ফরিদপুরের ইতিহাস

ফরিদপুরের ইতিহাস

আনন্দনাথ রায়



পারুল প্রকাশনী
১৬ আখাউড়া রোড, আগরতলা ৭৯৯০০১
ফোন (০৩৮১) ২৩৮৬৯৪৭
৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২২৪১-৬৪৭৪

প্রকাশিকা

শ্রীমতী রত্না সাহা
১৬ আখাউড়া রোড, আগরতলা

প্রচ্ছদ ঃ

রাজু সরকার

প্রথম প্রকাশ

৫ জুন, ২০০০

লেজার কম্পোজ

জ্যোতি লেজার পয়েন্ট
৬৩/২ডি সূর্যসেন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রণ

আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স
২৪৩/২সি এ পি সি রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

ভূমিকা

রত্নগর্ভা ফরিদপুর জেলার একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখেছিলেন আনন্দনাথ রায়। তারপর ফরিদপুরের বিবরণমূলক বেশ কিছু গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ জনবসতিও যে পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাস সমৃদ্ধ তা অনেকেরই অজানা। অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের প্রচেষ্টায় তার বেশ কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান সংকলন সেই ধরনের বেশ কিছু আলোচনায় সমৃদ্ধ।

বর্তমান বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার বিবরণ দিয়ে বই-এর আলোচনা শুরু। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্ব, প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক বিবরণ, কৃষি-শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ছড়া ও লোকসংগীত, স্থান পরিচয় এবং সাময়িকপত্রে প্রকাশিত কয়েকটি বিবরণ সংকলিত হয়েছে। জেলা ফরিদপুরের দক্ষিণাংশের বিস্তৃত বিলাঞ্চলের দুষ্প্রাপ্য বিবরণ বর্তমান গ্রন্থের অন্যতম মূল্যবান সংযোজন।

অম্বিকাচরণ মজুমদার
কবি জসীমউদ্দিন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান
স্মরণে

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

অবশেষে প্রকাশিত হল "ফরিদপুরের ইতিহাস"। এই ঐতিহ্যময় জেলাটির সম্পর্কে সব থেকে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ আনন্দনাথ রায়ের 'ফরিদপুরের ইতিহাস'। ১৩১৬ সালে প্রকাশিত গ্রন্থখানি তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাময়িক পত্র কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল।

জমিদার পরিবারের সন্তান আনন্দনাথ (১২৬২—১৩৪০) ছিলেন সেকালের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগারে ছিল যোল হাজারেরও বেশি মূল্যবান বই ও পত্রপত্রিকা। সমকালের গুণিজনদের মধ্যে বিশ্বকোষ সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু, দীনেশচন্দ্র সেন, ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায়, ময়মনসিংহেব বিবরণ ও ইতিহাস লেখক আরতি ও সৌরভ সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার, রামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ সিংহ-র সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর সুসম্পর্ক। বেশ কয়েকটি পত্র পত্রিকায়ও তাঁর রচনা প্রকাশিত হত।

আনন্দনাথের 'ফরিদপুরের ইতিহাস' ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১৬ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশকাল ১৩২৮। এবং তৃতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু এই খণ্ডটির প্রকাশকাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। আনন্দনাথের ফরিদপুরের ইতিহাসের মতই, তাঁর লেখা অপর একখানি গ্রন্থ "বারো ভুঁইয়া"। বারো ভুঁইয়া সম্পর্কে প্রচারিত কিংবদন্তির ওপর নির্ভর না করে, প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করেন আনন্দনাথ। সুদীর্ঘকাল এই বইখানিও ছাপা ছিল না। সম্প্রতি দে'জ ইতিহাস গ্রন্থমালায় "বারোভুঁইয়া" গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

"ফরিদপুরের ইতিহাস" ১ম খণ্ড প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' (১৩১৬ মাঘ) পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ঃ ".. ইহাতে ভৌগোলিক তত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত আছে। ফরিদপুর জেলার নদ, নদী, খাল, বিল, পথ. ঘাট, জাতি, ধর্ম, পশু, পক্ষী, মৎস্য, দেবমন্দির ও ধর্মশালা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। একখানি ম্যাপ ও রাজনগরের একুশ রত্নের মঠের একখানি চিত্র আছে। ইহা সাহিত্যপরিষদ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত। জাতীয় ঐতিহাসিক ইহার মধ্যে বহু উপকরণ পুঞ্জীভূত দেখিতে পাইবেন।... এই রকম গ্রন্থেই আমাদের দেশের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।..." আর্যাবর্ত পত্রিকায় 'ফরিদপুরের ইতিহাস' ১ম খণ্ডের যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ওই আলোচনা থেকে জানা যায় "গ্রন্থে মুখপত্র বা টাইটেল পেজের ও সূচির অভাব এবং আবরণেই "ভূমিকা" মুদ্রণ করা হয়েছিল। মুদ্রণে ছিল অসাবধানতা। যার ফলে অনেক ত্রুটি থেকে যায়। প্রথম খণ্ড মোট চারখানি বই সংগ্রহ করেছিলাম। লেখক ভূমিকায় নিজের আর্থিক অসঙ্গতি ও অক্ষমতার উল্লেখ কবেছেন। তাঁর লেখা ভূমিকার সবটুকু উদ্ধার সম্ভব হয়নি। কিন্তু মূল গ্রন্থ যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণই আছে। অবশ্য জীর্ণতার কারণে কয়েকটি স্থানের শব্দ উদ্ধার সম্ভব হয়নি।

ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র সম্পাদিত 'ঐতিহাসিক চিত্রে' লেখা হয়েছিল ঃ "... রায় মহাশয় ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানের এবং তৎসম্বন্ধে নিজের যুক্তি বলে তথ্য নির্ণয়ের অপূর্ব শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ফরিদপুরের ভৌগোলিক তত্ত্ব লইয়াও বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন জমিদারির কাগজপত্র দেখিয়া তিনি যেরূপ গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অল্পদিনের

ও অল্প পরিশ্রমের ফল নহে। এই খণ্ডে ফরিদপুরের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় তিনি সেন বংশের, পালবংশের, মুসলমান রাজত্বকালের নবাব ও সুলতানের, বারভূঁইয়ার এবং বহু প্রাচীন জমিদার বংশের অধিকার, রাজত্ব, যুদ্ধ, বিদ্রোহ প্রভৃতির সপ্রমাণ বিবরণী এত অধিক সংগ্রহ করিয়াছেন যে, পড়িতে গেলে আশ্চর্য বোধ হয়। তিনি পুস্তকখানিতে কৌতূহলজনক বাঙালি জাতির গৌরবজনক, দেশের প্রতি শ্রদ্ধাবর্ধক আত্মসম্মানবর্ধক ও অতীতের বহু পুরাতন মধুর কথা সন্নিবেশিত করিয়া পাঠক মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।..."

সে সময়কার ইংরেজি পত্রিকায় The Bengalee, Amrita Bazar Patrika, Indian Mirror-এ বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের কঠোর শ্রমের প্রতি যথাযোগ্য স্বীকৃতি জানানো হয়েছিল।

আনন্দনাথের 'ফরিদপুরেব ইতিহাস' অক্ষত অবস্থায় সংগ্রহ করা দুরূহ। কারো সব পৃষ্ঠা নেই। কারো অবস্থা জীর্ণপ্রায়, কোন কোন বইয়ের স্থানে স্থানে মুদ্রণ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবুও যথাসাধ্য মূল গ্রন্থ অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রেও কিছু বৈসাদৃশ্য আছে মূল গ্রন্থে। সেক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে। আকস্মিকভাবে প্রথম খণ্ডের একটি জীর্ণ সংস্করণ সংগ্রহ করেছেন শ্রীমান শুভঙ্কর দে। আমাদের সংগৃহীত সংস্করণের সঙ্গে সেটি মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে।

আনন্দনাথের মতই দীনবন্ধু রায় চৌধুরী (১২৫৭-১৩২৪) ছিলেন ফরিদপুরের জমিদার পরিবাবের সন্তান। 'পরিচয়' নামে দীনবন্ধু রায়চৌধুরী একখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনার পর ১৩২৪ সালে পরলোক গমন করেন। সেই অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি তাঁর পুত্র সতীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ করার পর প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালে। বইটি ফরিদপুরের দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তৃত বিল প্রসঙ্গের বিবরণের সঙ্গে আছে বঙ্গজ কায়স্থগণের সামাজিক ইতিহাস। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার পক্ষেও এই বইখানি অন্যতম উপকরণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। সে কারণেই এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রিত করা হল। এই পরিবার সুদীর্ঘকাল আগেই কলকাতায় চলে আসেন। সতীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে অধ্যাপনা করলেও, ১৯২০ সাল থেকে আইন ব্যবসায়ে যুক্ত হন।

দুটি গ্রন্থের রচনাকালের পরবর্তী দীর্ঘ সময়ে জেলা ফরিদপুরের অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের ফরিদপুরকে আর পুরনো চোখে উপলব্ধি সম্ভব নয়। জেলার সঠিক বিবর্তনের পরিচয় আছে গ্রন্থের প্রথমেই। আজকের পাঠক প্রাচীন ও আধুনিক জেলা পরিচয় সহজেই জানতে পারবেন।

ফরিদপুর জেলার বিবিধ প্রসঙ্গে কয়েকটি মূল্যবান রচনা গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে। মূল গ্রন্থ দুটিতে অনালোচিত কয়েকটি বিষয়ের প্রসঙ্গ আছে এই সব লেখায়।

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য জেলার ইতিহাসের মতই বর্তমান গ্রন্থেও আধুনিক বানান অনুসরণ করা হয়েছে।

পাঠকদের প্রতি সবিনয় নিবেদন, গ্রন্থটির সম্পর্কে কারো কোন বক্তব্য থাকলে, প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী শুক্লা সরখেল এবং শ্রীমতী অর্চনা ধর।

সূচিপত্র

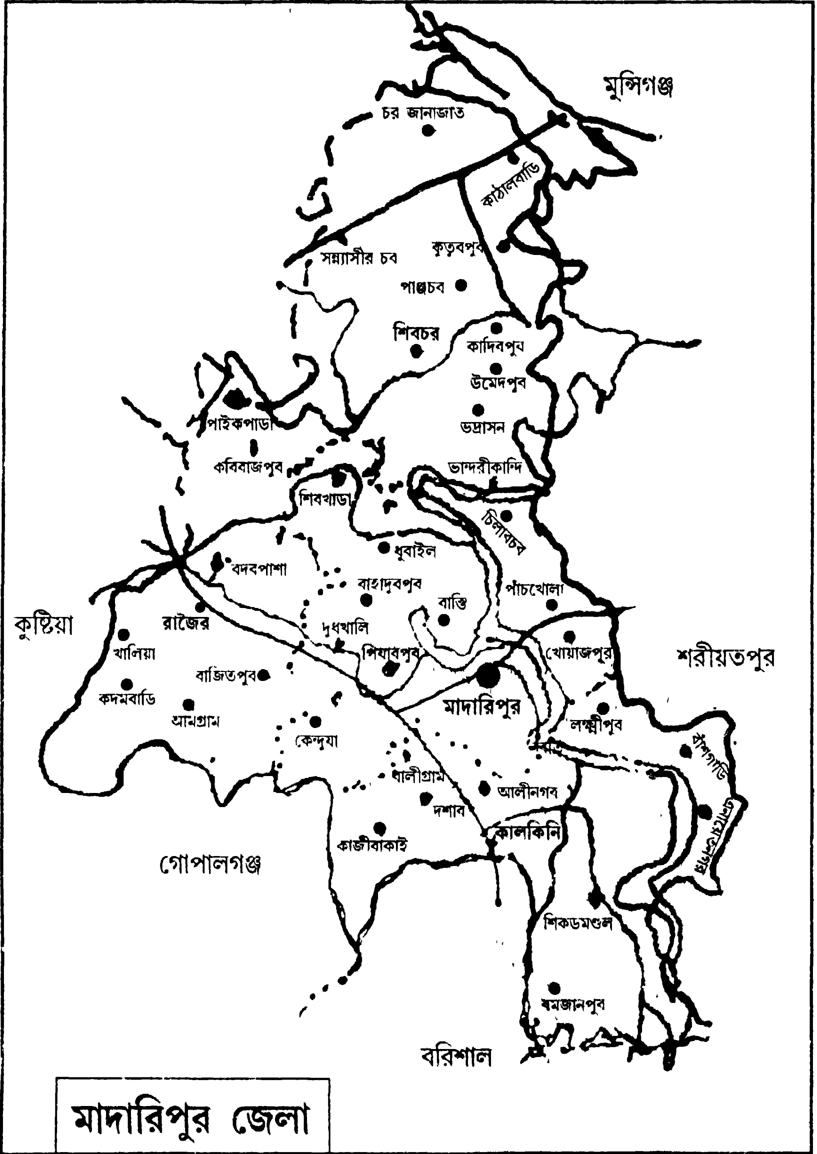
এখন ফরিদপুর


রাজবাড়ি
মানিকগঞ্জ
ঢাকা
চবমাধদিয়া
নর্থ চেনেল
অম্বিকাপুর
ফরিদপুর
ডুমাইন
গজানা
রায়পুব
কইজুরী
চরভদ্রাসন
বাগাট
মধুখালি
কানাইপুর
চব বিষ্ণুপুব
আক্তাবচক
ডাংগী
কৃষ্ণপুব
ঢেউখালি
আটঘর
গাটি
ভাসানচর
সদরপুর
মাগুরা
দাদপুব
ঘোসপুর
বামকান্তপুব
ভাওয়াল
নকল্লাগঞ্জ
ময়না
নগরকান্দা
হামিবদী
নাছিবাবাদ
মাঝাবদিয়া
কাইচাইল
ভাঙ্গা
সোনাপুব
পুবাপাড়া
আজিমনগব
আলগি
বল্লবদী
পরমেশ্বরদী
ঘারুয়া
মাদারিপুর
চর যশোবদী
নড়াইল
বুবাইচ
আলফাডাঙ্গা
গোপালগঞ্জ
গোপালপুব
ফরিদপুর জেলা


পাবনা
কুষ্টিয়া
হাবাসপুব
মানিকগঞ্জ
দেবগ্রাম
দৌলতদিয়া
বরাত
কালিমোহর
রাজবাড়ি
গোয়ালন্দ
কসবামাজাইল
বোয়াল্লিয়া
ইসলামপুব
সবাইল
বাহারপুর
মুলঘর
ঝিনাইদহ
খানখানাপুর
শহীদ ওহাবপুব
বসন্তপুর
মাগুরা
বালিয়াকান্দি
সুলতানপুর
ফরিদপুর
গোপালগঞ্জ
রাজবাড়ি জেলা

মুন্সিগঞ্জ
নওপাড়া
কান্দেরচর
চবত্রা
কাছিকাটা
সেনেরচর
বিলাসপুর
জানজিরা
ভোমকড়া
রাজনগর
নড়িয়া
ডিংগা
মানিকচর
চিকন্দী
চন্দ্রপুব
নাছাছন
জাপশা
ডোমেশ্বব
ঝিঝাবি
দিগাব মহিষখালী
বিনোদপুব
শরীয়তপুর
চর কুমারিয়া
নারায়ণপুব
ভেদরগঞ্জ
মেঘনা নদী
কনেশ্বর
ডামুড্যা
মাদারিপুর
ধানকাটি
গোসাইর হাট
নাগেরপাড়া
চাঁদপুর
ইদিলপুব
নালমুড়ি
বরিশাল
শরীয়তপুর জেলা

ফরিদপুর
মুকসুদপুর
বাটিকামারী
মহারাজপুব
মধুমতী
পাশারঘাট
বাববাসুব
সাজইল
গোবিন্দপুব
বাঘদি
বাঁশবাড়িয়া
কাশিয়ানী
মামুদপুব
বাজগ্রাম
জালিরপাড়
মাদারিপুর
ওরাকান্দি
সিঙ্গা
বেথুরী
বোয়ালতলী
গোপীনাথপুর
জালালাবাদ
সাহাপুর
কালাবাড়ি
সাদুল্লাপুর
করপাড়া
বামশীল
নড়াইল
কাজুলীয়া
কসলা
গোপালগঞ্জ
উরাফি
কোটালিপাড়া
কাঁথি
গোপালপুর
বুরুনী
সোয়াগ্রাম
টুঙ্গীপাড়া
পিঞ্জরী
কান্দী
বরিশাল
ডুমুরিয়া
বাগেরহাট
পিরোজপুর
গোপালগঞ্জ জেলা


মুন্সিগঞ্জ
চর জানাজাত
কাঠালবাড়ি
কুতুবপুর
সন্ন্যাসীর চর
পাঞ্চর
শিবচর
কাদিরপুর
উমেদপুর
ভদ্রাসন
পাইকপাড়া
কবিরাজপুর
ভান্দরীকান্দি
শিবখাড়া
চিলারচর
ধুবাইল
বদরপাশা
বাহাদুরপুর
পাঁচখোলা
বাস্তি
কুষ্টিয়া
রাজৈর
দুধখালি
খোয়াজপুর
শরীয়তপুর
খালিয়া
পিয়ারপুর
বাজিতপুর
মাদারিপুর
কদমবাড়ি
আমগ্রাম
লক্ষ্মীপুর
কেন্দুয়া
হাঁসগাড়ি
আলীনগর
দশার
কালকিনি
কাজীবাকাই
গোপালগঞ্জ
শিকড়মঙ্গল
রমজানপুর
বরিশাল

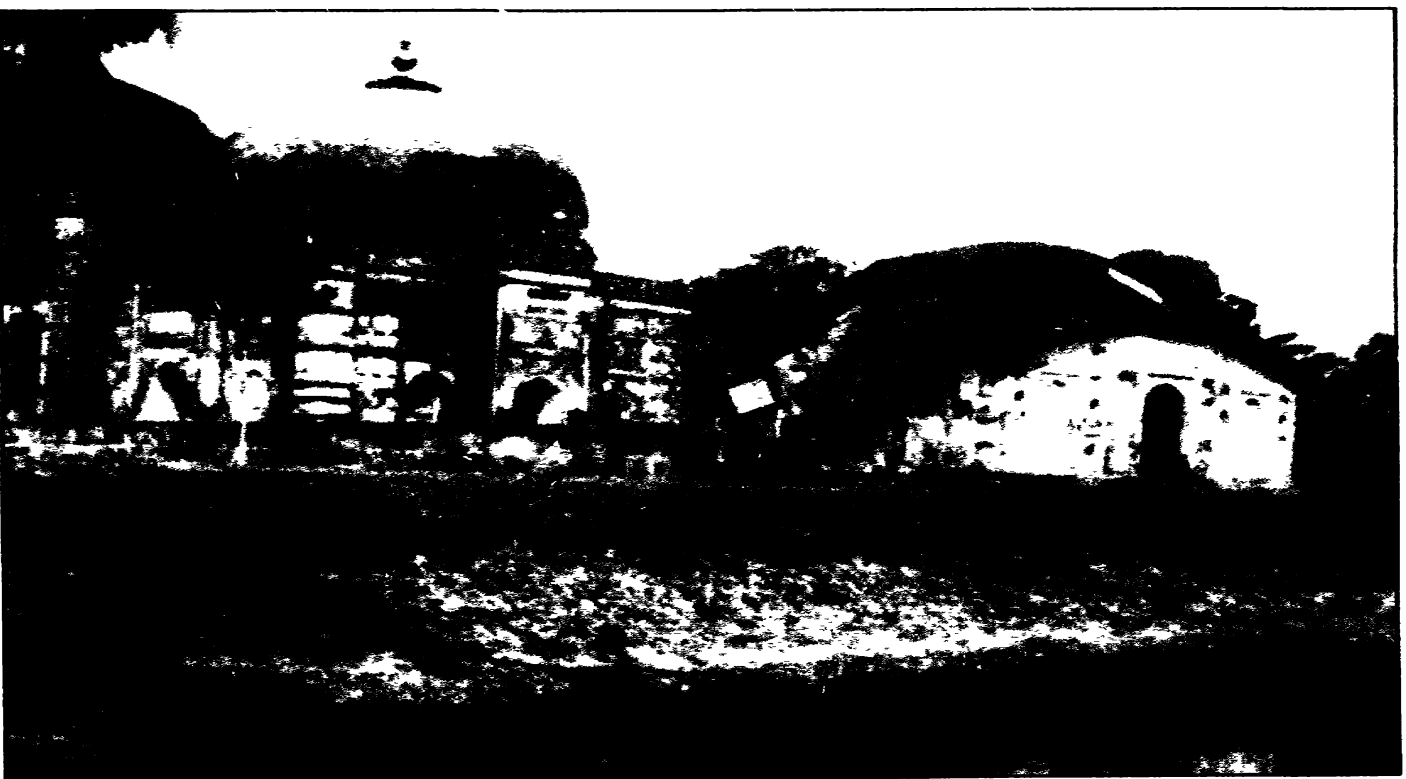
মাদারিপুর জেলা



বালিয়াকান্দির কাছে চন্দনা—বারাসিয়া খালের সংস্কার চলছে



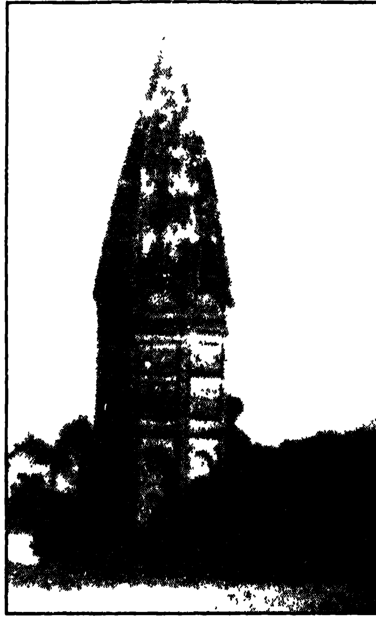
জেলার সর্বপ্রাচীন—ফরিদপুর জেলাস্কুল



রসিন্দুর, শাহ মুহম্মদের মসজিদ



গোয়ালন্দ ঘাট



কালীচরণ রাসের মঠ,
খালিয়া, ফরিদপুর (১৯শতক)



শিবমন্দির, খালিয়া, ফরিদপুর



ফরিদপুর, পাথরাইল, মসজিদ



ময়মনসিংহ, এগারসিন্দু, সাদীর মসজিদ



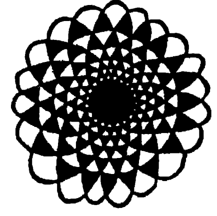
ধানখেত—খেজুর গাছ



খালিয়ার রাজারাম মন্দির

এখন ফরিদপুর

এখন ফরিদপুর



ফরিদপুর জেলাটি ২২°৫১'—২৩°৫৫ উত্তর, ৮৯°১৯'—৯০°৩৭ পূর্বে অবস্থিত। বর্তমান আয়তন ৭০০৬ বর্গ কিমি (২৮২১ বর্গমাইল)। দক্ষিণে বাকরগঞ্জ জেলা। জেলার উত্তরে পদ্মা, পূর্বে মেঘনা, পশ্চিমে গড়াই, মধুমতী এবং বাবসিয়া নদী। এইসব নদী জেলা ফরিদপুরকে বিচ্ছিন্ন করেছে ঢাকা, নোয়াখালি, কুষ্ঠিয়া ও যশোহর জেলা থেকে। ফরিদপুর জেলাটি পদ্মা ও মেঘনার পলিমাটিতে গঠিত। উত্তর ও পূর্বদিক অপেক্ষাকৃত উঁচু, অন্যান্য অংশের তুলনায়। জেলার দক্ষিণাংশ ক্রমশ ঢালু হয়ে মিশেছে বাকরগঞ্জ জেলার উত্তরাংশে। এই অংশটি সম্পূর্ণ জলাভূমি। এই জলাভূমি নবাবশাহী নামে পরিচিত। এখানে ঢোলসমুদ্র নামে প্রকাণ্ড বিল আছে। যার জল বর্ষার সময় শহরে প্রবেশ করে।

জেলার অন্যতম নদী হল পদ্মা, মেঘনা, গরাই, মধুমতী, আরিয়লখাঁ, চন্দনা, ভুবনেশ্বর, পালঙ্ এবং নয়া ভাঙানি। নদীগুলির বেশিরভাগই সারা মাসই নৌচলাচলের উপযোগী থাকে। ফলে ব্যবসা কেন্দ্রগুলির অধিকাংশই গড়ে উঠেছে নদীতীরে অনুকূল পরিবেশে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গোয়ালন্দ, মাদারিপুর, বাজবাড়ি, সৈয়দপুর, গোপালগঞ্জ, ভাটিয়াপাড়া। এই সঙ্গে অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য পাঙসা, কালুখালি, মধুখালি এবং কামারখালি।

মরা পদ্মা খালের পশ্চিম তীরে ফরিদপুর জেলা সদর অবস্থিত। আয়তন ১৩ বর্গ কিমি। এই শহরকে কেন্দ্র করেই শিল্পবিকাশ ঘটেছে। বিকশিত শিল্পগুলির অন্যতম হল চর্মশিল্প, হোসিয়ারি, ছাপাখানা, চাউল কল, সাবান কারখানা, রেল মেরামত কারখানা ও সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। নানা ধরনের কুটির শিল্পে জেলার সুনাম দীর্ঘকালের। তার অন্যতম কয়েকটি হল শীতলপাটি, বেতেব ঝুড়ি, ডালা, মাদুর, তাঁতেব কাপড়, চটের থলি ইত্যাদি।

ধান প্রধান কৃষিপণ্য হলেও, ডাল, তৈলবীজ, লঙ্কা, গম, বার্লি, আখ, তামাক, নারকেল, সুপারির উৎপাদনও কম নয়। পাট উৎপাদন জেলার অনত্যম আর্থিক শক্তি।

বাংলায় ভ্রমণে উল্লেখ আছে ঃ "কলিকাতা হইতে ১৬৬ মাইল দূর। জেলার সদর শহর ফরিদপুর মরা পদ্মা নামে একটি খালের উপর অবস্থিত। ইহার পূর্বদিকে মাদারতলা খাল ও পশ্চিমে ফরিদপুরের জোলা নামে আরও দুইটি খাল আছে। শহরের দক্ষিণ দিকে ঢোলসমুদ্র নামে একটি প্রকাণ্ড বিল আছে। বর্ষাকালে এই বিলের জল শহরের প্রান্তদেশ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছে। ফরিদ খাঁ নামক এক ফকিরের নাম হইতে ফরিদপুরের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া কথিত। ফরিদ খাঁর দরগাহ কাছারীর উত্তরে দৃষ্ট হয়। পূর্বে এই শহরের কমলাপুরপাড়ার উত্তর পশ্চিমে পদ্মাবহিত এবং তাহার নিকটে বন মধ্যে একটি ডাকাতের দলের আড্ডা ছিল। ইহার নেতৃত্ব করিত ছবদরা নামে একটি স্ত্রীলোক ; এই ডাকাতের দল দমন করিবার জন্য প্রথমে এখানে মহকুমার প্রতিষ্ঠা হয় এবং পরে ইহা জেলার সদরে পরিণত হইয়াছে।

"ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজ নামে একটি দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজ আছে। পরলোক গত বিখ্যাত জননায়ক অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় ফরিদপুরের অধিবাসী ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল পুরাতন ফরিদপুর স্টেশনটির নাম পরিবর্তিত করিয়া তাঁহার নামানুসারে অম্বিকাপুর

রাখা হইয়াছে এবং রেললাইনকে বিস্তৃত করিয়া বর্তমান ফরিদপুর স্টেশনের সৃষ্টি হইয়াছে। ফরিদপুরে জগদ্বন্ধুসুন্দর নামে একজন ভক্ত সাধক বাস করিতেন। তাঁহার সমাধি এখানকার একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।" *(বাংলায় ভ্রমণ। পৃঃ ১১১-১১২)*

"ফরিদপুর নাম ফরিদ খাঁ নামে এক ফকিরের নাম হইতে হইয়াছে বলিয়া কথিত। চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে ফরিদপুর জেলা পূর্ব বাংলার অন্যান্য অংশের সহিত মুসলমানদের অধীন হইয়া পড়ে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বারো ভুঁইয়াদের ইতিহাসের নিদর্শন এখনও এই জেলায় দেখা যায়, যথা কেদার রায়ের কীর্তি পরিখা বেষ্টিত কেদারবাড়ি এবং ভূষণা থানার কেল্লাবাড়িতে সীতারাম রায়ের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। ইংরেজ আমলে ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর একটি স্বতন্ত্র জেলা হইয়া ওঠে।" *(ভারত কোষ। ৪র্থ খণ্ড। পৃঃ ৪৮৯)*

জেলার জনসংখ্যা ১৯৬১ সালে ছিল ৩১,৭৯,০০০ জন। তার মধ্যে ২৩,৪৭,০০০ জন মুসলমান, ২,২৯,০০০ জন হিন্দু, ৫,৯৪,০০০ জন নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং ৯০০০ জন খ্রিস্টান। ১৯৮১ সালে জনসংখ্যা ছিল ৪৭,৬৪,০০০ জন। তখন জেলার ৪টি মহকুমা ছিল ফরিদপুর সদর, গোয়ালন্দ, গোপালগঞ্জ এবং মাদারিপুর।

নতুন ফবিদপুর জেলার আয়তন ১৬৯৯.৮ বর্গ কিমি। জনসংখ্যা ১৩,১৫,০০০ জন। এই জেলার থানাগুলি হল ফরিদপুর, চরভদ্রাসন, বোয়ালমারি, নগরকান্দা, ভাঙা, আলফাডাঙা, সদরপুর এবং চন্দনখালি।

বর্তমান বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ৫টি জেলা ঃ

১. ফরিদপুর
২. রাজবাড়ি
৩. গোপালগঞ্জ
৪. মাদারিপুর
৫. শরিয়তপুর

রাজবাড়ি ঃ

আয়তন ঃ ১১১৯ কিমি^{2} **জনসংখ্যা** ('০০০') ঃ ৯৬৩ (উপরে)

সীমা ঃ উত্তর ঃ পাবনা ও মানিকগঞ্জ।

দক্ষিণ ঃ ফরিদপুর, মাগুরা ও ঝিনাইদহ।

পূর্ব ঃ মানিকগঞ্জ।

পশ্চিম ঃ কুষ্ঠিয়া।

ইউনিয়ন ঃ ৪২ **থানা ঃ** ৪ **মৌজা ঃ** ৯৩৪

জনবসতির ঘনত্ব ঃ ৮৫২

শিক্ষিতের হার (৭+বৎসর) ঃ ৪৬% (ওপরে)

নদনদী ঃ পদ্মা, মধুমতী ও অন্যান্য

ভূপ্রকৃতি ঃ মাঝারি উঁচু জমি-গঙ্গা প্লাবিত সমভূমি

প্রধান ফসল ঃ ধান, পাট, আখ প্রভৃতি

পরিবহন

বাস সার্ভিস ঃ রাজবাড়ি-দৌলতদিয়া ঘাট বা স্টেশন
পাঙসা বাস স্টেশন
ঢাকা বাস স্টেশন ইত্যাদি

রেল স্টেশন ঃ রাজবাড়ি রেল স্টেশন
গোয়ালন্দ রেল স্টেশন
কালুখালি বেলওয়ে জংশন (রতনদিয়া-পাঙসা) ইত্যাদি

নদীবন্দর ঃ দৌলতদিয়া ঘাট (গোয়ালন্দ)
দহপাড়াঘাট (সূর্যনগর)
হোটেল ঃ (জেলাসদরে) হোটেল-আল-কুশ (তিনপট্টি)
গুলসন বোর্ডিং (মুজিব বিল্ডিং)
বসুন্ধরা রেস্ট হাউস (কুষ্টিয়া রোড)
রাজবাড়ি বোর্ডিং (রেল স্টেশন রোড) ইত্যাদি
হোটেল রেস্টুরেন্ট ঃ হোটেল ডিলাক্স (স্টেশন রোড)
শংকর সুইটস (রাজবাড়ি বাজার)
হাসপাতাল ঃ আধুনিক সদর হাসপাতাল (সদর রোড)
ক্লিনিক ঃ আদর্শ ক্লিনিক (বড় পুল)
রাজবাড়ি ক্লিনিক (হসপিটাল রোড)
ঢাকা থেকে দূরত্ব ঃ
গোয়ালন্দ সড়কপথে ১০৯.৪৮ কি. মি.
রেলপথে ৪৪৯.৫৮ কি. মি.
জলপথে ১০৯.৪৮ কি. মি.
দ্রষ্টব্য স্থান ঃ লক্ষ্মীকোল রাজবাড়ি, চৌধুরি হাউস, বাণীবহর জমিদারবাড়ি।

ফরিদপুর ঃ

সীমা ঃ উত্তর ঃ ঢাকা, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ি।
দক্ষিণ ঃ মাদারিপুর, গোপালগঞ্জ এবং নড়াইল।
পূর্ব ঃ ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ এবং মাদারিপুর।
পশ্চিম ঃ রাজবাড়ি, মাসুরা এবং নড়াইল।
আয়তন ঃ ২০৭৩ কি. মি²
ইউনিয়ন ঃ ৭৯ **থানা ঃ** ৮ **মৌজা ঃ** ৯১১
জনসংখ্যা ঃ ('০০০') ঃ ১৭০৬ (ওপরে)
জনবসতির ঘনত্ব ঃ ৮৮২
শিক্ষিতের হার ঃ (৭+বৎসব) ঃ ৪৮% (ওপরে)
নদনদী ঃ পদ্মা, কুমার, মধুমতী ইত্যাদি।
ভূপ্রকৃতি ঃ অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চল-গঙ্গাপ্লাবিত সমভূমি।
প্রধান ফসল ঃ ধান, পাট, আখ ইত্যাদি।
শিল্প ঃ পাট, ওষুধ ইত্যাদি
পরিবহন ঃ
বাস স্টেশন ঃ ফরিদপুর সদর বাসস্টেশন
রেল স্টেশন ঃ ফরিদপুর রেল স্টেশন
হাসপাতাল ঃ ফরিদপুর সদর হাসপাতাল
ঢাকা থেকে দূরত্ব
সড়কপথে ঃ ১৪৪.৯০ কি. মি.
রেলপথে ঃ ৪৬৫.২৯ কি. মি.
আকাশ পথে ঃ ৫৯ ৫৭ কি. মি.
জলপথে ঃ ১৯১.৫৯ কি. মি.

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ কামারখালিতে গরাই ব্রিজ, আত্রালি ও চন্দ্রপাড়ার দরবার শরিফ, মথুরাপুর দেউল।

শরিয়তপুর ঃ

সীমা ঃ উত্তর ঃ মুন্সিগঞ্জ।
দক্ষিণ ঃ বরিশাল।
পূর্ব ঃ চাঁদপুর।
পশ্চিম ঃ মাদারিপুর।
আয়তন ঃ ১১৮১ কি. মি²
ইউনিয়ন ঃ ৬ **থানা ঃ** ৬ **মৌজা ঃ** ৫২০
জনসংখ্যা ঃ ('০০০') ঃ ১০৭২ (ওপরে)
জনবসতির ঘনত্ব ঃ ৯০৮
শিক্ষিতের হার ঃ (৭+বৎসর) ঃ ৪৫% (ওপরে)
নদনদী ঃ পদ্মা, মেঘনা, পালঙ নদী ইত্যাদি।
ভূপ্রকৃতি ঃ গঙ্গা প্লাবিত সমভূমি
প্রধান ফসল ঃ ধান, পাট ইত্যাদি
শিল্প ঃ মৃৎ শিল্প
পরিবহন ঃ
বাস স্টেশন ঃ আভ্যন্তরীণ বাসস্টেশন
নদী বন্দর ঃ সদর ঘাট—শরিয়তপুর
হাসপাতাল ঃ শরিয়তপুর সদর হাসপাতাল
ঢাকা থেকে দূরত্ব ঃ সড়কপথে ঃ ২৩৮ কি.মি.
নয়নাভিরাম নদী দৃশ্য দর্শকদের মুগ্ধ করে।

মাদারিপুর ঃ

সীমা ঃ উত্তর ঃ ফরিদপুর ও মুন্সিগঞ্জ।
দক্ষিণ ঃ গোপালগঞ্জ ও বরিশাল।
পূর্ব ঃ শরিয়তপুর।
পশ্চিম ঃ গোপালগঞ্জ।
আয়তন ঃ ১১৪৫ কি. মি²
ইউনিয়ন ঃ ৫১ থানা ঃ ৪ মৌজা ঃ ৬৮৬
জনসংখ্যা ঃ ('০০০') ঃ ১২০৭ (ওপরে)
জনবসতির ঘনত্ব ঃ ১০৫৩
শিক্ষিতের হার ঃ (৭+বৎসর) ঃ ৫১% (ওপরে)
নদনদী ঃ পদ্মা, নুলাত, কুতুবপুর, কুমার, ভদ্রাসন, আরিয়লখাঁ প্রভৃতি।
প্রধান ফসল ঃ ধান, পাট ইত্যাদি
শিল্প ঃ টেক্সটাইল, পাট, মৃৎশিল্প, ইত্যাদি।
খনিজ দ্রব্য ঃ পিট কয়লা
পরিবহন ঃ
বাস স্টেশন ঃ আভ্যন্তরীণ বাসস্টেশন

নদী বন্দর ঃ সদর ঘাট

হোটেল ঃ হোটেল সুমন (জেলা সদর)

হাসপাতাল ঃ মাদারিপুর সদর হাসপাতাল

ঢাকা থেকে দূরত্ব ঃ

সড়কপথে ঃ ২১৮.৯৬ কি. মি.

জলপথে ঃ ৯৮.২১ কি. মি.

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ হজরত শাহ সুফি খাজা ইউসুফ শাহ আহসানের দরগাহ, দালপের নীল কুঠি।

গোপালগঞ্জ ঃ

সীমা ঃ উত্তর ঃ ফরিদপুর।

দক্ষিণ ঃ বাগেরহাট ও পিরোজপুর।

পূর্ব ঃ মাদারিপুর।

পশ্চিম ঃ নড়াইল।

আয়তন ঃ ১৪৯০ কি.মি[২]

ইউনিয়ন ঃ ৬৯ **থানা ঃ** ৫ **মৌজা ঃ** ৬১৪

জনসংখ্যা ঃ ('০০০') ঃ ১১৮৬ (ওপরে)

জনবসতির ঘনত্ব ঃ ৭৯৮

শিক্ষিতের হার ঃ (৭+বৎসর) ঃ ৫৩% (ওপরে)

নদনদী ঃ মধুমতী, কুমার ইত্যাদি

ভূপ্রকৃতি ঃ নিম্নাঞ্চল - গঙ্গাপ্লাবিত সমভূমি

প্রধান ফসল ঃ ধান, পাট ইত্যাদি

খনিজ দ্রব্য ঃ পীট কয়লা

পরিবহন ঃ

বাস স্টেশন ঃ কুয়াডাঙা বাস স্টেশন
টঙ্গিপাড়া-ঢাকা বাস স্টেশন

রেল স্টেশন ঃ কাশিয়ানি স্টেশন

নদী বন্দর ঃ হরিদাসপুর
মানিকদহ (গোপালগঞ্জ)

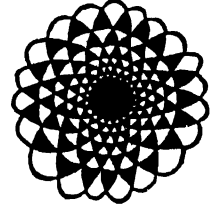
হাসপাতাল ঃ গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতাল

ঢাকা থেকে দূরত্ব ঃ

সড়কপথে ঃ ২৩২ কি. মি.

হোটেল ঃ (জেলা সদর) হোটেল রেফাত (চৌরঙ্গি বাজার), হোটেল সোহাগ, হোটেল সীমা (কাপুরপট্টি), হোটেল গোল্ডেন

দ্রষ্টব্য স্থান ঃ বঙ্গবন্ধু সেখ মুজিবরের সমাধি টঙ্গিপাড়া।



ইতিহাসের পথ বেয়ে ফরিদপুর

সমুদ্র গর্ভে উত্তরের নদীবাহিত পলি, পাথরকুচি জমে, দক্ষিণবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলে কয়েক হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠে ভূখণ্ড। আজকের বদ্বীপ অঞ্চলের উত্তরাংশেও সামুদ্রিক জলরাশির প্রবাহ সুদীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। গড়ে ওঠা ভূখণ্ডে গাছপালা জন্মেছে। এসেছে জীবজন্তু। অনেক পরে মানুষ। সেসব কয়েক হাজার বছর আগেকার কথা। আজ বাংলার যে অংশে ফরিদপুর নামে পরিচিত তা এককালে ছিল বঙ্গরাজ্যভুক্ত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে (৩৮০-৪১২ খ্রিঃ) কবি কালিদাস রঘুবংশ কাব্যে বঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। সে সময়ে ফরিদপুরসহ অন্যান্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চল গঙ্গাবক্ষে ছিল দ্বীপ সমিষ্টি। বসতকারী জনগোষ্ঠী ছিল সুদক্ষ নৌজীবী। বেঁচে থাকতে তারা ছিল নৌকার ওপর নির্ভরশীল। ক্রমশ ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা ও অন্যান্য নদীবাহিত পলি, পাথর জমে জমে গড়ে ওঠে এক অখণ্ড বিশাল ভূখণ্ড। যার মধ্যে ছড়িয়ে থাকা নদীনালার পরিচয় আজও বর্তমান। আর এই ভূখণ্ড ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে দক্ষিণে।

গুপ্ত আমলে (৪-৫৪৪ খ্রিঃ) ফরিদপুর অঞ্চলে ছিল তাদের অধিকার বিস্তৃত। সমুদ্রগুপ্তের (৩৪-৩৮০ খ্রিঃ) এলাহাবাদ শিলালেখ এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও স্কন্ধগুপ্তের প্রাপ্ত বেশকিছু স্বর্ণমুদ্রা থেকে এই ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে গুয়াখোলা গ্রামের সোনাকুন্দরি প্রান্তরে পাওয়া গেছে এই স্বর্ণমুদ্রা। ষষ্ঠ শতকে (৫৮৬ খ্রিঃ) রাজা ধর্মাদিত্যের সময়ে এই জেলায় জমি দান করা হয়েছিল। জেলায় প্রাপ্ত দুটি তাম্রফলকে তা জানা যায়। ধর্মাদিত্যই হলেন সম্রাট যশোধর্মন— ঐতিহাসিকরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন। পরবর্তীকালে গোপচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রকে ক্ষমতাচ্যুত করে যশোধর্মন রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার কবেন। সে সময়ে ফরিদপুর অঞ্চল ছিল তার অধিকারভুক্ত।

ঘাঘর নদীর ধারে পিনজারির সন্নিকটে ঘাঘরহাটি গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রলিপিতে সমাচারদেব নামক এক নৃপতির নাম পাওয়া যায়। তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্য পতনের পর এই অঞ্চলে স্বাধীন রাজা (৬১৫-৬২০ খ্রিঃ) ছিলেন। তিনি ছিলেন শৈবভক্ত। সম্রাট শশাঙ্কের পূর্বে সাত শতকের প্রথমপর্বে তিনি ছিলেন এই অঞ্চলের অধীশ্বর। সাত শতকের দ্বিতীয় দশকে বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করেন হর্ষবর্ধন। এই সময়ে ভারত দর্শনে আসেন চীন পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ। তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন। ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে এবং বাংলায় কয়েকজন স্বাধীন নৃপতির আবির্ভাব ঘটে। এই সময়ের ধারাবাহিক বিবরণ উদ্ধার সম্ভব না হলেও, বিভিন্ন তাম্রফলক থেকে কয়েকজন নৃপতির নাম পাওয়া যায়। এই সময়ে খড়্গ নৃপতিরা ছিলেন ক্ষমতাশালী। কুমিল্লার ১৪ মাইল পশ্চিমে বদকামতায় ছিল তাদের রাজধানী। এই রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় দশম ও একাদশ শতকে ঢাকার বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করে বৌদ্ধ চন্দ্রবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। ফরিদপুরের ইদিলপুর ও কেদারপুর এবং ঢাকার রামপালে প্রাপ্ত তাম্রফল থেকে তাদের শাসনকাল সম্পর্কে জানা যায়।

বর্মন রাজাদের আমলে (১০৮০—১১৫০ খ্রিঃ) ফরিদপুর ছিল তাদের রাজ্যভুক্ত। বর্মনরা বিক্রমপুর থেকে শাসনকার্য চালাতেন। বর্মনদের ক্ষমতাচ্যুত করে বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করে সেনবংশ। বিজয় সেনের সময়ে (১০৯৭—১১৬০ খ্রিঃ) ফরিদপুর অঞ্চলে তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা থেকে বর্মন এবং উত্তর বাংলা থেকে পালদের বিতাড়িত করেছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। বিজয় সেন এবং তার উত্তর পুরুষ বল্লাল সেন (১১৬০—১১৭৯ খ্রিঃ) ছিলেন শৈব মতাবলম্বী। বল্লাল সেনের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল দুর বিস্তৃত। বল্লাল সেনের পর সিংহাসনে বসেন তার পুত্র লক্ষ্মণ সেন (১১৭৮—১২০৬ খ্রিঃ)। লক্ষ্মণ সেন ১২০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। ওই বছর ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খিলজি সেনরাজাদের রাজধানী নদিয়া দখল করেন। তখন বৃদ্ধ নৃপতি লক্ষ্মণ সেন পূর্ববাংলায় চলে যান এবং ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করে দেশ শাসন করতে থাকেন। এখানে সেন রাজাদের কয়েক পুরুষ রাজত্ব করেন। তাদের অন্যতম ছিলেন বিশ্বরূপ সেন (১২০৬—১২২০ খ্রিঃ)। ফরিদপুরের কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ত শাসন থেকে তাঁর শাসনকাল সম্পর্কে জানা যায়। ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সেন রাজাদের আধিপত্য অব্যাহত ছিল।

ত্রয়োদশ শতকের তিনের দশকে দেববংশের রাজা দশরথদেব সেন অধিকার খর্ব করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। সম্ভবত দশরথ দেব হলেন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার (কুমিল্লা-নোয়াখালি অঞ্চলে) দেববংশের প্রতিষ্ঠাতা দামোদর দেব-এর বংশধর। দশরথ দেব হলেন ফরিদপুর সহ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সর্বশেষ হিন্দু শাসক। তারপর এই অঞ্চলে স্থাপিত হয় মুসলিম আধিপত্য। এই সময়ের আকর্ষণীয় ও মূল্যবান বিবরণ আছে স্যর উইলিয়ম হান্টারের গ্রন্থে হোসেন সাহর (১৪৯৩—১৫১৯) আমলের আগে, ফরিদপুরের আনুপূর্বিক ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। এই সময়ে যশোহর, খুলনা, পাবনা এবং ফরিদপুরের কয়েকটি পরগণার নাম ছিল নসরৎসাহী, মাহমুদসাহী, ইউসুফসাহী ও মাহমুদাবাদ। এগুলির নামকরণ হয় হোসেন সাহ, তার ভাই ইউসুফসাহ এবং দুই পুত্র নসরত শাহ এবং মাহমুদ সাহের নামানুসারে।

হোসেন সাহেব আমলে প্রধান শহর ছিল ফাতেহাবাদ। এই ফাতেহাবাদই ফরিদপুর। লখনৌতির শাসক জালালুদ্দিন ফতে সাহর (১৪৮১—১৪৮৭ খ্রিঃ) নামানুসারে হয় ফতেহাবাদ। ফরিদপুর, ঢাকা ও বাকরগঞ্জের অংশবিশেষ এবং দক্ষিণ সাহবাজপুর ও সন্দ্বীপ দ্বীপ নিয়ে গঠিত হয়েছিল এই সরকার। আইনি আকবরি থেকে জানা যায় মাহমুদাবাদ সরকারের মধ্যে ছিল ফরিদপুরের পশ্চিম অংশ, যশোহর ও কুষ্ঠিয়ার অংশ।

১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে আকবরের সেনাবাহিনী বঙ্গ বিজয়ে এগিয়ে আসে। দক্ষিণপূর্ব বঙ্গ অধিকারের জন্য মোরাদ খাঁনের নেতৃত্বে স্বতন্ত্র একদল সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়। আকবরনামা থেকে জানা যায় সেনাপতি মোরাদ খাঁন ফতেহাবাদ (ফরিদপুর) ও সরকার বাকলা (বাকরগঞ্জ) অধিকার করেন। তিনি ফতেহাবাদে থাকতেন এবং সেখানে তিনি ছয় বছর পরে মারা যান। অনেকের অনুমান ফরিদপুর শহরের ১৩ মাইল দূলে খানখানপুরে ছিল তার বাসস্থান। বর্তমান এখানে একটি রেলওয়ে স্টেশন আছে।

মুকুন্দরাম রায় ও সত্রাজিৎ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন ঃ "যে দ্বাদশ জন ভৌমিক মোঘল-আগমনের পূর্বে বঙ্গদেশ একরূপ শাসন করিতেছিলেন, তন্মধ্যে ভূষণা বা ফতেয়াবাদ (আধুনিককালে অনেকটা ফারিদপুর জেলা লইয়া এই রাজ্য গঠিত হইয়াছিল) রাজ্যের অধিপতি মুকুন্দরাম রায় মোঘলদিগের বিরুদ্ধে প্রায় সমস্ত জীবনযুদ্ধ করিয়াছেন। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে মুকুন্দরাম অতি অল্প সময়ের জন্য মোঘল রাজপ্রতিনিধি বঙ্গেশ্বর ইসলাম খাঁর সঙ্গে সৌহার্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে কুচবিহার অভিযানের সময়ে কিছু সৈন্য দিয়া সহায়তা

করিয়াছিলেন ; কিন্তু মূলত ইনি মোঘলদের চিরশত্রু ছিলেন। ক্ষণকালব্যাপী সখ্যের ফলে কতকদিনের জন্য তিনি পাণ্ডুয়া ও গৌহাটির সুবেদার হইয়া মোঘলদের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার স্বাধীন প্রকৃতি এই কার্য একেবারেই পছন্দ করে নাই, তাহার পুত্র সত্রাজিৎকে ঐ সুবেদারী দিয়া তিনি স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সৈন্য সংগ্রহ ও রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া মোঘলের বিরুদ্ধে পুনরায় বিদ্রোহ করেন। কথিত আছে, প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পরও তিনি মোঘলদিগের সঙ্গে কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহ চালাইয়াছিলেন। তিনি মোঘল-সেনাপতি মোরাদের পুত্রগণকে ভূষণায় আমন্ত্রণ করিয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন (বেভারিজ-আকবরনামা, ৩য় খণ্ড, ৪৬৯ পৃঃ)। কথিত আছে মুকুন্দবাম রায় মোঘলরাজ প্রতিনিধি বঙ্গেশ্বর সৈয়দ খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। পুত্র সত্রাজিৎও তাহার পৈত্রিক বিদ্রোহভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে মুখে বশ্যতা স্বীকার করিলেও মোঘলদিগের বিরুদ্ধ-পক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। কোচদের সঙ্গে যখন মোঘলেরা যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, তখন কোচরাজ বলদেবের সঙ্গে একটা গুপ্তসন্ধি করিয়া ইনি মোঘলদিগের গতিবিধির সমস্ত সংবাদ শত্রুপক্ষকে দিতেছিলেন। ব্লকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন, "Satrajit gave Jahangir's governors of Bengal no end of trouble and refused to send in customary *peskash* or do homage at the court of Dacca." (Blockman, p. 332)। সত্রাজিৎ জাহাঙ্গীরের বাংলার শাসনকর্তাদের যৎপরোনাস্তি অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি ঢাকায় বঙ্গেশ্বরকে প্রচলিত পেশকাস প্রদান কিংবা বশ্যতা স্বীকার করিতে কখনই স্বীকৃত ছিলেন না। ১৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বন্দি হইয়া ঢাকায় আনীত হন এবং তথায় তাহাকে হত্যা করা হয়।"

বৃহৎ বঙ্গ। দ্বিতীয় খণ্ড। দে'জ সংস্করণ। পৃঃ ৮০০-৮০১

মুকুন্দরাম সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র মিত্রের রচনা থেকে জানা যায় ঃ "সেনাপতি মুনেম খাঁ যখন (১৫৭৪) সসৈন্যে বঙ্গে আসেন, তখন মোরাদ খাঁ নামক একজন সেনানী তাহার সহচর ছিলেন। তিনি ফতেহাবাদ সরকাবে বিদ্রোহ দমন করেন। ভূষণাই এই সরকারে প্রধান জমিদারি ছিল। ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে লিখিত বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গলে' দেখিতে পাই, তখন অর্জুন নামক এক রাজা ফতেহাবাদের জমিদার ছিলেন।

'উত্তরে অর্জুন রাজা প্রতাপেতে যম
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বঙ্গরোড়াত্‌ক সীমা'
—দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ১৬৭২

এই অর্জুন রাজার সহিত পরবর্তী জমিদার মুকুন্দরামের কোন রক্ত সম্বন্ধ ছিল কিনা, জানা যায় না। দায়ুদের সহিত মুনেম খাঁর সন্ধি হইলে মোরাদ জলেশ্বরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মুনেমের মৃত্যুর পর যখন দায়ুদ পুনবায় বিদ্রোহী হইয়া ভদ্রকের শাসনকর্তা নজর বাহাদুরকে হত্যা করেন, তখন মোরাদ পুনরায় ফাতেহাবাদ প্রেরিত হন এবং তথায় তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তৎপ্রদেশীয় জমিদার ভূষণাধিপতি মুকুন্দরাম মোরাদের পুত্রগণকে অন্যায়রূপে হত্যা করিয়া সমগ্র ফাতেহাবাদের রাজা হন। টোডরমল তাহাকেই ভূষণার জমিদার বলিয়া স্বীকার করেন (১৫৮২)। মুকুন্দরাম মধ্যে মধ্যে নামে মাত্র সামান্য পেশকস পাঠাইয়া বাদশাহের অধীনতার ভাণ করিতেন। কিন্তু কার্যত তিনি স্বাধীনই ছিলেন। আকবরের রাজত্বের অবশিষ্টকাল তিনি অন্যান্য ভুঁইয়াগণেব সহিত নানা সূত্রে যোগদান করিয়া দেশব্যাপী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিলেন। প্রতাপাদিত্য বা কেদার রায়ের রাজত্ব উৎসন্ন হইলেও মুকুন্দরাম দমিত হন নাই। জাহাঙ্গীরের সময়ে ইসলাম খাঁ (১৬০৮) বঙ্গের শাসনকর্তা হইয়া

আসিলে, তিনি মুকুন্দরামের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং তাহার অধীন একদল সৈন্য পাঠাইয়া কোচহাজো (কামরূপ) অধিকার করিয়া আসেন। তখন মুকুন্দরাম পাণ্ডু ও গৌহাটির থানাদার নিযুক্ত হন। পরে তিনি সে পদে স্বীয় পুত্র সত্রাজিৎকে রাখিয়া স্বয়ং ভূষণায় আসেন। এবং প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া পেশকস বন্ধ করেন। কথিত হয়, এই সময়ে তিনি বঙ্গের শাসনকর্তা সৈয়দ খাঁ কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। জাহাঙ্গীরের শাসনকালে যখন ইসলাম খাঁ বঙ্গের সুবেদার হইয়া আসেন, তখন সত্রাজিৎ ঢাকায় আসিয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করেন। অধ্যাপক যদুনাথ সরকাব কর্তৃক আবিষ্কৃত আবদুল লতিফেব ভ্রমণ-কাহিনী বিষয়ক ফার্সি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি, ইসলাম খাঁর ঢাকা যাইবার পথে ভূষণার রাজা সত্রাজিৎ বা শাহজাদা রায় কয়েকটি হাতি উপহার দিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। (প্রবাসী ১৩২৬ ১ম খণ্ড, ৫৫২ পৃঃ)। নবাব পুনরায় কোচহাজো অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করেন, তাহার সহিত সত্রাজিৎ ছিলেন। কিন্তু কার্যত সত্রাজিৎ কোচহাজোর রাজভ্রাতা বলদেবের সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিয়া মোঘলের গতিবিধি সমস্ত বিজ্ঞাপিত কবেন। তখন সত্রাজিৎ বন্দি হইয়া ঢাকায় আনীত হইয়া নিহত হন (১৬৩৬)।"

যশোহব খুলনাব ইতিহাস। পৃঃ ৫৪২-৫৪৩

অন্যতম বারো ভুঁইয়া চাঁদরায় কেদার রায়ের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল ঢাকার রাজবাড়ি থেকে ফরিদপুরের কেদারবাড়ি পর্যন্ত। ফরিদপুরের পালঙ থানায় তাদের নির্মিত সড়ক আজও কাচকিগুড়া রোড নামে পরিচিত। সীতারাম রায় নামে একজন ভুঁইয়ার প্রাচীন দুর্গের অবশেষ আজও ভুষণার কিল্লাবাড়িতে বর্তমান। এই সীতারাম রায়কে মোঘল সেনারা ফতেপুরের যুদ্ধে পরাস্ত করেছিল।

বারো ভুঁইয়াদের বিনাশের পর বাংলায় অপ্রতিহত মোঘল প্রশাসন বিস্তৃত হয়। তার মধ্যে অবশ্যই ছিল ফরিদপুর। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে মোঘল শাসনের অবসান ঘটে। এবং বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা দখল করে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর কোম্পানির রাজস্ব বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। নতুন ব্যবস্থায় উত্তর-পশ্চিম ফরিদপুর রাজসাহী জমিদারি ভুক্ত এবং বাকি অংশ ঢাকা নিয়াবতের অধীন। ১৭৯৩ সালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সময় পুরোনো গোয়ালন্দ মহকুমা ও গোপালগঞ্জ মহকুমার অংশ যশোহরের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ফরিদপুরের বাকি অংশ ঢাকা-জালালপুর জেলার অন্তর্গত হয়। ঢাকা, ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ নিয়ে গঠিত এই জেলার সদর ছিল ঢাকায়। এই ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। ১৭৯৭ সালে বাকরগঞ্জ স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হয়। এবং ঢাকা জালালপুরের সদর সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ফরিদপুর সদরে। ঢাকা শহর এবং বর্তমান ঢাকা জেলার অংশ বিচ্ছিন্ন হয় ঢাকা-জালালপুর থেকে। নতুন ফরিদপুর জেলার পশ্চিমে যুক্ত করা হয় যশোহর জেলার কিছু অংশ। ১৮১৫ সালে নতুন ফরিদপুর জেলার স্বতন্ত্র রাজস্ব বিভাগ গঠিত হয়। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর নিযুক্ত হয়। ১৮৩৩ সালে স্বাধীন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ সৃষ্টি হয়। ১৮৫৯ সালে পূর্ণ জেলার মর্যাদা পাওয়ার পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর নিযুক্ত হয়। তার আগে ১৮৫০ সাল থেকে কিছু কিছু প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৮৫৩ সালে মানিকগঞ্জ মহকুমা ঢাকার সঙ্গে যুক্ত হয়। গোয়ালন্দ মহকুমা গঠিত হয় ১৮৭১ সালে এবং পাবনা থেকে পাঙশা থানা বিচ্ছিন্ন করে যুক্ত হয় ফরিদপুরের সঙ্গে। মাদারিপুর মহকুমা ১৮৫৪ সালে গঠিত হলে, বাকরগঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফরিদপুরের সঙ্গে যুক্ত করা হয় ১৮৭৩ সালে। ১৮৭৫ সালে ফরিদপুরে স্বতন্ত্র জেলা জজ নিযুক্ত করা হয়েছিল। ফরিদপুর সদর থেকে মকসুদপুর ও মাদারিপুর মহকুমা থেকে গোপালগঞ্জ থানা ও কোটালিপাড়া থানা

নিয়ে গোপালগঞ্জ মহকুমা গঠিত হয় ১৯০৯ সালে।

হান্টারের গ্রন্থে উল্লেখ আছে : "In 1582, during the reign of the Emperor Akbar, the Province of Bengal was formed into thirty-three *sarkar's* or financial subdivisions, and Faridpur appears to have been included with in the *sarkar* of Muhamad Abud. Being near the seaside, it was exposed to the attack and incursions of the Maghs, a race which at that time infested all the sea coast from Arakan as far as the Sundarbans. It was also liable to the invasions of the Assamese, who sailed down the Brahmaputra raviging the country on either bank. During the reign of the Emperor Shah Jahan, these depredatious were carried on to such an extent as to cause a falling off in the imperial reveune. In 1721 a new partition of the country was made, the Province of Bengal being formed into 13 large devisions (*Chaklas*), instead of *sarkars*. In 1765 the financial administration of Faridpur, together with the rest of Bengal, was ceded to the English, and in 1790 they assumed the actual criminal administiation of the country and the collectors were invested with magisterial powers. In 1793 the Collectors were relived of their magisterial duties, and separate officers were appointed, uniting in one person the functions of judge and magistrate. The greater portion of the present District was then comprised within the tract of country known as Dacca Jalalpur, the headquarters of which was at Dacca city. The magistracy of Dacca Jalalpur included not only a large portion of what is now Faridpur, but also the police sections of Jafarganj and Nawabganj to the east of the Padma river. It did not however, comprise the city of Dacca, which formed a separate magistracy. A portion of the existing district of Faridpur not included in Dacca Jalalpur, namely, the present police section of Bhushna with part of Maksudpur was included in Jassor, while Gopinathpur Fiscal Division was included in Bakarganj. In 1811 it was deemed expedient to separate Dacca Jalalpur from the Dacca Collectorate. Courts were built at the town of Faridpur and about the same time the trct east of the river Chandana was transferred from Jessore to Dacca Jalalpur. The jurisdiction on the east of the Padma was given up and transferred to Dacca, the Fiscal Division of Gopinathpur being annexed to Faridpur from Bakarganj. The formation of Faridpur district, as now coustitued, was not the work of any single year. But its separate existence dates from the erection of the Courts in 1811.

Statistical Account of Faridpur District - vol V. P. 256-57.

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরিদপুর জেলা নানান উল্লেখযোগ্য ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তার অন্যতম হল নীলবিদ্রোহ এবং ফরাজি আন্দোলন। বাংলার অন্যান্য জেলার মতই ফরিদপুরের কৃষিজীবীদের জীবনে নীলচাষ বিপর্যয় ডেকে আনে। নীলকরদের দাদন গ্রহণ করতে করতে চাষীদের সেই ঋণজাল থেকে মুক্তির কোন পথ ছিল না। মুনাফাহীন এই কৃষি উদ্যোগে তাদের অনীহা ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। ১৮৬০ সালে তারা নীল চাষ বন্ধ

করে দেয়। এবং ১৮৭৫ সালের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় প্রায় সমস্ত নীলকুঠি। একমাত্র নাকান্দার নীলকুঠি আরও কিছুদিন সক্রিয় ছিল। বলা যেতে পারে নীলচাষ ফরিদপুরের জনজীবনের চূড়ান্ত সর্বনাশ করেছিল। যা সনাতন জীবনধারার পক্ষে ছিল অভিশাপ। নীলবিদ্রোহ ও ফরাজি আন্দোলন নীলকরদের আগ্রাসী মনোভাবকে অনেকটাই স্তিমিত করে দেয়। নীল কমিশন রিপোর্ট প্রকাশের পর নীলচাষ বন্ধ হয়ে যায়।

"Indigo manufacture was formerly carried on in Faridpur to a considerable extent, but, with one exception, all the European factories have now been closed. The cultivation still carried only the natives is so insignificant in quantity, that it can hardly be called a manufacture of the district, end no discription of the process is needed here." (Statistical Account of Bengal, vol. v. p-338)

ফরাজি বিদ্রোহ ঃ

ফরিদপুরের ইতিহাসে ফরাজি বিদ্রোহ (১৮৩৮-৪৭) একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই ধর্মীয় আন্দোলন শেষ পর্যন্ত জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সমবেত করেছিল। হাজি শরিয়তুল্লা ছিলেন এই বিশেষ ধর্মমত ও আন্দোলনের নেতা। ফরিদপুর জেলার বন্দরখোলা পরগণার এক দরিদ্র মুসলমান জোলা বা তাঁতির ঘরে তাব জন্ম। তিনি মক্কা যান ও ওয়াহাবি মতে দীক্ষা নিয়ে ১৮২০ খ্রিঃ দেশে ফিরে আসেন। কিংবদন্তী ফরিদপুর ফেরার সময় তিনি একদল ডাকাতের হাতে পড়েন, তাদের দলে মিশে যান। শরিয়তুল্লার ধর্মোপদেশে ডাকাতদলের মানসিক পরিবর্তন ঘটে। শরিয়তুল্লা শিষ্যদের নিয়ে গ্রামের গরিব কৃষকদের মধ্যে, বিশেষ করে ঢাকা ও ফরিদপুরে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। এই দুই জেলার গরিব মুসলমান কৃষকরা তার মতবাদ গ্রহণ করতে থাকে। এবং ক্রমশ রক্ষণশীল ধনী মুসলমান নেতা ও জমিদারদের বিরুদ্ধে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়। যে কারণে, ওই দুই ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ের শত্রুতে পরিণত হন শরিয়তুল্লা।

শরিয়তুল্লা দরিদ্র মুসলিম জনগণকে সচেতন করে তুললেও নিজের কাজ সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। তিনি মারা যাওয়ার পর সেই দায়িত্ব সম্পূর্ণ করার কাজে এগিয়ে আসেন তার পুত্র মহম্মদ মহসীন। তিনি সর্বসাধারণের মধ্যে দুদুমিঞা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনিও মক্কা যান। দেশে ফিরে এসে ধর্মমত প্রচার শুরু করেন। ধীরে ধীরে উৎপীড়িত কৃষক সমাজকে জমিদারি শোষণ ও বিদেশি ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলেন। দুদুমিঞা ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু। কেবল গরিব মুসলমান কৃষক নয়, হিন্দু গরিব কৃষকরাও দুদুমিঞার আহ্বানে এগিয়ে আসে।

দুদুমিঞার সঙ্গে ধনী জমিদার ও স্বার্থান্বেষীদের লড়াই শুরু হয়ে যায়। স্বতন্ত্র বিচারালয় স্থাপিত হয়। জমিদার ও নীলকরদের খাজনা দেওয়া বন্ধ এবং নানাবিধ স্বাধীন কাজকর্ম চলতে থাকে। ফরাজিদের বিরুদ্ধে স্থানীয় জমিদার, নীলকর ও সরকার একত্রিত হয়ে এগিয়ে আসে। জমিদার ও নীলকরদের লাঠিয়াল বাহিনী কৃষকদের ঘরবাড়ি লুঠ ও আগুন ধরিয়ে ধ্বংস করতে থাকে। তারা কিন্তু পড়ে পড়ে মার খায়নি। দুদুমিঞার লাঠিয়াল বাহিনী প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। সরকার এই কৃষক অভ্যুত্থান দমনে বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করেছিল। দাঙ্গা প্রবল আকার নেয়। অবশেষে ঢাকা থেকে আসে বিশেষ পুলিশ বাহিনী। দুদুমিঞাকে ১৮৩৮ সালে গ্রেপ্তার করা হলেও, প্রমাণাভাবে তাকে ছেড়ে দিতে হয়। অনুরূপ ঘটনা আবার ঘটে ১৮৪৪ সালে।

এই সময়ে দুদুমিঞার স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার প্রয়াস তীব্র আকার

নেয়। তার প্রবলতম শত্রু ও অত্যাচারী ডানলপের নীলকুঠি একদিন পাঁচশত কৃষক ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়।

এবার এগিয়ে আসে সেনাবাহিনী। দুদুমিঞা এবং তার ৬২ জন অনুগামীকে গ্রেপ্তারের পর ১৮৪৭ সালে ফরিদপুরে দায়রা আদালতে উপস্থিত করা হয়। বিচার চলে দীর্ঘদিন। অবশেষে সকলেরই বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হলেও, উচ্চ আদালতে আপীল করায় তারা মুক্তি পায়।

পুলিশ, সেনাবাহিনী ও জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর অত্যাচার ক্রমশ তীব্র আকার নিলেও, ফরাজি আন্দোলনের গতিবেগ এতটুকুও স্তিমিত হয় না। ১৮৫৭ সালে আবার দুদুমিঞা আবার গ্রেপ্তার হলেন। দীর্ঘদিন কাবাবাসে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। ১৮৬০ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর দুদুমিঞার মৃত্যু হয় জন্মস্থান বাহাদুরপুর গ্রামে। সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল।

এরপর ফরাজি ধর্মমত প্রচারিত থাকলেও, রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প রূপায়ণের আর কোন যোগ্য সেনাপতি ছিল না।

সুপ্রকাশ রায় ফরিদপুরের ফরাজি বিদ্রোহ (১৮৩৮-৪৭) সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"ফরাজিগণ ফরিদপুরের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। ওয়াহাবীদের ধর্মমতের সহিত ইহাদের ধর্মমতের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকিলেও আবার যথেষ্ট পার্থক্যও ছিল। ফরাজিরা 'ওয়াহাবী' নামটিরও বিরোধিতা করিত। 'ফরাজি' কথাটির অর্থ 'ফরাজ' অর্থাৎ আল্লার আদেশ অনুসরণকারী ফরিদপুরের শরিয়তুল্লা এবং তাহার পুত্র মহম্মদ মহসীন বা দুদুমিঞা ছিলেন এই ধর্মমতের প্রবর্তক। তাহারা প্রচলিত মুসলমান ধর্মের মৌলিক সংস্কার সাধন করিয়া 'ফরাজি মতবাদ' নামে ইহা মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। তাহাদের এই ধর্মমত অল্পকালের মধ্যে ঢাকা ফরিদপুর অঞ্চলের দরিদ্র মুসলমান জনসাধারণের ধর্মীয় আদর্শে পরিণত হয়। ধর্মীয় মত ও ধর্মাচরণের সরলতাই তাহাদের এই সাফল্যের কারণ।...

ফরাজি মতের প্রবর্তক শরিয়তুল্লা মুসলমান ধর্মের যে সংস্কার সাধন করেন তাহা মূলত প্রচলিত মুসলমান ধর্মের বিরোধী। এই সংস্কার-কার্যে তিনি মোল্লা-মৌলভিদের দ্বারা উৎপীড়িত মুসলমান জনসাধারণের অর্থাৎ মুসলমান কৃষক-কারিগরদের স্বার্থই সর্বাগ্রে স্থান দিয়াছিলেন এবং এই সকল ধর্মীয় উৎপীড়িকদের কবল হইতে উৎপীড়িত মুসলমান কৃষক ও শ্রমজীবীদিগকে রক্ষার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

প্রচলিত মুসলমান ধর্মে 'পীর' ও 'মুরিদ' শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হয়। 'পীর' শব্দে বুঝায় 'প্রভু' আর 'মুরিদ' শব্দে বুঝায় 'অনুগত শিষ্য'। উৎপীড়ক প্রভুর নিকট উৎপীড়িত কৃষক ও শ্রমজীবী মুসলমানগণ অনুগত থাকিতে পারে না এবং 'পীর' ও 'মুরিদ' শব্দ দুইটি প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক প্রকাশ করে বলিয়া শরিয়তুল্লা এই শব্দ দুইটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এই শব্দ দুইটির পরিবর্তে তিনি তাহার শিষ্যদিগকে 'ওস্তাদ' (শিক্ষক) ও 'সাগরেদ' (শিক্ষার্থী বা ছাত্র) শব্দ দুইটি ব্যবহার করিবার নির্দেশ দেন। ইহা ব্যতীত আরও বহু উৎপীড়নমূলক ধর্মীয় নিয়ম রদ করিয়া তিনি তাহার শিষ্যদিগকে মোল্লা-মৌলভিদের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। তাহার শিষ্যদিগকে মোল্লা-মৌলভিদের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। তাহার এই সংস্কার-কার্যের ফলে মুসলমান ধর্ম মুসলমান কৃষক ও শ্রমজীবী জনসাধারণের ধর্মে পরিণত হয় এবং ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার লক্ষ লক্ষ মুসলমান কৃষক তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

শরিয়তুল্লা কেবল ধর্মসংস্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তাহার ধর্ম-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিষ্যদিগকে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য শোষণ-উৎপীড়নের কবল হইতেও মুক্ত

করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। জমিদার ও নীলকরের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য তাহার ধর্মীয় প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই চলিত।

শরিয়তুল্লা তাহার শিষ্যগণকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন এবং বিপদের সময় তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র মুসলমান জনসাধারণের শিক্ষক, বন্ধু ও বিপদ-আপদের সহায়। তাই দরিদ্র মুসলমান জনসাধারণ তাহাকে তাহাদের পিতার আসনে বসাইয়াছিল।...

শরিয়তুল্লার ধর্মসংস্কারে রক্ষণশীল ধনী মুসলমানগণ তাহার উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। ইহা ব্যতীত ফরিদপুর জেলার সকল মুসলমান কৃষক তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার নেতৃত্বে জমিদারি শোষণ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকিলে জমিদারগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন এবং তাহাকে ওই জেলা হইতে বিতাড়িত করিবার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন।

শরিয়তুল্লার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র মহম্মদ পিতার অসমাপ্ত কার্যভার গ্রহণ করেন। মহম্মদ মহ্‌সীন দুদুমিঞা নামেই সর্বাধিক পরিচিত। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে দুদুমিঞার জন্ম হয়। তরুণ বয়সেই তিনি মক্কা গমন করেন এবং দেশে ফিরিয়া আসিয়া পিতার মতবাদের প্রচার ও সংগঠন স্থাপনের কার্যে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেন। শরিয়তুল্লার বৈপ্লবিক ধর্মসংস্কার ও প্রচার-কার্যের ফলে জমিদারগোষ্ঠীর অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নে জর্জরিত পূর্ববঙ্গের কৃষক জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ আরম্ভ হইয়াছিল। কৃষক জনসাধারণ জমিদার ও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামেব জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। দুদুমিঞা দেশে ফিরিয়া আসিয়াই জমিদারি শোষণ ও বিদেশী ইংরেজ-শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার এক পরিকল্পনা রচনা করেন এবং সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। এইভাবে শরিয়তুল্লা কর্তৃক আরব্ধ ধর্মীয় সংগ্রাম দুদুমিঞার নেতৃত্বে বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়।

দুদুমিঞা-পরিচালিত ফরাজিরা যে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ সাধন এবং স্বাধীন ভারতে বা স্বাধীন বঙ্গে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপনের জন্যই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা সরকারি বিববণ হইতেও জানিতে পারা যায়।

মুসলমান কৃষক, কারিগর প্রভৃতি জনসাধারণের প্রতি দুদুমিঞার গভীর দরদ এবং সকল প্রকার শোষণ হইতে তাহাদের মুক্তির বাণী প্রচারের জন্য অল্পকালের মধ্যে দুদুমিঞা পিতার মতই দরিদ্রের শিক্ষক, বন্ধু ও পিতার আসন লাভ করেন।

দুদুমিঞা ফরিদপুর জেলার পল্লী অঞ্চলের সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন যে, সকল মানুষই সমান এবং আল্লার সৃষ্ট এই পৃথিবীতে কর ধার্য করিবার অধিকার কাহারও নাই। দুদুমিঞার এই বাণী মুসলমান কৃষক ও শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া দিল। তাহারা এই বাণীর মধ্যে খুঁজিয়া পাইল শত প্রকারের কর আদায়কারী জমিদার-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, জমিদার-নীলকর-মহাজন-গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষক ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার শত্রু বিদেশী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার অসীম সাহস ও অনমনীয় শক্তি। এই সাহস ও শক্তির বলেই তাহারা দুদুমিঞার নেতৃত্বে জমিদার-গোষ্ঠী আর ইংরাজ শাসনকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

দুদুমিঞা তাহার পরিকল্পিত স্বাধীন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসাবে এক অপূর্ব সংগঠন স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণব মতাবলম্বীদের অনুকরণে সমগ্র পূর্ববঙ্গ কতিপয় অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অঞ্চলে তাহার প্রতিনিধি হিসাবে একজন 'খলিফা' নিযুক্ত করেন। এই 'খলিফা'গণ নিজ নিজ অঞ্চলের সকল ফরাজি মতাবলম্বীদিগকে একতাবদ্ধ করিয়া রাখিতেন,

তাহাদের ওপর যাহাতে কোন উৎপীড়ন না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতেন এবং তাহাদের নিকট হইতে নিয়মিতভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতেন। এই 'খলিফা' বা প্রতিনিধিগণ দুদুমিঞাকে নিয়মিতভাবে নিজ নিজ অঞ্চলের সকল সংবাদ জ্ঞাপন করিতেন। যে স্থানেই জমিদারগণ ফরাজি সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকদিগের উপর কর বসাইতেন অথবা কোন উৎপীড়ন করিতেন, সেই স্থানেই কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে অর্থ সাহায্য করিয়া-ইংরেজের আদালতে জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা চালান হইত এবং সম্ভব হইলে লাঠিয়াল-দল পাঠাইয়া সেই জমিদার ও তাহাদের অনুচরদিগকে শাস্তি দেওয়া হইত এবং জমিদারদিগের সম্পত্তি ধ্বংস করা হইত।

দুদুমিঞার নেতৃত্বে কৃষকদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে দেখিয়া এবং তাহাদিগকে আর পূর্বের মত দমন করিতে না পারিয়া "সকল জমিদার ও সকল নীলকর দুদুমিঞার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইলেন।" দুদুমিঞাকে প্রচলিত মুসলমান ধর্মের সংস্কার সাধন করিতে দেখিয়া রক্ষণশীল মুসলমানগণ পূর্ব হইতেই দুদুমিঞা ও তাহার ফরাজি সংগঠনের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহারাও জমিদার ও নীলকর সাহেবগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া ফরাজিদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। নূতন ফরাজি ধর্মমত ও দুদুমিঞার নেতৃত্বই যে কৃষকদিগের এই প্রকার বিদ্রোহী মনোভাবের কারণ—ইহা বুঝিয়া জমিদারগণ সকলে পরামর্শ করিয়া তাহাদের প্রজাগণকে দুদুমিঞার শিষ্যত্ব গ্রহণে বাধা দান করিতে আরম্ভ করেন।

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগে গ্রামের কৃষক ও কারিগরদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া দুদুমিঞা ও তাহার সহকর্মিগণ জমিদার, নীলকর ও রক্ষণশীল মুসলমান নায়কগণের ঐক্যবদ্ধ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন। শত্রুর লাঠিয়াল-দলের বিরুদ্ধে তাহারাও লাঠিয়াল-দল প্রস্তুত করিলেন।...

জমিদার ও নীলকরগণকে যাহাতে কর না দিতে হয় তাহার জন্য তিনি কৃষকগণকে জমিদারের জমি ত্যাগ করিয়া সরকারি খাস জমিতে গিয়া বসতি স্থাপন করিবার পরামর্শ দান করেন।

ফরিদপুর জেলার কৃষকগণ সমবেতভাবে জমিদার ও নীলকরগণের খাজনা বন্ধ করিয়া দিলে জমিদার ও নীলকরগণ ক্ষিপ্ত হইয়া কৃষকদের ওপর অমানুষিক উৎপীড়ন আরম্ভ করে। তাহাদের লাঠিয়াল-বাহিনী কৃষকদের ঘরবাড়ি ভস্মীভূত ও সকল সম্পদ লুণ্ঠন করিতে থাকে। লাঠিয়ালদের লাঠির আঘাতে বহু কৃষক হতাহত হয়।

এই অমানুষিক উৎপীড়ন হইতে কৃষকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দুদুমিঞার নির্দেশে কৃষক লাঠিয়াল-দলও জমিদার নীলকরগণের লাঠিয়াল দলকে উচিত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে। সংখ্যাধিক কৃষক লাঠিয়ালদের আক্রমণে বহু নীলকুঠি ও জমিদারদের সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিভিন্ন স্থানে দুইদল লাঠিয়ালের প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটিতে থাকে। এই সকল সংঘর্ষে বিভিন্ন জমিদার-নীলকরগোষ্ঠীর বহু লাঠিয়াল হতাহত হয়। জমিদার নীলকরগোষ্ঠীর এই দুর্দশা দেখিয়া ইংরেজ সরকার আর নীরব দর্শক হইয়া থাকিতে পারিলেন না। সরকার প্রকাশ্যে এই কৃষক-অভ্যুত্থান দমনের সংকল্প ঘোষণা করেন এবং বহু সংখ্যক পুলিশ জমিদার-নীলকরগণের লাঠিয়াল-বাহিনীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কৃষকবাহিনীর সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের সংগ্রাম ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। ইংরেজ সরকার কেবলমাত্র পুলিশের উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া সামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করেন।...

এইভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া জমিদার, নীলকর ও ইংরেজ শাসকগণের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দুদুমিঞার নেতৃত্বে কৃষকদের সংগ্রাম চলিতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে উভয় পক্ষে অজস্র ধারায় রক্তপাত ও প্রাণহানি ঘটিতে থাকে। ফরিদপুর জেলাব্যাপী কৃষক বিদ্রোহীদের এই সংগ্রাম দমন করিতে ব্যর্থ হইয়া ইংরেজ সরকার অবশেষে এক নূতন

কৌশলে এই বিদ্রোহ দমনের পরিকল্পনা করেন। বিদ্রোহী কৃষকদের প্রধান নায়ক দুদুমিঞাকে গ্রেপ্তার করিয়া কারগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে বিদ্রোহী কৃষকগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে—ইহা ভাবিয়া ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে বহু গৃহ লুণ্ঠনের অভিযোগে দুদুমিঞাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সরকার কোন অভিযোগ সপ্রমাণ করিতে না পারায় দুদুমিঞা মুক্তিলাভ করেন। পুনরায় তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু কোন অভিযোগ প্রমাণ করিতে না পারায় সরকার এবারও তাহাকে মুক্তিদান করিতে বাধ্য হন।

ইতিমধ্যে দুদুমিঞার স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার কার্য বহুদূর অগ্রসর হয়। দুদুমিঞা বাহাদুরপুর নামক গ্রামে বাস করিতেন। এই গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া তাহার শাসনব্যবস্থা বহুদূর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনি সর্বত্র নির্দেশ পাঠাইয়া জমিদার ও নীলকরগণকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন। মহাজনগণের ঋণশোধ করাও নিষিদ্ধ করা হয়। গ্রামে গ্রামে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের লইয়া আদালত স্থাপন করা হয়। জনসাধারণ সরকারি আদালত বর্জন করিয়া দুদুমিঞা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গ্রামের আদালতে আপন আপন অভিযোগ পেশ করিত। আদালতের বৃদ্ধ বিচারকগণ যে রায় দান করিতেন তাহা সকলে মানিয়া লইত।...

এদিকে জমিদার ও নীলকরদের সহিত দুদুমিঞার সংগ্রাম সমানভাবে চলিয়া আসিতেছিল। জমিদার ও নীলকরদের উৎপীড়ন হইতে কৃষকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দুদুমিঞা যথাশক্তি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুরের পাঁচচর নামক স্থানের নীলকুঠির কুখ্যাত ম্যানেজার ডানলপ সাহেবের উৎপীড়ন চরম আকার ধারণ করিলে দুদুমিঞা তাহাকে উচিত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন।...

১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর প্রায় পাঁচশত সশস্ত্র কৃষকের এক বাহিনী পাঁচচরের নীলকুঠি আক্রমণ করিয়া ইহা ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। ইহার পর এই কৃষক বাহিনী নীলকর ডানলপের সহযোগী পার্শ্ববর্তী গ্রামের জমিদারের বাড়ি আক্রমণ করিয়া বহু টাকা মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট করে। জমিদারের এক ব্রাহ্মণ গোমস্তা ছিল জমিদারের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ। কৃষকবাহিনী তাহাকে শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে ধরিয়া লইয়া যায়। এই গোমস্তাটি বিদ্রোহী কৃষকের ক্রোধের আগুনে জীবন বলি দিয়া তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে।

এই ঘটনার পর এক বিশাল সামরিক বাহিনী আসিয়া সমগ্র অঞ্চলটিকে বেষ্টন করে। ইহার পর ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার, খানাতল্লাস, প্রহার এবং কৃষকদের উপর নানাপ্রকারের শারীরিক লাঞ্ছনা কয়েক মাস ধরিয়া চলিতে থাকে। দুদুমিঞাকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে আবদ্ধ রাখা হয়। অবশেষে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ফরিদপুরে দায়রা আদালতে দুদুমিঞা ও তাহার বায়ট্টিজন সহকর্মীর বিচার আরম্ভ হয়। দুদুমিঞাও আদালতে কতিপয় জমিদার ও নীলকর ডানলপের বিরুদ্ধে কৃষক হত্যা, কৃষকের সম্পত্তি লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি বহু অভিযোগ উপস্থিত করেন। বলাবাহুল্য, ইংরেজ বিচারকগণ সেই সকল অভিযোগ অগ্রাহ্য করেন। দীর্ঘকাল বিচারের পর অবশেষে দুদুমিঞা ও তাহার সকল সহকর্মীর বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডাদেশ হয়। কিন্তু উচ্চতর আদালতে আপীলের ফলে সকলেই মুক্তি লাভ করেন।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহের সময় দুদুমিঞাকে শেষবারের মত গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু এবারেও দুদুমিঞাকে সরকার প্রমাণাভাবে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। সমগ্র জীবনব্যাপী সংগ্রাম ও দীর্ঘ কারাবাসের ফলে দুদুমিঞার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে। অবশেষে নানা প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর পূর্ব বাংলার কৃষকের প্রিয়তম সন্তান, শোষণ-উৎপীড়ন-বিরোধী কৃষক-সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক দুদুমিঞা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাহার জন্মস্থান বাহাদুরপুর গ্রামেই তাহার মৃত্যু হয় এবং বাহাদুরপুর

গ্রামেই তাহাকে কবরস্থ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে তাহার কবর ও বসতবাড়ি আরিয়লখাঁ নদের ভাঙনে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।...

পূর্ববঙ্গের ফরাজি আন্দোলন এবং পশ্চিম-ভারত ও দক্ষিণ-বঙ্গের ওয়াহাবী আন্দোলনের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্য থাকিলেও উভয়েই উদ্দেশ্য ছিল মৌলিক সংস্কারের মারফত মুসলমান ধর্ম হইতে সকল প্রকার কুসংস্কার দূর করিয়া ইহাকে জনসাধারণের ধর্মে পরিণত করা, জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধন ও স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরিচালিত হইয়া ওয়াহাবী আন্দোলনেই মতই ফরাজি আন্দোলনও শোষণ-উৎপীড়নের ফলে হতাশাচ্ছন্ন জনসাধারণকে নূতন আশায় সঞ্জীবিত করিয়া তাহাদের মধ্যে নূতন জীবনের সঞ্চার করিতে এবং তাহাদিগকে কঠোর সংগ্রামের মধ্যে টানিয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিল।

শিল্প বিকাশের পূর্ববর্তী সময়ের, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য বৃহৎ গণসংগ্রামের মত ফরাজি বিদ্রোহও ধর্মীয় সমস্যা লইয়া আরম্ভ হইলেও শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল। কৃষক জনসাধারণের জাগরণ ধর্মের ভিত্তিতে আরম্ভ হইলেও জমিদার-নীলকর-মহাজন-কৃষক শোষণের ও ইংরেজ শাসনের এই তিনটি প্রধান স্তম্ভের উপর আঘাত করিয়া কৃষক জনসাধারণ তাহাদের সেই ধর্মীয় জাগরণকে রাজনৈতিক স্তরে উন্নীত করিয়াছিল।

ফরাজি আন্দোলন প্রথমে মুসলমান ধর্মের সংস্কার-আন্দোলন রূপে আরম্ভ হইলেও ইহা কেবল মুসলমান জনসাধারণকেই সঙ্ঘবদ্ধ ও সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে নাই, এই আন্দোলনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্থানীয় হিন্দু কৃষকদের একটি বৃহৎ অংশকেও সংগ্রামে টানিয়া আনিতে পারিয়াছিল এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের আংশিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

আন্দোলনের প্রধান নায়ক দুদুমিঞার নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে "স্বাধীন সরকার" গঠন, কৃষক স্বেচ্ছাসেবকগণকে লইয়া স্বাধীন সরকারের "সৈন্যবাহিনী" গঠন, স্বাধীন "বিচারালয়" স্থাপন এবং বিস্তৃত অঞ্চলে জনসাধারণের নিকট হইতে "কর" আদায় প্রভৃতি কার্য ফরাজি আন্দোলনকে জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা-সংগ্রামের পূর্ণ বৈপ্লবিক রূপ দান করিয়াছিল।

অবশ্য ফরাজি আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণও এই আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিল। প্রথমত, ওয়াহাবী আন্দোলনের ন্যায় ফরাজি আন্দোলনও সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান কৃষক জনসাধারণের পূর্ণ ঐক্য গড়িয়া তুলিতে ব্যর্থ হইয়াছিল। এই ঐক্যের অভাবেই দুদুমিঞার স্বাধীন সরকারও প্রথম হইতেই দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের অস্পষ্ট রাজনৈতিক চেতনা, সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণাবশত সংগ্রাম আরও উন্নত স্তরে আরোহণ করিতে পারে নাই। তৃতীয়ত, সংগ্রামের মধ্য দিয়া দুদুমিঞা ব্যতীত অপর কোন যোগ্য নায়কের আবির্ভাব ঘটে নাই। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ও পূর্ণ চেতনাযুক্ত কোন দলীয় সংগঠন সে যুগে ছিল অসম্ভব। তাই দুদুমিঞার একক নেতৃত্বে পরিচালিত এই গণ-সংগ্রাম দুদুমিঞার দীর্ঘ কারাবাসের ফলে বার বার নেতৃত্বহীন হইয়া পড়িয়াছিল। এই নেতৃত্বহীন অবস্থার সুযোগ লইয়াই ইংরেজ শাসকগণ, সৈন্য-বাহিনী, পুলিশ-বাহিনী, জমিদার ও নীলকরগণের তীব্র আক্রমণে শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ পরাজিত হয়।

এই সকল দুর্বলতাবশত ফরাজি বিদ্রোহ দীর্ঘ দশ বৎসর চলিবার পর ব্যর্থ হইয়া গেলেও এই দীর্ঘকালব্যাপী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা এবং স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের যে আদর্শ ইহা রাখিয়া গিয়াছে তাহা আজিও ভারতের কৃষক জনসাধারণকে সংগ্রামের প্রেরণা দান করে।"

উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে ফরিদপুরের মুসলিম সমাজে সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভির একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে। তার প্রেরিত প্রতিনিধিরা হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণির মুসলিম জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব ফরিদপুরের ওপর পড়েনি। কিন্তু ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন জেলার জনগণকে সুস্পষ্টভাবে দ্বিধাবিভক্ত করেছিল। ভাইসরয় কার্জনের শাসনকালে (১৮৯৯—১৯০৫ খ্রিঃ) পূর্ববঙ্গ-আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। এই নতুন প্রদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এতকাল যারা অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের অন্তরালে নিমজ্জিত ছিল, এবার শিক্ষা, চাকরি ও ব্যবসাবাণিজ্য তাদের বৃহত্তর সম্ভাবনার আলোক দেখা দেয়। বাংলার মুসলমান নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেও, হিন্দুরা প্রবল বিরোধিতার সৃষ্টি করে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী এবং স্বদেশি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে অবিভাজ্য ও এক জাতি প্রমাণ করতে উদ্যোগী হয় হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ। নবগঠিত প্রদেশের গভর্নর স্যার বেনফিল্ড ফুলার এই আন্দোলন দমনে সর্বাত্মক প্রয়াস নিলেও, আন্দোলন ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। এই আন্দোলন থেকে জন্ম নেয় স্বরাজের দাবি। যা ফরিদপুর জেলাবাসীদের, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) শেষ হওয়ার পর জেলায় বৈপ্লবিক আন্দোলন সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক রূপ নেয়। সর্বভারতীয় মুসলিম লিগ এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সব মতপার্থক্য ভুলে কিছুকাল ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করলেও, যুদ্ধ শেষে তুরস্ক সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্নকরণের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মিত্রপক্ষ, তার ফলে উপমহাদেশের মুসলমান সম্প্রদায় ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ১৯২০ সালে মৌলানা সৌকত আলি এবং মৌলানা মুহম্মদ আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে শুরু হয় খিলাফৎ আন্দোলন। গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে মুসলিম লিগ ও জাতীয় কংগ্রেস এই আন্দোলনের সমর্থন জানায়। ফরিদপুর জেলার হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ সর্বশক্তি নিয়ে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। এই সময়ে ফরিদপুরের সংগ্রামী জনগণের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন মৌলভি তামিজউদ্দিন খাঁ এবং অম্বিকাচরণ মজুমদার। বাহাদুরপুরের মৌলভি তামিজউদ্দিন খাঁ ছিলেন খিলাফৎ কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ফরিদপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। এমনকী আইন ব্যবসা ছেড়ে, তিনি জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯২১ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুক্তি পান। ১৯২৬ সালে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লিগে যোগ দেন। অম্বিকাচরণও ফরিদপুরের একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন।

আর একজন জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। তামিজউদ্দিন খাঁ পরবর্তীকালে সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের অন্যতম নেতা হন। দেশভাগের আগে তিনি ছিলেন ফজলুল হক মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য।

দেশ ভাগের (১৯৪৭ খ্রিঃ) সময় থেকে জেলায় উল্লেখযোগ্য কোন প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটেনি। তারপর ফরিদপুর সদর মহকুমার সঙ্গে যুক্ত হয় মধুমতীর পূর্ব তীরের যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার আলফাডাঙা থানা এবং মাগুরা মহকুমার মুহম্মদপুর থানার বানা, পাণ্ডুরিয়া, গুনবাহা ও ময়না ইউনিয়ন।

পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনে ফরিদপুর জেলার মানুষও এগিয়ে এসেছিল। তারা আশা করেছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মত তারা সমমর্যাদা ও অধিকার লাভ করবে। কিন্তু চব্বিশ বছর বৃহত্তর পাকিস্তানের (১৯৪৭—১৯৭১ খ্রিঃ) অঙ্গ থেকে সমগ্র পূর্ব পাকিস্থানের মানুষ (বর্তমান বাংলাদেশ) উপলব্ধি করে, তারা যেন একটি উপনিবেশের অধিবাসী। চব্বিশ

বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষ তাদের অধিকার ও ন্যায্য মানবিক সুযোগ সুবিধা অর্জনের লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামের শেখ মুজিবর রহমান এগিয়ে এসে তাদের সংগ্রামকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। এই অনন্য ও অসাধারণ মানুষটিকে আমরা দেশভাগ পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখতে পাই। সে সময়ে হোসেন শাহিদ সওরাবার্দির নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামি লিগের অন্যতম নেতা হিসাবে মুজিবর রহমান রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি হন আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৫৪ সালে গঠিত যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসাবে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে অবৈধভাবে ক্ষমতাচ্যুত করার পর মুজিবর অন্তরীণ হন। এর আগে ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনে যোগদানের জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আবার তিনি ১৯৫৪ সালে অন্তরীণ হন সরকারি নির্দেশের কারণে। ১৯৫৮ সালে ইস্কান্দার মির্জার সহযোগিতায় জেনারেল আয়ুব খান ক্ষমতা দখল করলে মুজিবরকে তিন বছর অন্তরীণ থাকতে হয়েছিল। কিন্তু সমগ্র পূর্ব পাকিস্থানে (বর্তমান বাংলাদেশ) তখন শেখ মুজিবর রহমান অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। ১৯৬৬ সালে তিনি আওয়ামি লিগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ছয় দফার ভিত্তিতে তিনি পূর্ববাংলার জন্য সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবি জানান। সমগ্র দেশের মানুষের কাছে এই ছয় দফার দাবি এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে আনে। ব্যাপক জনজাগরণে আতঙ্কিত জেনারেল আইয়ুব খান মুজিবকে গ্রেপ্তার করেন। মুজিব যখন জেলে তখন, ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি তাঁকে মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। দীর্ঘ তের মাস তাঁকে নির্জন কারাবাসে আটক রাখা হলেও, ব্যাপক গণঅসন্তোষ ও বিক্ষোভের কারণে সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। মিথ্যা মামলাও প্রত্যাহার করা হয়। শেখ মুজিবরের মুক্তির সংগ্রামে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯৬৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্সে (বর্তমান সওবার্দি উদ্যান) আয়োজিত মহতীসভায় শেখ মুজিবর রহমানকে "বঙ্গবন্ধু" হিসাবে ঘোষণা করা হয়। দেশভাগের পর অন্য কোন বাঙালি নেতা (পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ) এমন অবিতর্কিত জাতীয় নেতার সম্মান লাভ করতে পারেননি।

পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে তখন আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে জেনারেল আয়ুব খানকে সরিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন। এই একনায়ক প্রেসিডেন্ট গণসংগ্রামের চাপে পূর্বতন পাকিস্তানে ১৯৭০-৭১ সালের ডিসেম্বর-জানুয়ারি প্রথম সাধারণ নির্বাচনের আয়োজনে বাধ্য হন। কিন্তু শাসক গোষ্ঠীর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল না। জাতীয় সংসদের ৩১৩টি আসনের ১৬৭টি দখল করে আওয়ামি লিগ। বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তানে) তখন মোট আসন সংখ্যা ছিল ১৬৯। দেখা গেল জাতীয় সংসদে আওয়ামি লিগ সংখ্যাগরিষ্ঠ।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে গোপন ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়। গোটা পূর্ববঙ্গ জুড়ে সামরিক তৎপরতা ব্যাপক আকার নেয়। এদিকে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ নতুন জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসার কথা। কিন্তু ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

সরকারি এই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবরের আহ্বানে সারা পূর্ববাংলা জুড়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায় ২ মার্চ থেকে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক জনসমাবেশে শেখ মুজিবর স্বাধীনতার দাবি পেশ করলেন জনগণের সামনে। জনগণ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পথে এগিয়ে গেল। গোটা পূর্বপাকিস্তানে জ্বলে উঠল অশান্তির আগুন। কিন্তু ২৫ মার্চ গভীর রাতে গোটা দেশ জুড়ে শুরু হয়ে গেল এক পৈশাচিক সামরিক নির্যাতন।

ব্যারাক ছেড়ে বেরিয়ে এল পাকিস্তানি সেনা দল। নিরস্ত্র ছাত্র ও সাধারণ নাগরিকদের ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত। সেই রাতেই মুজিবরকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় বিচারের জন্য। এদিকে গোটা পূর্ব পাকিস্তানে নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ এবং বিশিষ্ট জননেতা ও বুদ্ধিজীবী হত্যার অভিযান চলতে থাকে। কিন্তু বাংলার মানুষ ভয় পেল না। গড়ে উঠল বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সম্মিলনে মুক্তিবাহিনী। গঠিত হল অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার।

দেশের সর্বত্র শুরু হয়ে গেল সর্বাত্মক মুক্তি সংগ্রাম। দখলদার বাহিনীর ব্যারাকের ওপর হামলা ব্যাপক রূপ পেতে থাকে। গেরিলা লড়াইয়ের এই অগ্নিপর্বে ফরিদপুর জেলার মানুষ পিছনে থাকেনি। সেদিন বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে আসে ভারতীয় সেনাবাহিনী। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াইকে শক্তিশালী করে তুলেছিল।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দখলদাব বাহিনী বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশেব এই মুক্তিযুদ্ধে কয়েক লক্ষ মানুষ মারা যায়, কয়েক কোটি মানুষ হয গৃহহারা এবং কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হয়।

ভূষণা ও রাজা সীতারাম রায়

ফরিদপুর জেলা গেজেটিয়ারে (১৯৭৭) উল্লেখ আছে---বিদ্রোহী বাংলা অধিকারের জন্য ১৫৭৪ খ্রিঃ সম্রাট আকবর ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা অধিকারের জন্য পাঠান হয় সেনাপতি মোরাদ খানকে। আকবরনামা থেকে জানা যায়, সেনাপতি সরকার বাকলা (বাকরগঞ্জ) দখল করেন। এব অন্তর্গত ছিল ফতেয়াবাদ (ফরিদপুর)। সেনাপতি ফতেযাবাদে থাকতেন এবং সেখানেই তিনি ছয় বছর বাদে মারা যান। ফরিদপুর শহরের ১৩ মাইল দূরে খানখানপুর নামে একটি গ্রাম ও রেলওয়ে স্টেশন আছে। সম্ভবত সেখানেই তিনি থাকতেন।

আকবরের সময়ে রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি) পূর্ব ভারতে সম্পূর্ণভাবে মোঘল আধিপত্য স্থাপিত হয়নি। স্থানীয় ভূস্বামীদের মধ্যে সংখ্যায় বেশি ছিল মুসলমান। কার্যত তারা ছিল স্বাধীন। আফগান বিদ্রোহীদের কার্যক্রম এবং জলাভূমি ও নদীবাহুল্য ছিল মোঘল বাহিনীর অভিযানের অন্যতম প্রতিবন্ধক। সমকালীন বিদেশি পর্যটক ও ধর্মপ্রচারকদের বিবরণ থেকেও অনুরূপ অভিমত পাওয়া যায়।

রালফ ফীচ ঢাকা জেলার রাজবাড়ির কাছে শ্রীপুর গিয়েছিলেন। সেই শ্রীপুর ভেসে গেছে পদ্মার খরস্রোতে। এখানে ছিল বারোভূঁইয়াদের অন্যতম চাঁদরায় ও কেদার রায়ের রাজধানী। ওদের রাজত্ব ছিল ঢাকার রাজবাড়ি থেকে ফরিদপুরের কেদারবাড়ি পর্যন্ত। এদের দুর্গ বা বসতবাড়ির চিহ্নস্বরূপ সুবিস্তৃত দিঘি দীর্ঘদিন জনগণের কাছে ছিল বিস্ময়ের। ফরিদপুর জেলার পালঙ থানায় কাচকিগুড়া রোডও ওদের স্মৃতিযুক্ত। বারোভূঁইয়াদের অন্যতম ছিলেন ভূষণার মুকুন্দ রায়। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে ফরিদপুর সম্পর্কে আলোচনায় উল্লেখ আছে, ফরিদপুর জেলার ভূষণা থানার কিল্লাবাড়িতে অন্যতম বারোভূঁইয়া সীতারাম রায়ের একটি দুর্গ আছে। ফতেপুরের যুদ্ধে তিনি মোঘলদের কাছে পরাস্ত হন।

ফরিদপুরের ইতিহাসে ভূষণা ছিল একটি বিখ্যাত স্থান। ফতেয়াবাদ সরকারের প্রধান

জমিদারি ছিল ভূষণা। আগে ছিল যশোহর জেলায় ফৌজদারের নিয়ন্ত্রণে। বর্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত। চন্দনা নদীর পাড়ে ভূষণার কাছেই ছিল মুসলমান বসতি বনমালদিয়া ও দক্ষিণবাড়ি। অন্যতম বারোভুঁইয়া মুকুন্দরাম রায়ের সময়ে ভূষণা বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি ছিলেন এখানকার জমিদার। সেনাপতির মুনেম খাঁর (১৫৭৪ খ্রিঃ) সঙ্গী অন্যতম সেনানায়ক মোরাদ খাঁ ফতেয়াবাদে মারা যাওয়ার পর মুকুন্দরাম তার পুত্রদের হত্যা করে ফতেয়াবাদের রাজা হয়ে বসেন। এই মুকুন্দরামকেই রাজা টোডরমল ভূষণার জমিদারের স্বীকৃতি দেন (১৫৮২ খ্রিঃ)। সূচনাপর্ব থেকেই মুকুন্দরাম ছিলেন স্বাধীন। কখনো কখনো বা: শাহের কাছে পেশকস্ পাঠাতেন।

বাংলার ভুঁইয়াদের অন্যতম মুকুন্দরাম মোঘল শাসক ইসলাম খাঁর (১৬০৮) সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। ইসলাম খাঁর কোচবিহার অধিকারে সহযোগিতা করেন মুকুন্দরাম। বিনিময়ে তিনি পাণ্ডু ও গৌহাটির থানাদার নিযুক্ত হন। কিন্তু মুকুন্দরাম সেই দায়িত্ব পুত্র সত্রাজিতের ওপর অর্পণ করে ভূষণায় ফিরে এসে বাদশাহ দরবারে পেশ্‌কস পাঠান বন্ধ করেন। কিন্তু বাংলার শাসনকর্তা সৈয়দ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় (১৬০৬-১৬২৭) সত্রাজিৎ ঢাকায় মোঘল সুবাদার ইসলাম খাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। নবাবকে তিনি কয়েকটি হাতি উপহার দেন। পুনরায় কোচবিহার অভিযানের সময় সত্রাজিৎ কোচহাজার রাজভ্রাতার সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র শুরু করেন। কিন্তু সেই গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। সত্রাজিৎকে বন্দি করে ঢাকা আনার পর তাকে হত্যা করা হয় (১৬৩৬ খ্রিঃ)।

ফরিদপুরের ভূষণা আবার বিখ্যাত হয়ে ওঠে সপ্তদশ শতকে। ভূষণাকেন্দ্রিক সীতারাম রায়ের বিদ্রোহ আর এক অগ্নিময় অধ্যায়ের সূচনা করে। এই সীতারাম রায় (১৬৫৮/১৬৬০-১৭১৪) সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেনের দীর্ঘ আলোচনা এখানে উদ্ধৃত হল ঃ*

"মুর্শিদকুলি খাঁর রাজত্বের প্রধান ঘটনা—সীতারামের অভ্যুদয় ও পতন। সীতারামের পূর্বপুরুষ রামদাস খাঁ গজদানী বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। ইহারা কায়স্থ দাস, কাশ্যপগোত্রীয়। রামদাস খাঁ এত বড় লোক ছিলেন যে তাহার পিতৃশ্রাদ্ধে স্বয়ং রাজা গণেশ ও যদু উপস্থিত হইয়াছিলেন। কান্দী মহকুমার কুলিয়া গ্রামে ইহার বাস ছিল। তথায় ইহার নির্মিত দিঘি ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। অনন্তরাম এই রামদাসের পুত্র। অনন্তরামের দুই পুত্রের মধ্যে সীতারাম ধরাধরের ধারায় জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তরাম হইতে ষষ্ঠস্থানীয় হিমকর দাসের পুত্র শ্রীরামদাস মুসলমান সরকার হইতে "খাঁ বিশ্বাস" উপাধি প্রাপ্ত হন। সীতারাম "খাঁ বিশ্বাস" মহাশয়ের প্রপৌত্র ও উদয়নারায়ণের পুত্র। ইহারা উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। রামদাস গজদানীর পর হইতে ইহাদের অবস্থার কতকটা অবনতি হইয়াছিল। সীতারামের পিতামহ হরিশ্চন্দ্র মোঘল সরকারে কাজ করিয়া "রায় রাঁয়া" উপাধি লাভ করেন, তখন হইতে আবার এই পরিবারের অবস্থার উন্নতি আরম্ভ হয়।

"বারোভুঁইয়ার অন্যতম ভূষণার রাজা মুকুন্দ রায় ও তৎপুত্র সত্রাজিতের মোঘলদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও নিহত হওয়ার কথা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি। সত্রাজিতের মৃত্যুর পর উক্ত পরগণা তথাকার ফৌজদারের হাতে পড়ে। তখন মোঘল সরকারের এক বিশ্বস্ত ক্ষত্রিয় সেনাপতি সংগ্রামসিংহ ভূষণার উপস্বত্ব ভোগ করিয়া রাজানুগ্রহে প্রবল হইয়া উঠেন। ইনি জোর করিয়া পূর্ববঙ্গের বৈদ্য-সমাজে মিশিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহাদের পুত্র-কন্যা ইনি জোর করিয়া গ্রহণ করেন, তাহারা "হাম বৈদ্য" নামক এক পৃথক থাক হইয়া বৈদ্যসমাজে

বৃহৎবঙ্গ—২য় খণ্ড—দীনেশচন্দ্র সেন। পৃঃ ৮৪২-৮৫০

কলঙ্কলাঞ্ছিত হইয়া আছেন।[১] মোঘল সরকারে উদয়নারায়ণের বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছি। তিনি ভূষণার কতকংশ জমা লইয়া তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত হন। সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর তাহার বংশে তেমন কেহ ছিলেন না। এখনও নালিয়া, মথুরাপুরী প্রভৃতি স্থানে সংগ্রামসিংহের অনেক মন্দির দৃষ্ট হয়। এই সময়ে মগ, পাঠান ও পর্তুগিজ দস্যুগণের দ্বারা ভূষণা বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। অনুমান ১৬৫৮-৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে উদয়নারায়ণের ঔরসে দয়াময়ীর গর্ভে সীতারামের জন্ম হয়।

"উদয়নারায়ণ তহসিলদারের কার্য করিতেন, সীতারাম বাল্যকাল হইতে লেখাপড়ায় অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া খেলা শিক্ষা করাই তাহার প্রধান কার্য ছিল। প্রতিভা চাপা থাকে না। তাহার অসাধারণ সাহস ও বিক্রমের কথা শীঘ্রই প্রচারিত হইল। তখন ভূষণা পরগণায় একদিকে মগ দস্যু, অপরদিকে পাঠান বিদ্রোহী সীতারামের নিকট পরাভূত হইয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ প্রীত হইয়া সীতারামকে ভূষণার অন্তর্গত নলদি পরগণা জায়গির দিলেন।

"এই পরগণা খুব বড় ছিল, কিন্তু দস্যুতস্করের অত্যাচারে ইহা একরূপ জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। সীতারাম ইহার শ্রী একেবারে ফিরাইয়া দিলেন। মুকুন্দরায় ও সত্রাজিতের পর ভূষণা প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ পূর্ণ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। সীতারাম দস্যু-তস্করের যমস্বরূপ ছিলেন। সে দেশের এক বড় দস্যু ছিল—তাহার নাম বক্তার খাঁ ; এই দস্যুপতিকে পরাস্ত করিয়া সীতারাম যশস্বী হইলেন। বক্তার খাঁ সীতারামের সাহস ও অমিতবিক্রম দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বীয় দলবল লইয়া সীতারামের সৈন্যশ্রেণিভুক্ত হইলেন। অন্যান্য দস্যুরা সীতারামের ভয়ে দূর দূরান্তরে চলিয়া গেল। নলদি পরগণায় শত শত লোক আসিয়া বাস করিতে লাগিল। সীতারাম বহু দিঘি খনন করাইয়াছিলেন—প্রবাদ এই যে, এই দির্ঘিকা-খনন ব্যাপারের অন্যতম উদ্দেশ্য সৈন্য সংগ্রহ করা। প্রকাশ্যভাবে সৈন্য সংগ্রহ করিলে উহা নবাবের নজরে পড়িতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি দিঘি-খননকারী সহস্র সহস্র লোককে রাত্রে সামরিক শিক্ষা প্রদান করিতেন। একদল লোকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া নতুন দল নিযুক্ত করিতেন। এইভাবে রাজ্যের বহু লোক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শিখিয়াছিল। প্রয়োজন হইলে তাহারা সীতারামের আহ্বানে একত্র হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইত। তাহার পরগণায় মগ, পাঠান ও দস্যুদের অত্যাচার নিবারিত হইয়া শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ সীতারামের বিক্রম ও দস্যু-নিবারিত কথা শুনিয়া বরং প্রীত হইলেন। তিনি আরঙ্গজেবের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধির সনন্দ আনাইয়া তাহাকে দিলেন। অনুমান ১৬৮৭-৮৮ খ্রিঃ অব্দে সীতারাম এই 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন।

"নলদি পরগণা বহুজননিবাসে পরিণত হওয়াতে ইহার আয় খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, তাহা ছাড়া সাঁতৈর পরগণার অনেকটা তিনি তালুক হিসাবে লইয়াছিলেন। তাহার প্রতাপ এখন প্রবাদবাক্যের ন্যায় লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইল। তিনি বিপুল উৎসবে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন। সেকালে এই ব্যাপারে তাহার ২৮,৯৭২ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। সতীশ মিত্র বলেন, "এখনকার দিনে উহা অন্যূন দুই লক্ষ টাকা সমান।" (৫৩৯ পৃঃ)। রাজা উপাধি প্রাপ্তির পর ইনি মহম্মদপুরে রাজধানী স্থাপনপূর্বক যেরূপ ঘটার সহিত অভিষেকোৎসব করিয়াছিলেন, বহুদিন কোন হিন্দু রাজা বাংলায় সেরূপ করেন নাই। লোকে মুখে মুখে গাহিয়া বেড়াইত—"ধন্য রাজা সীতারাম বাংলা বাহাদুর। যার বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেল দূর।। বাঘ মানুষে একুই ঘাটে সুখে জল খায়। রামী-শ্যামী পুঁটলী বাধি গঙ্গাস্নানে যায়।।"

"শৈশব হইতে শিবাজির মতো সীতারাম সার্বভৌম হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাহার উদ্দেশ্যসাধনে কয়েকজন অক্লান্তকর্মা মহাবীর তাহার সহায় হইয়াছিলেন, ইহাদের একজনের নাম 'মেনা হাতি'। বস্তুত তাহার বিরাট হৃষ্টপুষ্ট দেহ ও

বলিষ্ঠ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিলে তাহাকে ছোটখাট একটি হাতি বলিয়াই মনে হইত। দস্যুরা ইহার নাম শুনিলেই অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া পালাইত। ইহার প্রকৃত নাম রামরূপ ঘোষ (আকনার দক্ষিণ-বাড়ির ঘোষবংশীয়)। অপর একজনের নাম মুনিরাম ঘোষ- -খুলনা জেলার বঙ্গজ কায়স্থ। মুনিরামেব দুঃসাহসিক মন্ত্রণা ও মেনা হাতির দৈহিক বল ও অদম্য বীরত্ব---সীতারামকে সর্বকার্যে প্রবুদ্ধ করিত। ইহা ছাড়া পাঠান বক্তার খাঁ, মোঘল আমল বেগ, রূপচাঁদ ঢালী ও ফকিরা (মাছকাটা) প্রভৃতি সেনাপতিও যুদ্ধকালে তাহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিল। এই নবগঠিত বীরদলের মধ্যে অনেকে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, ইহাদেব মধ্যে সীতারামের জীবনীলেখক অন্ধ যদুবাবু, রখো, রামা, গুম্রো, বিশে, হরে, কালা, নিমে, দীনে, ভুলো, জগা ও মেধো---এই বারোজন প্রধান দস্যুবীরের উল্লেখ করিয়াছেন, সকলেই বাঙালি ছিল এবং শেষে সীতারামের দলভুক্ত হইয়াছিল। রাজা সীতারাম পাঞ্জাব হইতে শিখ, নেপাল হইতে গুর্খা আমদানি করেন নাই। বাঙালি রাজা বাংলার ভাইদের লইয়া দেশের অনাচার-নিবারণের জন্য লড়াই করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানে ভেদ দেখেন নাই। এ সম্বন্ধে পল্লীকবি সেই সময়ে এই গানটি বাঁধিয়াছিলেন---

"শুন সবে ভক্তিভরে করি নিবেদন
দেশ গাঁয়েতে যাহা হইল তাব বিবরণ।।
রাজাদেশে হিন্দু বলে মুসলমানে ভাই।
বাজে লড়াই কাটাকাটিব নাহিক বালাই।।
হিন্দু বাড়ির পিঠে কাসন (কাসন্দী) মুসলমানে খায়।
মুসলমানের নস (রস) পাটালী হিন্দুর বাড়ি যায।।
রাজা বলে আল্লা হরি নহে দুইজন।
ভজন পূজন যেমন ইচ্ছা করুক সে তেমন।।
মিলে মিশে থাকা সুখে, তাতে বাড়ে বল।
ভয়েতে পলায় মগ ফিরিঙ্গিব দল।।
চুলে ধবে নারী লডে চডতে নারে নায়।
সীতারামের নাম শুনিয়া পলাইয়া যায়।।"

(যদুবাবুব- -সীতারাম ১১২ পৃঃ)।

"সীতারাম হিন্দুবাজার আদর্শ লইয়া যে সুখ-শান্তির সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন তাহা এই দেশে টিকিল না। এই ভ্রাতৃবিরোধখিন্ন, স্বার্থান্ধ, পরশ্রীকাতব-- ঐক্যহীন ঊষর মরুভূমিতে স্বর্গের কল্পতরুর চারা বাড়িবে কিরূপে?

"সীতারাম ক্রমশ তাহার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সত্রাজিতের মৃত্যুর পব ভূষণা পরগণাব অনেকাংশ অবশেষে কালীনারায়ণ নামক এক ব্যক্তির হস্তগত হয়। ইহাব পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদের মৃত্যু হইলে সেই জমিদারির শিশু মালিকগণের পক্ষে সীতাবাম অভিভাবক হইয়া রূপাপাত, লোকভানী, বকনপুর প্রভৃতি পরগণা শাসন করেন। মামুদসাহী পরগণাব ভূস্বামী রামদেবের জমিদারির পূর্বাংশ সেনাপতি মেনা হাতি বলপূর্বক দখল কবেন। উত্তবে মাগুরার নিকটবর্তী নান্দুয়ালীতে শচীপতি মজুমদার নামক এক বৈদ্য জমিদার ছিলেন, সীতারাম তাহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন। "উত্তরে পদ্মা পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদাবিগুলি সীতারামেব হস্তে আসে" (সতীশবাবু---৫৫৭ পৃঃ)। সাতৈরেব উত্তরে নসিব ও নসরৎ নামক দুই পাঠান বিদ্রোহী হইয়াছিল। সীতাবাম নবাব কর্তৃক ইহাদিগকে দমন করিবাব ভারপ্রাপ্ত হন। এই সুযোগে তিনি অনেকগুলি নতুন দুর্গ ও মহম্মদপুরে কামান প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করেন। পাঠানেরা সহজেই পরাভূত হয়, এবং নবাব সরকারে তাহার প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া

যায়। চাঁচড়ার রাজা মনোহর রায়, মীর্জানগরের ফৌজদার নূরউল্লা খাঁর সাহায্যে সীতারামের রাজধানী আক্রমণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন। তখন সীতারাম তাহার দুর্গতির একশেষ করিয়াছিলেন (১৭০৩ খ্রিঃ)। সুন্দরবনের জায়গির সীতারামের ছিল, কিন্তু কতিপয় জমিদার প্রজাদিগকে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করেন। রাজা স্বয়ং তথায় যাওয়াতে সকলে নিরস্ত হইয়া যায়। এই সূত্রে নলদী, তেলিহাটি ও মকিমপুর তাহার হস্তগত হয়। জানকী বিশ্বাস মজুমদার নামক এক বৈদ্যজমিদারের বংশধরেরা সুলতানপুর খড়ড়িয়া পরগণার মালিক ছিলেন। সীতারাম এই সমস্ত জমিদারের নিকট হইতেই রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন। তিনি রামপাল জয় করিয়াছিলেন, তাহার প্রদত্ত সনদে তাহা পাওয়া যায়। পরমধুদিয়ার নিকট "রণভূম" বা রণের মাঠ নামক একটা স্থান আছে, সম্ভবত এই স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল। সীতারাম এইবার চিরুলিয়া, মধুদিয়া প্রভৃতি পরগণা অধিকার করিয়া লইলেন।

"যশোর খুলনার ইতিহাস-লেখক সতীশবাবু বলেন, "সীতারামের রাজ্য পদ্মার উত্তর পার হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গোপসাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।" (৫৬৩ পৃঃ)। উত্তরে পাবনা, দক্ষিণে ভৈরব নদ, পশ্চিমে মামুদসাহী পরগণা—তেলিহাটি পরগণার শেষ। এই এক অংশ, আর দ্বিতীয় অংশ—দক্ষিণে সুন্দরবনের আবাদী মহল, উত্তরে ভৈরব নদ হইতে আবাদ শেষ, পূর্বে বালেশ্বর হইতে বরিশালের কতকাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিস্তৃত অধিকার ৪৪টি পরগণায় বিভক্ত ছিল এবং ইহার আয় তখনকার দিনে এককোটি টাকার উপরে হইত।

"মোঘলেরা সীতারামকে এতদিন পর্যন্ত প্রশ্রয় দিয়াছিলেন কেন? তাহার একমাত্র কারণ—তাহারা হিন্দু জমিদারদিগকে নগণ্য মনে করিয়াছিলেন, জনশ্রুতিতে যত কিছু শোনা যাইত, নবাব তাহা কানে আনিতেন না। সীতারামের সুশাসনে মুসলমানেরা প্রীত ছিল। তৎকালে নবাবেরা পাঠানদিগকে ও মগদিগকে আশঙ্কা করিতেন। সীতারাম নবাবের পক্ষ হইয়া দুর্দান্ত পাঠান ও মগদিগকে দমন করিয়াছিলেন, ইহাতে সায়েস্তা খাঁ প্রমুখ শাসনকর্তারা বরং তাহার উপর প্রীতই হইয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধির একটা সীমা আছে, সীতারাম যখন সে সীমানা লঙ্ঘন করিয়া গেলেন, তখন তাহার প্রতি নবাব সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

"পাঠান-নির্যাতনের অছিলায় সীতারাম বহু দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, দির্ঘিকা-খননের উপলক্ষে তিনি রাজ্যের শতসহস্র প্রজাকে সামরিক শিক্ষা দিয়াছিলেন, দস্যুদলন-প্রচেষ্টায় তিনি বহু দস্যুকে করতলগত করিয়াছিলেন। তাহার সৈন্যশ্রেণীতে হিন্দু, পাঠান, মোঘল প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোক রাজভক্তিপরায়ণ ও সন্তুষ্টচিত্ত ছিল।

"এইভাবে বলসঞ্চয়পূর্বক সীতারাম রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি মহম্মদপুরের দুর্গকে অতি দুর্গম করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিশাল অরণ্য ও তিনদিকে বিল পরিবেষ্টিত থাকায় নিভৃত প্রদেশে তিনি স্বদেশি কর্মকার কর্তৃক বড় বড় কামান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মহম্মদপুর বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইল। রাজার আয় বাড়িয়া গেল। রাজা নিজে বিদ্বান ছিলেন। শৈশবে তিনি টোলে সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন, তিনি বাংলা ও উর্দু খুব ভাল জানিতেন। জয়দেব ও চণ্ডীদাসের পদ খুব ভাল করিয়া আবৃত্তি করার পুরস্কারস্বরূপ তিনি জগন্নাথ চক্রবর্তীকে জমি দান করিয়াছিলেন—সেই সনদে লিখিত ছিল—"পরম পূজনীয় জগন্নাথ চক্রবর্তী শ্রীচরণেষু—আমার জমিদারি পরগণে মাহিমসাহীর হোগলাডাঙা ও কল্যাণপুর গ্রামে বার পাখি ও পরগণে নলদীর নারায়ণপুর ও নহাটি গ্রামে আট পাখি জমি আপনার চণ্ডীদাস ও জয়দেবের মুখস্থ কবিতা শুনিবার জন্য ব্রহ্মোত্তর দিলাম—আপনি পুরুষানুক্রমে আশীর্বাদ করিয়া ভোগদখল করুন। সন ১১১৩, তাং ৫ বৈশাখ (১৭০৭ খ্রিঃ)। মহম্মদপুর অঞ্চলে পূর্ব হইতেই শিল্পের খ্যাতি ছিল। সীতারাম শিল্পের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন। এখনও নালিয়া গ্রামে সাত হাত উচ্চ নানারূপ কারুকার্যশোভিত চিনির মঠ, রথ, ময়ূরপঙ্খী প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য

পাওয়া যায়—ময়রারা চিনির যে কদমা এখনও তৈরি করিয়া থাকে—তাহার অধিকারে তাহার বেড় দুই হাত এবং উচ্চতার দেড় হাত হইত। এই জিনিসটা তুলার ন্যায় হাল্কা, কাজ এত সূক্ষ্ম ও সুন্দর যে মনে হয় এত বড় কদমাটা ফুঁ দিলে উড়িয়া যাইতে পারে। তাহারই রাজধানীর নিকটবর্তী স্থানে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরি হইত, এখন তাহার লুপ্ত গৌরবের চিহ্ন আছে। সাতৈরের পাটি ও মাদুর একসময়ে ভারতবিশ্রুত ছিল। কয়েক বৎসর মাত্র অতীত হইল তখনও এমন কারিগর বর্তমান ছিল যে ৫০০ টাকা মূল্যের মাদুর তৈরি করিতে পারিত। তাহারই মন্দিরাদির ইটে যে কারুকার্য দৃষ্ট হয়, তাহা বঙ্গে সূক্ষ্ম শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কাঠের উপর, কাগজের উপর তাহার সময়ে যে কত সুন্দর সুন্দর কারুকার্যের নমুনা আমরা পাইয়াছি তাহাতে মনে হয়, বীর সীতারাম রায় কেবল যুদ্ধবিদ্যায় দেবসেনাপতির পূজা করিতে অর্ঘ প্রস্তুত করিয়া ক্ষান্ত রহেন নাই, তিনি স্বর্ণপদ্মের ডালি অর্ঘ দিয়া বঙ্গের কলালক্ষ্মীর পূজা করিতেন। ভূষণা পরগণা পূর্ব হইতে বস্ত্র ও কাগজ প্রস্তুত করার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল ("বনাত-মখমল-পটু ভূষণাই খাসা। বুটাদার ঢাকাই দেখিতে তামাসা।।" রামপ্রসাদ—বিদ্যাসুন্দর।) ভূষণাই কাগজ সেকালে বঙ্গের সর্বত্র সুপরিচিত ছিল। আমরা ইতিপূর্বে এই অঞ্চলের যে শিল্পমণ্ডিত ঘরের, উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও সীতারামের রাজধানীর অনতিদূরবর্তী। মহম্মদপুরে এখনও কাচারু নামক একজাতীয় লোক বাস করে, তাহারা কাচের চুড়ি প্রস্তুত করিত। গালা, মোম, তামা, পিতল, কাঁসা এবং সোনারূপার কারুশিল্পের জন্য সীতারামের ভূষণা বিখ্যাত ছিল। মুরশিদাবাদ নবাববাড়ির যে সুবৃহৎ কামান আছে—তাহা ঢাকার জনার্দন কামার ১৬৩৭ খ্রিঃ অব্দে নির্মাণ করিয়াছিলেন, পিতলফলকে এই কথাই উৎকীর্ণ আছে। এই কামানের নাম "জাহান-কোষা" বা "জগজ্জয়ী"। সীতারাম এই জনার্দন কর্মকারের স্বজাতীয় শিল্পীদিগকে ঢাকা হইতে আনিয়া মহম্মদপুরে উপনিবিষ্ট করেন। তাহারাই তাহার সুবিখ্যাত "কালু খাঁ ও ঝুমঝুম খাঁ" নামক কামান নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঢাকায় উক্ত নামধেয় কামানদ্বয়ের মতো একটি বৃহৎ কামান আছে, তাহা সীতারাম রায়ের কি না বলিতে পারি না। সীতারামের বহু পুষ্করিণী ও দিঘি এখনও বিদ্যমান। ইষ্টক মন্দির নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই সকল দিঘির পুণ্য নীর এখনও সুপেয়। সর্বাপেক্ষা বড় দিঘি "রামসাগর", এখনও পাহাড় লইয়া তাহার বেষ্টনী ৬,০০০ হাতের কম হইবে না, ইহার বর্গফল অন্যূন ২০০ বিঘা। "সুখসাগর" নামক দিঘিতে গুরুতর রাজ্যশাসন ও যুদ্ধবিগ্রহের শান্তি দূর করিবার জন্য নানা কারুশিল্পমণ্ডিত "ময়ূরপঙ্খী" নৌকাতে বহু রমণী-পরিবৃত হইয়া 'বিলাসী' সীতারাম নৌবিহার করিতেন। অতি জটিল ও কঠিন রাজনৈতিক সমস্যাপূর্ণ যাহার জীবন, যিনি দরিদ্র অবস্থা হইতে সার্বভৌম সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাকে 'বিলাসী' বলা মূর্খতা, তবে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও রুচি অনুগত "একপত্নীক" ধর্ম তখনও বঙ্গদেশে প্রচলিত হয় নাই, নর্তন, গান, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদজনিত ক্ষণিক সুখভোগে তখনকার বড়লোকেরা নৈতিক বিভীষিকা দেখিতেন না। 'সুখসাগর' ছাড়া 'কৃষ্ণসাগর' ও অন্যান্য দিঘিও এই মহাপ্রাণ ব্যক্তির সাধারণের হিতকামনার নিদর্শনস্বরূপ রহিয়াছে।

"সীতারামের রাজসভা বহুপণ্ডিতমুখরিত ছিল। তাহার রাজ্যে বারুইখালি, নালিয়া, নহাটা, বাটাজোর প্রভৃতি স্থান বৈদিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের কেন্দ্রস্থান ছিল। পলিতা নহাটার প্রসিদ্ধ ভাস্করানন্দ আগমবাগীশ, বৈষ্ণবচূড়ামণি কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। আগমবাগীশ মহাশয় তৎসম্বন্ধে বাংলায় এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন ; "ভাস্করে উদয়ভাস, উদয়নারায়ণ দাস, তনয় রাজেন্দ্র সীতারাম। গুণেন্দ্র, দেবেন্দ্র তথি, ভূ অধিপতি, ভূষণে ভূষিত গুণগ্রাম।" "বৈদ্যকুল-প্রদীপ" অভিরাম কবীন্দ্রশেখর কবিরাজ রাজসভার অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি রাজার নিকট হইতে

"মহোপাধ্যায়" উপাধি পাইয়াছিলেন (সতীশবাবু, ৫৬৮ পৃঃ)। "অভিরামঃ কবীন্দ্রোহসৌ সীতারামাদ্ধি ভূপতেঃ। মহোপাধ্যায় পদবীং মহৎপূর্বামবাপ্তবান" (রামতনু হুড়—কুলপঞ্জী)। সীতারামের সভায় দর্শন, সাহিত্য, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রের সর্বদা আলোচনা চলিত। "তিনি মুসলমান প্রজাদের শিক্ষার জন্য মৌলবি-দ্বারা বহুসংখ্যাক মক্তব খুলিয়াছিলেন" (সতীশবাবু, ৫৬৯ পৃঃ)।

"সীতারামের "দোলমঞ্চ", "দশভূজার মন্দির", "কৃষ্ণজীর মন্দির", "রামচন্দ্রবাটি", "পঞ্চরত্ন" প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। তাহার মালঞ্চী গ্রামের প্রসিদ্ধ দুর্গ, কালিকাপুরের গড়, এমন কি মহম্মদপুরের দুর্গ এখন টিপিতে পরিণত।

"একটি দরিদ্র বালক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বীয় প্রতিভাবলে আদর্শ হিন্দুসাম্রাজ্য গড়িতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। প্রথম জীবনে তাহার দুই অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন, রামজীবন ও রামরূপ (মেনা হাতি), উহারা তাহার আজীবন-সঙ্গী। কত গভীর রজনীর পরামর্শ, কত উদযোগ, কত জীবন-পণ যুদ্ধ, মগ-পাঠান-হিন্দু-দস্যুর সহিত সংঘর্ষ, কত কৃচ্ছ্র ও বিপৎসঙ্কুল অভিযান ও বিলবেষ্টিত স্থানে দুর্গম রাজধানীতে কামান-নির্মাণ, দিঘি খননোপলক্ষে দুর্ধর্ষ বাঙালি সৈন্যের সৃষ্টি—একটা অজ্ঞাত অরণ্যপ্রদেশকে সহসা যাদুমন্ত্রপ্রভাবে যেন রত্ন-মেখলা সৌধকরীটিনী লঙ্কার মতো করিয়া গড়া এবং বিদ্যা, শিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের প্রতিষ্ঠা এবং বাণিজ্যের বিলাসক্ষেত্ররূপে গড়িয়া তোলা—প্রজাদিগকে রামরাজ্যের স্বপ্ন সফল করিয়া প্রদর্শন—১৬৯০ খ্রিঃ হইতে ১৭১২ খ্রিঃ—এই স্বপ্ন দ্বাবিংশতিবর্ষব্যাপী অধ্যবসায়ে "দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"—সেই সাহান সা সম্রাটের বিরুদ্ধে অটল প্রতিজ্ঞায় দাঁড়ানো—এভাবে এতটা বড় স্বপ্ন আর কোনও বাঙালি গত চারশো বৎসরের মধ্যে এতটা সফলতার দিকে আনিতে পারিয়াছেন? হিন্দু-মুসলমান এই প্রীতি, জাতিধর্মনির্বিশেষে গুণগ্রাহিতা, কায়স্থ হইয়া বৈদ্য পণ্ডিতকে "মহোপাধ্যায়" উপাধিপ্রদান, মন্দির ও মসজিদ, চতুষ্পাঠী ও মক্তব একত্র প্রতিষ্ঠা. জয়দেব ও চণ্ডীদাসের গীতি শুনিয়া নিষ্কর জমিদান, শিল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং রাজধানীর "মহম্মদপুর" নামকরণ—এমনভাবে প্রতাপাদিত্যের পরে আর কে করিয়াছেন? অপর মহাবীরেরা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু সীতারাম তাহার বিশাল সাম্রাজ্যের গঠন-শক্তি সর্বদিকে সপ্রমাণ করিয়াছেন। যখন মুরশিদকুলি খাঁ রাজস্ব দেওয়ায় দেরি হইলে ব্রাহ্মণ জমিদারদিগকে ধরিয়া ধরিয়া 'বৈকুণ্ঠে' নিক্ষেপ করিতেন, সেখানে পুরীষমিশ্রিত জল তাহাদিগকে গলাধঃকরণ করিতে হইত, তখন সীতারাম অটলভাবে দাঁড়াইয়া জমিদারদিগকে বলিতেন, "রাজস্ব দেওয়া বন্ধ কর।" তিনি জানিতেন—এই সংঘর্ষ শুধু মুর্শিদাবাদের সঙ্গে নহে, সমস্ত ভারত-সাম্রাজ্যের মালিকের—হিমাদ্রিপ্রমাণ গুরুতর রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ, সেই বিশাল যন্ত্রের নিষ্পেষণে তাহার মহম্মদপুর বুদ্বুদের মতো বিলীন হইবে। পতঙ্গ যেমন অগ্নিকুণ্ডে স্বেচ্ছায় ঝাঁপাইয়া পড়ে—সেইরূপ তিনি এই বিপদকে বরণ করিয়া লইলেন। এ যুদ্ধ দাউদের সঙ্গে আকবরের যুদ্ধ নহে—দ্বাদশ ভৌমিকের সমবেত শক্তির সহিত মানসিংহের যুদ্ধ নহে, জয়পরাজয় সে সকল ক্ষেত্রে অনিশ্চিত ছিল, এই যুদ্ধ নগণ্য মহম্মদপুরের সঙ্গে দিল্লির বাদশাহের। এ সকল জানিয়াও তিনি মুরশিদকুলি খাঁ-কৃত হিন্দুজমিদারদের অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না, ফৌজদার তরপ খাঁকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি রাজস্ব দিবেন না। মেনা হাতির সঙ্গে যুদ্ধে তরপ খাঁ নিহত হইলেন। যে সকল হিন্দু জমিদার তাহার শাসনে গরুড় পক্ষীর ন্যায় হইয়া ছিলেন, তাহারাই রং বদলাইয়া মুরশিদকুলি খাঁর পক্ষাশ্রয়পূর্বক সীতারামকে টিটকারী দিতে লাগিলেন। স্বয়ং দয়ারাম রায় বক্সার খাঁর সঙ্গে যোগ দিয়া মোঘল সৈন্যের নেতা হইয়া মহম্মদপুর অভিযান করিলেন, গুপ্ত গুণ্ডা লাগাইয়া মেনা হাতিকে অতর্কিতভাবে বধ করিলেন। মুরশিদকুলি শত্রু হইলেও ততটা হীন ছিলেন না, তিনি সেই বিশাল নরমুণ্ড দেখিয়া

বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা কি করিয়াছ? এরূপ বিশালকায় বীরকে না মারিয়া তাহাকে ধরিয়া আনা উচিত ছিল!" ("The Nawab seeing the huge head said, 'A man like that you should have brought alive and not killed!' He directed the head to be taken back to Muhammudpur and it was there buried and a great tomb raised over it." Westland's report, p. 27.) সীতারামের সহিত বাবাসিয়ায় মোঘলদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে ৬০০ মুসলমান সৈন্য নিহত হয়।

"দয়ারামের দ্বারাই সীতারামের পতন ঘটে। শেষ পর্যন্ত মহম্মদপুরে দুর্গ সমাশ্রয় করিয়া তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বন্দি হইয়া তিনি মুর্শিদাবাদে নীত হন। তাহার বহু পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কেহ পূর্বে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাহার তিন বিবাহিতা পত্নীর মধ্যে একজন শেষ পর্যন্ত তাহার সঙ্গে ছিলেন। কোন ফিরিঙ্গি লেখক আপনাকে সীতারামের বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া পর্তুগিজ ভাষায় বই লিখিয়াছিলেন। তাহার অন্দরমহলের বহু রমণীর মধ্যে দুই একজন ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়ভুক্ত থাকা আশ্চর্যের বিষয় নহে।

"তাহার দেশীয় লোকের শত্রুভাব ফলে তাহার পতন হইয়াছিল, তাহার রাষ্ট্রনীতি আদর্শ নরপতির যোগ্য ছিল। তাহার সংগঠনী-প্রতিভা সম্রাটের যোগ্য ছিল। অদম্য বীরত্ব, সাহস, ন্যায়বোধ প্রভৃতি গুণে তিনি জগন্মান্য মহাবীরদের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত। তিনি নিজের দোষে বিনষ্ট হন নাই। "জ্ঞাতি যদি অভিরোষে, গরুড়ের পাখা খসে—" নিজের লোক যদি পর হয়—স্বজাতি যদি দ্রোহী হয়—তবে বিনাশ অনিবার্য। ভারতের ইতিহাস—বিশেষ হিন্দুজাতির ইতিহাস পুনঃ পুনঃ এই কথাটা প্রমাণ করিয়াছে। যেদিন তাহার শৈশবসঙ্গী, নিত্যসহচর, উচ্চকাঙ্ক্ষার অংশীদার, রাজ্যের প্রধান ভিত্তি "মেনা হাতি"র মৃত্যু হইল—যাহার সহায়তায় তিনি শত দস্যুর অত্যাচার হইতে বঙ্গদেশকে বাঁচাইয়াছেন—যিনি জগতে ন্যায়রাজ্যস্থাপনের জন্য রাউন্ড টেবলের নাইটের ন্যায় আর্থারতুল্য রাজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, কতদিন রাত্রিতে জল্পনা করিয়া পরদিনই তাহা কার্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই চিরসুহৃদ মেনা হাতির মৃত্যুসংবাদ যখন পৌঁছিল, সেদিন তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়াছিল—তাহার দূরকম্পন আজও আমরা আমাদের হৃদয়ে অনুভব করিতেছি। ১৭১২ খ্রিঃ অব্দে সীতারামের মৃত্যু হইয়াছিল। জন্ম ১৬৫৮ (৬০)—মৃত্যু ১৭১২, সুতরাং মৃত্যুকালে তাহার বয়ঃক্রম ৫৪ অথবা ৫২ বৎসর হইয়াছিল।"

সীতারাম প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্রের পরবর্তীকালে আরও আলোচনা হয়েছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'সীতারাম রায়' এবং যদুনাথ ভট্টাচার্যের 'রাজা সীতারাম রায়' দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে নিয়ে একখানি উপন্যাসও লেখেন। কিন্তু তা উপন্যাসই, ইতিহাস হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। ইতিহাসকার ও গবেষকরা সীতারাম সম্পর্কে তেমন নির্ভরযোগ্য বিবরণ এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেননি। বরং হিন্দুত্ব আরোপ করায় পরিচয় উদ্ধার সম্ভব হয়নি। মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক এর "বাংলার ইতিহাস : ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনাপর্ব" গ্রন্থে সীতারাম প্রসঙ্গে একটি অধ্যায় আছে। লেখক সলিম উল্লাহের 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা' থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন সীতারামে দেশশাসক অপেক্ষা দস্যুবৃত্তিই প্রাধান্য পেয়েছিল : "মাহমুদাবাদ পরগণায় জমিদার সীতারাম একদল দস্যু নিয়ে জঙ্গলে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং প্রতিবেশী এলাকা থেকে গরু-ছাগল ধরে নিয়ে যান, কিন্তু সরকারি সৈন্যরা ধাওয়া করলে বিলজঙ্গলে আশ্রয় নেন। ভূষণার ফৌজদার মীর আবু তোরাব যিনি ছিলেন একজন সৈয়দ বংশীয় এবং সম্রাটের পরিবারের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনযুক্ত, সীতারামের ধ্বংসলীলায় বাধাপ্রদানে ব্যর্থ হন। ফৌজদার সীতারামকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলে তিনি চতুরতার সাথে মুঘল বাহিনীকে এড়িয়ে যান। শেষ পর্যন্ত সীতারামকে অনুসরণ করার জন্য তিনি দুইশত অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি পীরখানকে নিয়োগ করেন। একদিন পীরখান

সীতারামকে ধাওয়া কবার সময় মীর আবু তোয়াবও ঘটনাচক্রে সেই জঙ্গলে শিকার করতে যান। সীতারামের লোকেরা আবু তোয়াবকে পীর খান মনে করে তাঁকে ঘিরে ফেলে ধরে হত্যা করে। মুর্শিদ কুলী খান এই খবর পেয়ে শঙ্কিত হন, কারণ এই কাজে আবু তোরাবকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য না করার জন্য আলমগীর (ফররোখসিয়ার) ক্রোধান্বিত হবেন। তিনি তার শ্যালক বখ্‌স আলী খানকে সেনাপতিত্ব দিয়ে আদেশ প্রদান কবেন, যেভাবেই হোক সীতারামকে যেন বন্দি করা হয়। প্রতিবেশী জমিদারদের নিকট আদেশ দেওয়া হয় তারা যেন বখ্‌স আলীকে এই কাজে সহাযতা করেন. অন্যথায় যার জমিদারি দিয়ে সীতারাম পালিয়ে যেতে সক্ষম হবে তিনি যেন চরম দুর্ভোগের জন্য প্রস্তুত হন। ফলে প্রতিবেশী জমিদারগণ চতুর্দিক থেকে সীতাবামকে চেপে ধরেন এবং শেষ পর্যন্ত বখ্‌স আলী খান সীতাবামকে তার পবিবার সন্তান-সন্ততি ও পারিষদবর্গসহ বন্দি করেন। পরে তাদেরকে শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় মুর্শিদাবাদ প্রেরণ করেন।"

জানা যায় সীতারামের পরাজয় অনিবার্য হযে ওঠায়, তার পারিবারের লোকজন বিস্তর টাকা পযসা নিয়ে কলকাতায় পাটওয়ারী (অর্থাৎ জমিদারির আযব্যয়ের হিসাবরক্ষক) বামনাথের গৃহে আশ্রয় নেয়। তারা গোপনে ছিল। ১৭১৪ খ্রিঃ ১১ ফেব্রুয়ারি হুগলির সহকারি ফৌজদার কলকাতায় কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে জানায়, কলকাতায় লুকিয়ে থাকা সীতারামের পরিবারের লোকজনকে যেন অবিলম্বে ফেরৎ পাঠান হয়। কোম্পানি তাদের খুঁজে পেয়ে ১৭১৪ খ্রিঃ ৫ মার্চ হুগলির সহকারি ফৌজদারের হাতে তুলে দেয়।

মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক সীতারাম সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যেব ভিত্তিতে বলেছেন, সীতারাম সাধারণ অর্থে একজন ডাকাত ছিলেন না। তাব অধিকৃত অঞ্চল সুবিস্তৃত না হলেও সমগ্র এলাকা ছিল পরস্পর "সন্নিহিত এবং সুনিযন্ত্রিত"। বর্তমান যশোহর জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত মধুমতী নদীর তীরে ভূষণা চাকলার হবিহরনগর গ্রামে সীতারামের জন্ম এক দরিদ্র উত্তর রাঢ়ী কাযস্থ বিশ্বাস পরিবাবে।" তার পিতা উদয়নারায়ণ ছিলেন ভূষণার মুসলিম ফৌজদারের একজন খাজনা আদায়কারী। ১৬৮৫/৮৬ খ্রিঃ সীতাবাম নলদি পরগণা (বর্তমান নড়াইল) বাংলার সুবাদারের কাছ থেকে ইজাবা নেন। সীতারামের সুশাসনে দ্রুত পরগণার রাজস্বই কেবল বৃদ্ধি হয় না, তিনি সমগ্র মাহমুদাবাদ পরগণার সর্বময় হয়ে ওঠেন। তিনি স্থানীয় ডাকাত ও দুঃসাহসী হাঙ্গামাকারীদের সমূলে উৎপাটন করেন। তাদের অনেকেই সীতারামের সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। জনশ্রুতি সীতারাম মোঘল দরবারের ফরমান এবং রাজা উপাধি লাভ করেছিলেন। ভূষণার ১০ মাইল দূবে বগজালিতে রাজধানী স্থাপন করেন সীতারাম। এই বগজালির নাম হয় মোহাম্মদপুর।

মোহাম্মদপুর নামকরণেরও একটি কিংবদন্তী আছে। বহু পূর্ব থেকেই এখানে জনবসতি ছিল। কিন্তু দস্যু তস্করদের উৎপাতে সমগ্র অঞ্চল জনবসতির অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া এই খাল ও জলাভূমি সমাকীর্ণ স্থানে মুসলিম দরবেশ মোহম্মদ খান একটি কুটিরে বাস করতেন। এই নির্জন জঙ্গলময় দুর্গম স্থানটিতে রাজধানী স্থাপনের জন্য দরবেশকে স্থানটি ত্যাগ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু দরবেশ স্থান ত্যাগ করে যান। এরকম একটি নিরাপদ স্থানই সীতারামের প্রয়োজন ছিল। কারণ, একসময় মোঘল বাহিনীর সঙ্গে তার সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠবে।

মোহাম্মদপুরে সীতারাম নির্মিত মাটির দুর্গের ও মন্দিরের উল্লেখ উল্লেখ পাওয়া যায় অনেকের বিবরণে। চারদিকে দুমাইল বিস্তৃত ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গটি ছিল গড়খাই পরিবেষ্টিত। গড়খাই-এর উত্তরপূর্ব দিক শুকিয়ে গেলেও, দক্ষিণ-পশ্চিমের গড়খাই-এ সামান্য জল জমে থাকে। দুর্গের ভিতর বেশ কয়েকটি দিঘি ছিল। যার নিদর্শন আছে। মন্দিরে ছিল লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ। এই মন্দির সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী হল, একদিন সীতারামের ঘোড়ার খুরের সঙ্গে

মাটির ওপর কোন বস্তুর সংঘর্ষ হয়। পরে মাটি খুঁড়ে একটি মন্দির পাওয়া যায়। যার মধ্যে ছিল লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ। কিন্তু বর্তমানে যে মন্দিরটি দেখা যায় সেটি খুব প্রাচীন নয়, এবং মাটির ওপরে মন্দির অবস্থিত। সীতারাম রামসাগর, সুখসাগর ও কৃষ্ণসাগর নামে তিনটি সুবৃহৎ দিঘি খনন করেন। দুর্গে প্রবেশদ্বারের সামনেই ছিল রামসাগর। এই জলাশয় না পেরিয়ে দুর্গে প্রবেশ শত্রুপক্ষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুখসাগর দিঘির মাঝখানে ছিল একটি ছোট দ্বীপ ওই দ্বীপে অবসর সময় আমোদ-প্রমোদে যাপন করতেন সীতারাম। তিনটি দিঘি ছাড়াও আর একটি দিঘি ছিল দুর্গের ভিতরে। যেখানে ছিল সীতারামের গোপন অর্থভাণ্ডার। যার প্রবেশপথ একমাত্র তারই জানা ছিল। সীতারামের মৃত্যুর পর সেই অর্থভাণ্ডারের হদিশ পায়নি কেউ।

সীতারাম মোহাম্মদপুরে বেশ কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করেন। স্থাপত্যকলার কোন বৈশিষ্ট্য না থাকলেও, প্রত্যেকটিতে ভিত্তি প্রস্তর ছিল। যে দিঘিতে সীতারামের গোপন অর্থভাণ্ডার ছিল, তার পাড়েই ছিল এককক্ষ বিশিষ্ট দশভুজা মন্দির। ভিত্তিপ্রস্তর থেকে জানা যায়, ১৬৯৯-১৭০০ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মিত হয়। দুর্গের ভিতর আর একটি মন্দিরে ছিল লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ। এই লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ নড়াইলের জমিদাররা চুরি করে নিয়ে যায় এবং তারপর থেকে এই পরিবারের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। মন্দিরটি ১৭০৪ সালে নির্মিত হয়েছিল। কানাইনগরে ছিল একটি সুদৃশ্যস্য অলঙ্কৃত মন্দির। মন্দিরে যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিগ্রহ ছিল, সেটি নাটোরের দিঘাপতিয়ার জমিদার অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে, তাদের রাজপ্রাসাদে স্থাপন করেন।

রাজা সীতারাম রায় একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ ছিলেন। তার ছিল অসাধারণ সাহস। যুদ্ধ বিশারদ ও কৌশলী এই মানুষটিকে ঘিরে কিংবদন্তীব শেষ নেই। তিনি জানতেন, মোঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে জয়লাভ অসম্ভব। তবুও অদম্য স্বাধীনতা স্পৃহা তাকে অনেক দূরপথ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার জনপ্রিয়তা, শক্তিমত্তা এবং বিপুল সম্পত্তি পার্শ্ববর্তী হিন্দু জমিদারদের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছিল। সাধারণ মানুষ তার সমর্থনে এগিয়ে না এলে, সে সময়ে বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করাও সম্ভব হত না তার পক্ষে। তার সেনাবাহিনীতে কোন ভাড়াটে সেনানায়ক ছিল না। যে সাহায্য গ্রহণ প্রতাপাদিত্যের পক্ষে ছিল অপরিহার্য. সীতারাম তার থেকে ছিলেন অনেক দূরে। হিন্দু রাজ্য নয়, সীতারাম ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষকেই চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন। অবশ্যই, সেকালে তার সাফল্য ছিল অসম্ভব। ভূষণা সম্পর্কে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যর একটি মূল্যবান আলোচনা প্রকাশিত হয় "প্রবাসী"* পত্রিকায়। আগ্রহী পাঠকদের জন্য রচনাটি উদ্ধৃত হল ঃ

"রেনেলের মানচিত্রের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে, বর্তমান ফরিদপুর ও যশোহর জেলার অনেকটা স্থান জুড়িয়া সেকালে ছিল ভূষণা। ভূষণা অতি প্রাচীন স্থান, কিন্তু বর্তমান সময়ে উহা নামেমাত্র পর্যবসিত হইয়াছে। এখানে হিন্দুরাজার রাজত্ব ছিল, মুসলমান ফৌজদারের শহর ছিল, হিন্দু ও মুসলমান, পাঠান ও মোঘলের বহু বার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। মুকুন্দরামের ভূষণা, সীতারাম রায়েব ভূষণা এখন খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। ইহাই কালেব নিয়ম।

"ফরিদপুর নগর হইতে পশ্চিম দিকে প্রায় আঠার মাইল দূরে মধুখালি গ্রাম। এখানে অল্পদিন পূর্বেও পুলিশের একটা আড্ডা ছিল। সাবেককালের ভূষণা এখান হইতে প্রায় তিন-চার মাইল। গ্রাম্য রাস্তা ও মাঠের মধ্য দিয়া কোনমতে সেখানে পৌছিতে হয়। যেখানে

* ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ

জনাকীর্ণ নগর ছিল সেখানে এখন ক্ষুদ্র পল্লী। নিকটেই প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ। প্রাচীর ও পরিখার চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বনজঙ্গলের মধ্য ইষ্টকনির্মিত গৃহও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে এখনও দেখাইয়া দেয়, অমুক স্থানে অপরাধীকে শূলে দেওয়া হইত। সেকালে একদিকে চন্দনা নদী, অন্য দিকে কালীগঙ্গা ভূষণার নৈসর্গিক রক্ষিরূপে বিদ্যমান ছিল। কালীগঙ্গা এখন মৃত, চন্দনা মুমূর্ষু। দুর্গের পাদদেশে একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা কোনরূপে কালের সর্বগ্রাসী কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আছে। পুলিশ স্টেশনের নাম এখনও ভূষণা থাকিলেও বহুকাল পূর্বে উহা ভূষণা হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কিছুকাল ইহার অবস্থিতি ছিল সৈয়দপুর নামক স্থানে তাহার পর গিয়াছে বোয়ালমারিতে। ভূষণার সমৃদ্ধি এক সময়ে সৈয়দপুরকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল। এখানে পূর্বে মিউনিসিপ্যালিটি ছিল, বাণিজ্যের শ্রী বিরাজ করিত। তাহাও এখন অতীতের কথা।

"ভূষণা-মামুদপুর কথাটা খুব প্রচলিত, কিন্তু ভূষণা মধুমতী নদীর পূর্বদিকে, মামুদপুর পশ্চিমে। বোধ হয় মধ্যবর্তী নদী পূর্বে ক্ষুদ্রকায় ছিল এবং উভয় স্থানের সামাজিক যোগ থাকায় নামটার উদ্ভব হইয়াছে। এখন ভূষণা ফরিদপুর জেলায়, মামুদপুর যশোহরের মধ্যে।

"দিগ্বিজয়প্রকাশ' নামক হিন্দু ভৌগোলিক গ্রন্থে পাওয়া যায়, ধেনুকর্ণ নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি যশোরেশ্বরীর মন্দির পুনর্নির্মাণ করেন। তাহার কণ্ঠহারের 'বঙ্গভূষণ' উপাধি ছিল এবং তিনিই যশোহরের উত্তরভাগ অধিকার করিয়া তাহার নাম ভূষণা রাখেন। কোন সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা ঠিক জানা যায় না, তবে অবস্থা দৃষ্টে বলিতে হয় বারোভুঁইয়ার অভ্যুদয়ের বহু পূর্বে।[১]

"মুসলমান আমলে ভূষণা নগর ছিল সাতৈর পরগণার অন্তর্গত। মোঘল শাসনকালে যখন সুবে বাংলা (উড়িষ্যা সমেত) চব্বিশটি সরকারে বিভক্ত হয় তখন এই সাতৈরকে সরকার মামুদাবাদের অন্তর্গত দেখা যায়। সরকারি মামুদাবাদ ও সরকার ফতেয়াবাদ দুইটি পাশাপাশি সরকার, একের ইতিহাস অন্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আইন-ই-আকবরীতে আমরা ফতেয়াবাদকে একটি বিস্তীর্ণ জনপদরূপে দেখিতে পাই। বর্তমান ফরিদপুর জেলার অনেকটা অংশ, যশোহর জেলার খানিকটা এবং বর্তমান বাকরগঞ্জ, ঢাকা ও নোয়াখালি জেলার খানিকটা এবং বর্তমান বাকরগঞ্জ, ঢাকা ও নোয়াখালি জেলার খানিকটা ইহার অন্তর্গত ছিল। মামুদাবাদ সরকারের মধ্য বর্তমান ফরিদপুর জেলার পশ্চিমাংশ, যশোহর জেলার অনেকটা এবং নদীয়া জেলার কতকটা ছিল। ইহাতে মহাল ছিল ৮৮টি এবং ইহার রাজস্ব ছিল ১১৬১০২৫৬ দাম। ফতেয়াবাদ অপেক্ষা এই সরকার অধিক রাজস্ব যোগাইত, কিন্তু সৈন্য যোগাইতে হইত ফতেয়াবাদকে অনেক বেশি।

"এই দুইটি পাশাপাশি জনপদ নামে মুসলমান-প্রতাপ ঘোষণা করিলেও বহুকাল পর্যন্ত হিন্দুরাজার প্রভাবান্বিত ছিল। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বিজয়গুপ্ত-প্রণীত মনসামঙ্গলের কোন পাঠে এক 'অর্জুন রাজা'র উল্লেখ পাইয়াছেন, যাহার ছিল 'মুল্লুক ফতেয়াবাদ বঙ্গরোড়া তক সাম'। এই অর্জুন রাজা সম্ভবত পাঠানরাজের আনুগত্য স্বীকার করিতেন, কিন্তু মামুদাবাদের হিন্দুরাজা গৌড়ের প্রতাপ ক্ষুণ্ণ দেখিলেই মস্তক উন্নত করিতে ত্রুটি করিতেন না। আইন-ই-আকবরীতে আমরা পাই, এখানে কেল্লা ছিল, আশেপাশে নদী ছিল, পূর্বে জয় সত্ত্বেও সেরসাহকে আবার এই প্রদেশ আক্রমণ করিয়া জয় করিতে হইয়াছিল। সেই জয়ের সময়ে এখানকার রাজার কতকগুলি হস্তী জঙ্গলে পলায়ন করে এবং তাহার পর জঙ্গলের মধ্যে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হয়। এই রাজার রাজধানী ভূষণায় ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ঠিক কোন্ সময়ে মামুদাবাদ নামের উৎপত্তি তাহা বলা যায় না, তবে মনে হয় বাংলার পাঠান নৃপতি ফথ সার (১৪৮১ ৮৭ খ্রিঃ অব্দ) নামানুসারে ফতেয়াবাদের নাম হইয়াছে আর মামুদাবাদের

নামও তাহার নিকটবর্তী কোন সময়ের। সেরসাহের আক্রমণের পরবর্তী সময়ের কোন ধারাবাহিক বিবরণ না পাইলেও আমরা বুঝিতে পারি যে হিন্দুরাজাদের প্রভাব প্রবল ছিল—নতুবা মোঘল আমলে মামুদাবাদ ও ফতেয়াবাদকে শাসনে আনিতে দিল্লির বাদশাহকে গলদঘর্ম হইতে হইত না। আকবরের রাজত্বকালে বাংলাদেশে বরাবর গোলমাল চলিয়াছিল। আকবরনামায় পাওয়া যায়, সর্বদা বিবাদ থাকায় বাংলাদেশের নাম হইয়াছিল 'বুলঘাক'। আকমহলের যুদ্ধের পর মোরাদ খাঁ নামক জনৈক সেনাপতি ফতেয়াবাদ ও বাক্‌লা সরকার জয় করেন বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায়। বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে বহুকাল পর্যন্ত স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন হিন্দু রাজার রাজত্ব ছিল--সুতরাং এই জয়ের অর্থ সম্পূর্ণ খাসদখল নহে, আনুগত্য-স্বীকার। ইহার পরও পাঠান ও মোঘলের সংঘর্ষ বাংলা ও বিহারে ভালভাবেই চলিতে লাগিল। বাদসাহের কর্মচারিদিগের মধ্যেও বিশ্বাসঘাতকের অভাব ছিল না। মোরাদ খাঁ ফতেয়াবাদে বিদ্রোহ দমন করিয়া সেখানে অবস্থিত ছিলেন। তিনি মুখে রাজভক্ত ছিলেন, কিন্তু কার্যত বাদশাহের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থের চিন্তাই বেশি করিতেন। আকবরনামায় পাওয়া যায়, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সে-অঞ্চলের ভূম্যধিকারী মুকুন্দরাম রায় তাহার পুত্রগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের হত্যাসাধন করেন ও সম্পত্তি অধিকার করিয়া লন। 'বারোভুঁইয়া' গ্রন্থ প্রণেতা আনন্দনাথ রায় কিন্তু লিখিয়া গিয়াছেন, 'মোরাদের সহিত তাহার বিশেষরূপ সখ্যতা থাকায়, মুকুন্দ তাহার পুত্রগণের যথোচিত সহায়তা সাধনে বদ্ধপরিকর হন।' ইহা তিনি কোথায় পাইলেন জানি না। আনন্দনাথ রায় আরও বলেন, "টোডরমল জানিতে পারিলেন যে, মুকুন্দ মোঘল পক্ষাবলম্বী হইয়া পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এজন্য নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া ফতেয়াবাদে অন্য কোন মুসলমান শাসনকর্তা নিয়োগ না করিয়া মুকুন্দ রায়কে রাজোপধি প্রদান ও ঐ সরকারের কতক শাসনভার অর্পণ করিলেন।" "মানসিংহ মধ্য সময়ে যখন একবার বাংলা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন, তৎসময়ে শাসনকর্তা সায়দ খাঁ, মুকুন্দ রায়কে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে একজন মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। মুকুন্দ রায় এই আকস্মিক বিপদে পতিত হইয়া চিন্তিত হইলেন বটে, কিন্তু কোনও মতে নব শাসনকর্তার হস্তে ফতেয়াবাদ সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। উভয় পক্ষের মধ্যে একটি যুদ্ধঘটনার অবতারণা হইল। তেজস্বী বীরবর মুকুন্দ রায় অনায়াসে সেই যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে তাড়াইয়া দিলেন। পরে সায়দ খাঁ দলবল সহ উপস্থিত হইয়া মুকুন্দ রায়কে পরাস্ত ও হত করেন।" এই সকল কথাও রায়-মহাশয় প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করেন নাই। মুকুন্দরাম রায় প্রদত্ত ব্রহ্মত্র জমির দলিলের সন্ধান কালেক্টরিতে পাওয়া গিয়াছে।

"আকবরনামায় পাই, খাঁ আজিম কোকা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ-দমনে প্রেরিত হইলে (১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে) তাহার বিরুদ্ধে যে সকল বিদ্রোহী নেতা সমবেত হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে ফতেয়াবাদের কাজীজাদা ছিলেন একজন। ইনি অনেক রণতরী লইয়া আসিয়াছিলেন। কামানের গোলায় ইহার মৃত্যু হইলে কালাপাহাড় ইহার স্থলে নৌবিভাগের ভার গ্রহণ করেন।

"ইহার কিছুকাল পরে রাজা মানসিংহের উড়িষ্যা জয়ের পর আমরা ভূষণার বিষম গোলযোগের সংবাদ পাই। এই সময়ে, যেরূপেই হউক, ভূষণা চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের হস্তগত হইয়া পড়িয়াছিল। মুকুন্দরাম সম্ভবত তখন মৃত, তাহার পুত্র সত্রাজিৎ কি করিতেছিলেন বা কোথায় ছিলেন জানা যায় না। বিদ্রোহী আফগানেরা লুটপাট করিতে করিতে ভূষণার দিকে অগ্রসর হয়। আবুল ফজল এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বোধ হয় চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের সম্বন্ধবিপর্যয় ঘটাইয়াছেন। তাহার মতে কেদার রায় ছিলেন চাঁদ রায়ের পিতা। চাঁদ রায় কেদার রায়ের পরামর্শে বিদ্রোহী আফগানদিগকে বন্দি করার প্রয়াস

পাইলেন, কিন্তু ফলে তাহার নিজেরই প্রাণ গেল। চাঁদ রায় নাকি আতিথেয়তার ভাণ করিয়া পাঠানসর্দার দেলওয়ার, সুলেমান ও উস্‌মান্‌কে ভূষণা-দুর্গে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেখানে ছলক্রমে দেলওয়ারকে বন্দি করা হইলে সুলেমান তরবারি উন্মুক্ত করিয়া নিকটবর্তী বহু লোককে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তিনি দুর্গদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে চাঁদরায় তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, কিন্তু উসমান আসিয়া সুলেমানের সহায়তা করিতে লাগিলেন এবং ঘটনার বিবরণ শুনিয়া পাঠানেরা প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। চাঁদ রায়ের নিজের পাঠান-সৈন্যও তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। ফলে চাঁদ রায় নিহত হইলেন। আফগান-সৈন্য লুটপাট করিতে করিতে অগ্রসর হইলে দুর্গস্থ লোকেরা মনে করিল চাঁদ রায় বুঝি ফিরিতেছেন। তাহারা দুর্গদ্বার খুলিয়া দিল, আফগানেরাও সহজেই জয়লাভ করিল। তাহার পর ঈশা খাঁর ষড়যন্ত্রে আফগানেরা তাহার সহিত মিলিত হইলে ভূষণা-দুর্গ ও রাজ্য কেদার রায়ের হস্তে সমর্পিত হইল।

"কেদার রায় এইরূপে আফগানদিগের যোগে ভূষণার মালিক হইয়া বসিলেন, কিন্তু প্রবল মোঘল কর্তৃপক্ষ বেশি দিন এ অবস্থা স্থির থাকিতে দিলেন না। মানসিংহ শীঘ্রই দুর্জন সিংহের অধীনে একদল বাছা সৈন্য ভূষণার প্রেরণ করিলেন (১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে)। সুলেমান ও কেদার রায় দুর্গ দৃঢ় করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। মোঘল-সৈন্য দুর্গ অবরোধ করিল, প্রতিদিন যুদ্ধ চলিতে লাগিল। দুর্গ মধ্যে এক কামান ফাটিয়া যাওয়ায় সুলেমান ও আরও অনেকে নিহত হইলেন। কেদার রায় আহত হইয়া পলায়ন করত ঈশা খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। (আকবরনামা)

"সম্ভবত ১৫৯৮-৯৯ অব্দে মানসিংহের স্থানান্তরে অবস্থানকালে সত্রাজিৎ আবার ভূষণায় প্রবল হইয়া পড়েন।

"কথিত আছে, টোডরমল মুকুন্দরামকে ভূষণার জমিদার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন (১৫৮২ খ্রিঃ)। সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেকের সময় মুকুন্দরাম ও তৎপুত্র সত্রাজিৎ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন (১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু, তৎপরে অভিষেক)। সতীশচন্দ্র আরও বলেন, মুকুন্দরাম কায়স্থ রাজা কেশব সিংহের বংশধর। কেশব সিংহ উত্তররাঢ় হইতে আসিয়া দক্ষিণ-রাঢ়ে আন্দুল-সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। কি সূত্রে মুকুন্দরাম ভূষণায় প্রাধান্য লাভ করেন তাহা স্থির করা কঠিন। তবে তিনি যে সম্রাট আকবরের সময়ে ভূষণা ও নিকটবর্তী ফতেয়াবাদ অঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা সমসাময়িক বিবরণ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। কায়স্থদিগের দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ সমাজ উভয়ই তাহাকে দাবি করে। ফতেয়াবাদের বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের ইনিই প্রতিষ্ঠাতা। এই কার্যের জন্য ইহাকে চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চল হইতে অনেক কুলীন কায়স্থ আনাইতে হইয়াছিল।

"মুকুন্দরামের পুত্র সত্রাজিৎ কখনও মোঘল-পক্ষের সহায়তা, কখনও বিরোধিতা করিয়া বহুকাল ভূষণার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় যে আবদুল লতিফের ভ্রমণকাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন ও বাহারিস্তান নামক পুস্তকের সন্ধান দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, সত্রাজিৎ কিছুদিন মোঘল বাদশাহের বিদ্রোহিতাচরণ করিয়াছিলেন। সুবেদার ইসলাম খাঁ তাহার বিরুদ্ধে ইফ্‌তখর নামক এক সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। ইহাতে সত্রাজিৎ দমেন নাই। তিনি বাদসাহের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু মোঘলেরা নদী পার হইয়া অতর্কিত ভাবে তাহার রাজ্যে প্রবেশ করিল। সত্রাজিৎ তখন বশ্যতা স্বীকার করিয়া ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।[২] ইসলাম খাঁ যখন আঠারবাঁকা ও ভৈরব নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত আলাইপুর হইতে কুচ করিয়া নসরপুর বা নাজিরপুরের দিকে

যাইতেছিলেন তখন পথিমধ্যে ফতেপুর নামক স্থানে সত্রাজিৎ আসিয়া দেখা করিলেন (১৬০৯ খ্রিঃ অব্দ) এবং সুবেদারকে আঠারটি হস্তি উপহার দিলেন। দুই পক্ষে সৌহার্দ স্থাপিত হইলে সত্রাজিৎ মোঘলপক্ষে বিদ্রোহদমনে মন দিলেন। এই সময়ে যিনি ফতেয়াবাদের অধিকারী হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহার নাম মসজিস কুতব। কবি সৈয়দ আলাওলের আত্মপরিচয়ে এই মজলিস কুতবের উল্লেখ আছে। হবিবুল্লা নামক এক সেনাপতি বিদ্রোহী মজলিস কুতবের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন আর রাজা সত্রাজিৎ হইলেন এই সেনাপতির সহায়। মজলিস কুতব ফতেয়াবাদ-দুর্গে অবরুদ্ধ থাকিয়া মুশা খাঁর সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। সাহায্য আসিল কিন্তু মজলিস মোঘল সৈন্যকে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। মোঘল ঐতিহাসিকের বিবরণ হইতে জানা যায়, এই যুদ্ধে সত্রাজিতের সৈনাপত্য ও সাহস মোঘলদিগের বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল। পাঠানপক্ষীয় লোক পুনঃ পুনঃ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মোঘলপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল, কিন্তু সত্রাজিৎ তাহাদিগের সকল উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিলেন। অনেক মারামারির পর মজলিস মুশা খাঁর সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। অবশেষে তিনি দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

"ইহার পর আমরা ভূষণারাজ সত্রাজিৎকে মোঘলপক্ষে কুচবিহারের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধকার্যে ব্যাপৃত দেখিতে পাই। মোঘল-সুবেদার সেখ আলাউদ্দিন ইসলাম খাঁর আহ্বানে তিনি মোঘল-সৈন্যের যোগে কোচ্‌হাজো আক্রমণ করেন। কোচ্‌হাজো বিজিত হইলে তাহার শৌর্যে প্রীত সুবেদার তাহাকেই পাণ্ডু ও গৌহাটির থানাদার বা সীমান্তরক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। তাহার বহু অনুচর এবং ভূষণার অধিপতিস্বরূপ একটা বিশিষ্ট খাতির ছিল। ইহার ফলে তিনি আসামবাসীদিগের বন্ধুত্ব লাভ করেন এবং কোচ-রাজবংশের সহিতও ঘনিষ্ঠতা সম্পাদনে সমর্থ হন। শেখ আলাউদ্দিনের পরবর্তী শাসনকর্তারা তাহাকে অনেকবার ডাকিয়া পাঠাইলেও তিনি সে ডাক গ্রাহ্য করেন না, পূর্বপ্রথামত পেশ্‌কসও পাঠান না। এদিকে তিনি কোচরাজের ভ্রাতা বলিনারায়ণের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং মোঘল-সেনাপতি আবদার সালামের কর্তৃত্বাধীনে সৈন্য প্রেরিত হইলে সত্রাজিৎদের বিশ্বাসঘাতকতায় আহোম নৌবাহিনী কর্তৃক মোঘল-সৈন্যের পরাজয় ঘটে। ইহার ফলে সত্রাজিৎ ধুবড়িতে ধৃত হইয়া ঢাকায় প্রেরিত হন এবং এখানে তাহার মৃত্যুদণ্ড হয় (খ্রিঃ ১৩৩৬ অব্দে বা তাহার নিকটবর্তী সময়ে)।

"ইহার পর ভূষণা কিছুকাল মোঘল-সেনাপতি সংগ্রাম সাহেব 'নাওবা' মহলভুক্ত থাকে। সংগ্রাম পশ্চিমদেশীয় লোক। কেহ বলেন, তাহার আদি বাসস্থান ছিল রাজপুতানায় (আনন্দনাথ রায়)। কেহ বলেন জম্মুতে (সতীশচন্দ্র মিত্র)। তিনি পূর্ববঙ্গে নানা স্থানে বিদ্রোহদমন ও দস্যুদলন কার্যে যশ অর্জন করিয়া শেষে ভূষণা অঞ্চলে ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তখনও তাহাকে সম্রাটের কার্যে আবশ্যকমত নৌ-সৈন্য যোগাইতে হইত। ঠিক কোন সময়ে তিনি ভূষণার আধিপত্য প্রাপ্ত হন ঠিক করা কঠিন। তবে তিনি বেশ প্রতাপের সহিতই শাসনকার্য চালাইতেন। বোধ হয় এখানে তাহার স্থায়ীভাবে বাস করিবার ইচ্ছা ছিল, তাই বৈদ্যসমাজে পুত্র-কন্যার বিবাহ দিয়া 'হাম বৈদ্য' বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বৈদ্যেরা সহজে অজ্ঞাতকুলশীল রাজন্যের সহিত বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হন নাই। কুলজী গ্রন্থের প্রমাণে বুঝিতে পারা যায়, নবাগত সামন্তকে সময়ে সময়ে বল প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। মথুরাপুর গ্রামের সুবিখ্যাত 'দেউল' ইহারই কীর্তি। এই দেউল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের কৃপায় এখন আমরা অনেক কথাই শুনিতেছি।[৩]

"সংগ্রাম বা তাহার পুত্রের প্রতাপ ভূষণা অঞ্চল হইতে কিরূপে গেল ঠিক জানা যায় না। মনে হয়, প্রায় তাহাদের তিরোধানের সময়েই ফতেয়াবাদ হইতে ফৌজদারের আসন

স্থানান্তরিত হইয়া ভূষণায় আসে। ফতেয়াবাদের উপর পদ্মাদেবীর অনুগ্রহ এবং সংগ্রাম সাহ বা তাহার পুত্রের ভূসম্পত্তি শাসন ইহার কারণ হইতে পারে।[৪]

"ইহার পর আমরা সীতারাম রায়ের পিতা উদয়নারায়ণকে ভূষণার ফৌজদারের অধীনে সাজোয়ালরূপে দেখিতে পাই। উদয়নারায়ণ ভূষণা নগরে অদূরে গোপালপুর গ্রামে বাসস্থান স্থির করেন; পরে হরিহরনগর নামক গ্রামে বাস করিতে থাকেন। তিনি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলসম্ভূত ছিলেন। কাটোয়ার নিকট কোন গ্রামে তিনি দয়াময়ী নাম্নী এক ঘোষ-দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। সীতারাম এই বিবাহের ফল।

"সীতারাম সম্বন্ধে অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। তবু, বর্তমান প্রবন্ধে কিছু না বলিলে ভূষণার কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তিনি প্রথম বয়সে কিছু সংস্কৃত, ফার্সি ও উর্দ্দু শিখিয়াছিলেন কিন্তু অস্ত্রশিক্ষায়ই তাহার মনোযোগ ছিল অধিক। তাহার পিতা ঢাকায় রাজদরবারে নিযুক্ত থাকার সময়ে তিনিও সেখানে যাতায়াত করিতেন। পরে উদয়নারায়ণ ভূষণার সাজোয়াল হইয়া আসিলে, তিনিও দস্যুদমনের কার্যে ভূষণা অঞ্চলে আসিলেন। এই কার্যে সাফল্যলাভ করিয়া সীতারাম নবাব সবকার হইতে জায়গিরও লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পিতার ন্যায় নবাব সরকারে চাকরি করিয়াই জীবনক্ষেপ করিবার লোক ছিলেন না। তাহার অস্ত্রবিদ্যা নিজের কার্যে ভালমত লাগাইতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। নবাবপক্ষে নিযুক্ত হইয়া করিম খাঁ পাঠানের বিদ্রোহদমনই তাহার উন্নতির সূত্রপাত। সে সময়ে দস্যুবৃত্তি দেশে বিশেষভাবে প্রচলিত। সীতারাম জায়গির ও সেই সঙ্গে আরও দস্যুদলনের ভার পাইলেন। তাহার বীব সঙ্গীও অনেক জুটিয়া গেল। মণিরাম রায় ও রামরূপ বা মেনাহাতি ইহাদের মধ্যে প্রধান। দস্যুদলনে তিনি ক্রমেই অধিকতর কৃতকার্যতা দেখাইতে লাগিলেন; অন্যত্র বাসস্থান স্থাপন করিলেও সমৃদ্ধ ভূষণা নগরীতে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। তাহার খ্যাতি বাড়িতে লাগিল ও রাজা উপাধি লাভ হইল। তিনি দক্ষিণ-বাংলা আবাদে আনিবার সনন্দ পাইলেন এবং বর্তমান মাগুরা মহকুমায় অবস্থিত মহম্মদপুর নগর স্থাপন করিলেন। হিন্দুর এই নূতন রাজধানীর মুসলমানী নাম হইল কেন? এ-সম্বন্ধে নানা প্রবাদ আছে। খুব সম্ভব, তখনও তিনি মোঘলের বশ্যতা অস্বীকার করেন নাই, মোঘল শাসনকর্তাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্যই নিজ নগরের মুসলমানী নাম দিয়াছিলেন। তাহার অধীন কর্মচারীদিগের মধ্যেও যোগ্য মুসলমানের অভাব ছিল না। মৃণ্ময় দুর্গ, সুবৃহৎ মনোরম জলাশয়, সুন্দর দেবমন্দির ইত্যাদি দ্বারা মহম্মদপুর ভূষিত হইয়াছিল। সীতারামের কীর্তি অতীতের অনেক ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া এখন পর্যন্ত দর্শকের চিত্ত বিনোদন করে। নানাস্থান হইতে রাজসরকারে কর্ম ও বাণিজ্যাদি উপলক্ষে লোক আসিয়া মহম্মদপুরকে ক্রমে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। এই সময়ে নানাস্থানে রাজা-প্রজায় অসদ্ভাব—রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সীতারামকে রাজ্যবিস্তারে সহায়তা করে। জমিদারিতে বিশৃঙ্খলা?—সীতারাম অমনি শৃঙ্খলার নামে গ্রাস করিতে প্রস্তুত। অন্য জমিদারের প্রজা বিদ্রোহী? সীতারাম সেখানে সেই প্রজাকে নিজের প্রজায় পরিণত করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। সীতারামের জমিদারি ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এক সময়ে মুকুন্দরাম ও সত্রাজিতের প্রতাপে ভূষণা অঞ্চল কম্পিত হইত। সীতারাম সত্রাজিতের বৃদ্ধ প্রপৌত্রগণকে নিজের এলাকাভুক্ত করিলেন। নলডাঙ্গার রাজা তাহার জমিদারির পূর্বভাগ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

"সীতারামের সকল কথা বিস্তৃতরূপে লিখিবার স্থান এ নয়। উত্তরে পদ্মা পর্যন্ত অনেক পরগণা—নসিবসাহী, নসরৎসাহী, মহিমাসাহী, বেলগাছি প্রভৃতি এবং সম্ভবত পদ্মার উত্তরেও কিছু কিছু তিনি ক্রমে হস্তগত করেন। দক্ষিণেও তাহার রাজা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে—কতক গায়ের জোরে, কতক আবাদী সনন্দের বলে। উজানীর রাজাদের অনেক স্থানে তিনি অধিকার করিয়া লন।

"সীতারাম কেবল রাজ্যবিস্তারই করিতেন না, তিনি নিজের রাজ্যে শৃঙ্খলাস্থাপনের চেষ্টা করিতেন, পাণ্ডিত্যের সমাদর ও সাহায্য করিতেন, বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেন, সমাজসংস্কারেও অমনোযোগী ছিলেন না।

"মোঘল সুবেদারগণের দুর্বলতাই সীতারামের প্রতাপ বহুদিন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। ক্রমে ভূষণার ফৌজদারের সহিত তাহার বিবাদ বাধিল। বারাসিয়া নদীর কূলে এক ক্ষুদ্র যুদ্ধে ফৌজদার আবুতোরাপ নিহত হইলে সীতারাম ভূষণা অধিকার করিলেন। ভূষণার তখন অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি। নানারূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য, কাগজ, গালা, বাসনপত্র তুলা ইত্যাদির জন্য ভূষণা বিখ্যাত ছিল। কাগজ ও গালার কাজ এখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। সাতৈরের পাটির ন্যায় সূক্ষ্ম পাটি বোধ হয় এখনও অন্য কোথাও প্রস্তুত হয় না। সৈয়দপুরের প্রকাণ্ড পান্‌সি নৌকা দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় একটা দর্শনীয় বিষয় ছিল।

"আবুতোরাপ নিহত হইলে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বক্স আলি খাঁ নামক এক ব্যক্তি ভূষণায় ফৌজদার হইয়া আসিলেন। নিকটবর্তী জমিদারদিগের উপর সীতারামকে দমন করিবার জন্য আদেশ প্রেরিত হইল। নবাবের হুকুম—জমিদারেরা সীতারামের উপর বেঁকিয়া দাঁড়াইলেন। সংগ্রাম সিংহ, দয়ারাম প্রভৃতি হিন্দু সৈন্যাধ্যক্ষেরা বক্স আলির সঙ্গে আসিয়া সীতারাম দমনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে সীতারাম জয়লাভ করিলেন, কিন্তু তাহার ভূষণা-দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। দয়ারাম মহম্মদপুরের দিকে ছুটিলেন। সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতির গুপ্তহত্যার কথা এ অঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ। ভূষণায় অবস্থান নিরাপদ নহে দেখিয়া সীতারাম মহম্মদপুরে পলায়নকরত তাহার কতক পরিজন স্থানান্তরিত করিলেন। শেষে যুদ্ধে আহত হইয়া বন্দি হইলেন। মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হওয়ার পর তাহার মৃত্যু হয়। কিরূপে মৃত্যু হয় সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

"এই উপলক্ষে নাটোরের রামজীবন ও রঘুনন্দন বিশেষভাবে পুরস্কৃত হন; দয়ারামেরও জমিদারি লাভ ঘটে।

"রঘুনন্দন নবাব-সরকারে কার্য করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিলেন, তাহারই প্রভাবে ভূষণা জমিদারি তাহার ভ্রাতা রামজীবনের সহিত বন্দোবস্ত হয়। জমিদারিটি তখন প্রকাণ্ড ছিল। অনেক পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ নবাবের সময় যখন পূর্বতন সরকারগুলির পরিবর্তে তেরটি চাক্‌লার একজন করিয়া ফৌজদার ও তাহার অধীন নানা কর্মচারী ছিলেন। সীতারামের পতনের পরও ভূষণায় ফৌজদার রহিলেন কিন্তু তাহার অধীনস্থ অনেক স্থান নাটোরের জমিদারিভুক্ত হইয়া গেল। রামজীবন যখন ভূষণা জমিদারির সনন্দ প্রাপ্ত হন, তখন দিল্লিতে সম্রাট ফাররোক্‌শের। সনন্দ তাহারই মোহরাঙ্কিত ছিল।

"রঘুনন্দন হইতেই নাটোর জমিদারি অভ্যুদয়। সামান্য অবস্থা হইতে নিজের প্রতিভাবলে রঘুনন্দন বড় হইয়া উঠেন এবং ভ্রাতা রামজীবনের নামে বিস্তীর্ণ জমিদারি অর্জন করেন। দীঘাপতিয়া রাজবংশের পূর্বপুরুষ প্রতিভাশালী দয়ারাম রায় ছিলেন রঘুনন্দনের দক্ষিণহস্তস্বরূপ, আর জমিদারি পরিচালনে সুদক্ষ ছিলেন রামজীবন।

"রামজীবন নাটোর জমিদারি বৃদ্ধিই করিয়াছিলেন। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে তাহার মৃত্যুর পর কিছুকাল দয়ারাম জমিদারির কাজকর্ম চালান, পরে রামজীবনের পৌত্র রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার উপরই জমিদারির ভার পড়ে। তখনকার জমিদারি পরিচালনা এখনকার মত ছিল না। জমিদারেরা পুলিশের তত্ত্বাবধান করিতেন, ফৌজদারি ও দেওয়ানি মোকদ্দমার বিচার করিতেন। রামকান্ত বিষয়কার্য অপেক্ষা ধর্মকার্যেই অধিক অনুরাগী ছিলেন। অল্পবয়সে তাহার মৃত্যু হইলে জমিদারি তাহার পত্নী প্রাতঃস্মরণীয়া রানি ভবানীর হস্তে আসে। রানি যেমন বিষয়কর্মে, তেমনি দেবার্চনা, দান-ধন্যাদি কার্যে মনোযোগ দিতেন। কিন্তু ভূষণার জমিদারিকে

যে খাজনা যোগাইতে হইত, তাহাতে তাহার ন্যায় দানশীলা রমণীর পক্ষে ইহার রক্ষা অনেক সময়েই দুষ্কর হইয়া পড়িত। ইংরেজ শাসনের প্রথম আমলের কাগজপত্র দেখা যায় ভূষণা জমিদারি রাজস্ব আদায়ের জন্য সময়ে সময়ে ইজারা দেওয়া হইত। তখন ভূষণায় আদালত ছিল এবং ইহা রাজসাহীর সুপারভাইসরের তত্ত্বাবধানে চলিত। রাজসাহীর সুপারভাইসর থাকিতেন নাটোরে। তাহার উপরে ছিল মুর্শিদাবাদে রাজস্ব-কৌন্সিল। ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভের অল্পদিন পরই (১৭৭০-১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে) ভূষণা হইতে আদালত উঠিয়া যায়, কিন্তু তখনও রাজসাহীর সুপারভাইসরের এক সহকারি সাহেব ভূষণায় থাকিতেন। রানি ভবানীর সময় রাজস্ব আদায়ের জন্য ভূষণার জমিদারি যে-সকল ইজারাদারের হস্তে দেওয়া হইত তাহাদের মধ্যে নড়াইলের জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালীশঙ্কর রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সরকারি কাগজপত্র হইতে মনে হয় ভূষণায় যে অত্যধিক পরিমাণে কর ধার্য হইয়াছিল তাহা পুনঃ পুনঃ ইজারা বন্দোবস্ত সত্ত্বেও আদায় করা যাইত না। কালেক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা হওয়ার পর ভূষণার জন্য একজন অ্যাসিস্টান্ট কালেক্টর থাকিতেন। ক্রমে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ভূষণা যশোহর জেলাভুক্ত হইল এবং রানি ভবানীর দত্তক পুত্র সাধক রামকৃষ্ণের সময়ে রাজস্বের দায়ে ইহার পরগণাগুলি খণ্ডে খণ্ডে বিক্রিত হইয়া অন্য জমিদারের হস্তে চলিয়া গেল। নাটোর রাজবংশের হাতে থাকিল কেবল রানি ভবানীকৃত দেবত্র গ্রামগুলি। কালের প্রভাবে সেই প্রাচীন স্থানীয় রাজধানী ইহার দুর্গসমেত জঙ্গলে পরিণত হইয়া গেল।

প্রবাসী ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ

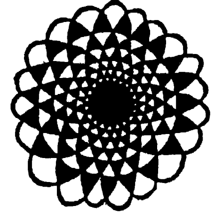
---

১. দিগ্বিজয়প্রকাশ খুব প্রাচীন বা প্রামাণিক গ্রন্থ না হইলেও প্রাচীন ঘটনাবলীর স্মৃতির উপর লিখিত এবং হিন্দুদিগের এই শ্রেণির গ্রন্থের অভাব ইহাকে মূল্যবান করিয়া রাখিয়াছে।

২. এই প্রসঙ্গে মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত Journal of Indian History, Dec. 1932 তে বাহারিস্তানের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩. ১৩৪০ চৈত্র সংখ্যার 'প্রবাসী' দ্রষ্টব্য।

৪. আনন্দনাথ রায় তাহার ফরিদপুরের ইতিহাসে সম্রাট আওরংজেবের সময়ে বঙ্গদেশে সংগ্রাম সাহের নানা কীর্তির উল্লেখ করিয়াছেন, আবার যশোহর কালেক্টরির তায়দাদে ১৬২৬ ও ১৭৪১ (১৬৪১?) খ্রিস্টাব্দে সংগ্রাম সাহ কর্তৃক ভূমিদানের কথাও লিখিয়াছেন। ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীর সম্রাট এবং সত্রাজিৎ ভূষণার রাজা। সে সময়ে সংগ্রাম সাহের ভূমিদান কিরূপে সম্ভব হয়? ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে শাজাহান বাদসাহর মৃত্যু হয়।



প্রাকৃতিক বিপর্যয়

ফরিদপুর খরাপ্রবণ অঞ্চল নয়। সময় মত বৃষ্টি না হলে ফসলের ক্ষতি হত ঠিকই ; বৃষ্টির প্রয়োজন হত শীতে বোনা ফসল পাকার সময়ে ফেব্রুয়ারিতে, বা মার্চে নতুন ফসল বোনার সময়। আবার সেই ফসল পাকার আগে সেপ্টেম্বর মাসে। অবশ্য একাজটা অনেক সময় সমাধা করত বড় বড় নদীবাহিত জলরাশির প্রবাহ। মাটিকে যেমন দীর্ঘকাল জলসিক্ত রাখত, তেমনি পলি পড়ে বাড়ত জমির উর্বরতা। কোন আঞ্চলিক নদীবাহিত জলরাশি বড় বড় নদী প্রবাহকে সমৃদ্ধ করত না। বরং সেসব গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বাহিত জলে পূর্ণ থাকত।

তবুও ফরিদপুরের ইতিহাসে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের চিত্রধারা আছে ১৮৬৬, ১৮৯৬, ১৯০৬ এবং ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষে মানুষের খাদ্য পরিমাণ পর্যাপ্ত ছিল না। অনেকে, বিশেস করে দরিদ্র মানুষেরাই ইলিশ মাছের ওপর নির্ভর করে বেঁচে ছিল। ১৮৯৬ এবং ১৯০৬ সালের দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ ছিল ফসলের হ্রাস পরিমাণ উৎপাদন।

সব থেকে মারাত্মক আকারে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ১৯৪৩ সালে। না খেতে পাওয়া মানুষের মধ্যে বৃহৎ অংশের মৃত্যু হয়েছিল কলেরা ও বসন্তে (পক্স)। বহু মানুষ আত্মজনকে ফেলে রেখে দূরবর্তী অঞ্চলে চলে গিয়েছিল। নারী ও শিশুর মৃত্যুহার ছিল সবথেকে বেশি। একমাত্র বাংলাদেশেই ২০ থেকে ২৫ লাখ মানুষ মারা পড়ে। তার মধ্যে ফরিদপুরে মারা যায় ৬%।

পোকামাকড়ের আক্রমণে ফসল ও গাছপালার ক্ষতি লেগে থাকত প্রতি বছর। তবে এই ক্ষতি সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে। বিস্তৃত খেত জুড়ে আক্রমণ নিয়মিত ঘটনায় দাঁড়িয়েছিল। এইসব পোকামাকড়ের অন্যতম ছিল ১) গাইছা ফড়িং-এক বা দেড় ইঞ্চি লম্বা; ২) মরিচা ফড়িং এবং ৩) বর্ষা পোকা—এক ইঞ্চি লম্বা. ধূসর রঙের এই পোকার শরীরটা বেশ নরম ধরনের। দিনের বেলায মাটিতে থাকে, রাতে শস্যদানা নষ্ট করে বিশ্রিভাবে। চাষের জমির কাছে জলাজমিতে থাকা এই পোকা ফসল পাকার সময় জমিতে এসে হাজির হয়। বাঙ্গা পোকার আক্রমণের লক্ষ হল আখ খেত। ধূসর রঙের এই পোকা আধ ইঞ্চি লম্বা। মাথাটা বেশ চকচকে। গাছ একটু বড় হলেই এদের আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। মাঝে মাঝে পঙ্গপালেরও আক্রমণ ঘটে। ১৮৬২ সালে মাত্র একদিন পঙ্গপালের আক্রমণে ফসলের ক্ষতি হয়েছিল ব্যাপক। দীর্ঘদিন এই রকম পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে ফরিদপুর ব্যাপক সংকটে পড়েনি। গাইছা ফড়িং মারার জন্য কৃষিজীবীরা একটা কৌশল অবলম্বন করত। তারা গাছের ডালপালা কেটে জমির মধ্যে পুতে রাখত। সেই ডালপালায় গিয়ে বসত গাইছা ফড়িং। আর কাকের আক্রমণে মারা পড়ত তারা। মরিচা ফড়িং তাড়াতে চাষীরা একটা অদ্ভুত উপায় নিত। একটা লম্বা বাস দুজনে ধরে মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যেত। যন্ত্রণায় অস্থির ফড়িং উড়ে গিয়ে পড়ত পাশের কোন জমিতে। কিন্তু বর্ষা পোকার আক্রমণ থেকে ফসল বাঁচাবার কোন উপায় ছিল না। কৃষিজীবীরা চেষ্টা করত যত তাড়াতাড়ি ফসল পেকে যায়, তত তাড়াতাড়ি কেটে নিয়ে ঘরে তুলতে পারে। আখের খেতে বাঙ্গাপোকার আক্রমণে গাছের গায়ে লাল দাগ দেখা দেয়। ওই জায়গা চেঁচে পোকা ফেলে দিলে গাছের কোন ক্ষতি হয় না।

বন্যা ঃ

পদ্মা ও চন্দনা নদীর জল বাড়লে সেই জল ঢুকে পড়ত জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে। এই জল গোটা জেলায় উপছে উঠলেও, ফসলের তেমন কোন ক্ষতি হত না। বন্যা হত অতিরিক্ত বর্ষার বাড়তি জলে। জলে প্লাবিত হত যাবতীয় বিল অঞ্চল। ১৭৮৭ খ্রিঃ, ১৮২৪ খ্রিঃ, ১৮৩৮ খ্রিঃ এবং ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের বন্যা ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করেছিল। শেষ বছরে ফসলের ক্ষতির পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকৃত কম। সে সময়ে জেলায় কোন বাঁধ ছিল না। নীলকররা চন্দনা নদীরেখা থেকে অনেক খাল কেটেছিল। এর ফলে চন্দনার বাড়তি জল প্রবাহিত হত ওইসব খালের মধ্য দিয়ে। ফলে বেঁচে যেত জমিতে চাষ করা নীল। ফসলকে রক্ষা করতে ধীরে ধীরে বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়। ফসল রক্ষার একটি সুব্যবস্থাও গড়ে ওঠে। চন্দনার বাড়তি জলে ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পায়। কিন্তু নীলচাষ বন্ধের পর সমস্ত নদীমুখ মুক্ত হয়ে পড়ায়, বন্যার সম্ভাবনা প্রকট হয়ে ওঠে। সে সময়ে কালেক্টর সুপারিশ করেন, ফসল বাঁচাতে হলে অবিলম্বে অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ জরুরি। পদ্মার প্রবেশ মুখে মজুরদিয়ার খাল এবং বেলগাছিয়া পুলিশ সার্কেলের অন্তর্গত রাজাপুর ধলায় বাঁধ নির্মাণের ওপর তিনি গুরুত্ব দেন। এর ফলে রক্ষা পাবে আমন চাষ।

১৮৭০-৭১ সালের বন্যায় নিচু জমির সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চালের দাম বিগত বছরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম থাকায় মানুষের দুর্ভোগ বাড়েনি। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী বাকরগঞ্জ, কুমিল্লা, বগুড়া ও ময়মনসিংহ থেকে চালের রপ্তানি থাকায় জেলার মানুষ দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে যায়।

বন্যা মারাত্মক প্রভাব ছড়ায় ১৯৫৪ সালে। গোটা ফরিদপুর শহর চলে যায় জলের নিচে। ফরিদপুর শহরসহ, অন্যান্য মহকুমা শহর ও মফস্বল এলাকায় বোটে বা নৌকোয় করে খাদ্যদ্রব্য পাঠান হয়। মাদারিপুর ও গোপালগঞ্জ ছিল গভীর জলাকীর্ণ। সরকারি ব্যাপক অনুদানে রক্ষা পায় মানুষের প্রাণ। এবারের বন্যায় মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা এবং যমুনার জলরাশি জলসীমা অতিক্রম করায় বন্যার আকারও হয়েছিল মারাত্মক।

বন্যা ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আসে ১৯৫৮ সালে। রাস্তা, রেলপথ, ব্রিজ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বোয়ালমারি ও ভাটিয়ার মধ্যে এবং রাজবাড়ি থেকে ফরিদপুরের মধ্যে রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমনকি যাবতীয় সড়কপথ পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। খুব দ্রুত সমগ্র পরিস্থিতি মানুষের জীবন ধারনের প্রতিকূল হয়ে ওঠে। জলপরিবেষ্টিত অঞ্চলে উঁচু স্থানগুলি দ্বীপের আকার নেয়। বিপন্ন মানুষের প্রাণরক্ষার একমাত্র অবলম্বন ছিল ওইসব সাময়িক দ্বীপসমষ্টি। স্কুল কলেজ সব বন্ধ হয়ে যায়। ফরিদপুর শহরের বড় বড় রাস্তায় নৌকা চলাচল ছিল অব্যাহত। ফরিদপুর শহরে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বলে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। বহু জায়গায় মানুষ মাচা বেঁধে, তার ওপর সাময়িক আশ্রয় নিয়ে প্রাণরক্ষা করে। রাজবাড়ি ও গোয়ালন্দ এলাকার বিরাট এলাকা প্লাবিত হওয়ায়, সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যায়। মাদারিপুর শহর প্রায় জলের নিচে ডুবে ছিল। মাদারিপুর ও গোপালগঞ্জের সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যায়।

১৯৬৮ সালে বর্ষার প্রারম্ভে মেঘনা, পদ্মা, আরিয়লখাঁ, মধুমতী এবং তাদের শাখা নদীগুলির জলরাশি এমন জলপ্লাবন শুরু করে, যার ফলে ফরিদপুর জেলার ২৪টি থানার মধ্যে ২১টি প্রায় ভেসে গিয়েছিল। ব্যাপক ক্ষতি হয় জানজিরা, নরিয়া, শিবচর, ভেদারগঞ্জ, ফরিদপুর, সদরপুর এবং চরভদ্রাসন থানার। এক লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ৪০% আউস, আমন ও পাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইসব থানার ৪ হাজার একর জমি নদী জলস্রোতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ৫ হাজার মানুষ গৃহহারা হয়ে পড়ে। বেশির ভাগ মানুষ আশ্রয় নেয় মাচানের ওপর। জানজিরা থানার ৩৮টি গ্রাম ডুবে যাওয়ায় ৩০ হাজার মানুষ বিপন্ন হয়। সদরপুর থানার কাটাখালিতে বাঁধ ভেঙে বিস্তৃত এলাকায় নদীর জল ঢুকে পড়ে।

মাদারিপুর মহকুমার পরিস্থিতি ছিল জটিল। মেঘনা ও আরিয়লখাঁ বাহিত বিপুল জলরাশি মহকুমার ৯টি থানার ৩০০ বর্গ মাইল এলাকা প্লাবিত করে। ফলে প্রায় ২ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১,৫০০ বাড়ি ভেঙে পড়ে এবং ৫২ হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হয়। ৩ জন মহিলা সহ ৫ জনের মৃত্যু হয়। ৪৬,২৮৩ বাসগৃহ এবং ৫ হাজার কাঁচা ঘর ভেঙে যায়। ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১৪,৮৭,০৭৫ টাকা।

সব থেকে মারাত্মক রূপ নেয় ১৯৭০ সালের বন্যা। মানুষের সম্পত্তি, ফসল ও প্রাণহানি ঘটেছিল ব্যাপক। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ। ১,২০০ বর্গ মাইল এলাকার ফসল চলে যায় জলের নিচে। বন্যায় জলপ্রবাহে ৮ জন মানুষ মারা যায়। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মাদারিপুর মহকুমায়। পদ্মা ও আরিয়লখাঁর জলবৃদ্ধিতে মহকুমার সাত লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। নয়টি থানার ৪০০ বর্গ মাইল এলাকা পড়ে বন্যার কবলে। পালঙ থানার সোমেশ্বর, শৈলপাড়া, চিকুন্দি, রুদ্রকের, তালেশ্বর, অনজারা ও বিনোদপুর ইউনিয়নে ক্ষতির পরিমাণ ছিল সবথেকে বেশি। ডানজিরা, নরিয়া ও ভেদারগঞ্জ থানার অবস্থাও ছিল শোচনীয়। আউস ৫০%, আমন ৩৫%, পাট ২০% এবং আখ ১৫% নষ্ট হয়ে যায়। ভেদারগঞ্জের ১১টি থানায় কাউন্সিল সড়ক সহ ৩১টি সড়ক ভেঙে যায়। চর লোহাগঞ্জ, স্বরূপবাবুর চর, দেশেনগিরি কান্দি, কিরদার ব্যাপক বিনষ্টির মূলে ছিল পদ্মার তীব্র জলস্রোত। নরিয়া থানার কয়েকশ পরিবার বাসস্থান ছেড়ে চলে যায় নদী ভাঙনের কারণে। পানীয় জলের সংকট ছিল তীব্র।

ঘূর্ণিঝড় ঃ

ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে জেলায় বিপর্যয় ঘটেছে একাধিকবার। মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণও কম হয়নি। ১৯১২ সালের ১ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড়ে একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল। খুলনা জেলার ওপর দিয়ে এসে গোপালগঞ্জ ও মকসুদপুর থানা হয়ে ফরিদপুর শহরে পৌঁছায়। তারপর উত্তরদিকে পদ্মা পেরিয়ে ঢাকায় ঢোকে। ঝড়ের প্রবাহ পথ ছিল মাত্র ১০০ গজ ব্যাপী। ঝড়ের গতিবেগ তীব্র ও ভয়াল হলেও এক মিনিটের বেশি থাকেনি। অনেক বাড়ির ছাদ থেকে কারসেডের টিন উড়ে গিয়ে বেশ দূরত্বেই পড়ে। জেলখানার পাঁচিল ভেঙে পুকুরে পড়ে। ময়দান পেরিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়। কিছু কিছু বাধা পায় বড় গাছে জজ কোর্টের সামনে। সেটেলমেন্ট অফিসের তিনজন কর্মী মারা যায়। আহত হয় প্রায় ৫০ জন। আহতদের একজন পরে মারা যায়।

ঘূর্ণিঝড় মারাত্মকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ১৯১৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। এইদিন সারারাত ধরে ছিল ঝড়ের দাপট। ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তিস্থল ছিল বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল। সকালে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে সুন্দরবনের উপকূলভাগে। খুলনা জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত ঝড়, যশোহর ও বাকরগঞ্জের অংশ বিশেষের ওপর এসে যায়। তারপর ফরিদপুর ও ঢাকা জেলা হয়ে কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ পেরিয়ে আসামের খাসিয়া পার্বত্য এলাকায় চলে যায়। যে এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেখানে ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিপুল। গাছপালা ভেঙে ও বাড়িঘর ভেঙে মারা পড়ে অনেকেই। ৩ হাজারেরও বেশি মানুষ এবং ৪০ হাজার গবাদি পশু মারা যায়। নদীপথ, রেল, সড়ক পরিবহন বন্ধ হয়ে পড়ে। টেলিগ্রাম ও পোস্টাল সংযোগ ছিল বিচ্ছিন্ন। নদীবক্ষে নষ্ট হয় বহু নৌকা। এসব বিধ্বংসী বিপর্যয় ছিল সাময়িক। দ্রুত সমগ্র অঞ্চলে চাষআবাদ শুরু হয়ে যায়। উৎপাদনের পরিমাণ হয়ে ওঠে পর্যাপ্ত। বিপর্যস্ত মানুষদের জন্য সরকারি সাহায্য ছিল পর্যাপ্ত। বার্মা থেকে আনা চাল বিক্রি করা হয় কম দামে। কাপড় বিতরণ করা হয়। বিনা শর্তে সরকার অর্থ সাহায্য করেছিল।

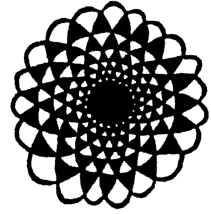
মর্মান্তিক ঘটনায় আবর্তিত ১৯৬১ সালের ১৮ মার্চের ঘূর্ণিঝড়। ঢাকা, ফরিদপুর ময়মনসিংহ, রংপুর এবং যশোহরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত ঝড়ে মারা পড়ে ২৭৬ জন। গোয়ালন্দ থেকে ২ মাইল দূরবর্তী উজানচরের ওপর আঘাত ছিল প্রবল। তিন মাইল দীর্ঘ

এবং ১০০ গজ চওড়া এলাকায় ঝড়ের আঘাতে ২ জন মারা পড়ে, আহত হয় ১৪৩ জন। ৩৮০টি কাঁচা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৩৫-৫৫ মাইল। কোতওয়ালি থানার উত্তর চ্যানেল গ্রামে ২৯৪টি বাড়ির আংশিক ক্ষতি, ৪০টি সম্পূর্ণ ধ্বংস, ৮০ জন মানুষ আংশিক আহত এবং ২০টি নৌকা নষ্ট হয়। চরভদ্রাসন থানার চর ঝাউকান্দিতে ধ্বংসস্তূপের নিচে ৮৮টি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। আহতের সংখ্যা ছিল ৬০০। ১৫ জন নিখোঁজ। ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির সংখ্যা ছিল ৪০০। ৩০০টি গবাদি পশু নিহত হয়। চরজোয়ার এবং নইনাজর বিঘার ৪৭ জন মারা যায়। চরের বালিতে সমাধিলাভ করে বেশ কিছু মানুষ।

১৯৬৬ সালের ৩১ অক্টোবরের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাজবাড়ি, মাদারিপুর ও গোপালগঞ্জ মহকুমা। কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ কম ছিল না। আমন চাষ, আখ, কলা, নানা রকম সবজি ও ফলের গাছ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। ১৯৬৭ সালের ১৬ এপ্রিল নরিয়া, ভেদারগঞ্জ এবং ঘোষায়েরহাটের ক্ষতি হয় ব্যাপক। আউস, আমন, পাট, লঙ্কা, কলা ও ফল গাছের ক্ষতি হয়। বহু মানুষ মারা যায়। সম্পত্তিও বিনষ্ট হয়েছিল।

১৯৬৮ সালের টর্নেডোতে মাদারিপুর মহকুমার নরিয়া, জানজিরা ও ভেদারগঞ্জ থানায় ১১৮ জন মারা যায়। আহত হয়েছিল ১,০৪৫ জন। ১১টি ইউনিয়নের ৩৭টি গ্রামের ১৫,০৯৩ জন হয় ক্ষতিগ্রস্ত। একবছরের মধ্যে দুবার একই অঞ্চল পড়েছিল ঝড়ের কবলে। ১৯ বর্গ মাইল এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ৪৬১৫টি বাড়ি সম্পূর্ণ এবং ১,৪৩৫টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

নদনদী



বহুকাল যাবৎই ভারি মালবাহী নৌকা সারা বছর ধরে পদ্মা বা গঙ্গা, আরিয়লখাঁ, মধুমতী এবং বারাসিয়া নদীতে চলাচল করছে। একসময় একশ মনেরও বেশি মাল নিয়ে গেছে এইসব নৌকা। বর্ষায় সারা জেলা প্রায় প্লাবিত হয়ে থাকে। এই সময়ে সব নদীপথেই ভারি মাল নিয়ে নৌকা চলাচলের কোন অসুবিধা ঘটে না। অসংখ্য নদীরেখা বা খাল ছড়িয়ে আছে সারা জেলায়। শীত মরশুমে এইসব নদীর বেশিরভাগই যায় শুকিয়ে। গরমের সময়ে বর্ষা শুরু হলেই নৌকা চলাচলে কোন অসুবিধা ঘটে না।

গঙ্গা/পদ্মা ঃ

জেলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গা বা পদ্মা। নদীটি সরাসবি জেলার মধ্যে কোথাও প্রবেশ করেনি। মিজিডাঙা গ্রামের কাছে জেলাকে স্পর্শ করে গোয়ালন্দ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে স্বাভাবিকভাবে। এখানে ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখা যমুনা এসে মিশেছে পদ্মায়। মিলিত স্রোত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে জেলার পূর্ব সীমান্ত বরাবর এগিয়ে গেছে। গোয়ালন্দের যেখানে দুটি নদী মিশিছে, সেখানে নদীর স্রোতধারা অত্যন্ত প্রবল। মিশ্রিত জলধারায় ঘূর্ণি স্রোত বা ঘূর্ণিজলের প্রাবল্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। আসাম থেকে প্রবাহিত অন্যতম বেগবতী ও শক্তিশালী নদীপথে সেই সময়ে নৌ চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়ে। পণ্যবাহী নৌযান গোয়ালন্দে অপেক্ষা করে—কারণ তখন নদীপথ অতিক্রমের প্রয়াস খুবই বিপদজনক। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দেব তীব্র বর্ষণেব পর নদী এমন মারাত্মক হয়ে উঠেছিল যে, গুণ টেনেও যমুনা পথে এগোবার উপায় ছিল না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ফরিদপুর ও পাবনা শহরের মধ্যে পলি জমতে থাকে। ফলে নদীস্রোত গরাই নদীপথে প্রবাহিত হতে শুরু করে। কিন্তু নদী সাধারণত উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। আর ফরিদপুর নদীরেখায় পূর্ব ও পশ্চিমে এমন স্থানে অবস্থিত যে তার ফলে জেলার কোনরকম ক্ষতি হয়নি। এখানে সারা বছর ধরে পদ্মা পরিবহন উপযোগী।

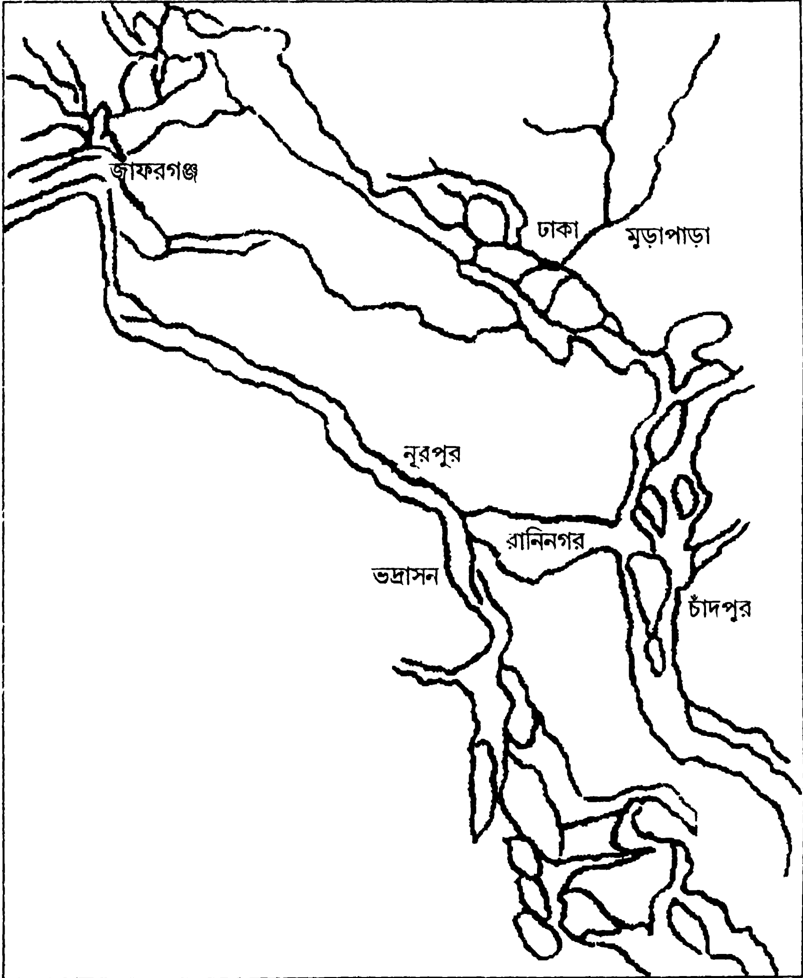
আরিয়লখাঁ ঃ

পদ্মার প্রধান শাখা আরিয়লখাঁ প্রবাহপথের উত্তরাংশে সাধারণত ভুবনেশ্বর নামে পরিচিত। ফরিদপুর শহর থেকে কয়েক মাইল এগিয়ে যাওয়ার পর চর মুকুন্দ নামে একটি বড় দ্বীপের সৃষ্টি করে। নদীটি প্রথমে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত। তারপর দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে মাদারিপুরের কাছে জেলার দক্ষিণ সীমান্ত পেরিয়ে বাকরগঞ্জে প্রবেশ করেছে। ঠিক এই স্থানে পশ্চিমদিক থেকে এসে কুমার নদী মিশেছে আরিয়লখাঁ-এ। আরিয়লখাঁ নদীপথে সারাবছর পণ্যবাহী বড় বড় নৌকা চলাচল করতে পারে। নদীর জলসীমা বর্ষায় বেড়ে যায়। আরিয়লখাঁর একটি শাখানদী হল নীলাখি খাল। কুমার নদী থেকে বেরিয়ে দু-তিন মাইল পশ্চিম থেকে পূর্বে এগিয়ে যাওয়ার পর নীলাখি গ্রামের কাছে মিশেছে আরিয়লখাঁ-এ। এই স্রোতধারা শুকনো মরশুমে যতটা চওড়া থাকে, বর্ষাকালে তার দ্বিগুণ হয়ে যায়। ছোট ছোট নৌকা সারা বছর ধরে চলাচল করে এই নদীপথে। আরিয়লখাঁর অপর শাখা

নদী কাচিকাটা খাল পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত। বছরে মাত্র পাঁচমাস এই নদীপথ নৌচলাচলের উপযোগী থাকে।

এই নদী সম্পর্কে বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী লিখেছেন* ঃ

"আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে। কিন্তু তাহার বিস্তীর্ণ বালুকাতটে হয়তো লুকানো আছে কত পুরনো দিনের অজানা কাহিনী ; সুদূর অতীতের বিস্মৃতি অন্ধকার হইতে হয়তো ভাসিয়া আসিবে তাহার তরঙ্গ-কল্লোল। এ পরিবর্তন কখনো ঘটিয়াছে অকস্মাৎ ; আবার কখনও চলিয়াছে শত শত বর্ষব্যাপী মন্থর গতিতে। ফরিদপুর জেলায় মাদারিপুরের প্রান্তবর্তিনী আরিয়লখাঁ নদী এমন একটি পরিবর্তনের স্মৃতিবিজড়িত।

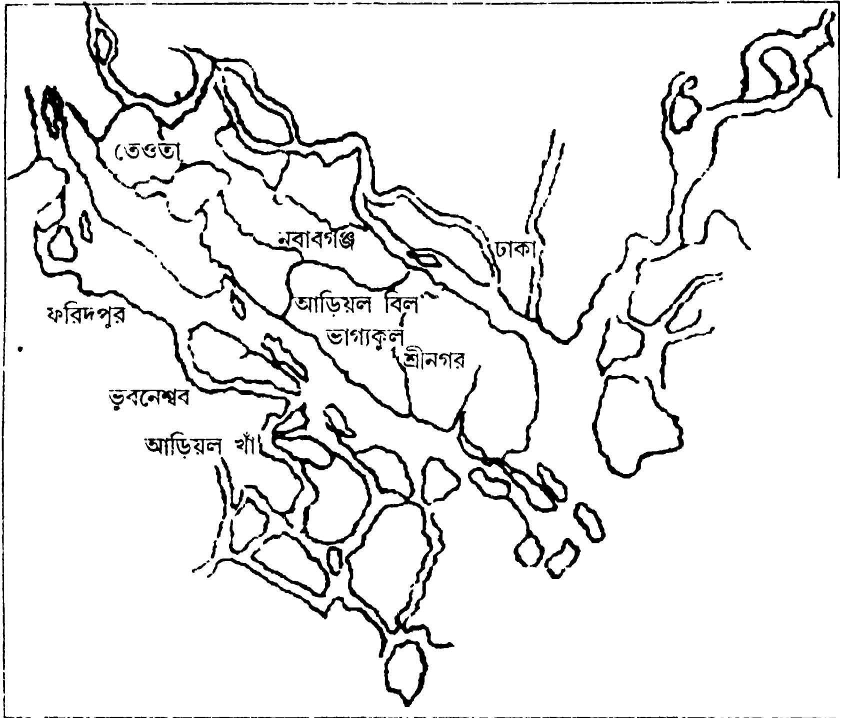


১নং মানচিত্র (রেনেল অঙ্কিত ৯ নং সীট থেকে)

ভারতবর্ষ ১৩৫০ অগ্রহায়ণ

"ঢাকা বিভাগের মানচিত্রে কয়েকটি স্থানের নাম-সাদৃশ্য অনুসন্ধানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঢাকা জেলায় ভাগ্যকুল গ্রামের নিকটবর্তী আরিয়ল বিল, লৌহজঙ্গের কিছু পূর্বে আরিয়ল গ্রাম এবং এগারসিন্ধুর দক্ষিণ পূর্বে আরিয়লখাঁ নামে একটি নদী আছে। নাম-সাদৃশ্য চূড়ান্ত প্রমাণ না হইতে পারে। কিন্তু এসব নামের সহিত ফরিদপুর জেলার নদীটির নামের সাদৃশ্য কি খুবই লক্ষ্যণীয় নহে?

"আজকাল পদ্মার দিগন্তবিস্তারী জলস্রোত ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার সীমা নির্দেশ করিতেছে। কিন্তু ইহার দুই কুল জুড়িয়া প্রাচীন বিক্রমপুর পরগণা। রেনেলের মানচিত্রেও (১৭৭৬ খ্রিঃ অঃ) এই ভূমিবিভাগ দেখা যায় না। এ পরিবর্তন গত আশি বৎসরের মধ্যে হইয়াছে। তাহার পূর্বে পদ্মা, ভুবনেশ্বর ও আরিয়লখাঁর পথে চলিত। (১নং মানচিত্র দ্রষ্টব্য)

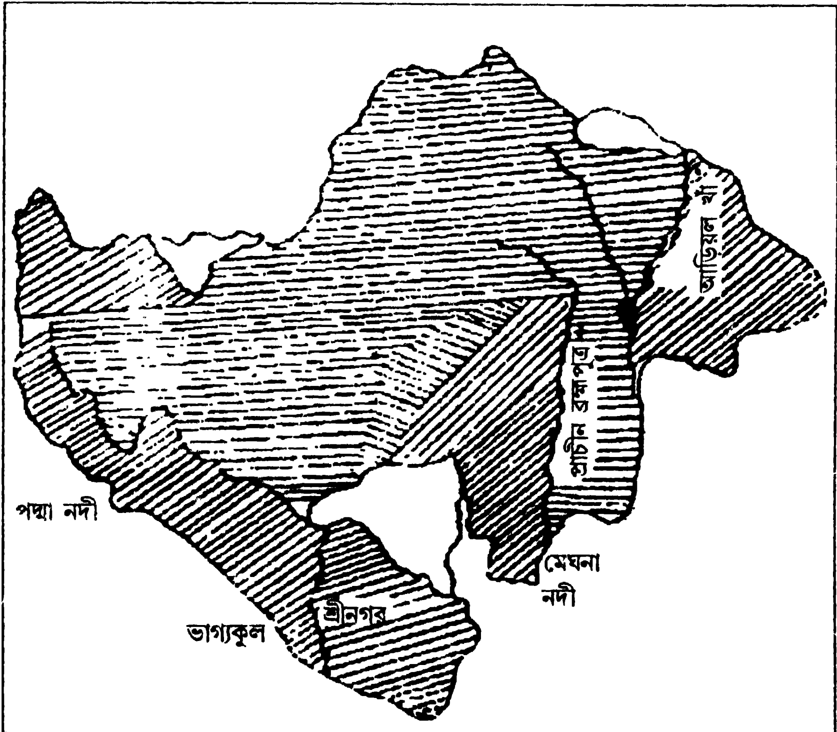


২নং মানচিত্র (বেঙ্গল ড্রইং আফিসেব ১৯৪১ সালে অঙ্কিত মানচিত্র থেকে)

"ঢাকা জেলায় তেওতা গ্রামের পাশে ভুবনেশ্বর নামে একটি নদীর খাত আছে। বেঙ্গল ড্রইং আফিসের আধুনিক মানচিত্রে ফরিদপুর শহরের প্রায় চার মাইল দক্ষিণ পূর্বে ভুবনেশ্বর নদের উদ্ভব দেখানো হইয়াছে। তেওতার প্রান্তবর্তী ভুবনেশ্বরের ঠিক এই বরাবরই পদ্মায় আসিয়া মিশিত। ফরিদপুরের ভুবনেশ্বর কিছু পশ্চিম দিকে আঁকিয়া বাঁকিয়া ষোল মাইল দক্ষিণে পুনরায় পদ্মায় মিশিয়াছে। এখান হইতে পশ্চিম দক্ষিণে আরিয়লখাঁর প্রবাহ। কিন্তু তাহার আরও একটু পশ্চিমে একটি লুপ্ত নদীর খাত আছে। উহা দত্তপাড়া গ্রামের পাশে আজও দেখা যায়। পুরাতন সেটলমেন্ট ম্যাপে ইহার নাম বিলপদ্মা। ২নং মানচিত্রে দেখা

যাইবে যে এই ফরিদপুর জেলার ভুবনেশ্বর তেওতার প্রান্তবর্তী নদটির দক্ষিণ প্রসৃতি মাত্র। ইহা ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী। পদ্মা প্রথমত এই ভুবনেশ্বর নদের পথে বিলপদ্মার খাতে প্রবাহিত ছিল; পরে আরিয়লখাঁর পথ খুলিয়া যায়।

ফরিদপুর জেলায় যেখানে আরিয়লখাঁ নদীর উদ্ভব দেখানো হইয়াছে ঠিক তাহার পূর্বদিকে পদ্মার অপর তীরে আরিয়ল বিল। সাধারণ্যে উহা আজও আরিয়লখাঁ বিল[২] নামে পরিচিত। উহা পূর্ব পশ্চিমে প্রায় ১২ মাইল দীর্ঘ এবং উত্তর দক্ষিণে প্রায় সাত মাইল প্রশস্ত। বিলের দৈর্ঘ্য সাধারণত বিলুপ্ত নদীটির গতিপথ নির্দেশ করে। আরিয়লখাঁ বিলও একটি পূর্ব পশ্চিম প্রবাহিনী নদীর পরিত্যক্ত খাত। যে কয়টি নদী ইহার মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইয়াছে[৩] তাহারা হয় গঙ্গার শাখা নদী, না হয় গঙ্গার পূর্বাভিমুখী স্রোত কর্তৃক তাড়িত উত্তরবঙ্গের নদী। সুতরাং সকলেই আধুনিক। এই আরিয়ল বিলে এক সময় গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[৪] ৩নং মানচিত্রে দেখা যাইবে যে আরিয়ল বিলের উত্তর এবং উত্তর পূর্বদিকের ভূমি প্রাচীন। পক্ষান্তরে পূর্বদিকের ভূমি মেঘনা নদী পর্যন্ত নব গঠিত এবং নিম্ন। ব্রহ্মপুত্রের জলরাশি এ পথেই একদিন প্রবাহিত হইত।



৩নং মানচিত্র (ডাঃ রাধাকমল মুখার্জিকৃত Changing Face of Bengal গ্রন্থ হইতে)

"ঢাকা জেলার উত্তর পূর্বপ্রান্তে এগারসিন্ধুর নিকটবর্তী" আরিয়লখাঁ নদীর নাম পূর্বে করিয়াছি। ৩নং মানচিত্রে এখানকার ভূমি গঠন দেখা যাইবে। ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত কতদূর পর্যন্ত প্রাচীন ভূমির উপর। কিন্তু তাহার দক্ষিণ অংশ নব গঠিত ও নিম্ন। সপ্তদশ শতাব্দীতে

মির্জা নাথন ঢাকা নগরীকে দোলাই নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়াছেন।[৬] রেনেলের মানচিত্রেও ঢাকা হইতে মোলাপাড়া (মুড়াপাড়া) পর্যন্ত দোলাই খাল দেখা যায়। বুড়িগঙ্গার অপর পারে রেনেল অঙ্কিত ঠাকুরপুরের খাল ইহারই দক্ষিণ পশ্চিম প্রসৃতি।

"ইছামতী, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা ও বর্তমান পদ্মার প্রবাহে ঢাকা জেলার পশ্চিম অংশের প্রভূত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আরিয়লখাঁ নদীর পশ্চিম প্রবাহের চিহ্নও লুপ্তপ্রায়। শুধু ভূমিসংগঠন অনুসন্ধানীর সম্মুখে এক সুদূর অতীতের ছবি তুলিয়া ধরে।

"পূর্ববঙ্গের ভূমি সংগঠনে পদ্মার প্রভাব যে সময় প্রথম অনুভূত হয় সেকালে আরিয়লখাঁ বর্তমান আরিয়ল বিলের পথে প্রবাহিত ছিল। ভুবনেশ্বর তাহার সহিত মিলিত হওয়ায় নদী একটু দক্ষিণে সরিয়া যায়। এই সঙ্গমের পশ্চিমে ভুবনেশ্বরের ক্ষীণ রেখা পড়িয়া থাকে। পদ্মা প্রথমত সেই পথ অবলম্বন করে। বিলপদ্মা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। অল্পকাল পরেই পদ্মার প্রবাহ আরও দক্ষিণে আরিয়লখাঁর পথে ধাবিত হয়। আরিয়লখাঁর স্রোতবেগই বোধহয় পদ্মাকে প্রথমত পশ্চিমের পথ ধরিতে বাধ্য করিয়াছিল। কিন্তু পদ্মার বিপুল জলরাশি অনতিকাল পরেই আরিয়লখাঁর পথ খুলিয়া লয়। বহু পরবর্তীকালে পদ্মা আরও পূর্বদিকে সরিয়া যায় এবং আরিয়লখাঁ ঢাকা জেলা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

"পদ্মার এই আরিয়লখাঁ স্রোত বেশ প্রাচীন, গ্রীকদের ভ্রমণ-কাহিনীতে ইহার নাম আছে Antibole. ডাঃ শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের মতে অন্তত খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এ মোহানার সৃষ্টি হইয়াছে।[৭] বর্তমানে আরিয়ল বিলের প্রান্তবর্তী স্থানসমূহ বাসযোগ্য হইয়াছে। কিন্তু পুষ্করিণী প্রভৃতি খননকালে প্রায়ই মাটির তলায় বহু গাছ এবং পীটজাতীয় জিনিসের স্তর দেখা যায়। উহা প্রায় ১২।১৪ ফিট মাটির তলায় এবং বহু দূরবিস্তৃত। নবগঠিত ভূমির উপর বন জন্মাইলে তাহা নিজ চাপে এরূপ মাটির তলায় চলিয়া যায়। সুন্দরবনে এরূপ ভূগর্ভপ্রোথিত বন ১০।১১ ফিট নিচে দেখা গিয়াছে।[৮] ইহা হইতেও আরিয়লখাঁ নদীর প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। মাদারিপুরের প্রান্তশায়িনী ক্ষুদ্র তটিনী আজও সেই আড়াই হাজার বৎসরের পুরাতন স্মৃতি বহন করিতেছে।

মরা পদ্মা ঃ

জেলায় প্রচলিত কিংবদন্তী হল, পূর্বে পদ্মা সেলিমপুরের কাছে দক্ষিণাভিমুখী ছিল। ফরিদপুর শহরের ২৫ মাইল উত্তর দিয়ে প্রবাহিত নদীরেখা কানাইপুর পেরিয়ে পূর্বমুখী হয়ে ফরিদপুর শহরের নিম্নাংশে পদ্মা মিশেছে। এখানে পদ্মার স্রোতধারা খুবই সংকীর্ণ। পুরনো রেখাটি প্রায় বুজে গেছে। একে বলা হয় মরা পদ্মা।

চন্দনা ঃ

হান্টারের বিবরণে আছে, চন্দনা নদী ফরিদপুরের পশ্চিম সীমা বরাবর প্রবাহিত। মির্জাডাঙার কাছে জেলার উত্তর-পূর্ব দিকে গঙ্গা বা পদ্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চিম সীমা বরাবর মন্থর গতিতে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে মসলন্দপুরের কাছে গড়াই নদীতে মিশেছে। মসলন্দপুর হল সৈয়দপুর শহর ও গঞ্জের কাছেই। এখানে এর কোন শাখা দেখা যায় না। শুকনো সময়ে নদীর আয়তন সংকীর্ণ হয়ে গেলেও, বর্ষায় আবার বৃদ্ধি পায়। বছরে মাত্র পাঁচমাস নৌ চলাচলের উপযোগী থাকে। স্রোতে পলিজমার পরিমাণ খুব বেশি। গরমকালে কোন কোন জায়গায় নদী শুকিয়ে যায়। চন্দনা-গড়াই-এর মিলিত স্রোত ফরিদপুরের পশ্চিম সীমা দিয়ে দক্ষিণে সাগরের দিকে এগিয়ে গেছে। ফরিদপুরের সীমানায় এই মিলিত স্রোত মধুমতী নামে পরিচিত।

সাম্প্রতিক বিবরণে আছে, পাংসা সাবডিভিশনের ডাহুকা গ্রামে পদ্মা থেকে বেরিয়েছে চন্দনা। পাংসা সাবডিভিশন থেকে এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়েছে কালুখালি পর্যন্ত। দৈর্ঘ্য প্রায়

৩০ কিলোমিটার। তারপর সোজা দক্ষিণমুখী হয়ে কামারখালি ও মধুখালির মধ্যবর্তী আড়কান্দি গ্রামে বারাসিয়া নদীর সঙ্গে মিশেছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ কিলোমিটার। এখানে নদীর নাম চন্দনা-বারাসিয়া। চন্দনা-আড়কান্তি, চন্দনা-বারাসিয়া এই মিলিত স্রোত আরও দক্ষিণে বোয়ালমারি ও কাশিয়ারি সাব ডিভিশনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে ভাটিয়াপাড়া বাজারের উত্তরে গরাই-মধুমতী নদীতে পড়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ কিলোমিটার।

আগে চন্দনার সঙ্গে গরাই ও কুমার নদী যুক্ত ছিল। গরাই ও কুমার উভয়ই পদ্মার শাখানদী। প্রকৃতপক্ষে গরাই নদীর জলরাশি চন্দনার মধ্য দিয়ে পড়ত কুমার নদীতে। এই নদীর গতিপথ পরিবর্তন, বেশ কিছু বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, ভূমিখণ্ডের পরিবর্তনে গড়াই ও কুমারের সঙ্গে চন্দনার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

বর্ষায় চন্দনা জলে ভরে যায়। দুকূল দাপিয়ে ছোটে স্রোত। কিন্তু শুকনোর সময় উৎসমুখ একেবারে শুকিয়ে যায়। তখন মৃতপ্রায় চন্দনা পড়ে থাকে। ফরিদপুরের চিনিকলের আখ পরিবহনের জন্য শুকনো মরশুমে নদীর স্থানে স্থানে বাঁধ দেওয়া হয়। নদী তখন পরিণত হয় একখণ্ড জলাভূমিতে।

নদীটি অনাব্য হয়ে পড়ায় বাংলাদেশ জল উন্নয়ন বোর্ড একাধিকবার নদীর সংস্কার করেছে। ফরিদপুর-বরিশাল প্রজেক্টের ফরিদপুর ইউনিটে চন্দনা-বারাসিয়াকে নিষ্কাশন খাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নিষ্কাশন এলাকার উত্তরে পদ্মা, পূর্বে কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া রেল লাইন, দক্ষিণে ও পশ্চিমে গরাই-মধুমতী। এলাকার পরিমাণ ৯৭,৫০০ হেক্টর। পাঙসা ও ঘোষপুরে রেগুলেটর নির্মিত হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে পাম্প বসিয়ে সেচের জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে।*

গরাই ঃ

কুষ্ঠিয়ার কাছে গরাই নদী দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে মধুমতী নামে পরিচিত। ফরিদপুর জেলার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করলেও গোপালগঞ্জের কাছে বাকরগঞ্জ জেলায় প্রবেশ করেছে। এখান থেকে বালেশ্বর নামে পরিচিত। এই নদীপথ ধরে গঙ্গার জলধারা পূর্বদিকের খাল পথে প্রবাহিত হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে গঙ্গার প্রধান স্রোত গরাই ধরে প্রবাহিত হত। সে সময়ে গরাই নদীর প্রশস্ততা ছিল ক্রমবর্ধমান। একসময় মনে করা হত গরাই-এর স্রোতধারা আরও প্রশস্ত হয়ে পড়বে। ১৮৫৭ সালে ক্যাপ্টেন সেরউইল বলেছিলেন, গরাই প্রতি বছর আয়তনে বাড়ছে। এর স্রোতধারা দুধারের উপকূলভাগ ভেঙে এগিয়ে চলেছে। বিস্তৃত অঞ্চল এই নদীধারার কবলে পড়বে। কিন্তু ১৮৬৩ সালে দেখা গেল গঙ্গার স্রোতধারা বিভক্ত হয়ে পূর্বদিকে মাথাভাঙা, গরাই ও চন্দনা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

মধুমতী ঃ

হান্টারের সময়েও মধুমতী ছিল যথেষ্ট বেগবতী। এখনও সারা বছর ধরে ভারি মালবাহী নৌকা যাতায়াত করতে পারে। শুকনোর সময়ে নদী প্রশস্ততা হ্রাস পেলেও বর্ষায় এক ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। একসময় মধুমতী ও গরাই দিয়ে বড় বড় নৌকা সারাভারতে যাতায়াত করত। এই নদীপথে সুন্দরবনে যাতায়াত ছিল সহজসাধ্য। মধুমতীর শাখা বারাসিয়া গোয়ালবাড়ির কাছে মূল স্রোত থেকে দক্ষিণে প্রায় ২০ মাইল এগিয়ে গিয়ে ভাটিয়াপাড়ার কাছে আবার মধুমতীর সঙ্গে মিশেছে। এই নদীপথেও নৌকা চলাচল করে। মধুমতীর কয়েকটি শাখা নদী হল বনকানা খাল, নবগঙ্গা খাল এবং মাচিয়াখালি খাল। এই শাখা নদীগুলি ফরিদপুর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়নি। এদের স্রোত প্রবাহিত যশোহর জেলার মধ্য দিয়ে।

বারাসিয়া ঃ

মধুমতীর শাখা বারাসিয়া। গোয়ালবাড়ির কাছে মধুমতী থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে

প্রবাহিত হয়েছে। এককভাবে ২০ মাইল প্রবাহিত হওয়ার পর আবার মিশেছে মধুমতীর সঙ্গে।

কুমার ঃ

কানাইপুরের কাছে চন্দনা থেকে বেরিয়ে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্বে প্রবাহিত হয়ে মাদারিপুরের কাছে বাকরগঞ্জ জেলায় ঢুকেছে। উৎস থেকে কানাইপুর পর্যন্ত পণ্যবাহী নৌকা বর্ষার সময় সহজে যাতায়াত করে। কানাইপুর থেকে মাদারিপুর পর্যন্ত ছোট নৌকা চলাচল করে সারা বছর। কুমারের প্রধান শাখা নদী শীতললাখ্যা তলমা থানা থেকে বেরিয়ে ভাঙার কাছে মিশেছে কুমারে। বর্ষাকালে এই পথে পণ্যবাহী নৌকা যাতায়াত করতে পারে। শুকনোর সময় নৌকা চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। বিশেষ করে তলমা ও তাজিয়া গয়েশপুরের মাঝে পলি জমে যাওয়ায় জলসীমা হ্রাস পায়। এই অঞ্চলটির গভীরতা বাড়াতে পারলে, নদী সারা বছর নৌ চলাচলের উপযোগী থাকে। বড়গঞ্জ হিসাবে বিকাশমান ভাঙা থেকে তলমার মধ্যে নৌ চলাচল স্বাভাবিক রূপ পেতে পারে। এখান থেকে ফরিদপুর শহরে যাওয়ার সড়ক আছে।

দ্বিতীয় নদী শাখা বালুগামের কাছে ভাঙার উত্তর দিক থেকে বেরিয়ে জেলার দক্ষিণের বৃহৎ বিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে মিশেছে মধুমতীতে। এই নদীপথও পলি জমে যাওয়ায় সংস্কারের প্রয়োজন নানা স্থানে। ফলে ফরিদপুর থেকে বাণিজ্য কেন্দ্র গোপালগঞ্জের মধ্যে যাতায়াত হবে সহজসাধ্য। তাছাড়া সুন্দরবন হয়ে কলকাতায় যাওয়ার পথও সুগম হবে। এক সময়ে কলকাতায় যাতায়াত করতে হত বাকরগঞ্জ হয়ে।

কুমারের আর একটি শাখা বালুগ্রাম খাল তিন চারটি বড় বিলের মধ্য দিয়ে গেছে। এই নদীপথ সংস্কার করলে কিছু পরিমাণ জলাভূমির উদ্ধার সম্ভব হবে। কুমারের অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন শাখানদীর মধ্যে আছে মরা পদ্মা এবং চন্দনা নদীর শাখা নদী হাজরা খাল। শতবর্ষে নদীর স্বভাব, চরিত্র ও স্বাভাবিক গতিধারার নানা রূপান্তর ঘটেছে। পুরনো জনবসতি জলরেখার অবলুপ্তি ঘটেছে যেমন, তেমনি নদীর নতুন প্রবাহ পথে গড়ে উঠেছে নানান জনবসতি।

হান্টারের এই বিবরণ থেকে কুমারের যে পরিচয় পাওয়া যায়, ১০০ বছর পরে, তার স্বরূপ বদলে গেছে অনেক। আবদুল ওয়াজেদের বিবরণে আছে, পদ্মা থেকে উৎপন্ন কুমার নদ ফরিদপুর শহরের প্রাণস্বরূপ। ফরিদপুর শহরের মাঝ বরাবর প্রবাহিত। কুমারের তিনটি উৎসমূলের সন্ধান পাওয়া গেলেও দুটি অস্তিত্বহীন। অবশিষ্ট উৎসটিকে ফরিদপুর শহরের কাছে জলকাঠামো তৈরি করে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। বন্যাপ্রবণ কুমার নদ বর্ষার জলে প্রতি বছর দুকূল ছাপিযে যায়। ফরিদপুর সদর, বোয়ালমারি সাবডিভিশন, নগরকান্দা সাবডিভিশন, মোকসেদপুর সাবডিভিশন এবং ভাঙা সাবডিভিশনের অংশ বিশেষ জলে ভেসে যায়।

উৎপত্তি স্থল থেকে কুমারনদ ফরিদপুরের কাছে চরমাধবদি গ্রামের ভিতর দিয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে অম্বিকাপুরের কাছে দুটি শাখায় বিভক্ত। প্রথম শাখা ফরিদপুর, বাখুণ্ডা, রসুলপুর ও নগরকান্দার ভিতর দিয়ে ভাঙা পর্যন্ত প্রবাহিত।

অপর শাখা ফরিদপুর সদর সাবডিভিশন, বোয়ালমারি সাবডিভিশন, মোকসেদপুর সাবডিভিশনের ভিতর দিয়ে ভাঙা পর্যন্ত প্রবাহিত। এখানে দুটি শাখা মিলিত হয়ে ফতেপুরের কাছে মাদারিপুর বিলরুটে পড়েছে।

উৎপত্তি স্থল থেকে অম্বিকাপুর পর্যন্ত কুমারের দৈর্ঘ্য ৮ কিলোমিটার। অম্বিকাপুর থেকে ভাঙা পর্যন্ত প্রথম শাখার দৈর্ঘ্য ৮০ কিলোমিটার। অম্বিকাপুর থেকে ভাঙা পর্যন্ত দ্বিতীয় শাখার দৈর্ঘ্য ১১২ কিলোমিটার। ভাঙা থেকে ফতেপুর পর্যন্ত নদীর দৈর্ঘ্য ৪০ কিলোমিটার।

শুকনোর সময় নদীর উৎসমুখ শুকিয়ে গেলেও মাদারিপুর বিল রুটের জল অম্বিকাপুর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। বর্ষার সময় কুমারের উৎসমুখ উন্মুক্ত করা হলেও তা থাকে সুনিয়ন্ত্রিত।

বর্ষায় পদ্মার স্রোত এই নদীপথে প্রবাহিত হওয়ায় নদী খরস্রোতা হয়ে ওঠে। এসময় নদী নাব্য থাকে। কিন্তু শুকনোর সময় তা থাকে না। প্রবাহপথে নদীটি সম্পূর্ণ আঁকাবাঁকা। ফরিদপুর জেলা শহর ও নগরকান্দায় নদীর ভাঙন প্রবণতা বেশি। নগরকান্দা শহরের কাছে নদীটি শীতললাখ্যা নামে পরিচিত। বাংলাদেশ জল উন্নয়ন বিভাগ শহর দুটি রক্ষায় নানা ব্যবস্থা নিয়েছে।

কুমার নদের প্রথম শাখার তীরে রসুলপুরের হাট, নদী গবেষণা কেন্দ্র, নগরকান্দা সাবডিভিশন বিখ্যাত। দ্বিতীয় শাখার তীরে কানাইপুর বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র। এখানে শিকদার বংশীয় জমিদারদের বিখ্যাত চক মিলানো বসতবাড়ি আজও দর্শনীয়। চাঁদপুরহাট, কাদিরদি বাজার পাটের কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ। বাংগেশ্বরদী, ধোপাখালি শ্রীপুর বন্দরে হিন্দু জমিদারদেব বসতবাড়ি, কাছারি, দিঘি, মঠ, মন্দির, নদীতে বাঁধানো ঘাট আজও বিস্ময় জাগায়। পাটের অন্যতম ব্যবসাকেন্দ্র হল ফতেপুর বন্দর।

নদীটি গড়ে ১০০ মিটার প্রশস্ত। গড় গভীরতা ৮ মিটার।

পাম্পের সাহায্যে কোথাও কোথাও সেচের কাজ হয়। ফরিদপুর-বরিশাল প্রজেক্টের অঙ্গ হিসাবে নদী জলের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য নানান প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে।

লোয়ার কুমার ঃ

কুমার নদীর নিম্নাংশ লোয়ার কুমার নামে পরিচিত। নদীটি মাদারিপুর জেলার কুমার নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে চর মাগুরিয়ায় আরিয়লখাঁ নদীতে পড়েছে। নদীর দৈর্ঘ্য ৩০ কিলোমিটার। প্রশস্ত গড়ে ৬০ মিটার।

রাজোইর সাবডিভিশনের টেকেরহাট থেকে লোয়ার কুমারের উৎপত্তি। আগে কুমার নদের এই অংশকে বলা হত আপার কুমার। বিশ শতকের প্রথম দশকে মাদারিপুর বিল রুটের কাজ শেষ হলে আপার কুমারের অধিকাংশই ওই রুটের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে আপার কুমারের টেকেরহাট এলাকার অংশ মাদারিপুর রুট নাম নেয়। ফলে এর উৎপত্তি মাদারিপুর বিল রুট থেকে ধরা যেতে পারে।

শুকনো মরশুমে কোন কোন বছর টেকের হাটে নদীর উৎসমুখ শুকিয়ে গেলেও আরিয়লখাঁ নদীর সঙ্গে মোস্তফাপুর পর্যন্ত সারা বছর অব্যাহত যোগাযোগ থাকে। বর্ষায় নদী নাব্য থাকলেও, শুকনো মরশুমে নদীর ওপরাংশ অনাব্য হয়ে পড়ে। কিন্তু চরমাগুরিয়া থেকে মোস্তফাপুর পর্যন্ত অংশ সারা বছর নাব্য থাকে। নদীপথ আঁকাবাঁকা। ভাঙন প্রবণতা কম।

নদীতীরে প্রসিদ্ধ স্থান রাজোইর, মোস্তফাপুর ও চরমাগুরিয়া। টেকেরহাট প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ও নৌ-বন্দর। এখানে মিল্কভিটা কোম্পানির দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা আছে। রাজোইর সাবডিভিশন সদর নদীতীরে অবস্থিত। নদীতীরে মোস্তফাপুর মাদারিপুর টেক্সটাইল মিল। চরমাগুরিয়া প্রসিদ্ধ বাণিজ্যবন্দর। এখানে আল হাজ্ব আমিনউদ্দিন জুটমিল অবস্থিত।

নদীর বিভিন্ন শাখার ওপর কয়েকটি জল কাঠামোর সাহায্যে সেচের কাজে সাহায্য করা হয়। বাংলাদেশ জলউন্নয়ন বোর্ড নদীর নানান জায়গায় পাম্প বসিয়ে আবাদ উপযোগী জলসরবরাহের সুবন্দোবস্ত করেছে।*

চর ও বিল ঃ

জেলার বিল ও খালে ক্রমবর্ধমান জলজ উদ্ভিদ জন্মাতে থাকায় আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে। জেলার অন্যতম প্রধান জলধারা, যা জেলাসদর মহকুমাকে মাদারিপুর ও গোপালগঞ্জ মহকুমার সঙ্গে সংযুক্ত করেছিল, তার ধারাপথ আগাছা জন্মে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে থাকে। তাছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জেলার নদীপথগুলির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যে পথে তারা প্রবাহিত হত সময়ে সময়ে সেগুলি সম্পূর্ণ শুকিয়ে যেত। নদীবাহিত পলি বা

নুড়ি পাথর জমে নদীতল বেশ উঁচু হতে থাকে। অনেক সময় দেখা গেছে নদী কোথাও একপাড় ভাঙতে ভাঙতে পার্শ্ববর্তী গ্রাম ভাসিয়ে ভিন্ন পথে এগিয়ে চলেছে ; সে সময়ে অপর পাড়ে নদীবাহিত পলি, পাথর জমে তৈরি হচ্ছে নতুন ভূখণ্ড। কোথাও চর বা দিয়ারার সৃষ্টি হচ্ছে। পরিত্যক্ত নদীরেখায় বালি জমিতে থাকায় এবং তার ওপর জল জমে থাকায় ভূগঠনের ক্ষেত্রে ওই বিস্তৃত এলাকা নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দেয়। চরের উচ্চতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই চর জমির উর্ববতা অসাধারণ। এখানে অপরিযাপ্ত পরিমাণ ধান জন্মায়। নদীরেখা পরিবর্তনের কারণে যদি জলধারা চর জমিতে প্রবেশ না করে, তবে সেসব চর বালি ভর্তি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। এই চরজমির দখল নিযে অতীতে কৃষিজীবীদের সঙ্গে সংঘর্ষ ক্রমশ বাড়তে থাকায় সরকারকে ১৯২০ সালে আইন প্রণয়ন করতে হয়েছিল।

বেশ কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, পদ্মার গর্ভে প্রচুর পরিমাণ পলি জমে বহু চরেব সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া অতীতের তুলনায় বর্তমানের বন্যায় জলরাশি অনেক উঁচু হয়ে প্রবাহিত হয। বর্তমানে পদ্মাবাহিত জলের পবিমাণ পূর্বের তুলনায় কয়েক হাজার কিউসেক বেশি। পদ্মার গর্ভে যে পরিমাণ পলি জমছে, তা ভবিষ্যতের পক্ষে অশুভজনক। পদ্মার জলবাশি প্রবাহ পথে একপাড় ভাঙে, আর একপাড় গড়ে না। এরকম ঘটে ছোট ছোট নদীব ক্ষেত্রে। নভেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে পদ্মায় প্রবাহিত জলরাশির উচ্চতা অনেক হ্রাস পায়, বিশেষ করে সরবরাহ মুখের জলপরিমাণ হ্রাস পায় সব থেকে বেশি।

ফরিদপুর জেলায় চর অঞ্চলগুলির অন্যতম হল ঃ

১. পঙ্কজ-হাজারিগ্রুপ-গোয়ালন্দ থানার উত্তর-পূর্বে

২ বান্দাখোলা গ্রুপ-শিবচরথানার উত্তর পূর্বে

৩. কলকিনি গ্রুপ-মাদারিপুর থানার দক্ষিণ পূর্বে

৪. কোদালপুর গ্রুপ-পালঙ থানাব পূর্বে

জেলায় জলাজমিব পরিমাণও কম নয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল ঃ

১. ঢোলসমুদ্র—জেলা প্রশাসনিক কেন্দ্রেব দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। বর্ষার সময় একটি হ্রদেব চেহাবা নেয়। জলরাশি প্রবাহিত হয শহব পর্যন্ত। সে সময় এর আয়তন দাঁড়ায় প্রায আট মাইল। কিন্তু শীতের সময়ে ক্রমশ কমে যেতে থাকে। আর গ্রীষ্মে দু এক মাইল মাত্র অস্তিত্ব। বর্ষার সময় নৌবহন উপযোগী।

২. বিল পাতিযা—বেলগাছি রাজস্ব বিভাগের অন্তর্গত। তিন মাইল লম্বা এবং দুই মাইল চওড়া। বর্ষার সময় নৌবহন উপযোগী।

৩ হাতিমোহন—আড়াই মাইল লম্বা ও দুমাইল চওড়া। শুকনোর সময়ও নৌবহন উপযোগী।

৪. বিল রানকোলি—সাতোর রাজস্ব বিভাগেব অন্তর্গত। ১৫ মাইল লম্বা ও ছয় মাইল চওড়া। শুকনো মরশুমে নৌচলাচল সম্ভব নয।

৫. নসিবসাহী জলাভূমি—নসিবসাহী রাজস্ব বিভাগেব অন্তর্গত। ষোল মাইল লম্বা ও ছয় মাইল চওড়া। বর্ষার সময় নৌ চলাচলের উপযোগী। এখানে কিছু গ্রামের সৃষ্টি হয়েছে।

জেলার দক্ষিণাংশ বেশ কিছু বিলের উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলির বেশির ভাগই মকসুদপুর থানা মধ্যে একটি বৃহৎ জলাশয়, যা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। গ্রীষ্মে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। জলাশয়ের মধ্যে বেশ কিছু কৃত্রিম মাটির ঢিবি আছে। স্থানীয় মানুষ নৌকায় এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাতায়াত করে। এমনকি এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যেতে কখনও কখনও নৌকার প্রয়োজন হয়। জেলার দক্ষিণাংশের বিলগুলির অন্যতম হল মোতার বিল, চন্দ্রা বিল এবং বকশির বিল।

১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুসারে জেলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল হল ঃ

কতিলি	নলনা	চাতাল	মৌরা
ঘোড়ামারা	কাজলিডাঙা	বাঘিলা	পাটিনীডাঙা
দিঘা	কাশমিরা	পাবনিরা	সোলাডাঙা
আটাভাঙা	চন্দা	পথরাম	উজান

এখানে ফরিদপুর জেলা গেজেটিয়ারেব একটি মন্তব্য উদ্ধৃত যোগ্য ঃ "The Padma and the Brahmaputra including the Jamuna do play an important part in Faridpur in filling up depressions. A certain amount of water stik comes down the Garai and on the south-western boundary of the district, the Madhumati plays a considerable part. The other rivers, the Chandna, Kumar and Barasia are now for all practical purposes dead, although sufficiently full of water in the rains to permits of navigation by country boats The Garai and the Madhumati is filling up the great depressions of the south-west. There are many water courses between them and the moushes, but play are naturally inclined to shoal at their junction with the rivers, which deprives them of most of their utility in filling the interior with silt. Both the Garai and the Madhumati bring down a vast amount of silt in the flood season, but it is only at the top of the flood that silt is carried over the shoal and into the distributary stream. On the other hand when the floods are over, same abstruct prevents the water of the marsh from being drained repidly into these rivers which have now become low enouth to carry it away. It is no doubt very difficult and costly to keep the connection open between these numerous distributories and the great rivers, but the splendid work which the beel route has done lately in land formation near its banks shows that the labour and expenditure would not be made in vain.

(Faridpur District Gazetter · 1977. p. 14-15)

মাদারিপুর বিলরুট ঃ

খুলনা থেকে মাদারিপুর. গোয়ালন্দ, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, কাছাড় ও আসামের মধ্যে নৌপথে দূরত্ব কমিয়ে আনাব জন্য স্যর আর্থার কটন ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে একটি নৌপথ খননের প্রস্তাব দেন। ১৮৭৫ খ্রিঃ স্যর ব্রেডফোর্ড ল্যাসলি এবং ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে স্যর রিচার্ড টামসল এর কিছু সংশোধন প্রস্তাব পেশ করেন। আবার ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে স্যর আর বি ব্যাকল হরিদাসপুরের কাছে মধুমতীর সঙ্গে টেকেরহাটে কুমারের সংযোগ স্থাপনের প্রস্তাব দেন। কাজ শুরু হয় ১৮৯৯ খ্রিঃ। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ ব্যবহারোপযোগী করা হলেও, কাজ শেষ হয় ১৯১৪ খ্রিঃ। মাদারিপুর বিল রুটকে বলা যায় বাংলাদেশের সুয়েজ ক্যানেল। অসংখ্য নিম্নাঞ্চল, বিল বা জলাশয় একই রেখায় এনে মিলিত করার কারণে এই নামকরণ।

মাদারিপুর বিলরুটে মাদারিপুব জেলার কবিরাজপুরের কাছে আরিয়লখাঁ নদী থেকে গোপালগঞ্জের মানিকদহের কাছে মধুমতী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পথে বিলরুট টেকেরহাটের কাছে কুমার নদীতে মিশেছে। টেকেরহাটের প্রায় ৩৫ কিলোমিটার এগিয়ে মানিকদহে মধুমতীর স্রোতের সঙ্গে একীভূত হয়েছে। কুমার নদী কবিরাজপুর থেকে টেকেরহাট পর্যন্ত "আপার কুমার" নামে পবিচিত। তাই টেকেরহাট থেকে মানিকদহ পর্যন্ত মাদারিপুর বিলরুট

নামেই কুমার নদী প্রবাহিত। কুমার নদী ফতেপুর বিল রুটে পড়ার পর টেকের হাটের কাছে এই রুট থেকে লোয়ার কুমার নামে পরিচিত।

আগে মাদারিপুর বিলরুটের বাম পাড়ে একটি মার্জিনাল বাঁধের সাহায্যে ২৪,০০০ হেক্টর এলাকায় চাষাবাদ হত। এখানে ছিল সাতটি জল কাঠামো। এই বাঁধ ও জলকাঠামো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় টেকেরহাট থেকে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ হারিংবোন বন্ড রাস্তা তৈরি করে বাংলাদেশ জল উন্নয়ন বোর্ড। আগেকার সাতটি জল কাঠামো মেরামত করে ফ্লাসিং স্লুইস তৈরি হয়েছে।

মাদারিপুর বিলরুট একটি ব্যস্ততম জলপথ। খুলনা থেকে চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা যেতে এই সংক্ষিপ্ত নৌপথ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গতিপথ সরল, কিন্তু কোথাও কোথাও ভাঙন প্রবণতা আছে। স্রোতে পলির পরিমাণ বেশি থাকায়, চরা পড়ায় শুকনো মরশুমে নৌ চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। বিগত কয়েক বছর শুকনো মরশুমে খুলনা থেকে টেকেরহাট পর্যন্ত যায়। কবিরাজপুর হয়ে চাঁদপুর বা নারায়ণগঞ্জ নৌকাচলাচল করতে পারে না।

মাদারিপুর বিলরুটে সারাবছর প্রবাহ থাকে। গড় প্রস্থ ১৫০ মিটার। জোয়ার ভাটা খেলে। বিলরুটের উভয়পাড় নিম্নাঞ্চল। খরিফ মরশুমে ধান, পাট, আখ হয়। রবি মরশুমে গম, ডাল, তৈলবীজ ও আলু জন্মায়। নদীর বামতীরে ধানের আবাদ আছে। পাম্পের সাহায্যে সেচের জল নিয়ে আরো আবাদ হচ্ছে।

টেকেরহাটে নদীর ওপর সেতু তৈরি হয়েছে। কবিরাজপুর, টেকেরহাট, সিন্ধিয়াঘাট, জলিরপাড়, সাতপাড়, বৌলতলী, ভেড়েবহাট, হরিদাসপুর ও মানিকদহ নদী তীরের প্রসিদ্ধ স্থান। টেকেরহাটে নৌ ও বাণিজ্য বন্দর। এখানে ফেরি পারাপারের ব্যবস্থা আছে। জলির পাড় ও তেতুলিয়ায় টোল অফিস। সাতপাড়ের কাছে পাওয়া গেছে টোল কয়লার সন্ধান।

১ ঢাকার ইতিহাস ১ম খণ্ড ২য় অধ্যায় পৃঃ ৫৯

২. রেনেলের ম্যাপে আছে চুড়াইন বিল। পার্শ্ববর্তী চুড়াইন গ্রামের নাম হইতে এই নাম হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

৩ ইছামতী, ধলেশ্বরী, কালীগঙ্গা বুড়িগঙ্গা প্রভৃতি।

৪. Relics of the Great Ice Age in the plains of N India by T H D. La Touche, Quoted by S C Mazumder in his Rivers of the Bengal Delta pp 59-64

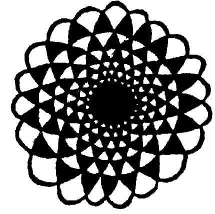
৫ J R A S B VIII pp 9-10

৬. Baharistan-i-Ghaibi ; "It is well to remember that access to Dacca from the Meghna side was through these two channels (of the Dula) and that the fatulla Dhaleswari section by which Buriganga now falls into the Dhaleswari did not then exist (Islamic Culture Oct 1942, p 394.)

৭. Antiquity of the Lower Ganges and its Courses (Science and Culture Vol VII No 5, p 238)

৮ R K. Mukerji, Changing Face of Bengal p. 119.

* বাংলাদেশের নদীনালা—আবদুল ওয়াজেদ।



পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক জেলার মত ফরিদপুর নদীবহুল। যে কারণে তার পরিবহন ব্যবস্থাও অনুরূপভাবেই গড়ে উঠেছে। জেলার অভ্যন্তরে তেমনভাবে যান চলাচল উপযোগী সুদীর্ঘ সড়ক তৈরি হয়নি। জেলা ঘিরে রয়েছে নদনদী। জলপথই জেলার অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম। বর্ষাকালে নদী ভরে যায় জলে। জেলার বিস্তৃত অঞ্চল হয় জলাকীর্ণ। তখন নদীপথ বেয়ে প্রান্তবর্তী অঞ্চলে যাতায়াত ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। জেলার উত্তরাংশে রয়েছে যেমন রেল সংযোগ, দক্ষিণাংশে তেমন আছে মধুমতী নদী ও মাদারিপুর বিল রুট। গোয়ালন্দ অন্যতম নদীবন্দর ও যোগাযোগ কেন্দ্র হিসাবে দীর্ঘকাল বিখ্যাত। পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত স্রোত গোয়ালন্দ-নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর হয়ে চলে যায় সমুদ্র উপকূলে। জল পরিবহনের ক্ষেত্রে মাদারিপুরের গুরুত্বও অপরিসীম। একদিকে নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, চাঁদপুরে যেমন যাতায়াত করা যায়, তেমনি বরিশাল ও খুলনার সঙ্গেও যুক্ত। জেলার দক্ষিণাংশে যাতায়াত ব্যবস্থা খুব ভালো নয়। তেমন ভালো রাস্তা নেই এই অঞ্চলে। বছরের বেশির ভাগ সময় নদীপথে নৌকায় চলাচলই একমাত্র নির্ভরযোগ্য। আবার জেলার উত্তরাংশে একমাত্র চন্দনা ও কুমার নদীপথে চলাচল সম্ভব একমাত্র বর্ষাকালে।

হান্টারের বিবরণে আছে ঃ "There are only three important lines of road in Faridpur and they are all under the management of the Magistrate of the District. (1) The Calcutta and Jessore imperiab road, from the station of Faridpur to Dhuliaghata on the Basasia, nineteen miles in length ... (2) The Belgachhi road, from the town of Faridpur to Kalinagar, sixteen miles in length ; .. (3) The Talma road, from the town to Talma, ten miles in length ; ... No large markets have lately sprung upon these lines of traffic. Every road in the District suffered siriously from the successive inundations of 1870 and 1871; the allotment for roads in 1871 being entirely spent in repairing the damages caused by floods. All the roads, except that part of the Jessore and Calcutta road which passes through the station, were more or less under water for forty days in August and September 1871. Several bridges were also washed away, and others more or less injured by the inundation ... (Statistical Account of Faridpur. vol. v. p 333-34)

১৮৭০-৭১ সালের এই তথ্য রেখে যান হান্টার। তার অনেক পরে ১৯১৬ সালে জে সি জ্যাকের বিবরণে আছে ঃ In the north-west so few roads exist that during the season when the rivers have dried up, the transport of produce is almost impossible, which has all the more depressing an effect upon general trade since it is at this period of the year that the reaping of the main harvest has

put money freely into the hands of the population. In the south-west all trade is carried by water, as the rivers and streams are very numerous and serve every village throughout the year. If a traveller walks through the northern part of the district in January or February and on to the south-west, he cannot fail to be struck by the contrast between the two The one region shows no visible signs of prosperity and appears to be completely stagnant the other is full of movement, the markets are crowded and ply a thriving trade, the rivers and streams are full of boats at all hours of the day and the people generally show every sign of alertness or prosperity." (Economic life of a Bengal District.)

উনিশ শতকের শেষেও জেলার সড়ক উন্নয়নে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। হান্টারের বিবরণে জানা যায় ১৮৭০ সালে জেলায় মাত্র ৪৫ মাইল রাস্তা ছিল। কিন্তু বন্যার দাপটে সেই রাস্তাও সুরক্ষিত ছিল না। কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। বিশ শতকের প্রথমে সড়ক সুরক্ষায় সামান্য নজরদারি থাকলেও, তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ট্রাঙ্ক রোড ছিল কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন। এই সময়ে রাস্তা ছিল ১৬৪ মাইল। জেলার উত্তরে গ্রামের অভ্যন্তরে চলাচলের সাধারণ রাস্তার পরিমাণও তেমন বেশি না থাকায়, যাতায়াত ছিল খুবই অসুবিধাজনক। দেখা যাচ্ছে ১৯২২-২৩ সালে যে ৩৫৩ মাইল রাস্তা ছিল, তার ৬ মাইল মাত্র ছিল পাকা। এছাড়া গ্রামের অভ্যন্তরে চলাচলের জন্য ছিল ৩০৭ মাইল রাস্তা। এসবই ছিল কাঁচা রাস্তা। বর্ষার সময় রাস্তা চলাচলের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়ত। এই সময়ে জেলার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির মধ্যে ছিল ঃ

১. যশোহর রোড-ফরিদপুর থেকে চাঁদপুর ও বোয়ালমারি হয়ে যশোহর সীমান্ত পর্যন্ত (২১ মাইল) ;

২. পাংসা রোড-ফরিদপুর থেকে বালিয়াকান্দি হয়ে পাংসা পর্যন্ত (২৯½ মাইল) ;

৩. রাজবাড়ি রোড-ফরিদপুর থেকে রাজবাড়ি পর্যন্ত (১৮½ মাইল) ;

৪. ভাঙা রোড-ফরিদপুর থেকে ভাঙা পর্যন্ত (২০½ মাইল) ; এবং

৫. তলমা রোড-ফরিদপুর থেকে তলমা পর্যন্ত (৮ মাইল)।

বর্তমানে জেলার সড়ক ব্যবস্থার অনেক উন্নতি ঘটেছে। ১০০.৪১ মাইল পাকা সড়ক আছে। তা তত্ত্বাবধান করে বাংলাদেশ সরকারের সড়ক ও হাইওয়ে দপ্তর। এর মধ্যে ৬৬.২০ মাইল নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ করে সড়ক বিভাগ, ফরিদপুর। বাকি ৩৪.২৫ মাইল নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বাকরগঞ্জ বা বরিশালের সড়ক বিভাগের।

রাস্তাগুলি হল ঃ

১. গোয়ালন্দ-রাজবাড়ি-ফরিদপুর-মাগুরা রোড—

মোট ৫৬.৬০ মাইল দীর্ঘ এই সড়কের ৪৭.৫ মাইল আছে ফরিদপুর জেলায়। ১৯৬৫ সালে ৪৬ মাইল এবং ১৯৬৮ সালে বাকি অংশ পাকা করা হয়।

২. ফরিদপুর-ভাঙা রোড—

জেলার মধ্যেই ১৮.৭০ মাইল এই সড়কটি বিস্তৃত। ১৯৬৫ সালের মধ্যে সড়কটি পাকা করা হয়।

৩. ভাঙা-মাদারিপুর রোড—

এই সড়কটি জেলার অভ্যন্তরে ৩৪.২৫ মাইল বিস্তৃত। ১৯৬৫ সালের মধ্যে পাকা করা হয়।

দেশ ভাগের পূর্ব পর্যন্ত ফরিদপুর জেলার সড়ক পরিবহন ব্যবস্থায়, যোগাযোগ বা যাতায়াতে গরুর গাড়ি ও ঘোড়ায় টানা গাড়ির ভূমিকা ছিল প্রধান। তাছাড়া সড়কপথে মাল পরিবহনে এক জাতীয় ছোট ঘোড়া ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল। সাধারণত যে সময়ে কোন কারণে জলপথে যাতায়াতে কড়াকড়ি হত সেসময়েই এই ঘোড়াকে ব্যবহার করা হত পরিবহনের কাজে। ১৯৫০ সাল নাগাদ জেলার মধ্যে বাই সাইকেল, রিক্‌শা, মোটরগাড়ি, মোটর সাইকেল যাতায়াত শুরু হয়ে যায়। ভারি দ্রব্যাদি পরিবহনে ট্রাকের চল বাড়তে থাকে। বাসও এসে পড়ে শহরের মধ্যে চলাচলের জন্য। কেবল মানুষ নয়, মাল নেওয়ার কাজেও বাসের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। এখন জিপ, স্টেশন ওয়াগন, অটোরিক্সা ও অন্যান্য আধুনিক যান চলাচল করতে দেখা যায়।

যত রকম আধুনিক যানই আসুক না কেন, ফরিদপুর জেলার সর্বত্র পরিবহনে নৌকাই সবথেকে প্রয়োজনীয় ও জনপ্রিয় মাধ্যম। যেহেতু নদী প্রধান জেলা, সে কারণে নৌকা পরিবহন ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে। নৌকা তৈরি হয় নানান প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে। কোন নৌকায় কেবলমাত্র যাত্রী চলাচল করে, কোন নৌকা এক গঞ্জ থেকে আর এক গঞ্জ মাল নিয়ে যায়, কোন কোন মাল বোঝাই নৌকা দূরবর্তী অঞ্চলে পাড়ি দেয়। কেবলমাত্র মাছ ধরার জন্য অন্য এক ধরনেব নৌকা তৈরি হয়ে থাকে।

অনেক আগেই ১৮৭১ সালে জেলার মধ্যে রেলগাড়ি চলাচল শুরু হয়েছিল। কুষ্ঠিয়া থেকে শাখালাইন মাচপাড়া হয়ে ফরিদপুরে প্রবেশ করে উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে গোয়ালন্দ ঘাট পর্যন্ত পৌছায়। এই লাইন ২৯ মাইল দীর্ঘ। এই পথের স্টেশনগুলির মাচপাড়া থেকে দূরত্ব যথাক্রমে ঃ পাংসা (৪ মাইল), কালুখালি (৮½ মাইল), বেলগাছি (১২½ মাইল), সূর্যনগর (১৬¼ মাইল), রাজবাড়ি (১৯½ মাইল), পচুরিয়া (২৩¾ মাইল), গোয়ালন্দ-ঘিয়ের বাজার (২৮ মাইল) এবং গোয়ালন্দ ঘাট (২৯ মাইল)। ধীরে রেললাইনের সম্প্রসারণ ঘটেছে। ১৮৯৮ সালে একটি শাখা লাইন পচুবিয়া থেকে পদ্মার সমান্তরালভাবে ফরিদপুর শহবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। লাইনটির দৈর্ঘ্য মাত্র ১৬ মাইল। রেলপথে অবস্থিত স্টেশন ও পাচুবিয়া থেকে তাদেব পারস্পরিক দূরত্ব যথাক্রমে ঃ খানখানপুর (৩½ মাইল), বসন্তপুর (৬½ মাইল), আমিরাবাদ (৮¾ মাইল), অম্বিকাপুর (১৬ মাইল) এবং ফরিদপুব (১৩¾ মাইল)।

কালুখানি থেকে ভাটিয়াপাড়া পর্যন্ত শাখা লাইনে দৈর্ঘ্য ৪৬¼ মাইল। কালুখালি থেকে মধুখালি পর্যন্ত লাইন চালু হয় ১৯৩২ সালের ১ জানুয়ারি এবং মধুখালি থেকে ভাটিয়াপাড়া ঘাট চালু হয় এই বছরের ১ মার্চ। রেলপথের বিভিন্ন স্টেশন থেকে কালুখালির দূরত্ব যথাক্রমে ঃ রামদিয়া (৫½ মাইল), বহরপুর (৮¼ মাইল), আরকান্দি (১২ মাইল), নলিয়াগ্রাম (১৫½ মাইল), মধুখালি (১৯½ মাইল), সাতৈর (২৭¼ মাইল), বোয়ালমারি বাজার ৩১¼ মাইল), সাহসরেল (৩৬½ মাইল), বিয়াসপুর (৪০¼ মাইল), কাসিয়ানি (৪৪ মাইল) এবং ভাটিয়াপাড়াঘাট (৪৬½ মাইল)।

মধুখালি থেকে পশ্চিমদিকে কামারখালিঘাট পর্যন্ত যে লাইনটি গেছে তার দৈর্ঘ্য মাত্র ৬¾ মাইল। ১৯৩২ সালের ১ জানুয়ারি এই লাইনের উদ্বোধন হয়। এই পথে দুটি মাত্র স্টেশন মধুখালি ও কামারখালি।

ফরিদপুর-তলমা রেলওয়ের দৈর্ঘ্য মাত্র ১০ মাইল।

ফরিদপুর-বরিশাল রেলওয়ে প্রজেক্টে কার্যকরী হয় ১৯৭৩ সালের ২৪ জুলাই।

পদ্মা, মেঘনা, মধুমতী নদীপথে স্টিমার চলাচল করে। গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুর হয়ে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত সারাবছর স্টিমার যাতায়াত করে থাকে। পদ্মা ও যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) সঙ্গমে

গোয়ালন্দ অন্যতম নদী বন্দর। তাছাড়া বাংলাদেশের রেলওয়ের টর্মিনাস উত্তরপ্রান্তে সংযোগকেন্দ্র। এখান থেকে কুষ্টিয়ার রেল সংযোগ রয়েছে। রেলপথের যাত্রীরা এবং মালপত্র সহজে স্টিমার স্টেশনে পৌঁছায়। গোপালগঞ্জ ও মাদারিপুর থেকে খুলনা এবং মাদারিপুর থেকে বরিশাল যাওয়ার যে স্টিমার সার্ভিস ছিল, আপাতত তা বন্ধ হয়ে গেছে।

মাদারিপুর বিল রুটটির গুরুত্ব নানাভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশ শতকের প্রথমে এই নদীপথটি খনন করা হয় মাদারিপুর বিলের মধ্য দিয়ে। বলা হত গ্রান্ড কানাল রুট। খননের উদ্দেশ্য ছিল খুলনা ও আঠারবাকি নদী হয়ে কলকাতার সঙ্গে পদ্মার সংযোগ সাধন। কিন্তু পরিকল্পনা কার্যকরী না হওয়ার অন্যতম কারণ খালের নাব্যতা রক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকা। এই বিল রুট দিয়ে মাদারিপুর থেকে খুলনা যেতে ৮৯ মাইল কম লাগে। কবিরাজপুরে আরিয়লখাঁ নদী এবং গোপালগঞ্জের কাছে মানিকদহে মধুমতী নদীকে সংযুক্ত করা হয়। এই নদীটির মাঝখানেই মাদারিপুর বিল, বছরের বেশির ভাগ সময় যা শুষ্ক অবস্থায় পড়ে থাকে।

জেলার কয়েকটি বাস সার্ভিস ঃ

বাস সার্ভিস	রুটে কয়েকটি বিশিষ্ট স্থান
১. ফরিদপুব-টেকেরহাট	বাখুনদিয়া, তালমা, পুকুরিয়া ভাঙা ও টেকেবহাট
২. টেকেরহাট-মাদারিপুর	মুস্তাফাপুর ও মাদারিপুব
৩. ফবিদপুব-কামারখালি	কানাইপুর, মধুখালি ও কামারখালি।
৪. মাদারিপুর-ভুবঘাটা	ভুরঘাটা, বরিশালের সঙ্গে সংযোগবক্ষাকাবী
৫. ফরিদপুর-রাজবাডি	বাজবাড়ি টাউন

রেস্ট হাউস ও ডাকবাঙ্লো ঃ

কোথায় অবস্থিত	উপযোগী ব্যবস্থা	নিয়ন্ত্রক সংস্থা
১. ফরিদপুর সদর রেস্টহাউস ফরিদপুর শহর, ফবিদপুর	৪ ঘর ৫ শয্যা	রোড ও হাইওয়েজ ডিরেক্টরেট, ফরিদপুর রোড ডিভিশন
২. কামারখালি রেস্ট হাউস কামারখালি ঘাট, ফরিদপুর	২ ঘর ২ শয্যা	ঐ
৩. রাজবাড়ি রেস্ট হাউস রাজবাড়ি, ফরিদপুর	২ ঘর	ঐ
৪. গোপালগঞ্জ রেস্ট হাউস গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর	১ ঘর	ঐ
৫. ইনস্পেকসন বাঙ্লো মাদারিপুর, ফরিদপুর	২ ঘর ২ শয্যা	ঐ
৬. রাজবাড়ি রেস্ট হাউস রাজবাড়ি, ফরিদপুর	২ ঘর	জেলা কাউন্সিল
৭ ফরিদপুর ডাকবাঙ্লো কোতওযালি, ফরিদপুর	২৮ শয্যা	ঐ

৮. ভাঙা ডাকবাঙ্লো ভাঙা, ফরিদপুর	৪ শয্যা	জেলা কাউন্সিল
৯. নগরকান্দা ডাকবাঙ্লো নগরকান্দা, ফরিদপুর	২ শয্যা	ঐ
১০. সদরপুর ডাকবাঙ্লো সদরপুর, ফরিদপুর	২ শয্যা	ঐ
১১. বোয়ালমারি ডাকবাঙ্লো বোয়ালমারি, ফরিদপুর	২ শয্যা	ঐ
১২. গোপালগঞ্জ ডাকবাঙ্লো গোপালগঞ্জ ফরিদপুর	৪ শয্যা	ঐ
১৩. কোটালিপাড়া ডাকবাঙ্লো কোটালিপাড়া, ফরিদপুর	২ শয্যা	ঐ
১৪. ভাটিয়াপাড়া ডাকবাঙ্লো ভাটিয়াপাড়া, ফরিদপুর	২ শয্যা	ঐ
১৫. মাদারিপুর ডাকবাঙ্লো মাদারিপুর, ফরিদপুর	৬ শয্যা	ঐ
১৬. শিবচর ডাকবাঙ্লো শিবচর, ফরিদপুর	২ শয্যা	ঐ
১৭ পালঙ ডাকবাঙ্লো পালঙ, ফরিদপুর	২ শয্যা	ঐ
১৮. দামুদিয়া ডাকবাঙ্লো	১ শয্যা	ঐ
১৯. রাজবাড়ি ডাকবাঙ্লো রাজবাড়ি, ফরিদপুর	৪ শয্যা	ঐ
২০. পাঙশা ডাকবাঙ্লো পাঙশা, ফরিদপুর	২ শয্যা	ঐ
২১. বালিয়াকান্দি ডাকবাঙ্লো বালিয়াকান্দি, ফরিদপুর	২ শয্যা	ঐ

বিভিন্ন লঞ্চ সার্ভিস ঃ

১ মাদারিপুর—ঢাকা সার্ভিস

গুরুত্বপূর্ণ এই লঞ্চ সার্ভিস জেলার কয়েকটি স্থানের সঙ্গে ঢাকার সংযোগ সাধন করেছে। মাদারিপুর থেকে আরিয়লখাঁ নদী ধরে প্রথমে কালিকাপুর তারপর দুবালদিয়া নদী দিয়ে জানজিরা হয়ে পদ্মায় পড়ে। তারপর চাঁদপুর হয়ে ঢাকায় পৌঁছায়।

২. গোয়ালন্দ—ঢাকা সার্ভিস

জেলার গোয়ালন্দ, নারেরটেক হয়ে ঢাকার দিকে যাওয়ার পথে ঢাকা জেলার জামিলদা, মওয়া, দিঘলি এবং মুন্সিগঞ্জ হয়ে ঢাকায় পৌঁছায়। বর্ষার মরশুমে এই রুটের লঞ্চ গৌরগঞ্জের তালতলা খাল হয়ে মুন্সিগঞ্জের তালতলা পথ ব্যবহার করে।

৩. ভাঙা—ঢাকা সার্ভিস

এই পথে জেলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। ফরিদপুর জেলায় লঞ্চ স্টেশনগুলির মধ্যে আছে ভাঙা, দিগ্‌নগর, বামনডাঙা, টেকেরহাট, কবিরাজপুর, কাছারিঘাট, বাজাহাট ও

কালিকাপুর। তারপর দুবালদিয়া খাল হয়ে ঢাকা যাওয়ার পথে পদ্মায় পড়ে। বর্ষার সময় ব্যবহার করে তালতলা খাল।

৪. গোয়ালন্দ—দাউদকান্দি সার্ভিস

এই লঞ্চ সার্ভিস গোয়ালন্দ থেকে কুমিল্লা যাতায়াতের সময়ে জেলার একটি মাত্র স্টিমার ঘাট ও নদী বন্দর ব্যবহার করলেও, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ও কুমিল্লার সঙ্গে সংযোগ সাধন করেছে। এই পথে জেলার মধ্যবর্তী যে সমস্ত লঞ্চ ঘাট পড়ে সেগুলি হল—গোয়ালন্দ, নাবেরটেক, পাতরাইল, লক্ষীকুল, পিঁযাজখালি ও চৌধুরিহাট। তারপর ঢাকা জেলার ভাগ্যকুল দিঘলি হয়ে কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর হয়ে দাউদকান্দি পৌঁছায়।

৫. মাদারিপুর—বরিশাল সার্ভিস

এই রুটের লঞ্চ বরিশালের সঙ্গে ফরিদপুরের সংযোগ সাধন করেছে। জেলার মাদারিপুর, আঙারিয়া, খাজুরতলা এবং কাকচিকাটা হল অন্যতম লঞ্চ স্টেশন। বরিশাল পৌঁছায় নাদিববাজাব ও তালতলি হয়ে।

৬ মাদারিপুর—খুলনা সার্ভিস

ফরিদপুর ও খুলনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্থানের সঙ্গে এই রুট সংযুক্ত। মাদারিপুর, কালিকাপুর, রাজারহাট, কবিবাজপুর, টেকেরহাট, জলিরপাড়, সাতপার, বেলতলি, উলপুর ও হরিদাসপুর এই কয়েকটি স্থান পেরিয়ে টোনা, কালিয়া, গাজিরহাট ও দৌলতপুর হয়ে খুলনা পৌঁছায়।

৭. ফরিদপুর —খুলনা সার্ভিস

ফরিদপুর জেলার প্রধান কার্যালয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানেব সঙ্গে খুলনা জেলার সংযোগ স্থাপিত হয়েছে এই রুটের মাধ্যমে। জেলার মধ্যে লঞ্চ স্টেশনগুলি হল ফরিদপুর, বাকুন্দিয়া, রসুলপুর, ভাওয়াল, আইমপুর, চাগলদিয়া, নগবকান্দা, পুরাইদা, মনসুরাবাদ, ভাঙা, ঘাওরিয়া, সুমারদি, দিগনগব, বামনডাঙা, গোহালা, সিন্দিয়াঘাট, কালিগ্রাম, সাতপাড, বেলতলি, উলপুর, হরিদাসপুর এবং গোপালগঞ্জ। জেলা পেরিয়ে তালা, টোনা ও দৌলতপুর হয়ে খুলনায় পৌঁছায়।

৮. ভাঙা—খুলনা সার্ভিস

ভাঙা থেকে খুলনা পর্যন্ত সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ লঞ্চ রুট। জেলার ভাঙা, গাটুয়া, চামোবদি, দিগনগর, বামনডাঙা, গোহালা, টেকেরহাট, কালিগ্রাম, সাতপাড়, বেলতলি, উলপুর, হরিদাসপুর ইত্যাদি হয়ে খুলনা জেলার মানিকাদা, যোগানিয়া, জয়নগর, টোনা, নোয়াগ্রাম ও দৌলতপুর হয়ে খুলনা পৌঁছায়।

৯. গোপালগঞ্জ—গোয়ালগ্রাম সার্ভিস

এই লঞ্চ সার্ভিস জেলার অভ্যন্তরে চলাচল করে। রুটের স্টেশনগুলি হল গোপালগঞ্জ, হরিদাসপুর, ভেরারহাট, রাউত-খামার, তালতলা, নড়াইল, রামদিয়া, ওরাকান্দি, সাহানাডাঙা, কুমবিয়া ও গোয়ালগ্রাম।

১০. মাদারিপুর—টেকেরহাট সার্ভিস

জেলার অভ্যন্তরে মাদারিপুর, কবিরাজপুর, রাজারহাট, কাছারিঘাট ও টেকেরহাটের মধ্যে চলাচল করে।

১১. ফরিদপুর—ঢাকা সার্ভিস

এই রুটের মাধ্যম রাজধানীর সঙ্গে জেলা সদরগুলি যুক্ত। রুটের লঞ্চ স্টেশনগুলি হল ফরিদপুর, হাজিগঞ্জ, গজারিয়া, কৃষ্ণপুব, কটখালি, সদরপুর, বাবুবচর, পিঁয়াজখালি এবং চৌধুরিহাট। তারপর ঢাকা জেলার জসিলদা দিঘলি হয়ে ঢাকা পৌঁছায়।

১২. ভাঙা—ঢাকা সার্ভিস

এই লঞ্চ সার্ভিস ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে সংযুক্ত করেছে। ফরিদপুর জেলার ভাঙা, গাঢুয়া, দিগনগর, বামনডাঙা, টেকেরহাট, কবিরাজপুর, মোচারপুর, শিরেল, উত্তরেল, দত্তপাড়া, চান্দেরবাজার, মাভেল, বালিয়াতি, চৌধুরিহাট এবং ঢাকা জেলার ভাগ্যকুল, জশিলদা, মাওয়া, দিঘলিয়া, গৌরগঞ্জ, কাঠপট্টি ও ঢাকাব মধ্যে যাতায়াত করে।

১৩. গোয়ালন্দ—চাঁদপুর সার্ভিস

ফরিদপুর জেলার একমাত্র নদীবন্দরের সঙ্গে কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্র ও জেলা জংসনের সঙ্গে যুক্ত। এই রুটের লঞ্চ স্টেশনগুলি হল ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ, নারেরটেক, পাতরাইল, পিঁয়াজখালি ও চৌধুরিহাট।

১৪. টেপাখোলা—নারায়ণগঞ্জ সার্ভিস

ঢাকা জেলার ব্যস্ততম ব্যবসা কেন্দ্র ও নদীবন্দর নারায়ণগঞ্জের সঙ্গে ফরিদপুর জেলার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান এই সার্ভিস মাধ্যমে যুক্ত। জেলার মধ্যে বিভিন্ন লঞ্চ স্টেশন হল টেপাখোলা, হাজিগঞ্জ, গজারিয়া, কৃষ্ণপুর, শোলডুবি, সদরপুর, বাবুরচর, পিঁয়াজখালি ও চৌধুরিহাট। তারপর ঢাকা জেলার ভাগ্যকুল হয়ে জমিলডা, মাওয়া, দিঘলি, গৌরগঞ্জ, বলিগাঁও, আবদুল্লাপুর, কাঠপট্টি, মুন্সিগঞ্জ হয়ে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছায়।

১৫. মাদারিপুর—সুরেশ্বর সার্ভিস

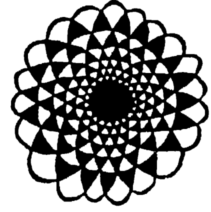
কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্র চাঁদপুরের সঙ্গে ফরিদপুরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান সংযুক্ত। এই রুটের লঞ্চ স্টেশনগুলি হল মাদারিপুর, বিধাবাগিশ, দাউদপুর, আঙারিয়া প্রভৃতি। তারপর পালঙ, ভোজেশ্বর হয়ে সুরেশ্বরে পৌঁছায়।

১৬. টেকেরহাট—খুলনা সার্ভিস

ফরিদপুর জেলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সঙ্গে খুলনা জেলা যুক্ত এই লঞ্চ সার্ভিসের মাধ্যমে। জেলার অভ্যন্তরের টেকেরহাট, কালিগ্রাম, সাতপাড়, বাউলতলি, তেঁতুলিয়া, হরিদাসপুর, মানিকদহ হয়ে খুলনা জেলার টালা, জয়নগর, টোনা, গাজিহাট ও দৌলতপুর পৌঁছায়।

১৭. আর একটি লঞ্চ সার্ভিস গোয়ালন্দ-আরিচা-নগরবাড়ি হয়ে জগন্নাথগঞ্জের মধ্যে চলাচল করে।

কৃষি ঃ শিল্প ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য
হাট-বাজার ঃ ব্যাঙ্ক ঃ মেলা



কৃষি ঃ

ফরিদপুরের প্রধান কৃষি দ্রব্য চাউল। আমন, আউস, বোবো, রায়দা এইগুলি প্রধান। এর মধ্যে প্রথম দুটি জেলার প্রধান খাদ্য। পরের দুটি যারা চাষ করে, তাদের আহারের প্রয়োজন মেটায়। হান্টারের বিবরণে পাওয়া যায়—আমন চাউল সাধারণত দু রকমের—বরণ ও ছোট্না। এব মধ্যে বরণ আমন ২৩ রকম ঃ

১. ছত্রভোগ	২ দুধমণি	৩. লেপা	৪. মান্দ্রাজী (মাদ্রাজ)
৫. গাওয়া-রাজল	৬. গাজিভোগ	৭. পীতরাজ	৮. কাচকলম
৯ ঝুল	১০. সাদা নালাজি	১১. সীতালক্ষ্মী	১২. ভোজনকর্পূর
১৩. মহিষ ·ান্দি	১৪. লালবাদল	১৫. নারিকেল বাদা	১৬. খায়া মুগরি
১৭. বাঘরাইল	১৮. মুক্তহার	১৯. দল-কচু	২০. ফুল আমন
২১. বালিয়াবেত	২২. লক্ষ্মী হিদা	২৩. বয়েরা	

—এই সব আমন চাষ হয় অল্প জলাভূমিতে চৈত্র ও বৈশাখ মাসে (মার্চ-এপ্রিল-মে)। ধান পাকে অগ্রহায়ণ ও পৌষে (নভেম্বর-ডিসেম্বর-জানুযারি)।

ছোট্না আমন হত ১৩ রকম ঃ

১. হরিয়াকাটি	২. কাটিয়া লেপা	৩. সোনাদিঘা	৪. খান্দি
৫. মধুশৈল	৬. ধলিয়াদিঘা	৭. কাণকুয়া	৮. ঘোরভাগ
৯. পবপুরি	১০. বাশিবাজ	১১. ঝুঙাশৈল	১২. মালভোগ
১৩ হিদা			

—ওপরে যে ১৩ রকম ধান-চাউলের কথা বলা হল, এই ধানের চাষ হয় ভিজে স্যাঁতসেঁতে জায়গায় চৈত্র-বৈশাখ মাসে (মার্চ-এপ্রিল-মে) এবং কার্তিক মাসে (অক্টোবব নভেম্বব)।

২৭ রকম আউস ধানের ফলন হত। তার মধ্যে ছিল ঃ

১. বীনা-ফুল	২. লোহাসলা	৩. কৌটুকমনি	৪. কালীজিরা
৫ দাশনাগব	৬ সমুদ্রফেনা	৭. বেগুনবিচি	৮. বাকুই
৯. বাইলান			

এই ধান রোযা হয় চৈত্র বেশাখ মাসে (মার্চ-এপ্রিল-মে) নিচু জমিতে। ধান পাকে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে (জুন-জুলাই-আগস্ট)।

১০. পারঙ্গি—ওপরের ধানের মতই রোযা ও পাকার সময়।

১১. মল্লিকা	১২. নিমতেল	১৩. লক্ষ্মীপুরা	১৪ ঘিকরগুর
১৫. পিপরাইল	১৬. মানিক-মণ্ডল		

এই ধান রোযা হয় নিচু জমিতে মার্চ-এপ্রিল-মে মাসে। ধান পাকে জুন-জুলাই-আগস্ট মাসে।

১৭ সাইতিয়া—নিচু জমিতে এপ্রিল-মে মাসে বোনা হয়। পাকে জুন জুলাই মাসে।

১৮. পাজরা	১৯. সাদা	২০. কেদারচব	২১. কাওজুরি
২২. বানিয়াবতর			

এই ধানও নিচু জমিতে মার্চ-এপ্রিল-মে মাসে বোনা হয়। ধান পাকে জুন জুলাই ও আগস্টে।

২৩. কুমরাইল ২৪. কচারনারী
উঁচু ও নিচু সব ধরনের জমিতে চাষ হয়। ধান বোনা ও পাকার সময় আগেব মতই।
২৫. সোনাগাজি ২৬. পঙ্খীরাজ পবাঙ্গী
উঁচু ও শুকনো জমিতে চাষ হয়। বোন ও পাকার সময় আগের মতই।
২৭. পাটনাগেশ্বর—নিচু জমিতে ওপরের সময় মতই বোনা হয়। একই সময়ে পাকে।
পাঁচরকম বোবো ধান হল ঃ ১. বটর-পিঁয়াজ ২. কৈজোর ৩. সোনার গাইজা ৪. শালকাঠি ৫. কলজাগলি।
চার রকম রাইদা ধান হল ঃ ১. ঢাকাই ২. পিপরি ৩. আমানিয়া ৪. দেশাল।

হান্টারের বিবরণে ফরিদপুর জেলার কৃষিসম্পদের যে বিবরণ পাওয়া যায়, বর্তমানে জেলার সেই সব সম্পদ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলার প্রধান শস্য উৎপাদনে ধান ও পাটের অবস্থান সবার ওপরে। মোট কৃষিযোগ্য জমির ৬৪ শতাংশে ধান এবং ২৫ শতাংশে পাট চাষ হয়। এরপরেই বিভিন্ন রকম কলাইয়ের চাষ হয় ৮০,৮৪৫ একর জমিতে।

বর্তমানে উৎপাদিত কৃষিদ্রব্যের অন্যতম কয়েকটি ঃ

খাদ্যশস্য ঃ	আউস	গম	রবিশস্য
	আমন	বার্লি	বাদোই শস্য
	বোরো	মেইজি	
কলাই ঃ	কলাই	মুগ	মাসকলাই
	অড়হর		কেসারি
	বরবটি	মটর	
	রবিশস্য	বাদোইশস্য	
তৈলবীজ ঃ	তিসি	সরিষা দানা	
	তিল (গ্রীষ্মকালীন)	বাদাম	নারকেল
	তিল (শীতকালীন)	রেড়ি	অন্যান্য তৈলবীজ
মশলা ও মশলাজাত আচার ঃ	লঙ্কা	পিঁয়াজ	রসুন
	অন্যান্য আচার চাটনি		কাসুন্দি
চিনি ঃ	আখ		
তন্তু ঃ	পাট		
নেশার দ্রব্য ঃ	তামাক	সুপারি	পান
	অন্যান্য নেশার দ্রব্য		
ফল এবং সবজি ঃ	কলা	আম	আনারস
	লেবু জাতীয় ফল	কাঁঠাল	পেঁপে
	তরমুজ	লিচু	অন্যান্য ফল
	সবজি (রবি)	সবজি (বাদোই)	
গবাদি পশুর খাদ্য ঃ	রবি		
	বাদোই		
অন্যান্য কৃষি পণ্য ঃ	গোল আলু		
	মিষ্টি আলু		

শীতলাকীন ফসল আমন, শরৎকালীন ফসল আউস এবং বসন্তকালীন ফসল বোরো। বিল অঞ্চলে চাষের সঙ্গে এই বিভাজনের কোন সম্পর্ক নেই। বিল অঞ্চলে ধান বোনা পাকা

নির্ভর করে জলের পরিমাণের ওপর। এই অঞ্চলে জল প্রতিবছর সবসময়ে পরিমাণ মত মেলে না। প্রতিবছর এই তিন রকম ধানই বিল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। আর সেই সব ধানর সঠিক শ্রেণি নির্ভর একমাত্র কৃষিজীবীর পক্ষে সম্ভব। তাছাড়া একই ধান জেলার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যে সব কৃষক ফসল কাটতে ময়মনসিংহ, সিলেট বা বাকরগঞ্জে যায়, তারা বিগত একশ বছরে বহু শ্রেণির ধানের প্রচলন করেছে এই জেলায়।

আউসের চাষ সব থেকে বেশি হয় জেলাব উত্তরাংশে গোয়ালন্দ জেলায়। তারপর ফরিদপুর জেলায় (সদর)। অন্যান্য অংশে উৎপাদনেব পরিমাণ সামান্য। ৫,৭৭,০১৫ একর জমিতে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬৪,৯২৫ টন (১৯৬৯-৭০)।

জেলার দক্ষিণাংশের প্রধান ফসল শীতকালীন আমন। গোপালগঞ্জ ও মাদারিপুর জেলার সর্বত্র আমন চাষ হয় সব থেকে বেশি। জেলাব উত্তরাংশে উৎপাদনের পরিমাণ সামান্য। দক্ষিণ-পশ্চিমের জলা এলাকায় বরণ আমনের ফলন পর্যাপ্ত। ১৯৬৯-৭০ সালে ৭,৮৬,২০০ একর জমিতে ৩,০৩,৬৪৫ টন আমন উৎপাদন হয়েছিল। আমন ধানের চালের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্র হল ঘিয়েরবাজার, গোপালগঞ্জ, পাঙসা, ভাণ্ডার, কুমারখালি ও মাদারিপুর।

বসন্তকালীন বোরো চাষ হয় জলা ও বিল এলাকায় বা চর অঞ্চলে। এই ধানের উৎপাদন গোপালগঞ্জ ও কোটালিপাড়া এলাকায় সব থেকে বেশি।

ভিজে বা স্যাঁতসেঁতে জায়গায় গমের যে ফলন হয়, তা স্থানীয় মানুষের চাহিদা মেটাতেই লেগে যায়। গমের চাষ শুরু হয় নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে। মার্চ-এপ্রিলে পেকে ওঠে।

প্রায ১,৩৭,৫৫৫ একর জমিতে খেসাড়ি, মুসুর, মাসকলাই, মুগ, কলাইদানা, মোটর এবং অড়হর জাতীয় কলাই চাষ হচ্ছে।

তৈলবীজের মধ্যে সব থেকে বেশি উৎপাদন সরিষার। দুরকমের উৎপাদন হয়—সরিষা এবং রাই। রাই থেকে উৎকৃষ্ট মানের তেল পাওয়া যায়। রাজৈর, মাদারিপুর, কালকিনি এবং মকসুদপুরে চাষ হয় সব থেকে বেশি। তিল দু'রকমের—গ্রীষ্মকালীন এবং শীতকালীন তিল। দুরকমেব তিল থেকে তেল পাওয়া যায়। কালকিনি, গোপালগঞ্জ, মকসুদপুর, মাদাবিপুর এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলে তিলের চাষ ব্যাপক।

মসিনা বা তিসির উৎপাদন পর্যাপ্ত। লঙ্কা, পিঁয়াজ, রসুন, ধনিয়া, হলদি, আদা-র চাষও উৎপাদন কেবল আভ্যন্তরীণ চাহিদাই মেটায় না, অন্যান্য জেলাব বাজারেও চাহিদা আছে।

কয়েকরকম আখের চাষ হয়। যেমন—রজলা, ধলসুন্দর, খইলা এবং চুনিয়া। আখের রস জ্বাল দিয়া গুড় এবং অপরিশোধিত চিনি পাওয়া যায়। আখের চাষেব ব্যাপকতা বেশি মাদারিপুর, কালকিনি, পালঙ, ঘোষেরহাট এবং ভেদেরগঞ্জ অঞ্চলে।

গোল আলু, মিষ্টি আলু, মুলা, বেগুন, কুমড়া, শসা, লাউ, করোলা, কাঁকরোল, পটল, ঝিঙা, বিন, বরবটি, কচু (পানিকচু ও মানকচু), ডাটাশাক, পালঙশাক, পুঁইশাক, কলমিশাক, ওল—এরকম স্থানীয় শাকসবজি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শীতের সময়ে পাওয়া যায় টমেটো, বাঁধাকপি, ফুলকপি এবং ওলকপি জাতীয় শীতের সব্জি।

তামাক উৎপাদনেও ফরিদপুর পিছিয়ে নেই। বীজ ছড়ানো হয় ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে। নতুন তামাক পাতা বাজারে আসে অক্টোবর-নভেম্বরে। আধ থেকে এক সেরে বীজে ১০ থেকে পনের মন পাওয়া যায় প্রতি একরে। ১৯৬৭-৭০ সালে ৬,৭৭৫ একর জমিতে ১,৫৮০ টন তামাক চাষ হয়েছিল। তামাক ধূমপানে লাগে। সে তামাক তৈরি করতে হয় বিশেষ পদ্ধতিতে। গ্রামে বৃদ্ধাদের মধ্যে শুকনো তামাকপাতা পানেব সঙ্গে চিবিয়ে খাওয়ার প্রচলন ছিল। কোথাও কোথাও তামাকগুড়ো নস্যের পরিবর্তেও ব্যবহৃত হত।

সুপারি পাওয়া যায় বিপুল পরিমাণ। সারা জেলা ছড়িয়ে আছে সুপারি গাছ। যদিও বাকরগঞ্জের মত সুসজ্জিত বাগিচা এখানে না থাকলেও, উত্তরের পালঙ্ থানায় ছোট ছোট সুপারি বাগিচা দেখা যায়। এই সব গাছ ফলবতী থাকে ২০ থেকে ৩০ বছর। সুপারি এখান থেকে রপ্তানি হয় না। স্থানীয় চাহিদা মেটায়।

সুপারির মত পানও উৎপাদন হয়। তবে জেলাব উঁচু স্থানে পান পাতার চাষ বেশি। চাষ হয় সাধারণত ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিলে। পাতা পরিণত হলেই সারা বছর তোলা যায়। পানের বরোজ বিশেষভাবে তৈরি করতে হয়। তার ভিতর থাকে পান পাতার লতানো গাছ। এই ববোজ চোখে পড়ে জেলার সর্বত্র। ওপবে খড়ের ছাউনি থাকে বোদ থেকে গাছ বাঁচাতে। তাছাড়া নানারকম পরিচর্যারও প্রয়োজন পড়ে। জল যাতে না জমে সবসময় সেদিকে নজব রাখতে হয়। তাছাড়া উৎকৃষ্ট মানের সার, বিশেষ করে সরষের খৈল সার হিসাবে ব্যবহারই বেশি। ফরিদপুরেব সর্বত্র সাধারণ পানের উৎপাদন থাকলেও, ছাঁচিপানের কোন উৎপাদন নেই।

কৃষি অর্থনীতিতে ফলফলাদির উৎপাদন তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাকরগঞ্জের তুলনায় ফরিদপুরে ফলসমৃদ্ধ গাছপালাব পরিমাণ অনেক কম। ফলবাগিচা না থাকলেও, জেলার সর্বত্র আছে নানা রকম গাছপালা। ফল চাষের পবিমাণ ক্রমশ কমে আসছে। তবে আম, কাঁঠাল, নারিকেল, খেজুর, কলা পেঁপে, লিচু, লেবু, বাতাবি লেবু, আতা, বেল, তাল, কুল এরকম সাধারণ ফল পর্যন্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে আম গাছ। একটি আম গাছ সাধারণত ৫০ বছর বাঁচে। ফরিদপুরের আম তেমন সুস্বাদু নয়। জেলার মানুষের প্রিয় আমসত্ব। ঠিকমত রাখতে পারলে আমসত্বে পাকা আমের স্বাদ থাকে সারা বছর।

গোয়ালন্দ, শিবচর, কোতওয়ালিপাড়া ও গোপালগঞ্জ ছাড়া সর্বত্র খেজুর গাছ আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। খেজুর গাছের চাষ হয় না। সাধারণ জমির আলের আশেপাশে জন্মায়। একটি গাছ সাধারণ বাঁচে ২০ বছব। খেজুরের রস থেকে গুড় তৈরি হয়। এবং রস মানুষের প্রিয় পানীয়। রস পাওয়া যায় শীতের শুরু থেকে।

তাল, কাঁঠাল ফলন কম নয়। একটি কাঁঠাল গাছের পরমায়ু সাধারণত ৪০ বছর। তাল গাছের কাঠ কাজে লাগে। কাঁঠাল কাঠ এখনও গ্রামাঞ্চলে ব্যবহার করা হয়।

বর্তমানে চাষাবাদে রাসায়নিক সার প্রাধান্য পেলেও, সরিষার খৈল ব্যবহার হয় আলু, পান এবং আখ চাষের খেতে। ধান খেতেও গোবরসারের তুলনায় রাসায়নিক সার প্রয়োগ অনেক বেড়েছে। তবে চাষাবাদ পদ্ধতিতে এখনও ব্যবহার করা হয়ে থাকে সনাতন পদ্ধতি—লাঙল, গরু আর মই।

সার ব্যবহারের পরিমাণ (টন হিসাবে)

	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৯-৭০	১৯৭০-৭১
ইউরিয়া	৫২৬.৭১	৯২১.৭০	১,০২৪.৪২	১,৭৩৩-৩৬	২,১৯১.৮৯	২,৭৫৫.৪৫
ট্রিপল সুপার ফসফেট	১৮৭.৬১	৪৭৪.৫২	৩৮৮ ০৩	৮০২.৯৫	৮৪১.২৫	১,৩৩৮.৪৬
মিউরেট পটাস	১০৮.৮৪	৩০০.২৩	২৩৭.৮৫	৪৫১.৪৩	৪৭০.৬৬	৬৮৬.৭৪
অ্যামোনিয়াম ফসফেট	৫.৭৬	২১.০৫	২৯.৮১	৯.৭১	০.৪৩	—
সিঙ্গল সুপার ফসফেট	৩.৭১	—	—	—	—	—
মোট	৮৩২.৬৩	১,৭১৭.৫০	১৬৮০ ১১	৩,০০০.৪৫	৩,৫০৪.২৩	৪,৭৮০.৬৫

গবাদিপশু আছে পর্যাপ্ত পরিমাণেই। মহিষ, গরু, মেষ, ছাগল, হাঁস-মুরগি, ঘোড়াব সংখ্যা যথেষ্ট। পশুখাদ্যের অভাব নেই। চর অঞ্চল, বিশেষ করে যেখানে এখনও চাষাবাদ শুরু হয়নি, সেখানে প্রচুর ঘাস জন্মায়। যা পশু খাদ্যের উপযোগী। তাছাড়া ধান কাটার পর তাদের খাবাবের অভাব হয় না। গরু ও মহিষ থেকে পাওয়া দুধের পরিমাণ কম নয়। একটি গরু বছরে ২৬৮ সের এবং একটি মহিষ বছবে ৪৮০ সের দুধ দেয়। এখানে চারটি শহবেব জনসংখ্যা ও দুধ সরবরাহের পরিমাণ উল্লেখ করা হল (১৯৬০ সাল) ঃ

	জনসংখ্যা	দুধ সরবরাহের পরিমাণ
ফরিদপুব	২৮,৩৩৩	৮৩৭
রাজবাড়ি	১৬,০৪৪	৫০৯
মাদারিপুর	২৫,৩২৮	১,০৯১
গোপালগঞ্জ	৮,৮৫৬	৩৬৪

দুধ থেকে তৈরি হয় নানা জাতীয় খাদ্য দ্রব্য জেলার সর্বত্র। এর মধ্যে মাদারিপুর, ফবিদপুর এবং রাজবাড়ির খ্যাতি সব থেকে বেশি। স্থানীয় গোয়ালারা ঘি এবং মাখম তৈরি করে থাকে। তাছাড়া কৃষিজীবীদের মধ্যেও ঘি তৈরির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এরা সাধারণত দুধের সর থেকেই ঘি তৈরি করে।

ফদিরপুর জেলা রকমারি মাছের জন্য বিখ্যাত। জেলার মানুষ মাছ খেতে অভ্যস্ত। রপ্তানি থেকে আয়েব পরিমাণ কম নয়। বিভিন্ন রকম জলাশয়ে মাছের চায এবং মাছ ধরা হয়। এর মধ্যে আছে ঃ

১. নদী ও খাল—উল্লেখযোগ্য হল পদ্মা, আরিয়লখাঁ, মধুমতী, কুমার, চন্দনা। এদের প্রবহমান ধারায় (আয়তন প্রায় ৩১,৭১৯ একর) মাছ ধরা পড়ে প্রচুর।

২. বিল/বাওড়—এ জেলায় কম নয়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য এ জাতীয় জলাশয় হল ঃ চিতলিয়া বিল, ঘোরামারা বিল, কৈচাইল বিল, মেঘনা বিল, বিল পদ্মা, ভাসা বিল, নৈতা বিল, মহিষতোলী বিল, ধোপাডাঙা বাওড়, বোরনি বাওড়, গোপালগঞ্জ বাওড় এবং বৈকুণ্ঠপুর বাওড়। এর আয়তন প্রায় ১,০৭৮ একর।

৩. জেলায় মাছ চাযের পুকুবের সংখ্যা ৬৮,৪৯০। আয়তন প্রায় ১৭,৯৩০ একর। তাছাড়া কয়েকটি সুবিশাল দিঘি এবং পুষ্করিণী আছে। বিল, বাওড়, পুকুর, দিঘি এবং ধান চাষের নিচু জমি থেকে ধরা মাছের পরিমাণ বছরে ১,১১,১১৪ টন। সব থেকে বেশি মাছ পাওয়া যায় গোয়ালন্দ ঘাট, কামাবখালি, ভাঙা, পিঁয়াজখালি, সিন্ধিয়া ঘাট, চরমুগুরিয়া, লাওখোলা, রাজবাড়ি এবং কালুখালি অঞ্চলে।

মাছের বড় বাজার হল ঃ ফরিদপুর, কানাইপুর, রাজবাড়ি, খানখানপুর, বেরারহাট, টেংরাখোলা, মাদারিপুর, টেকেরহাট, চিলার চর, দেবলদিয়া, কামাবখালি, ভেদারগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, চরমুগুরিয়া, বোয়ালমারি, পিঁয়াজখালি, কালুখালি, শিবচর, চাঁদের হাট এবং কলকিনি।

মাছের প্রাধান্যের কারণে এক শ্রেণির মানুষের জীবিকাই হল মাছ ধরা। সাধারণত যেখানে মাছ ধরার সুবিধা এবং প্রচুর মাছ পাওয়া যায়, অর্থাৎ বিল, বাওড় ও নদী পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাবা বসতি গড়ে তুলেছে। এরকম ৪,৮৬০টি পরিবারে জেলে সংখ্যা ১৫,৫০৪। এরা নদী, বিভিন্ন বড় বড় জলাশয়, নদী মোহনা ও বিলে মাছ ধরে থাকে। বিভিন্ন থানায় জেলে-গ্রাম ও তাদের সংখ্যা দেওয়া হল ঃ

থানা	জেলে গ্রাম	জেলে সংখ্যা
১. কোতওয়ালি	৪	৪০৫
২. সদরপুর	৩	৩৩৩
৩. চর ভদ্রাসন	৪	৩১৫
৪. ভাঙা	৯	৬৮৮
৫. নগরকান্দা	১১	৭১৩
৬. বোয়ালমারি	৬	৫৪২
৭. আলফাডাঙা	৪	৩৫১
৮. রাজবাড়ি	৫	৬১৩
৯. গোয়ালন্দ ঘাট	৩	২১৮
১০. পাঙসা	৪	৪০৭
১১. বালিয়াকান্দি	৬	৭২৩
১২. গোপালগঞ্জ	৮	৯৬৩
১৩. কাশিয়ানি	৭	৬৭৮
১৪ কোতওয়ালিপাড়া	৫	৫১৭
১৫ মুকসুদপুর	১৩	১,৮৯৩
১৬. মাদারিপুর	৭	৬৯৮
১৭. কলকিনি	৫	৪৮২
১৮. রাজোইর	৩	২০৩
১৯. শিবচর	১৫	১,৮১৫
২০. জানজিরা	৪	৩৯০
২১. নলিয়া	৬	৪৫১
২২. পালঙ	৫	৪১৭
২৩. ভেদেরগঞ্জ	৮	৮১২
২৪. ঘোষেরহাট	১০	৮৭৭
মোট	১৫৫	১৫,৫০৪

মাছ ধরায় ব্যবহৃত হয় নানারকম জাল। তার অন্যতম কয়েকটি হল ঃ

১. টানা বা বেড় জাল—সবরকমের মাছ ধরতে ব্যবহার করা হয়।

২. খেপলা জাল—ছোট ছোট মাছ এবং বাগদা ধরা যায়।

৩. ভাসাল জাল—তিনটি বাসের টুকরো দিয়ে তৈরি। ছোট ছোট জলধারা, খাল প্রভৃতিতে মাছ ধরার কাজে লাগে।

৪. খড়কে জাল—সাধারণত ইলিশ মাছ ধরা হয়ে থাকে।

৫. চাঁদনি জাল—নদীতে ইলিশ ও অন্যান্য বড় মাছ ধরা হয়।

৬. ধর্ম জাল—এই চৌকো জাল দিয়ে নদী নালায় ছোট ছোট মাছ ধরে।

বর্তমানে সমবায় ও কৃষি ব্যাঙ্ক থেকে কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবীদের ঋণদানের ব্যবস্থা হয়েছে।

শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য

প্রধানত কৃষি প্রধান জেলা ফরিদপুর। শিল্প উদ্যোগ খুবই সীমিত। শিল্প বলতে বৃহৎ কোন শিল্পের বিকাশ এখানে ঘটেনি। যা আছে তা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ ছবিটাই ছিল স্পষ্ট। বেশিরভাগ মানুষই ছিল কৃষির ওপর নির্ভরশীল। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত জুট প্রেস, পাট বুনন, তাঁত বুনন, মাদুর ও ঝুড়ি বুনন, ইট ও টালি তৈরি, গুড় তৈরি, পিতল কাঁসার কাজ এবং মাছ ধরাই ছিল প্রধান। এর মধ্যে পাট শিল্পটির বিকাশ ঘটে পরবর্তীকালে। দেশলাই, বিড়ি তৈরি হয়ে থাকে। মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাঁত শিল্প অনেক পিছিয়ে পড়েছে। মাছ ধরা একটি প্রধান সংগঠিত ব্যবসা---যার ওপর অকৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশই নির্ভরশীল।

জুট প্রেস-এর কাজে ১৯২০ সালে ৪৭টি সংস্থা যুক্ত ছিল। যার কর্মী সংখ্যা ছিল ৪,৮৩৮ জন। ৪০ শতকে জুট-প্রেস শিল্পটির যথেষ্ট উন্নতি ঘটলেও, ১৯৪৭ সালের পর ইংরেজ ও হিন্দু মালিকরা দেশত্যাগ করায় শিল্পটির পরিকাঠামো ভেঙে পড়তে থাকে। কিন্তু কাচা জুট-প্রেস কাজ চলতে থাকে। সে সময়ে অন্যতম দুটি সংস্থা ছিল ঃ

১. ডাফস অ্যান্ড ল্যানডেল লিঃ, চরমুগুরিয়া, ফরিদপুর।

২. তোলারাম পাচ্চারাজ, চরমুগুরিযা, ফরিদপুর।

—দুটি সংস্থাই ১৯৬০ সালে বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু চরমুগুরিয়া ও মাদারিপুরে জুট-প্রেস শিল্প এখনও বর্তমান। এখানে কাঁচাপাট গাট বেঁধে রপ্তানি করা হয।

কোতওয়ালিপুরে পাট থেকে চট ও থলি বোনা হয। যার আভ্যন্তরীণ বাজার যথেষ্ট। মেঝেয় পেতে শোয়ার উপযোগী চট তৈরি করা হয়। যা দরিদ্র কৃষিজীবীরা হোগলার ওপর বিছিয়ে শয্যা তৈরি করে।

দেশীয় শিল্পের মধ্যে তাঁতের ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। কারিগরি বা জোলা সম্প্রদায়ের মানুষ এই শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অকৃষিজীবী সম্প্রদাযের এক বিপুল সংখ্যক মানুষের তাঁত শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। গামছা, লুঙ্গি, মশারি, ধুতি, শাড়ি যে সমস্ত সুতি দ্রব্য এরা তৈরি করে তা স্থানীয় বাজারের চাহিদা মেটায়। রাজবাড়ি, মাদারিপুর ও ফরিদপুরের কিছু জায়গায় সূক্ষ্ম উন্নতমানের বস্ত্র, বিছানার চাদর, শার্ট ও কোর্টের কাপড় তৈরি হয়। এর বেশ কিছুপরিমাণ ঢাকায় বাজার পেয়েছে।

বাঁশের তৈরি বাস্কেট, চালুনি, মাদুর একসময়ে প্রতিটি গ্রামেই তৈরি হত। বেত থেকে চেয়ার, টেবিল, নানা ধরনের বাসকেট তৈরি হয় কালিয়াডি, পাংসা এবং কালিয়াকান্দি অঞ্চলে। ফরিদপুরের শীতলপাটির সুনাম দীর্ঘদিনের।

হান্টারের বিবরণে জেলার চিনি ও গুড়ের উল্লেখ আছে। এই দুটি ছিল অন্যতম উৎপাদন। এখনও ফরিদপুরের গুড়ের খ্যাতি অম্লান।

জেলার সর্বত্র আছে মৃৎ শিল্প কেন্দ্র। ফরিদপুরের হিন্দু সম্প্রদায়ের কুম্ভকাররা ১৯৪৭ সালে দেশ ত্যাগ করায় যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই স্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। মাটির তৈরি নানা ধরনের দ্রব্য এখনও ফরিদপুরের বিভিন্ন বাজারে ও হাটে বিক্রি হয়। এইসব দ্রব্য ঢাকা ও বাকরগঞ্জ অঞ্চলেও রপ্তানি হয়।

স্থানীয় কলুরা ঘানিতে সরষের তেল তৈরি করে। কিছু নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষও এই শিল্পে জড়িত।

বর্তমানে ফরিদপুরের শিল্প মানচিত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রাধান্য পেয়েছে। এর মধ্যে আছে ঃ

সাবান কারখানা	ওষুধপত্র	বরফকল
সরষের তেলকল	ইউনানি ওষুধ	ছাতা
খাদ্যশস্য প্রক্রিয়াকরণ	বেকারি	পানীয়
দুগ্ধজাত দ্রব্য	ময়দা মিল	লবণ
বাঁশের দ্রব্যাদি	পাট প্রক্রিয়াকরণ	কাঠকল
কাঠের আসবাবপত্র	ইট ও টালি	চিনামাটির দ্রব্যাদি
জুতো	রাবারজাত দ্রব্য	সোনার অলংকার
ছাপাখানা	রিকশ ও গাড়ি মেরামত কারখানা	
টিনের পাত্র	ঘড়ি মেরামত	বই বাঁধাই
মাথার তেল	সুগন্ধি দ্রব্য	লন্ড্রী
তৈরি পোশাক	গুড়	নৌকা নির্মাণ
ট্রাঙ্ক	সুটকেশ	মাছ ধরার জাল
তাঁত শিল্প	চট বস্তা	কনফেকশনারি

এ. আর হাওলাদার জুট মিলে উৎপাদন শুরু হয় ১৯৭০ সালে। মিলে আছে ২৫০টি লুম। এর ১৫০টি হল হেসিয়ান লুম ও ১০০টি স্যাকিং লুম। বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ৯,০০০ টন। চট ও বস্তা দুই-ই তৈরি হয়। জাতীয়করণের পর মিলটি পরিচালনা করে বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন।

ফরিদপুর সুগার মিলস্ আছে মধুখালিতে। বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ১০ হাজার টন। এই মিলও পরিচালন করে বাংলাদেশ সুগার মিলস কর্পোরেশন।

ফরিদপুরে চালের উৎপাদন পর্যাপ্ত হলেও আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে পারে না। উত্তরের জেলাগুলি থেকে, বিশেষ করে দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া থেকে চাল আমদানি করতে হয়। বরিশাল থেকে চাল আসে।

ফরিদপুর জেলা জুড়ে হাটবাজারের অভাব নেই। বাজার বসে নিয়মিত। হাট বসে সাধারণত সপ্তাহে দুদিন। কোন হাট ছোট, কোনটি বেশ বড়। দূরদূরান্ত থেকে কেনাকাটার জন্য এখানে আসে মানুষ। ১৯২৫ সালে ছিল ৩৫৪টি হাট বাজার। এর মধ্যে ২৫২টি ছিল নিছক হাটই এবং ১০৬টি ছিল হাট ও বাজার। ১৯৪৩ সালে হাট বাজারের সংখ্যা হয় ৪৯১। তার মধ্যে ৩১৭টি হাট, ১১৪টি দৈনিক বাজার এবং ৪১টি হাট ও বাজারের সংমিশ্রণ।

এখানে হাট-বাজারগুলির উল্লেখ করা হল ঃ

১৯৬৯-৭০ সালে ফরিদপুর জেলায় মোট হাটবাজারের সংখ্যা ছিল ৩৬৩। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাটবাজারের নাম ও বিক্রিত দ্রব্যের উল্লেখ করা হল।

		বাজারের ধরন	সপ্তাহের যে দিবসে বসে	প্রধান প্রধান যে পণ্য দ্রব্য কেনাবেচা হয়
কোতয়ালি থানা ঃ				
১	ফরিদপুর মার্কেট	আড়তদারী	বুধবার/শনিবারে হাট দৈনিক বাজার	চাল, ধান, পাট, শন, কলাই, পিঁয়াজ, রসুন, ধনে, গুড়, মাছ, তরি-তরকারি, তৈলবীজ ইত্যাদি

		বাজারের ধরন	সপ্তাহের যে দিবসে বসে	প্রধান প্রধান যে পণ্য দ্রব্য কেনাবেচা হয়
২.	ফরিদপুর পুরবাজার	খুচরা বাজার	দৈনিক বাজার	চাল, মাছ, তরিতরকারি
৩.	টেপাখোলা গবাদি পশুর হাট		মঙ্গলবার	গবাদি পশু
৪.	কাটালিপুর	আড়তদারি	শনিবার/বুধবার	পিঁয়াজ, রসুন, পাট, কলাই, চাল ইত্যাদি
৫.	মোমিনখারহাট	,,	ববিবার/বুধবার	পাট, ধান, চাল, কলাই, মাছ,তরিতরকারি ইত্যাদি
৬.	কানাইপুর	,,	মঙ্গলবার/শনিবার	পিঁয়াজ, রসুন, পাট, কলাই, চাল, ধান, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৭.	তোপাখোলা	খুচরা বাজার	দৈনিক বাজার	চাল, পিঁয়াজ, রসুন, দুধ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৮.	অম্বিকাপুর	আড়তদারি	,,	পাট, কলাই, চাল, মাছ তরিতরকারি ইত্যাদি
৯.	গোপালপুর	প্রাথমিক	প্রতিদিন সকালে	চাল, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
চরভদ্রাসন থানা ঃ				
১০.	হাজিগঞ্জ	আড়তদারি	শনিবার/মঙ্গলবার	পাট, পিঁয়াজ, রসুন, চাল, কলাই, তৈলবীজ ইত্যাদি
	বিরামপুর	প্রাথমিক	রবিবার/বুধবার	চাল, ধান, কলাই, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
সদরপুর থানা ঃ				
১২.	সদরপুর	প্রাথমিক	রবিবার/বৃহস্পতিবার	চাল, পাট, কলাই, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
১৩.	কেষ্টপুর	আড়তদারি	রবিবার/বুধবার	চাল, পাট, কলাই, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
১৪.	চরমনিরহাট	প্রাথমিক	রবিবার/বুধবার	পাট, কলাই, চাল, মাছ, তরিতবকারি ইত্যাদি
১৫.	চৌধুরিহাট	আড়তদারি	সোমবার/বৃহস্পতিবার	পাট, কলাই, পিঁয়াজ, রসুন, চাল, ধান, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
১৬.	চৌদ্দরসি (১৪ রসি)	ঐ	শনিবার/মঙ্গলবার	পিঁয়াজ, রসুন, পাট, কলাই, চাল, ধান, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
১৭.	পিঁয়াজখালি	ঐ	সোমবার/বৃহস্পতিবার	পিঁয়াজ, রসুন, পাট, কলাই, চাল, ধান, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি

	বাজারের ধরন	সপ্তাহের যে দিবসে বসে	প্রধান প্রধান যে পণ্য দ্রব্য কেনাবেচা হয়
ভাঙা থানা ঃ			
১৮. ভাঙা	আড়তদারি	সোমবার/শুক্রবার এবং দৈনিক বাজার	পিঁয়াজ, রসুন, পাট, কলাই, চাল, ধান, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
১৯. চৌকিঘাটা	ঐ	রবিবার/বৃহস্পতিবার	চাল, ধান, পাট, কলাই মাছ, তরিতরকারি, গবাদি পশু ইত্যাদি
২০. কলামৃধা	প্রাথমিক	রবিবার/বুধবার	চাল, পাট, কলাই, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
২১. পুকুরিয়ার হাট	ঐ	রবিবার/বুধবার	পাট, চাল, মাছ, কলাই, তরিতরকারি ইত্যাদি
বোয়ালমারি থানা ঃ			
২২. বোয়ালমারি	আড়তদারি	রবিবার/দৈনিক বাজার	পাট, ধান, চাল, কলাই শন, গুড়, তৈলবীজ, মাছ তরিতরকারি ইত্যাদি
২৩. কামারখালি	ঐ	সোমবার/শুক্রবার	ঐ
২৪. মধুখালি	ঐ	ঐ	ঐ
২৫. চিতরবাজার	প্রাথমিক	দৈনিক বাজার	চাল, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
২৬. বানেশ্বরদিহাট	ঐ	রবিবার/বৃহস্পতিবার	পাট, চাল, কলাই, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
২৭. ধোপাঘাটা হাট	প্রাথমিক	সোমবার/শুক্রবার	পাট, কলাই, চাল, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
২৮. পরমেশ্বরদি হাট	ঐ	সোমবার/বুধবার	ঐ
২৯. মাকরাল হাট	ঐ	শনিবার/মঙ্গলবার	ঐ
৩০. নোয়াপাড়া হাট	ঐ	রবিবার/বৃহস্পতিবার	ঐ
৩১. শেখরহাট	ঐ	শনিবার/বুধবার	ঐ
নগরকান্দা থানা ঃ			
৩২. নগরকান্দা	আড়তদারি	শনিবার/মঙ্গলবার	চাল, পাট, কলাই, পিঁয়াজ, তৈলবীজ, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৩৩. ভাওয়াল	প্রাথমিক	রবিবার/বৃহস্পতিবার	চাল, কলাই, মাছ
৩৪. ফুলবেড়িয়া	ঐ	সোমবার/শুক্রবার	চাল, মাছ, কলাই, তরিতরকারি ইত্যাদি
৩৫. তলমা	আড়তদারি	সোমবার/বৃহস্পতিবার ও দৈনিক বাজার	পিঁয়াজ, রসুন, পাট, কলাই, ধান, চাল, মাছ, তরিতরকারি, তৈলবীজ ইত্যাদি

	বাজারের ধরন	সপ্তাহের যে দিবসে বসে	প্রধান প্রধান যে পণ্য দ্রব্য কেনাবেচা হয়
৩৬. মানিকনগর	প্রাথমিক	শনিবার/মঙ্গলবার	পাট, কলাই, চাল, মাছ, তরিতরকারি, তৈলবীজ
৩৭. মঘিকান্তা	ঐ	ঐ	ঐ
৩৮. ইসুবদিন	ঐ	রবিবার/বৃহস্পতিবার	ঐ
আলফাডাঙা থানা ঃ			
৩৯. আলফাডাঙা হাট	আড়তদারি	রবিবার/বুধবাব	ধান, চাল, তৈলবীজ, কলাই, মশলাপাতি, পাট ডিম, হাঁসমুরগি, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৪০. পানাইল	প্রাথমিক	সোমবার/শুক্রবার	ঐ
৪১. হেলেঞ্চাহাট	ঐ	রবিবার/বুধবার	ঐ
গোপালগঞ্জ থানা ঃ			
৪২. গোপালগঞ্জ	আড়তদারি	সোমবার/শুক্রবার	চাল, পাট, মাছ, গুড়, তরিতরকারি ইত্যাদি
৪৩. গোবরা	প্রাথমিক	শনিবার/বুধবার	চাল, কলাই, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৪৪. সিলনা	প্রাথমিক	রবিবার/বৃহস্পতিবার	চাল, ধান, তবিতরকারি, মাছ, কলাই, ইত্যাদি
৪৫. কুশলি	আড়তদারি	শনিবার/বুধবাব	পাট, ধান, কলাই, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৪৬. পাতগাতি	,,	শনিবার/মঙ্গলবার	ধান, পাট, শন, তিল, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৪৭. গেমাডাঙা	প্রাথমিক	সোমবার/শুক্রবার	চাল, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৪৮. কাথি	ঐ	রবিবার/বৃহস্পতিবার	ধান, পাট, কলাই, ইত্যাদি
৪৯. কাজুলিয়া	ঐ	রবিবার/বুধবার	চাল, ধান, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৫০. করপাড়া	ঐ	শনিবার/মঙ্গলবার	চাল, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৫১. ভেরার হাট	আড়তদারি	রবিবার/বুধবার	চাল, ধান, পাট, গুড়, তিল, মশলা, কাঁচালঙ্কা, মাছ, বেগুন ইত্যাদি
৫২. বউলতলি	ঐ	সোমবার/শুক্রবার	চাল, ধান, পাট, কলাই, তিল, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি

	বাজারের ধরন	সপ্তাহের যে দিবসে বসে	প্রধান প্রধান যে পণ্য দ্রব্য কেনাবেচা হয়
৫৩. সাতপাড়া	প্রাথমিক	র	চাল, ধান, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৫৪. চন্দ্রদিঘলিয়া	ঐ	শনিবার/মঙ্গলবার	চাল, মাছ, কলাই, তরিতরকারি ইত্যাদি
৫৫. গোপীনাথপুর	ঐ	রবিবার/বৃহস্পতিবার	চাল, তরিতরকারি, মাছ, কলাই, গুড়, পাট, ইত্যাদি
৫৬. বরফাহাট	ঐ	ঐ	চাল, ধান, মাছ, কলাই, তরিতরকারি ইত্যাদি
৫৭. সুকতৈল	ঐ	ঐ	চাল, ধান, কলাই, মাছ, পিঁয়াজ, তরিতরকারি ইত্যাদি
কোতওয়ালিপাড়া থানা ঃ			
৫৮. রামশীল	প্রাথমিক	শনিবার/মঙ্গলবার	চাল, কলাই, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৫৯. কুশলা	ঐ	রবিবার/বৃহস্পতিবার	চাল, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৬০ হেরনহাট	ঐ	শনিবার/মঙ্গলবার	চাল, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৬১. রাধাগঞ্জ	আড়তদারি	শনিবার/বুধবার	চাল, ধান, পাট, কলাই, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
মকসুদপুর থানা			
৬২. মোহরায়পুর	প্রাথমিক	রবিবার/বৃহস্পতিবার	ধান, পাট, কলাই, তিল, তরিতরকারি ইত্যাদি
৬৩. ট্যাংরাখোলা	আড়তদারি	রবিবার/বৃহস্পতিবার	ধান, পাট, কলাই, তিল, তরিতরকারি ইত্যাদি
৬৪. কান্দেরপাড়	প্রাথমিক	শনিবার/মঙ্গলবার	চাল, কলাই, মাছ, গুড়, তরিতরকারি ইত্যাদি
৬৫. জলিরপাড	আড়তদারি	সোমবার/বৃহস্পতিবার	চাল, ধান, পাট, মাছ, কলাই, তৈলবীজ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৬৬. গোহলা বাজার	খুচরো বাজার	দৈনিক বাজার	চাল, পাট, কলাই, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৬৭. ভান্জুর্দিয়া	ঐ	ঐ	চাল, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৬৮. দিগ্নগর	আড়তদারি	রবিবার/বুধবার	ধান, পাট, তিল, কলাই, মাছ ইত্যাদি

	বাজারের ধরন	সপ্তাহের যে দিবসে বসে	প্রধান প্রধান যে পণ্য দ্রব্য কেনাবেচা হয়
৬৯. বনগ্রাম	ঐ	রবিবার/বৃহস্পতিবার	ধান, পাট, গুড়, তিল, ইত্যাদি
৭০. ভটিকামারি বাজার	প্রাথমিক	দৈনিকবাজার	চাল, মাছ, কলাই, তরিতরকারি ইত্যাদি
কাসিয়ানি থানা ঃ			
৭১. কাসিয়ানি	প্রাথমিক	দৈনিক বাজার	চাল, কলাই, গুড়, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৭২. ভাটিনপাড়া	আড়তদারি	সোমবার/শুক্রবার ও দৈনিক বাজার	চাল, ধান, পাট, কলাই, গুড়, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৭৩. ঘোনাপাড়া	প্রাথমিক	রবিবার/বুধবার	চাল, ধান, পাট, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৭৪. তারনিল বাজার	ঐ	রবিবার/বৃহস্পতিবার	চাল, ধান, পাট, কলাই, গুড়, হলুদ, পিঁয়াজ, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৭৫. চাপতা	ঐ	সোমবার/শুক্রবার	চাল, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৭৬. রামদিয়া	আড়তদাবি	সোমবার/বৃহস্পতিবার	চাল, ধান, পাট, কলাই, গুড়, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৭৭. রায়পত	প্রাথমিক	মঙ্গলবার/শুক্রবার	চাল, ধান, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৭৮. বাথানডাঙা	ঐ	শনিবার/বুধবার	চাল, ধান, পাট, কলাই, তরিতরকারি ও গবাদি পশু ইত্যাদি
৭৯. দক্ষিণ ফুকরা	ঐ	সোমবার/শুক্রবার	চাল, কলাই, বাঁশ, পিঁয়াজ, গুড়, সরিষা. তিল, শন, তরিতরকারি ইত্যাদি
৮০. পূর্ব ফুকরা	ঐ	শনিবার/মঙ্গলবার	চাল, কলাই, গুড়, হলুদ তরিতরকারি ইত্যাদি
৮১. মাজরা	ঐ	সোমবার/বৃহস্পতিবার	চাল, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৮২. জয়নগর	ঐ	শনিবার/মঙ্গলবাব	পাট, ধান, গুড়, কলাই, তরিতরকারি ইত্যাদি

	বাজারের ধরন	সপ্তাহের যে দিবসে বসে	প্রধান প্রধান যে পণ্য দ্রব্য কেনাবেচা হয়
মাদারিপুর থানা ঃ			
৮৩. মাদারিপুর	আড়তদারি ও খুচরো বাজার	দৈনিক বাজার শনিবার/মঙ্গলবার হাট	পাট, চাল, কলাই, গুড়, ধান, শন, ঘি ইত্যাদি
৮৪. চরমুগুরিয়া	আড়তদারি	শনিবার/মঙ্গলবার দৈনিক বাজার	চাল, পাট, কলাই, তৈলবীজ, পিঁয়াজ, রসুন, কালোজিরে, শন, গবাদিপশু, তরিতরকারি ইত্যাদি
৮৫. মাদরাবাজার	খুচরো বাজার	দৈনিক	চাল, মাছ, তরিতরকারি, দুধ ইত্যাদি
৮৬. খোয়াজপুর	ঐ	ঐ	চাল, কলাই, ডিম, দুধ, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৮৭. কুলপাদিবাজার	প্রাথমিক	রবিবার/বৃহস্পতিবার	চাল, কলাই, আখেরগুড় ঘি, দুধ, মাছ, তরিতর-কারি,খেঁজুরগুড় ইত্যাদি
৮৮ হবিগঞ্জ	ঐ	রবিবাব/বৃহস্পতিবার	চাল, কলাই, ডিম, দুধ, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৮৯. মুস্তাফাপুর	আড়তদারি ও খুচরো বাজার	সোমবার/শুক্রবার দৈনিক বাজার	চাল, ধান, পাট, কলাই, তৈলবীজ, হাঁস-মুরগি, ঘি, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৯০. কেন্দুয়া বাজার	প্রাথমিক	দৈনিক বাজার	ঘি, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৯১. ঘাটমাঝিবাজার	ঐ	ঐ	চাল, মাছ, ডিম, তরিতরকারি ইত্যাদি
কলকিনি থানা ঃ			
৯২. কলকিনি	ঐ	শনিবার/মঙ্গলবার ও দৈনিক বাজার	পাট, ধান, কলাই, শুকনো লঙ্কা, মাছ, তরিতরকারি, গুড় ইত্যাদি
৯৩. ময়দানের হাট	ঐ	সোমবার/বৃহস্পতিবার	চাল, মাছ, তরিতরকারি পিঁয়াজ, রসুন, হাঁস-মুরগি, মিষ্টি আলু ইত্যাদি

	বাজারের ধরন	সপ্তাহের যে দিবসে বসে	প্রধান প্রধান যে পণ্য দ্রব্য কেনাবেচা হয়
৯৪ সাহেবরামপুর হাট	ঐ	মঙ্গলবার/শুক্রবার	পাট, ধান, কলাই, মিষ্টি আলু, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
৯৫. খাসেরহাট	আড়তদারি	সোমবার/শুক্রবার	চাল, ধান, পাট, কলাই, শুকনো লঙ্কা, গুড় ইত্যাদি
৯৬. ফাসিয়াটোলাহাট	আড়তদারি	সোমবার/শুক্রবার ও দৈনিক বাজার	পাট, ধান, কলাই, শুকনো লঙ্কা ইত্যাদি
৯৭. লক্ষীপুরহাট	প্রাথমিক	সোমবার/শুক্রবার ও দৈনিক বাজার	পাট, ধান, কলাই, শুকনো লঙ্কা ইত্যাদি
রাজোইর থানা ঃ			
৯৮. রাজোইর	ঐ	সোমবার/বৃহস্পতিবার ও দৈনিক বাজার	পাট, চাল, ধান, কলাই, গুড়, তৈলবীজ, পিঁয়াজ ইত্যাদি
৯৯. আমগ্রামহাট	ঐ	মঙ্গলবার/শুক্রবার	পাট, ধান, কলাই, হাঁস-মুরগি, মাছ, তরিতর-কারি ইত্যাদি
১০০. খালিয়া	ঐ	রবিবার/বৃহস্পতিবার ও দৈনিক বাজার	পাট, ধান, কলাই, তরি-তরকারি,পিঁয়াজ ইত্যাদি
১০১. ইশিবপুর হাট	ঐ	শনিবার/বুধবার	পিঁয়াজ, রসুন, পাট, ধান ও কলাই ইত্যাদি
১০২. টেকেরহাট	আড়তদারি	শনিবার/বুধবার	চাল, ধান, পাট, কলাই. গবাদি পশু, পিঁয়াজ, পিঁয়াজ. রসুন, ধনে, কালো জিরে, ডিম, হাঁস মুরগি, কলা. কাঠ, তরি-তরকারি ইত্যাদি
১০৩ কদমবড়ি	প্রাথমিক	মঙ্গলবার/শুক্রবার	পাট, ধান, কলাই, ডিম, হাঁসমুরগি ইত্যাদি
১০৪. চর মোস্তাফাপুর	ঐ	রবিবার/বৃহস্পতিবার	পিঁয়াজ, পাট, ধান, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
১০৫. বাজিতপুর	প্রাথমিক ও খুচরো বাজার	দৈনিক বাজার	চাল, মাছ, তরিতরকারি, দুধ, ডিম ইত্যাদি
১০৬. কবিবাজপুর	আড়তদারি	দৈনিক বাজার	চাল, মাছ, তরিতরকারি, দুধ, হাঁসমুরগি, গুড়, ইত্যাদি

	বাজারের ধরন	সপ্তাহের যে দিবসে বসে	প্রধান প্রধান যে পণ্য দ্রব্য কেনাবেচা হয়
জনজিরা থানা ঃ			
১০৭. জনজিরা	আড়তদারি	সোমবার/শুক্রবার	পাট, ধান, কলাই, হাঁস-মুরগি, শুকনো লঙ্কা, ধনে, পিঁয়াজ, রসুন, তরিতরকারি ইত্যাদি
১০৮. কাজিরচরহাট	প্রাথমিক	শনিবার/বুধবার	পাট, ধান, কলাই, শুকনো লঙ্কা, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি
১০৯ নওডোবাহাট	আড়তদারি	সোমবার/শুক্রবার	পাট, ধান, কলাই, শুকনো লঙ্কা, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি
১১০. দুবুলদিয়া হাট	ঐ	রবিবার/বৃহস্পতিবার	পাট, ধান, কলাই, পিঁয়াজ, রসুন, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি
১১১. নরিয়া	প্রাথমিক ও খুচরো বাজার	সোমবার/শুক্রবার ও দৈনিক বাজার	পাট, কলাই, ধান, গুড়, শুকনো লঙ্কা, হাঁস-মুরগি, ঘি, তরিতরকারি, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি
১১২. মুলফতগঞ্জ	ঐ	সোমবার/শুক্রবার ও দৈনিক বাজার	ঐ
১১৩ চণ্ডীপুর	প্রাথমিক	রবিবার/বুধবার ও দৈনিক বাজার	চাল, মাছ, তরিতরকারি, পাট, ধান ইত্যাদি
১১৪. হালাইশর	ঐ	শনিবার/মঙ্গলবার	পাট, ধান, হাঁস-মুরগি, ডিম ইত্যাদি
১১৫. ঘারিসর	আড়িতদারি	সোমবার/শুক্রবার	পাট, ধান, কলাই, গুড়, শুকনো লঙ্কা, পান, সুপারি, দুধ, ঘি, তরি-তরকারি ইত্যাদি
১১৬. ভোজেশ্বর	ঐ	সোমবার/শুক্রবার	চাল, পাট, ধান, লঙ্কা, ধনে, নারকেল, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি
পালঙ থানা ঃ			
১১৭. পালঙ	আড়তদারি ও খুচরো বাজার	শনিবার/মঙ্গলবার ও দৈনিক বাজার	পাট, ধান, কলাই, শুকনো লঙ্কা, পিঁয়াজ, রসুন, মাছ, তরিতরকারি মিষ্টি আলু ইত্যাদি
১১৮. চন্দ্রপুরহাট	প্রাথমিক	শনিবার/মঙ্গলবার	পাট, ধান, কলাই, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি

	বাজারের ধরন	সপ্তাহের যে দিবসে বসে	প্রধান প্রধান যে পণ্য দ্রব্য কেনাবেচা হয়
১১৯. চিকিন্দিহাট	প্রাথমিক ও খুচরো বাজার	শনিবার/সোমবার ও দৈনিক বাজার	পাট, ধান, কলাই, পিঁয়াজ, রসুন, ধনে, মিষ্টি আলু ইত্যাদি
১২০. আঙ্গারিয়া	আড়তদারি ও খুচরো বাজার	রবিবার/বৃহস্পতিবার ও দৈনিক বাজার	চাল, ধান, পাট, কলাই, পিঁয়াজ, দুধ, ধনে, গুড়, তরিতরকারি ইত্যাদি
১২১. শোয়ালপাড়া	আড়তদারি	রবিবার/বুধবার	ধনে, পাট, কলাই, পিঁয়াজ, গবাদি পশু, রসুন ইত্যাদি
১২২. বুড়ির হাট	আড়তদারি	মঙ্গলবার/শুক্রবার	ধান, পাট, কলাই, শুকনো লঙ্কা, গবাদি পশু, পিঁয়াজ, রসুন, তরিতরকারি ইত্যাদি
১২৩. মনোহর বাজার	প্রাথমিক	দৈনিক বাজার	চাল, মাছ, কলাই, তরিতরকারি ইত্যাদি
১২৪. রাজগঞ্জ	ঐ	শনিবার/মঙ্গলবার	পাট, ধান, কলাই, ডিম, পিঁয়াজ, হাঁস-মুরগি, মশলা, মাছ, তরি-তরকারি ইত্যাদি
ঘোষেরহাট থানা ঃ			
১২৫. হাটুরিয়া	আড়তদারি	শনিবার/মঙ্গলবার	পাট, ধান, চাল, শুকনো লঙ্কা, নারকেল, সুপারি, ধনে ইত্যাদি
১২৬. নাগেরপাড়া হাট	ঐ	রবিবার/বৃহস্পতিবার	চাল, ধান, পাট, শুকনো লঙ্কা, হাঁস-মুরগি, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
১২৭. সিদ্ধিলকুরা হাট	ঐ	শনিবার/মঙ্গলবার	পাট, ধান, চাল, কলাই, হাঁস-মুরগি, তরিতরকারি ধনে, আলু ইত্যাদি
ভেদেরগঞ্জ থানা ঃ			
১২৮ ভেদেরগঞ্জ	আড়তদারি ও খুচরো বাজার	রবিবার/বৃহস্পতিবার ও দৈনিক বাজার	পাট, ধান, কলাই, শুকনো লঙ্কা, পান, সুপুরি, গুড, তৈলবীজ, মিষ্টি আলু, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি
১২৯. স্বজনপুর	প্রাথমিক ও খুচরো বাজার	শনিবার/মঙ্গলবার ও দৈনিক বাজার	পিঁয়াজ, রসুন, সরিষা, পাট, ধান, কলাই, তরিতরকারি ইত্যাদি

	বাজারের ধরন	সপ্তাহের যে দিবসে বসে	প্রধান প্রধান যে পণ্য দ্রব্য কেনাবেচা হয়
১৩০. কানেশ্বর	প্রাথমিক	সোমবার/শুক্রবার	পাট, ধান, কলাই, পিঁয়াজ ইত্যাদি
১৩১. কার্তিকপুর	আড়তদারি ও খুচরো বাজার	শনিবার/মঙ্গলবার ও দৈনিক বাজার	পাট, ধান, কলাই, শুকনো লঙ্কা, পিঁয়াজ, রসুন, তরিতরকারি, মিষ্টি আলু ইত্যাদি
১৩২.শাকীপুর	আড়তদারি	শনিবার/বুধবার	পাট, ধান, গবাদি পশু, ছাগল, শুকনো লঙ্কা, মিষ্টি আলু, তরিতরকারি
১৩৩.কাঞ্চনপাড়া	ঐ	রবিবার/বৃহস্পতিবার	পাট, ধান, কলাই, হাঁস-মুরগি, ডিম, মিষ্টি আলু ইত্যাদি
বোরহানগঞ্জ থানা ঃ			
১৩৪. বোরহানগঞ্জ	আড়তদারি	সোমবার/শুক্রবার	পাট, ধান, চাল, কলাই, গুড়, শুকনো লঙ্কা, ধনে, পিঁয়াজ, রসুন, তরিতর-কারি ইত্যাদি
১৩৫. মঠবাড়ির চর	ঐ	রবিবার/বৃহস্পতিবার	পাট, ধান, কলাই, শুকনো লঙ্কা, পিঁয়াজ, গবাদি পশু ইত্যাদি
১৩৬. উৎরেল হাট	ঐ	মঙ্গলবার	পাট, ধান, শুকনো লঙ্কা, কলাই, ধনে, পিঁয়াজ, রসুন, তৈলবীজ, ভেড়া, গুড়, তরিতরকারি, মিষ্টি আলু ইত্যাদি
১৩৭. চাঁদের হাট	ঐ	শনিবার/মঙ্গলবার	পাট, ধান, কলাই, শুকনো লঙ্কা, হাঁস-মুরগি, ডিম, পিঁয়াজ, রসুন, মিষ্টি আলু, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
১৩৮. টেকেরহাট	ঐ	রবিবার/বৃহস্পতিবার	পাট, ধান, কলাই, গবাদি পশু, পিঁয়াজ, রসুন, তৈলবীজ, মিষ্টি আলু ইত্যাদি
১৩৯. পাঁচচর	ঐ	রবিবার/বৃহস্পতিবার	পিঁয়াজ, রসুন, পাট, ধান কলাই, শুকনো লঙ্কা, তরিতরকারি, মাছ ইত্যাদি

	বাজারের ধরন	সপ্তাহের যে দিবসে বসে	প্রধান প্রধান যে পণ্য দ্রব্য কেনাবেচা হয়
রাজবাড়ি থানা ঃ			
১৪০. রাজবাড়ি	আড়তদারি ও খুচরো বাজার	রবিবার/মঙ্গলবার ও দৈনিক বাজার	চাল, ধান, পাট, কলাই, তৈলবীজ, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
১৪১. কুঠিপাঁচুরিয়া	আড়তদারি	মঙ্গলবার/শুক্রবার	পাট, ধান, কলাই, তৈল-বীজ, নারকেল, সুপারি, তরিতরকারি ইত্যাদি
১৪২. খানখানপুর	ঐ	মঙ্গলবার/শুক্রবার	পাট, ধান, চাল, কলাই, তৈলবীজ, হাঁসমুরগি, তরিতরকারি ইত্যাদি
১৪৩. বসন্তপুর	ঐ	মঙ্গলবার/শুক্রবার	কলাই, ধান, তরিতর-কারি ইত্যাদি
১৪৪. রাজাপুর	প্রাথমিক	সোমবার/বৃহস্পতিবার	কলাই, তৈলবীজ, ধান ইত্যাদি
১৪৫. বরাট	আড়তদারি	...	পাট, ধান, কলাই, আখ, তরিতরকারি ইত্যাদি
১৪৬. উরাকান্ডা	প্রাথমিক	মঙ্গলবার/শুক্রবার	ধান, কলাই, তরিতর-কারি ইত্যাদি
১৪৭. মাটিপাড়া	আড়তদারি	শনিবার/মঙ্গলবার	ধান, চাল, কলাই, তৈলবীজ, তরিতরকারি ইত্যাদি
১৪৮. বাণীভোয়া নতুন হাট	ঐ	সোমবার/শুক্রবার	ঐ
১৪৯. কোলাহাট	প্রাথমিক	রবিবার/সোমবার	তৈলবীজ, কলাই, ধান, পাট, তরিতরকারি ইত্যাদি
১৫০. কুটিরহাট	আড়তদারি	শনিবার/বুধবার	চাল, ধান, কলাই, পাট, তৈলবীজ, বাঁশ ইত্যাদি
১৫১. পাঁচুরিয়া হাট	,,	মঙ্গলবার/শুক্রবার	বাঁশ, নারকেল, তরি-তরকারি, কলাই, তৈলবীজ ইত্যাদি
গোয়ালন্দঘাট থানা ঃ			
১৫২. গোয়ালন্দ	খুচরো বাজার ও আড়তদারি	দৈনিক বাজার	ধান, চাল, পাট, কলাই, মাছ, পিঁয়াজ, রসুন, তৈলবীজ, তরিতরকারি ইত্যাদি
১৫৩ উজানচরহাট	আড়তদারি	শনিবার/বুধবার	চাল ধান, কলাই, মাছ, তৈলবীজ, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি

	বাজারের ধরন	সপ্তাহের যে দিবসে বসে	প্রধান প্রধান যে পণ্য দ্রব্য কেনাবেচা হয়
১৫৪. বরাট হাট	প্রাথমিক	সোমবার/বৃহস্পতিবার	চাল, ধান, মাছ, তরি-তরকারি ইত্যাদি
পাঙশা থানা ঃ			
১৫৫. পাঙশা হাট	আড়তদারি	রবিবার/বুধবার	চাল, ধান, পাট, কলাই, তৈলবীজ, আখের গুড়, তরিতরকারি, গবাদি পশু ইত্যাদি
১৫৬. পাংশা রেলওয়ে স্টেশন বাজার	খুচরো বাজার	দৈনিক বাজার	চাল, মাছ, দুধ, তরি-তরকারি ইত্যাদি
১৫৭. সেনগ্রাম	প্রাথমিক	সোমবার/শুক্রবার	ধান, পাট, কলাই, আখের গুড়, মাছ, তরি-তরকারি ইত্যাদি
১৫৮. হাবাসপুর	খুচরো বাজার	দৈনিক বাজার	চাল, কলাই, আখের গুড়, মাছ, তরিতরকারি ইত্যাদি
১৫৯. মাচপাড়া	আড়তদারি	সোমবার/শুক্রবার	ধান, আখের গুড়, কলাই, পাট, তৈলবীজ ইত্যাদি
১৬০. মেঘনাহাট	প্রাথমিক	শনিবার/মঙ্গলবার	চাল, ধান, কলাই, আখের গুড়, তরিতর-কারি ইত্যাদি
১৬১. মোজাইল	ঐ	রবিবার/বৃহস্পতিবার	চাল, ধান, কলাই, আখের গুড়, তরিতর-কারি ইত্যাদি
১৬২. মিরনিহাট	আড়তদারি	রবিবার/বৃহস্পতিবার	চাল, ধান, কলাই, পিঁয়াজ, আখের গুড়, তরিতরকারি ইত্যাদি
১৬৩. ব্রিথিডাঙা হাট	ঐ	সোমবার/শুক্রবার	পাট, ধান, কলাই, তৈলবীজ ইত্যাদি
১৬৪. রতনদিয়া	ঐ	বুধবার	পাট, চাল, ধান, কলাই, আখের গুড়, তৈলবীজ, ইত্যাদি
১৬৫. বেলগাছি (দাদপুর)	ঐ	সোমবার/শুক্রবার	পাট, ধান, কলাই, আখেরগুড়, তৈলবীজ, পিঁয়াজ ইত্যাদি
বালিয়াকান্দি থানা ঃ			
১৬৬. বালিয়াকান্দি হাট	প্রাথমিক	রবিবার/বৃহস্পতিবার	চাল, ধান, পাট, আখের গুড়, কলাই, তরিতর-কারি, মাছ ইত্যাদি

	বাজারের ধরন	সপ্তাহের যে দিবসে বসে	প্রধান প্রধান যে পণ্য দ্রব্য কেনাবেচা হয়
১৬৭. নারুয়াহাট	আড়তদারি	সোমবার/শুক্রবার	চাল, ধান, কলাই, আখের গুড়, পিঁয়াজ, পাট, তৈলবীজ, ইত্যাদি
১৬৮. গাজনাহাট	প্রাথমিক	রবিবার/বৃহস্পতিবার	পাট, ধান, চাল, কলাই, তরতরকারি ইত্যাদি
১৬৯. বাহারপুর	আড়তদারি	শনিবার/বৃহস্পতিবার	পাট, ধান, কলাই, আখের গুড় ইত্যাদি
১৭০. সমাধিনগর	ঐ	শনিবার/বুধবার	চাল, ধান, পাট, কলাই, বাঁশ, তৈলবীজ ইত্যাদি
১৭১. জামালপুর হাট	ঐ	রবিবার/বুধবার	পাট, ধান, কলাই, আখের গুড়, তৈলবীজ ইত্যাদি
১৭২. নাটাপাড়া হাট	প্রাথমিক	শনিবার/সোমবার	চাল, ধান, কলাই, মাছ, আখের গুড়, তরতর-কারি ইত্যাদি
১৭৩. মেগচেন হাট	ঐ	শনিবার/মঙ্গলবার/ বৃহস্পতিবার	পাট, ধান, চাল, কলাই, তরিতরকারি ইত্যাদি

মেলা

একসময় মেলা বাংলার গ্রামজীবনধারার অন্যতম অঙ্গ ছিল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এর গুরুত্ব কম ছিল না। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ মেলাকে ঘিরে বাঙালি এক অভাবনীয় উদ্দীপনায় মেতে উঠত বিশেষ কয়েকটি দিনে। হান্টারের বিবরণে (১৮৭৫ খ্রিঃ) জানা যায় সাতৈর বা ধোবাঘাটায় ফাল্গুন মাসের শেষ দিনে ৪ বা ৫ দিনের মেলা হত। জেলায় স্থানীয় বিভিন্ন বৃত্তির কারিগরদের তৈরি নানারকম দ্রব্য আসত বিক্রির জন্য। ঝালডাঙা বিলের পাড়ে মধুরদিয়ার মার্চ বা এপ্রিল মাসে যে মেলা হত সেখানে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ আসত বিলের জলে স্নান করতে। এই মেলা হত একদিনের। কেনাকাটার পরিমাণও কম ছিল না। গঙ্গাস্নান উপলক্ষে ধুলদি এবং গাজানায় মেলা হত। এইসব মেলার আয়োজন হত পুণ্যার্থীদেব প্রয়োজনে। মুকসুদপুর থানার কাছে ধানোয়ায় চৈত্র মাসের শেষ দিনে আয়োজিত মেলায় আসত বিভিন্ন দ্রব্য দেশিয় কারিগরদের তৈরি। তাছাড়া এই মেলার বড় আকর্ষণ ছিল ঘোড়ারহাট। এখানে বহু ঘোড়া আনা হত বিক্রির জন্য।

হান্টার ফরিদপুর শহরে আয়োজিত গ্রামীণ শিল্প মেলা ও প্রদর্শনীর উল্লেখ করেছেন। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে গড়ে ওঠে একটি সংস্থা গৃহপালিত জীবজন্তু ও কৃষিদ্রব্যের আয়োজন করত প্রতি বছর। ক্রমশ মেলার জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। ১৮৭০ সালে মেলা চলেছিল ৮ দিন। পুরস্কারের অর্থ পরিমাণও বেড়ে যায়। এ বছর ২৭০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। ৪৯ রকমের আমন ধানের নমুনা নিয়ে এবং ১৪১ জন আসে আউস ধানের নমুনা নিয়ে।

ক্রমশ মেলার বাণিজ্যিক রূপান্তর ঘটে। এই সামাজিক সম্মিলনে ব্যবসায়ীরা তাদের উৎপাদিত ও সংগৃহীত দ্রব্যের বড় বাজার পেয়ে যায়। সারা বছর জুড়ে নানা স্থানে মেলা হত। আর সেই মেলায় আসত গ্রামীণ ব্যবসায়ী ও হকার। এইসব মেলার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল বিনোদনের সঙ্গে ব্যবসা।

ফরিদপুর জেলায় ১৯৪০ সাল নাগাদ যে সব মেলা প্রচলিত ছিল, তার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হল ঃ

	সময়-উপলক্ষ্য	মেলায় যেসব জিনিস পাওয়া যায়
ভাঙা থানা ঃ		
১. মুখডোবা মেলা	চৈত্র মাস-অষ্টমী স্নান ১ বা ২ দিনের মেলা	স্টেশনারি দ্রব্য, কাটা কাপড়, খেলনা, দেশি কাপড়, মিষ্টি দ্রব্য ইত্যাদি।
২. দরগার মেলা	চৈত্র মাস-বারুনী স্নান ১ দিনের মেলা	স্টেশনারি দ্রব্য, কাটা কাপড়, দেশি কাপড়, মিষ্টি দ্রব্য ইত্যাদি।
৩. খাতরা মেলা	আষাঢ়মাস-রথ যাত্রা ১ দিনের মেলা	ঐ
বোয়ালমারি থানা ঃ		
৪. সাতৈর মেলা	চৈত্র মাসের ১ তারিখ এক মুসলিম সাধকের জন্মদিন স্মরণে ১৫ দিনের মেলা	স্টেশনারি দ্রব্য, খেলনা, আসবাব-পত্র, কাপড়, মিষ্টি দ্রব্য ইত্যাদি।
মাদারিপুর থানা ঃ		
৫. মাদারিপুর মেলা	দশহরা উপলক্ষে ২ দিনের মেলা	আসবাবপত্র, স্টেশনারি দ্রব্য, মাটির বাসনকোসন, খেলনা, মিষ্টি দ্রব্য ইত্যাদি।
৬. মোস্তাফাপুর মেলা	দশহরা উপলক্ষ্যে ১ দিনের মেলা	ঐ
৭. শ্রিন্ধি মেলা	মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে ১ নের মেলা	ঐ
৮. দত্তকেন্দুয়া মেলা	ঐ	ঐ
কলকিনি থানা ঃ		
৯. শিওলপাটি মেলা	চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে ১ দিনের মেলা	কাটা কাপড়, খেলনা, স্টেশনারি দ্রব্য ইত্যাদি।
১০. পাঙাসিয়া মেলা	ঐ	কাপড়, জুতো, খেলনা, স্টেশনারি দ্রব্য, মিষ্টি দ্রব্য, আসবাবপত্র ইত্যাদি।
পালঙ থানা ঃ		
১১. কোটাপাড়া মেলা	চৈত্র সংক্রান্তির উপলক্ষে ৭ দিনের মেলা	কাপড়, জুতো, স্টেশনারি দ্রব্য, মাটির বাসনকোসন, খেলনা, মিষ্টি দ্রব্য ইত্যাদি।

	সময়-উপলক্ষ্য	মেলায় যেসব জিনিস পাওয়া যায়
১২. বিলাসখান মেলা	১ বৈশাখ উপলক্ষে চৈত্র সংক্রান্তিতে ১ দিনের মেলা	কাপড়, জুতো, আসবাবপত্র, মাটির বাসনকোসন, মিষ্টি দ্রব্য, স্টেশনারি দ্রব্য ইত্যাদি।
১৩. মনোহর মেলা	চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে ১ মাসের মেলা	কাপড়, জুতো, খেলনা, মিষ্টি, আসবাবপত্র, স্টেশনারি দ্রব্য, মাটির বাসনকোসন ইত্যাদি।
রাজোইর থানা ঃ		
১৪. মহেন্দ্রদি কালীবাড়ি মেলা	চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে ১ দিনের মেলা	ঐ
ভেদারগঞ্জ থানা ঃ		
১৫. রামভদ্রপুর মেলা	ঐ	ঐ
১৬. মহিষের মেলা	দিগম্বরী কালিবাড়িতে ১ বৈশাখ থেকে ৭ দিনের মেলা	কাপড় ও অন্যান্য সুতীবস্ত্র, খেলনা, আসবাবপত্র, স্টেশনারি দ্রব্য, মিষ্টি, মাটির বাসনকোসন, মশলাপাতি ইত্যাদি।
নরিয়া থানা ঃ		
১৭. সুরেশ্বর মেলা	মৌলবি জান শরিফের উরস উপলক্ষে প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে ১ দিনের মেলা	কাপড়, স্টেশনারি দ্রব্য, খেলনা, আসবাবপত্র, জুতো, মিষ্টি ইত্যাদি।
শিবেহর থানা ঃ		
১৮. শিবেহর মেলা	চৈত্র মাসে শিবদুর্গা পূজা উপলক্ষে ১ দিনের মেলা	কাপড়, জুতো, স্টেশনারি দ্রবা, মিষ্টি, খেলনা ইত্যাদি।
গোয়ালন্দ ঘাট থানা ঃ		
১৯. লক্ষ্মীকোলা বুড়ি মেলা	প্রতি বছর বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবায়	মাটির বাসনকোসন, খেলনা, কাপড়চোপড়, স্টেশনারি দ্রব্য, মিঠাই ইত্যাদি।
২০. পাঁচুরিয়া মেলা	বারুনি স্নান উপলক্ষে ১ দিনের মেলা	মাটির বাসনকোসন, খেলনা, মিষ্টি, কাপড়চোপড়, স্টেশনারি দ্রব্য ইত্যাদি।
পাংশা থানা ঃ		
২১. খানগঞ্জ মেলা	পুষ্পরথ যাত্রা উপলক্ষে ১ দিনের মেলা	স্টেশনারি দ্রব্য, খেলনা, মিষ্টি দ্রব্য ইত্যাদি।
বালিয়াকান্দি থানা ঃ		
২২. হরিঠাকুরের মেলা	মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে ৩ দিনের মেলা	মাটির বাসনকোসন, খেলনা, স্টেশনারি দ্রব্য, মিষ্টি দ্রব্য ইত্যাদি
২৩. ভীমনগর মাঝপাড়া মেলা (হরিঠাকুর মেলা নামেও পরিচিত)	বারুনি স্নান উপলক্ষে ১ দিনের মেলা	মাটির বাসনকোসন, খেলনা, স্টেশনারি দ্রব্য, মিষ্টি দ্রব্য ইত্যাদি

	সময়-উপলক্ষ্য	মেলায় যেসব জিনিস পাওয়া যায়
২৪. জাননগর মেলা	স্থানীয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বাবু নরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে ১ দিনের মেলা	মাটির বাসনকোসন, খেলনা, স্টেশনারি দ্রব্য, মিষ্টি দ্রব্য ইত্যাদি
গোপালগঞ্জ থানা ঃ		
২৫. রঘুনাথপুর মেলা	পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে পৌষ মাসের প্রথম দিন এবং মাঘ মাসের শেষদিন	স্টেশনারি দ্রব্য, আসবাবপত্র, বাসনকোসন, খেলনা, মিষ্টি দ্রব্য ইত্যাদি।
কোটালিপাড়া থানা ঃ		
২৬. ঘাঘর মেলা	চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে ১ দিনের মেলা	ঐ
২৭. সিদ্ধান্তবাড়ি মেলা	চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে ১ দিনের মেলা ১ বৈশাখ থেকে ৩ দিন চলে	ঐ
মুকসুদপুর থানা ঃ		
২৮. মুকসুদপুর মেলা	রথযাত্রা উপলক্ষে ১ দিনের মেলা	স্টেশনারি দ্রব্য, খেলনা, মশলা-পাতি, মিষ্টি দ্রব্য ইত্যাদি।

(ফরিদপুর জেলা গেজেটিয়ার ১৯৭৭)

ডক্টর আশরফ সিদ্দিকীর বিবরণে সম্প্রতিকালে জেলার কয়েকটি মেলার উল্লেখ রয়েছে ঃ

শিবচর থানা ঃ	
শিবচর মেলা	শিবদুর্গা পূজা—চৈত্র মাস
লক্ষ্মী কোলবুড়ী মেলা	বৈশাখের প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার
পাঁচুড়িয়া মেলা	বারুনি স্নান-১ দিন
পাংশা থানা ঃ	
খানগঞ্জ মেলা	পুষ্পরথযাত্রা-১ দিন
অন্নপূর্ণা মেলা-খানখানানপুর	বৈশাখ
সদর ঃ	
কাটাগড় মেলা	১ দিন
বালিয়াকান্দা থানা ঃ	
হরিঠাকুর মেলা	মাঘি পূর্ণিমা-৩ দিন
মাঝপাড়া হরিঠাকুরের মেলা	বারুনি স্নান-১ দিন
জাউনগরের মেলা	১ দিন
গোপালগঞ্জ থানা ঃ	
রঘুনাথপুর মেলা	পৌষ সংক্রান্তি-১ দিন

কোতওয়ালীপাড়া থানা ঃ	
ঘাঘর মেলা	চৈত্র সংক্রান্তি
সিদ্ধান্তবাড়ি মেলা	,, -৩ দিন
মুকসুদপুর মেলা	রথযাত্রা-১ দিন
ভাঙা থানা ঃ	
মুকদোবা মেলা	অষ্টমী স্নান-চৈত্র ২ দিন
দরগার মেলা	বাকনি স্নান-চৈত্র ১ দিন
ক্ষাত্র মেলা	রথযাত্রা-আষাঢ় ১ দিন
বোয়ালমারি থানা ঃ	
সাতৈর মেলা	ওরস-চৈত্র ১৫ দিন
মাদারিপুর থানা ঃ	
মাদারিপুর মেলা	দশহরা-২ দিন
মোস্তাফাপুর	ঐ-১ দিন
শ্রীনন্দিমেলা	মাঘিপূর্ণিমা-১ দিন
দত্ত কেন্দুয়া মেলা	ঐ
কালকিনি থানা ঃ	
সোওলা পট্টি মেলা	চৈত্র সংক্রান্তি-১ দিন
পালঙ থানা ঃ	
কোঠাপাড়া মেলা	ঐ
বিলাসখান মেলা	১ বৈশাখ-চৈত্রসংক্রান্তি-১ দিন
মনোহর মেলা	চৈত্র সংক্রান্তি-১ মাস
রাজৈইর থানা ঃ	
মহেন্দ্রাদি কালিবাড়ি মেলা	১ দিন
ভেদরগঞ্জ থানা ঃ	
রামভদ্রপুব মেলা	ঐ
মাহিসার মেলা	চৈত্র সংক্রান্তি-১দিন নববর্ষ ১-৭ বৈশাখ
নলিয়া থানা ঃ	
মৌলভী জান শরীফের ওরস	ফাল্গুন-৩ দিন

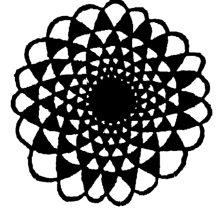
ব্যাঙ্ক

১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ৫টি নন-সিডিউলড ব্যাঙ্ক জেলায় কর্মরত ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ পূর্ববর্তী সময় থেকে এরা সক্রিয় ভূমিকা নেয়। এদের নাম এবং যেখানে এদের কর্মরত দেখা যায় ঃ

১. ফরিদপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড	ফরিদপুর
২. লক্ষ্মীকুল-রাজবাড়ি লোন অফিস কোঃ লিঃ	রাজবাড়ি
৩. রাজবাড়ি ব্যাঙ্ক লিমিটেড	রাজবাড়ি
৪. মাদারিপুর কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড	মাদারিপুর
৫. মাদারিপুর পপুলার ব্যাঙ্কিং অ্যান্ড লোন কোম্পানি লিঃ	মাদারিপুর

চরমাগুরিয়ায় ১৯৪৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি প্রথম সিডিউলড সোনালি ব্যাঙ্ক (পূর্বতন ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান) কাজ শুরু করে। ১৯৫৮ সালে এই ব্যাঙ্কের একটি শাখা স্থাপিত। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত নতুন কোন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়নি। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে সাতটি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের ২১টি শাখা স্থাপিত হয়। এগ্রিকালচারাল ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্কের ৪টি শাখা স্থাপিত হয়েছিল এই সময়ে। সক্রিয় কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ছিল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান, হাবিব ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেড, মুসলিম কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক. ইস্টার্ন মার্কেনটাইল ব্যাঙ্ক, ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন এবং অস্ট্রেলেশিয় ব্যাঙ্ক লিমিটেড। বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পর এই ৭টি ব্যাঙ্ক এবং আরও ৪টি ব্যাঙ্ক---কমার্স ব্যাঙ্ক লিঃ, স্ট্যানডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড এবং ব্যাঙ্ক অফ ভাওয়ালপুর জাতীয়করণ করা হয়। এরা ৬টি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের আওতায় আসে। ১৯৬৮ সালের মধ্যে বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্র ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ২৭টি ব্যাঙ্ক শাখা স্থাপিত হয়েছিল। ব্যাঙ্কগুলির নাম হল ঃ

	কোথায় অবস্থিত	কবে শুরু
১. সোনালি ব্যাঙ্ক (পূর্বতন ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান)	চর মাগুরিয়া	১.২.১৯৫৪
২. ঐ	ফরিদপুর	৫.১২.১৯৫৮
৩. ঐ	রাজবাড়ি	২৩.১০.১৯৬২
৪. ঐ	গোপালগঞ্জ	২৩.৭.১৯৬৩
৫. ঐ	মাদারিপুর	৭.৫.১৯৬৪
৬. ঐ	বোয়ালমারি	৭.৭.১৯৬৬
৭. ঐ	পাংসা	৫-৮-১৯৬৬
৮. ঐ	কামারখালি	৫-৯-১৯৬৬
৯. ঐ	ভাঙা	১৫-২-১৯৬৭
১০. অগ্রণী ব্যাঙ্ক (পূর্বতন হাবিব ব্যাঙ্ক লিঃ)	মাদারিপুর	১১.১২.১৯৬২
১১. ঐ	ফরিদপুর	১২.৫.১৯৬৪
১২. ঐ	রাজবাড়ি	১৭.৭.১৯৬৫
১৩. ঐ	ভাঙা	২১.৮.১৯৬৫
১৪. ঐ	বোরহানগঞ্জ	১৬.৪.১৯৬৬
১৫. জনতা ব্যাঙ্ক (পূর্বতন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ)	গোপালগঞ্জ	২.৩.১৯৬৪
১৬. ঐ	ফরিদপুর	১৬.৩.১৯৬৪
১৭. ঐ	হরিকুমরিয়া	৭.১২.১৯৬৬
১৮. ঐ	খানখানপুর	৩.৪.১৯৬৮
১৯. রূপালী ব্যাঙ্ক (পূর্বতন মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ)	রাজবাড়ি	২২.১২.১৯৬২
২০. ঐ	গোপালগঞ্জ	২৩.১০.১৯৬৪
২১. রূপালী ব্যাঙ্ক (পূর্বতন ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিঃ)	ফরিদপুর	১৬.১০.১৯৬৭
২২. ঐ (পূর্বতন অস্ট্রেলেশিয় ব্যাঙ্ক লিঃ)	ফরিদপুর	১.১২.১৯৬৭
২৩. উত্তরা ব্যাঙ্ক (পূর্বতন ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ)	চকবাজার	১০ ৭.১৯৬৮
২৪. এগ্রিকালচারাল ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ বাংলাদেশ	ফরিদপুর	১৮ ২.১৯৬১
২৫. ঐ	মাদারিপুর	১৮.২.১৯৬১
২৬. ঐ	গোপালগঞ্জ	১৮.২.১৯৬১
২৭. ঐ	রাজবাড়ি	১.৫.১৯৬৮



ছড়া ও লোকসঙ্গীত

(১)

ছেলে ভুলানো ছড়া

ঝিঁ ঝিঁ সই, তোর পুত কই?
আম গাছে। কি কাজ করে?
পিঁড়ি চাঁছে। কার পিড়ি?
ছোট বউর পিঁড়ি-ছোট বউ কো?
ঘাটে গেছে। -ঘাট কো?
ডাহু খাইছে। -ডাহু কো?
বনে গেছে। -বন কো?
পুইড়া গেছে। -ছাই কো?
ধোপায় নিছে। -ধোপা কো?
হাটে গেছে। -হাট কো?
ভাইঙ্গা গেছে। -বুড়ি লো বুড়ি!
কিলো? -তইলা পাইলাগুলি সবালো।
ক্যালো? -তালগাছটা পইল।
চিপ্‌পুস!

(২)

ময়নামতী সরস্বতী কাইল ময়নার বিয়া,
ময়না রে লইয়া যাইব দিগ্‌নগর দিয়া।
দিগ্‌নগরের মাইয়াগুলা নাইতে লাগিছে,
চিকন্ চিকন্ চুলগুলা ঝাড়তে লাগিছে,
গলায় তাগো শঙ্খমালা রক্ত ফুটিছে,
হাতে তাগো দ্যাব (দেব) শাঁখা ম্যাগ (মেঘ) করিছে।
পরনে তাগো ডুইরা শাড়ি উড়তে লাগিছে,
কে দেখিছে, কে দেখিছে, দাদা দেখিছে,
দাদার হাতের বাজু-বন্দুক ছুইড়া মারিছে,
উহু দাদা, উহু দাদা. বড্ড লাগিছে।

(৩)

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী আইল বান,
শিবঠাকুরের বিয়া হইল তিনকন্যা দান।
এককন্যা রাঁধেন বাড়েন, আর এক কন্যা খান,
আর এক কন্যা রাগ কইরা বাপের বাড়ি যান।

(৪)

এ পার গঙ্গা ও পার গঙ্গা তার মাইদ্দে চর,
সেইখানেতে বস্যা আছেন শিব সদাগর।
শিব গ্যালেন শ্বশুরবাড়ি বইস্তে দিলো পিড়া,
জলপান করিতে দিলো শালিধানের চিড়া।
শালিধানের চিড়া নালো বিন্নিধানের খই,
হবিগঞ্জের সবরিকলা গামছা বান্ধা দই।

(৫)

আদা কাটি কুচুর কুচুর রক্ত পড়ে ধারে।
শিবঠাকুরের কোটনা কাটি, মহাদেবের ঘরে।
মহাদেব, মহাদেব, এবার বড় খরা,
আর বচ্ছর নীল বুনাবো শ্যাওড়া গাছতলা।
শ্যাওড়া গাছতলা নালো বটগাছ তলা,
দুই পাশে দুই ঢাকের বাড়ি, মইদ্দে নাচে বালা।
বালার বেটা বালারে তোর হাতে লোহার তাড়,
ভ্যান্না গাছে উইঠা বালার ভাঙ্লো মাজার হাড়।
হাড় ভাঙিলো, গোড় ভাঙিলো, ভাঙ্লো মাথার খুলি,
শিবঠাকুরের আইজ্ঞা লইয়া ঢাকে দাও বাড়ি।

(৬)

আদবিনী কন্যার বিবাহ অনিবার্য-মায়ের স্নেহমায়া মমতায় গড়া যেবন্ধন-তা ছিন্ন করে চলে যেতে হয়। মেয়ের চোখের জলের সামনে মা তার কর্তব্য করে যান—

আষ্ট সখী সাজে গো কি লিলুয়া পড়িয়া রে—
মেন্দী তুলত যায়গো তারা মনের অভিলাষে কি ওরে।।
কওছে কওছে সোনার গো মেন্দী মেন্দী তোমার জন্ম
কোন খানে রে—
কওছে কওছে আফন গো মেন্দী মেন্দী তোমার জনম
কোন খানে রে।
অরণ জঙ্গলের মাইঝে অরণ বিক্ষের পাতা সেইখানে
লইছি জনম আল্লাজী বুলাইয়া কি ওরে।।
আষ্ট সখী সাজে গো—
কি লিলুয়া পড়িয়ারে
মেন্দী তুলত যায়গো তারা মনের অভিলাষে কিওরে।।
কওছে কওছে সোনার গো—
মেন্দী মেন্দী তুমি লাগ কি কি কাজে কিওরে—
কওছে কওছে আফন গো মেন্দী মেন্দী তুমি লাগ কি কি
কাজে কি ওরে।
নয়া না নবীনা বালীর বিয়াতে লাগি গো
নয়া না নবীনা দুলার গতরে লাগি কি ওরে।।
আষ্ট সখী সাজে গো কি লিলুয়া পড়িয়ারে।
অলদী তুলত যায় গো তারা মনের অভিলাষে কি ওরে।।

কওছে কওছে সোনার গো
হলদী অলদী তোমার জনম কোনখানে কিওরে।
কওছে কওছে জংলী গো
অলদী অলদী তোমার জনম কোনখানে কিওরে।
গিরস্তের ঘরের পাঁইছালে গো
গিরস্তের ঘরের হাইছালে র
সেইখানে লইছি জনম আল্লাজী বুলাইয়া রে।।
আষ্ট সখী সাজে গো
কি লিলুয়া পড়িয়া রে
অলদী তুলতে যায় গো তারা মনের অভিলাষে কিওরে।।
কওছে কওছে সোনার গো
অলদী অলদী তুমি লাগ কি কি কাজে কি কওরে।
কওছে কওছে জংলী গো
অলদী অলদী তুমি লাগ কি কি কাজে কি ওরে।
নয়া না নবীনা বালীর গতরে লাগিগো
নয়া না নবীনা দুলার বিয়াতে লাগি কি ওরে।।
আষ্ট সখী সাজে গো কি লিলুয়া পড়িয়া রে
গীলা তুলত যায় গো তারা মনের অভিলাষে কি ওরে।।

(৭)

"কি কর দুল্যানের মালো বিভাবনায় বসিয়া নারে।
আসত্যাছে বেটীর দামান ফুল পাগড়ী উড়ায়া নারে।"
"আসুক আসুক বেটীর দামান কিছুর চিন্তা নাইরে।
আমার দরজায় বিছায় থুইছি কামরাঙা পাটী নারে।
সেই ঘরেতে নামায়া থুইছি মোমের সস্ত্র বাতি নারে।
বাইর বাড়ী বান্দিয়া থুইছি গজমতী হাতি নারে।"

(৮)

বিবাহিতা কন্যাব কোল জুড়ে আসে সন্তান। আনন্দের জোযাব আসে আত্ম-পরিজন-পাড়া-পড়শীর মনে—

রাজা দশরথের বাড়ীতে
রাজা দশরথের বাড়ীতে
কি আনন্দ তার দাদার মনে।
বিনা সুতায় বুইনা মালাগো
ও রাজা নাতিরে সাজাইল গো
ও রাজা নাতিরে সাজাইল গো।
কি আনন্দ তার দাদার মনে।।
বিনে ত্যালে পেইবা কাজল গো
ও রানী নাতিরে সাজাইল
ও রানী নাতিরে সাজাইল গো।
কি আনন্দ তার বো'মার মনে।।
রাজা দশরথের বাড়ীতে

রাজা দশরথের বাড়ীতে
কি আনন্দ তার জ্যাঠার মনে।
বিনে সোনায় গইরা মালাগো
ও জ্যাঠা তার বেটা সাজাইল
ও জ্যাঠা তার বেটা সাজাইল গো।
কি আনন্দ তার জ্যাঠার মনে।।
রাজা দশরথের বাড়ীতে
রাজা দশরথের বাড়ীতে
কি আনন্দ তার আইয়ার মনে।। ...
বিনে সোনায় গইরা বালা গো
ও আইয়া নাতিরে সাজাইল
ও আইয়া নাতিরে সাজাইল গো।
কি আনন্দ তার আইয়ার মনে।।
রাজা দশরথের বাড়ীতে
রাজা দশরথের বাড়ীতে
কি আনন্দ খুড়ার মনে।
বিনে সোনায় গইরা মটুক গো
ও খুড়া তার বেটা সাজাইল
ও খুড়া তার বেটা সাজাইল গো।
কি আনন্দ তার খুড়ার মনে।।
রাজা দশরথের বাড়ীতে
রাজা দশরথের বাড়ীতে
কি আনন্দ তার দাদার মনে ...।।

(৯)

কন্যাদান

'উলু উলু শিমুলের ফুল মুকুট মাথায় দিয়া
শিমুল ফুল তুলতে গেলাম তাইতে হল বিয়া।'
'আয়লো খেলার সই খেলার সাজ নিয়া,
আর ত খেলব না খলা পরের দেশে গিয়া।'
ঢোল বাজে ঘুমুর ঘুমুর শানাই বাজে রয়া
পরের ছেলে নিতে এল ঢোলে টোকর দিয়া।
আমকাঁটালের পিঁড়িখানি ঘি মউ মউ করে
তারির উপর বাপ ভাই কন্যে দান করে।

(১০)

কন্যা বিদায়

এখন কেন কান্দ, বাপধন, মুখে গামছা দিয়া,
তখন নি কইছিলাম তোমায় দূরে না দেও বিয়া।
এখন কেন কান্দ, মাগো, শানে পাছাড় খাইয়া।
তখন নি কইছিলাম তোমায় দূরে না দেও বিয়া।।
এখন কেন কান্দ, ভাইগো, খেলার সজ্জা লইয়া।

তখন নি কইছিলাম তোমায় দূরে না দেও বিয়া।
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানি।
ধীরে ধীরে বাওরে, মাঝি, মায়ের কান্দন শুনি।।
নাইয়ারে দিয়াম তাড় বালা মাঝিরে দিয়াম কড়ি।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি মায়ের কান্দন শুনি।।
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানি।
ধীরে ধীরে বাওরে, মাঝি, বাপের কান্দন শুনি।।

(১১)

গায়ের হলুদের পর বরের বাড়ির গীত

জোগারে মঙ্গল ধ্বনি,
আইস আইস ওরে বাছা নীলমণি।
ঘরের থনে জিজ্ঞাসেন মায়ে,
"কি কি লোভে আমার রামের গায়ে?"
হস্তে শোভে হস্ত জ্যোতি
গলায় শোভে রামের গজমতি।
রৌদ্রে ঘাইমাছে বাছা,
ক্ষুধায় ঘাইমাছে বাছা
কি চন্দ্রবদন, ওগো রামের মা।
"কই গেলা রামের দাসী!
গামছা আন রামের বদন মুছি"
অঞ্চলে বাঁধিয়া কড়ি,
যান ওগো রামের মা বাইনা বাড়ী,
"হ্যাদেরে বাইনা ছেইলা,
কত লইবা রে তোমার সিন্দুর তোলা?"
"আমার সিন্দুরের মূল্য সোনার পাঁচ কড়া
ওগো রামের মা।"

(১২)

বিবাহের আগের দিন পাত্রকে সাজানো উপলক্ষে গান

সখি, চল চল চল সখি, অযোধ্যার ঐ ভুবনে।
আমরা সাজাব রাম ঐ গুণগ্রাম চল যাই সকালে।
আমি আগে যাইয়ে সাজাইব ঐ বাম বিজয়বসন্ত রে।
আমি এই চলিলাম চন্দন আনতে বানোর দোকানে।

(১৩)

ফুলশয্যার গান

যাতি, যুথি, কুটরাজ, বেলা, গন্ধরাজ ফুল, কৃষ্ণকলি
নবকলি অর্ধ বিকশিত, তাতে বনমালী হরষিত।
তুমি যাও ও, নাগর, প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে আছেন ঘুমে কাতর।
আমি এই আসিলাম বানের চন্দন গৃহেতে থুয়ে।
এখানেও দীপের কাজল, তাঁতীর বস্ত্র মালী মালা গৃহেতে রেখে।
তুমি যাও হে নাগর প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে আছেন ঘুমে কাতর।

(১৪)

প্রেম

আগা নায়ে ঝামুর ঝুমুর রে
হারে মাঝি রে—
পাছা নায়ে ছৈয়া।
দাঁড় পড়ে শতেক শতেক বইঠা পড়ে রে রইয়া,
তোর বৈঠার জলে রে
মাঝি আমার ভিজে মাঞ্জার শাড়ি
তরে কেমনে বুঝাই কইয়া।
ঐ দেখা যায় গুয়া নারিকেলরে
ও মোর ঐ দেখা যায় বাড়ী,
ঐ না বাড়ী যাইয়া রে
লীলা শুকাইও মাঞ্জার শাড়ী

(১৫)

কেবল প্রেমিক বা স্বামীই সব নয়—মাতৃপিতৃ প্রেমও বাঙালি রমণীর চিরন্তন ঐশ্বর্য—

ধীরে ধীরে বাইও নৌকা রে
মাঝি আস্তে আস্তে ফেলাও বৈঠা,
আমার মাবোনের কান্দন রে
শুনি আমার ভাইবনের কান্দন রে শুনি।
ঐ দেখা যায় গুয়া নারিকেল রে লীলা,
ও মোর দেখা যায় বাড়ী,
ঐ না বাড়ীর গেলি রে লীলা
আমার মা বন আছে,
আমার ভাইবন আছে।।
পরের মা বন বইলা,
আমার কি মন ভেজে রে।
পরের ভাইরে ভাই বললে
সে কি দরদ আমার বুঝে রে।।
মায় কান্দে ঘাটে পথে
বুইনে কান্দে কোলে,
বাপে কান্দে মাঠে মাঠে
এমনও দরদের মা বাপ রে
কেমনে যাব ফেলে।।

(১৬)

কোন এক জেলে মাধব আর প্রেমিকা মালাপের স্মৃতিজড়ানো --

আমার বাপের অধীন করি তোমার বাপের ঘর।
এই না শুনিলে মাধব তোমার রাগনে না রে ধর।।
তোমার বাপের অধীন করি আমার বাপের ঘর।
উচিত খাজনা ফেলে দিলে, আমি কারে করব ডর।।
বাটা ভইরে টাকা না দিব পঞ্চ বিয়া করিও,
বাইল্যার চরের জমি দিব, তুমি বাশশাই কইরে খাইও।

আমার মায়া ত্যাগ কইরে তুমি অন্য মায়া ধর।।
চাই না তোমার টাকাকড়ি, চাই না তোমার জমি।
আড়ে দীবে গভীর সাগর আমি টাকায় বানতে পারি।
সোমেতে জুড়ি যারে নৌকা, মঙ্গলে গড়াইও।
বুধের ও বৈকালে মাধব, তুমি পাছ ঘাটে লাগাইও।।
কচু বইনা মশার কামড় সইতে নারে পারি।
এমন ইচ্ছা করে রে মালঞ্চ আমি গঙ্গায় ডুইবা মরি।।
ঘরে জাগে মাতা-পিতা বাইরে জাগে পহরি।
রশই করা সারা হলো, কেবল ভোজন বাকী।।
ভাটি বাঁকে মাধবের বাড়ী-উজান ক্যানে বায়।
নিশ্চয় জানিলাম এতো ডাকাইতেরও নাও।।
হাতে হাতে পানও না দিতাম, মাধব
হারে না বাড়াইতাম পাও।
নিশ্চয় জানিলাম এতো জাইলা মাধার নাও।।

(১৭)

একজন মানুষকে জীবনসঙ্গী হিসাবে পেলেও-নারীর পক্ষে ভুলে যাওয়া অসম্ভব বাল্য প্রেমিকদেব

বাপমায়ে দিছিলো বিয়া বাবরী চুইলার সাতে।
বাবরী চুইল্যা ঘুমে কাতর কথা কই কার সাতে।।
ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে লড়ে তাইরি বুলি চড়া,
বুকের মধ্যে ভরা রে যইবন সোনা দিয়া মড়া।
চলসখী যাই প্রেমের বাজারে।।
বাটাভরা কাটা গুয়া চুনো দিয়া খাইও,
আগা নৌকার গুড়া ধইরা টিলা টাইলা বাইও।
চল সখি যাই প্রেমের বাজারে।।
তারপরে করিলাম পেরোমো কলা গাছের আঁড়ে,
সেও কলাগাছ ভাঙ্গিয়া গ্যালো চতত্তিব মাইসা ঝড়ে।
চল সখি যাই প্রেমের বাজারে।।
তারপরে করিলাম পেরোমো খাজুর গাছের আঁড়ে.
নালা বাইয়া রসো পড়ে কমলকলির পবে।
চল সখি যাই প্রেমের বাজারে।
তারপরে করিলাম পেরোমো বরই গাছের আঁড়ে,
হিঙ্গিল প্রেমের কাঁটা টানলি নাহি ছাড়ে।
চল সখি যাই প্রেমের বাজারে।।
তারপরে করিলাম পেরোমো কাঁঠাল গাছের আঁড়ে,
বিজিল গাও দেরায় ওরে তলে গামছা দেরে।
চল সখি যাই প্রেমের বাজারে।।

কোড়া শিকারি চাঁদ বিনোদকে নিয়ে একটি অসাধাবণ গান—সাপের কামড়ে মৃত বিনোদেব জীবনলাভের আশায় ছুটে যায় ওঝার বাড়ি--

(১৮)

এই তো আষাঢ়মাসেরে দেওয়ায় দিলো ডাক রে,
হাইড়া কোঁড়ার ডাকও শুনিয়া বিনোদ কোড়ার দেয়
পালন রে।
ছোঁপেরও বাঁশ কাটিয়া বিনোদ চিকন ফাঁড়ে শলা,
তাঁলের আশ উঠাইযা বিনোদ বাঁধে কোড়ার খাঁচা রে।।
উত্তরেতে যায়রে বিনোদ, কাছে গুয়া গাছ রে,
গুয়া গাছও কাটিয়া বিনোদ মাইয়া তৈয়ার করে।।
প্রভাতে গা তুলিয়া বিনোদ ভাতের দেয় রে সাড়া,
বিনোদের মা উইঠা বলে ভাতের চাইল নাই কাঁড়া।।
ডাইন হাতে কোড়ার খাঁচা বিনোদ বাম হাতে মইয়া রে,
কোড়া শিকার দিল গিয়া উত্তর ডাংগার মাঠে রে।
কোড়া শিকার দিয়া বিনোদ বসলো গাছের পাশে রে,
সূতা সঞ্চর সাপে আইসা বিনোদেরে কামড়াইল মস্তকে রে।।
সূতা সঞ্চর সাপের বিষ উর্দ্ধনালে যায় রে,
নারীর মাথার কেশও দিয়া বিনোদ তাগা করলো পায় রে।
মাছ মার জাইলা ভাই হাতে জালের দড়ি,
কোনপথে যাব আমি তিলেক ওঝাঁর বাড়ী।
ঐ দেখা যায় গুয়া নারিকেল কলা সারি সারি,
ঐনা পথে যাবা তুমি তিলেক ওঁঝার বাড়ী।।
হাল বওয়াও হাউলা ভাই হাতে সোনার নড়ি।
কোন্ পথে যাব আমি তিলেক ওঝার বাড়ী?
ঐ দেখা যায় গুয়া নারিকেল কলা, সারি-সারি,
তার নীচে দেখা যায় তিলেক ওঝার বাড়ী।।
ঐনা পথে যাও গো তুমি তিলেক ওঝার বাড়ী।।
ওরে বিনোদ রে ...।
তিলেক ওঝা নাই রে বাড়ী,
আছে তার খুড়া, বিনোদেরে যে বাঁচাইতে পর দিব
সোনার চূড়া।।
তিলেক ওঝা নাই রে বাড়ী আছে তার ভাই,
ওরে বিনোদরে যে বাঁচাইতে পার দিব তারে দুওয়া গাই।।
এক ঝাড়া দুইও ঝাড়া তিন ঝাড়া হইল,
চাইরও ঝাড়ার কালে বিনোদ উল্টা মোড়ও খায়।

(১৯)

সওদাগর বাঙালি-বাণিজ্যেতে যায়-গৃহে অবস্থিত নারীর আশঙ্কা স্বামী না অন্য নারীতে আসক্ত হয়—

বারে বারে করিমানা মাধব না লইও বাণিজ্যের বায়না,
লইয়া বায়না না যাইও বাণিজ্যে, ও প্রাণ মাধব রে।
ও প্রাণ মাধব রে, কোদালে কাটিয়া মাটি
কলা রুইলাম সারি সারি,
রুইয়া কলা না কাটিলাম পাত।।
নায়ে যাবা দাঁড়ি হবা, মাঝির সঙ্গে ভাইল রাখবা,
বেভাইল হলে বধিরে পরাণে, ও প্রাণ মাধব রে।।
পূবেরও বাণিজ্যে যাবা, হীরামণ মাণিক্য পাবা,
সেনা দেশে দারুণ বাঘের ভয়. ও প্রাণ মাধব রে।।
যে কালে করিলে বিয়া হস্তের পরে হস্ত থুইয়া
আর রাঙা সূতায় করিয়া বন্ধন, ও প্রাণ মাধব রে।।
শিশুকালে শিশুমতি বয়োসের কালে মইলো পতি,
হলো বিয়া না হলো মিলন।

(২০)

মাগনের গান—
বৃষ্টির জন্য

আইলাম্বর আইল্যাম্বর
চাউল কড়ি বাইর কর্
চাউল দিবে দিবে কড়ি।
বড় বউ গো তাড়াতাড়ি।
ছোট বউ গো তাড়াতাড়ি।।
আমি তো মাগিয়া খাই।
বাড়ী বাড়ী বয়াৎ গাই।।

(২১)

আইলাম রে হরিয়া।
হস্তীর পিঠে চড়িয়া।।
হস্তীর পিঠ দুল দুল করে।
সর্গে উইঠ্যা নাচ করে।।
সর্গে অইল হিজুলী।
বাপ মা তার বিজুলী।।
ঘর তো বড় ছাটুনী।
গিন্নি বড় খাটুন্নী।।
সেও গিন্নি মাধন।
আমাগো দিব্যান কত ধন।।
দেন ধান চলিয়া যাই।
আর বাড়ীতে পাইব্যার চাই।।
আর বাড়ী বহুত দূর।
আইস্তে যাইতে সমুদ্দুর।।
সমুদ্দুরে দিলাম ভাটা।
ধান দিব্যান চাইর কাঠা।।

(২২)

মাগনের গান একসময়ে গ্রামবাংলার একটি লৌকিক আচার—দীর্ঘদিন বৃষ্টি হলে, গ্রামের ছেলেরা বাড়ির উঠোনে জল ঢেলে দিয়ে, সেখানে গড়াগড়ি করত।

কালো মেঘা নামো, ফুল তোলা মেঘ নামো।
ধূলট মেঘা, তুলট মেঘা, তোমরা সবাই ঘামো।
কালো মেঘা টল্‌মল্‌ বার মেঘার ভাই,
আরো ফুটিক পানি দিলে চিনার ভাত খাই।
কালো মেঘা নামো-নামো চোখের কাজল দিয়া,
তোমার কপালে টিপ দিব মোদের হলে বিয়া।।
আড়্‌ইয়া মেঘা, হাড়্‌ইয়া মেঘা, কুড়্‌ইয়া মেঘার নাতি।
নাকের নোলক বেচ্‌চ্যা দিবাম তোমার মাথার ছাতি।।
কৌটা ভরা সিন্দুর দিবাম সিন্দুর মেঘার গায়।
আইজ যেন রে দেওয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায়।।

(২৩)

এ বাড়ী আইলাম রে বড় ভাগ্যবান।
বাইর বাড়ীতে দেখিরে ত্যা-মাল্লাইরা দালান।।
ত্যা-মাল্লাইরা দালানের উপর স্যাত কুইল্যা ধান।
সাত কুইল্যা ধান পাইয়া সব রাখালে বলে,
এ বাড়ীর গাই র‍্যাস্তের সোনার চান কোলে,
সোনার চান চাক্‌রি কইর্‌ বে কৈলকাত্তার শহরে,
কত টাকা আন্‌বে রে ঘুড়া আর গাড়ীতে।
আর টাকা আনবেরে সুইম্যার না পাই।।

(২৪)

কানাই বলেরে শ্রীদাম.
বেলা গেল বিলম্বে আর কার্য নাই।।
বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল, রবি গেল তল,
বিলম্বের আর কার্য নাই ধেনু লয়ে চল।।
ধবলী, শ্যামলী গাই পালের প্রধান
হারায়ে ধবলীর বাছুর উড়িল পরাণ।।
গাছে থাক, পাখীগণ, নজর বহুদূর,
এই পথে কি যাইতে দেখেছ ধবলীর বাছুর।।
দেখেছি দেখেছি বাছুর কালিন্দীর তীরে
গলায় ঘণ্টা পায়ে ঘুঘুর চলেছে ধীরে ধীরে।।

(২৫)

মাঘমণ্ডল ব্রত/সূর্য ব্রত

ওঠো ওঠো রাউল রে ঝিকি মিকি দিয়া।
সুবর্ণের পঞ্চম খাড়ু নিশিরে থুইয়া।
নিশিরে থুইয়া না লো ঝাপুর ঝুমুর।
আমাদের রাউলের হাতে তাম্বুল।।
হাতে তাম্বুল না লো পাছে থুইয়া।
নিয়া গেল বাওন ঝি কোলে করিয়া।।
নিলি নিলি বাওন ঝি ও তোর কে।
বাসুর পো না লো দ্যাওর পো।।
দ্যাওর পো হৈয়া কি কাম করে।
রাজার দুয়ারে পাশা খেলে।।
খেলুক পাশা জিনুক কড়ি।
তা দিয়া কেন্‌বো মোরা সূর্যাই রাউলের পিড়ি।।
সূর্যাই রাউলের পিড়িখানি নেতে পিছল।
তাতে লাইগ্‌গা গেল ধোপাঝির আঁচল।।
নে নে ধোপাঝি নেত্‌খান ধুইয়া।
যাইট কাওনের পান গুয়া খাইয়া।।
যাইট কাওন না লো ঝাড়ার মূল।
ভায়া যাবেন লো বিক্রমপুর।।
বিক্রমপুর না লো বড় বড় লাড়ু।
মার্ লৈয়া আন্‌বেন লো সুবর্ণের খাড়ু।।
বাপের লৈয়া আন্‌বেন লো দোলা ঘোড়া।
ভাইর লৈয়া আনবেন গো পাজি পুথি।।
বুইনের লৈয়া আন্‌বেন লো খেলার ডুখি।
সতাইর লৈয়া আনবেন কুইয়া পুঠি।।
এইয়া শুনিয়া সতাই তুমি সুন্দরবনে যাও।
সুন্দরবুনিয়া বাঘ ওরে সতাইরে ধরিয়া খাও।।
ছাপ ছিপ না লো বেড়ের মাটী।
আমাগো বাপ তাই লোহার কাঠি।।
লোহার কাঠি হইয়া কি কাজ করে।
স্বর্গে উঠিয়া জোকার পাড়ে।।
জয় দিব না লো জোকার দিব।
সোনার দুইটি ভাই বুইন কোলে করিয়া নিব।।
আগর চল লো দুয়ার মেল লো।
জুতি মালতী মেল্লিয়া মারলাম ঘরে।
কত নিদ্রা যাও রে সূর্যাল জোর বাসর ঘরে।।
সূর্যাইর ঘরের দুয়ারে সোনার মৃদঙ্গ বাজে।
তবু না সূর্যাই রাউলের নিদ্রা ভাঙে।।

ওঠো রাউল উদয় দিয়া
দুগুণ ছাতি মাথায় দিয়া
নগুণ পৈতা গলায় দিয়া ;
রাঙা লাঠি হাতে কইর্ আ।

বাওন বাড়ীর উপর দিয়া।
বাওনের মাইয়া বড় সেয়ানপৈতা কাটে অতি বেয়ান।।
ওঠো রাউল উদয় দিয়া নগুণ পৈতা গলায় দিয়া।
মালীর মাইয়া বড় সেয়ান ফুল জোগায় অতি বেয়ান।।
ওঠো রাউল উদয় দিয়া নগুণ পৈতা গলায় দিয়া
কুমারের মাইয়া বড় সেয়ান মাটী জোগায় অতি বেয়ান।
ওঠো রাউল উদয় দিয়া নগুণ পৈতা গলায় দিয়া।
বারৈয় মাইয়া বড় সেয়ান পান জোগায় অতি বেয়ান।।
ওঠো রাউল উদয় দিয়া নগুণ পৈতা গলায় দিযা।
তেলির মাইয়া বড় সেয়ান তেল জোগায় অতি বেয়ান।।
ওঠো রাউল উদয় দিয়া নগুণ পৈতা গলায় দিয়া।
বাওনের মাইয়া বড় সেয়ানফুল চন্দন জোগায় অতি বেয়ান।।
সূর্যাই ওঠেন কোন বর্ণে
সূর্যাই ওঠেন তাম্বুলবর্ণে।
সূর্যাই ওঠেন কোন্ দিক্ দিয়া
সূর্যাই ওঠেন পুব দিক্ দিয়া
তিতৈল গাছের গোড় দিয়া
তিতৈল গাছ মেলিল পাত
সূর্যাই ঠাকুর জগন্নাথ।।
আমতলার শীতল পানি, তাতে সূর্যাইর গাডু গামছা ধোয়া পানি।
চন্দন তলার শীতলপানি, তাতে সূর্যাইর মুখধোয়া পানি।।

(২৬)

আলা চাউলে গামছা দুধে লাউলে স্নান করে।
ছাপাই বাডী কাপড় ধুইয়া লাউলে শীতে মরে।।
আলা চাউলে গামছা দুধে লাউলে স্নান করে।
শ্বশুর বাড়ী মাউগ থুইয়া লাউলে ভাতে মরে।।
ও লাউল, ভাত খাও আইসা ঘরে
তোমার শাশুড়ী রান্ধে বাড়ে মট্‌কার কদমগাছটির তলে।।
কদমের ডাইল ভাইঙ্গা পাছর পড়ে।।

(২৭)

কি করছ লো লাউলের বউ দুয়ারে বইসা।
তোর লাউলে আইছে দোলায় চইড়া।।
আস্‌বেন লাউলে বসবেন খাটে।
নাইবেন ধুইবেন গঙ্গার ঘাটে।।
দুলগাছি মেইলা দিবেন চম্পার ডাইলে।
কাপড়খান মেইলা দিবেন বড় ঘরের চালে।।

(২৮)

ঐ পারে দুই বাউনেব কন্যা মেল্যা দিছে শাড়ী,
তাহা দেখ্যা সূর্য্যাই ঠাকুর ফেরেন বাড়ী বাড়ী।
ওপার দুইটি বাউনের কন্যা মেল্যা দিছে কেশ,
তাহা দেখ্যা সূর্যাই ঠাকুর ফেরেন নানা দেশ।
ওপার দুইটি বাউনের কন্যা মল খাড়ুয়া পায়,
তাহা দেখ্যা সূর্যাই ঠাকুর বিয়া করতে চায়।

(২৯)

যখন জন্মিলেন গৌরী বিদর্ভনগরে।
আকাশেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।।
এই কন্যা বিয়া কর্‌বে সূর্য দিবাকর রে।
দিনে দিনে হইল কন্যা দশম বৎসর রে।।
সোনার কলসী লইয়া জল ভরিতে যায় রে।
'কোথা হইতে আইছ কন্যা, কোথায় তোমার ঘব রে।
কাহার কন্যা তুমি কিবা তোমার নাম বে।।
কিসের কলসী তোমার কক্ষের উপরে রে।'
'বিদর্ভেতে জন্ম আমার মথুবাতে ঘর।
উড়িয়া রাজার কন্যা আমি গৌরীমালা নাম।।
সুবর্ণের কলসী আমার কক্ষের উপব।'

(৩০)

উডিয়া রাজার দুইটি কন্যা বসিয়া বৈছে খাটে।
তা দেখিয়া সূর্যাই ঠাকুর ফেবেন মাঠে মাঠে।
উড়িয়া রাজার দুই কন্যা মেলিয়া দিছে শাড়ী।
তা দেখিয়া সূর্যাই ঠাকুব ফেরেন বাড়ী বাড়ী।।
উডিয়া বাজার দুই কন্যা মেলিয়া দিছে কেশ রে।
তা দেখিয়া সূর্যাই ঠাকুর ধবেন নানা বেশ বে।।
উড়িয়া রাজার দুই কন্যা মল খাড়ু দিছে পায রে।
তা দেখিয়া সূর্যাই ঠাকুর বিয়া কবতে চায বে।।

(৩১)

শুইয়া রইছ ব্রাহ্মণ ঠাকুব নিদ্রায় দিছ মন রে।
চক্ষুমেলি চাইয়া দেখ শিয়রে নারায়ণ রে।।
তোমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা সতী।
তাহার মনে বড় ইচ্ছা সূর্যাইরে পাবে পতি।।
তোমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা নাম।
শঙ্খবস্ত্র দিয়া কন্যা সূর্যাইব কর দান।।

(৩২)

ব্রাহ্মণ উঠিয়া বলে ব্রাহ্মণীর স্থানে।
'কিস্বপ্ন দেখিলাম আমি আজিকার রাত্রে।।
আমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা সতী।
তাহার মনে বড় ইচ্ছা সূর্যাইয়ে পাবে পতি।।
আমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা নাম
শঙ্খচক্র দিয়া কন্যা সূর্যাইরে কর্‌ছি দোন।'
ব্রাহ্মণী বলেন--ব্রাহ্মণ, বুদ্ধি নাই তোর ঘটে।
ভিক্ষা করি খাওরে ব্রাহ্মণ কন্যা দিবা কারে।।
কেমন করি দিব রে কন্যা আমাব চালে নাই ছোন রে।
সূর্যদেবের বরে লাম্‌লো ঘরামি চৌদ্দ জন রে।।
কেমন করি দিব রে কন্যা আমার উঠান ভরা বন রে।
সূর্যদেবের বরে লাম্‌লো ভুঁইমালি চৌদ্দ জন রে।।
ঘর হৈল দুয়ার হৈল হৈল টাকা কড়ি।
সূর্যদেবের বরে হৈল সোনার চৌয়াড়ি।।
যে দোকানে গৌবমণি শঙ্খ কিনতে যায় রে।
সেই দোকানে'ছাওয়াল সূর্যাই ছত্র ধরেন শিবে রে।।
সাক্ষী থাইক্‌ক দেবধর্ম সাক্ষী থাইক্‌ক তোমরা
অকুমারী গৌবা আমি।।
সম্মান নারিকেল তেলে কামারে দোকান মেলে।
সোনা দিব সেবে সেরে (আরে) রূপা যত লাগে।
এমনিকরি গড়বা গয়না আমার গৌরীর অঙ্গে লাগে।।
দেখ দেখ মালিয়া রে কিসের ভরা আইসে।
অর্ধেক গাঙ জুড়িয়া রে ফ‌ু মটুকের ভরা আইসে।।
আসুক আসুক আসুক ভরা লাগুক আসি ঘাটে।
আমার গৌরমণির বিয়া শনিমঙ্গল করে।।

(৩৩)

খাট খাট কলা গাছটা বাইয়া পড়ে মৌ।
সূর্যাই ঠাকুর বিয়া করছে বড় সুন্দর বৌ।।
ছোট ভাই উঠিয়া বলে, 'বড় দাদা ভাই।
গাদি ভবা পান দেও বউ আনিতে যাই।।'
ছোট ভাই উঠিয়া বলে, 'বড় দাদা ভাই।
কলসী ভরা তেল দেও বউ আনিতে যাই।।'
ছোট ভাই উঠিয়া বলে, 'বড় দাদা ভাই।
মনে ভরা সিন্দুর দেও বউ আনিতে যাই।।'

(৩৪)

সুবর্ণের খাট পাট নেতের মশারী।
তাহার মধ্যে শয়ন করেন সূর্যাই আর গৌরী।।
কাউয়ায় করে কল কল কোকিলের ধ্বনি।
'জাগ রে জাগ রে গৌরমণি দেশে যাব আমি।'
'তোমার দেশে যাব রে আমি মা বলিব কারে?'
'ঘরে আছে আমার মা যে মা বলিও তারে।।'
'শোন রে বুদ্ধির সাগর বুদ্ধি নাই তোর ঘাড়ে।
পরের মারে মা বলিলে কার প্রাণ ভরে।।
পরের বাপকে ডাকলে বাপ কার প্রাণ ভরে।।'
দৌড় দিয়া যায় গৌরমণি মায়ের কাছে।
'আমারে যে নিতে আইছে লুকাইয়া রাখ পাশে।'
'টাকা নয় রে পয়সা নয় রে বাক্সে তুল্যা থোব।
পরের লাগ্যা হইছ, গৌরা পরেরে সে দিব।।"

(৩৫)

'বিয়া কর্‌লা সূর্যাই ঠাকুর দানে পাইলা কি?'
'ভাঙ্গা গাড়ু ভাঙ্গা থাল উড়িয়া রাজার ঝি।।'
থাল পাইলাম গাড়ু পাইলাম অন্নজল খাইতে।
উড়িয়া রাজার ঝি পাইলাম গৃহ বাস করিতে।।
ভাঙ্গা গাড়ু ভাঙ্গা থাল ফেলিয়া আইলাম পথে।
উড়িয়া রাজার ঝিরে লইয়া আইলাম সাথে।।

(৩৬)

অর্ধেক গাঙ্গে ঝড় বৃষ্টি অর্ধেক গাঙ্গে খুয়া।
মধ্য গাঙ্গে বাদ্য বাজে গৌরা লবাব লইএগ্রা।।
আড়শী কান্দে পড়শী কান্দে কান্দে রইয়া রইয়া।
গৌরার জনকে কান্দে গাম্‌ছা মুড়ি দিয়া।।
গৌরার যে ভাই কান্দে খেলার সজ্জ লইয়া।
গৌরার যে মায়ে কান্দে শানে পাছাড় খাইয়া।।

(৩৭)

ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানী।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি মায়ের কান্দন শুনি।।
নাইয়ারে দিয়াম তাড় বালা মাঝিরে দিয়াম কড়ি।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি ভায়ের কান্দন শুনি।।
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ছলকে ওঠে পানী।
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি বাপের কান্দন শুনি।।

(৩৮)

'এখন কেন কান্দ, মাগো, শানে পাছাড় খাইয়া।
তখন নি কইছিলাম তোমায় দূরে না দেও বিয়া।।
এখন কেন কান্দ, ভাইগো, খেলার সজ্জ লইয়া।
তখন নি কইছিলাম তোমায় দূরে না দেও বিয়া।।

(৩৯)

'তোমার দেশে যাব সূর্যাই বাপ বলিব কারে।'
'ঘরে আছে আমার বাপ বাপ বলিব তারে।।'
'তোমার দেশে যাব সূর্যাই মা বলিব কারে।'
'ঘরে আছে আমার মা, মা বলিব তারে।।'
'তোমার দেশে যাব সূর্যাই কাপড়ের দুঃখ পাব।'
'নগরে নগরে আমি তাঁতিয়া বসাব।।'

(৪০)

সূর্যাই গৌরাই যাত্রা করাইয়া দিয়া।
গৌরমণির মায় কাঁদে শানে আছাড খাইয়া।।
আরসী কান্দে পড়সী কান্দে সকল কান্দে বইয়া।
গৌরমণির যে মা-ধন কান্দে শানে পাছাড় খাইয়া।।
আরসী কান্দে পড়সী কান্দে সকল কান্দে পর।
গৌরমণির যে মা-ধন কান্দে বেলা আড়াই ফর।।
'আগে যদি জান্‌তাম, মা-ধন, পরে নিবে তোরে।
কোলের ছাওয়াল মাটিতে রাখিয়া কোলে নিতাম তোরে।।
আগে যদি জান্তাম, মা-ধন, পবে নিবে তোরে।
কানের সোনা খসাইয়া থুইয়া কানে রাখতাম তোরে।।'
আগে যদি জানতাম, মা-ধন, পরে নিবে তোরে।
গলা হার খসাইয়া থুইয়া গলায় রাখতাম তোরে।।'
আরসী কান্দে পড়সী কান্দে সকল কান্দে রেয়া।
গৌরমণির যে বাপধন কান্দে মুখে গামছা দিয়া।।
চৌদ্দ দাঁড়ের নৌকাখানি ষোল ছয়জন মাঝি।।
'নাইয়ারে দিব তার বয়লা মাঝিরে দিব কড়ি।
ধীরে ধীরে বাওরে নৌকা মায়ের কান্দন শুনি।
ধীরে ধীরে বাওার নৌকা বাপ ভাইর কান্দন শুনি।।
এখন কেন কান্দ, মা-ধন, শানে পাছাড় খাইয়া।
সেইকালে কৈছিলাম, মা, দূরে না দিও বিয়া।।
এখন কেন কান্দ, বাবা, মুখে গামছা দিয়া।
সেইকালে কৈছিলাম, বাবা, দূরে না দিও বিয়া।।
তখন কেন কান্দ, ভাই-ধন, মুখে কাপড় দিয়া।
সেইকালে কৈছিলাম, ভাই-ধন, দূরে না দিও বিয়া।।
এখন কোন কান্দ, বুইন, খেলার সজ্জ লইয়া।
সেইকালে কৈছিলাম, বুইন, দূরে না দিও বিয়া।।

এখন কেন কান্দ, ভাইর বউ, লেমু পান্তা লৈয়া।
সেইকালে কৈছিলাম, বউ, দূরে না দিও বিয়া।।

(৪১)

পুত্রকনা জন্মলাভ করলে তবেই সিদ্ধ হয় বিবাহ। সূর্যঠাকুর পুত্রসন্তান লাভ করেন।

'লাউলে গো বাগানে কে রে কাটে পাত?'
'লাউলের ছোট ভাই শিবাই কাটে পাত।।'
'না কাটিও শিবাই রে না কাটিও পাত।
আমরা শত বইন কাটিব পাত।।
পাত কাইটা ভাত খাইমু।
ভাত খাইয়া ঝিকটি খেলাইমু।।
ঝিকটি খেলাইয়া লো শুখাই লো দূত।
কি দিয়া পূজম লো লাউলের ঘরের পুত।।
লাউলের ঘরে পোলা অইছে কি কি নাম থুইমু?
আমগা হাতে দিয়া আমাই নাম থুইমু।।
কলা গা হাতে দিয়া কলাই নাম থুইমু।
বেল গা হাতে দিয়া বেলাই নাম থুইম্।।'

(৪২)

'আমার বউল আইল বাড়ী বাড়ী।
লাউলের বউরে দেইল ঢাক্কাই বাড়ী।
লাউলের বউ লো সাধন্তী কি কি খাইতে সাধ।
ইলিস মাছ ভাজা পান্তা ভাত।।
তোমার লাউলে দিয়া পাঠাইছে ক্ষীরার রাইং।
ক্ষীরার রাইং না লো প্যাঁকের রাইং।।
খাইস্ না ছুইস্ না শিয়রে থুইস্
লাউল ঠাকুর বাড়ী আইলে বিলাইয়া দিস্'।।

(৪৩)

মুরশিদী গান

কোন্ রঙে বাইন্ধ্যাছ ঘরখানা মিছা দুনিয়ার মাঝে গোঁ সাইজি।
তোর হাড়ের ঘরখানা চামেলার ছাউনি বন্ধে বন্ধে জোড়া।
তাহার মধ্যে মনুরায় পাখী, পাখী ছুটিলে না দেয় ধরা।
ওতোর প্রথম কাল গেল হাসিতে খেলিতে যৈবন কাল গেল রসে।
ও তোর বৃদ্ধ না কাল গেল ভাবিতে চিন্তিতে গুরু ভজিবা কোন্ কালে।
ও তোর দন্ত পড়িবে চুল পাকিবে যৈবনে লাইগা যাবে ভাটি।
ও তোর দিনার দিনে খসিয়া পড়িবে বঙিলা দালানোর মাটি।।
মালির বাগিচায় ফুল ফুইটাছে ভোমরা গুনগুন্ করে সে ফুলে।
তুমি সুজন চিনিয়া করিও পিরীতি (সেজন) মরিলে বাঁচাইতে পারে।।

(৪৪)

বংশীহরণ গীত

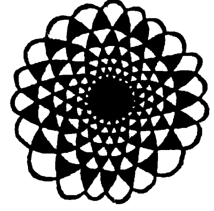
বৈদ্যরাজ বলে রাই গলার হারের কার্য নাই
দিবা মোরে প্রেম আলিঙ্গন
যদি দয়া কর রাই, প্রেম আলিঙ্গন আমি চাই,
অন্যধনের নাহি প্রয়োজন।
তখন রাইরে ঘিরে যত সখীগণে কি আনন্দ মনে মনে,
দরশনে পূর্ণ হল আশা,
দেহ যৈবন সমর্পিয়ে, বৈদ্যরাজ-সম্ভাষিয়ে,
করিলেন প্রেম প্রকাশ।

(৪৫)

বাউল গান

সাধুর সঙ্গেতে প্রাণ জুড়ায রে, শীতল হয় বে তাপিত অঙ্গ।
শীতল হয় রে তাপিত অঙ্গ রে, ক্ষণকাল হলে সঙ্গ।।
সাধুর গুণ কি যায় রে বলা, শুদ্ধ চিত্ত অন্তর খেলা।
সাধুর দর্শনে যায় মনের ময়লা রে, পরশে হয় প্রেম-তরঙ্গ।।
সাধুসঙ্গ হলে পরে, অমনি আত্মায় আত্মাহরণ করে,
সাধু হৃদয়-মাঝারে বিরাজ রে করেন শ্রীগৌরাঙ্গ।।
সাধু যদি মনে করেন, চাঁদ গৌর দিলেও দিতে পারেন।
আপন রং ধরাইতে পাবে রে তাইরে বলি অন্তরঙ্গ।।
গোঁসাই গোলোক চাঁদে বলে, তারক রে তুই রইলি ভুলে।
সাধুসঙ্গ করব বলে রে মাতলো না তোর মন-মাতঙ্গ।

সূত্র ঃ লোকসঙ্গীত রত্নাকর ১-৩ খণ্ড ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
বাংলার লোকসাহিত্য ১-২ খণ্ড ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
লোকসাহিত্য ১-২ খণ্ড ডঃ আশরফ সিদ্দিকি



স্থান পরিচয়

ফরিদপুর ঃ

ফরিদপুর জেলার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত জেলা সদর। ফরিদপুর শহরের পূর্ব নাম ফতেয়াবাদ। মরা পদ্মার তীরে ফরিদপুর শহরের দূরত্ব গোয়ালন্দ স্টিমার ঘাট থেকে ২০ মাইল। ফতেআলি ছিলেন এখানকার একজন প্রভাবশালী মানুষ, বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এই স্থানকে কৃষি উপযোগী এবং জনবসতির বাসোপযোগী করেছিলেন। পরে এখানে আসেন হজরৎ মইনউদ্দিন চিস্‌তির শিষ্য প্রখ্যাত সাধক শাহ ফরিদউদ্দিন। বর্তমান কালেক্টর ভবনের কাছে তেরো শতকের প্রথমদিকে তিনি এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। জনশ্রুতি এই ফরিদউদ্দিন নাম থেকেই স্থানটি পরবর্তীকালে ফরিদপুর নামে পরিচিত হয়।

ফরিদপুর শহরের উত্তরে মরা পদ্মা, দক্ষিণে বিল মামুদপুর, পূর্বে টেপাখোলা নদী এবং পশ্চিমে বদরপুর গ্রাম। শহরের আয়তন প্রথমে ছিল ৫.৩ বর্গ মাইল। ৪ বর্গ মাইল বেড়েছে পুর এলাকায়। পুর এলাকার উত্তরে মরা পদ্মা, পূবে মাদারতলা খাল, পশ্চিমে ফরিদপুর জোলা (খাল) এবং দক্ষিণে বিখ্যাত ঢোল সমুদ্র বিল। বর্ষাকালে পরিণত হয় একটি লেকে। ১৯১৫ পদ্মা সরে আসে শহরের কাছাকাছি। তখন শহরের উত্তর পূর্বদিকে বাঁধ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু পদ্মার মূল প্রবাহ পথ শহরের ২ মাইল দূরে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের অন্যতম কেন্দ্র ফরিদপুর শহর। তাছাড়া এখান থেকে লঞ্চে গোয়ালন্দ, মাদারিপুর, গোপালগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানে যাতায়াত করা সম্ভব। শহরের ভিতরে রিকশা ও সাইকেল চলাচল করে। মোটরযানও আছে। দূরবর্তী অঞ্চলে নৌকা চলাচল করে। শহরের অন্যতম সড়ক হল ঃ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিন্যু, থানা রোড, কলেজ রোড, আলি মুজ্জমান রোড, সাউথ সার্কুলার রোড, সার্কুলার রোড, আলিপুর রোড, নিউ ভাঙা রোড, যশোর রোড এবং স্টেশন রোড। ঢাকা ও ফরিদপুরের মধ্যে লঞ্চ যাতায়াত করে বর্ষাকালে। এই সময়ে গোয়ালমারি ও ফরিদপুরে লঞ্চ চলাচল করে। এছাড়াও চৌধুরিহাট হয়ে ফরিদপুর থেকে মাদারিপুর এবং ভাঙা হয়ে ফরিদপুর ও মাদারিপুরের মধ্যে লঞ্চে যাতায়াত করা যায়।

শহরের বর্তমান সরকারি মহাবিদ্যালয় রাজেন্দ্র কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ১৯১৮ সালে। মেয়েদের জন্য আছে সারদাসুন্দরী মহিলা কলেজ এবং ইয়াসিন কলেজ। দুটিই অনুমোদন পায় ১৯৭০ সালে। ছেলেদের উচ্চ বিদ্যালয়গুলির অন্যতম হল ফরিদপুর জেলা স্কুল (১৮৪০ খ্রিঃ স্থাপিত) ফরিদপুর ঈশান ইনস্টিটিউশন (১৮৯১ খ্রিঃ স্থাপিত), ফরিদপুর হাইস্কুল (১৯৩৪ খ্রিঃ স্থাপিত), ফরিদপুর ময়জুদ্দিন হাইস্কুল (১৯২৬ খ্রিঃ স্থাপিত), ফরিদপুর মহিম ইনস্টিটিউশন (১৯৩৬ খ্রিঃ স্থাপিত)। এর সবগুলিই ছেলেদের জন্য। মেয়েদের তিনটি পুরনো বিদ্যালয় হল ফরিদপুর গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল (১৯৫০ খ্রিঃ স্থাপিত), ফরিদপুর গার্লস স্কুল (১৯৬৩ খ্রিঃ স্থাপিত) এবং ঈশান ইনস্টিটিউশনের বালিকা বিভাগ (১৯৩৫ খ্রিঃ স্থাপিত)। তাছাড়া আছে মেয়েদের জুনিয়র মাদ্রাসা, জুনিয়র হাইস্কুল, পুরসভা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মক্তব। অস্ট্রেলিয় মিশনারিদের পরিচালিত শিল্প বিদ্যালয়ের প্রধান কেন্দ্র এখানে। ফরিদপুর শহরে একটি মূক বধির বিদ্যালয় রয়েছে।

ফরিদপুর শহরে জনজীবনে উপযোগী সবরকম ব্যবস্থাই আছে। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে

সঙ্গে জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত। সদর হাসপাতাল, পুলিশ হাসপাতাল, জেল হাসপাতাল, রেলওয়ে হাসপাতাল, টিবি হাসপাতাল এবং শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র রয়েছে। গ্যালারি ও প্যাভেলিয়ন-সহ স্টেডিয়াম, অম্বিকা পার্ক, সুরেন্দ্র মেমোরিয়াল হল (অরোরা টকিজ) শহরটির বিশেষ আকর্ষণ। অরোরা টকিজে সিনেমা ও থিয়েটার এবং অম্বিকা মেমোরিয়াল হলে বেসরকারি বিনোদন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রয়েছে। দুটি গ্রন্থাগার হল বঙ্গবন্ধু লাইব্রেরি এবং কোহিনুর লাইব্রেরি। সরকারি কর্মকর্তাদের অফিসার্স ক্লাব এবং ফরিদপুর ক্লাব বিশেষ পরিচিত।

ফরিদপুরে একটি কৃষি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় ১৮৬৪ খ্রিঃ। ফরিদপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার কৃষিজীবী মানুষ আগ্রহের সঙ্গে প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিল। জানা যায়, এখনও জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বর্তমানে ফরিদপুর শহরে ২৫টি মসজিদ রয়েছে। হিন্দুদের কালীবাড়ি, রামকৃষ্ণ মাঠ এবং জগদ্বন্ধু আঙিনা বিখ্যাত। অস্ট্রেলিয়ান মিশন পরিচালিত একটি গির্জা শহরের খ্রিস্টান অধিবাসীদের উপাসনা কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হত।

বর্তমান গ্রন্থের হাট বাজারের তালিকা থেকে ফরিদপুর শহরের হাটবাজারের নাম জানা যাবে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চকবাজার ও টেপাখোলা বাজার। স্থানীয় বাজারের অন্যতম পণ্য দ্রব্য হল তাঁতের কাপড়, পাট, গুড়, মাছ, পিঁয়াজ, রসুন ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য। ফরিদপুরের পিঁয়াজ বিখ্যাত। তছাড়া কালি, মাটির দ্রব্য ও ছাতা তৈরি হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ব্যাঙ্কিং ব্যবসার প্রসার ঘটেছে। তার মধ্যে অন্যতম হল ফরিদপুর ব্যাঙ্কিং কোঅপারেটিভ, সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও সোনালী ব্যাঙ্ক।

ফরিদপুর শহরের পুরসভার উন্নয়নমূলক কার্যক্রমও ক্রমবর্ধমান। নাগরিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রাথমিক শিক্ষা, জলনিকাশ, পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তার আলোর ব্যবস্থা করে থাকে।

সাময়িক অবস্থান ও বিশ্রামের জন্য ফরিদপুরে আছে তিনটি ডাকবাঙ্‌লো এবং একটি সার্কিট হাউস। সার্কিট হাউসে সাধারণত সরকারি কর্তাব্যক্তিরাই কার্যোপলক্ষে অবস্থান করেন।

জেলার অন্যতম দুটি ব্যবসা কেন্দ্র ভাঙা ও বোয়ালমারি। বোয়ালমারি একটি গ্রাম এবং থানা সদর। ১৮টি ইউনিয়নের ২৮৯টি গ্রাম এই থানায়। ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে বোয়ালমারির খ্যাতি ছিল বিস্তৃত। সে সময়ে খুলনা-বোয়ালমারি স্টিমার চলাচল করত। তখন স্টিমার টার্মিনাস ছিল বোয়ালমারির দেড়মাইল দূরে নদিয়ার চাঁদঘাটে। ১৯১১ সালে স্থাপিত হয়েছিল বোয়ালমারি জর্জ আকাদমি। ১৯৬৯ সালে স্থাপিত হয়েছে বোয়ালমারি কলেজ। অন্যান্য সুযোগ সুবিধার সঙ্গে এখানে একটি ডাকবাঙ্‌লো আছে।

নদিয়ার চাঁদঘাট সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে। শোনা যায়, নদিয়ারচাঁদ নামে জনৈক ব্যক্তি যাদু প্রভাবে নিজেকে কুমিরে রূপান্তরিত করতে পারত। নদিয়ারচাঁদের বউ স্বামীর যাদুর কথা শুনেছিল। একদিন সে নদিয়ারচাঁদের কুমির হওয়া দেখতে চাইল। তখন স্বামী একটি পাত্রে মন্ত্রপড়া জল রেখে বউকে বলল, যখন সে কুমির হবে, তখন বউ যেন ওই জল তার শরীরে ছড়িয়ে দেয়। তাহলে সে আবার মানুষ হয়ে যাবে। তারপর সে কুমির হয়ে গেল। কিন্তু ভয়াল মূর্তি দেখে সেখান থেকে পালিয়ে গেল তার বউ। পালাবার সময় তার পায়ে লেগে পাত্র থেকে জল মাটিতে পড়ে যায়। নদিয়ারচাঁদ আর মানুষ হতে পারল না। তখন সে পাশের নদীতে নেমে যায়। তারপর থেকে নদিয়াচাঁদের মা নদীপাড়ে গিয়ে যখন ছেলেকে ডাকত, তখন সে পাড়ে এসে মায়ের হাত থেকে খাবার খেয়ে যেত। মা যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন এইভাবে সে ছেলেকে খাওয়াত। অনেক পরে একজন নীলকর সাহেব কুমিরটিকে গুলি করে মারে। সে জানত না এই কুমিরটি নদিয়ারচাঁদ। কোনদিন

কুমিরটি মানুষকে আক্রমণ করেনি, এমনকি মানুষের মাংসও খেত না। স্টিমার কোম্পানি এই কাহিনী জানবার পর খুলনা-বোয়ালমারি সার্ভিসের এই ঘাটটির নামকরণ করে নদিয়ারচাঁদ ঘাট।

ফরিদপুর সদরের মধুখালি গ্রামটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্র। উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, ডাক বাঙলো, পুলিশ আউট পোস্ট আছে এখানে।

নগরকান্দা একটি থানা সদর। থানার অধীনে আছে ১২টি ইউনিয়নের ২৩৯টি গ্রাম। আয়তন ১৪৮ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ১,৫৫,৫১২ (১৯৬১)। এখন জনসংখ্যা আরও বেড়েছে। নগরকান্দা গ্রামের আয়তন ৩৫৫ একর। ১৯১৬ সালে গ্রামে স্থাপিত বিদ্যালয়টির নাম নগরকান্দা এম এম আকাদমি। এখানে আরও বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা পরবর্তীকালে স্থাপিত হয়েছে। একটি ডাকবাঙ্‌লো আছে।

পাতরাইল গ্রামটি হল ভাঙা থানায় ও আজিমনগর ইউনিয়নে। এই গ্রামের প্রাচীন দিঘির পশ্চিম পাড়ে একটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ দেখা যায়। দিঘিটি "বড় দিঘি" নামে পরিচিত। দিঘির আয়তন ২০০০ × ১২০০ ফুট। দিঘির পশ্চিমদিকে আছে দেয়াল ঘেরা পাকা কবর। লোকে বলে মজলিস আওলিয়ার কবর। হিন্দু-মুসলমান সকলের পবিত্র স্থান। এখানে অসংখ্য মাজার চোখে পড়বে। সম্ভবত একসময় এখানে মুসলিম বসতি ছিল বিস্তৃত। মাজারের উত্তর-পশ্চিমে বিরাট মজলিস আউলিয়ার মসজিদ। স্থানীয় মানুষ মনে করত মসজিদটি তৈরি করেছিলেন মজলিস আউলিয়া। এই বিশাল আয়তনের মসজিদ উত্তর-দক্ষিণে ৮৪ ফুট লম্বা, পূর্ব-পশ্চিমে ৪১½ ফুট চওড়া, চার কোণে আট কোন বিশিষ্ট ৪টি মিনার ছিল। মিনারের দেয়াল ছিল ৭ ফুট পুরু। মসজিদের সামনের দিকে ৫টি দরজা, উত্তরের দেওয়ালে ২টি ও দক্ষিণের দেওয়ালে ২টি দরজা ছিল। ভিতর দিকের পশ্চিম দেওয়ালে ছিল ৫টি চিত্রিত মেহরাব। ভিতরদিকে উত্তর-দক্ষিণে ৪টি স্তম্ভ। দেওয়ালের ওপর ছিল ২ সারিতে ১০টি গম্বুজ। পোড়ামাটির ফলক ছিল মসজিদের বাইরের দেওয়াল ও মেহরাবে। এখন দেওয়াল ছাড়া কিছু নেই। অনেকে মনে করেন মসজিদটি সুলতান হোসেন শাহ বা তার পুত্র নসরত সাহেবের আমলে তৈরি। মসজিদের ইটগুলিতে স্বাতন্ত্র দেখা যায়। তার ওপর খোদিত মূর্তি আছে। এই ইট তৈরিতে শিল্পির নৈপুণ্য ফুটে উঠেছে।

পাতরাইলের মজলিস আওলিয়া মসজিদ সম্পর্কে আরও জানা যায়, "অভ্যন্তরে মজলিস আওলিয়া মসজিদটির ইটের তৈরি চারটি স্তম্ভ দ্বারা দু'টি আইলে বিভক্ত। এ সমস্ত স্তম্ভের সাহায্যে অভ্যন্তরে দশটি বর্গকার এলাকার সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর প্রতিটির উপর একটি করে গম্বুজ নির্মিত হয়েছে যা বহু পূর্বে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। ড্রামবিহীন এ সমস্ত গম্বুজ অর্ধগোলাকার এবং চূড়ায় কলস দেখা যাবে। ছাদে সর্বমোট দশটি গম্বুজ থাকায় এটি সুলতানি আমলের আয়তাকার দশ গম্বুজটাইপের অন্তর্গত। কিবলা প্রাচীরে পাঁচটি অবতলাকৃতি মিহরাব রয়েছে যা পূর্বদিকে খিলা পথের বরাবর। মিহরাব গুলো পোড়ামাটির নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত এবং আয়তাকার। ফ্রেমে আবদ্ধ। গম্বুজগুলো স্কুইঞ্চের সাহায্যে নির্মিত। উত্তর ও দক্ষিণদিকে কৌণিক খিলানপথ রয়েছে।

[বাংলাদেশের মুসলিম পুরাকীর্তি-ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান। পৃঃ ২৫৫]

মজলিস আওলিয়া মসজিদের কাছে আছে ফতেহ শাহের সমাধি। যা এখন একটি ইটের স্তূপে পরিণত। এখানে একটি ছোট মসজিদও ছিল। সেটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অনেকের অনুমান আমীন জৈনুদ্দিন ফতেহশাহ ধর্মযোদ্ধা হিসাবে এই অঞ্চলে এসেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। মাজারটি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে বা ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুতে নির্মিত হয়েছিল।

পাতরাইলের মসজিদ আওলিয়া মসজিদের পশ্চিমদিকে আজিমনগরে একটি মসজিদ আছে। "... মসজিদটির চার কোণায় চারটি গোলাকার বুরুজ দেখা যাবে। যার উপরে কুপোলা বা নিরেট ক্ষুদ্রাকার গম্বুজ রয়েছে। বুরুজগুলো নিচ থেকে উপরের দিকে সরু হয়ে গেছে। মসজিদটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটি অভ্যন্তরে তিন অংশে বিভক্ত এবং মধ্যভাগে একটি গম্বুজ ও দুইপাশে দুটি গোলাকার ভল্ট দ্বারা আবৃত। গম্বুজটি পেনডেনটিভের সাহায্যে নির্মিত এবং ড্রামের উপর স্থাপিত। ...আজিমনগরের মসজিদটির পূর্বদিকে তিনটি খিলানপথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। মধ্যবর্তী খিলানপথটি অপেক্ষাকৃত বড়। পাশের প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খিলান চার কেন্দ্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রধান প্রবেশপথের উভয় পাশে দুটি করে খিলান সম্বলিত কুলুঙ্গি দেখা যাবে। উত্তর ও দক্ষিণদিকে দুটি করে খিলান পথ রয়েছে। মধ্যবর্তী খিলানপথের উপরে একটি শিলালিপি গাঁথা আছে। ফার্সি ভাষায় উৎকীর্ণ এই শিলালিপিতে তারিখ রয়েছে হিঃ ১২১৬/ইং ১৮৯১। সম্মুখভাগে অসংখ্য টারেট রয়েছে এবং কার্নিশটি বক্সাকার নয়, সমান্তরাল। কিবলা প্রাচীরে একটি মিহরাব দেখা যাবে। মসজিদের পশ্চিমদিকে একটি বর্গাকার এক গম্বুজ বিশিষ্ট ইমারতের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, সম্ভবত এটি ছিল হুজরাখা।"

(বাংলাদেশের মুসলিম পুরাকীর্তি-ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান। পৃঃ ২৫১-৫২)

সদরপুর একটি গ্রাম ও থানা সদর। একসময়ে ছিল ভাঙা থানার অন্তর্গত। কিন্তু নানাবিধ কর্মোদ্যোগ ঘটায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং স্বতন্ত্র থানার প্রয়োজন পড়ে। ১৩১৬ বাংলা সনে গঠিত হয় সদরপুর থানা। গ্রামের ১৪ রশি জমিদার পরিবার দেশপ্রেম ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই পরিবারের রাজেন্দ্রনাথ রায় একটি ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করেন জেলা সদরে। পরে এই শিক্ষায়তনটি রাজেন্দ্র কলেজ নামে পরিচিত হয়। গ্রামের তিন বিখ্যাত পির হলেন ৮ রশি পির, ৭½ রশি পির এবং ১৭ রশি পির। গ্রামের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এরা পরম শ্রদ্ধার্হ। সদরপুরের মানুষের ভাগ্য আজও পদ্মার ওপর নির্ভরশীল। নদী একদিকে যেমন জমিকে সম্পদবহুল করে চলছে, অপরদিকে ফসল ও গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর। পদ্মার পথ ধরে যাওয়া যায় গোয়ালন্দ, ঢাকা ও চাঁদপুরে। এখানকার সব থেকে বড় আকর্ষণ ইলিশ মাছ।

থানা সদর সদরপুরে আছে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর। জেলা সদরের সঙ্গে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ যোগাযোগ রয়েছে। প্রতিদিন বসে সদরপুর হাট। উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধান, পাট ও সরিষা।

ফরিদপুর শহরের ১৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বোয়ালমারি থানার সাতৈর একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে উচ্চ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা আছে। এখানকার মসজিদটি সুপ্রাচীন। সম্ভবত এটি জেলার সবথেকে পুরনো মসজিদ। মসজিদ এখনও অভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। অনেকের অনুমান মসজিদটি সুলতানি আমলের শেষে নির্মিত। কিন্তু বারবার সংস্কার হওয়ায় প্রাথমিক শিল্পরূপটি হারিয়ে গেছে। একসময়ে খুব বড় শহর ছিল। তার কিছু ভগ্ন নিদর্শন এখনও চোখে পড়ে।

"রাজবাড়ির ১৮ মাইল পশ্চিমে সাতৈর নামের একটি গ্রামে নয় গম্বুজ বিশিষ্ট যে মসজিদটি রয়েছে তার পরিমাপ ৬১´-৬˝ প্রতি বাহুতে। বর্গাকার এই মসজিদটির দেয়াল আট ফুট প্রশস্ত। বাইরের চারকোণায় চারটি বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলো নিচে থেকে উপরের দিকে সরু হয়ে গেছে, অর্থাৎ ঢালু। সাতৈর মসজিদের বুরুজগুলো আটভুজাকৃতি। পূর্বদিকে তিনটি খিলান পথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। এছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ দিকে তিনটি খিলান পথ রয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে সাতৈর মসজিদটি শুধু নয় গম্বুজ বিশিষ্ট নয়, দরজা বিশিষ্টও বটে। বাইরের দেওয়ালে পোড়ামাটির নকশা দেখা যাবে এবং বক্সাকার

কার্নিশ শোভা পাচ্ছে।...মিহরাবগুলো আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ এবং খিলানগুলো নকশাকৃত। সাঁতের মসজিদটি পঞ্চদশ শতাব্দীর ইমারত হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।"

(বাংলাদেশের মুসলিম পুরাকীর্তি। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান। পৃঃ ২৫৩-৫৪)

রাজবাড়ি ঃ

"গোয়ালন্দ মহকুমার সদর দপ্তর রাজবাড়িতে অবস্থিত। স্টেশন হইতে ৪-৫ মাইল দক্ষিণে হমদমপুর একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহার এক অংশ মূলঘর নামে পরিচিত। এখানে প্রসিদ্ধ সরযূপারী গ্রহ বিপ্রবংশীয় আচার্যদিগের বাটিতে স্ফটিক নির্মিত অতি মনোরম সূর্য মূর্তি ও দামোদর নামক নারায়ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই বিগ্রহের সেবার জন্য পূর্বে রাজা সীতারাম রায় ও নাটোর জমিদারগণ ভূমিদান করিয়াছিলেন। মূলঘরে পূর্বে সংস্কৃত চর্চা ছিল। কথিত আছে, রাজা সীতারামের সময়ে সরযূপারী গ্রহ বিপ্রগণ প্রথম এ অঞ্চলে আগমন করেন। ইঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। হমদমপুরের এক মাইল পশ্চিমে পাঁচথুপিও একটি প্রাচীন গ্রাম। পূর্বে পাঁচথুপির কাছ দিয়া পদ্মা বহিত ; এখনও মরা পদ্মার চিহ্ন নিকটে কিছু কিছু দৃষ্ট হয়। পাঁচথুপির উত্তরে রাধাগঞ্জ নামে তখন একটি বড় বন্দর ছিল এবং তথা হইতে মুঘল সৈন্যের যাতায়াতের জন্য রাজাপুর পর্যন্ত একটি চওড়া রাস্তা ছিল। উহা পল্টনের রাস্তা নামে অভিহিত হইত। বাণীবহের নাওয়ারা-চৌধুরিগণের আদিবাস পাঁচথুপিতে ছিল ; তথা হইতে তাঁহারা বাণীবহে উঠিয়া যান।"

গোয়ালন্দ ঘাট বার বার নদী জলরাশিতে বিপন্ন হওয়ায় মহকুমা সদর সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রাজবাড়ি। বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক পরিবর্তনের পর রাজবাড়ি বর্তমান বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার অন্যতম একটি জেলায় পরিণত হয়েছে। জেলা সদর রাজবাড়িতেই অবস্থিত। গোয়ালন্দঘাট থেকে ৯ মাইল এবং ফরিদপুর শহর থেকে ২০ মাইল দূরে রাজবাড়ি। রাজবাড়ি সামান্য কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি ছিল একসময়ে। রাজবাড়িতে ১৯২৩ সালে পুরসভা (মিউনিসিপ্যালিটি) গঠিত হয়। ১৯৬১ সালে পুরসভার আয়তন ছিল ৩.৫ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ১৬,০৬৬। রাজবাড়ি সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হয়েছে। এখানকার বিখ্যাত রাজপরিবারকে স্মরণ করেই রাজবাড়ি নামকরণ। রাজবাড়িতে আছে একটি বৃহৎ রেলওয়ে স্টেশন। এই রেলপথ কেবল ফরিদপুর ও গোয়ালন্দ ঘাটের সঙ্গেই সংযুক্ত নয়, কুষ্ঠিয়া ও ভাটিপাড়াতেও যাতায়াত করা যায়।

১৯৬১ সালে রাজবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় ডিগ্রি কলেজ—রাজবাড়ি কলেজ। চারটি হাইস্কুলের তিনটি ছেলেদের এবং একটি মেয়েদের। রাজবাড়ি মডেল হাইস্কুল এবং রাজবাড়ি আর এস কে ইনস্টিটিউসন স্থাপিত হয়েছিল ১৮৮৮ সালে, ইয়াসিন হাইস্কুল অনেক পরে স্থাপিত হয় ১৯৫১ সালে। রাজবাড়ি গার্লস হাইস্কুল স্থাপিত হয়েছিল ১৯৬১ সালে। শিক্ষা ক্ষেত্রে জেলার মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে অনেক আগে থেকে।

ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে রাজবাড়ি ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বেশ কয়েকটি বরফ কল আছে। তাছাড়া আছে বার্মা ইস্টার্ন এবং এসো অয়েল কোম্পানির তেলের ডিপো। সোনালি ব্যাঙ্ক ও রূপালি ব্যাঙ্কের কয়েকটি শাখাও রয়েছে।

রাজবাড়ির যোগাযোগ ব্যবস্থা যথেষ্ট ভালো। বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, হাসপাতাল, যক্ষ্মা নিরাময় কেন্দ্র, আদালত, রেজিস্টার অফিস, ডাকবাঙ্লো ও চিলড্রেন্স পার্ক আছে।

গোয়ালন্দ ঃ

গোয়ালন্দ সম্পর্কে "বাংলায় ভ্রমণ" গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ "কলিকাতা হইতে ১৫৫ মাইল দূরে। এই স্থানটি প্রবল স্রোতা পদ্মার তীরে অবস্থিত। পদ্মার ভাঙনের জন্য শহর ও স্টেশন এক জায়গায় থাকিতে পারে না, প্রায়ই বৎসর বৎসর ইহার স্থান পরিবর্তিত হয়। এই জন্য

এখানে ছোট ছোট কুটীর ভিন্ন বড় বাড়ি নির্মিত হয় না। রেলস্টেশনের অফিস প্রভৃতি পদ্মার মধ্যে ভাসমান ফ্ল্যাটের উপর অবস্থিত। গোয়ালন্দ হইতে স্টিমার যোগে পূর্ববঙ্গ রেলপথের ঢাকা বিভাগের নারায়ণগঞ্জ স্টেশন ও আসাম বাংলা রেলপথের চাঁদপুর এবং বাংলার আরও বহু স্থানে যাওয়া যায়। গোয়ালন্দ হইতে সিরাজগঞ্জ ঘাট ও জগন্নাথগঞ্জ ঘাট হইয়া বাহাদুরাবাদ ঘাট পর্যন্ত দৈনিক স্টিমার যাতায়াত করে। গোয়ালন্দের ইলিশ মাছ ও তরমুজ খুব বিখ্যাত। বর্ষাকলে গোয়ালন্দ হইতে বহু পরিমাণে ইলিশ মাছ কলিকাতায় চালান আসে। গোয়ালন্দের নিকটবর্তী পদ্মা নদীর বাঁক সমূহে যত ইলিশ মাছ পড়ে, তত আর কোথাও দেখা যায় না। বর্ষাকালে ইলিশ মাছ ধরিবার জন্য এক এক স্থানে বহু জেলের নৌকার সমাবেশ হয় এবং কেবলমাত্র জেলেদের মহাজনদের নিকট জিনিসপত্র বিক্রয় করিবার জন্য নিকটবর্তী চরগুলিতে অস্থায়ীভাবে এক একটি বড় বাজার বসে। গোয়ালন্দের নিকটস্থ পদ্মাতীরবর্তী স্থান সমূহের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর।" (পৃঃ ১১২)

নদীবন্দর হিসাবে গোয়ালন্দ ঘাটের গুরুত্ব বাড়ে ইংরেজ কোম্পানির আগমনের পর। গোয়ালন্দ মৌজার অন্তর্গত গোয়ালন্দঘাট পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমে অবস্থিত। স্থানটির সঙ্গে সমস্ত দেশের সংযোগ রয়েছে রেলওয়ে, স্টিমার, লঞ্চ, ফেরি ও সড়ক মাধ্যমে। দুটি নদীপথে যে স্টিমার চলাচল করে তাদের সংযোগ ঘটে এখানেই। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে রেলপথে যাতাযাত করতে হলে এই পথ পেরোতে হয়। দেশভাগের আগে কলকাতার প্রবেশ দ্বার ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম প্রবেশপথ। দর্শনা গোয়ালন্দ রেলওয়ে টার্মিনাস। গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুর হয়ে নারায়ণগঞ্জ দিনে দুবার স্টিমার চলাচল করে। দেশের মধ্যে মাছ সরবরাহের অন্যতম কেন্দ্রই কেবল নয়, বৃহত্তম ব্যবসাকেন্দ্রও বটে। চাল, ধান, পাট ও আখ অন্যতম বাণিজ্য পণ্য। জেলার বৃহত্তর অংশ হল নদীবন্দরের পশ্চাদভূমি। রেলসংযোগ ও নদীবন্দরের কারণে গড়ে উঠেছে বৃহৎ শহর। রেলওয়ে ও স্টিমার কর্মীদের আবাসন কেন্দ্র আছে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে।

একসময় গোয়ালন্দ ঘাটেই ছিল মহকুমা সদর। কিন্তু পদ্মা ক্রমশ উপকূল ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে আসতে থাকায়, অবশেষে প্রশাসনিক কেন্দ্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় রাজবাড়িতে। স্টিমার ঘাট ও রেলওয়ে টার্মিনাসকে বার বার স্থান বদল করতে হয়েছে। হান্টারের বিবরণ থেকে জানা যায় ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত গোয়ালন্দ ঘাট ছিল বিশাল বাঁধের ধারে। ১৮৭৫ সালের পর দেশের দু মাইল অভ্যন্তরে টার্মিনাসকে সরিয়ে নেওয়া হয় নদী পাড় থেকে। ১৯১৪ সালের মধ্যে গোয়ালন্দকে ১০টি বিভিন্ন স্থানে বারবার সরে যেতে হয়েছে।

নানান সরকারি অফিস, হাসপাতাল, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, পোস্ট অফিস, কমিউনিটি সেন্টার, ডাকবাঙলো আছে এখানে। একটি বড় বাজারে আছে বাঙালি ও মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা। শনিবার ও বুধবার এখানে হাট বসে। গোয়ালন্দ ঘাট থানার অধীনে ৪টি ইউনিয়নে ৮৭টি গ্রাম রয়েছে। যার আয়তন ৫৮ বর্গ মাইল।

গোয়ালন্দ মহকুমা শাসকের নামে ১৯৪৩ সালে স্থানীয় জমিদার স্থাপিত বিদ্যালয়টির নাম নাজিরউদ্দিন হাইস্কুল।

জামালপুর ঃ

বালিয়াকান্দি থানা ও জামালপুর ইউনিয়নের জামালপুর বাজার গ্রামটি চন্দনা নদীতীরে অবস্থিত। এখানে একটি রেলস্টেশন আছে এবং থানা সদরের সঙ্গে সড়ক পথে যুক্ত। একটি ছোট আকারের রেলওয়ে ওয়ার্কসপ, হাসপাতাল, আঞ্চলিক সরবরাহ দপ্তরের ২টি গুদাম, উদ্ভিদ ও শস্য সংরক্ষণ কেন্দ্র, উচ্চ ও নিম্ন বিদ্যালয়, মিশন কেন্দ্র, গ্রন্থাগার, পোস্ট অফিস, তহসিল অফিস, কো-অপারেটিভ অফিস এবং পাট ক্রয় কেন্দ্র আছে।

জামালপুর বাজার এলাকার অন্যতম কৃষি উৎপাদন পাট, ধান এবং রবিশস্য। এখানে ৫টি চালকল ও ময়দা কল ছাড়াও আছে আইসক্রিম ফ্যাক্টরি, কুটির শিল্প কেন্দ্র, তাঁত শিল্প কেন্দ্র, ৬টি মাটির দ্রব্যাদি তৈরি কেন্দ্র এবং তেলের ঘানি। ৩টি বাজার আছে। দিনে দুবার জামালপুর বাজার বসে। শনিবার ও বুধবার বসে হাট।

খানখানপুর ঃ

মরা পদ্মার তীরে খানখানপুরে আছে একটি রেলওয়ে স্টেশন। গোয়ালন্দ মহকুমার রাজবাড়ি থানার খানখানপুর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিখ্যাত খাঁ পরিবারের স্মৃতি। মোঘল আমলে এখানে শাসক হয়ে আসেন আমির খান। তার শাসনাধীন এলাকার আমিরাবাদ পরগণা নামে পরিচিত হয়। খানখানপুর হল আমিরাবাদ পরগণার একটি মৌজা। এখানে দুটি উচ্চবিদ্যালয় (একটি ছেলেদের এবং একটি মেয়েদের), ২টি মক্তব, একটি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, সরকারি বীজ সংবক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি ব্লক অফিস, মিলন কেন্দ্র, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ কেন্দ্র রয়েছে। খানখানপুর থেকে সড়কপথে দেশের বিভিন্ন স্থানে যাওয়া যায়। পাটের মরশুমে খানখানপুর জমজমাট হয়ে ওঠে। এই গ্রামে আছে ১৩টি পাট কোম্পানি। তার মধ্যে জুট মিল কাউন্সিল ও রেলিব্রাদার্স রয়েছে। পাট বাঁধাই ও রপ্তানি কেন্দ্রও আছে। এখানকার অন্যতম ব্যাঙ্ক হল জনতা ব্যাঙ্ক। হাট বসে সপ্তাহে দুদিন মঙ্গলবার ও শুক্রবার। রোজ কিন্তু বাজার বসে। হাটটির নাম ফুলতলার হাট।

একটি প্রচলিত কিংবদন্তী হল নবাব সিরাজদৌলার সময়ে পবগণার আমির একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ পোতেন। তার নিচে হাট বসতে থাকায় হাটটির নাম হয় ফুলতলার হাট। গ্রামে ধান, পাট, আখ ও নানারকম রবিশস্য জন্মায়।

গ্রামে হিন্দুদের অন্নপূর্ণা মন্দিরটি বিখ্যাত। এখানে বৈশাখ মাসে পুণ্যার্থী সমাগম ঘটে। তাছাড়া গ্রামের যুবসমাজের প্রিয় হল রামকানাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট।

কোরকদি ঃ

বালিযাকান্দি থানায় মেগচাযি ইউনিয়নের কোরকদি গ্রাম নিয়ে একটি কিংবদন্তী প্রচারিত আছে। বহু পূর্বে ছিল জনবসতিহীন এক দ্বীপ। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তার একমাত্র মেয়েকে নিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে এই দ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করে। তখন গ্রামটি কনক দ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। কোরকদি শব্দটি এসেছে কনক দ্বীপ থেকে। খুব দ্রুত গ্রামটির উন্নতি ঘটে। জনবসতি বেড়ে যায়। প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত পুরনো বাড়ি এখনও দেখা যায়। শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায় দ্রুত অগ্রগতি ঘটতে থাকে। গ্রামের রায় বাহাদুব রাধিকামোহন লাহিড়ি আসাম-বেঙ্গল-এর প্রথম ভারতীয় পোস্ট মাস্টার জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলেন। রাধিকামোহন এবং বিনোদবিহারী লাহিড়ি ১৯০১ সালে যে বিদ্যালয়টি স্থাপন কবেন, তার নাম আর বি হাইস্কুল। গ্রামের রামধন তর্কপঞ্চানন ছিলেন সংস্কৃত ভাষার একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। তার নামে গ্রামে একটি লাইব্রেরি স্থাপিত হয়েছিল। এখনও লাইব্রেরি বাড়িটি আছে। এখানে যে থিয়েটার হল তৈরি হয়েছিল, তার চিহ্নমাত্র নেই। সাতটি বড় বড় ফুটবল মাঠ ছিল। কলকাতাব মোহনবাগান ক্লাব যারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম দুজন হলেন এই গ্রামের শিবদাস ভাদুড়ি ও বিজয়দাস ভাদুড়ি। তাছাড়া গ্রামে যাতায়াত ব্যবস্থা প্রথম থেকেই ছিল উন্নত। ফরিদপুব ও অন্যান্য স্থানে স্থানে যাতায়াত ছিল সহজসাধ্য। অতীতের গৌরব এখনও জড়িয়ে আছে গ্রামটিকে।

মথুরাপুর ঃ

বর্তমান রাজবাড়ি জেলার বালিয়াকান্দি থানা ও গাজনা ইউনিয়নের মথুরাপুর গ্রামে মোঘল আমলে নির্মিত একটি মঠ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। মঠটি মধুখালির দেড় মাইল

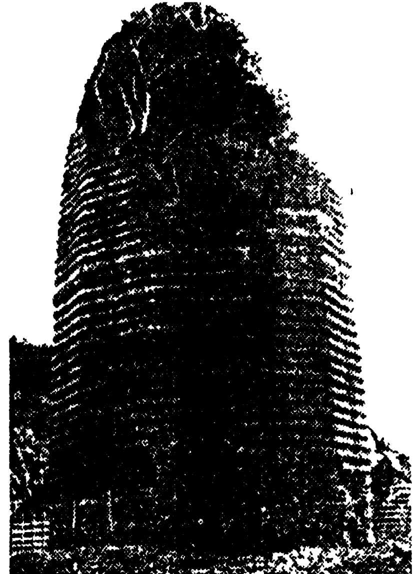
দূরে অবস্থিত। ৭০ ফুট উঁচু মঠটির গায়ে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী অলঙ্কৃত ছিল।

মধুখালি থেকে মাইল দেড়েক উত্তরে খোলা মাঠের মধ্যে বিখ্যাত মথুরাপুর দেউল। কে যে কবে তৈরি করেছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই। কেউ কেউ বলেন, প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে পরাস্ত করার পর রাজা মানসিংহ বিজয়স্তম্ভ স্বরূপ এটি নির্মাণ করেন। কিন্তু আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেছেন ঃ "এ গল্পের পিছনে কোন সত্য থাকতে পারে না। কারণ রাজা মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপের কোন যুদ্ধ হয়নি। মানসিংহের মৃত্যু হয় ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে এর আরও পরে প্রায় ৭/৮ বছর পরে মোঘলদের সঙ্গে প্রতাপের যুদ্ধ হয়েছিল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে। দেউল তৈরির কায়দা-কানুন দেখে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এটি সতের শতকের দিকে তৈরি হয়েছিল। খুব সম্ভব সেই এলাকার কোন হিন্দু সামন্ত রাজা এটি তৈরি করেছিলেন।" (বাংলাদেশের প্রাচীন কীর্তি। ২য় খণ্ড। পৃঃ ১৭১)। যাই হোক, দেউলটির আশপাশে কোন জনবসতির কোন চিহ্ন ছিল না। দেউলের প্রকৃত উচ্চতা জানা যায় না। দেউলের সর্বশেষ উচ্চতা ৭০ ফুট, জানা যায়। আগে নাকি আরও উঁচু ছিল। দক্ষিণ দিকে মাত্র একটি দরজা। আর ভিতরে একটি ফাঁকা ঘর। তার ভিতর কোন বিগ্রহ ছিল কিনা তারও প্রমাণ নেই। দেউল ১২টি কোণ বিশিষ্ট। ক্রমশ সরু হয়ে উঠে গেছে উপর দিকে। একসময় দেউলটি ছিল নানা ধরনের চিত্র ফলকে অলঙ্কৃত। নিচের দিকে ফলকে আছে রামায়ণ-মহাভারত ও নানান পৌরাণিক কাহিনীর চিত্ররূপ।

মথুরাপুর দেউল সম্পর্কে গুরুসদয় দত্ত লিখেছেন* ঃ দেখিবার মত জিনিস এই মথুরাপুর দেউল--স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে বাঙালির বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন।

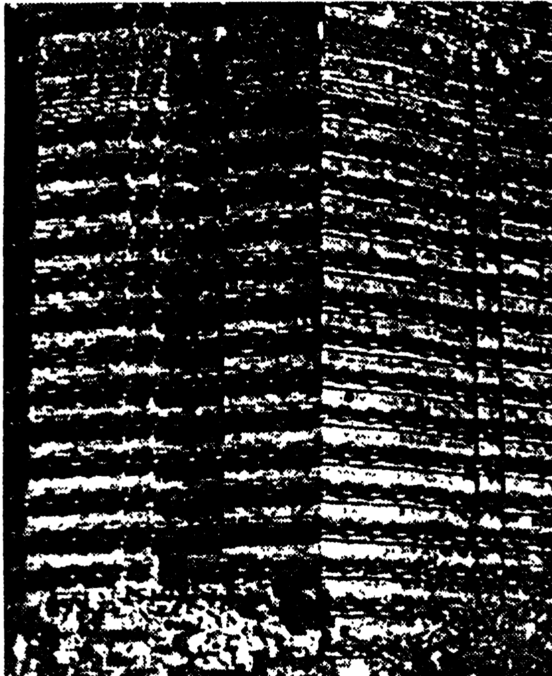


কৃত্রিম দ্বার—উত্তর



মথুরাপুর দেউলের পশ্চিম দ্বার

"মথুরাপুর গ্রাম ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ি মহকুমার অন্তর্গত। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলপথের কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া শাখার নলিয়াগ্রাম হইতে তিন মাইল ও কালুখালি হইতে এক মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। পূর্বে রেলপথ ও পশ্চিমে চন্দনা নদী হইতে প্রায় সমদূরবর্তী স্থানে এই দেউল। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই পল্লীগ্রামে এই উন্নত শিখর দেউল দাঁড়াইয়া আছে—কোন ঐতিহাসিক, ভাস্কর কিংবা প্রত্নতত্ত্ববিদের দৃষ্টি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। আমি যখন প্রথম ইহা দেখিতে যাই তখন ইহার চারিদিকে প্রায় ১০ ফুট উচু কাঁটা জঙ্গল। অতি কষ্টে একটি সরু পথ ধরিয়া আমি দেউলের পাদদেশে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলাম। কাঁটায় আমার সর্বাঙ্গে ভীষণ আঁচড় লাগিয়াছিল। দক্ষিণ দিকের দ্বারের উপরিভাগের ও প্রাচীরগাত্রের চিত্রসমুহ আমার চোখে পড়ে—ইহাতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ ভীষণ অন্ধকারময়, তবু আমি ভিতরে প্রবেশ করিতে মনস্থ করিলাম। ইহাতে যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা, কারণ হয়ত ঐ দেউল এখন বন্যপশুর বিশ্রামস্থান অথচ আমাদের সঙ্গে আত্মরক্ষার কোনই অস্ত্র নাই। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া বুঝিলাম আমাদের আশঙ্কা অমূলক। অকস্মাৎ লোকসমাগমে শান্তি ভঙ্গ হওয়ায় কতকগুলি বাদুড় চঞ্চল হইয়া উড়িতে লাগিল—ইহা ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী ছিল না। বাহির হইতে যত মনে করিয়াছিলাম, ভিতরটা কিন্তু তত অন্ধকার নহে। উপরের চূড়া ভগ্ন—আলো ভিতরে প্রবেশ করিবার বেশ পথ পায়। আলোকে

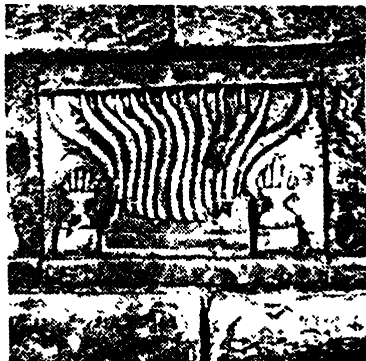


প্রাচীরগাত্রে কারুকার্য

প্রবাসী ১৩৪০ চৈত্র



রাম ও হনুমান



যজ্ঞকুণ্ড



ভরত ও রাম



কৃষ্ণলীলা

দেখিলাম—এই দক্ষিণ-দ্বার ব্যতীত পশ্চিম দিকেও একটি দ্বার আছে, কিন্তু এত জঙ্গল যে গমনাগমন অসম্ভব। লোক নিযুক্ত করিয়া পশ্চিমদ্বারের নিকটবর্তী জঙ্গল পরিষ্কার করিতেই একটি নূতন দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল। দেউলের সম্মুখ দিকের প্রাচীরে স্তরে স্তরে নানবিচিত্র মূর্তি উৎকীর্ণ।

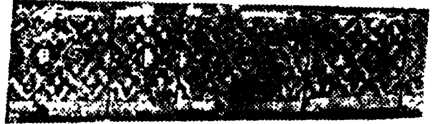
"বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য আমি নিকটবর্তী অশ্বত্থ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রায় ১৫ ফুট উর্ধ্বে উঠিলাম। এইবার মূর্তিগুলির স্বরূপ আমার চক্ষে ধরা পড়িল, ইহাদের অনুপম সৌন্দর্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি হইল। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল ; বেশিক্ষণ দেখিতে পাইলাম না, তাই প্রত্যাবর্তন করিলাম।

"ক্ষণকালের দর্শনে আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইল না, বরং বৃদ্ধি পাইল। চারিদিকের জঙ্গল পরিষ্কার করিতে লোক নিযুক্ত করা হইল। দেউলটিকে চারিদিকে ঘিরিয়া প্রায় দশ ফুট স্থান এইভাবে মুক্ত হইলে আমি পুনরায় গমন করিলাম। দেখিলাম ভূমি হইতে অন্তত ৫ ফুট উর্ধ্ব পর্যন্ত প্রাচীরের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে—কোথাও বা নোনা ধরিয়াছে, কোথাও বা গাছের শিকড়ে ফাটল ধরিয়াছে। পশ্চিম, পশ্চিম-দক্ষিণ, উত্তর-পশ্চিম এই তিনটি সম্মুখস্থ দেওয়ালেই ভাস্কর্যের উৎকর্ষ। এই মূর্তি ভাস্কর্যের তেরটি লম্বা লম্বা সারি, তন্মধ্যে পশ্চিমদ্বারের উপরস্থ ছয়টি অটুট আছে। ভূমি হইতে সঠিক পর্যবেক্ষণ সম্ভবপর নহে বুঝিয়া আমি কয়েকটি মাচা প্রস্তুতের উপদেশ দিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

"পরদিন মাচায় উঠিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে চমৎকৃত হইলাম। নিম্নভূমি হইতে একটি পশু-চিত্রের সারি দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল বুঝি-বা এই পশুগুলি ঘোড়া! নিকটে আসিয়া দেখি এগুলি সিংহ।—পদ্মবনের ভিতর দিয়া নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে ইহারা চলিয়াছে—ইহাদের কেশর ও লেজ বীর্যবান্ ঢঙে উৎকীর্ণ,—তাহাতে পৌরুষ, সংযম ও গর্বের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাস্কর্যে এরূপ বীর্যবান মূর্তি আর কোথাও আমি দেখি নাই। আমার নিঃসন্দেহ ধারণা হইল যে, এই দেউলটি বিজয়স্তম্ভ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না।

"এই তিনটি সম্মুখ দিকের দেওয়ালের দক্ষিণাংশে রামলীলা ও উত্তরাংশে কৃষ্ণলীলার নানাবিধ মূর্তি।

"এই দেউলের ঐতিহাসিক, স্থাপত্যগত ও ভাস্কর্যগত মূল্য সম্পর্কে আমার মনে আর কোন দ্বিধা রহিল না। আমি আরও কয়েকদিন দেউলটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিলাম।

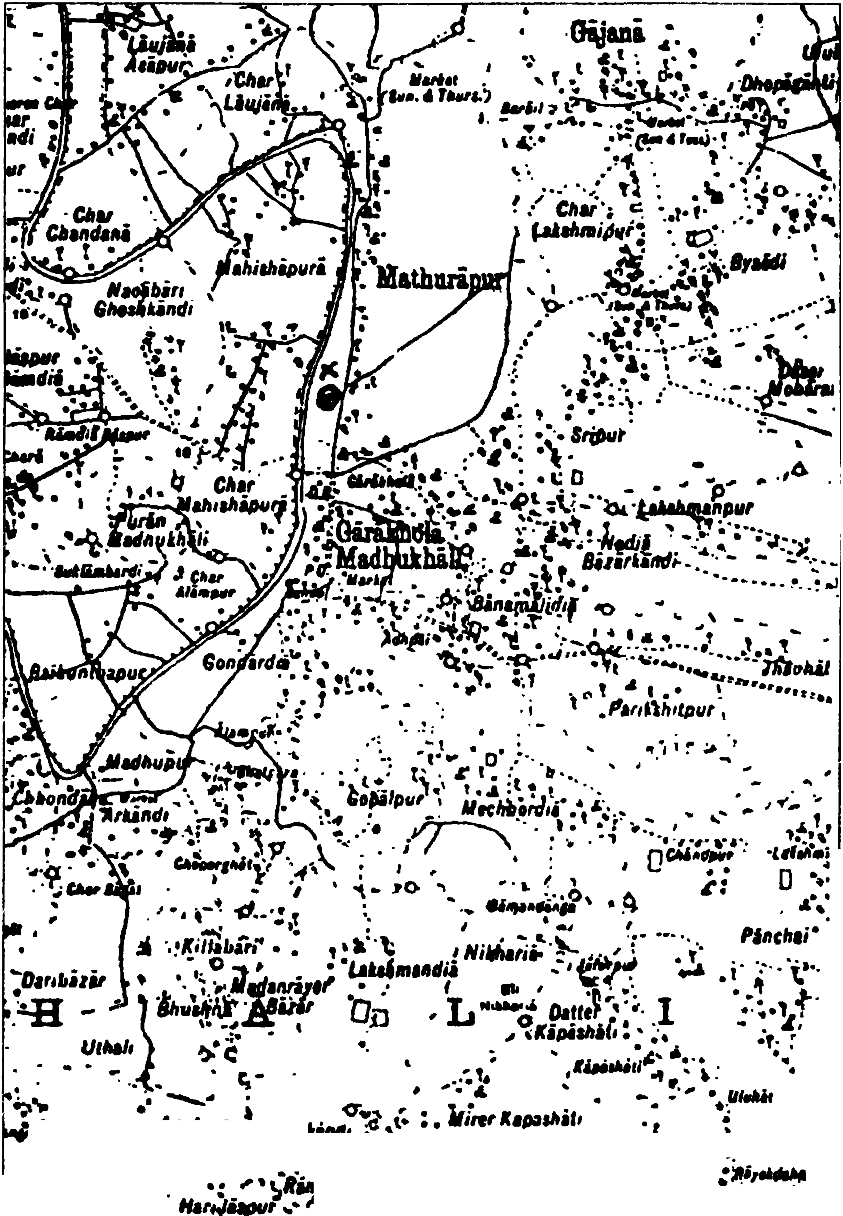



মন্দিরগাত্রে কারুকার্য




কীর্তিমুখ

এই দেউল যে অতি প্রাচীন এ-বিষয়ে সন্দেহ করিবার [ক]োনই কারণ নাই। মেজর রেনেল তাহার জর্ণল বা স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন—



মথুরাপুর (রাজস্ব জরিপ মানচিত্র)



মথুরাপুর (মেজর রেনেলের মানচিত্র)

৮ জুলাই ১৭৬৪—অদ্য অপরাহ্নে দক্ষিণ-পূর্বে দুই তিন মাইল দূরে একটি উচ্চ মন্দির দেখিলাম। ইহা মোত্রাপুর গ্রামের নিকটবর্তী।

১০ জুলাই—মোত্রাপুরের মন্দিরের পাশ দিয়া গেলাম। গ্রামটি নদীর উভয় তীরেই অবস্থিত। মন্দিরের দুই মাইল দূরে একটি বড় নদী পূর্বদিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহা দিয়া সময় সময় বড় বড় নৌকা চলিতে পারে, কিন্তু শীতকালে কোন কোন স্থানে একেবারেই জল থাকে না, শুকাইয়া যায়। নদীটি জয়নগর ও হরিগঞ্জের পথে চলিয়াছে। এই বাঁক হইতে নদীটি চন্দনা নামের পরিবর্তে কুমার নামে পরিচিত।

"মেজর রেনেলের জর্নালের সম্পাদকগণ এইস্থলে একটি পাদটিকা জুড়িয়া দিয়াছেন (মেময়র্স অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ভলুম ৩, নং ৮, পৃঃ ৯৫—২৪৮)

পাদটিকা—এই নদী ও কুমার নদীর সঙ্গমস্থলে মথুরাপুর অবস্থিত। এই সময়ের ৭০ বৎসর পূর্বে বৈদ্যবংশসম্ভূত সংগ্রামশাহ নামক এক ব্যক্তি দ্বারা নির্মিত। কিন্তু জনৈক মিস্ত্রী চূড়া হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করায় মন্দির অসমাপ্ত রহিয়া যায়।

"মেজর রেনেলের মানচিত্রে মথুরাপুর বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। যদিও মানচিত্রে দেউলের উল্লেখ নাই, তথাপি ইহার অবস্থান-নির্ণয় কঠিন নহে। রেনেলের মানচিত্র হইতে লঘিমা ২৩°৩৩´ ও দ্রাঘিমান্তর কলিকাতা হইতে পূর্বে ১°১৫´ নির্ণয় করা যায়। ইহা আমি রেভেনিউ সার্ভে মানচিত্রে দেউলের অবস্থানের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি।

"স্থানীয় কিম্বদন্তীও সংগ্রাম সাহ কর্তৃক এই দেউল নির্মাণের কথাই সমর্থন করে, কিন্তু তিনি কোথা হইতে এই গ্রামে আগমন করেন সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, তিনি কাশ্মীর হইতে আসিয়াছিলেন, কেহ বলেন রাজপুতানা হইতে, কেহ কেহবা কোন বিশেষ দেশের নাম না করিয়া বলেন যে তিনি উত্তর দিক হইতেই আসিয়াছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বর্ণশ্রেষ্ঠ কোন্ জাতি, তাহার এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি অবগত হইলেন যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। যখন তিনি জানিলেন যে ব্রাহ্মণের নীচেই বৈদ্যবর্ণের স্থান, তখন তিনি বলিলেন—হাম বৈদ্য। স্থানীয় অধিবাসীরা তাহার কথার অর্থ (আমি বৈদ্য) না বুঝিয়া ধারণা করিল যে, "হামবৈদ্য" স্বতন্ত্র একটি বর্ণ এবং সংগ্রাম সাহ সেই বর্ণের লোক। কথিত আছে যে, তিনি বলপূর্বক স্থানীয় এক বৈদ্য পরিবারে বিবাহ করেন এবং নিজের কন্যাগণকে পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের বৈদ্য পরিবারেই বিবাহ দেন। ইহাদের বংশধরগণ এখনও 'হামবৈদ্য' বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করেন।



কীর্তিমুখ ও সিংহ

"সংগ্রাম সাহ আদেশ করেন যে, ইহা এত উচ্চ করিতে হইবে যে, চূড়া হইতে যেন ঢাকা নগর দেখা যায়। দেউল নির্মাণ যখন শেষ হইল তখন সংগ্রাম সাহ প্রধান মিস্ত্রীকে চূড়ায় আরোহণ করিতে ও ঢাকা নগর দেখা যায় কি না বলিতে বলিলেন। মিস্ত্রী চূড়ায় উঠিয়া ঢাকা দেখিতে পায় নাই। সে নিজের দোষ স্খালনের জন্য বলিল যে, সে আরও মাল মশলা পাইলে আরও উঁচু করিতে পারিত; তখন ঢাকা দেখা যাইত। ইহাতে সংগ্রাম সাহের

ক্রোধ হইল। আরও জিনিসপত্র সে কেন চাহিল না এই অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে, সংগ্রাম সাহ এরূপ শাসাইলে মিস্ত্রী ওই চূড়া হইলে লাফ দিয়া আত্মহত্যা করে।

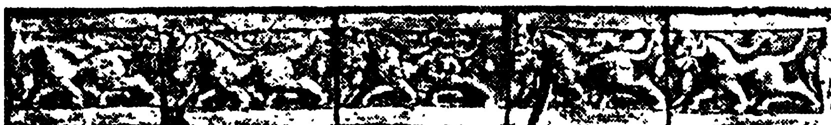
"এই শোচনীয় ঘটনার পর এই দেউল সম্পূর্ণ করা হইল না, কোন বিগ্রহ স্থাপনের প্রশ্নও উঠিল না।

"রেনেলের স্মৃতি কথার সম্পাদক পাদটিকায় বোধ হয় এই কিম্বদন্তীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

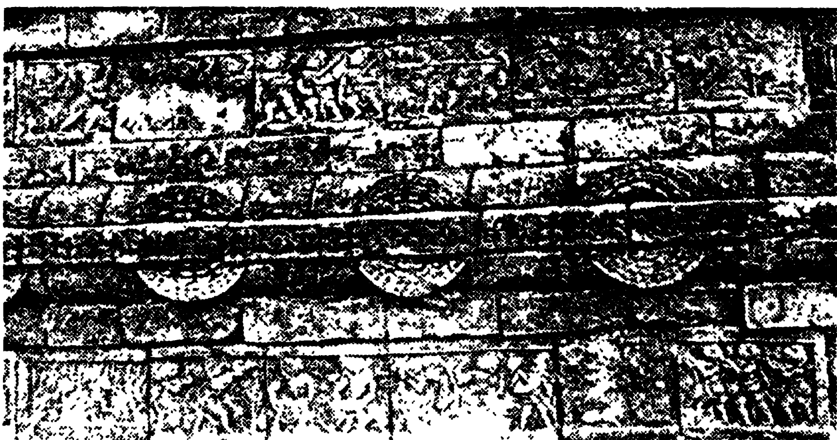
"সীতারাম রায়ই এই দেউল নির্মাণ করাইয়াছিলেন, এরূপ একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে ; কিন্তু সংগ্রাম শাহ সম্পর্কে কিম্বদন্তী যতটুকু প্রবল সীতারাম রায় সম্পর্কে ততটুকু নয়।"



সিংহের বিজয়যাত্রা



রামায়ণের দৃশ্য



রামায়ণের দৃশ্য

আনন্দনাথ রায় প্রণীত ফরিদপুরের ইতিহাস গ্রন্থে এক সংগ্রাম সাহের বিস্তৃত বিবরণ আছে। টডের রাজস্থানে ঔরংজেবের মনসবদার বলিয়া এক সংগ্রাম সাহের উল্লেখ আছে এবং বাংলাদেশে এক সংগ্রাম সাহ বারোভূঁইয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ও জলদস্যুদিগকে দমন করিয়া শান্তি স্থাপন করিযাছিলেন এবং জীবনের শেষ ভাগে রাঠোর সর্দারদিগকে

পরাভূত করিয়াছিলেন—রায় মহাশয়ের মতে এই তিন সংগ্রাম সাহ-ই এক। বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠাতা ও মথুরাপুর দেউল প্রতিষ্ঠাতা সংগ্রাম সাহ যে অভিন্ন, এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। স্থানীয় লোকেরও বিশ্বাস এইরূপ ; এবং বহুকাল যাবৎ এরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ফরিদপুরের ইতিহাসেও এইরূপ লিখিত আছে যে, তিনি মথুরাপুরে তাহার আবাস নির্মাণ করেন। দেউলের দেওয়ালের মূর্তিগুলিও ইহা সমর্থন করে। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণী হরণ ও পরিণয় এই সংগ্রাম সাহের বলপূর্বক বিবাহেরই দ্যোতকরূপে স্থাপিত, এরূপ বিশ্বাস করিলে অন্যায় হইবে না। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বৃন্দাবন লীলার দৃশ্যাবলীতে শ্রীকৃষ্ণ রাখালমূর্তিতেই চিত্রিত, কিন্তু রুক্মিণীহরণ ও বিবাহের দৃশ্যে শ্রীকৃষ্ণের পরিণত বয়স্ক ও পুষ্টায়তন মনুষ্য-রূপ। পুরাণে বর্ণিত মূর্তির সহিত ইহার কোনই সাদৃশ্য নাই।

যদি এই কিম্বদন্তী সত্য হয় তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই দেউল সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর উত্তরার্ধের প্রথম ভাগে নির্মিত হয়—হয়ত ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ। একটি সরকারি বিবরণে নির্মাণের তারিখ ১৪৭২ খ্রিস্টাব্দে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই তারিখ সমর্থন করিবার মত কোন কাহিনি আমি অবগত নহি।

৩

দেউলটির গঠনের বিশেষত্ব এই যে, ইহা ভিত্তি হইতে চূড়া পর্যন্ত সমদ্বাদশভূজ। ভূমি হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় সত্তর ফুট। ভিত্তি ভূমিতে ইহার ব্যাস বাহিরের বৃত্তে ৩৪.১১´ ও ভিতরের বৃত্তে ১২.১১´ অর্থাৎ দেওয়াল ১১´ পুরু। দ্বার মাত্র দুইটি পশ্চিম ও দক্ষিণের দিকে ; পশ্চিমেরটিই প্রধান দ্বার। উত্তর ও পূর্ব দিকে নকল দরজা আছে। পূর্বদিকের দ্বার পিপুল বৃক্ষটিতে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

দেউলের ভিতরে প্রাচীরগাত্রে কোনও কারুকার্য নাই ; নেহাতই সাধারণভাবে ২৯´ পর্যন্ত উঠিয়াছে। তারপর চূড়া পর্যন্ত 'চষা ক্ষেত' পদ্ধতি অর্থাৎ প্রাচীরগাত্র সমান নহে, একবার উঁচু, একবার নীচু। ইহাতে সৌন্দর্য বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই। কোন দেউলে ইহার অনুরূপ আমি দেখি নাই। সর্বোচ্চ চূড়ায় সমদ্বাদশভূজ পদ্ধতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহা যেন বিপরীত ভাবে স্থাপিত জলপাত্রের তলদেশের ভিতর-দিকের ন্যায় ঈষৎ সমতল। এই ছাদের কিয়দংশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

ভিত্তিভূমিতে বাহির দিকে এই সমদ্বাদশভুজের প্রত্যেক ভূজ ৯.১১´ মাত্র। একটি পঙ্‌ক্তির পর একটি পঙ্‌ক্তি—এই একই পদ্ধতিতে ভিত্তি হইতে চূড়া পর্যন্ত চলিয়াছে। তবে ভূমি হইতে ২৯.১´ পৌঁছিয়া সামান্য একটু বিরতি আছে—একটি কার্নিস।

তারপর একই পদ্ধতিতে চূড়া পর্যন্ত প্রাচীর উঠিয়াছে—তবে গাত্রে কোন কারুকার্য নাই। চূড়ায় হয়ত শোভনীয় "মুকুট" ছিল ; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। চূড়ার 'খিলানের'ও বৃহদংশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

বাহিরের প্রাচীরগাত্রের অপর বিশেষত্ব ইহার 'পঞ্চরথ' পদ্ধতি—প্রত্যেকটি ভুজে বা প্রাচীরে ভিত্তি হইতে চূড়া পর্যন্ত পাঁচটি পগ (Pagas) চলিয়াছে। সাধারণত এই জাতীয় স্থাপত্যে কেন্দ্রে উন্নত রাহাপগ (Rahapaga) এবং পার্শ্বে ক্রমনমিত অনর্থপগ ও কনকপগ থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।



পূজারিণী ও বীরসেনা



নৃত্য ও বাদ্য



স্নানদৃশ্য

এই দেউল যে কখনও দেবপূজার কার্যে ব্যবহৃত হয় নাই, বা দেবপূজার জন্য নির্মিত হয় নাই বা দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত হয় নাই—আমার এ বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ আছে। যতই ইহা কারুকার্য এবং স্থাপত্য-নৈপুণ্য পর্যবেক্ষণ করা যায় ততই যেন প্রতীয়মান হয় যে, এ দেউল কোন বিজয়ীর বিজয়স্তম্ভ। রামায়ণের ও কৃষ্ণলীলার চিত্রে যুদ্ধের ভঙ্গিমা উৎকীর্ণ আছে বলিয়াই যে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহা নহে,—এই দেউলের সকল চিত্রই যেন যুদ্ধের ভাব প্রকাশ করে। ভূমি হইতে ২৮ ফিট উর্ধে দ্বাদশ ভুজের মধ্যে নয় ভুজ ব্যাপিয়া যে সিংহশ্রেণির মূর্তি খোদিত আছে, তাহারা যেন গর্বভরে পদ্মবন দলিত করিয়া বিজয়যাত্রায় চলিয়াছে এবং তাহাদের দীর্ঘ সূচিমুখ দন্ত দ্বারা পদ্মকলি ধ্বংস করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, ইহার জল-নিকাশের নলেও সিংহেরই মুখ। উদ্দাম মল্লযুদ্ধের চিত্রও ইহাতে উৎকীর্ণ। কীর্তিমুখ তিনটি বিভিন্ন আদর্শে উৎকীর্ণ—প্রত্যেকটি আদর্শই রণ-মনোবৃত্তির প্রতীক।

এই দেউলের অপর বিশেষত্ব এই যে, একটির পর একটি স্তরে রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার সমগ্র কাহিনিই পর্যায়ক্রমে খোদিত। সম্মুখের তিনটি প্রাচীর গাত্রে পর পর তেরটি স্তরে এই

মূর্তি প্ল্যাক্ স্থাপিত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যবদ্বীপে সুবিখ্যাত প্রাম্‌বানাম্ মন্দিরের ভাস্কর্যের সঙ্গে অপূর্ব সাদৃশ্য ইহাতে দেখা যায়—উৎকীর্ণ মূর্তিগুলির ঠিক সেইরূপ এমন কি তাহার অপেক্ষাও বেশি, পুরুষোচিত দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা। প্রভেদ এই যে, যবদ্বীপের মন্দির প্রস্তরনির্মিত, দেউলটি বাংলার মাটিতে গড়া ইষ্টকের।

"দেউলের স্থাপত্যে পরিকল্পনা ও গঠনপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে বাঙালি ভাবের পরিচায়ক। বাংলার পল্লীগ্রামের বাঁকা ছাদের (জুত) ঘর, বাংলার তৎকালীন রীতিনীতি ও জীবনযাপনের চিত্র, বাংলার নরনারীর আকার প্রকারের বিশেষত্ব, বাংলার চালা হইতে ঝুলানো ধানের শিস, বাঙালি শাড়ির অনুপম লীলা মাধুর্য—সমস্তই বাঙালি গৃহস্থ ঘরের প্রতিদিনের দৃশ্য—বাঙালি পুরুষের দৃঢ়তাব্যঞ্জক চিত্র ও নারীর শ্রীসম্পন্ন মূর্তি—এগুলি ইটের মধ্যে ফুটাইয়া তোলা সহজ কাজ নহে। এই দেউল একান্তভাবে বাংলার নিজস্ব--বাংলার পুরুষোচিত কৃষ্টির পরিচায়ক। বাংলার বাহির হইতে কোন প্রভাবই ইহাকে স্পর্শ করে নাই। লঙ্কা, মথুরা, বৃন্দাবন—বাংলার বাহিরের বহুঘটনার দৃশ্য, বাংলার এক গ্রাম্য স্থপতি এমন ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, যেন বাংলার কুটিরে বাংলার নর-নারীই ইহাদের নায়কনায়িকা।

"মথুরাপুর দেউল বাংলার গর্বের জিনিস। অনুপম ভাস্কর্য গৌরবে এই দেউল যে এই কলাজগতে একটি বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠাস্থান লাভ করিবে ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। আমি এ-বিষয়ে সরকারি আর্কিওলজি বিভাগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি।*

নলিয়া ঃ

বালিয়াকান্দি থানা ও জামালপুর ইউনিয়নে নলিয়া গ্রাম। গ্রামের দেড় মাইল দূরে বাংলাদেশ রেলওয়ে স্টেশন। বেশ প্রাচীন গ্রাম। দেশভাগের আগে এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষিত হিন্দু পরিবারের সংখ্যাই ছিল বেশি। এখনও গ্রামে হিন্দুদের একটি জোড়বাঙ্‌লা মন্দির আছে। মন্দিরের ইটগুলি অপূর্ব অলঙ্কৃত। ১৯৩৪ সালে গ্রামে যে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়, তার নাম নলিয়া এস এম ইনস্টিটিউশন। রায়সাহেব এস এন চক্রবর্তী তার বাবা এস এম চক্রবর্তীর নামে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গ্রামে আরও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে।

নারায়ণপুর ঃ

নারাযণপুর গ্রামটি বর্তমান রাজবাড়ি জেলার পাঙসা থানায় অবস্থিত। কৃষিপ্রধান, অর্থাৎ ধান, পাট, গম ও অন্যান্য রবিশস্যর উৎপাদন পর্যাপ্ত হলেও, আধুনিক শহরবাসের সুযোগ সুবিধাও কম নেই। হাইস্কুল, ফরকুয়ানিয়া মাদ্রাসা, পাবলিক লাইব্রেরি ও রিডিং রুম (ইয়াকুব আলি স্মৃতি পাঠাগার), একটি দাতব্য চিকিৎসালায়, বিভিন্ন সরকারি অফিস, ডাক-বাঙ্‌লো, রেলস্টেশন (পাঙসা স্টেশন), পুলিশ বিভাগের নানা দপ্তর ছড়িয়ে নারায়ণপুরে।

পাঁচুরিয়া ঃ

বর্তমান রাজবাড়ি জেলার রাজবাড়ি থানায় পাঁচুরিয়া একটি রেলওয়ে জংশন স্টেশন। রাজবাড়ি-ফরিদপুর, রাজবাড়ি-গোয়ালন্দঘাট এবং রাজবাড়ি-পোড়াদহ রেলওয়ে লাইনের মধ্যে সংযুক্ত। সমগ্র এলাকা দ্রুত উন্নতি লাভ করেছে। ব্যবসাবাণিজ্য, যোগাযোগ ও পরিবহন, সংস্কৃতি চর্চা সর্বক্ষেত্রে গ্রামটি সমৃদ্ধ। গ্রামটির সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে পার্শ্ববর্তী মাকুন্দিয়া, কুঠি-পাঁচুরিয়া ও ভাকলার বৃহৎ জমিদারদের ভূমিকা। এখানে ফুটবল খেলা খুবই জনপ্রিয়। ফুটবল লিগ পরিচালিত হয়।

প্রবাসী ১৩৪০ চৈত্র

বালিয়াকান্দি ঃ

চন্দনা নদীতীরে থানা সদর বালিয়াকান্দি। এই থানার অন্তর্ভুক্ত ১০টি ইউনিয়নের ১৯৪টি গ্রাম। আয়তন ১২৫ বর্গ মাইল। এই থানার অন্তর্গত বালিয়াকান্দি গ্রামের পাশ দিয়ে চন্দনা নদী প্রবাহিত। একসময় নদী ছিল বিস্তৃত এলাকা জুড়ে। কিন্তু অবিশ্রাম নদীবাহিত পলি জমে নদীতল উঁচু হয়ে যাওয়ায় নদীর আকার সংকীর্ণ হয়ে গেছে। বালিয়াকান্দি নামটির উৎপত্তিও নদী প্রভাবে। বালিয়া এসেছে "বালি" শব্দ থেকে। আর কান্দি অর্থাৎ নদীর চর। দুয়ে মিলে বালিয়াকান্দি। নদীর রেখা সংস্কার করা হলেও, নদী আর নৌপরিবহনের উপযোগী হতে পারেনি। গ্রামের বর্তমান আয়তন ২ বর্গ মাইল। গ্রামের দু মাইল দূরত্বে রেল স্টেশন আরকান্দি। সড়কপথে বালিয়াকান্দি ফরিদপুর ও পাংসার সঙ্গে যুক্ত। গ্রামের প্রধান কৃষিদ্রব্য ধান, আর পাট। অপরিযাপ্ত পরিমাণ নারকেল, সুপারি, পান ও বিভিন্ন রকম মশলাপাতি উৎপন্ন হয়ে থাকে। বিভিন্ন পেশার মানুষও বসবাস করে এখানে। যেমন কুমোর, কামার, স্বর্ণকার প্রভৃতি। প্রতি বৃহস্পতিবার ও রবিবার হাট বসলেও নিত্যকার বাজারও বসে। তাছাড়া প্রতি রবিবার গরুর হাটে গবাদি পশু বিক্রি হয়ে থাকে।

বালিয়াকান্দি অজ গ্রাম নয়। আধুনিক শিক্ষার প্রসারে ঘটেছে। ১৯১৭ সালে স্থাপিত হয়েছিল বালিয়াকান্দি হাইস্কুল। শিক্ষার অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে ১৯৭১ সালে গড়ে ওঠে বালিয়াকান্দি কলেজ। মেয়েদের স্কুল, হাফিজিয়া মাদ্রাসা, আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ক্লাব, লাইব্রেরি, দাতব্য চিকিৎসালয়, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, পশু হাসপাতাল, সাব-রেজিস্টার অফিস, ম্যারেজ রেজিস্টার অফিস, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, কমিউনিটি হল, ডাক-বাঙলো সব মিলিয়ে বালিয়াকান্দি শহর হয়ে উঠেছে।

গোয়ালন্দ ঘাট থানার উজানচর ইউনিয়নে একটি সমৃদ্ধ বসতি উজানচর (উত্তর)। স্টিমার ঘাট আছে এখানে। বেশ কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র আছে।

মাদারিপুর ঃ

আরিয়লখাঁ ও কুমার নদীর সঙ্গম স্থলে জেলা সদর মাদারিপুর। গুরুত্বপূর্ণ স্টিমার বন্দর। নারায়ণগঞ্জ ও চাঁদপুর এবং খুলনার মধ্যে স্টিমার চলাচল করে। তাছাড়া মাদারিপুর বিল রুট হয়ে সরাসরি খুলনায় যাতায়াত করা যায়। ১৫ শতকের মুসলিম সাধক বাহারউদ্দিন সাহ মাদারের নামানুসারে স্থানটি পরিচিত। এখানে প্রচলিত কিংবদন্তী হল, সাহ মাদারের দবগাহ আরিয়লখাঁ নদী কখনও ধ্বংস করতে পারবে না। শহরের দায়দায়িত্ব পুরসভার ওপর ন্যস্ত।

একটি ডিগ্রি কলেজ, তিনটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় (একটি মেয়েদের) আছে। মেয়েদের বিদ্যালয়টির নাম ডোনাভান গার্লস হাইস্কুল—স্থাপিত হয়েছিল ১৯১৪ সালে। শহরে ব্যাপটিস্ট মিশনের একটি বাড়ি আছে। নানান সরকারি অফিস, একটি ডাক-বাঙলো, একটি হাসপাতাল রয়েছে। পাটের অন্যতম বিক্রয় কেন্দ্র। বাজারহাটের অভাব নেই। মাদারিপুর শহরের পশ্চিম দিকে একটি বৃহৎ বাজারের নাম চর মাগুরিয়া। শহরে অনেক পুকুর ও খানা ডোবা আছে। যেগুলি ছোট ছোট খাল দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত। শহরে পানীয় জল সরবরাহ করা হয় আরিয়লখাঁ নদীর জল থেকে।

মাদারিপুরের পালঙে ১৮৯৯ সালে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। এই বিদ্যালয়টির নাম পালঙ তুলাসাব জি. ডি. হাইস্কুল। ১৯২৯ সালে রাজোইর একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯২৯ সালে—বিদ্যালয়টির নাম রাজোইর-গোপালগঞ্জ কে. জে. এস. ইনস্টিটিউশন। এই বছর সাকিপুরে স্থাপিত হয়েছিল শাকিপুর ইসলামিয়া হাইস্কুল।

সাহেবরাঝপুর ঃ

কালকিনি থানা ও সাহেব রামপুর ইউনিয়নের সাহেবরামপুর গ্রামটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকলেও, সে সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না। গ্রামটির সঙ্গে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও বাকরগঞ্জের সরাসরি লঞ্চ যোগাযোগ রয়েছে। একটি ১৫ ফিট উঁচু কাঁচা রাস্তার মাধ্যমে তরকি বন্দর ও কলকিনি থানা সদরের সঙ্গে যুক্ত। মঙ্গলবার শুক্রবার বসে সাহেবরামপুর হাট। হাটটি এই অঞ্চলের অন্যতম বৃহৎ হাট। এখানকার প্রধান কৃষিপণ্য ধান, পাট এবং আখ।

কোন একজন মিঃ ওয়ার্ড ইউরোপ থেকে এখানে এসে জামিদারি কেনেন। গ্রামবাসীদের কাছে তিনি ওয়ার্ড সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। তার তহশিলিদারের নাম ছিল রামবালা। এই ওয়ার্ড সাহেবের 'সাহেব' এবং রামবালার 'রাম' মিলে স্থানটি পরিচিত হয় সাহেবরামপুর। এই গ্রামের উত্তর ও পূর্বদিকে আরিয়লখাঁ নদী পশ্চিমে চর দৌলতখান এবং দক্ষিণে ডিক্রির চর।

সাহেবরামপুর গ্রামটি বেশ সমৃদ্ধ। ছেলে ও মেয়েদের উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, বঙ্গবন্ধু পাবলিক লাইব্রেরি, দাতব্য চিকিৎসালয়, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, কো-অপারেটিভ সোসাইটি এরকম বহু কিছুর সঙ্গে আছে নানা সরকারি দপ্তর।

উৎরাইল ঃ

জেলার সবথেকে বড় হাট আছে শিবচর থানার উৎরাইল গ্রামে। এই হাটে বাকরগঞ্জ, খুলনা, কুমিল্লা ও ঢাকা থেকে ব্যাপারিরা আসে। হাটের এলাকা ১৫ একরের বেশি। সপ্তাহে একদিনের হাট। প্রতি হাটে আগত লোকসংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। আরিয়লখাঁ নদীতীরে হাট বসে।

বাহাদুরপুর ঃ

মাদারিপুর জেলার শিবচর থানার পাঞ্চর ইউনিয়নের অন্তর্গত বাহাদুরপুর গ্রামটির নাম ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। ফারাজি আন্দোলনের সংগঠক ও নেতা হাজি শরিয়তুল্লাহ এই গ্রামে বাস করতেন। এই গ্রাম থেকেই তিনি আন্দোলন পরিচালনা করেন। তার পুত্র দুদুমিঞা এবং তার অনুগামীরা ১৮৩৮ সালে স্থানীয় হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে মারাত্মক সংঘর্ষে লিপ্ত হন। প্রতি বছর কয়েক হাজার অনুগামীর সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয় মাহফিল। এখানকার আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্ররা বিনা বেতনে ধর্মশিক্ষা করতে পারে। তাদের বই, খাদ্য এবং বাসস্থানেরও ব্যবস্থা আছে। বারহামগঞ্জ বন্দর (শিবচর) থেকে মাত্র ৩ মাইল দূরে বাহাদুরপুর অবস্থিত।

বারহামগঞ্জ ঃ

নদীবন্দর ও থানা সদর বারহামগঞ্জ বন্দর (শিবচর) শিবচর বাজার নামেও পরিচিত। শিবচর থানার অধীনে ১৭টি ইউনিয়নের ১০৪টি গ্রাম। ১২৯ বর্গ মাইল এলাকায় ১,৯৮,৫৫৮ জন মানুষের বাস। উত্তর পূবে পদ্মা নদী এবং দক্ষিণে খরস্রোতা আরিয়লখাঁ। একসময়ে বারহামগঞ্জ ছিল আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অন্যতম বৃহৎ বন্দর। কিন্তু আরিয়লখাঁর স্রোত পরিবর্তন ঘটায় বন্দরের পতন ঘটে। তবুও মরশুমি বাণিজ্যের অন্য কেন্দ্র হিসাবে স্থানটির খ্যাতি আছে। আরিয়লখাঁ এবং পদ্মাবাহিত পলি জমে এখানকার মাটি খুবই উর্বরা। চাল, ধান, পাট ও রবিশস্যের অপরিযাপ্ত ফলন হয়। সপ্তাহে দুবার হাট বসে। এখানকার বাণিজ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের সাহা ও কুণ্ডুদের ভূমিকা ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। দেশভাগের সময় তারা এদেশ ত্যাগ করায় স্থানীয় মুসলমানরা সেই ব্যবসায় এগিয়ে আসে।

ভোজেশ্বর ঃ

মাদারিপুরের অন্যতম পাট বাণিজ্যের কেন্দ্র নরিয়া থানার ভোজেশ্বর। তাছাড়া ভেদারগঞ্জও একটি ব্যবসা কেন্দ্র। ভেদারগঞ্জ একটি থানা সদর। শিবচর থানার চর দত্তপাড়ায় ১৯৩৪ সালে স্থাপিত হয়েছিল দত্তপাড়া টি. এন. আকাদমি। মাদারিপুর থানার চরমুগারিয়া বৃহৎ পাট ব্যবসা কেন্দ্র। ঘোসাইরহাট থানায় দামুদ্দিয়াও জেলার অন্যতম ব্যবসাকেন্দ্র।

দাসর ঃ

কিংবদন্তী কালকিনি থানার দাসর গ্রামে এসেছিলেন মুসলিম সাধক সৈয়দ উসমান। তিনি এখানে বসবাস করতে থাকেন। লোকে বলত, তিনি বাঘের পিঠে চলাচল করতেন। এখানে তার সমাধি আছে। তিনি ধর্মে কর্মে জীবন কাটান। তিনি কবে এখানে এসেছিলেন তা জানা যায় না। নরিয়া থানার ফতেজঙ্গপুর-এ মোঘল সেনাপতি মানসিংহ কেদার রায়কে পরাস্ত করার পর একটি সুবিশাল সুদৃশ্য প্রবেশ দ্বার নির্মাণ করেছিলেন। প্রবেশদ্বারটি এখন সম্পূর্ণ ভগ্ন প্রায়। মানসিংহ স্থানটির নাম দিয়েছিলেন ফতেজঙ্গপুর।

খালিয়া ঃ

মাদারিপুরের অন্যতম আকর্ষণ খালিয়া গ্রামে রাজারাম রায় মন্দির। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মন্দিরটিকে সংরক্ষিত প্রাচীন পুরাকীর্তি হিসাবে ঘোষণা করেছে। মন্দিরটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকারের। এই দোতলা ইটের মন্দিরটি সতের শতকে নির্মাণ করেছিলেন স্থানীয় প্রভাবশালী জমিদার রাজারাম রায়। একতলায় ছয়খানি ঘর। দোতলায় তিন খানি ঘর। সামনে ছাদযুক্ত প্রশস্ত বারান্দা। সামনের দিকে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে টেরাকোটার সুদৃশ্য অলঙ্করণ সমৃদ্ধ।

নরিয়া থানার কেদারপুরে ছিল চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের রাজধানী। বর্তমানে কেদারপুর একটি সাধারণ গ্রাম হলেও, একটি পুরনো দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দর্শকদের অন্যতম আকর্ষণ।

গোপালগঞ্জ ঃ

বর্তমান জেলা সদর গোপালগঞ্জ। মধুমতী নদীর চার মাইল পূর্বে অবস্থিত। ১৯০৯ সাল থেকে ছিল মহকুমা সদব। সে সময়েই গোপালগঞ্জ মহকুমা গঠিত হয়। শুধু জেলা সদর নয়. এখানে গোপালগঞ্জ থানারও সদর কার্যালয়। গোপালগঞ্জ থানার অধীনে আছে ১৮টি ইউনিয়নের ১৫৪টি গ্রাম। আয়তন ১৮০ বর্গ মাইল। মধুমতী নদীর কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় এবং মাদারিপুর বিল রুটের কারণে যান চলাচল ও পরিবহন ব্যবস্থা বেশ অনুকূল। এই বিলরুট বহু আগে পূর্ত দপ্তর মধুমতী নদী ও আরিয়লখাঁ নদীর মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য খনন করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল স্টিমার লঞ্চ ও নৌচলাচলের ব্যবস্থা সহজসাধ্য করা।

গোপালগঞ্জ থানা হল এক বিশাল বিল এলাকা জুড়ে। ফরিদপুরের এই দক্ষিণাঞ্চল এক সময়ে রাণী রাসমণি পেয়েছিলেন পুরস্কার হিসাবে। কারণ সিপাহী বিদ্রাহের সময় রাণী রাসমণি একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসারকে বিদ্রোহী সিপাহীদের হাত থেকে রক্ষা করে। ফরিদপুরের এই অঞ্চলটিকে বলা হত মাকিমপুর পরগণা। বিলে ছিল প্রচুর মাছ। রাসমণি জেলের কন্যা হলেও তিনি এখানে মাছের চাষ বন্ধ করে দেন। এখানে প্রথম পর্বে বসতি গড়ে ওঠে চণ্ডালদের নিয়ে। এখন যাদের নমশূদ্র বলা হয়। এরা ফরিদপুর, যশোহর ও বাকরগঞ্জের দক্ষিণাংশে এসে বসতি স্থাপন করে।

গোপালগঞ্জ স্থানীয় সুবৃহৎ ব্যবসা কেন্দ্র। এখানকার প্রধান ফসল হল পাট, ধান, তিল, সরিষা, কাওন ও গম। প্রতিদিন বাজার বসে। হাট হয় সপ্তাহে দুদিন। সম্প্রতি এখানে কিছু ছোটখাট কলকারখানা গড়ে উঠেছে। তাব মধ্যে অন্যতম হল আইসক্রিম কারখানা। শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন দপ্তর।

মহাবিদ্যালয়, ছেলেদের ও মেয়েদের উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ১৯৫০ সালে গোপালগঞ্জে একটি বেসরকারি কলেজ স্থাপিত হয়। বর্তমানে কলেজটির নাম বঙ্গবন্ধু গভর্নমেন্ট কলেজ। ১৯৭৩ সালের কলেজটি সরকার অধিগ্রহণ করে। কলেজ এবং কয়েকটি বিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্রাবাস আছে। এখানকার "নজরুল গ্রন্থাগার" গোপালগঞ্জের অন্যতম সংস্কৃতি কেন্দ্র। জেলা সদরের সবরকম সরকারি দপ্তর, অফিস আদালত আছে এখানে।

গোপালগঞ্জের অন্যতম আকর্ষণ একটি দ্বিতল মসজিদ। ১৮৬৬ সালে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান মথুরানাথ বসু কলকাতা থেকে ফরিদপুর আসেন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। তিনি গোপালগঞ্জে আসেন এবং খ্রিস্টধর্ম প্রচারে কিছুটা সফল হয়েছিলেন।

গোপালগঞ্জের অন্যতম কয়েকটি জনবসতি হল গোপীনাথপুর (গোপালগঞ্জ থানা), জলিরপুর (মুকসুদপুর থানা)।

কাশিয়ানি ঃ

কাশিয়ানি একটি থানা সদর। ১৩টি ইউনিয়নের ১৫৪টি গ্রামের ১০৯ বর্গ মাইল এলাকা এই থানা সদরের অন্তর্গত। কাশিয়ানি ইউনিয়নের অন্তর্গত কাশিয়ানি গ্রাম। কালুখালি ও ভাটিয়াপাড়ার সঙ্গে রেলসংযোগ রয়েছে। নদীপথ হল মধুমতী ও বারাসিয়া। লোকশ্রুতি নবাব আলিবর্দি খানের আমলে এই গ্রামের বাসিন্দা বাবু দর্পনারায়ণ সেন কাশীনাথদেবের পাঁচটি মূর্তি নির্মাণ করে গ্রামের পাঁচটি বাড়িতে স্থাপন করেন। সেই সময় থেকে গ্রামটি পরিচিত হয় কাশিয়ানি নামে। এক সময়ে এই গ্রামে বিভিন্ন বর্ণের নানান সম্প্রদায়ের হিন্দু বসতি ছিল। বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সাহা, বণিক, নমশূদ্র প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈদ্যরাই ছিল সবথেকে প্রভাবশালী, শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন। ব্রিটিশ আমলে বৈদ্যনাথ সেন জজ নিযুক্ত হয়েছিল। কবিরাজ কৈলাশচন্দ্র সেন ছিলেন বিখ্যাত আয়ুর্বেদিক কবিরাজ। তার একজন উত্তরসূরী জমিদার গিরিশচন্দ্র সেন ১৯০২ সালে যে বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন, পরে তার নাম হয় জি. সি. হাইস্কুল। গ্রামের বিত্তশালী ব্যবসায়ী সাহা সম্প্রদায় দেশভাগের পর এদেশ ছেড়ে ভারতে চলে যায়।

কাশিয়ানিতে ধান ও পাটের উৎপাদন পর্যাপ্ত। কিন্তু এখানে কোন শিল্প নেই। কাশিয়ানি থানার অধীন রাকান্দি বিশিষ্ট জনবসতি। অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিস্ট মিশনের একটি শাখা আছে এখানে। বহু শিক্ষিত হিন্দু বসতি ছিল একসময়ে। এখানে রেলওয়ে স্টেশন আছে। বামদিয়া, রাজপথ, সাজেল, টুঙ্গিপাড়া জনবসতিগুলিতে শিক্ষার বিকাশ ঘটে বহু আগেই।

উলপুর ঃ

গোপালগঞ্জের ৯ মাইল উত্তরে উলপুর। একসময় স্থানটি ছিল বর্ণহিন্দু কায়স্থদের আধিপত্য। কেউ কেউ বলেন, এরা সিপাহী বিদ্রোহের আগে মুসলিম প্রভাব মুক্ত থাকতে ঢাকা থেকে এসে বসতি স্থাপন করে। আবার কেউ কেউ বলেন মোঘল বাদশাহ একজন হিন্দু কর্মচারীর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে এখানে তাকে একটি তালুক দান করেছিলেন। ১৯০০ সালে এখানে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল সেটি উলপুর হাইস্কুল নামে পরিচিত।

কোতওয়ালিপাড়া ঃ

গোপালগঞ্জ একটি প্রাচীন বসতি কোতওয়ালিপাড়া। গোপালগঞ্জের দক্ষিণ-পূর্বদিকে ১৮ মাইল দূরত্বে ঘাঘর নদীর তীরে অবস্থিত। গ্রামটি মুখ্য কোতওয়ালি নামেও পরিচিত। এখানে আছে থানা সদর। একটি পুরনো দুর্গ আছে। দুর্গের দেওয়াল মাটির—২ থেকে ২½ মাইল দীর্ঘ ; ১৫ থেকে ৩০ ফুট উঁচু দেওয়াল। দুর্গটি ভালো অবস্থাতেই আছে। দুর্গটির অবস্থানের কারণে স্থানটির নাম হয়েছে কোতওয়ালিপাড়া। দুর্গটির ৩/৪ মাইল দূরে সুনাকান্দির মধ্যে

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং স্কন্ধগুপ্ত আমলের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। তাছাড়া কিছু তাম্রফলকেরও সন্ধান মিলেছে।

সম্ভবত ৩১৫ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রবর্মা বাংলা অভিযানকালে কোতওয়ালিপাড়ায় সেনা উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। তিনি চতুর্থ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত হন।

বিলাঞ্চলে অবস্থিতির কারণে সারা বছর এখানে যাতায়াতের জন্য নৌকা ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে। একসময়ে এখানকার অধিবাসীদের ৮০ শতাংশ ছিল নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ। বেশ কিছু ব্রাহ্মণের বসতিও ছিল।

বিল এলাকায় অতীতের কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে। প্রায় ৩০ বর্গ মাইল এলাকাটি কান্দি বিল নামে পরিচিত। একসময়ে এখানে লবণ জলের জন্য কোনরকম চাষাবাদ করা সম্ভব ছিল না। বর্তমানে ৯ মাইল দীর্ঘ বাঁধ দেওয়ায় মানুষের জীবনধারাও বদলে গেছে। সপ্তাহে দুদিন হাট বসে। ঘাঘর, শিশিরবাজার, রাধাগঞ্জ, ডুমুরিয়া এবং পিনজুরিতে দৈনিক বাজার বসে। সর্বাধিক উৎপন্ন ফসল ধান।

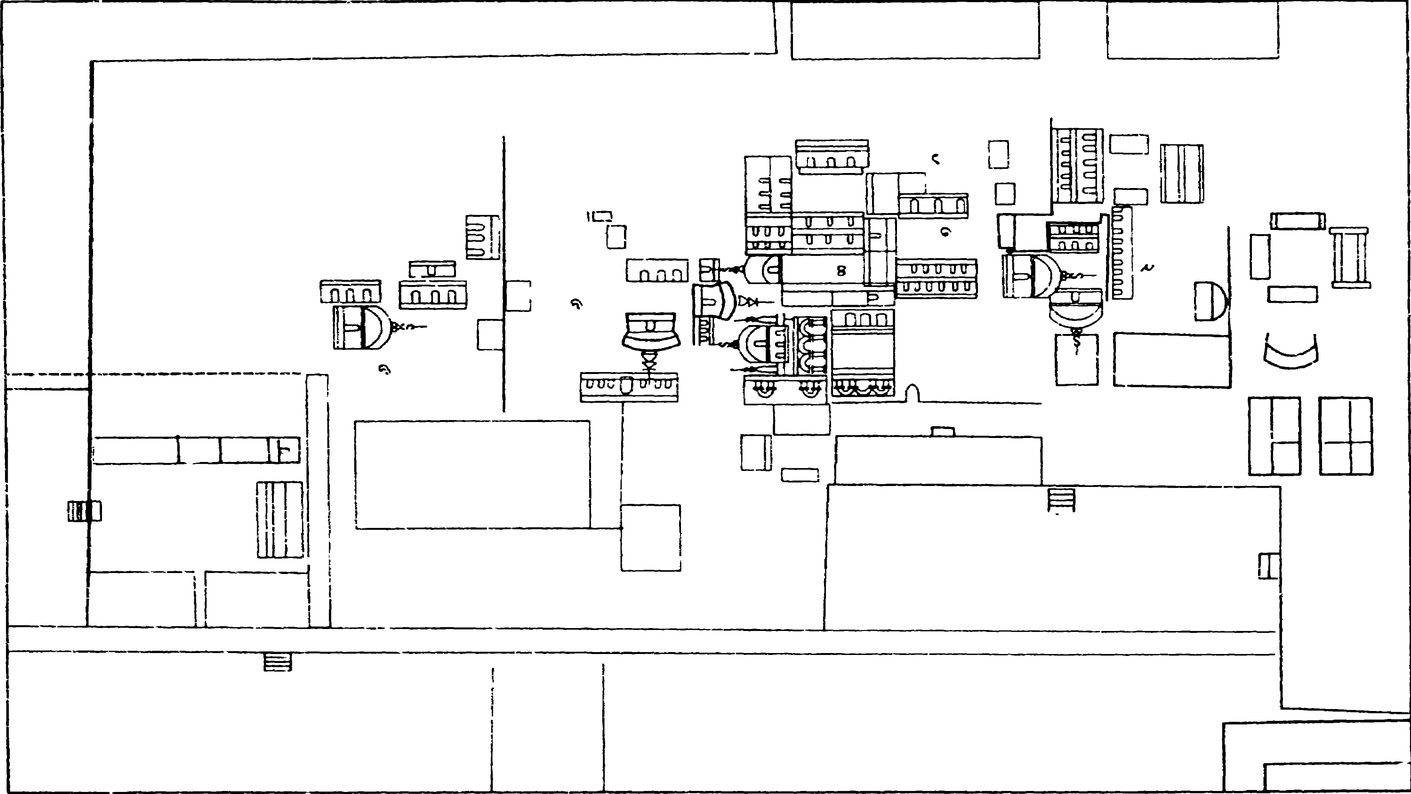
ফরিদপুরের ইতিহাস

(ভৌগোলিক তত্ত্ব প্রাচীন ইতিবৃত্ত)

১ম খণ্ড

শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত

কলিকাতা
২১০/৫ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, নব্যভারত প্রেসে।
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। কার্তিক, ১৩১৬।
 মূল্য ।।/০ আনা



জপসা ছয় হাবেলি লালাবাবুর বাড়ি

কয়েকটি কথা

অবস্থার পরিবর্তনে, নানাবিধ দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া, যথাসময়ে ইতিহাসখানা মুদ্রিত করিয়া উঠিতে পারি নাই। যে যে মহাত্মার পুস্তক হইতে এতৎসম্বন্ধে সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদের নাম যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পর্যটন দ্বারা বহু তথ্য সংগ্রহ করিতে ও প্রবাদমূলক কথা অবলম্বন করিতে ত্রুটি করি নাই। এজন্য পাথেয় খরচাদি যথেষ্ট লাগিয়াছে।

১৩০৭ সনে প্রথম "বারভূঞা" প্রবন্ধ নির্ম্মাল্য পত্রিকায় আরম্ভ করিয়া ১৩১৩ সন পর্যন্ত মধ্যভারত পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করি। ডাক্তার ওয়াইজ এশিয়াটিক জার্নালে প্রথম কেদার রায়, ফজলগাজী প্রভৃতি কয়েকজনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তদবলম্বনে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় অতি সামান্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া উহা প্রবন্ধাকারে বাহির করেন। চাঁদ ও কেদার রায়ের রাজ্যের বিশেষ বিবরণ ও অমাত্যগণের নাম এবং মানসিংহ সহিত তাঁহার যে লিপি চলিয়াছিল, তিনি তাহা অবগত ছিলেন না। উহা আমার প্রবন্ধ বাহির হইবার পূর্বে আর কেহই কখন উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সুখের বিষয় এই যে, মৎসংগৃহীত ঐ সকল উপকরণ লইয়া বঙ্গবিক্রম ও কেদার রায় প্রভৃতি কয়েকখানা নাটক ও নভেল প্রণীত হওয়ায় আমার পরিশ্রম সার্থক বিবেচিত হইয়াছে। মুকুন্দ রায়ের বিবরণ ওয়াইজ লিপিবদ্ধ করেন নাই, কাজেই সিংহ মহাশয় ও তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ১২৯৯ সনের ফাল্গুন মাসের ভারতীতে মুকুন্দরাম রায় নামে এক প্রবন্ধ বাহির হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ইতিহাসের কোন কথাই ছিল না. কেবল তৎকালীন দেশের কথা মাত্র ছিল। মূল আকবরনামা হইতে অনুবাদ করিয়া এই প্রবন্ধটির অবতারণা করিয়াছি। কেদার রায় ও মুকুন্দ রায় সম্বন্ধে সংক্ষেপে বিবরণ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলাম, বিস্তারিত বিবরণ "বারভূঞা" পুস্তকে প্রকাশিত হইতেছে।

অতি অল্প লোকই সংগ্রাম সাহের নাম পরিজ্ঞাত ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ এ পর্যন্ত বাহির হয় নাই, পাঠকগণ উহার প্রতি মনসংযোগ করিলেই সমুদয় জানিতে পারিবেন।

গেরদার প্রস্তরলিপির ইতিহাস, ফরিদপুরের উকিল শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল রহমান সাহেব অনুগ্রহ করিয়া প্রদান করায় (তাহার নিকট) চিরবাধিত আছি।

নানাকারণে অত্যল্প পৃষ্ঠা সম্বল লইয়া আমাকে সর্বসমক্ষে উপস্থিত হইতে হইল, এইটুকু যদি তাহাদের কোন অংশেও তৃপ্তিদায়ক হয়, তবে আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পুস্তকের সৌষ্ঠব সাধনার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারি নাই, ভাষার অঙ্গহানিও যথেষ্ট হইয়াছে, সহৃদয় পাঠক ও সমালোচক ক্ষমা করিবেন।

যাঁহাদের নিকট কোন না কোনরূপ উপকার পাইয়াছি, তাহাদের নাম উল্লেখ করা কর্তব্য, কিন্তু উহা সম্যকভাবে পারিয়া উঠিলাম না বলিয়া দুঃখিত রহিলাম। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন কবিরাজ মহাশয়, ফরিদপুরের স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়, কলিকাতা-বাসী (সুবিখ্যাত) জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহোদয়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস রায়, শ্রীযুক্ত (রাজা) সূর্যকুমার রায় ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুলেখক

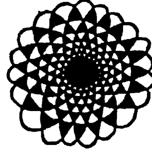
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য, কারণ আমার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহারা সাহায্য না করিলে আমি কখনই এই ইতিহাস লেখার ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে পারিতাম না।

নব্যভারক সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়, সুলেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু ও উকিল শ্রীযুক্ত বিনোদীলাল ঘোষ প্রভৃতি মহোদয়গণকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কর্তব্য।

অতঃপর আর দুই খণ্ডে এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইবে, ম্যাপ ও চিত্রাদি তাহাতে অধিকতররূপে সন্নিবেশিত থাকিবে। বর্তমান সংখ্যাসহ অগ্রিম মূল্য (...) টাকা। অপর দুই খণ্ডে পৃষ্ঠাও অত্যধিক থাকিবে।

৩১নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্ট্রিট, গ্রন্থকারের নিকট ও ২০নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট মজুমদার লাইব্রেরিতে, ফরিদপুর পুস্তকালয় সমূহে, মাদারীপুরের উকিল শ্রীবিনোদলাল ঘোষ মহাশয়ের ও জপসা, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়ের নিকট এই পুস্তক পাওয়া যাইবে। পোঃ উপাসী।

[এরপর কয়েকখানি অতি জীর্ণ চিঠির উল্লেখ আছে। উদ্ধার সম্ভব হয়নি।]



সীমা

উত্তরে পদ্মা ও পাবনা জেলা, পশ্চিমে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া সবডিভিসন ও বারাসীয়া, মধুমতী ও যশোহর জেলা, দক্ষিণে খুলনা ও বাকরগঞ্জ জেলা, নয়াভাঙ্গিনী নদী, পূর্বে নোয়াখালী, ত্রিপুরা এবং ঢাকা জেলা ; যথাক্রমে মেঘনা ও পদ্মা নদী দ্বারা বিভক্ত। ২৩-৫৪-৫৫ এবং ২২-৪৭-৫৩ উত্তর দ্রাঘিমার মধ্যে এবং ৮৯-২১-৫০ এবং ৯০-১৬ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। ১৮৭১ সনের সার্ভে-জেনারেলের পরিমাপে ইহার পরিমাণ ছিল ১৫২৪.০৬ স্কোয়ার মাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল ১৮৭২ খ্রিঃ সেনসেসে ১৫৩০২৮৮ জন। বর্তমান সময়ে মাদারিপুর সবডিভিসন ইহার অন্তর্গত হওয়ায় পরিমাণ আরও বর্ধিত হইয়াছে। অধুনা লোকসংখ্যা ১৯৩৭৬৪৬ এবং পরিমাণ ফল ২২৮১ স্কোয়ার মাইল। সদর স্টেশন ফরিদপুর পদ্মার পশ্চিম তীরে ঢাকা হইতে ৩৮ মাইল দুরবর্তী। কলিকাতা হইতে ১৫০ মাইল ঈশান কোণে অবস্থিত।

ফরিদপুর প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত, ১. সদর, ২. মাদারিপুর, ৩. গোয়ালন্দ। পরে বিস্তারিতভাবে এই তিন বিভাগের বিবরণ উল্লেখ করা যাইবে।

নিম্নলিখিত পরগণাগুলি ও অন্যান্য কতকগুলি তালুকের সমষ্টি লইয়া এই জেলার সংস্থিত প্রধান পরগণাগুলির নাম, পরিমাণ ও সদর রাজস্ব উল্লেখ করা হইল।

১। বিক্রমপুর ২৩ স্কোয়ার মাইল, কর ৩ পাউন্ড ১ স্টেট।
২। ফতেজঙ্গপুর ৩৫.৯০ স্কোয়ার মাইল ১১০টি স্টেটের কর ৩৬৩ পাউন্ড ২ সিলিং।[১]
৩। হবিবপুর ১৫.৯৯ স্কোয়ার মাইল ১ স্টেট কর ৮৭ পাউন্ড।
৪। ইদিলপুর ২৪২.৭৯ স্কোয়ার মাইল ৫০২ স্টেট কর ৭৯৭৭ পাউন্ড ১৮ সিলিং।
৫। ইদ্রাকপুর ২৪২.৭৯ স্কোয়ার মাইল ৬৩ স্টেট কর ৫৬৯ পাউন্ড ১০ সিলিং।
৬। জালালপুর ৯.৩৪ স্কোয়ার মাইল কর ৮৫ পাউন্ড ১ স্টেট।
৭। কাদিরাবাদ তপ্পা ৩.৩৮ স্কোয়ার মাইল কর ১৫৬ পাউন্ড ২ স্টেট।
৮। কাশিমপুর সেলা পাট্টি ৬.১৭ স্কোয়ার মাইল ৯৯ স্টেট কর ৮১২ পাউন্ড।
৯। কোটালিপাড়া ৮৫.৯২ স্কোয়ার মাইল ৫০২ স্টেট কর ২৪৪ পাউন্ড ১৮ সিলিং।
১০। মাদারিপুর ১২.২৪ স্কোয়ার মাইল ৫ স্টেট কর ৮২ পাউন্ড ১০ সিলিং।
১১। মুর্শিদকোটাল জায়গির .২১ স্কোয়ার মাইল ৪২ স্টেট কর ৮২ পাউন্ড ৮ সিলিং।
১২। রামনগর ১১.৯৭ স্কোয়ার মাইল ১৮ স্টেট কর ৮৭ পাউন্ড ১৬ সিলিং।
১৩। সফিপুর কালাতপ্পা ৩.২০ স্কোয়ার মাইল ৮৬ স্টেট কর ১১৪ পাউন্ড।

এই সকল পরগণার কোন কোন অংশ বাকরগঞ্জের কালেক্টরির তৌজিভুক্ত।

ফরিদপুরের খাস তৌজি

১। অমরাপুর ০.৫ স্কোয়ার মাইল ১ স্টেট কর ৩ পাউন্ড ২ সিলিং।
২। আমিরাবাদ ৬.৬২ স্কোয়ার মাইল ৫ স্টেট কর ২৬৬ পাউন্ড ১০ সিলিং।
৩। আমিরনগর কিংবা আমীন্নগড় ৩.৯৩ স্কোয়ার মাইল ১ স্টেট কর ১১৫ পাউন্ড ১৪ সিলিং।
৪। বৈকুণ্ঠপুর ৬.৪১ স্কোয়ার মাইল ৯ স্টেট কর ২৪৬ পাউন্ড ১৬ সিলিং।

৫। বাকিপুর ০.২১ স্কোয়ার মাইল ১ স্টেট কর ৯ পাউন্ড ১৪ সিলিং।
৬। বাউলার ০.০৭ স্কোয়ার মাইল ১ স্টেট কর ৮ সিলিং।
৭। বন্দরখলা ০.৬৯ স্কোয়ার মাইল ২ স্টেট কর ১২৮ পাউন্ড ১২ সিলিং।
৮। বেলগাছি ৩২.৬০ স্কোয়ার মাইল ২৮ স্টেট কর ৭৯৫ পাউন্ড।
৯। বিনোদপুর তপ্পা এরিয়ার উল্লেখ নাই ১ স্টেট কর ৪ পাউন্ড।
১০। বিরাহিমপুর ১৪.১৯ স্কোয়ার মাইল ২ স্টেট কর ২৭৭ পাউন্ড ১২ সিলিং।
১১। বীরমোহন ৪৫.৬৩ স্কোয়ার মাইল ৬০২ স্টেট কর ৯৫৫ পাউন্ড ১৪ সিলিং।
১২। ধূলদী ৫৭.৭৪ স্কোয়ার মাইল ৫৯ স্টেট কর ১০৪৪ পাউন্ড ৪ সিলিং।
১৩। ফতেজঙ্গপুর এরিয়ার উল্লেখ নাই ১৯ স্টেট কর ১৫৮ পাউন্ড ২ সিলিং।[২]
১৪। গঙ্গাপথ ০.০৫ স্কোয়ার মাইল ৬ স্টেট কর ২৬৬ পাউন্ড ১০ সিলিং।
১৫। হাকিমপুর ২১.৯০ স্কোয়ার মাইল ৩২ স্টেট কর ২৪ পাউন্ড ৪ সিলিং।
১৬। হাবেলী ৪.৪০ স্কোয়ার মাইল ১৩১ স্টেট কর ১১৮ পাউন্ড ১৬ সিলিং।
১৭। জাহাঙ্গিরনগর ০.১১ স্কোয়ার মাইল ২ স্টেট কর ৪ পাউন্ড ২ সিলিং।
১৮। জালালপুর ১০৪.৭৭ স্কোয়ার মাইল ৬৮৭ স্টেট কর ১৩৪১ পাউন্ড।[৩]
১৯। কাসথা সাগর ০.৪৪ স্কোয়ার মাইল ৬৮৭ স্টেট কর ১৩৪১ পাউন্ড।
২০। কাশীমনগর ৭.৫৩ স্কোয়ার মাইল ২২ স্টেট কর ২২২ পাউন্ড ৮ সিলিং।
২১। কোষা ০.০১ স্কোয়ার মাইল ১ স্টেট কর ৮ সিলিং।
২২। মহিমসাহী ৯.১৬ স্কোয়ার মাইল ২৭ স্টেট কর ২১৭ পাউন্ড ১০ সিলিং।
২৩। মহম্মদপুর ৪.৩৩ স্কোয়ার মাইল ১১৪ স্টেট কর ১৫৫ পাউন্ড ১৪ সিলিং।
২৪। মুবারকপুর উজিলা ১০৪ স্কোয়ার মাইল ১ স্টেট কর ৩ পাউন্ড ১০ সিলিং।
২৫। মুকিমপুর ৭.৫৯ স্কোয়ার মাইল ৮ স্টেট কর ৫৪ পাউন্ড ৮ সিলিং।
২৬। নলদী ৬৫.১৮ স্কোয়ার মাইল ১০৪ স্টেট কর ৭৫ পাউন্ড ২ সিলিং।
২৭। নসীবসাহী ৪ ৪৫ স্কোয়ার মাইল ৯ স্টেট কর ৭৫৬ পাউন্ড ২ সিলিং।
২৮। নসরৎসাহী .১৮ স্কোয়ার ২ স্টেট কর ৫ পাউন্ড।
২৯। নরুল্লাপুর ২.০২ স্কোযার মাইল ৬৯ পাউন্ড ৪ সিলিং।
৩০। পাটপাসার ১.৯৭ স্কোয়ার মাইল ৪ স্টেট কর ৬৯ পাডন্ড ৪ সিলিং।
৩১। পোকতানী ১ স্টেট কর ২০৫ পাউন্ড ৮ সিলিং।
৩২। রাজনগর ১.২৭ স্কোয়ার মাইল ৫ স্টেট কর ৩৫ পাউন্ড ১৪ সিলিং।
৩৩। রোকনপুর .৩৭ স্কোয়ার মাইল ৩৫ পাউন্ড ১৪ সিলিং।
৩৪। রূপাপাত তরফ ২৯.৫ স্কোয়ার মাইল ১ স্টেট কর ১০০৩ পাউন্ড ২ সিলিং।
৩৫। সাতৈর ১২৮.৬৩ স্কোয়ার মাইল ৮৬ স্টেট কর ৪৫৭৬ পাউন্ড ১৮ সিলিং।
৩৬। সাহপুর তপ্পা ৮৪৭০৪ স্কোয়ার মাইল ৪৯ স্টেট কব ৩৭৬৬ পাউন্ড।
৩৭। সেরদিয়া ১০৮৫ স্কোয়ার মাইল ১৮ স্টেট কর ৫৩ পাউন্ড।
৩৮। সিন্দুরিয়া ২০৯ স্কোয়ার মাইল ৮ স্টেট কর ২৩ পাউন্ড ৬ সিলিং।
৩৯। সুলতানপুর খড়রিয়া ১০.০৭ স্কোয়ার মাইল ১৪ স্টেট কর ২১ পাউন্ড।
৪০। তেলিহাটি ১৬৫.৬৪ স্কোয়ার মাইল ২৪ স্টেট কর ১৫৭০ পাউন্ড ৪ সিলিং।
৪১। তেলিহাটি আমিরাবাদ ১১.১৫ স্কোয়ার মাইল ৭৭ স্টেট কর ২১৩ পাউন্ড ১৮ সিলিং।
৪২। তেলিহাটি মহব্বৎপুর ১১.১৬ স্কোয়ার মাইল ৭৭ স্টেট কর ৪০৮ পাউন্ড ১০ সিলিং।
৪৩। কার্তিকপুর, সেলিমপ্রতাপ, খুটনেকপুর. চাউলার, বেগী, দুর্গাপুর প্রভৃতি পরগণা আছে।

প্রধান চর

(১) উজানচর প্রায় ৯১৭৯ একর (২) চরটি প্রাকান্দী ৫১২৭ একর (৩) চর নাজীরপুর ১১৭৩৫ একর (৪) চর ভদ্রাসন ৭৩৪০ একর (৫) চর জজিরা স্টেশন শিবচর ও পালং মধ্যে (৬) চর নৌকাডুবি ঐ স্টেশন মধ্যে (৭) চর কালকিনী আরিয়লখাঁ ও ফাইসাবতলা নদীর মধ্যে (৮) পঞ্চহাজারি ২৮২৬ একর (৯) চর খালপুরা ১৮৩৮ একর (১০) রাজার চর ১৮৫৮ একর (১১) চর দত্তপাড়া আরিয়লখাঁ নদীতীরে (১২) চর ছোলাছির বন্দরখলা বরমগঞ্জের নিকট (১৩) চর জমালপুর আজাপুরের নিকট (১৪) লাউজানা আশাপুর মথুরাপুরের নিকট (১৫) চর মুকুন্দিয়া (১৬) তরফ বাইলাড় (১৭) বেটকা, (১৮) তরফ কৃষ্ণনগর, (১৯) মাধবদী, (২০) পদ্মার মধ্যবর্তী হাকিমপুর শ্যামনগর, কালীনগর ইত্যাদি।

বিল

১। ঢোলসমুদ্র ফরিদপুরের দক্ষিণ পূর্বাংশে সংলগ্ন এক সময়ে ইহার আয়তন ৮ মাইল ছিল, পরে বর্ষার সময়ে প্রায় দুই মাইল জলপূর্ণ থাকিত। অধুনা গ্রীষ্মকালে প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়।
২। বিলপাটিয়া বেলগাছির নিকট বর্ষার সময়ে প্রায় ২ মাইল হইতে ৩ মাইল প্রশস্ত হইত।
৩। বিল হাতিমোহনা ২॥ মাইল দীর্ঘ ২ মাইল প্রশস্ত ছিল।
৪। রামকেলী সাতৈরের নিকট প্রায় ১৫ মাইল দীর্ঘ ৬ মাইল প্রশস্ত।
৫। নসীবসাহী বিল ১৬ মাইল দীর্ঘ ৬ মাইল প্রশস্ত; ইহা মুকসুদপুর থানা বিলমটর, চাঁদার বিল, বকসীর বিল পর্যন্ত বিস্তৃত।
৬। কাজলার বিল।
৭। বাঘিয়া কোটালিপাড়ার উত্তর।
৮। রামশীলা দিঘি।
৯। বড়য়া।—এই সকল বিলের অধিকাংশ জমি উত্থিত হইয়াছে।

নদী

এই জেলার সীমান্তে দুইটি বড় নদী বিদ্যমান; উহার একটি পদ্মা অপরটি মেঘনা।

পদ্মা জেলার উত্তর পূর্বাংশে পাবনা ও ঢাকা হইতে জেলাকে বিভক্ত করিতেছে। ইহা প্রথমত মুগীডাঙাব নিকট 'ভেলবারিয়া' ফ্যাক্টরির উত্তর পশ্চিমাংশ স্পর্শ করিয়া গোয়ালন্দের নিকট যমুনা সহিত মিলিত হইয়াছে। সাধারণতঃ এই সংযোগ বাইশ-কোদালিয়া নামে পরিচিত।[৪] বর্ষার সময়ে উহার জলস্রোত এত প্রবলভাবে দক্ষিণদিকে ধাবিত হয় যে, অতি বেগগামী আসামের স্টিমার পর্যন্ত উহা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের এক রিপোর্টে কালেক্টর সাহেব লিখিয়া যান যে, এই বৎসর ৬ খানা ফ্লাটসহ স্টিমার পদ্মা-যমুনা ভেদ করিয়া উঠিতে না পারায়, কতক দিন গোয়ালন্দ নঙ্গর কবিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। এই সময়ে গড়াই নদী দ্বারা পদ্মার গতি পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে। কর্নেল গেস্টল কর্তৃক পরিমাপে তৎ সময়ে গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার প্রশস্ততা গ্রীষ্ম সময়ে ১৬০০ গজ বলিয়া অবধারিত হয়।

পদ্মার একটি শাখার নাম আরিয়লখাঁ, ইহার উপরের দিকের নাম ছিল ভুবনেশ্বর। ১৮০১ সালে ঠগি দমন জন্য আরিয়লখাঁ নামীয় এক জমাদার গবর্নমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হয়। ভুবনেশ্বর হইতে এক খাল খনন করাইয়া উহা প্রাচীন পদ্মার দক্ষিণাংশের সাহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়ায়, উহাই কালক্রমে প্রবল রূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রাচীন পদ্মা ও ভুবনেশ্বরের কতকাংশ গ্রাস করিয়া ফেলে ও সাধারণের নিকট আরিয়লখাঁ নামে পরিচিত হয়। এই নদী ফরিদপুর হইতে কতক মাইল দূরে চর মুকুন্দিয়া নামে দ্বীপ গঠিত করিয়া, প্রথমত দক্ষিণ পূর্বদিকে,

পরে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া মাদারিপুরের নিম্ন দিয়া কালকিনী চরের পূর্বাংশ দিয়া ফুলতলা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। বর্ষার সময়ে ইহার প্রশস্ততা ১৬০০ গজ হয়। নীলখীর খাল ইহার ২/৩ মাইল অতিক্রম করিয়া আরিয়লখাঁ হইতে কুমার পর্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। গ্রীষ্ম সময়ে ২৫ গজ ও বর্ষার সময়ে ৫০ গজ প্রশস্ত হয়।

নয়াভাঙ্গনী কালীনগরের নিকট আরিয়লখাঁ নদী হইতে বাহির হইয়া ইদিলপুব ও শ্রীরামপুর ভেদ করিয়া মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিমে বক্রগতিতে দীর্ঘ প্রায় ২২ মাইল। গ্রীষ্মকালে ৮০০ শত গজ এবং বর্ষাকালে ১২০০ শত গজ প্রশস্ত হয়।

ফাইসাতলার দোন আরিয়লখাঁ হইতে বাহিব হইয়া পাঙ্গাসিয়া পর্যন্ত দীর্ঘে প্রায় ৪$\frac{১}{২}$ মাইল। গ্রীষ্ম সময়ে ৬০ ও বর্ষার সময়ে ৮০ গজ প্রশস্ত হয়।

পদ্মার যে অংশ বিক্রমপুর ভেদ করিয়া মেঘনার সহিত মিলিয়াছে, উহার নাম কীর্তিনাশা, প্রকৃত প্রস্তাবে পদ্মার গতি বিক্রমপুরের পশ্চিম দিক পরিত্যাগ করিয়া মরাপদ্মা নামে এবং প্রবলাংশ যাহা ১০০ বৎসরের মধ্যে উদ্ভূত হইয়া প্রাচীন কালী গঙ্গা বিলুপ্ত করিয়াছে, উহা কীর্তিনাশা নামে পরিচিত।

মিঃ রেনেলের কৃত ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের মানচিত্রে কীর্তিনাশার নাম উল্লেখ নাই। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে মিঃ টেইলার, তদীয় টপগ্রাফী অব ঢাকা পুস্তকে কাথারিয়া বা কীর্তিনাশা নদীর বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, চাঁদ ও কেদার রায় এবং নওপাড়ার বৈদ্য চৌধুরীদের কীর্তি ভগ্ন করায় উহার নাম হয় কীর্তিনাশা। প্রথম রথখলা পরে ব্রহ্মবধিয়া পরে কাথারিয়া সর্বশেষে কীর্তিনাশা নামে পরিচিত হয়। এই নদী বিক্রমপুরেব বহু কীর্তি উদরসাৎ করিয়াছে, তন্মধ্যে রাজনগর, জপসা ও কালীপাড়ার নাম উল্লেখযোগ্য। এই নদী দ্বারা বিক্রমপুর দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া উত্তর ভাগ ঢাকা জেলায় এবং দক্ষিণ ভাগ ফরিদপুব জেলার অন্তর্গত হইয়াছে। বর্ষার সময়ে উহার বেগ বড়ই প্রবলরূপ ধারণ করে এবং ভগ্নস্থানের গর্জন বহু দূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়। পরিসর উত্তর দক্ষিণ পারের মধ্যে চারি হাজার গজ হইবে, কিন্তু বহু চর থাকায় ততটা অনুমান হয় না। বর্ষার সময়ের গভীরতা স্থান বিশেষে ৫০/৬০ গজ পর্যন্ত হইয়া থাকে।

চন্দনা নদী ফরিদপুবের পশ্চিম সীমান্তে, মুগীডাঙ্গা গ্রামের নিকট জেলার একেবারে উত্তর পূর্বাংশে গঙ্গা বা পদ্মা হইতে শাখারূপে বহির্গত হইয়াছে। তৎপর ইহা বক্রগতি হইয়া পশ্চিম সীমা দিয়া কিন্তু সাধারণতঃ পূর্ব হইতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া, সৌদপুর বন্দরের নিকট মসলন্দপুরস্থ গড়াইতে পতিত হইয়াছে। ইহা গ্রীষ্মের সময় ৫০ গজ প্রশস্ত এবং বর্ষার সময় ৮০ গজ হইয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে মাত্র ৫ মাস এই নদী দিয়া গমনাগমন করা যায়। নদীটি ক্রমেই ভরিয়া আসিতেছে। গ্রীষ্মের সময় ইহার গতির অনেকাংশ প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়। চন্দনা এবং গড়াই একত্র সংযুক্ত হইয়া মধুমতী নামে ফরিদপুবের পশ্চিম সীমা দিয়া সমুদ্রাভিমুখে দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত হয়।

মধুমতী বড় নদী মাঝারি নৌকা দ্বারা পাব হওয়া যায়। গ্রীষ্মের সময় ইহার প্রশস্ত ১৫০ গজ ও বর্ষার সময় ২০০ গজ হইয়া থাকে। মধুমতী এবং গড়াই নদী দিয়া ভারতবর্ষের সর্বাংশে ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতেছে। বৎসরের প্রত্যেক সময় বড় বড নৌকা যাতায়াত করিতে দেখা যায়। সুন্দরবনের প্রবেশের ইহা একটি পথ, ইহার পার দিয়া গুণ টানিয়া যাইতে বিশেষ সুবিধা। মধুমতীর একটি শাখা **বারাসিয়া** নদী গোয়ালবাড়ির নিকট মধুমতী হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রায় ২০ মাইল প্রবাহিত হইয়া জেলার ভাটিয়াপাড়া গ্রামের নিকট মধুমতীর সহিত পুনরায় মিলিয়াছে। এই নদীতে বড় বড় নৌকা যোগে সমুদয় বৎসর পার হওয়া যায়। মধুমতীর উপশাখার নাম বানকাণা, কেহ কেহ নবগঙ্গা কহিয়া থাকে, কিন্তু এই সকল নদী যশোহর জেলা দিয়া প্রবাহিত, ফরিদপুরের মধ্যে নহে।

কুমার নদী। সিবিল স্টেশন হইতে বত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত কানাইপুর গ্রামের নিকট চন্দনা নদী হইতে কুমার নদী শাখারূপে বহির্গত হইয়াছে। পরে বক্রগতিতে বহির্গত হইয়া সাধারণতঃ উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্বদিক দিয়া প্রবাহিত হওয়ার পর মাদারিপুরের নিকট ফরিদপুর পরিত্যাগ করিয়া বাকরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্ষার সময় বাণিজ্য নৌকা দ্বারা ইহার উৎপত্তি স্থান হইতে কানাইপুর পর্যন্ত যাতায়াত করা যায়। তৎপর সমস্ত বৎসর পর্যন্ত মাদারিপুর পর্যন্ত যাওয়া যায়। দেশের আরো বৃদ্ধি জন্য কুমার নদীর দুইটি শাখা ব্যবহার করা যায়।

প্রধান শাখা **শীতললক্ষ্যা**, তালমা পুলিশ স্টেশন হইতে আরম্ভ করিয়া ভাঙার নিকট কুমারের সহিত মিলিত হইয়াছে। বর্ষার সময় এই নদীতে নৌকা যোগে যাতায়াত করা যায়, কিন্তু গ্রীষ্মের সময় নয়। তালমা ও আজিয়া গয়েসপুর ভরিয়া যাওয়ায় গমনাগমন করা যায় না, যে, সমস্ত স্থান ভরে নাই, তাহাতে গভীর জল থাকে। এই নদীতে সকল বৎসর গমনাগমন করা যাইতে পারে, যদি ইহার ঐ সমস্ত অংশ খনন করা হয়, তাহা হইলে ভাঙা পর্যন্ত নৌকাযোগে যাতায়াত করা যায়। ভাঙা এবং তালমার মধ্যে নৌকার সুবিধা হইলে বাণিজ্য বিস্তার ঘটিতে পারে। কারণ তালমা হইতে ফরিদপুর পর্যন্ত রাস্তার বন্দোবস্ত আছে।

২য় শাখা বালুগাঁর নিকট চরটুকু, উপরে কুমার ছাড়িয়া জেলার দক্ষিণ অংশে বিলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সর্বশেষে মধুমতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত নদীর মত এই নদীও স্থানে স্থানে খনন করা আবশ্যক। যদি এইরূপে নৌকাযোগে যাতায়াতের সুবিধা হয়, তবে ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জের মধ্যে বাণিজ্যের সুবিধা হইতে পারে। কুমার দুই শত গজ পর্যন্ত প্রশস্ত।

খাল

কাওনীয়া, রত্নদিয়া, মাতলাখালি এই সকল খাল নসীবসাহী ও মহিসসাহীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া কুমার ও হাজিখালির সহিত মিলিয়াছে। এতদ্ভিন্ন মাদারিপুরের, ধোপাডাঙার, নওপাড়ার গোয়ালমারির, গোয়ালার, পিঞ্জিরির, ফতেপুরের গোয়াখালীর, ঘাগরের, বিনোদপুর বা চিকন্দীর, রাজগঞ্জ বা পালঙের, ঘড়িশারের খাল ও বিল-রুট প্রশস্ত।

পথ

প্রাচীন রাস্তা সম্বন্ধে রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায়, ফরিদপুর হইতে এক প্রশস্ত পথ বরাবর উত্তরাভিমুখ হইয়া পাঠপাসার হাজিগঞ্জ অতিক্রম করতঃ বরাবর পূর্বাভিমুখ হইয়া পদ্মার অপর তীরস্থ নবাবগঞ্জ হইয়া ঢাকা পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। অপর পথটি হাবাসপুর হইতে আরম্ভ হইয়া গোয়াল গাঁ, কুমারখালি, কুষ্ঠিয়া হইয়া এক শাখা জলঙ্গী নদীর তীরবর্তী জয়রামপুর পর্যন্ত, অপর শাখা পদ্মার তীরস্থ সারদা পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

মুলফৎগঞ্জ হইতে অপর রাস্তা আরম্ভ হইয়া জপসা, লরিকুল হইয়া রাজনগর পর্যন্ত, তথা হইতে কালীগঙ্গা অতিক্রম করিয়া উত্তরাভিমুখে ধানকুনিয়া, রাজাবাড়ি, সেরাজদি হইয়া ঢাকার দিকে চলিয়া গিয়াছে। রেনেলের ম্যাপে এই দুই রাস্তার চিত্রই দৃষ্ট হয়।

অপর আর একটি রাস্তার নাম 'কাচকিগুড়ার দরজা'। এটি ইদিলপুরের প্রান্তবর্তী দেওভোগ হইতে আরম্ভ হইয়া মুলফৎগঞ্জের রাস্তা সহ মিলিয়াছিল। নানাবক্র গতিতে উহা বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া ধলেশ্বরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

নূতন রথ্যার মধ্যে ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের লৌহবর্ত্ম গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত কিন্তু পদব্রজে গমনাগমনের সুবিধা নাই। অপর রাস্তা গোয়ালন্দ হইতে ফরিদপুর, ফরিদপুর হইতে তালমা। এতদ্ভিন্ন ফরিদপুর হইতে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তা ও

পালং হইতে নগর ফতেজঙ্গপুরেব রাস্তা ও মাদারিপুর হইতে বরিশালের অন্তর্গত গৌরনদীর এলাকার নিকটবর্তী রাস্তা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তা দৃষ্ট হয়। নড়িয়া ও লোনসিংহের পথ অল্পদূর মাত্র বিস্তৃত। মোটের উপর পথকরের টাকা দ্বারা উচিত মত রাস্তা, খাল না হওয়ায় দেশীয় লোকের ক্লেশ মোচন হইতেছে না। বাদসাহী গবর্নমেন্টের ও হিন্দু রাজাদের সময়ে এদেশে রাস্তার বন্দোবস্ত বরং ভাল ছিল।

পশু, পক্ষী ও মৎস্য ইত্যাদি

বাংলার বিভিন্ন স্থানের ন্যায় হিংস্র ও গ্রাম্য পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য ইত্যাদি এই স্থানেও দৃষ্ট হয়। নদীতে কুম্ভীর ও শুশুক এবং স্থলে ব্যাঘ্র, শূকর, বানর তত প্রচুর দেখা যায় না।



১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে রেনেলের মানচিত্রে যে যে প্রাচীন মন্দিরাদির পরিচয় আছে, এস্থলে তাহা উল্লেখ করা হইল।

১। খাগটিয়া একটি মঠের চিত্র।

২। রাজনগর দুইটি মঠের ও একটি জলাশয়ের চিত্র। সম্ভবত সতেররত্ন ও একুশরত্ন এবং রাজসাগরের চিত্র দেখানো হইয়াছে।

৩। জপসা একটি মঠের চিত্র, কেবলমাত্র এই মঠের পার্শ্বে লেখা রহিয়াছে[৫] এই মন্দির পদ্মা ও মেঘনা হইতে দেখা যায়। যাবতীয় মন্দির মধ্যে এইটি উচ্চ ছিল, অনুমান হয়।

৪। বেলাসার একটি মঠ (ইদিলপুরের দিকে)।

৫। বাদরাসন একটি মঠ (ঐ)

৬। টেঙ্গারামারির নিকটবর্তী মসজিদ।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এক সময়ে যেটুকু রেনেলের ম্যাপ হইতে প্রয়োজন বোধে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাই এস্থানে উল্লেখ করা হইল, ফরিদপুরের অন্তর্গত অপর স্থানে যে দুই চারিটি প্রাচীন কীর্তি ছিল, তাহা আর উহা হইতে লিখিয়া রাখা হয় নাই। রেনেলের সময়ে দক্ষিণ বিক্রমপুর মধ্যে, সোমকোট, গোবিন্দমঙ্গল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রামেব অস্তিত্ব থাকা অবগত হওয়া যায়, কিন্তু কোন মন্দিরের চিহ্ন দেখা যায় না। ঢোলসমুদ্র নামে একটি জলাশয়ের চিত্র দেখা যায়, যাহা রাজসাগর অপেক্ষাও বড় ছিল। উহা ফুলবাড়িয়া গ্রামের নিকটবর্তী বিধায়, চাঁদ ও কেদার রায়ের কীর্তি বলিয়াই অনুমিত হয়। উল্লিখিত কীর্তিগুলি এক্ষণে নদী কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে।

জাতি ও ধর্ম

এই জেলা হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খ্রিস্টিয়ান এই চারি জাতির বাসস্থান। হিন্দুর সংখ্যা ৭৩৩৫৫৫। তন্মধ্যে পুরুষ ৩৬০০১২; স্ত্রী ৩৭৩৫৪৩। ব্রাহ্ম মোট ৮৩; তন্মধ্যে পুরুষ ৪০ ও স্ত্রী ৪৩। জৈন পুরুষ ৫ জন মাত্র। বৌদ্ধ ১০ জন মাত্র। মুসলমান মোট সংখ্যা ১১৯৯৩৫১ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ৬০৭৬৮৮ ও স্ত্রী ৫৯১৬৬৩। খ্রিস্টান ৩৬৫৭ জন। হিন্দু-শ্রেণি নানা ভাগে বিভক্ত—ফরিদপুর জেলায় ঠাকুর উপাধি ব্রাহ্মণও বাস করিতেছেন। ১৮৫৭ সনে প্রথমত এই স্থানে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়। হিন্দুদের নানারূপ দেবদেবী বিভিন্ন স্থানে সংস্থাপিত আছেন। এতদ্ভিন্ন বহু বৃক্ষ দেবাধিষ্ঠান বলিয়া পূজিত হয়। মুসলমান-সম্প্রদায় মধ্যে ফরাজি বলিয়া এক সম্প্রদায় নূতন গঠিত হইয়াছে, স্থানান্তরে তাহাদের বৃত্তান্ত বিবৃত হইবে। অধিকাংশ নিম্নশ্রেণি হিন্দু বিশেষ নমঃশূদ্র-সম্প্রদায় হইতে দেশীয় খ্রিস্টানদলের উৎপত্তি।

হিন্দুসমাজে নিতান্ত হেয়ভাবে আছে বলিয়া তাহারা স্বীয় পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এইরূপ জাত্যন্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। ব্রাহ্ম হিন্দুর এক বিশেষ উন্নত শাখা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কালে উভয় আবার এক হইয়া যাইবে।

এই জেলায় হিন্দুদের মধ্যে নিম্নলিখিত শ্রেণি বিভাগ দৃষ্ট হয়

১।	ব্রাহ্মণ।	২।	ক্ষত্রিয়।
৩।	বৈদ্য।	৪।	কায়স্থ।
৫।	ছত্রী।	৬।	গন্ধ বণিক।
৭।	কামার।	৮।	কুমার।
৯।	আগরওয়ালা।	১০।	আগুরি।
১১।	তাম্বুলী।	১২।	সদগোপ।
১৩।	শূদ্র।	১৪।	কুরমী।
১৫।	তিলি।	১৬।	মালী।
১৭।	কাঁসারি।	১৮।	শাখারি।
১৯।	নাপিত।	২০।	বৈষ্ণব।
২১।	বারই।	২২।	কৈবর্ত।
২৩।	গাররী।	২৪।	মদক।
২৫।	গোপ বা গয়লা।	২৬।	সুবর্ণ বণিক।
২৭।	সেকরা।	২৮।	সূত্রধর।
২৯।	সাহা।	৩০।	পাইটাটি।
৩১।	কলু।	৩২।	তাঁতি।
৩৩।	জুগি।	৩৪।	চুনারী।
৩৫।	পাইটাল।	৩৬।	জেলে।
৩৭।	কাড়াল।	৩৮।	কারলি।
৩৯।	মাল।	৪০।	মাঝি।
৪১।	পোদ।	৪২।	টিয়র।
৪৩।	পুবর।	৪৪।	বাইয়তী।
৪৫।	বেহারা।	৪৬।	ধানুক।
৪৭।	বাগদি।	৪৮।	পাটনি।
৪৯।	কোয়রী।	৫০।	চাষা।
৫১।	ধোপা।	৫২।	কাচুরি।
৫৩।	নমঃশূদ্র।	৫৪।	কাপালি।
৫৫।	বাউতি।	৫৬।	কাহার।
৫৭।	মুচি।	৫৮।	পালি।
৫৯।	বিন্দ।	৬০।	চেল।
৬১।	ডোম।	৬২।	দোসাদ।
৬৩।	কারাঙ্গি।	৬৪।	রাজবংশী।
৬৫।	মাল।	৬৬।	মালো
৬৭।	হাড়ি।	৬৮।	কাওলি।
৬৯।	ভুঁইমালি	৭০।	মিহাটার।
৭১।	বুনা।	৭২।	নর বা নট্ট।

জাগ্রত দেবতা ও ধর্মশালা

নলিয়ার হরি, মুকডোবার বাসুদেব, তালমার অন্তর্গত দুলারভাঙার কুশলনাথ শিবনাথ একটি বৃক্ষ; বেলগাছি স্টেশনের অন্তর্গত সাওতাপুরের বৃক্ষপুষ্করিণীসমন্বিত শিব (রাজ রাজেশ্বর), মাদারিপুরের বলরাম, রাজনগর (অধুনা পালঙের) রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ, জপসা (অধুনা নগরের) অভয়া, ধানুকার শ্যামা ও খান্দারপারের কালী, বুড়োঠাকুর শিব, ঘাগরের (হিরণ ও পশ্চিমপাড়ার) শিব জাগ্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এতদভিন্ন সর্বাপেক্ষা জাগ্রত ও পিঠস্থান তুল্য মাঐসারের দিগম্বরীতলা অর্থাৎ অশ্বত্থতল। স্থানান্তরে ইহার বিবরণ বিবৃত হইবে। জপসার প্রস্তর-নির্মিত শিব সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুদর্শনীয় দেব প্রতিমূর্তি। এতদ্ভিন্ন বেলগাছি স্টেশনের নিকট হারোয়া গ্রামের মদনমোহনের মন্দির। বেলগাছিয়া পরগণা পূর্বে নাটোর রাজ স্টেটের অন্তর্গত ছিল। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, উক্ত মন্দির এবং বিগ্রহ নাটোর রাজবংশেরই একটি কীর্তি। এই মন্দিরাধিষ্ঠিত 'মদনমোহন' অতি সুন্দর দ্বিভুজ মূর্তি, প্রস্তর-নির্মিত ১।৷ হাত উচ্চ। মন্দিরের ব্যয় নির্বাহার্থ প্রচুর দেবোত্তর ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে।

বেলগাছিতে প্রতিষ্ঠিত চৈতন্যদেবের মন্দির অতি প্রাচীন। কেহ কেহ বলেন, ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। মহাপ্রভুর মূর্তি নিম্বকাষ্ঠের নির্মিত। মন্দিরের গায়ে নানাবিধ প্রতিমূর্তি .খাদিত আছে।

পাংশা স্টেশনের অধীন মাদাপুর গ্রাম অতি প্রাচীন; এই গ্রামে দুইটি বট বৃক্ষের নিচে লোকেরা বহুকাল যাবৎ পূজা দিয়ে আসিতেছে; বৃক্ষের তলদেশে একটি ইষ্টক-নির্মিত ক্ষুদ্র মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

পাংশা মাধবপুরে সাজি নামে এক দরবেশ ফকিরের কবর আছে। এখানে বহুকাল যাবৎ হিন্দু ও মুসলমান সিন্নি দিয়া থাকে।

যে ত্রিনাথের মেলা পূর্ববঙ্গের প্রায় সমুদয় স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে, উহার প্রথম ফরিদপুরের অন্তর্গত পালং স্টেশনের অধীন নবীপুর গ্রামে উদ্ভব হয়। অধুনা এই স্থান কীর্তিনাশার গর্ভস্থ হইয়াছে।

সাতৈর, খাবাসপুর, কার্তিকপুরে, প্রাচীন মুকসুদপুরের অন্তর্গত দিগনগরে প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে দেওয়ান সাহাওয়াজ দ্বারা নির্মিত এবং শাতরাইলে ও গেরদায় প্রাচীন মসজিদ আছে। এতদ্‌ভিন্ন মাদারিপুর ও ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে দুইটি নূতন মসজিদ নির্মিত হইয়াছে।

ফরিদপুর নগরীতে ব্রাহ্মদের একটি মন্দির নির্মিত হইয়াছে।

ফরিদপুর, কোটালিপাড়া ও গোপালগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে খ্রিস্টানদের ধর্মালোচনার ঘর নির্মিত আছে।

বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প

ভাঙা কুমারনদীতটে, চাউল, ধান্য, লবণ, খেসারি, সরিষার বাণিজ্যস্থান। বরমগঞ্জ আরিয়লখাঁ তীরে, গোপালগঞ্জ মধুমতী তীরে, চাউল, পাট, লবণ, ঘৃত. মাদুর ; বোয়ালমারী ও সৈদপুর বারাসীয়া তীরে, দেশী তামাক, কাপড়, তুলা, লৌহ ও পিতল, কাঁসার জিনিস ; মধুখালি চন্দনাতীরে তামাক, লবণ ; কামারখালি চন্দনাতীরে, চাউল, সরিষা, খেসারি : জামালপুর চন্দনাতীরে, তামাক ; সেলিমাপুর, ধূলটী, আমবাড়িয়া, পাঁচরিয়া, কানাইপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বহু পরিমাণে বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হয়।

ফরিদপুর গুড়ের ও দেশী কাপড়ের জন্য ; পাংশা ও বেলগাছি দেশী কাপড়, গামছা ; ছিট প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ। গোয়ালন্দ পূর্ববঙ্গের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান, নানা স্থান হইতেই স্টিমার ও নৌকাযোগে নানাবিধ জিনিস এখানে উপস্থিত হইয়া বহু দুর-দূরান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে।

মাদারিপুর, কুমারতীরে, পাট, গুড, তৈল প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষ এই স্থানে এবং আঙ্গারিয়া, টেকেরহাট, পালং ও মসূরা প্রভৃতি স্থানে বিস্তর পাটের আমদানি হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হয়। আঙ্গারিয়ার টেকেরহাটে ও বুড়ির হাটে ইক্ষুগুড় প্রচুর বিক্রয় হয়, পালঙে পিতলকাঁসার বাসনের বিস্তর কারবার।

এতদ্‌ভিন্ন, গোয়ালা, ফতেপুর, ফাঁসিয়াতলা, মুকসূদপুর খাজুরতলা, জলিরহাট, গাবতলী, খান্দারপাড়, শ্রীপুর টেকেরহাট, বাতেবাইল, ভেড়ারহাট, বাতডাঙ্গা, গোবিন্দপুর, জয়নগর, টেঙ্গরাখোলা, ফতেপুর, ব্রাহ্মণদি, আমডউয়া, তাড়াইল, চাঁদেরহাট, বাউসখালি, দামোদরদি, আল্‌গি, কাশীয়ানী, উজানী, পুরাপাড়া, কৃষ্ণাইদিয়া, রূপাপাত, ফুলবাড়িয়া, আমগাঁ, বাইটকামারি মহারাজপুর, নগরকান্দা, ফলসী, তালমা, কবিরাজপুর, মহেন্দ্রদি, কালামৃধা, কুলপদী, হবিগঞ্জ, রাজৌর, ভাটিয়াপাড়া, পুকুরিয়া, পোড়াদহ, ডাইলবাজার, টেকেরহাট, আঙ্গারিয়া (রাজগঞ্জ) মনোহর রায়ের বাজার, চিকন্দী, মামুদপুর, গঙ্গানগর, কোঁয়পুর, নৈরা, মুলফৎগঞ্জ, ঘড়িসার, কার্তিকপুর, সেনেরহাট (বোকাইনগর), কাঞ্চনপাড়া, ডামড্ডা, বিঝারী, কালুরগাঁ, গোঁসাইরহাট, হাটরিয়া, টেঙ্গরা, ভেদেরগঞ্জ, ঘাগর, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ি, বাণীবহ, বহরমপুর, দক্ষিণবাড়ি, গইয়াতলা, পারকলা, বালিয়াভাঙ্গা, বড়ডুমুরিয়া ও সুয়াগ্রাম প্রভৃতি স্থানে হাট ও বাজার আছে। মসুরা বা ভোজশ্বরের বন্দর ক্রমে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন চৈত্র সংক্রান্তি ও বৈশাখ মাসের প্রথম দিবস নানা স্থানে এক দিবসব্যাপী মেলা বা গলৈয়া বসিয়া থাকে। বৃহৎ মেলা যে সকল স্থানে হয়, তাহা পরে উল্লেখ করা যাইবে।

পালং স্টেশনের অন্তর্গত নিম্ন শ্রেণির কায়স্থ পরিচিত শূদ্রগণ, কাঁসারিদের এবং কুম্ভকারগণের হাঁড়ি পাতিলের পাইকারি দ্বারা বিশেষ অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। উহারা মাল বোঝাই করিয়া বাকরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ময়মনসিংহ জেলার নানা স্থানে উপস্থিত হইয়া পিতল ও কাঁসার জিনিস বিক্রয় করিয়া থাকে এবং হাঁড়ি, পাতিলের বিনিময়ে ধান্য গ্রহণ করিয়া থাকে। ইঁহারা স্বহস্তে দাঁড় ও লগি ধরিয়া এবং মাথার বোঝা লইয়া যেরূপ অধ্যবসায় সহকারে কারবার চালাইয়া থাকে, তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্যের বিষয়। এই সকল পাইকারগণ মধ্যে আজকাল অনেকে বিশ ত্রিশ সহস্র টাকা সঞ্চয় করিয়াছে। এদিকে কাঁসারি ও কুম্ভকারগণও বিস্তর অর্থলভ্য করিয়া কেহ কেহ লক্ষপতি পর্যন্ত হইয়াছে। এই শূদ্র-সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্তে অধুনা প্রায় সকল নিম্নশ্রেণির হিন্দুই এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে, বহু মুসলমান হাঁড়িপাতিলের ব্যবসায় করিয়া তদবিনিময়ে ধান্য সংগ্রহ করিতেছে। এই শূদ্রজাতির বহু লোক পাঁঠা ক্রয় বিক্রয় ও মদ্যের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অর্থশালী হইয়া, উৎকৃষ্ট কায়স্থদের সহিত আদান প্রদান করিতে পর্যন্ত সমর্থ হইয়াছে। বাস্তবিক 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' এই কথার স্বার্থকতা কতকটা ইহারা যথার্থরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে।

তিলি ও সাহাগণ এ জেলার প্রধান ব্যবসায়ী ও ধনী, তাহাদের তেজারতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত; ব্যবসায়ে অর্থশালী হইয়া অনেকেই লক্ষপতি হইয়াছেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ রায় বাহাদুর উপাধি পর্যন্ত লাভ করিয়াছেন। তৎপর কাঁসারি, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক মধ্যেও ব্যবসায়ে অনেকে বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নবশাক মাত্রেই স্ব স্ব ব্যবসায় দ্বারা সুখস্বাচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন।

পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ভদ্রকায়স্থগণ মধ্যে অনেকেই নিঃস্ব। তাহাদের অধিকাংশের চাকুরির উপর নির্ভর। সেই নির্দিষ্ট বেতনে অনেক পরিবারের চলিয়া উঠা দুঃসাধ্য। যাহারা সামান্য বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, তাহার অধিকাংশে ঋণ দায়ে আবদ্ধ। দুর্ভিক্ষ সময়ে এই তিন শ্রেণির মধ্যে অনেককে যেরূপ কষ্ট পাইতে হয়, এমত আর কোন শ্রেণিতে নয়, কারণ ইহারা প্রাণান্তে অন্যের নিকট প্রার্থী হইতে চান না।

শস্য

বিলপ্রধান স্থানে ধানের চাষ অধিক হয়, অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে, পাট জন্মিয়া থাকে। তিল, সরিষা, মটর, খেসারি, কলাই, মুসুরি, ইক্ষু, তরমুজ, ফুটি, খিরই, শশা, নারিকেল, গুবাক, খেজুর, তাল, আম, কাঁঠাল এই জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জন্মিয়া থাকে।

যে ক্ষেত্রে যত জল অধিক হয়, ধান্যের ডাট তত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ২৮ ফিট গভীর জলে পর্যন্ত ধান্য জন্মে। নিম্নে কয়েক প্রকার ধান্যের নাম প্রদত্ত হইল।

১ বাঘা, ২ লেপা, ৩ মহিষকান্দী, ৪ বালিয়াবেত, ৫ বানসামর্থ, ৬ লক্ষ্মীদীঘা, ৭ দাদকালায়, ৮ লক্ষ্মীকাজা, ৯ ললজ, ১০ রাঙ্গীললজ, ১১ ঝুল, ১২ ধুলাই, ১৩ বাগবাই, ১৪ দল কচু, ১৫ গিলা সইতা, ১৬ গেবরুয়া, ১৭ ভোজন কর্পূর, ১৮ বয়রা, ১৯ কালাপুরা, ২০ গন্ধকস্তুরি, ২১ পিটীরাজ (পাতিবাজ), ২২ মাইচাল, ২৩ কাঁচকলঙ্গা, ২৪ বড় দিঘা, ২৫ বোর, ২৬ ষাইঠা শ্রীবইলাম, ২৭ বাগুনবিচি, ২৮ রাজামোড়ল, ২৯ হইলনে, ৩০ কালামাণিক, ৩০ গরেশ্বর, ৩১ খইয়া মটর, ৩২ গইরাকাজলা। মাদারিপুরের নিকটবর্তী বিশেষ পালং স্টেশনের স্থানসমূহে দেশী চাউলের আমদানি অত্যন্ত কম। বাকরগঞ্জের বালামই প্রধান অবলম্বন, তবে অধুনা ব্রহ্মদেশের আতপ চাউলের আমদানি এখানেও প্রচুর হইতেছে। এই আতপ চাউলের আমদানি নিবন্ধনে এদেশবাসী এই প্রবল দুর্মূল্যের সময়ে, প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু অচিরাৎ যদ্যপি চাউলের মূল্য কোন ক্রমে হ্রাস না পায়, তবে নিশ্চয় অনশনে বহু লোক প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে।

পাটের চাষ বৃদ্ধির সহিত ধান্যের চাষ ক্রমশই লয় পাইতেছে। পাটে প্রচুর লাভ পাইয়া মুসলমান ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায় বিশেষ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশের অবস্থা ভাল। প্রত্যেকেই টিনের ঘরের ব্যবস্থা করিয়া ও গয়না তৈয়ার করিয়া আপনার উন্নত অবস্থার পরিচয় প্রদান করিতেছে। যাহার জমি জমা নাই কেবল তাহারাই মোট বহিয়া ও কৃষাণের কার্য করিয়া দিনপাত করে। চাউলের মূল্য বৃদ্ধি সহ তাহাদের মজুরিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান বর্ষে পাটের দর ন্যূন হওয়ায় অনেক মহাজনের ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু চাষীরা তাহা অদ্যাপি অনুভব করিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ অধিকাংশ চাষী তাহাদেব পাট পূর্বেই মহাজনগণের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে; যাহারা অধিক লাভের আশায় সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, তাহারাই এখন বিপন্ন।

বাস্তবিক পাটের বাজার যদি ক্রমশ এইরূপ দুই তিন বৎসর দাঁড়ায়, তবে আর পাট বুনিতে কেহ সাহস পাইবে না। কারণ ধান্য ২/৩ বৎসর গোলাজাত করিয়া রাখা যায়, কিন্তু পাট বৎসরের অধিক থাকিলেই নষ্ট হইতে থাকে, কাজেই মূল্য কমিয়া যায়। পুরান চাউলের দাম বরং অধিক হয়। ক্ষণিক লাভাশয়ে যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ পাটের চাষ করিতেছে, তাহারাই দেশের ধান্য, চাউল দুর্মূল্য হওয়ার প্রধান পথ প্রদর্শক বা সাধারণের শত্রু। ফরিদপুর জেলায় পাটের চাষ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইয়া ধান্যের চাষ কমিয়া পড়িতেছে। অন্তত ধান্য পাট সমভাবে বপন না করিলে, দারুণ দুর্মূল্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আর উপায় নাই। স্বদেশসেবীগণের এই বিষয়ে লক্ষ রাখা কর্তব্য।

অধুনা স্বদেশি বস্ত্রের আমদানি ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে; ইহাতে তাঁতি, যুগী, জোলা-(কারিকর) দের অবস্থার বহু পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু মিলের ব্যবস্থা না হইলে, হাতে খাটিয়া প্রতিযোগিতা রক্ষার সম্ভাবনা নাই। স্বদেশি ধনীগণ কোম্পানির প্রথামত এই ব্যবসায়ের জন্য শেয়ার খুলিলে, দেশের বিশেষ কল্যাণ-সাধিত হইবে এবং উহাতেই তাঁতি, যুগী প্রভৃতি ও বহু দেশীয় দরিদ্র প্রতিপালিত হইতে পারে। কার্পাস বৃক্ষের বৃদ্ধি না করিতে পারিলে,

কাপড়ের ব্যবসায়ের উন্নতির সম্ভাবনা নাই, যাহাতে ভাল বীজ বপন করিয়া উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য।

আমাদের দেশে পূর্বে নবশাখগণই নানারূপ ব্যবসায় চালাইত। কিন্তু অধুনা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থগণও ব্যবসায় করিতে লজ্জাবোধ করেন না। দেশের পক্ষে এটি শুভ লক্ষণ। কিন্তু অনেকেরই অর্থ সংস্থাপন নাই, দশ জনে মিলিয়া কার্য চালাইবার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত হওয়া কর্তব্য। কিন্তু সাধুতাই উহার প্রধান অবলম্বন। যতদিন আমরা মন খাঁটি করিয়া এইরূপ সাধুতা রক্ষা করিয়া দশ জনের কার্য একজনে সম্পন্ন না করিতে পারিব, তত দিন আমাদের উন্নতির কোন আশা নাই। মুসলমানদের মধ্যে বহুকাল যাবৎ বাণিজ্য করিবার প্রথা থাকিলেও অতি অল্প লোকই তাহা করিয়া থাকে। চাষই অধিকাংশের জীবিকা।

নিম্নশ্রেণির মুসলমান ও হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে নৌকার মাঝিগিরি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। ঝালো ও কৈবর্তগণ এই কার্যে বিশেষ পটু। মেঘনা, পদ্মা প্রভৃতি প্রবল স্রোতস্বতীর বীচিমালা উল্লঙ্ঘন করিয়া উহারা অনায়াসে পারাপার হইয়া থাকে। কিন্তু নৌবিভাগের নূতন কোন উন্নতির আমাদের দেশে কেহ উদ্ভব করিতে সমর্থ হইতেছেন না। এবিষয়ে মস্তিষ্ক পরিচালন করা কর্তব্য।

বাদিয়া সম্প্রদায় অধুনা মুসলমান ধর্মাবলম্বী। ইহাদের কোন নির্দিষ্ট বাড়ি ঘর নাই। কেবল নৌকাযোগে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, স্ত্রী পুরুষে সমভাবে নৌকা চালাইয়া ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। নানাবিধ মনোহারি জিনিস বিক্রয় করাই ইহাদের কার্য, হাটেবাজারে ভিন্ন গ্রামে গিয়াও ইহারা ফিরিওয়ালার ন্যায় সাধারণের নিকট মনোহারি দ্রব্য উপস্থিত করিয়া বিক্রয় করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৎস্য বিক্রয় করিয়াও থাকে। বাস্তবিক ইহারা আমাদের দেশের মধ্যশ্রেণির ব্যবসায়ী। কিন্তু এই দলের কোন কোন শাখা চুরি ডাকাইতি করে বলিয়া, পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্বদাই তাহাদের প্রতি রহিয়াছে। স্বদেশির প্রতি ইহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলে বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে।

আমরা একটি উৎকৃষ্ট শিল্পের বিষয় উল্লেখ করি নাই—উহা সাতৈরের শীতল পাটি। ছয় ফুট লম্বা ও ৪ ফুট প্রস্থে একটি পাটির মূল্য ১৮৬৭ খ্রিঃ অব্দে ১৫০্ দেড় শত টাকা পর্যন্ত নির্দিষ্ট হইয়াছিল। (মিঃ হুইলের রিপোর্ট দেখ।) এই শিল্পের কতকটা অবনতি ঘটিয়াছে।

এক সময়ে ফতেয়াবাদের স্থপতিকুল বাংলার নানা স্থানে মঠ ও অট্টালিকা ইত্যাদি নির্মাণ করিয়া দিত। জপসাবাসী কায়স্থ জাতীয় রাজমিস্ত্রিগণ এবিষয়ে বিশেষ পটু ছিল। তেয়াবাদের কারিকরদিগের নিকট এই রাজদের পূর্বপুরুষ শান্তিরাম দে শিক্ষা লাভ করে। বর্তমান সময়ে যে সকল শিল্পের উন্নতি হইয়াছে, আমরা পরে তাহা উল্লেখ করিব।

১. ১৮৬৭ সালে পাউন্ড ও সিলিং-এর যে দর ছিল, তদনুসারে টাকার ও আনার হিসাব করিতে হইবে।

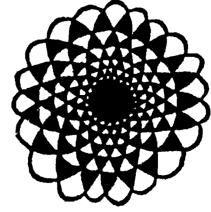
২. পূর্বে একবার উল্লেখ হইয়াছে।

৩. পূর্বে একবার উল্লেখ করা হইয়াছে।

৪. এক বার অতি বৃষ্টিতে মাঠে অত্যন্ত জল জমিয়া যায়, এমতাবস্থায় বপন কার্যের বিশেষ অসুবিধা নিবন্ধন ঐ জল নিঃসরণের জন্য এক পরিবারের বাইশটি লোক এক একখানা কোদালী লইয়া যমুনার ও পদ্মারদিগের উচ্চ ভূমিখণ্ড খনন করিয়া জল বাহির করিয়া দেয়। বর্ষার পূর্ণতা সহ যমুনার জলস্রোত

ব্রহ্মপুত্রের দিকে মন্দগতিতে চলিয়া এই পয়ঃপ্রণালীর যোগে দ্রুতভাবে পদ্মায় পতিত হইতে থাকে; ২/৩ বৎসরের মধ্যে এইরূপে যমুনাপদ্মার সংযোগে বহুগ্রাম প্রান্তর ভগ্ন হইয়া এই নতুন সংযুক্ত স্থান বর্ষার সময়ে দুরতিক্রমণীয় হইয়া দাঁড়ায়। বাইশকোদালে প্রথম উদ্ভব বলিয়া উহার নাম হয় 'বাইশ কোদালিয়া'।

২. "Japasa the pagoda seen in both rivers".



ফরিদপুরের প্রাকৃতিক বিবরণ

তিনটি জেলার আংশিক সমবায়ে ফরিদপুর জেলার পূর্ণ বিকাশ। তন্মধ্যে ১ম ঢাকা, ২য় যশোহর, ৩য় বাকরগঞ্জ। প্রাচীনত্ব হিসাবে ঢাকার অংশই শ্রেষ্ঠ; অতএব উহার বিবরণই প্রথম উল্লেখ করা কর্তব্য। ঢাকা জেলা হইতে যে সকল স্থান বিচ্ছিন্ন হইয়া ফরিদপুরান্তর্গত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিক্রমপুরের দক্ষিণাংশ অতি প্রাচীন স্থান। এতৎসম্বন্ধে জানা যায় যে, ঐ ভূভাগ পূর্বে সমতট বঙ্গের অন্তর্গত ছিল; পরে রাজা বিক্রমাদিত্য কতককাল ঢাকার দক্ষিণাংশে অবস্থান করায় ঐ অংশ বিক্রমপুর আখ্যা প্রাপ্ত হয়।[১] কেহ কেহ বলেন যে বিক্রমশালী সেন রাজগণই তাহাদের প্রিয় নিকেতনটিকে 'বিক্রমপুর' নাম প্রদান করেন। যাহা হউক 'বিক্রমপুর' নাম যত দিবসেরই হউক না কেন, সমতট বঙ্গের অন্তর্গত থাকায়, উহা যে খ্রিস্টিয় অব্দারম্ভের পূর্বেই স্থলভাগে পরিণত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অতঃপর যশোহর হইতে যে ভূভাগ বিচ্ছিন্ন হইয়া ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহাও কম প্রাচীন নয়। ভুষণা ও ফতেয়াবাদের বিবরণ আমরা মোগল রাজত্বের পূর্ব হইতেই প্রাপ্ত হই। আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরীতে ফতেয়াবাদের নাম উল্লেখ আছে।[২] তবে ঐ ভূভাগ কত কালের, তাহা স্পষ্ট অনুমান করা যায় না। কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পিঞ্জরী এবং ইদিলপুরের অন্তর্গত সামন্তসার গ্রামের পরিচয় সেনরাজগণের সময় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে অনুমান হয় যে, ফতেয়াবাদ বিভাগ ও তন্নিকটস্থ কতক স্থান অন্তত সহস্র বৎসর পূর্বে নিশ্চয় স্থল ভাগে পরিণত হইয়াছিল।

'সমতট বঙ্গের নিম্ন দিয়া পূর্বে সাগর-স্রোত প্রবাহিত হইত, ক্রমে চড়া পড়িয়া উহা বহু শত ক্রোশ পর্যন্ত ভূভাগরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সম্যক্‌রূপে উহাব জল নিঃসরণ না হওয়ায়, কোথাওবা হ্রদাকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। এ সকল হ্রদ সাধারণতঃ 'বিল' নামে অভিহিত। এইরূপ বহু বিলের সমষ্টিতে ফতেয়াবাদ বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। আরিয়লখাঁ নদীর পশ্চিমপ্রান্ত হইতে মধুমতী নদীর পূর্বতট পর্যন্ত যে কোন স্থানে খাল বা পুষ্করিণী খনন করা যায়, সেই স্থানের মৃত্তিকার কিছু নিম্নেই একটা কাল স্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভীট দাম পচিয়া যেরূপ মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়, উহা সাধারণতঃ ঠিক তদনুরূপ। এজন্য বোধ হয়, বিস্তৃত বিলের উপর যে সকল ভীট দাম ছিল, কালক্রমে উহাই পচিয়া এইরূপে মৃত্তিকা রাশির সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহাতে ক্রমে স্থলভাগের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। এইরূপ বহু বিলের বিলয়ে ফতেয়াবাদ বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। ফতেয়াবাদের অধিকাংশ অধুনা ফরিদপুর বিভাগের অন্তর্গত। বোধ হয়, ফরিদপুর পূর্বে এই ফতেয়াবাদের অন্তর্গত ছিল।'[৩]

প্রবাদ আছে, পূর্বে এই স্থান বহু জলা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকায়, কেহই আবাদ করিয়া উঠিতে পারে নাই। পরে ফতে আলি নামে এক মুসলমান বহু আয়াসে, এই স্থানে মনুষ্য-বাসোপযোগী করিয়া উঠাইলে, উহার নাম হয়, ফতেয়াবাদ।

পরে বাকরগঞ্জ জেলা হইতে যে স্থানগুলি খারিজ হইয়া ফরিদপুরের অন্তর্গত হইয়াছে, উহার ঐতিহাসিক তত্ত্বও ঐরূপ। কারণ, বাকরগঞ্জের অধিকাংশ স্থান পূর্বে সাগরজলে নিমজ্জিত ছিল, পরে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা কর্তৃক উচ্চ ভূপৃষ্ঠ হইতে পঙ্কিল মৃত্তিকা ও প্রস্তরবাশি

বিধৌত হইয়া স্রোতোবেগে যে স্থানে আসিয়া কতকটা স্থির হইয়া থাকিতে পারিয়াছে, তথায়ই চড়া বা দ্বীপবৎ স্থানের সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। বাংলার 'দ্বীপ' 'ডাঙ্গা' 'কূল' প্রভৃতি যে সকল স্থানের সহিত সংযোগে দেখা যায়, তাহাদের উদ্ভব, প্রায়ই এইরূপ উপায়ে, সংঘটিত হইয়াছে।

আবার ভূকম্প বা অত্যধিক জলপ্লাবন দ্বারাও অনেকরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে। উহাতে কোন স্থানের অধঃপতন ও কোন স্থানের উন্নয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী 'ব' দ্বীপবৎ ভূভাগে নদীর বিপর্যয়ে সময় সময় নানারূপ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। সমুদ্রোপকূলেই সাধারণতঃ ঘন ঘন পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

পূর্ব-দক্ষিণ বঙ্গের নিকট মহাসমুদ্র থাকায় অনেক বড় নদী উহার বক্ষ ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এজন্য বন্যাদি দ্বারা সমুদ্রজল-বৃদ্ধির সহিত ও নদীর গতি পরিবর্তন সহকারে এ ভূ-ভাগের বিপর্যয় প্রত্যেক শতাব্দীতে কিছু না কিছু অবশ্যই হইয়া থাকে। পদ্মার তীরস্থ স্থানগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলেই ইহা পরিলক্ষিত হয়। চাঁদ রায় ও কেদার রায় যখন বিক্রমপুর শাসন করিতেন, তখন উহা কতকগুলি দ্বীপসমষ্টি ছিল মাত্র[৪]। কোন বৃহৎ নদী বিক্রমপুরের মধ্যে ছিল না, এখন কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা এস্থলে নদীর গতির পরিবর্তন সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রদান করিলাম।

প্রবাদ অনুসারে জানা যায়, পদ্মা নদী ফরিদপুরের ২৫ মাইল উত্তরে 'সেলিমপুর' গ্রামের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া কানাইপুরের নিকট দিয়া পূর্বমুখে প্রবাহিত হইত। পরে ফরিদপুরের নিম্নস্থ ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী সহ সম্মিলিত হইয়াছিল, পরিণামে ঐ ক্ষুদ্র নদীই প্রবল পদ্মারূপে পরিণত হইয়া উহার পূর্বতন প্রবল খাতটিকে মরা-পদ্মারূপে পরিচিত করিয়াছে। ৬০/৭০ বৎসর গত হইল মধুখালি বন্দরটি চন্দনা নদীর দক্ষিণ-তীরে অবস্থিত ছিল। ক্রমে নদীর গতি পরিবর্তিত হইয়া বন্দরের দক্ষিণ দিক দিয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে, বন্দরটি আবার উঠিয়া নদীর দক্ষিণ পারে সংস্থাপিত হয়।

৪৮/৪৯ বৎসর পূর্বে বৈকুণ্ঠপুর চন্দনা নদীর উত্তর পারে অবস্থিত ছিল। কিন্তু নদীর গতি পরিবর্তন হইয়া এখন ঐ গ্রাম নদীর দক্ষিণ পার হইয়া পড়িয়াছে।

পদ্মার পরিবর্তন সর্বাপেক্ষা সমধিক সংঘটিত হইয়া থাকে। অতি পূর্বকালে পদ্মা নদীর মোহানা ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা স্থান অতিক্রম করতঃ মেঘনার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। মিঃ রেনেল ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গের যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায়, পদ্মা বিক্রমপুরের বহু পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া, ভুবনেশ্বর নামক একটি নদীর সহিত মিলিত হইয়া বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মেহেদিগঞ্জ থানার মধ্য দিয়া মেঘনার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। এখন ভুবনেশ্বর সম্পূর্ণ স্বীয় অস্তিত্ব হারাইয়া 'আরিয়লখাঁ' নাম ধারণ করিযাছে। সাধারণতঃ কন্দর্পপুর মোহনাই পূর্বে পদ্মা ও মেঘনার সম্মিলন স্থান ছিল। তখন 'কীর্তিনাশা' বা 'নয়াভাঙ্গনি' নামে কোন নদীর পরিচয় ছিল না। বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজনগর ও ভদ্রেশ্বর গ্রামের মধ্যে একটা অপ্রশস্ত জলপ্রণালী বর্তমান ছিল। উহা প্রাচীন কালীগঙ্গার শেষ চিহ্ন মাত্র। শ্রীপুর, নওপাড়া, ফুলবাড়িয়া মুলফৎগঞ্জ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রাম, কালীগঙ্গার তটেই বিদ্যমান ছিল।[৫] পরে শত বৎসরের মধ্যে কীর্তিনাশা উদ্ভুত হইয়া বিক্রমপুরের মধ্য ভেদ করিয়া এবং নয়াভাঙ্গনি আবির্ভূত হইয়া ইদিলপুরের প্রান্ত দিয়া পদ্মা ও মেঘনাকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়াছে।

মূল কথা, ব্রহ্মপুত্র মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া যখন প্রবাহিত হইত, তখন উহার স্রোতবেগ অতি প্রবল থাকায়, পদ্মাকে বহু পশ্চিম দিকে রাখিয়াছিল। পরে আবার যখন ব্রহ্মপুত্রের সহিত মেঘনার ততটা সম্বন্ধ রহিল না, ব্রহ্মপুত্র যমুনার সহিত মিলিত হইয়া

গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইল, তখন পদ্মার বেগই প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়া ক্রমে পশ্চিম দিক পরিত্যাগ করিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহার ফল স্বরূপই কীর্তিনাশার ও নয়াভাঙ্গনির উদ্ভব।

পদ্মার গতি পরিবর্তন অতি বিচিত্র। উহার মধ্যে হঠাৎ এমন সকল চর উৎপন্ন হয় যে, কোন স্টিমার এক সপ্তাহ পূর্বে যে জল অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, পর সপ্তাহে আর সে স্থান অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। যে স্থানে পূর্বে অল্প জল বিদ্যমান ছিল, উহাই আবার অত্যন্ত গভীর হইয়া পড়িয়াছে, দেখা যায়। তীরস্থ গ্রামগুলি ভগ্ন করিয়া এমন শ্রীভ্রষ্ট করে যে, বৎসরান্তে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া নদী-তীর হইতে পরিচিত স্থান ঠিক করিয়া লওয়া সুকঠিন হয়।

পদ্মা নদী কোন সময়ে মধুমতী ও হরিণঘাটার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য, একটি প্রধান শাখা অবলম্বন করিয়াছিল। ইহাতে নদীয়া ও যশোহর জেলার নদীগুলি প্রায়ই বন্ধ হইয়াছে, নৌকাযোগে পূর্বে এই সকল নদী বাহিয়া পশ্চিমবঙ্গে, এমন কি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও যাতায়াত করা যাইতে পারিত, স্টিমার চলাচলেও বাধা ছিল না। এখন মধুমতী ও হরিণঘাটা অবলম্বনে সুন্দরবনের মধ্য অথবা নিম্ন দিয়া পশ্চিমবঙ্গে যাইতে হয়।

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে কুষ্ঠিয়ার নিকট গড়াই নদীর বিস্তারমাত্র ৬০০ ফুট ছিল। ১৮৫৪-৫৫ খ্রিস্টাব্দে যখন রেভিনিউ অফিসার মিঃ লেম্বারটন কর্তৃক উহার পরিমাপ হয়, তখন ভদ্রখালি হইতে মীরপুর পর্যন্ত ইহার প্রসার ১৩২০ ফুট হইয়াছিল। দেখা যায় ২৭ বৎসর মধ্যে উহার শক্তি দ্বিগুণ লাভ করে। এখন আবার গড়াই নদীর উপর দিয়া ইস্টার্ন-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি কর্তৃক লৌহসেতু নির্মিত হওয়ায়, উহাব আকার খর্ব হইয়া আসিতেছে।

পূর্বে গড়াই আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ছিল; পদ্মা হইতে মধুমতী চন্দনা নদী হইয়া যাইতে হইত। এখন গ্রীষ্মকালে চন্দনার মোহানা, একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়। চন্দনা গড়াই নদীর ২৬ মাইল নিম্নে পদ্মা হইতে বাহির হইয়াছিল। উভয় নদী প্রায় চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে।

ফরিদপুর জেলার উত্তর পূর্বাংশে যেরূপ নদী কর্তৃক নানাবিধ পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে, পশ্চিম দক্ষিণ-ভাগেও তদনুরূপ বিলের সমষ্টিতে ভিন্ন রূপ দৃশ্য প্রতিফলিত করিয়াছে। জেলার উত্তরাংশ হইতে দক্ষিণাংশ ক্রমশঃ ঢালু হইয়া চলিয়াছে। পরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিলের সমষ্টিতে পর্যবসিত হইয়াছে। বিলের অধিকাংশ প্রায় জলপূর্ণ থাকিত, অধুনা অনেকটা উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফরিদপুরের নিম্নস্থ ঢোল সমুদ্র একেবারে উচ্চভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বিলের মধ্যে দিয়া অসংখ্য খালের চিহ্ন দৃষ্ট হওয়ায় প্রতীত হয় যে, এই সকল খাল দিয়া পূর্বে নদীর জল নিঃসৃত হইত, পরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, নদীর গতি ভিন্ন দিকে পরিবর্তিত এবং খালের মোহানাগুলি উচ্চ হওয়ায় নদীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। বর্ষার সময়ে এই সকল বিলগুলি প্রায় সাগর শাখাতে পরিণত হয়। যে সকল বিলে একেবারেই শস্য অথবা ধাপ থাকে না, প্রবল বাতাসের সময় নৌকা যোগে ঐ সকল স্থান অতিক্রম করিতে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়।

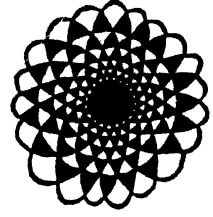
১ হন্টাব প্রণীত স্টেটেসটিকাল একাউন্ট অব ঢাকা ৭০ পৃষ্ঠা।

২. ইলিযট হিস্টরী অব ইন্ডিয়া —৬৭ পৃষ্ঠা এবং আকবরনামা ৫ম ভাগ ৪২৭ পৃষ্ঠা।

৩ ১৫৮২ খ্রিঃ অব্দে আকবব বাদসাহের শাসন সময়ে বাংলাদেশ ৩৩টি সরকারে বিভক্ত হয়। ফরিদপুর মহম্মদ আবুদের সরকারেব অন্তর্গত ছিল বলিযা বোধ হয়। হন্টার, স্টেটেসটিকাল একাউন্ট অফ ফরিদপুর ২৫৬ পৃষ্ঠা।

৪. হার্টন রেইলি রালফ ফিচ, ১১৮/১১৯ পৃষ্ঠা।

৫. হার্টন রেইলি রালফ ফিচ ১১৮/১১৯ পৃষ্ঠা—রালফ ফিচ এই নদীটিকে কেবলমাত্র গঙ্গা বলিয়া যাওয়ায় শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় এটিকে পদ্মা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নয়। তৎকালে পদ্মা অপেক্ষা বরং মেঘনা নদী শ্রীপুর গ্রামের নিকটবর্তী ছিল। চরকালীগঙ্গা বলিয়া যে মহালের পরিচয় ফরিদপুরের কালেক্টরের তৌজীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই কালীগঙ্গাভরাট মহাল। কালীগঙ্গার অধিকাংশ এখন কীর্তিনাশার অঙ্কে বিলীন হইয়া গিয়াছে।



প্রাচীন ইতিহাস

বিক্রমপুর ও সেন রাজবংশ

যে সুপ্রসিদ্ধ সেনরাজগণ বঙ্গে অবস্থান করিয়া, ভারতের নানাস্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহারা কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ সাগ্নিক বিপ্র আনয়ন করিয়া বঙ্গে প্রথমত শ্রৌত যজ্ঞকার্যের অবতারণা করেন; যাহাদের নিকট ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ কুলোৎপন্ন গুণিগণ কৌলীন্য মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং যাহাদের শাসনপ্রভাবে দুষ্ট দমিত ও শিষ্ট পালিত হওয়ায় বঙ্গে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই রাজাদের বাসস্থান বিক্রমপুর ছিল। বিক্রমপুরের আলোচনা করিতে হইলে সেন রাজাদিগের কথা প্রথমেই মনে পড়ে। সুতরাং তাহাদের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা পাঠকের বিরক্তিকর হইবে না। অপর চাঁদ রায় ও কেদার রায়, পরে বিক্রমপুরের আধিপত্য লাভ করিয়া বাদসাহের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই; এই কারণে বাদসাহের প্রেরিত সেনাপতি রাজপুত বীর মানসিংহের বিক্রমপুর পর্যন্ত আগমন করিতে হইয়াছিল। অতএব এইরূপ প্রসিদ্ধ স্থান সম্বন্ধে কিছু বলিলে বোধ হয় বঙ্গবাসী মাত্রেই উহা শুনিতে কতকটা ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন। আমরা এই সাহসের উপর নির্ভর করিয়া বিক্রমপুরের কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত বিবিধ প্রদেশের তুলনায় বিক্রমপুর অতি প্রাচীন স্থান। যখন গৌড়, নবদ্বীপ, সোনারগাঁ, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানগুলির নাম জনগণের শ্রুতিগোচর হয় নাই, তৎপূর্বে বিক্রমপুরের পূর্ণ বিকাশ। ঢাকা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানগুলি বিক্রমপুরের বহু পরে বিকাশ পাইয়াছে।

নবম শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরব্যাপী কতকগুলি স্থান 'সমতট' নামে পরিচিত ছিল। তখন বিক্রমপুর এই সমতট আখ্যা প্রাপ্ত স্থানের অন্তর্গত ছিল। বর্তমান সময়ে আমরা সমুদ্রতীর পর্যন্ত যে স্থানগুলি অবলোকন করি, সমতট আখ্যা প্রাপ্তির সময়ে উহার অধিকাংশ স্থান জলগর্ভ হইতে উত্থিত হয় নাই। মিঃ বিভারেজকৃত বাকরগঞ্জের ইতিহাস পাঠ করিয়া জানা যায় যে, বিক্রমপুরের দক্ষিণভাগে বিস্তৃত জলরাশি বর্তমান থাকিয়া দক্ষিণ বঙ্গকে একরূপ নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে দুই একটি দ্বীপবৎ স্থান মাত্র লোকলোচনের আয়ত্ত হইত। এইরূপ চড়া পড়িয়া ইদিলপুর, চন্দ্রদ্বীপ, সাহবাজপুর, হাতিয়া, সন্দ্বীপ প্রভৃতি স্থানের উৎপত্তি হয়। নবদ্বীপ অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানগুলির উৎপত্তিও পরে হইয়াছে। মিনহাজ-ই-সিরাজ তাহার 'তবকতই নাসিরি' গ্রন্থে এই সমতটকে কোন স্থানে 'সনকট' কোথাও 'সকাট' বা 'সাকাট' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

• খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রথম সমতট নামের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তরে ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্য নদ, পূর্বে মেঘনা নদ, দক্ষিণে বঙ্গ অখাত, পশ্চিমে ভাগীরথী, এই চতুঃসীমান্তবর্তী স্থান সমতট নামে কথিত হইত।

হিউএন সাহের সময়ে বঙ্গদেশের যে কয়েকটি বিভাগ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে সমতটের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈদ্যবংশীয় রাজা আদিশূর[১] বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল নামক স্থানে বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া, কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই সকল বিপ্রেরা যোদ্ধৃবেশে আগমন করায়, রাজা বিরক্ত হইয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। কিন্তু বিপ্রগণ বুঝিতে পারিলেন যে, রাজা তাহাদের বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বিরক্ত হইয়াছেন, অতএব তাহাকে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব দেখাইবার ব্যপদেশে তাহারা মৃত মল্লকাষ্ঠে আশীর্বাদী পুষ্প (যাহা রাজাকে প্রদান করিবার জন্য আনিয়াছিলেন।) স্থাপন করিলেন; দেখিতে দেখিতে শুষ্ক কাষ্ঠ পুনরুজ্জীবিত হইয়া, পত্রপুষ্পে পরিশোভিত হইয়া উঠিল। অনুচরেরা রাজাকে এই বিস্ময়কর বিষয় অবগত করাইল। আদিশূর তখন স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ম্রিয়মাণ হইয়া স্বয়ং অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে নানারূপ স্তব স্তুতিবাদে সন্তুষ্ট করিলেন। পরে তাহাদিগকে রাজভবনে আনিয়া ঈপ্সিত কার্যান্তে বহু পরিমাণে ধনরত্ন প্রদান করিলেন।

বিক্রমপুরের পূর্বোত্তর প্রান্তে মেঘনা নদীর পশ্চিম তটে রামপাল নামক গ্রাম অদ্যাপি বর্তমান আছে, উহা ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জ সাব ডিভিসনের অধীন। এই স্থানে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার খাত বর্তমান আছে। কেহ কেহ বলেন যে, রামপাল নামীয় কোন রাজা কর্তৃক এই জলাশয় খনিত হওয়ায়, তাহার নামানুসারে স্থানের নাম রামপাল হইয়াছে। এই স্থানে কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ অদ্যাপি বর্তমান আছে। কতকগুলি দেব দেবীর প্রতিমূর্তি এখানে মৃত্তিকা গর্ভে পাওয়া যায়, সেগুলি সম্প্রতি ঢাকা নগরীতে রক্ষিত হইয়াছে। এই সকল কারণে প্রতীতি হয়, পূর্বকালে এই স্থানে একজন পরাক্রমশালী রাজার রাজধানী ছিল। আরও প্রবাদ যে, পূর্বে অনেক ইতর লোক বনে কাষ্ঠ কর্তন করিতে গিয়া, কি মাঠে হলচালনকালে এই স্থানে অনেক স্বর্ণ, রৌপ্য ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। এক বার ৮০ হাজার টাকা মূল্যের এক খণ্ড হীরক এই স্থানে পাওয়া গিয়াছিল।[২] সেনরাজগণের সুবিশাল ও পরাক্রান্ত রাজ্য যদিও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের বাসস্থান বর্তমান থাকিয়া আজিও তাহাদের মহৈশ্বর্যের ও কীর্তির চূড়ান্ত নিদর্শন লোক পরম্পরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

সেনরাজগণ সম্বন্ধে আজ কাল বড়ই গোলযোগ চলিতেছে, পূর্বে তাহারা এই দেশে বৈদ্য বলিয়াই বিখ্যাত ছিলেন। সম্প্রতি কেহ তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়, কেহ কেহ বা কায়স্থ প্রমাণ করিতে বিশেষ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। নানাবিধ তাম্রশাসন ও প্রস্তর ফলক নিত্য নূতন আবিষ্কৃত হইয়া, তাহার সাক্ষী স্বরূপ আবির্ভূত হইতেছে। ঐ সকল শাসনে কি ফলকে যে যে শ্লোকাবলী অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহার অর্থ লইয়াও বাদানুবাদ চলিতেছে। বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ সকল মূল শাসনপত্র অনেকগুলিই পাওয়া যায় না ; আবার তাহাদের সময় ও বংশাবলী লইয়া অন্য দিকে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়াছে। এ পর্যন্ত আমরা শুনিয়া আসিতেছিলাম, বল্লালের অধস্তন সপ্তম কি অষ্টম পুরুষে লক্ষ্মণ বা লাক্ষ্মণীয়া মুসলমান ভয়ে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পলায়ন করেন। কিন্তু সম্প্রতি আবার ইতিহাস পাঠ করিয়া জানিতেছি, মুসলমানগণ বল্লাল পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সময়েই বঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন। পলায়িত রাজা প্রথমত পুরুষোত্তমে, তৎপশ্চাৎ তাহার জ্ঞাতিদের রাজ্য বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।" ১১৮১ শকাব্দে (১২৬৭ খ্রিঃ) যখন মিনহাজ স্বীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তখন তিনি লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মণ সেনের উত্তর পুরুষগণ অদ্যাপি বঙ্গদেশ শাসন করিতেছে। তৎপর 'তওয়ারিখ ফিরোজসাহী' লেখক 'জই বারণি' লিখিয়াছেন (১২৮০ খ্রিস্টাব্দে) সুলতান 'বুলবন' যখন বিদ্রোহী শাসনকর্তা মুঘিসুদ্দিন তুগ্রলকের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া জাজনগর (ত্রিপুরা) অভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সময় বঙ্গেশ্বর দনুজ রায় সম্রাটকে যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, লক্ষ্মণ সেন নদীয়া হইতে পালাইলে পরও, ৭৫ বৎসর এই রাজ্য তাহার উত্তর পুরুষের হস্তগত ছিল।'

নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় এই যে, আজকালকার ঐতিহাসিক গবেষণাবুদ্ধির পরিমাণ বুঝিতে আমরা যথার্থই অক্ষম। যে সকল মহাশয়েরা এত পরিশ্রম করিয়া উল্লিখিত কথাগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের তালিকায় বল্লালের অধস্তন অষ্টম পুরুষে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দেবের সময় বঙ্গদেশ মুসলমান করকবলিত হইয়াছিল, স্পষ্ট উল্লেখ আছে; আজ কি না তাহাদের মতও পরিবর্তিত হইয়া বল্লাল পুত্র লক্ষ্মণের সমকালেই বঙ্গে প্রথম মুসলমানাধিপত্য স্থাপন স্থিরীকৃত হইতেছে। আরও আশ্চর্যের কথা, যেমন আদিশূরের নামান্তর বীরসেন ধরিয়া লইয়া একটা প্রমাণের স্থান বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে, তেমন আবার 'দনুজ মাওধাকে' দনুজমর্দন ঠিক করিয়া, চন্দ্রদ্বীপের রাজসিংহাসনে উপবেশন করাইতেও কম অনুষ্ঠান করা হয় নাই; কারণ চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ কায়স্থ দে বংশ। বল্লাল সেনের নামের পশ্চাতে এই দেব উপাধি সংযোগ করিয়া এইজন্য এতকাল লেখাপড়া চলিয়াছিল। পরে একেবারে তাহারা বিক্রমপুরের জীর্ণ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া বাকলার নূতন সিংহাসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। ইহা অপেক্ষা লেখক মহাশয়েরা যদি ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় দে উপাধিধারী চাঁদ রায় ও কেদার রায়কে সেনবংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন, তবে বরং অধিক সঙ্গত বোধ হইত। বিক্রমপুর মুসলমান করতলগত হইলে বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপ যে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, এই কষ্ট কল্পনা না করাই সুসঙ্গত।

যাহা হউক, সেনরাজগণ মধ্যে লক্ষ্মণ সেন আপনাকে বিক্রমপুরবাসী বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] আজকাল আবার স্থানমাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার আশায় কেহ কেহ গৌড়নগরকে সেনরাজগণের সর্বপ্রথম রাজধানী বলিয়া নির্দেশ করিবার জন্য যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতেছেন। রামকে শ্যাম, জলকে স্থল, বানানো আজকালকার ঐতিহাসিক গবেষণার একটা অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ দেখিয়া, কেহ বা না দেখিয়া ঢিল ছুড়িতেছেন, যেটা যথায় গিয়া পড়ুক না কেন।

সেনরাজগণ বিক্রমপুরবাসী ছিলেন, হয়ত রাজকার্যের সুবিধার জন্য তাহারা গৌড়দেশেও একটা রাজধানী করিয়া. তথায় সময় সময় অবস্থিতি করিতেন। তৎপর তথা হইতে গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে রাজধানী সংস্থাপিত হয়। কৌলীন্য মর্যাদা বিক্রমপুর হইতেই সর্বপ্রথমে বিতরিত হয়; তৎপর কেন যে সদ্‌বংশজগণ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা অবধারণ করিতে গেলে বল্লাল সম্বন্ধে কতকগুলি দোষারোপ করিতে হয়। গোপালকৃষ্ণকবীন্দ্রবল্লভকৃত অম্বষ্ঠসম্পাদিকাতে বল্লালের দোষের বিষয় উল্লেখ আছে; কিন্তু অন্য কোন কুলজি লেখকেরা তদ্বিষয়ে কিছু বলেন নাই। আমরা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম বারেন্দ্রকায়স্থকুলপঞ্জিকাকার (ঢাকুরে) কবীন্দ্রবল্লভকৃত গ্রন্থের বহুপূর্বে তদ্‌বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তথাপি বৈদ্যজাতি এই অপবাদের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন। নিম্নে বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকার এই কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা—

"একদিন রাজা গেলা মৃগয়া করিতে।
ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগ হইল আচম্বিতে ॥
ত্যজিয়া বিপিন রাজা গেলা লোকালয়ে।
তথায় বসতি করে ডোমের আলয়ে ॥
সেই রাত্রি তথায় রহিল উপবাসী।
মিলিলেক ডোমকন্যা প্রাতঃকালে আসি

* * *

বিবাহ করিব বলি লইয়া আইলা।
যেবা শুনে যেবা জানে শত নিন্দা কৈলা ॥

যদি কালক্রমে রাজা শুনে নিন্দাবাণী।
সর্ব্বস্ব হরিয়া তারে তাড়ায় তখনি ॥

* * *

এত বলি রাজসুত মন দুঃখ পেয়ে।
চলিল পিতার কাছে ক্রোধান্বিত হয়ে ॥

* * *

জলের দৃষ্টান্তে বলে রাজাকে বচন।
পরম পবিত্র হইয়া নীচেতে গমন ॥
ইঙ্গিতে বুঝিয়ে রাজা কহে প্রত্যুত্তর।
হস্তীকে ভ্রমর হয়ে দিলেক ঝঙ্কার ॥
অনেক ভাবিয়া রাজা বিবাহ না কৈল।
তথাপি ডোমের কন্যা ছাড়িতে নারিল ॥

এই উপলক্ষ করিয়া বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের মধ্যে কয়েকটি শ্লোক লেখালেখি হয়, তাহাও বারেন্দ্রকায়স্থকুলপঞ্জিকা 'ঢাকুরে' স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

কি জন্য সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থগণ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তৎসম্বন্ধে ১৩০৫ সনের কার্তিক মাসের নির্মাল্য পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

'বহুকাল যাবৎ বিক্রমপুর উৎকৃষ্ট বৈদ্যগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। প্রবাদ, বৈদ্য রাজা বল্লাল সেন ও তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেনের পরস্পর সংঘর্ষণে সদ্বংশজ বৈদ্যেরা বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া সুদূর পঞ্চকূট প্রদেশে প্রস্থান করেন। রাজা আদিশূরের এবং বল্লাল সেনের সমকালে যদিও উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি দ্বারা বিক্রমপুর পরিপূর্ণ ছিল, তথাপি তৎপর হইতে নানা কারণে ঐ সকল বংশসম্ভূত কুলীনসন্ততিগণ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই জন্য ব্রাহ্মণ মধ্যে রাঢ়ী বারেন্দ্র; বৈদ্যদিগের মধ্যেও রাঢ়ী, বঙ্গজ পঞ্চকূট, বরেন্দ্র; এবং কায়স্থগণ মধ্যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ প্রভৃতি সমাজের সৃষ্টি হয। এইটি নিঃসন্দেহ যে, কৌলীন্য প্রথা প্রথমত বিক্রমপুর হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল, তৎপর নানা কারণে কেন যে এইরূপ বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, তাহা অবধারণ করা সুকঠিন। তবে কোন কোন বৈদ্যকুলপঞ্জিকা এবং বারেন্দ্র কায়স্থকুলপঞ্জিকা (ঢাকুর) প্রভৃতি পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে বল্লালের কতকগুলি দোষনিবন্ধন সামাজিকগণ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অথবা বোধ হয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বহুসংখ্যক হিন্দু গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়াছিল, তন্নিবন্ধনও বা বিক্রমপুরের এইরূপ শোচনীয় দশা সংঘটিত হইয়া থাকিবে।"

উল্লিখিত কারণ ভিন্ন, উহার আর একটি প্রধান কারণ রাজধানী পরিবর্তন। যখন গৌড়ে রাজধানী স্থাপিত হইল, তখন অনেক লোক রাজধানীতে ও তন্নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করিতে আরম্ভ করিল। পরে যখন নবদ্বীপে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তথায় ক্রমে বহু জনগণ বাড়ি ঘর করিয়া অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করিল এবং গঙ্গাতীর বলিয়া সেই স্থান ও তন্নিকটবর্তী স্থানগুলি বহুসংখ্যক হিন্দুর আবাসস্থানে পরিণত হইল। কেবল তীর্থ বলিয়া তথায় এত লোকের সমাগম হইয়াছিল না। রাজধানীর সন্নিহিত ও তীর্থ, এই দুই উপলক্ষ করিয়া পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু গঙ্গাতীর ও তন্নিকটবর্তী স্থানগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বল্লাল সেনের কতকটা অসদাচরণ যে উহার কথঞ্চিৎ পরিপোষক হইয়া উঠিয়াছিল, তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই।[৪]

আদিশূর ও সেনরাজগণের সময় লইয়া বড়ই গোলমাল চলিতেছে। কেহ বলিতেছেন, পাঁচটা তিন মিনিট দুই সেকেন্ডের সময়, লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনচ্যুত হন এবং বঙ্গে যবনাধিকার আরম্ভ হয়;—কেহ বলেন, তোমার গণনা শুদ্ধ হয় নাই। আমি সিদ্ধান্ত করিয়া দেখিয়াছি, চারি ঘটিকা পৌনে তিন মিনিটের সময় লক্ষ্মণ সেন খিড়কীর দরজা অতিক্রম করিয়া পুরুষোত্তম প্রস্থান করিয়াছিলেন, তখনই প্রকৃতরূপে যবনাধিকার আরম্ভ হইয়াছিল, এই ত নানা মুনির নানা মত। এইরূপ সন তারিখ লইয়া যখন নানারূপ গোলযোগ অদ্য পর্যন্ত চলিতেছে, তখন তৎসম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া, সেনরাজগণের রাজত্বের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি যে, তাহারা নবম শতাব্দীর অন্তভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত নির্বিবাদে বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহাদের উত্তর পুরুষের আরও কয়েকজন পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তৎপর তাহাদের রাজ্যের অবসান হয়। ত্রয়োদশ হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিক্রমপুরের চরম পতন হয়, তখন মুসলমান শাসনকাল—পাঠান বংশ দেশের রাজা, তাহারা পূর্ববঙ্গের রাজধানী বিক্রমপুর হইতে সোনারগাঁয়ে স্থানান্তরিত করেন।

আইন-ই-আকবরি গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, মোগল শাসন সময়ে সরকার সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত নিম্নলিখিত পরগণাগুলি ছিল, যথা — ১ অবতার সাহপুর, ২. আনচাপ, ৩. অবতার ওসমানপুর, ৪. বিক্রমপুর, ৫. বেলা জোওয়ার, ৬. বলদাখান, ৭. বোয়ালিয়া, ৮. পারচাঁদে, ৯. বাটখারা. ১০. পলাশবাটি, ১১. চরদিয়া, ১২. ফুলরী, ১৩. পানহাটী, ১৪. তাতরা, ১৫. তাজপুর. ১৬. তিরকী, ১৭. যোগীদিয়া, ১৮. জেওয়ার বন্দর, ১৯. চোকেন্দী, ২০. চণ্ডীহার, ২১. চাঁদপুর, ২২. হাবেলী সোনারগাঁ মরু শহর, ২৩. খিজিরপুর, ২৪. দৌহার, ২৫. ডানডেরা, ২৬. দক্ষিণ সাহপুর, ২৭. দেওয়ানপুর, ২৮ দেকান ওসমানপুর, ২৯. রায়পুর, ৩০. সুখারগঞ্জ, ৩১. সুকেরী, ৩২. সোলিমপুর, ৩৩. সেলিসেবি, সর জলকর, ৩৪. সুকাওশা, ৩৫. সুকদিয়া, ৩৬. সেবারচল, ৩৭. শমসপুর, ৩৮. কড়াপুর, ৩৯. গবদী, ৪০ কার্তিকপুর, ৪১. কাঁদী, ৪২. কোলহরি, ৪৩. ঘাটিদুনাই, ৪৪. মারকোর, ৪৫. মজমপুর, ৪৬. মেহার, ৪৭. মনোহরপুর, ৪৮. সাহীজল, ৪৯. নারায়ণপুর, ও সায়র জেকাত, ৫০. লেপুয়াকোট, ৫১. হিমতীবাজু. ৫২. হাটঘাটী, এই বায়ান্ন মহালের রাজস্ব ১০,৩৩,১৩,৩৩৩ দাম। তন্মধ্যে বিক্রমপুর পরগণার রাজস্ব ৩৩,৩৫,০৫২ দাম[৫] অর্থাৎ সমগ্র মহাল মধ্যে বিক্রমপুরের রাজস্ব সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল দেখা যায়। সম্প্রতি কার্তিকপুরবাসীরা আপনাদের বসতির পরিচয় স্থলে বিক্রমপুরের নামোল্লেখ করিয়া থাকে, বাস্তবিক কার্তিকপুর একটি পৃথক পরগণা বলিয়া বহুকাল যাবৎ উল্লেখ দেখা যায়। মহালের নাম গণনায় পাঠকগণ দেখিবেন উপরে কার্তিকপুরকে পৃথক ধরা হইয়াছে। উহার বার্ষিক কর ৮০,০০০ দাম। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পঞ্চম রিপোর্টেও দুটি পৃথক পরগণা বলিয়া বিক্রমপুর ও কার্তিকপুরের উল্লেখ দেখা যায়। উপরে যে সকল মহাল বা পরগণার নামোল্লেখ করা হইয়াছে, উহার অধিকাংশ অধুনা ঢাকা, ফরিদপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, এই চারি জেলাতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। কার্তিকপুর ও বিক্রমপুরের কতকাংশ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত, বিক্রমপুরের অধিকাংশ ঢাকা জেলার অন্তর্গত।

বিক্রমপুর, কার্তিকপুর ও চাঁদপুর সরকার সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত এবং ইদিলপুর সরকার বাকলার অন্তর্গত এবং সন্দ্বীপ ও সাবাজপুর সরকার ফতেয়া আবাদারের অন্তর্বর্তী ছিল। এখন যেমন এক এক জমিদারের জমিদারি বিভিন্ন জেলায় আছে, তখনও তদ্রূপ এক জন জমিদারের জমিদারি হয়ত পৃথক পৃথক সরকারের অন্তর্গত থাকিত। প্রত্যেক সরকারের

তহশীলদারকে (দেওয়ানকে) তদন্তর্গত মহালের জন্য পৃথকভাবে রাজস্ব প্রদান করিতে হইত। আকবরের সময় বিক্রমপুরে চাঁদ রায়ের অভ্যুদয় হয়। তাহার নামানুসারে চাঁদপুরের নামকরণ হয়, চাঁদপুর বর্তমান সময়ে ত্রিপুরা জেলার একটি সাবডিভিসন, মেঘনা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। চাঁদ রায় বিক্রমপুর, কার্তিকপুর, চাঁদপুর, সরকার সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত এই তিন মহালের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। ইদিলপুর তখন একটা চড়া স্থান মাত্র ছিল, উহা এবং সাহবাজপুর ও সন্দ্বীপ পরে কেদার রায়ের হস্তগত হয়। কারণ ইয়োরোপীয় ভ্রমণকারী যে রালফ ফিচ ১৫৬৬ খ্রিঃ অব্দে[৬] যখন এ দেশে আগমন করেন, তখন পর্যন্ত সন্দ্বীপ মোগল রাজগণের করায়ত্ত হয় নাই। মোগলেরা উহা হস্তগত করিলে পর ঐ স্থান কেদার রায়ের নিকট গচ্ছিত হয়।

অধুনা বিক্রমপুর ও মাদারিপুরের অন্তর্গত (স্থান) সম্প্রতি যে অবস্থায় পরিণত হইয়াছে, শত বৎসর পূর্বে উহার স্থানীয় অবস্থা এতদপেক্ষা বহু উৎকৃষ্ট ছিল। কীর্তিনাশা তৎকাল পর্যন্ত উদ্ভুত হইয়া বিক্রমপুরের বক্ষ বিদারণ করিয়া তাহাকে শ্রীহীনা করিয়া ফেলিয়াছিল না; নয়াভাঙ্গনি বা আরিয়লখাঁও বহু স্থানের বিলয় সাধন করে নাই। জনপূর্ণ-শ্যামল-শস্যরাজি পরিবৃত জনপদ সকল তখন লোকলোচনের যথেষ্ট আনন্দ বর্ধন করিত। মৎস্যপরিপূর্ণ ঝিল ও বিলগুলি নানাবিধ মৎস্য দানে রসনার তৃপ্তি বিধানে সতত নিযুক্ত থাকিত। বিলোৎপন্ন দাম ও তৎপার্শ্বস্থিত প্রশস্ত ক্ষেত্রোৎপন্ন ঘাসগুলি ভক্ষণ করিয়া গাভীগুলি যথেষ্ট হৃষ্টপুষ্ট হইয়া অমৃতনিভ সুস্বাদু দুগ্ধ প্রদান করিয়া জনগণকে পরিপোষণ করিত। তত্রত্য অধিবাসীরা তৎকালে চাউল, মৎস্য, দুগ্ধ যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া, স্ব স্ব পরিজন লইয়া যারপরনাই সুখে কাল কর্তন করিত। বিক্রমপুরের মত উৎকৃষ্ট ক্ষীর ও মৎস্য বঙ্গের আর কোথাও মিলিত না। এই পরগণার, পূর্ব দিকে মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র ও পশ্চিম দিকে পদ্মা নদী প্রবাহিত থাকায়, ইলিশ, ঢাইন, রোহিত প্রভৃতি সুস্বাদু নদীজ মৎস্যও তাহারা প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইত। হায়! একমাত্র কীর্তিনাশা নদীর প্রাদুর্ভাবে সেই রমণীয় স্থান এখন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, অধিকাংশ বিল ঝিল কীর্তিনাশার গর্ভস্থ হইয়া গিয়াছে, হতাবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, তাহাও আবার নদীস্রোত সংমিশ্রিত বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কৃষিক্ষেত্রগুলি লোকালয়ে পরিণত ও বালুকারাশিতে নিমজ্জিত হওয়াতে শস্যোৎপন্নের পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে। নদীগর্ভে অধিকাংশ স্থান বিলীন হওয়ায়, তত্তৎস্থানীয় লোকেরা অত্যল্প পরিসর স্থানে একত্র সমাবিষ্ট হইয়া বাস করিতেছে। এইরূপ বহু জনতার একত্র সমাবেশে, স্থানগুলি ক্রমে অস্বাস্থ্যকর হইয়া ওলাউঠার মূর্তিমতী রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে। আবার এদেশের বর্ষাকালের দশা ভাবিতে গেলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন বিক্রমপুর ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলি দ্বিতীয় সাগরশাখাতে পরিণত হয়, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাতায়াত দূরের কথা, এক গৃহ হইতে ভিন্ন গৃহে যাইতে হইলেও সাঁকো বা নৌকার সাহায্য ব্যতীত যাওয়া আসার সাধ্য নাই। বোধ হয়, বিধাতা বিক্রমপুরের ভবিষ্যৎ ভাগ্যের বিষয় গণনা করিয়াই দুইটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের সৃষ্টি পূর্ব হইতে করিয়া রাখিয়াছিলেন, উহার একটি 'ধুড়ী' নামে এক প্রকার কাষ্ঠ যান, অপরটি 'গামলা' নামে মৃত্তিকা যান। দক্ষিণ বিক্রমপুর ও ইদিলপুরবাসীগণ প্রথমটি এবং উত্তর বিক্রমপুরবাসী অবস্থাপন্ন লোকে দ্বিতীয়টি ব্যবহার করিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে ও প্রয়োজনীয় স্থানে চলিয়া বেড়ায়। এই সময় বহু হতভাগ্য লোক 'মাচা' বান্ধিয়া গৃহভিত্তির কার্য সম্পাদন করে, গৃহের মৃত্তিকা নির্মিত ভিটা সকল এই সময় স্রোতবেগে ধসিয়া পড়িয়া যায়। গৃহ মধ্যে নানাবিধ সরীসৃপ আশ্রয় লইয়া আবার আশ্রয় স্থানের মালিকের অনিষ্ট সম্পাদন করিতে ত্রুটি করে না। কত মনুষ্য সর্পদষ্ট হইয়া এই সময় মানবলীলা সম্বরণ করে।

দরিদ্রেরা গৃহবহির্গমনে অসমর্থ হইয়া এই সময় অনশন ব্রত অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। হায়! সুখপূর্ণ দেশের এই অশুভ পরিবর্তনের কথা কয় জন লোকে ভাবিয়া থাকে? এই পরগণাতে, বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য, ধনী, গুণী মনুষ্যের বাসস্থান আছে বটে, কিন্তু তাহাদের সহিত দেশের বড়ই অল্প সম্বন্ধ। কার্যানুরোধে তাহারা অধিকাংশ সময় বিদেশে অতিবাহিত করেন, দেশের দুর্দশা তাহারা বড় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন না, কাজেই তাহারা তৎপ্রতিকারেও কখন কোন আয়াস স্বীকার করা দূরে থাকুক, একবার ভাবিবারও সময় পান না। এ কথাটি যে কেবল আমরা বিক্রমপুর সম্বন্ধে বলিতেছি, তাহা নয়, ফরিদপুরের অধিকাংশ স্থান সম্বন্ধেই এই উক্তি প্রযুক্ত হইতেছে। দামোদরের বন্যায় মেদিনীপুর ও বর্ধমানের একবার মাত্র দুর্দশা করায় তাহার জন্য নানাবিধ পত্রিকায় কত লেখাপড়া চলিয়াছিল, কিন্তু আমাদের ফরিদপুরে এরূপ বন্যা প্রায় প্রতি বৎসর ঘটিয়া থাকে। তবে পূর্ব হইতে সতর্ক থাকায় মনুষ্য বা পশ্বাদির জীবনটা মাত্র রক্ষা পায়। দামোদরের বন্যার প্রসঙ্গ কাউনসেলে পর্যন্ত উঠিয়াছিল, আমাদের দুর্দশার বিষয় স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট বা কমিশনারের কর্ণগোচর হয় কি না সন্দেহ। অধুনা ফরিদপুর সম্মিলনী সভা দেশের অভাব বিমোচনে অগ্রসর হইয়াছে, আমাদের বিবেচনায় তাহাদের সর্বাগ্রে এই জলপ্লাবনের প্রতিকার জন্য যত্ন করা কর্তব্য। অবশ্য দেশ হইতে নদী তাড়াইবার সাধ্য বৃটিশ গবর্নমেন্টেরও নাই, কিন্তু যাহাতে অন্তত স্থানীয় লোকে অনায়াসে সর্বদা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলা ফিরা করিতে পারে, এইরূপ বিধান অবশ্য হইতে পারে। বর্ষার সময়ে মাদারিপুর মহকুমার অন্তর্গত তাবৎ স্থানে এইরূপ শোচনীয় ভাব ধারণ করে।

লালা রামগতি রায় কৃত 'মায়া তিমির চন্দ্রিকা' গ্রন্থ দেড় শত বৎসরের পূর্বে বিরচিত হয় নাই, তন্মধ্যে বিক্রমপুরের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেও কীর্তিনাশার উল্লেখ নাই। আমরা উক্ত গ্রন্থ হইতে সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মহাতীর্থ ব্রহ্মপুত্র পূর্বেতে প্রচার।
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার ॥
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহে সদ্‌জ্ঞানী বিস্তর ॥"

আমরা উপরে যে কবিতাটি উল্লেখ করিলাম, তৎপাঠে এই মাত্র জানা যায় যে, বিক্রমপুরের পশ্চিমে পদ্মা ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত হইত। রাক্ষসী কীর্তিনাশা তখন বিকট বদন ব্যাদান করিয়া বিক্রমপুরের দিকে অগ্রসর হয় নাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, বিক্রমপুরের পূর্ব দিকে যে বৃহৎ স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়া মেঘনা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, কবি লালা রামগতি তাহাকে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া পরিচিত করিলেন কেন? এই কথার উত্তর আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

সিদ্ধ শ্রোত্রীয়কুলোদ্ভব গোসাঞি ভট্টাচার্য নামে এক মহাত্মা বিক্রমপুরে বাস করিতেন। ভট্টাচার্য মহাশয় কেদার রায়ের গুরু ছিলেন। তৎসময় বীরাচারী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। সর্ববিদ্যা, সিদ্ধিবিদ্যা, অর্ধকালীর সন্তানেরা তখন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয়। তৎকালে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ লোক শক্তির উপাসনায় নিরত,—স্থানীয় রাজারাও শক্তি-মন্ত্র দীক্ষিত। প্রতাপাদিত্য শাক্ত ছিলেন, 'যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী' এই উক্তি যে তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ করিবার কারণ নাই। চন্দ্রদ্বীপের, ভুলুয়ার, বিক্রমপুরের অধিপতিরা সকলেই শক্তিসেবক ছিলেন। শক্তির কৃপাপাত্র হইয়া তাহারা যথার্থ শক্তি-সঞ্চয় করিয়া মায়ের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শুধু প্রেমের বন্যায় যে

কখনও মায়ের উদ্ধার সাধন হইবে, এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। প্রকৃত শাক্ত হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিলেই বরং তাহার আশা করা যায়। যাহা হউক, তৎসময় শাক্তগণের মধ্যে অনেক অসাধারণ ক্ষমতাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়া, জনগণকে যথার্থই বিমোহিত করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে গোসাঞি ভট্টাচার্য মহাশয়ের একটি ঘটনা এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে। বিশেষত এই প্রসঙ্গ পাঠ করিলে মেঘনার একাংশ কেন ব্রহ্মপুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, তাহাও বিশেষরূপে জানা যাইতে পারিবে।

একদা কেদার রায়, গুরু ভট্টাচার্য মহাশয়কে জানাইলেন, 'দেব, অশোকাষ্টমী প্রায় সমাগত, ইচ্ছা আপনার সহিত একত্র হইয়া তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্রনীরে অবগাহনান্তে পাপময় দেহ পবিত্র করি।' তখন ভট্টাচার্য সহাস্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, বৎস, তোমার বা আমার লাঙ্গলবন্ধ[৭] যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। লৌহিত্যদেব তোমার রাজধানীর পূর্ব প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, উহাতে স্নান করিলেই তোমার ব্রহ্মপুত্রে স্নান করা হইবে; তখন রাজা বলিলেন, দেব, আমার রাজ্যের পূর্ব প্রান্ত দিয়া ত মেঘনা নদী প্রবাহিত হইতেছে, উহাকে আপনি কিরূপে লৌহিত্য বলিতেছেন। তৎশ্রবণে ভট্টাচার্য, নিজ সম্মুখস্থ একটি কমলালেবু উত্তোলন করিয়া রাজাকে দিয়া বলিলেন, তুমি এই লেবুটি ব্রহ্মপুত্রের জলে যাইয়া নিক্ষেপ কর, যে স্থান হইতে স্বয়ং লৌহিত্য দেব হস্ত প্রসারণ করিয়া উহা গ্রহণ করিবেন, জানিও ততদূর পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত হইতেছে। যাও বৎস, আমার কথানুযায়ী কার্য করিয়া উহার যাথার্থ প্রত্যক্ষ কর। রাজা গুরুর আদেশে তৎক্ষণাৎ কতিপয় লোকসহ তরণী আরোহণ করিয়া ব্রহ্মপুত্র উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। তৎপর লাঙ্গলবন্ধের কতক উত্তরবর্তী পঞ্চমীঘাট নামক স্থানে যাইয়া, কমলালেবুটি ব্রহ্মপুত্র জলে নিক্ষেপ করিলেন। যেমন লেবুটি স্রোতবেগে ভাসিয়া চলিল, তৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজার নৌকাও চলিতে লাগিল, কিন্তু লাঙ্গলবন্ধ অতিক্রম করিয়া যখন লেবুটি লক্ষ্যা নদী অভিমুখে চলিল, তখন রাজার মনে একটুকু অবিশ্বাসের উদ্রেক হইল, ক্রমে যেমন কমলালেবু ভাসিয়া চলিল, রাজাও তৎপশ্চাৎ স্বীয় যান চালাইতে লাগিলেন। ক্রমে ঐ লেবুটি আসিয়া কার্তিকপুরের পূর্ব দিকে প্রবাহিত মেঘনার একটি ঘোলার মধ্যে পড়িয়া আবর্তিত হইতে লাগিল, রাজাও তথায় নঙ্গর করিয়া নৌকা রাখিয়া দিলেন। এই কথা পূর্বেই দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল, রাজার তরণী নদী মধ্যে অবস্থান করায়, চতুর্দিক হইতে নৌকাযোগে লোক আসিয়া তথায় জড় হইতে লাগিল। পরে যখন মধুশুক্লাষ্টমী তিথির আবির্ভাব হইয়া ব্রহ্মপুত্র স্নানের প্রকৃত সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সহস্র মানব দেখিতে পাইল, নদীর গর্ভ হইতে দিব্যালঙ্কারভূষিত এক দেবমূর্তির আবির্ভাব হইল। এদিকে গোসাঞি ভট্টাচার্য ঐ কমলালেবুটি নদীগর্ভ হইতে উঠাইয়া ঐ মূর্তির হস্তে প্রদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে দিব্যপুরুষ জলে বিলীন হইয়া গেলেন। দর্শকগণের আর আশ্চর্যের ইয়ত্তা রহিল না, তাহারা মুক্ত কণ্ঠে গোসাঞির গুণগান করিতে করিতে ঐ জলে অবগাহন করিয়া ব্রহ্মপুত্রস্নানের ফল লাভ করিলেন। রাজা গুরুপদানত হইয়া, তৎবাক্যের পরীক্ষা করার ত্রুটি জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরে গুরুর উপদেশানুযায়ী স্নানদানাদি করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তদবধি এই তীর্থস্থান কমলাপুর নামে বিখ্যাত হইল; অশোকাষ্টমীর দিবস প্রতি বর্ষে বহু সংখ্যক যাত্রী অদ্যাপি তথায় স্নান করিয়া থাকে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই ছিল যে, প্রতি বর্ষে ঠিক ঐ অষ্টমী দিবসে বহু সংখ্যক বক কোথা হইতে আসিয়া এই জলে স্নান করিয়া যাইত। এই জন্য এই স্থানের অপর নাম বগিধলি। প্রকৃত প্রস্তাবে মেঘনার এই অংশ প্রকৃত কমলাপুর উদরস্থ করিয়া, অনেক পশ্চিমে সরিয়া পড়িয়াছে।

কবি রামগতি একজন সাধক যোগী পুরুষ ছিলেন। মহাজনগণের এই সকল ঘটনার প্রতি

তাহার অণুমাত্র অবিশ্বাস ছিল না, এই কারণে তিনি গোসাঞি ভট্টাচার্যের কথার উপর নির্ভর করিয়া মেঘনার এই অংশকে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

গোসাঞি ভট্টাচার্য সম্বন্ধে আরও অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা শ্রুত হওয়া যায়। তন্মধ্যে যে গুলি কেদার রায়ের সহিত সম্বন্ধজড়িত আছে, তাহা পশ্চাৎ উল্লেখ করা হইবে; এমন কি, এই গোসাঞি ভট্টাচার্যের ক্রিয়াকলাপে অনাস্থা প্রকাশই কেদার রায়ের পতনের মূল কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

তথ্যসূত্র

১. অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাঢ়গৌড়বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈবচ।
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্বভূমিশ্বরো যদা।
অমাত্যৈর্বান্ধবৈশ্চৈব মন্ত্রিভির্দ্বিজবৃন্দকৈঃ।
এতৈঃ সহ মহীপাল একদা স নিজালয়ে।
উপবিষ্টা দ্বিজান্ পৃষ্টঃ ধর্মশাস্ত্রপরায়ণঃ ॥
ইতি দেবীবর ঘটককারিকা ২য় সংস্করণ
শব্দকল্পদ্রুম, ৭১২ পৃষ্ঠা।

অথ গৌড়দেশে কেন প্রকারেণ ব্রাহ্মণাগমনং তৎশৃণু। অথ সকলদিগ্দেশীয়রাজমধ্যে কলিযুগাবতার ইব নিখিল মঙ্গলালয়ঃ শ্রীলশ্রীআদিশূরো নাম রাজাসদ্বৈদ্যকুলোদ্ভবঃ পরমধার্মিক আসীৎ। ইত্যাদি। বারেন্দ্র ঘটক কারিকা; রামধন তর্কপঞ্চানন মহাশয় অতি প্রাচীন ও প্রামাণ্য কুলজিগ্রন্থ হইতে এই শ্লোকটি এবং অপর একটি শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'অপব শ্লোকটি পাঠে জানা যায় আদিশূর রাজার কন্যার কুলে বল্লাল সেন জন্মগ্রহণ করেন।

২. রামপালের বিবরণ দেখ। Taylor's Tapography of Dacca.

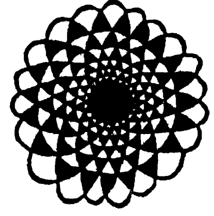
৩. মজিলপুর ২৪ পরগণা তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে উল্লেখ আছে, যথা—
'সখলু বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধ বীরা মহারাজাধিরাজঃ শ্রীবল্লাল সেন পদানুধ্যানাৎ পরমেশ্বর পরমবীরসিংহ পরমভট্টাবক মহারাজাধিরাজঃ যলক্ষ্মণদেবঃ ইত্যাদি।

৪. আর এক সমস্যা সেনরাজগণের ও আদিশূরের এতদিন বিক্রমপুর রাজধানী ও যজ্ঞস্থান বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস ছিল, অধুনা পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গবাসী কেহ কেহ গৌড়ে রাজধানী ও যজ্ঞ কার্যসম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ করিতে উদ্যোগী। কিন্তু সেন রাজগণের জাতিত্বের প্রমাণের ন্যায় এই সকল প্রমাণেরও যে বিশেষ কোন মূল্য আছে, তাহা আমাদের বোধ হয় না। এখন একটা প্রাদেশিক শাসনকর্তাই যখন ২/৩টা আড্ডা স্থাপন করিয়া এক এক সময়ে এক এক স্থানে অবস্থান করেন, তখন একটা স্বাধীন নৃপতির পক্ষে কি উহা অসম্ভব? আমাদের বিশ্বাস, তখন স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে ধর্মের প্রতি লোকের টান অধিক ছিল, এই জন্য ব্রহ্মপুত্রের সন্নিকটে বিক্রমপুর, ভাগীরথীর তীরে নবদ্বীপ এবং করতোয়া তীরে গৌড়ে পৃথক তিনটি রাজধানী সংস্থাপিত হয়। আদিশূরের যজ্ঞ বিক্রমপুরে হওয়ার প্রবাদ এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিলে চলিবে না।

৫. তাম্র মুদ্রাবিশেষ—চল্লিশ দামে এক টাকা।

৬. মিঃ বিভারেজকৃত বাকরগঞ্জের ইতিহাসের সাধারণ বিবরণ দেখ।

৭. ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের পূর্বদিকস্থ ব্রহ্মপুত্রের অংশ বিশেষ। বলরাম হল (লাঙ্গল) দ্বারা এই স্থান কর্ষণ করিয়া ব্রহ্মপুত্রে জল নিষ্কাসিত করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম লাঙ্গলবন্ধ হয়। প্রতি বৎসর অশোকাষ্টমীর দিবস এখানে বিস্তর লোকে গমন করিয়া স্নানদানাদি করিয়া থাকে।



বিক্রমপুর

চাঁদ রায় ও কেদার রায়

ষোড়শ শতাব্দীর অন্তভাগে বঙ্গদেশে কতকগুলি ভূম্যধিকারী এক মতাবলম্বী হইয়া দিল্লিশ্বরের অধীনতা হইতে, আপনাদিগকে বিমুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সাধারণতঃ তাহারা বারভুঁইয়া নামে প্রসিদ্ধ। আজিও বারভুঁইয়ার নাম বঙ্গদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই, তাহাদের কীর্তির ও কার্যকলাপের কোন কোন ভগ্নাংশ বর্তমান থাকিয়া, অদ্যাপি সেই মহানুভবগণের প্রাচীনলুপ্ত স্মৃতি জনগণের মনে ক্ষণস্থায়ী তড়িৎসদৃশ সময় সময় একটা আভাস প্রদান করিয়া থাকে।

বারভুঁইয়ার নাম লইয়া বড়ই গোলযোগ, কিন্তু তন্মধ্যে জন কয়েক নির্ব্বিবাদে দখলিস্বত্ব বজায় রাখিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে ১ম যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ২য় চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প রায়, ৩য় বিক্রমপুরের কেদার রায়, ৪র্থ ভুলুয়ার লক্ষ্ণমাণিক্য, ৫ম ভূষণার মুকুন্দ রায়, ৬ষ্ঠ ভাওয়ালের ফজল গাজী, ৭ম খিজিরের ঈশা খাঁ মসনদী আলি, ৮ম চাঁদপ্রতাপের চাঁদগাজী, এই আটজন সর্ববাদী-সম্মত ভুঁইয়া।

মিঃ বিভারিজ তৎকৃত বাকরগঞ্জের ইতিহাসের এক স্থলে লিখিয়াছেন, পাদ্রী সুইট ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে যখন বঙ্গদেশে আগমন করেন, তৎসময়ে তিনি তৎস্থানীয় দ্বাদশজন ভূম্যধিকারীর আধিপত্য সন্দর্শন ও সেই দ্বাদশজনের মধ্যে নয় জনকেই মুসলমান বলিয়া নির্দেশ করেন। আমরা এই কথার কোন ভাব পরিগ্রহ করিতে পারিলাম না। অনেকে মুকুন্দ রায়কে ভুঁইয়া না বলিয়া জমিদার শ্রেণিতে রাখিয়া, মাত্র কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, কন্দর্প রায় এই তিন জনকেই ভুঁইয়া বলিয়া অবশিষ্ট নয় জনকে মুসলমান বলিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহাদের নাম গোত্রাদি উল্লেখ করিতে পারেন না। আমাদের মতে তখন যাহারা মোগল বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কালে তাহারাই ভুঁইয়া পদবাচ্য ছিলেন।

আমাদের প্রবন্ধোক্ত কেদার রায়ের নাম বারভুঁইয়ার তালিকায় স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। চাঁদ রায়কে কেহ কেহ কেদার রায়ের ভ্রাতা বলিয়া থাকেন, কোন কোন মতে তাহারা পিতা পুত্র ছিলেন। এই রায়গণ ঘৃতকৌশিকী গোত্রীয় কায়স্থ বংশজ বলিয়া পরিচিত; আবার কেহ কেহ বা কট্‌কী কায়েথ বলিয়াও নির্দেশ করিয়া থাকেন। মূল বংশ বিশুদ্ধ না হওয়া প্রযুক্ত ঘটকেরা তাহাদের বংশাবলী কুলজীগ্রন্থে উল্লেখ করেন নাই। বিদ্বানই হউন, সাধু বা রাজাই হউন, যদি কুলের মূলে কিছু সার না থাকিত, তবে আমাদের বঙ্গীয় কুলজীলেখকেরা তাহাদের গ্রন্থে কখনও সেই সকল মহাত্মা লোকদিগকে স্থান প্রদান করিতেন না। অথচ কুলীনের অসাধু, মূর্খ সন্তানগুলির নামের তালিকা দ্বারা গ্রন্থ পূর্ণ করিতে কতই যত্ন বা প্রয়াস পাইয়াছেন। এই কারণে কি ব্রাহ্মণ, কি বৈদ্য, কি কায়স্থ, এইরূপ ভদ্র বংশসম্ভূত কত কত মহাত্মার বংশাবলীর উল্লেখাভাব প্রযুক্ত আমাদের জাতীয় ইতিহাস লেখার পক্ষে মহা অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে। একমাত্র কিংবদন্তী ও পারসি ইতিহাসে দুই চারিপংক্তিতে যদি কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবেই আমাদের একমাত্র ইতিহাস লেখার সুযোগ হয়। আমরা এই সুবিধাটি কম

মনে করি না, যদি তাহাও না পাইতাম, তবে হয়ত কত মহাত্মার অনন্ত নিদ্রার সহিত, তাহার কার্যাবলী বা গুণগ্রামের পরিচয়ও কালের অনন্ত তামসীতে চিরবিলীন হইয়া যাইত। আমরা শত চেষ্টা করিয়াও তাহার পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইতাম না।

পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ বারভুঁইয়াগণের প্রধানতম লীলাক্ষেত্র। ভাগীরথীর পূর্ব তট হইতে আরম্ভ করিয়া, বরাবর সমুদ্র তীর দিয়া বর্তমান যশোহর, খুলনা, বাকরগঞ্জ, নোয়াখালি প্রভৃতি জেলার অধিকাংশ এবং তৎপর উত্তর দিকে ফরিদপুর ও ঢাকার কতকাংশ এবং তদুত্তর পশ্চিম দিকে রাজসাহী ও পাবনা ও দিনাজপুর জেলার কতক স্থান লইয়া বারভুঁইয়াদের একটি দেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎসময়, বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীরা যেরূপ দলবল সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় উহাদের স্বাধীন হইবার আশাটা তত অসম্ভব কার্য মধ্যে পরিগণিত হইবার কথা ছিল না। তবে বিধাতা চিরকাল যাহাদের প্রতি বিমুখ, যে দেশ চিরদিন স্বজনদ্রোহী দ্বারা পরিবৃত, ভ্রাতৃহিংসা পর্যন্তও যে দেশ হইতে বিদূরিত হয় নাই, সে দেশের কল্যাণ আর কিরূপে হইতে পারে? বারভূম্যধিকারীরা বহু চেষ্টা করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কতিপয় স্বদেশদ্রোহী স্বজনের হিংসা ও পরশ্রীকাতরতায় তাহাদের সে আশা শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। তাহারা শেষ পর্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যখন আর কূলকিনারা পাইলেন না, তখন আত্মাহুতি প্রদান করিয়া, জন্মভূমির নিকট চির-বিদায় গ্রহণ করিলেন। স্বদেশদ্রোহী তাহাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিল, মায়ের সুসন্তানের জন্য সহৃদয় দুই চারি জন দুই চারি বিন্দু অশ্রু বিসর্জন করিয়া, রাজপুরুষগণের অলক্ষিতে তাহা আবার মুছিয়া, রাজার জয়জয়কার দিতে বসিল।

এই ভূম্যধিকারী দলের অভ্যুত্থানের সমকালে বঙ্গদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কিছু বিবরণ প্রকাশ করা কর্তব্যবোধে আমরা এস্থলে তৎসময়ের কতিপয় বিবরণ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মোগল বাদসাহগণের রাজত্ব পর্যন্ত, বাদসাহের প্রতিনিধিস্বরূপ মুসলমান নবাব দ্বারা বঙ্গদেশ শাসিত হইত বটে, কিন্তু তৎকাল পর্যন্ত সাধারণ প্রজা ও দেশ রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেশীয় জমিদারগণের উপরেই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিত। এই জন্য প্রত্যেক জমিদারের অধীনেই পদাতি, অশ্বারোহী, নৌ-সৈন্যের গমনোপযোগী যান সকল সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। আইন-ই আকবরী গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানা যায়, বাদসাহ আকবর শাহের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশীয় জমিদারেরা ২৩৩৩০ জন অশ্বারোহী, ৮০১১৫০ জন পদাতি, ১৭০টি হস্তী, ৪২৬০টি কামান এবং ৪৪০০ নৌকা সম্রাটের জন্য সর্বদা প্রস্তুত রাখিতেন। সম্রাট যখন আদেশ করিতেন তখনই জমিদারেরা এই সকল সৈন্য ও হস্তী অশ্বাদি লইয়া তাহার কার্যে নিয়োগ করিতেন। আমাদের নিকট এই কথাগুলি অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইলেও, জমিদারেরা যে তৎকালে আধুনিক করদ ও মিত্র রাজগণের মত বল সম্পন্ন ছিলেন, তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্তমান করদ ও মিত্র রাজগণ, রেসিডেন্টরূপ রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া, যেমন ত্রাহি ত্রাহি চীৎকারে, সময় সময় সুধাধবলিত হর্ম্যরাজি বিদীর্ণ করিয়া ফেলেন, তখনকার এই জমিদারগণ এতদ্‌পেক্ষা সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতেন বলিয়া বোধ হয়। একমাত্র নির্দিষ্ট রাজকর প্রদান করিলেই তাহারা স্বাধীন নৃপতির ন্যায় আপনাপন অধিকারে কার্য পরিচালনা করিতে সমর্থ হইতেন।

মহাত্মা আকবরের রাজত্ব সময়ে এই সকল ভূম্যধিকারীর মধ্যে কতক, তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া চলিত। কিন্তু বাদসাহের কর্মচারীর সহিত তাহাদের ততটা সম্মিলন ঘটিল না, কেন এই মনোমালিন্য ঘটিল, কাহার জন্য দ্বাদশ ভূম্যধিকারী বাদসাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল তাহার বিবরণ অনুসন্ধান করিতে গেলে বোধ হয় যে তৎকাল পর্যন্ত যদিও বাদসাহ

বাংলার অধিপতি ছিলেন, তথাপি পাঠানেরা সময় সময় তাহাদের আধিপত্য স্বীকার করিতে চাহিত না। বিশেষত যদি তাহারা কোনরূপ বুঝিত, সম্রাট, তাহাদের স্বশ্রেণির কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যায়রূপে অত্যাচার করিয়াছেন বা করিতেছেন তখন পাঠানেরা আত্মহারা হইত, আপনাদের পূর্ব বল ও অধিকার মনে ভাবিয়া তাহাদের শিরায় শিরায় শোণিত উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। তখন ভালমন্দ বিবেচনা তাহাদের অন্তঃকরণে আর স্থান পাইত না। কেবল প্রতিহিংসা ও পূর্বাধিকারের পুনরাভ্যুদয় তাহাদিগের স্মৃতিতে জাগরিত হইয়া তাহাদিগকে মোগল বাদসাহগণের প্রতিকূলে উত্তেজিত করিয়া তুলিত, ভবিষ্যৎ ভাবিবার আর সময় থাকিত না। টোডরমলের অন্যায় বন্দোবস্ত ভূম্যধিকারীদের বিদ্রোহের অন্যতম কারণ।

মানসিংহের আগমনের পূর্বে রালফ ফিচ নামে একজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী, বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাহার লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায়, তৎসময় বঙ্গদেশে দ্বাদশজন ভৌমিক ছিল। তন্মধ্যে বাকলা (চন্দ্রদ্বীপ) ও শ্রীপুর (বিক্রমপুর) দক্ষিণ ও পূর্ব বিভাগের দুইটি রাজধানী ছিল। ১৫০৬ খ্রিঃ অঃ পর্যন্ত বৃহৎ হিন্দুনগরী বাকলা নামে অভিহিত হইত। সন্দ্বীপ পর্যন্ত বিক্রমপুরের কেদার রায়ের রাজ্য বিস্তারের বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু উহা পর্তুগিজদের সাহায্য ব্যতীত হস্তগত রাখিবার উপায় ছিল না। আরাকানের মগেরা ঐ স্থান কি সমুদ্র তীরস্থ অন্যান্য স্থানে আপতিত হইয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, হিন্দুরাজগণ জলযুদ্ধে অক্ষম ছিলেন কিন্তু মগেদের মধ্যে অনেক পরিশ্রমী ও বহুদর্শী নাবিক ছিল। ডাক্তার জেকির লিখিয়াছেন[১], কেদার রায়কে পর্তুগিজ সৈন্যের সাহায্য লইয়া সন্দ্বীপ রক্ষা করিতে হইত।

সন্দ্বীপ দক্ষিণ সাহবাজপুরের পূর্ব দিকে মেঘনা নদীর সহিত সাগরসঙ্গমের মধ্যস্থলে সংস্থাপিত, ততদুর পর্যন্ত কেদার রায়ের অধিকার প্রসারিত থাকিলে মধ্যবর্তী ইদিলপুর, কার্তিকপুর, উত্তর ও দক্ষিণ সাহবাজপুর প্রভৃতি স্থানগুলি নিশ্চয় কেদার রায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। এই হিসাবে পশ্চিমে পদ্মা, পূর্ব-উত্তরে ধলেশ্বরী, দক্ষিণ দিকে আরিয়লখাঁ নদী ও পূর্বে মেঘনার সম্মিলিত সাগরাংশ এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী স্থানগুলি, নিশ্চয় কেদার রায়ের হস্তগত থাকা বিবেচিত হয়।

মিঃ ফারনেন্ডে আরাকান, শ্রীপুর (বিক্রমপুর) চণ্ডীখান্ (যশোহর) এই তিনটি রাজ্যকে বাংলার অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সাহেব লিখিয়াছেন, 'মোগলদের পরাক্রম সত্ত্বেও ঐ প্রদেশাধিপতিরা যথেষ্ট প্রভুত্ব ভোগ করিত। বিশেষত চণ্ডীখান ও শ্রীপুরাধিপতিরা মোগল পরাক্রম সত্ত্বেও স্ব স্ব রাজ্যে সর্বময় কর্তা ছিলেন[২]। প্রবল পরাক্রান্ত মোগলাধিপত্য সময়ে যাহারা এইরূপে স্বাধিকৃত প্রদেশে সর্বতোভাবে ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিতেন, তাহারা যে কম ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহা কোনরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

চাঁদ ও কেদার রায়ের সময়ে বিক্রমপুরের রাজধানী 'শ্রীপুর' নামক স্থানে সংস্থাপিত ছিল। এতদ্ভিন্ন তাহাদের প্রচুর কীর্তির নিদর্শনস্বরূপ অত্যুচ্চ ও মনোহর হর্ম্যমালা, দেবালয় ও বৃহৎ জলাশয় প্রভৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া, তৎকালে বঙ্গদেশ মধ্যে শ্রীপুর যথার্থ শ্রীস্থানীয় ও লোকলোচনানন্দদায়ী হইয়া উঠিয়াছিল। পরে যদিও পদ্মার অন্যতম শাখা কীর্তিনাশা নদীর উদ্ভবে ও তাহার প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে ঐ সকল কীর্তিরাজি বিলয়প্রাপ্ত হইয়া বিস্মৃতির চিরতামসে বিলীন হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি একমাত্র কীর্তিনাশার সহিত উহার যে অর্থ সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহাতেই রায় রাজগণের কীর্তির কতকটা আভাস ক্ষণস্থায়ী তড়িতবৎ অদ্যাপি মানবগণের মর্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়।

বারভুঁইয়া দল ক্রমে এইরূপ দুর্ধর্ষ হইয়া পড়িল যে, বাদসাহের প্রতিনিধিরা তাহাদিগকে

আর কোন মতেও বাধ্য রাখিতে পারিল না। দূর-দূরান্তর হইতে বিদেশীয়েরা বিবেচনা করিতে লাগিল, এইবার বুঝি বঙ্গদেশ মুসলমানের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া আবার হিন্দু সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। বঙ্গসন্তানেরা, কিছুকাল পরস্পরের প্রতি, সহানুভূতি ও বিশ্বাস রাখিয়া, কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার কি বিধান যে, পরে কিন্তু তাহারা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। সেই কূটনীতির অনুসরণ করিয়া তাহারা পরস্পরের প্রতি হিংসানল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিণামে সকলেই উহাতে পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইয়া স্ব স্ব কর্ম ফলানুযায়ী উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইলেন।

'আত্মদ্রোহিতা মহাপাপ' এই কথা ভারতবাসীরা যে কখনও বুঝিয়াছিল, অথবা বুঝিবে, তাহা বিশ্বাসাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সত্যযুগই বল, আর কলিকালই বল, ভারতের যত কিছু বীরানুষ্ঠান সীমাবদ্ধস্থানে স্বজাতীয়ের প্রতিই খাটাইতে প্রয়াস পাইয়াছে। ভারতীয় রাজগণের অশ্বমেধ ঘোটক, হিমালয়, মণিপুর, গান্ধার অতিক্রম করিয়া, কখনই ভিন্নদেশে শুভগমন করে নাই। বিশেষত পরকে প্রশ্রয় দিয়া প্রতিবাসীর গৃহভিত্তি উচ্ছিন্ন করিতে এই ভারতীয় জনগণ যতদূর মজবুত, বোধ হয় পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করিলেও, এমন দ্বিতীয় জাতি মিলে কি না সন্দেহ। বঙ্গদেশ, এই ভারতের একাংশ মাত্র সমভাবাপন্ন অপেক্ষা স্বজন-নিপীড়ন-স্পৃহা ইহাদের বরং এক ডিগ্রি উপরে। বঙ্গের মৃত্তিকার এমনই আশ্চর্য গুণ যে তদ্দ্বারা শিব গড়িতে গেলেও বানর হইয়া দাঁড়ায়। উহা বঙ্গের নৈসর্গিক নিয়ম কি তদ্দেশীয় জনগণের ললাটের অখণ্ডণীয় দোষ তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত উহারা দশে মিলিয়া কোন কার্য এ পর্যন্ত করিতে পারিয়াছে কি না তাহা সাধারণ জনগণের অবিদিত নাই। বঙ্গীয় দ্বাদশ ভূম্যধিকারীরা স্বদেশ-উদ্ধার-কল্পে ব্রতী হইয়াছিলেন বটে কিন্তু পরে আর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কতিপয় স্বদেশদ্রোহীর প্ররোচনায় ও কূট মন্ত্রণাজালে পতিত হইয়া তাহারা আত্মহারা হইয়াছিলেন। এবং পরস্পর একে অন্যের প্রতি অত্যাচার ও প্রভুত্ব স্থাপনের ত্রুটি করেন নাই। উহার পরিণাম ফল এই দাঁড়াইল যে কেহই আর সঙ্কল্প সিদ্ধি করিয়া মস্তকোন্নত রাখিতে পারিলেন না। কাহারও মুণ্ড ধরায় নিপতিত হইয়া মুসলমান রাজার চরণচুম্বনে কৃতার্থম্মন্য হইল; যাহারা তদ্বিপরীত আচরণ করিলেন তাহাদের মস্তক মহম্মদীয়গণের অসি প্রহারে দ্বিখণ্ডিত হইয়া ধরাবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। সেই স্বদেশ-প্রেমিকগণের দেশহিতৈষিতার ও আত্মত্যাগের কথা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই বিস্মৃত হইল না।

গ্রহবৈগুণ্য বা দূরদৃষ্টবশত যখন মানব স্কন্ধে দুর্বুদ্ধির আবির্ভাব হয়, তখন সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা অপনোদন করা সহজসাধ্য হইয়া উঠে না। দ্বাদশ ভূম্যধিকারীরা মিলিয়া মিশিয়া বাদসাহের হস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিবার জন্য, অনেক দূর অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু পরিণামে উহা, আকাশ-কুসুমবৎ কোথায় যাইয়া যে সরিয়া পড়িল, তাহা আর লোক-লোচনের আয়ত্তাধীন হইল না।

একটি সামাজিক বিষয় লইয়া, কেদার রায়ের সহিত তদীয় অমাত্য শ্রীমন্ত খাঁর বড়ই মনান্তর ঘটিয়াছিল। কোটীশ্বরের দেবল ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠীপতিত্ব পদ প্রদান করায়, প্রকৃত শ্রোত্রিয় শ্রীমন্ত উহার প্রতিকূলাচরণ করে। কিন্তু রাজাজ্ঞানুসারে পশ্চাৎ তিনি ঐ দেবল ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠীপতি শ্রোত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। হীনভাবাপন্ন লোকের সমকক্ষ করায়, কেদার রায়ের প্রতি শ্রীমন্ত আন্তরিক ক্রুদ্ধ হন। তদবধি কি প্রকারে রাজশ্রী বিনষ্ট হইবে, এই দুশ্চিন্তা নিয়ত তাহার হৃদয়ে পরিপোষিত হইয়া আসিতেছিল। ইতিমধ্যে এমন এক মহাসুযোগ সংগঠিত হইল, যদাশ্রয়ে পাপিষ্ঠ অমাত্য আপনার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া লইতে, সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছিল।

কোন সময়ে খিজিরাধিপতি ঈশা খাঁ, মিত্ররাজ কেদার রায়ের ভবনে শুভাগমন করিয়া, তাহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। খাঁ সাহেবের আগমনে শ্রীপুর নানারূপ আমোদ উৎসবে মাতিয়া উঠে। কেদার রায় যথাসাধ্য তাহাকে যত্ন ও অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার কি বিধান যে, এই আমোদ আহ্লাদই পরিণামে তাহাদের বন্ধুতাছিন্নের ও চির মনান্তরের কারণে পরিণত হইল।

চাঁদ রায়ের কন্যা স্বর্ণ বা সোনামণি, অসামান্য রূপলাবণ্যবতী ষোড়শী যুবতী রমণী ছিল। ভাগ্যদোষে বাল্যকালে তাহার পতির মৃত্যু হয়। তদবধি সেই লাবণ্যবতী বালবিধবা পিতা ও খুল্লতাতের আশ্রয়ে থাকিয়া, জীবন যাপন করিতেছিল। ঈশা খাঁ যখন বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের ভবনে অবস্থান করেন, তৎকালে খাঁ সাহেব একদা কোন ক্রমে সেই ললনারত্ন সোনামণিকে দেখিতে পান। এই সন্দর্শনই বঙ্গের চির পরাধীনতা স্খলনের প্রধান অন্তরায় হইয়া, মিত্ররাজদ্বয়ের পক্ষে, ঘোর মনোমালিন্যের কারণ হইয়া পড়ে।

ঈশা খাঁ, স্বদেশে প্রস্থানান্তর সোনামণিকে পাইবার জন্য চাঁদ ও কেদার রায়ের নিকট দূত প্রেরণ করেন। বোধ হয়, তাঁহার মনে এই বিশ্বাস ছিল যে বিধবা রমণীকে পরিত্যাগ করিতে, বিশেষত তাহার মত যোগ্য ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতে রায়রাজগণ কখনই অসম্মত হইবেন না। কিন্তু হিন্দুর, বিশেষত এক জন স্বাধীন পরাক্রান্ত নৃপতির নিকট ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর স্ত্রী কন্যা ভগিনী চাহিয়া পাঠান যে কতদূর ধৃষ্টতা, ফল প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তৎসাময়িক মুসলমানেরা অনেকেই তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

দূত প্রমুখাৎ ঈশা খাঁর মনোগত ভাব অবগত হইয়া, কেদার রায় তৎক্ষণাৎ সেই বার্তাবহকে দূরীকৃত এবং পরে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া প্রথমেই ঈশা খাঁর অধিকৃত কলাগাইছার দুর্গ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। অতঃপর ঈশা খাঁ ত্রিবেণীর দুর্গে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করে। চাঁদ ও কেদার রায় ঐ দুর্গ আক্রমণ করিয়া খিজিরপুর লুণ্ঠন করেন। তখন খাঁ সাহেবের চৈতন্যোদয় হইল যে, হিন্দুর নিকট তাহাদের কন্যা ভগ্নী প্রার্থনা করিয়া কি মারাত্মক ব্যাপার সংঘটিত করা হইয়াছে। এখন যাহাতে উভয় দিক রক্ষা পায়, তাহার কোন সুযোগ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে শ্রীমন্ত খাঁ, চাঁদ রায়ের সহিত খিজিরপুরে অবস্থান করিত। রায় রাজগণের জয়াপেক্ষা পরাজয়ই তাহার আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু ঘৃণাক্ষরেও সেই মনোগতভাব প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বরং সমধিক বন্ধুতার ভাণ করিয়া চলিত। কোন সুযোগে এই অমাত্য ঈশা খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর, খাঁ সাহেব তাহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তাহাদের পরস্পর কথাবার্তার পর ঠিক হয়, যে কোন উপায় হউক, শ্রীমন্ত সোনামণিকে আনিয়া ঈশা খাঁর অঙ্কশায়িনী করিয়া দিবে। তৎপরিবর্তে খাঁ সাহেব তাহাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিবেন। কিছু নগদ পুরস্কার গ্রহণান্তর শ্রীমন্ত ঐ সোনামণিকে করায়ত্ত করিবার জন্য, বিক্রমপুর প্রস্থান করে।

চাঁদ ও কেদার রায়ের অজ্ঞাতসারে, শ্রীপুর আসিয়া শ্রীমন্ত প্রকাশ করিল রাজাদ্বয় শত্রুহস্তে বন্দি হইয়াছেন। ঈশা খাঁ অচিরে সসৈন্যে শ্রীপুর আক্রমণ করিয়া, সোনামণিকে আত্মসাৎ করিবে। এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, রাজপুরীতে হাহাকার রব পড়িয়া গেল। কি রূপে রাজধানী ও সোনামণিকে রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহারই পরামর্শ চলিতে লাগিল। শ্রীমন্ত, রাজপরিজনকে পলায়নের পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু সর্বপ্রধান মন্ত্রী বৈদ্য বংশীয় রঘুনন্দন চৌধুরী, তাহার কোন কথায়ই স্বীকৃত না হইয়া রাজধানী রক্ষার উপায়াবলম্বন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাণী রাজ্য রক্ষার জন্য যতদূর ব্যস্ত না হউন কন্যা সোনামণিকে রক্ষার জন্য তদপেক্ষা অধিকতর উতলা হইয়া উঠিলেন। পরে শ্রীমন্তের প্ররোচনায় এই ঠিক

হইল যে সোনামণিকে তাহার শ্বশুরালয় চন্দ্রদ্বীপে রাখিয়া আসিলে এক রূপ নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। রঘুনন্দন এই কথারও প্রতিবাদ করিলেন বটে কিন্তু রাণীকে কোন রূপেই স্বমতে আনিতে পারিলেন না। নৌকাযোগে রাজকন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠানো স্থিরীকৃত হইলে ধূর্ত শ্রীমন্তই তাহার রক্ষক হইয়া চলিল। এদিকে নাবিকদের সহিত পূর্বেই শ্রীমন্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল তদনুসারে তাহারা চন্দ্রদ্বীপের পরিবর্তে নৌকা সোনারগাঁ অভিমুখে চালাইয়া দিল। বলা বাহুল্য শ্রীমন্ত সোনামণির সহিত অচিরে সোনারগাঁ পৌঁছিয়া চাঁদ রায়ের সেই অসামান্য রূপলাবণ্যবতী তনয়াকে ঈশা খাঁর হস্তে সমর্পণ করিল। উহা এইরূপে সুসম্পন্ন হইল যে চাঁদ বা কেদার রায় এ বিষয়ের কিছু মাত্র পূর্বে অবগত হইতে পারেন নাই। পরে যখন সমুদয় প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন মনঃক্ষোভে চাঁদ রায় যুদ্ধভার কেদার রায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া খিজিরপুর হইতে স্বীয় রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

চাঁদ রায় রাজধানীতে পৌঁছিয়া অমাত্য বন্ধুবান্ধব কাহারও সহিত আর বাক্যালাপ করিলেন না কেবল অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া কোটীশ্বরের মন্দির মধ্যে পতিত হইয়া রহিলেন। প্রবাদ আছে এই অবস্থায় দুই দিবস অতিবাহিত হইলে পর তদীয় ইষ্টদেব তাহাকে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন দিয়া বলিলেন, "বৎস, যাহা হইবার হইয়াছে, এখন অকারণে এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত থাকাই শ্রেয়স্কর। এখন ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হও।" এই প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া চাঁদ রায় মনে ভাবিলেন যে, সোনামণিকে উদ্ধার করিতে পারিলেও আর তাহাকে সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে না। বিশেষত বাদসাহের সহিত যেরূপ বিবাদ বাধিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কখন কি হয়, বলা যায় না। অতএব এই যুদ্ধ হইতে এখন বিরত থাকাই কর্তব্য। তৎপর কেদার রায়কে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া রাজধানীতে আসিবার জন্য বিশ্বস্ত দূত প্রেরিত হইল। এই সময় কেদার রায়, খিজিরপুর মথিত ও ঈশা খাঁর দুর্গগুলি বিধ্বস্ত করিয়া, তাহার আশ্রয়স্থান ত্রিবেণী দুর্গও অবরোধ করিয়াছিলেন। এখন ভ্রাতৃ আদেশ প্রাপ্তান্তে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত দুর্গাবরোধ পরিত্যাগ করিয়া, স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

এই সকল ঘটনার পর, কন্যারত্ন হারাইয়া ও রাজ্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া চাঁদ রায় অন্তিম শয্যায় শায়িত হন। সেই বীরজীবন, পরিণত বয়সে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া, কোটীশ্বরের পদমূলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহ জগতের সুখদুঃখের সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধ রহিল না। দুষ্ট ধূর্ত বিশ্বাসঘাতক শ্রীমন্ত খাঁ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া, খিজিরপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কেদার রায় বিক্রমপুরের সিংহাসনে উপবেশন করিলে, আকবর বাদসাহের মৃত্যুর পর, ১৬০৬ খ্রিঃ অব্দে, সেলিম, জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। পরে সেরকে হত্যা করিয়া, তৎপত্নী মেহেরুন্নেসাকে নুরজাহান নাম প্রদান করতঃ আপন সিংহাসনের অর্ধাংশভাগিনী করিয়া লন। এই সময় বঙ্গীয় জমিদারেরা, বাদসাহের প্রতিকূলে নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। সুযোগ পাইয়া পর্তুগিজ গেঞ্জালিস, চাঁদ রায়ের হস্ত হইতে সন্দ্বীপের আধিপত্য কাড়িয়া লইল। বারভুঁইয়া দল একযোগে কোন কার্য করিতে প্রবৃত্ত না হইয়া, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের সহিত তাহার জামাতা চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা রামচন্দ্রের মনোমালিন্য ঘটিল। আবার রামচন্দ্রের সহিত ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্যের বিষম শত্রুতা হইয়া দাঁড়াইল। বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের সহিত খিজিরপুরের ঈশা খাঁর মস্‌নদই আলির অনৈক্য ও যুদ্ধাদির কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল অনর্থকর গৃহবিচ্ছেদে লিপ্ত থাকিয়া, বারভুঁইয়া দল যখন স্বীয় স্বীয় পদে কুঠারাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,

সেই সুযোগে বাদসাহ অম্বরাধিপতি রাজা মানসিংহের প্রতি বাংলার বিদ্রোহী জমিদারদিগকে দমন জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। মানসিংহ ১৬০৫ খ্রিঃ অব্দে বাংলার শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত হইয়া, রাজমহলে রাজধানী সংস্থাপন করেন। তৎকালে ভূম্যধিকারীগণ বাদসাহের প্রতিকূলে যে কিরূপ উদ্ধত ভাব ধারণ করিয়াছিলেন তাহার একটি চিত্র জনৈক মুসলমান গ্রন্থকারের লিখিত বিবরণী হইতে উদ্ধৃত করিয়া এস্থলে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

"জাফর খুলনাৎ—উৎতওয়ারিখ নামক পারস্য পুস্তক অবলম্বনে, লক্ষ্ণৌ নিবাসী সের আলি জাফর 'আরশ-ই-মহামিন্দ' নামক যে উর্দুগ্রন্থ ১৮০৫ খ্রিঃ অব্দে অনুবাদ করেন তাহাতে জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) সম্বন্ধে এই রূপ জানা যায় "বাংলার জমিদারেরা নিতান্ত উদ্ধত ও অভদ্র হইয়া পড়িয়াছে তাহারা পূর্বের ন্যায় সম্রাট সরকারে রাজস্ব দেয় না উহারা তাহার প্রতিফল পাইয়াছে।'

মানসিংহের সময়ে বাংলার রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকাতে পরিবর্তিত হয়। ঢাকা বাদসাহের নামানুসারে জাহাঙ্গীরনগর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বর্ধমান ও ঢাকা এই দুইটিকে প্রধান কেন্দ্র স্থান করিয়া মানসিংহ বারভুঁইয়া দল নির্মূল করেন। মুসলমান ইতিহাস লেখক জমিদারগণকে অভদ্রই বলুন, বা যাহাই বলুন, কিন্তু তৎকালের প্রদেশীয় শাসনকর্তারাই যে, সকল গোলযোগের মূল ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাদের অযথা আবদার ও অর্থ-লালসা পূর্ণ করিতে না পারায় অনেক ভূম্যধিকারী লাঞ্ছিত হন। এই কারণে আপনাদের মান ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রধান প্রধান কয়েকজন জমিদার একত্র হইয়া বাদসাহের অধীনতা হইতে আপনাদিগকে স্বাধীন ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হন। জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের সহিত সের হত ও তৎপত্নী মেহেরউন্নেসা অপহৃত হওয়ায় তাহার নিকট সুবিচারের আশাও কাহারও রহিল না; কাজেই বাদসাহের বিরুদ্ধে অনেক জমিদারই চলিতে লাগিলেন।

বঙ্গদেশে আগমন করিয়া মানসিংহ ভুঁইয়াদলের মধ্যে মতভেদ জন্মাইয়া দিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন। ভবানন্দ মজুমদার ও শ্রীন্ত খাঁ প্রভৃতি তাহার সহায়তায় নিযুক্ত হইল। তাহারা মানসিংহকে ঘরের যাবতীয় বিবরণ প্রকাশ করিয়া দিল। সৈন্য কিরূপ ভাবে কোন পথে চালাইলে অনায়াসে যুদ্ধের সুবিধা হইতে পারে, তৎসমুদয়ের পরামর্শ প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইল না। মানসিংহ সমুদায় অবগত হইয়া রাজগণের নিকটে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দূত প্রেরণ করেন। যাহারা মানের প্রলোভনে বা ভয়ে অভিভূত হইয়াছিল, তাহারা বাধ্য হইয়া মোগল সেনাপতির আনুগত্য স্বীকার করায় মানসিংহ তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। ঈশা খাঁ বহু পূর্বেই ভুঁইয়াদল পরিত্যাগ করিয়া মোগলচরণে আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর মহারাজ প্রতাপাদিত্য, রাজা কেদার রায়, রাজা মুকুন্দ রায়, চাঁদ গাজি ব্যতীত আর সকলেই মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। ১৬০৬ খ্রিঃ অব্দের যুদ্ধে মহারাজ প্রতাপাদিত্য অমানুষিক বীর্য প্রকাশ করিয়াও দেশ রক্ষা করিতে পারিলেন না; পরে ধৃত হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ হন। পবে মুকুন্দ রায়ের রাজধানী ভূষণা আক্রমণ করিয়া মোগল সেনাপতি উহা বিধ্বস্ত ও হস্তগত করেন। তৎপর মোগল বাহিনী ক্রমে অগ্রসর হইয়া বিক্রমপুর আক্রমণ করে।

মানসিংহ শ্রীপুরের সন্নিকটবর্তী হইলে তৎকর্তৃক কতিপয় দূত কেদার রায়ের নিকট প্রেরিত হয়। ঐ দূতের নিকট তরবারি ও শৃঙ্খল প্রদান করিয়া বলিয়া দেওয়া হয় যে, যদি কেদার রায় শৃঙ্খল গ্রহণ করিয়া বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার করেন, তবে তদ্বিরুদ্ধে কোন কার্য করা হইবে না; অন্যথা তরবারি গ্রহণ করিয়া যদি শত্রুতার ভাব প্রকাশ করেন, তবে অবশ্য যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিনাশ করা হইবে। এতদ্ভিন্ন ঐ দূতের সহিত মানসিংহ কেদার রায়ের নিকট অতিরিক্ত একখানি লিপি প্রেরণ করেন। তাহাতে একটি শ্লোক লিখিত ছিল। দূত তরবারি, শৃঙ্খল ও ঐ লিপি লইয়া কেদার রায়ের নিকট উপস্থিত হয়।

দূত প্রভু-নির্দিষ্ট বাক্যানুসারে যাবতীয় বিষয় কেদার রায়ের নিকট বর্ণনা করিয়া মানসিংহের প্রদত্ত পত্রও তাহাকে প্রদান করিল। কেদার রায় প্রথমে লিপি পাঠ করিলেন, উহাতে এইরূপ লেখা ছিল,—

"ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাক কুলী চাকালী
সকল পুরুষ মেতৎ ভাগ যাও পালায়ী।
হয়-গজ-নর-নৌকা-কম্পিতা বঙ্গভূমি
বিষমসমরসিংহো মানসিংহঃ প্রয়াতি ॥

ইহা পাঠান্তে কেদার রায় উহার উত্তর-সূচক আর একটি শ্লোক লিখিয়া দূতের হস্তে দিয়া বলিলেন, "যাও দূত, তোমার প্রভুকে গিয়া বল আমি তরবারি গ্রহণ করিলাম। তাহার যতদূর ক্ষমতা থাকে, তাহা প্রয়োগ করিতে তিনি যেন কুণ্ঠিত না হন। হয় তাহার অস্ত্রাঘাতে আমার স্কন্ধ ছিন্ন হইবে, নতুবা তৎপ্রদত্ত এই অসির আঘাতে তাহারই মুণ্ড দেহ-বিচ্যুত হইয়া এই যুদ্ধের অবসান হইবে।' কেদার রায় উত্তরসূচক যে শ্লোকটি মানসিংহের নিকট প্রেরণ করেন, তাহা আমরা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম,—

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকম্।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ ॥"[৩]

মানসিংহ, কেদার রায়ের বিবরণ শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ শ্রীপুর অবরোধ করিবার জন্য সৈন্যগণকে আদেশ প্রদান করিলেন। আমরা এই স্থলে, কেদার রায়ের অন্যান্য কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ মানসিংহের সহিত তাহার সমরাভিনয়ের বর্ণনা করিব।

কেদার রায়ের গুরু গোসাঞি ভট্টাচার্য এই সময় রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে যুদ্ধ ক্ষান্ত করিবার জন্য অনেক উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু কেদার, তাহার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কোন দৈবানুষ্ঠান দ্বারা যাহাতে তাহার মঙ্গল হয়, সেই কার্যে ব্রতী থাকিবার জন্য গুরুদেবকে অনুরোধ করেন। অগত্যা গুরুদেব তৎকার্যসাধনমানসে, মৃন্ময়ী কালী প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া তদর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ কেদার রায়ের এই কার্য হিতের পরিবর্তে অহিতকর হইয়া দাঁড়াইল।

প্রবাদ আছে, গোসাঞি ভট্টাচার্য, তান্ত্রিক বীরাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাহারা বৈদিকাচারী বা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মত কোন পূজা বন্দনাদি প্রায়ই অনাহারে অনুষ্ঠান করিতেন না। তন্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠান দ্বারা ইষ্টদেবীকে অন্ন ব্যঞ্জন উৎসর্গ করিয়া ঐ প্রসাদ গ্রহণান্তর, নিশীথে পুনরায় দেবীর পূজা বন্দনাদি করিতেন। গোসাঞি, এই দিবসে আহার করিয়া, রাত্রিতে রাজ-নিয়োজিত পূজা করিতে যাওয়ায়, কেদার রায় রুষ্ট হন, অথচ গুরুদেবকে কিছু বলিতেও সাহস পান না। গুরুদেব পূজান্তে কেদার রায়কে আশীর্বাদ নির্মাল্য গ্রহণ জন্য, বার বার ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু কেদার রায় আর তৎসমীপে আগমন করেন না। তৎকারণ কেদারের উপর গোসাঞির ক্রোধের উদ্রেক হয়। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাহার অর্চনার উপর শিষ্যের নিতান্ত অভক্তি জন্মিয়াছে, এই কারণে সে আশীর্বাদ গ্রহণ করিল না। তখন আত্মক্ষমতার পরিচয় প্রদান জন্য তিনি সমবেত লোকমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ, তোমাদের রাজার এই দেবার্চনার প্রতি বড়ই সন্দেহ ও ঘৃণা জন্মিয়াছে। আমি তাহার কল্যাণ কামনায়, নানা উপদেশ প্রদান করিয়া, বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার করিতে বলিলাম। সে যখন তাহা শুনে নাই, তখনই জানিয়াছি, তাহার কল্যাণ অসম্ভব। অতঃপর যদিও এই দৈবকার্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া, তাহার রক্ষার্থ চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাও সে

উপেক্ষা করিল। অতএব তাহার অশুভ অনিবার্য। তোমরা আমার প্রভাব স্বচক্ষে অবলোকন কর। এই বলিয়া শাণিত খড়গ তুলিয়া প্রতিমার বুকে আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ ঐ ক্ষত স্থান হইতে অবিরল ধারায় রক্ত পতিত হইতে লাগিল। দর্শকগণের আর আশ্চর্যের ইয়ত্তা রহিল না। গোসাঞি তৎক্ষণাৎ কোথায় চলিয়া গেলেন। এই সকল সমাচার অচিরে কেদার রায় শুনিতে পাইয়া ভয়ে অভিভূত হইলেন। পরে গুরুদেবের শরণাপন্ন হইবার অভিপ্রায়ে বাহিরে আসিয়া তাহার অনেক অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু আর দর্শন পাইলেন না।

বহুকাল হইতে বিক্রমপুরের দুইটি কালীক্ষেত্র পীঠস্থানবৎ পূজিত হইয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে একটি চাঁচুরতলার "ঠারিণ বাড়ি" অপরটি মাঐসারে "দিগম্বরী বাড়ি" বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রবাদ চাঁচুরতলাতে ব্রহ্মানন্দগিরি এবং মাঐসারে গোসাঞি ভট্টাচার্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।[৪] ঐ উভয় স্থানে নানা স্থান হইতে, হিন্দুরা আসিয়া পূজা বন্দনাদি করিয়া থাকে। ঐ সময়ের তান্ত্রিক গুরুগণ সম্বন্ধে আরও নানারূপ উপাখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। সর্বানন্দ ঠাকুর মেহার প্রদেশে দশমহাবিদ্যা সিদ্ধি করিয়া উহার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করণান্তে স্বয়ং সর্ববিদ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বিল্বপুকুর-নিবাসী রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য[৫] সিদ্ধিলাভ করিয়া "বেলপুকুরে ভট্টাচার্য" নামে প্রসিদ্ধ হন। আমরা এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করায় হয়ত পাঠক মহোদয়গণ বিরক্ত হইতে পারেন, তবে তাহাদের বিবেচনা করা উচিত যে প্রাচীন বিবরণ সংগ্রহ করা বড়ই সুকঠিন ব্যাপার। বহু চেষ্টায় যতটুকু জানা যায়, তাহা পরিত্যাগ করিতে, কোন মতেও ইচ্ছা জন্মে না। এখন উহা পরিত্যাগ করিলে, ভবিষ্যতে আর পাইবারও সম্ভাবনা অতি অল্প। এই কারণে অস্বাভাবিক গল্প বলিয়া বিবেচিত হইলেও উহার কতকটা না রাখিয়া পারা যায় না। কেদার রায় মাতৃনির্দেশ ক্রমে এই পীঠস্থানবৎ চাঁচুরতলার নিকটে অপর একটি বাড়ি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি রাজাবাড়ি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বাস করিয়া, অনায়াসে দেবীর অর্চনা করা যাইতে পারিবে, এই মানসেই ঐ বাড়ি নির্মিত হয়। রালফ্ ফিচ ভ্রমণবৃত্তান্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন, এই রাজাবাড়ির ১৮ মাইল ব্যবধানে ঈশা খাঁ মসনদ আলির রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এই রাজাবাড়ির অনতিদূরে 'কেশার মার দিঘি' নামে এক বৃহৎ জলাশয় ছিল। প্রবাদ, কেশা অথবা কেশবের মাতা, পতি-পুত্রহীনা হইয়া, পতিকুলের প্রভু চাঁদ রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন যাপন করে। বিক্রমপুর অঞ্চলে সিকদার বা নফর বলিয়া এক সম্প্রদায় ক্রীতদাস আছে। তাহাদের রমণীরা বিপন্ন অবস্থাতে এইরূপে প্রভুকুলের আশ্রয় গ্রহণান্তর, প্রভু পরিবারের অপরাপর রমণীয় ন্যায়, স্বচ্ছন্দে কালাতিবাহিত করিয়া থাকে। এই সিকদার শ্রেণির মধ্যে যাহারা প্রভুপুত্রে 'ধাই ভাই' হইতে পারে, তাহারা বড়ই সম্মান বোধ করিয়া থাকে। ধাই ভাই বিক্রমপুরে 'আতা ভাই' বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেদার রায় জন্মগ্রহণ করিলে পর, কেশার মাকে তাহার ধাত্রী পদে নিযুক্ত করিয়া, রাজা পুত্রের প্রতিপালন ভার তৎপরে ন্যস্ত করেন। কেদার রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, ধাত্রীর ইচ্ছানুসারে এই বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া তদ্দ্বারা উৎসর্গ করাইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত উহার নাম হয় "কেশার মার দিঘি।" আরও প্রবাদ, কেশার মা যতদূর হাঁটিয়া যাইতে পারিবে, ততদূর পর্যন্ত এই সরোবর খনিত হইবে বলিয়া কেদার রায় প্রতিশ্রুত হন। তদনুসারে ধাত্রী প্রায় এক মাইল ব্যাপী স্থান হাঁটিয়া অতিক্রম করার পর অন্য কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া গমনে ক্ষান্ত হয়। এজন্য দিঘিও এক মাইল ব্যাপী স্থান লইয়া খনিত হইয়াছিল। অদ্যাপি উহার ভগ্নাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে। উহাব তীরস্থ বন্দব "দিঘির পাড়ের হাট" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বিক্রমপুরান্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে কেদার রায়ের রাজধানী ছিল। বস্তুত চাঁদ রায় উহার প্রতিষ্ঠা

সাধন করিয়াছিলেন। উক্ত রায়গণের জ্ঞাতি যাহারা অদ্যাপি বিক্রমপুরে বাস করিতেছেন, তাহারাও রায় উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। দক্ষিণ বিক্রমপুরেব দেভোগ গ্রামে এবং উত্তর বিক্রমপুরের মূলচর গ্রামে ইহাদের জ্ঞাতি আছে বলিয়া জানা যায়। এজন্য নিঃসন্দেহে বোধ হয় যে, চাঁদ রায়ের ঊর্ধ্বতন পুরুষে কেহ শ্রীপুর বাস করিতেন এবং সেই মহাত্মা হইতেই কতিপয় শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়াছিল। অন্যথা তাহাদের জ্ঞাতিবংশ বর্তমান থাকিবার সম্ভাবনা কি? তবে চাঁদ রায় ক্ষমতাশালী হইয়া শ্রীপুরের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন।

শ্রীপুর বিক্রমপুরের রাজধানী ছিল। তথায় রাজপ্রাসাদ, সৈনিকাবাস, বিচারালয়, কারাগার, কোষাগার প্রভৃতি রাজোচিত যাবতীয় বন্দোবস্ত ছিল। তৎসন্নিহিত আলাফুল-বাড়িয়া স্থানে বিস্তৃত বন্দর এবং কোটীশ্বর নামে দেবালয় ছিল। আমরা পূর্বে বলিয়াছি তৎকালে কীর্তিনাশা নামে কোন নদীর অস্তিত্ব পর্যন্ত ছিল না। একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া বক্রভাবে চলিয়া গিয়াছিল। উহা কালীগঙ্গা নামেও পরিচিত। ঐ নদী তীরে শ্রীপুর রাজধানী বিদ্যমান ছিল। জনশ্রুতিতে প্রকাশ, এক ক্রোর টাকা বেদিমূলে প্রোথিত করিয়া তদুপরি এই কোটীশ্বর সংস্থাপিত[৬] এবং স্থাপিত স্থানটিও ঐ অভিধা প্রাপ্ত হয়। এই কোটীশ্বর পল্লীতে রায়গণ কর্তৃক দশমহাবিদ্যা এবং স্বর্ণ নির্মিত দশভুজা দুর্গামূর্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। সর্বসাধারণের নিকট উহা "স্বর্ণময়ী" নামে প্রসিদ্ধ হন। এই দেবালয় অথবা দেবমূর্তি এখন কিছুই বিদ্যমান নাই। তবে রায় বংশের দুই চারিটি কীর্তির ক্ষীণ রেখা বর্তমান থাকিয়া আজিও তাহাদের নাম সময়ে সময়ে দর্শকগণকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহার বিবরণ যতদূর পারিলাম, পাঠক মহোদয়গণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাহাই নিম্নে বিবৃত করা হইল।

কাচকির দরজা

উহা এক বৃহৎ রথ্যা—ইদিলপুরের নিকটস্থ বুড়ির হাট ও দেওভোগ স্থান হইতে উহার এক শাখা আরম্ভ হইয়া বিক্রমপুর ভেদ করিয়া উত্তর দিকে বরাবর ধলেশ্বরী নদীর তট পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। অপরটি মেঘনা নদীর তট হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দিকে বরাবর পদ্মাতট পর্যন্ত প্রসারিত হয়। রাস্তা দুইটি বক্রগতিতে নানা জনপদ ঘুরিয়া ফিরিয়া যাওয়ায় বিক্রমপুরের অধিকাংশ গ্রামের যাতায়াতের সুবিধা ছিল। সেনরাজগণের সময়ে যে সমস্ত রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ এই কাচকির দরজার সহিত পরে সংযোজিত হয়। সুতরাং এই রাস্তার সমুদয় ভাগ রায় মহাশয়দের নিজকৃত নয়। এই পথটির অধিকাংশ এখন কীর্তিনাশা নদীর কুক্ষিগত হইয়াছে। স্থানে স্থানে যাহা আছে, তাহা পরে কোথাও বা ভগ্ন হইয়া ক্ষেত্রে, কোথাও বা লোকালয়ে, এবং অবশিষ্ট শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানীতে পরিণত হইয়াছে। ১৪/১৫ বৎসর অতীত হইল পালং স্টেশন হইতে যে রাস্তাটি ভোজেশ্বর পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল উহার অধিকাংশ এই কাচকির দরজার উপর দিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। এই রাস্তাটির উৎপত্তি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় যে, কেদার রায়ের মাতার অদৃষ্ট গণনা করিয়া কোন জ্যোতির্বিদ বলিয়াছিল মৎস্যের কণ্টক বিদ্ধ হইয়া তাহার মৃত্যু সংঘটন হইবে। এই কারণে কেদার রায় রাণীর জন্য কণ্টকহীন মৎস্যের ব্যবস্থা করেন। কাচকির গুড়া নামে এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য নদীতে সর্বদা পাওয়া যায়। সেই মৎস্য পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী নদীতে প্রত্যহ ধৃত হইয়া যাহাতে সুবিধা মত রাণীর জন্য পৌঁছিতে পারে, তন্নিমিত্ত চাঁদ রায় কর্তৃক এই রাস্তার পত্তন আরম্ভ হইয়া কেদার রায়ের সময়ে পরিসমাপ্ত হয়। কথার মূলে যাহাই থাকুক, কাচকি মৎস্য ধৃত করিবার ব্যপদেশে উহার সৃষ্টি এই কিংবদন্তীই চলিয়া আসিয়াছে, এবং এই জন্য রাস্তার নামও 'কাচকির দরজা' হইয়াছিল। প্রবাদ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, কিন্তু এই চতুর্দিক

প্রসারিত পথগুলি যখন পূর্ণাবয়বে, বিক্রমপুরে বিদ্যমান ছিল, তখন তদ্দেশবাসীরা যে বর্তমান অধিবাসীগণের অপেক্ষা অধিক সুখস্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কেদার বাড়ি

কেদার রায় কার্তিকপুর ও বিক্রমপুর এই পরগণাদ্বয়ের সন্ধিস্থলে এক প্রকাণ্ড বাড়ি নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উহার চতুর্দিকে সুপ্রশস্ত পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল; রাশীকৃত ইষ্টকাবলী সংগৃহীত হইয়া কয়েকখানা অট্টালিকার ভিত্তি পর্যন্ত গ্রথিত হয়; কিন্তু উহা আর সম্পন্ন হইয়া উঠে না। আজি পর্যন্তও সর্বসাধারণে ঐ স্থানকে কেদার বাড়ি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। এই গ্রাম পালং স্টেশনের অন্তর্গত। বর্তমান সময়ে কেদার বাড়িতে কতিপয় ধনী সাহা সন্তান বাস করিয়া কেদার বাড়ির নাম উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

রাজাবাড়ির মঠ

কীর্তিনাশা নদীর তটে এতাদৃশ প্রাচীন কীর্তি আর এখন দেখা যায় না। উত্তাল তরঙ্গময়ী স্রোতস্বতী খরবেগে যেমন এক দিকে চলিয়া যাইতেছে, তেমন আবার ভ্রূকুটি সঞ্চালন করিয়া এক এক বার ঐ উচ্চ মন্দিরের প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। পরবর্তী কত অত্যুচ্চ সুদৃশ্য হর্ম্যরাজী, কীর্তিনাশার উদরস্থ হইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, জানি না, কেদার রায়ের কি পুণ্যবলে এই মঠ অদ্যাপি বর্তমান থাকিয়া তাহার যশের একটি ক্ষীণ জ্যোতিঃ লোকলোচনের সম্মুখে ধরিয়া দিতেছে। এই মঠ নির্মাণ সম্বন্ধে যতদূর বিবরণ অবগত হওয়া যায়, উহা গ্রন্থান্তরে প্রকাশ করা যাইবে।

চাঁদ ও কেদার সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ বারভূঁইয়া প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে, এস্থলে অতঃপর সংক্ষেপে মানসিংহের সহিত কেদার রায়ের যুদ্ধ বিবরণ প্রদান করা হইল।

দেশীয় প্রবাদ মতে কেদার রায় গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ ত্যাগ করেন, কিন্তু আকবর নামা প্রণেতা বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রেই এই বীরবরের পতন হয়। আমরা ঐ অংশ উক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কেদার রায় ও ঈশা খাঁ এক দলবদ্ধ হইয়া, মোগল বাদসাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, এই সময়ে ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে বিপুল বাহিনী ও রণতরী সুসজ্জিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও কালীগঙ্গার তটও সমাচ্ছন্ন কবিয়া ফেলে। মোগল সেনাপতি বাজবাহাদুর বিপুল আয়োজন করিয়া কেদার রায়কে দমন করিবার জন্য শ্রীপুরে উপনীত হন। কিন্তু কেদার রায়ের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া মানসিংহের নিকট আরও সৈন্য সাহায্য চাহিয়া পাঠান। রাজা মান তৎক্ষণাৎ একদল সুশিক্ষিত সৈন্য বাজবাহাদুরের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং পশ্চাৎ অনুসরণ করেন। মানসিংহ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কেদার রায়কে পরাস্ত করেন বটে, কিন্তু তাহার রাজ্য গ্রহণ করেন নাই।[৭] সম্ভবত সেই যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কেদার রায়ের গৃহাধিষ্ঠাত্রী শীলাময়ীদেবীকে মানসিংহ জয়পুর লইয়া যান এবং স্বয়ং কেদার রায়ের একটি কন্যাকে গ্রহণ করেন।[৮]

আকবর বাদসাহের রাজত্বের ৪৮ বৎসরে ১৬০৩ খ্রিঃ পুনরায় কেদার রায় মোগলের বশ্যতা অস্বীকার করেন, এই সময়ে তাহার সহিত ঈশা খাঁর বিবাদ হয়। ঈশা মোগল পদে মস্তক অবনত করিয়াছে, এক মাত্র মগরাজকে অবলম্বন করিয়া কেদার বঙ্গমাতার স্বাধীনতা সংরক্ষণ প্রয়াসে বদ্ধপরিকর। কেদার রায় পাঁচ শত জাহাজ সংগ্রহ করিয়া মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ কিলমক্‌কে অবরোধ করিয়া ফেলিলেন. এবার ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল, মোগল সেনা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে অসমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু মানসিংহ পুনরায় বহু সৈন্য সহ যুদ্ধস্থলে উপনীত হইয়া শ্রীপুর অবরোধ করিলেন। আকবর নামাতে দেখা যায়, কেদার রায় ভয়ানক

যুদ্ধে আহত হইয়া ধৃত হন। কিন্তু মানসিংহের নিকট আনীত হইবার অল্প কাল পরেই তিনি সেই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া সুরলোকে প্রস্থান করেন।[৯]

বারভুঁইয়াদের মধ্যে যদি কাহাকেও সর্বপ্রথম আসন প্রদান করা কর্তব্য হয়, আমাদের বিবেচনায়, তবে তাহা বিক্রমপুরের কেদার রায়েরই প্রাপ্য। ঈশা খাঁ মসনদ আলি সর্বপ্রধান ছিলেন বটে, কিন্তু পরিণামে তিনিও মোগল পতাকামূলে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইলেন। অধিকাংশই তৎপথাবলম্বন করেন, করিলেন না কেবল তিনটি মহাপ্রাণ, বিক্রমপুরের কেদার রায়, ভূষণার মুকুন্দ রায় ও যশোহরের প্রতাপাদিত্য। আকবর নামাতে কেদার রায় ও মুকুন্দরাম রায়ের নাম স্পষ্ট উল্লেখ আছে, জানি না প্রতাপাদিত্যের নাম উহাতে উল্লেখ নাই কেন। এমন কি, এখন দেখা যায়, যে শীলাময়ী মানসিংহ বঙ্গদেশ হইতে জয়পুর স্বীয় রাজধানীতে লইয়া যান, তাহাও প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবী নন, কেদার রায়ের গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়াই অবগত হওয়া যায়।[১০]

নয়পাড়ার চৌধুরী

বারভুঁইয়ার পতনের পর, তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি নানা বিভাগে বিভক্ত হইয়া আবার বহু জমিদারের অভ্যুদয় হয়। কেদার রায়ের জমিদারি নিজ বিক্রমপুর নয়পাড়ার ভরদ্বাজ গোত্রজ বৈদ্য চৌধুরীদের হস্তগত হয়। প্রথম জমিদার রঘুনন্দন অতি সচ্চরিত্র এবং বীর পুরুষ ছিলেন। এজন্য মানসিংহ তাহার হস্তেই ঐ জমিদারি ন্যস্ত করেন। রঘুনন্দন জমিদারি লাভ করিয়া স্বদেশের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া তুলেন। নানা স্থান হইতে নানা শ্রেণির সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া এ সময়ে তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। বিশেষ বৈদ্য সম্প্রদায় মধ্যে তাহার স্থান অতি নিম্নে ছিল, এজন্য যশোহরাঞ্চল হইতে বহু সম্ভ্রান্ত বৈদ্য আনিয়া স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা করেন।[১১] ক্রমে দুই তিন পুরুষ পর যাহারা এই বংশে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন, তাহারা কিন্তু আর কাহাকেও সম্মানী বলিয়া গ্রাহ্য করিতেন না। নানারূপ অত্যাচার অবিচার চলিতে লাগিল। শুনা যায়, ইহারা সাড়ে সাত শত ঘর লোককে ক্রীতদাসের কার্যে নিযুক্ত করেন, ভদ্রলোকের বাটির নিকট দিয়া, অশ্লীল সারি গাহিয়া বাইচের নৌকা চালাইতেও ইতস্তত করিতেন না।

অত্যাচারের মাত্রা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া সকল শ্রেণির উপরই চলিতে লাগিল, একদা তাহাদের পূর্বপুরুষেরা, যাহাদের পদধূলি বাড়িতে পড়িলে, আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন, সেই সকল স্বজাতীয়দিগের এখন আর তাহারা মনুষ্য বলিয়াই বিবেচনা করিতেন না।

দিন কাহারও সমানে যায় না, এদিকে বৈদ্য বংশের মধ্যে যাহারা ইতিপূর্বে কেবল কৌলীন্য ও ঔষধ সম্বল করিয়া এত কাল জীবনযাপন করিতেছিলেন, এখন আবার তাহাদের বংশধরেরা অনেকেই সংস্কৃত শ্লোকাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, পারস্য ভাষায় মনোনিবেশ করিলেন। অচিরাৎ, ফলও ফলিল, তন্মধ্যে অনেকে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। এই সময় তাহাদের নিকট জমিদারের অন্যায় অত্যাচার বা আদব কায়দা ভাল লাগিত না। বোধ হয় সকলেই অনুমান করিতে পারেন যে, মানব যতই উন্নতি লাভে অগ্রসব হয়, ততই তাহার দৃষ্টি তদপেক্ষা উন্নতবানের প্রতি পতিত হয়; আর যাহাতে তাহারা সেই পদ লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হয়।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে বিক্রমপুরস্থ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রাধান্য ব্যতীত বৈষয়িক বিষয়ে বড় কেহ লিপ্ত ছিলেন না। স্বাবলম্বনে এই সময়ে বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে জপসার রায়, সোনারঙ্গের ও সোমকাটের ভুঁইয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

ক্রমে এই কয়েক ঘর একত্রিত হইয়া জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। জমিদারও নূতন অভ্যুত্থিত প্রজাগণকে দমন জন্য নিত্য নূতন অত্যাচারের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, উভয় পক্ষের দাঙ্গা হাঙ্গামায় বিক্রমপুর উৎসন্ন হইতে বসিল। এই কথা ক্রমে ঢাকার সুবেদারের কর্ণগোচর হইল। এই সময়ে সুবেদার সবফরাজ খাঁর প্রতিনিধি গালেব আলি খাঁ ঢাকার নায়েব এবং যশোবন্ত রায় তাহার দেওয়ান ছিলেন।

প্রজারা জমিদারের বিরুদ্ধে নানা রূপ অত্যাচারের, আবার জমিদার পক্ষ হইতে তাহাদের বোট ও বাইচের নৌকা ভঙ্গের বাবদ অভিযোগ উপস্থিত হইল, প্রমাণে জমিদার পরাস্ত হইলেন। সমবেত প্রজামণ্ডলীর কাতর ক্রন্দনে, গালেব আলি খাঁ ও যশোবন্ত রায় ব্যথিত হইলেন, প্রজারা বলিল, যদি অতঃপর আর জমিদারের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করা হয়, তবে আর তাহাদের মানসম্ভ্রম রক্ষা পাইবার উপায় নাই। ইহার পব রাজাজ্ঞাও প্রচার হইল, অতঃপর যে কোন প্রজা জমিদারের অধীন হইতে আপন বিষয় সম্পত্তি নবাব সরকারের সেরেস্তায় নাম পত্তন করিবে, তাহাদের সহিত জমিদারের আর কোন সংস্রব থাকিবে না! যেমন হুকুম প্রচার, অমনি সাত শত আবেদনকারী আসিয়া স্ব স্ব জমা জোত সম্বন্ধে নবাব সেরেস্তায় নাম পত্তন কবিয়া লইল।[১২]

সেই দিন হইতে নয়পাড়া রাজলক্ষ্মী চির অন্তর্হিত হইলেন, এ দিকে বিক্রমপুরের প্রজামণ্ডলীর স্বাধীনতা লাভের সহিত দিন দিন উন্নতি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আজ বিক্রমপুরের যে এতটা উন্নতি দেখা যায়, তাহার প্রধান কারণ জমিদারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ। দেওয়ান যশোবন্ত রায়ের রামরাজ্যের ফল বিক্রমপুরবাসীগণ অদ্যাপি সম্ভোগ করিয়া সেই মহাত্মার আত্মার চির কল্যাণ কামনায় কীর্তিনাশার উভয় তীর হইতে সমভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। আর যে বীরগণের স্বার্থত্যাগ ও উদ্যোগে এই দাসত্বের মোচন, তাঁহারাও সমুদয় বিক্রমপুরবাসীগণের নিকট অদ্যাপি দেববৎ প্রতীয়মান হইতেছেন।

বিক্রমপুর এই রূপে জমিদারগণের হস্তভ্রষ্ট হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে যে অংশ হুজুরি সেরেস্তার অন্তর্গত থাকে, তাহার রাজকর আদায় হইত ১৭২৮ খ্রিঃ অব্দের বন্দোবস্তে ১৪২৬১ টাকা ও ১৭৬৩ খ্রিঃ অব্দের বন্দোবস্তে বৃদ্ধি পাইয়া ২৪৫৬৫ টাকা। উহার তহশীলদার ছিলেন রাজারাম,[১৩] জপসার কৃষ্ণরাম দেওয়ানের ভ্রাতা। অপর অংশের নাম বিক্রমপুর সাহ[illegible]; বিক্রমপুর পরগণা ও তদন্তর্গত সাহাবন্দব নামে একটি সায়র মহাল হইতে উহার রাজ[illegible]দায় হইত ১২৫০০০ টাকা, সাহাবন্দর দক্ষিণ বিক্রমপুরান্তর্গত নরিকুল গ্রামের পশ্চিম দক্ষিণ, দেভোগ গ্রামের দক্ষিণ ও জপসা গ্রামের উত্তর কালীগঙ্গাতটে বড় জাকাল বন্দর ছিল। দেশী বড় বড় মহাজন ও পর্তুগিজ; ইংরেজদের কুঠি পর্যন্ত এই স্থানে বাণিজ্যব্যপদেশে নির্মিত হইয়াছিল। কালীগঙ্গা মজিয়া গেলে এই বন্দরেরও পতন হয়। এই স্থলে ফৌজদার অবস্থান করিতেন। মসজিদ তৎসংসৃষ্ট পারস্য ভাষা শিক্ষার জন্য একটি মখতব ছিল। এই মখতবে বিক্রমপুরের বহু গ্রামের জনগণ পারস্যভাষা অধ্যয়ন করিতেন। নদী কর্তৃক দেভোগ ও নরিকুল ভগ্ন হইবার পূর্ব পর্যন্ত এই মসজিদ ও একটি ইষ্টক নির্মিত সেতুর ভগ্নাবশেষ এই স্থানে দৃষ্ট হইত। বহু ব্যবসায়ী স্বর্ণবণিক, কর্মকার, সাহা ও জোলা (মুসলমান বস্ত্র বয়নকারী), মুসলমান জাতীয় কাগজ প্রস্তুতকারী (কাগজী) বন্দর থাকা সময়াবধি গ্রাম ধ্বংসের শেষ পর্যন্ত এই স্থানে বাস করিয়াছে। পরে বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থও এই গ্রামে বসতিবাটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কায়স্থ জাতীয় সরকার উপাধিধারী ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য। তাহারা নবাব সরকারে কার্য করিয়া যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করেন ও তদ্দ্বারা কতিপয় ইষ্টকালয় ও মঠ নির্মাণ করিয়া কিঞ্চিৎ কীর্তির সাক্ষী রাখিয়াছিলেন। আজিও

ভূম্যধিকারিগণের বহু কাগজপত্রে সাহাবন্দরের নাম উল্লেখ দেখা যায়। যথা সরকার সোনারগাঁ চাকলে জাহাঙ্গীরনগর পরগণে বিক্রমপুর সাহাবন্দর। এতদ্ভিন্ন গ্রদবন্দর নামে এইরূপ একটি বন্দর বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল, গ্রদবন্দরের নামও বহু প্রাচীন কাগজপত্রে দৃষ্ট হয়। বিক্রমপুর খাস হইলে মোসলমান রাজসরকারে আয় দাঁড়ায় মোট ১৪৯৫৬৬ টাকা। এতদ্ভিন্ন জমিদারি বলিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার সদর রাজস্ব অতি অল্পই ছিল। যাহার আয় বর্তমান সময়ে ৩ পাউন্ড বা ৪৫ টাকা। এতদ্ভিন্ন আর সমুদয়ই তালুকদারিতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

ফতেয়াবাদ

যে ফতে আলির নামানুসারে ফতেয়াবাদের নামকরণ হয়, স্টুয়ার্ট তাহাকে মোগলপক্ষের সুন্দ্বীপের শাসনকর্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জন স্টিভেন্স কর্তৃক ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে যে পুস্তক ভাযান্তরিত হইয়া মুদ্রিত হয়, তাহাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, ফতে খাঁ পর্তুগিজ মাটুস কর্তৃক নিযুক্ত ও সুন্দ্বীপের শাসনভারপ্রাপ্ত হন। পরে বিশ্বাসঘাতক ফতে খাঁ মোগলের পক্ষাবলম্বন করিয়া খ্রিস্টিয়ানদিগের নিধন সাধন করে। ফতে খাঁর পতাকা মধ্যে লিখিত ছিল, 'ঈশ্বরের অনুগ্রহে ফতে খাঁ সুন্দ্বীপের অধীশ্বর, খ্রিস্টিয়ানের রক্তপাতকারী ও পর্তুগিজ জাতির বিনাশকর্তা।' পরে কিন্তু পর্তুগিজদের হস্তেই তাহার নিধন সাধন হয়।

সরকার ফতেয়াবাদের অন্তর্গত সুন্দ্বীপ ও সাহবাজপুর পরগণাদ্বয় যেমন মধ্যবর্তী সরকার বাকলা অতিক্রম করিয়া মেঘনা নদ মধ্যে বিদ্যমান ছিল, ঠিক তদ্রূপ পরগণে বোজেরগোউমেদপুর পরগণা সরকার বাকলার নিকটবর্তী হইলেও উহা সরকার সোনারগাঁ মধ্যে রাখিয়া তদুত্তরবর্তী সরকার বাজুহায়ের অধীন ছিল। বাদসাহী আমলে সদর রাজস্ব আদায়ের একটি নির্দিষ্ট সীমা ছিল না। যে পরগণা যে সরকারের অধীন নির্দিষ্ট হইয়াছে, তত্রত্য পরগণার নিযুক্তিয় কানুনগো ও ক্রোড়ীগণ উহার রাজস্ব আদায় করিয়া, সরকারের প্রধান কার্যাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিতেন।

সরকার ফতেয়াবাদের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি ছিল ঃ জয়সিয়াচার্জ, ফুলচৌল, চেলন, ভাগলপুর, বাধাদিয়া, তেলিহাটী, চরণলক্ষ্মী, চরহাটী, হাবেলীফতেয়াবাদ, লবণের শুল্ক, হজরতপুর, হাটের খাজনা, রসুলপুর, সন্দ্বীপ সিরহরগরল, সিবিমালী, সিরোহী, সুদ দেওয়া, সোয়ামীল (জালালপুর), সাহাবাজপুর, খড়গহর, কুশদিয়া, কওসা, মাকরগঞ্জ, মসুলদাড়, মিরণপুর, ক্ষুদ্র তালুকদার, নাকতুল্যামির, হাজাবহাটি, ইউসফপুর; এই ৩১ মহালের ও পরগণার মোট রাজস্ব ৭৯৬৯৫৫৭ দাম[১৪] ৯০০ অশ্বারোহী ও ৫০৭০০ পদাতিক সরবরাহ হইত।

ফতেয়াবাদ ও মুকুন্দরায়

মুকুন্দরায়ের পূর্বপুরুষেরা কি রূপে এই ফতেয়াবাদ প্রদেশে প্রথম আগমন করেন, তাহার কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমাদের অনুমান হয়, যে সময়ে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের পূর্বপুরুষেরা বিক্রমপুর আগমন করেন, মুকুন্দ রায়ের পূর্ববর্তীগণও সেই সময় পূর্ববঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের রায় রাজগণ, চন্দ্রদ্বীপের রায় রাজগণ ও ফতেয়াবাদের রায় রাজগণ সকলেই 'দে' উপাধিধারী কায়স্থ ছিলেন। আমাদের বিবেচনায় এই তিন রাজবংশের মূল পুরুষ একই ব্যক্তি হইবেন, কেবল আমাদের যে এই মত, এমন নয়, এতৎ সম্বন্ধে ভারতী ও বালক পত্রিকায়[১৫] যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, অন্যান্য লেখকের মতেও এই রূপ অনুমান সপ্রমাণিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে ঐ অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

'বক্তিয়ার খিলিজী যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া প্রবল বাত্যারূপে পূর্ববঙ্গের দিকে

আপতিত হইতেছিল, অনুমান হয়, সেই সময় বাকলা চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দন রায়ের বংশাবলী অথবা নিকট সম্পর্কীয় জ্ঞাতি কি কুটুম্বগণ ছড়াইয়া পড়িয়া পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে কয়টি জমিদারি সৃষ্টি করেন। কালে সেই জমিদারির সৃষ্টি-কর্তাগণ আপন আপন গৃহবিচ্ছেদ, সমাজ বিরোধ প্রভৃতি কারণে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন। দনুজমর্দন রায় বঙ্গজ কায়স্থ, এই সমস্ত ক্ষুদ্র জমিদারির প্রবর্তয়িতাগণও বঙ্গজ কায়স্থ শ্রেণিভুক্ত।"

যদিও বক্তিয়ার খিলিজী পূর্ববঙ্গের সীমাতেও পদার্পণ করেন নাই, তথাপি দে বংশীয় রাজগণ যে, একই বংশোদ্ভব ছিলেন, তাহা আমরাও স্বীকার করি।

এই সময়ে ভূষণাপটি বলিয়াই একটা সাধারণ সমাজের সৃষ্টি হয়। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ মধ্যে ভূষণাপটি বলিয়া এক সম্প্রদায় বর্তমান দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন তিলি, বণিক, কর্মকার শ্রেণির মধ্যেও ভূষণাই পটী বলিয়া একটা সমাজ আছে।

এই রাজবংশের উৎসাহে ভূষণাতে বিবিধ প্রকার শিল্পকার্যের উৎকর্ষ সংসাধিত হয়। ভূষণার অন্তর্গত সাতৈরের শীতলপাটি সর্বত্র প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন বহু দিন পর্যন্ত ঐ বিভাগের বোয়ালমারির কার্পাস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রসাদাৎ ইউরোপে আমদানি হইত। ফতেয়াবাদের স্থপতিরা এক সময়ে পূর্ববঙ্গের যাবতীয় হর্ম্যমালা ও মঠাদি নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্ব স্ব গুণপনার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছে। স্বাধীন প্রদেশে ব্যবসায়ের ও শিল্প কার্যের যে কত উন্নতি হইতে পারে, তৎকালীন ভূষণা, ফতেয়াবাদের প্রতি দৃষ্টি করিলেই তাহার সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হিজরী ৯৮৮ সনে (১৫৭০ খ্রিঃ অব্দে) সম্রাট আকবর শাহের বঙ্গাধিকাবের সমকালে মোরদ খাঁ পাঠান সুবেদার দাউদের অধীনে থাকিয়া ফতেয়াবাদ শাসন করিতেন। পরে মেদিনীপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্তী মোগলমারি (তুকারো) নামক স্থানে মোগল পাঠানে যে যুদ্ধ হয় (১৫৭৫), তাহাতে পাঠানেরা পরাস্ত হইয়া কটকে প্রস্থান করিলে পর হিজলীর (উড়িষ্যার) খামার খাঁ, ফতেয়াবাদের মোরাদ খাঁ এবং সাতগাঁর মীরজানজাদ খাঁ সহজেই মোগল রাজের বশ্যতা স্বীকার করে। মোগল সেনাপতি হোসেন কুলি খাঁর মৃত্যু হইলে পর, পাঠান কোতল খাঁ এই অবসরে পুনরায় বাংলা আক্রমণ করিল, বিশেষত যে সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তা তাহার অবাধ্য হইয়া মোগল রাজের শরণাপন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়াই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।[১৬]

কোতল খাঁ প্রথমত সাতগাঁর শাসনকর্তা মীরজানজাদ খাঁকে আক্রমণ করিলেন, মীর সাহেব আত্মরক্ষার্থ পলাইয়া ছলিমাবাদ (সেলিমাবাদে) প্রস্থান করিলেন, তথায়ও আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান না করিয়া, দর্পনারায়ণ (কন্দর্পনারায়ণ) প্রতাপ বার ফিরিঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে কোতল খাঁর আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বেই ফতেয়াবাদের শাসনকর্তা মোরাদ খাঁর মৃত্যু হইল। এই সময় মুকুন্দ রায় তথাকাব এক সামান্য জমিদার বলিয়া পরিচিত। মোরাদের সহিত তাহার বিশেষরূপ সখ্য ভাব থাকায় মুকুন্দ তাহার পুত্রগণের যথোচিত সহায়তা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

কোতল খাঁ ফতেয়োবাদ আক্রমণ করিল, মুকুন্দ রায় মোরাদের সৈন্যগণের সহিত নিজ দলবল মিলাইয়া কোতল খাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহও ঠিক এই সময়ে বহু সংখ্যক সৈন্য সহিত বাংলায় প্রবেশ করিয়া কোতল খাঁর প্রতিকূলে উপস্থিত হইলেন। অননোপায় হইয়া পাঠানেরা বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার উড়িষ্যায় পলায়ন করিল।[১৭]

মানসিংহ জানিতে পারিলেন, মুকুন্দ মোগল পক্ষাবলম্বী হইযা পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এজন্য নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া ফতেয়াবাদের অন্য কোন মুসলমান শাসনকর্তা নিয়োগ না করিয়া, মুকুন্দ রায়কে রাজোপাধি প্রদান করিয়া ঐ স্থানের সম্পূর্ণ ভারার্পণ করিলেন। রাজা মুকুন্দ অকৃতজ্ঞ ছিলেন না, তিনি পূর্ব শাসনকর্তা মোরাদ খাঁর পরিবারকে যথোচিত ভূবৃত্তি প্রদান করিয়া যাহাতে তাহারা সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকিতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দিলেন। এইরূপে নামে মাত্র মোগলাধীনে থাকিয়া যখন মুকুন্দ রায় ভূষণার কর্তৃত্ব করিতেছিলেন, তৎকালে উহার যেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই বর্ণনা করা গিয়াছে। অতঃপর কিন্তু তিনি বিদ্রোহী দলে যোগদান করেন।

মানসিংহ বাংলায় আসিয়া যেরূপভাবে বিদ্রোহী জমিদারদিগকে দমন করিয়াছিলেন, তাহার বার বার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ভূষণাও মোগল সেনাপতির হস্তগত হইল। বিশেষ পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াও মুকুন্দ রায় আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। অগণিত মোগলবাহিনীর সহিত মুষ্টিমেয় যোদ্ধা লইয়া যতক্ষণ পারিলেন, তিনি আপন ভুজবলের পরিচয় দিতে ক্ষান্ত হইলেন না, পরিণামে সম্মুখ সমরে জীবন-বিসর্জন করিয়া ভবিষ্যবংশীয়গণও এইরূপে স্বদেশের উদ্ধার কল্পে জীবন ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত না হয়, এই উপদেশ প্রদানচ্ছলে যেন সেই সুরভোগ্য ত্রিদিবধামে গমন করিলেন।[১৮] প্রবাদ আছে এই সময়ে এক মোগল সেনাপতি মুকুন্দ রায়ের কন্যার সতীত্বনাশের উদ্যোগ করিলে, রাজনন্দিনী হস্তস্থিত অসিদ্বারা সেই আততায়ীর বক্ষ বিদ্ধ করিয়া দেন; পরে স্বীয় বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া ইহলোক হইতে সুরলোকে প্রস্থান করেন। পামর সেনাপতিও আর জীবিত থাকিল না ; অনন্ত নরকে তাহার স্থান নির্দেশ হইল। মুকুন্দের ছয় পুত্র, তন্মধ্যে শত্রুজিৎ ও শিবরামের নাম অবগত হওয়া যায়। শত্রুজিৎ পুনরায় স্বাধীন হইবার উদ্যোগী হওয়ায়, বাদসাহের সৈন্যকর্তৃক ধৃত হইয়া দিল্লিতে প্রেরিত ও তথায় হত হন। তাহার বংশধরগণ অদ্যাপি যশোহর শত্রুজিৎপুরে বাস করিতেছেন। তৎপর সমগ্র ফতেয়াবাদের অন্তর্গত চাকলে ভূষণা সংগ্রাম-সাহের করায়ত্ব হয়।

দীঘলবালা গ্রামে প্রাণনাথ ভট্টাচার্যের গৃহের ১৬০৮ নং তায়দাদ ও গঙ্গারামপুরের পরেশনাথ স্মৃতিতীর্থের গৃহে ১৯৩৩ নং তায়দাদ (১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দের) যাহা মুকুন্দরাম ব্রহ্মত্র প্রদান করেন, তাহাও তৎপুত্র শত্রুজিতের নিষ্কর দানপত্রে যাহা সম্পাদিত হয়, উহা যশোহরের কালেক্টরীর ১২০৯ সনের তায়দাদ কাগজপত্র দৃষ্টে জানা যায়।

ব্লকমানের আইন-ই-আকবরী পাঠে অবগত হওয়া যায়, ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে মোরাদ খাঁ মুনিম খাঁর আদেশে ফতেয়াবাদ চাকলা অধিকার করে। আমাদের বিবেচনায় তৎসময়ে ফতেয়াবাদ মোগলের নাম মাত্র অধিকারে আইসে, বাস্তবিক তৎসময়েও পাঠানদের হস্ত হইতে ফতেয়াবাদ বিচ্যুত হয় নাই।

কালাপাহাড়

আকবর বাদসাহের শাসনের ২৮ বৎসরে (১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে) খানই আজাম বাদসাহের পক্ষ হইতে বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত ছিলেন। মাসুম কাবুলী ও কতুলু লোহালী (কুতুল খাঁ) বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন। কালীগঙ্গার নিকট উভয় পক্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

রাজকীয় সৈন্য শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইয়া এক মাস পর্যন্ত যুদ্ধ করে। প্রত্যহই উভয় পক্ষের যুদ্ধ ঘটিত। উভয়পক্ষই সমভাবে সাহস প্রদর্শন করে, কিন্তু পরিশেষে বিদ্রোহী দলের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হওয়ায় মোগলপক্ষ জয়লাভ করে। এই সময়ে বিদ্রোহী দলের অন্যতম নেতা কাজীজাদা ফতেয়াবাদ হইতে অনেকগুলি যুদ্ধজাহাজ ও কামান বন্দুক লইয়া স্বপক্ষের

সাহায্যার্থে উপস্থিত হন; কিন্তু বাদসাহী সেনার গোলাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। মাসুম খাঁর আদেশে কালাপাহাড় কাজীজাদার অধীনস্থ সৈন্যের নায়ক পদে বরিত হন। (ইলিয়ট কৃত আকবরনামা ৬৭ পৃষ্ঠা।)

পূর্ববঙ্গে বহু প্রস্তর-নির্মিত দেবমূর্তি ভগ্নাবস্থায় দৃষ্ট হয়। উহাদের মধ্যে কাহারও নাসিকা, কাহারও বা কর্ণ, মুণ্ড ইত্যাদি ভগ্ন দেখা যায়, তাহা কালাপাহাড়ের কুকীর্তি বলিয়াই অবগত হওয়া যায়। সম্ভবত এই সময়েতেই ফতেয়াবাদের আধিপত্য লাভ করিয়া কালাপাহাড় এই কুকর্মের অবতারণা করে। উড়িষ্যার স্বাধীনতা ইহার হস্তে নষ্ট হয়।

কালাপাহাড় ব্রাহ্মণনন্দন; পূর্বনাম রাজু; পরে কোন মুসলমান আমিরের কন্যার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া মুসলমান ধর্ম পরিগ্রহ করে। কেহ কেহ বলেন যে, জোর করিয়া তাহার সহিত মুসলমান কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়।

ইলিয়টকৃত আইন-ই-আকবরির অনুবাদ পাঠে অবগত হওয়া যায়, মাসুম কাবুলী, বাদসাহের সহিত যখন পরাস্ত হইয়াছেন, তখনই ফতেয়াবাদে আশ্রয় পাইয়াছেন। এই হিসাবে ফতেয়াবাদ বাদসাহের বিপক্ষদলের এক প্রধান আড্ডা ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

সংগ্রাম সাহ

প্রায় সার্ধ দ্বিশত বৎসর অতীত হইলে, বঙ্গদেশে সংগ্রামসাহ নামে এক ব্যক্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে আজিও তাহার পরিচয়ের কতিপয় চিহ্ন বর্তমান থাকিয়া তাহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। যশোহর, ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ ও নোয়াখালি প্রভৃতি জেলা, সংগ্রামের প্রধানত লীলাক্ষেত্র ছিল বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন সুদূর মারবাড় বা যোধপুরের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেও সংগ্রামের গুণগ্রামের ও শৌর্যবীর্যের পরিচয় পাইয়া স্বতই তাহার ধন্যবাদ করিতে ইচ্ছা হয়। কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা একটি প্রবাদমূলক বাক্যকে কতকগুলি অসার উপকরণে সজ্জিত করিয়া পাঠকগণের ক্ষণিক মনস্তুষ্টি বিধানে প্রয়াস পাইতেছি। বাস্তবিক প্রকৃত বিষয়ে সত্য ঘটনা পরম্পরার উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এই প্রস্তাবের ভিত্তিসংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তবে তাহাতে কত দূর কৃতকার্য হইব, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। আজ কেবল মহাত্মা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠকগণের অবগতির জন্য এই স্থলে উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কবিকণ্ঠহারকৃত সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা, মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিককৃত চন্দ্রপ্রভা, আলমগীর-নামার আংশিক অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত 'কলিকাতা রিভিউ'র কতিপয় প্রবন্ধ, মিঃ বিভারেজ কৃত বাকরগঞ্জের ইতিহাস এবং মহাত্মা কর্ণেল টড কৃত রাজস্থানের ইতিহাস এবং অন্যান্য কতিপয় প্রবন্ধাবলম্বনে এই প্রস্তাব সংক্রান্ত উপকরণগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে যথাক্রমে এতদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

যে সময়ে দিল্লির মোগল বাদসাহগণ, ভারতে রাজ্য বিস্তার করিয়া একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তৎসময়ে বঙ্গদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার একটুকু নমুনা প্রদান না করিলে, আমাদের বর্তমান প্রস্তাবের একাংশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই জন্য তৎসমসাময়িক কিছু বিবরণ এস্থলে উল্লেখ করা গেল।

মোগল রাজত্বের প্রারম্ভ পর্যন্ত বাদসাহের প্রতিনিধি স্বরূপ মুসলমান নবাবগণের দ্বারা বঙ্গদেশ শাসিত হইত বটে, কিন্তু তৎকালে সাধারণ প্রজা ও দেশ রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেশীয় জমিদারগণের উপরই অধিক পরিমাণে নিভর করিত।

এই সময়ে বঙ্গের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা একরূপ নিরাপদ হইলেও পূর্ব-দক্ষিণ বঙ্গ দুইটি বিদেশীয় জাতির দ্বারা বড়ই বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। উহার এক দল আরাকানবাসী

মগ ও অপর দল ইউরোপের নরপিশাচ পর্তুগিজ দস্যু। এতদুভয় দল কখনও একত্রভাবে কখনও বা বিভিন্নভাবে বিভক্ত হইয়া, পূর্বদক্ষিণ বঙ্গকে এক রূপ জনহীন করিয়া তুলিয়াছিল। মুসলমান বাদসাহকুলতিলক আকবর বাদসাহের সময়ে এই উপদ্রবের প্রথম সূত্রপাত হয়; এই জন্য বাদসাহ, সাহবাজ নামক এক জন সুদক্ষ সেনাপতিকে এই দস্যুদলনব্যপদেশে পূর্ববঙ্গে প্রেরণ করেন। সাহবাজ খাঁ মেঘনা নদীর মোহানায় সেনানিবেশ করিয়া স্বীয় নামানুসারে এই স্থানকে সাহবাজপুর আখ্যা প্রদান করেন। [১৯] সাহবাজ—১৫৮৫ খ্রিঃ অব্দ হইতে ১৫৮৬ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত এই কার্যে ব্রতী থাকিয়া মগ ও পর্তুগিজদিগের প্রভাব অনেক পরিমাণে তিরোহিত করিয়াছিলেন। তৎপর আর এই জন্য তথায় কোন রূপ সৈন্য রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া বাদসাহ তৎপ্রদেশীয় ভূম্যধিকারিগণের উপর দস্যুদমনের ভার দিয়া এক রূপ নিশ্চিত থাকেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সমুদ্রতীরস্থ অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু ছিল এবং সুন্দরবন অঞ্চলে বহুজনাকীর্ণ জনপদ সকল বর্তমান ছিল। সম্ভবত কোন রূপ সংক্রামক-রোগের প্রকোপ অথবা অন্য কোন দৈব দুর্ঘটনার আয়ত্ত হইয়া তাহারা ঐ সকল স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আইন-ই-আকবরী পাঠে জানা যায়, ১৫৮৪ খ্রিঃ অব্দে একটি প্রবল বন্যার উৎপত্তি হইয়া প্রায় দুই লক্ষ লোক স্রোতোবেগে ভাসাইয়া লইয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে এই ঝড় বৃষ্টির সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদান করা গেল।[২০] তৎপরে দুর্ভাগ্যের সহচর মহামারীতেও বহুলোক কালকবলিত হওয়ায় জনহীনতার মাত্রা বর্ধিত হয়। মিঃ গ্রান্ট উল্লিখিত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, এই সকল কারণে, বিশেষত পরিশেষে মগ ও পর্তুগিজদের উৎপাতেই সমুদ্রতীর জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। সম্ভবত শেষোক্ত কারণটি প্রথমটির অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ছিল।

তৎসময়ে মগদিগকে এরূপ নরপিশাচ বলিয়া সাধারণের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, তাহারা কোন পল্লীতে প্রবেশ করিলেই তত্রত্য অধিবাসীরা অন্য স্থানীয় লোকদিগের চক্ষে জাতিভ্রষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। এই কারণে, সন্দ্বীপ ও দক্ষিণ সাহবাজপুরবাসী শূদ্র ও নর সুন্দরেরা, ভিন্ন দেশের হিন্দুর জলস্পর্শ করিতে পারে না। পূর্ববঙ্গে এইরূপ মঘে-তিলি মঘে-কামার মঘে-কুমার প্রভৃতি বর্তমান আছে, যাহারা অন্য সম্প্রদায়ের সহিত কোন রূপেও মিশিতে পারে না।

মিঃ বিভারেজ বাকরগঞ্জের ইতিহাসে এ বিষয়ের একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। তাহা পাঠে অনুমিত হয় যে, মঘেরা যদি কখনও সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়াও কোন কার্য করিতে অগ্রসর হইত, তথাপি তাহার ফল লোকে কু ব্যতীত সু বলিয়া বিশ্বাস করিত না। সাহেব লিখিয়াছেন, আরিয়লখাঁ নদীর তীরবর্তী রমজানপুরের দাসেরা বলে তাহাদের একটি স্ত্রীলোক নদীতে স্নান করিতেছিল, সেই সময়ে এক জন মঘ নদীতট দিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিল। মঘকে দেখিয়া ঐ রমণী তাহার দৃষ্টি হইতে আপনাকে অন্তরাল করিবার জন্য জলে ডুব দিল। কিন্তু মঘ বিবেচনা করিল, ঐ মহিলা বুঝি জল নিমগ্ন হইয়াছে। তখন সে দয়ার্দ্রচিত্তে জলে নামিয়া উহাকে তীরে উঠাইয়া লইয়া আসিল। এই ব্যাপারে পরিণামে ঐ স্ত্রীলোকটি তাহার আত্মীয় স্বজনগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং সাধারণে তাহাদিগকে জাতিভ্রষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। বাস্তবিক তৎকালে মঘেরা যে সকল অসভ্যোচিত উৎপাত করিয়া সমুদ্রতীরটাকে ছারখার করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের শত শত সাধুতা তাহার একাংশও পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

পূর্বে বলা হইয়াছে, সাহবাজ খাঁর প্রতি প্রথমত এই আততায়ী দস্যু দলের দমন করিবার

ভার অর্পিত হয়। সাহবাজ খাঁ উহাদিগকে একরূপ দেশ বিতাড়িত করেন। তখন আর সাহবাজপুরে সৈন্য রাখা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায়, বঙ্গীয় ভৌমিকগণের উপর দস্যুদলনের ভারার্পণ করিয়া সম্রাট সাহবাজকে রাজধানীতে থাকিতে আদেশ করেন। সে সময়ে দক্ষিণ ও পূর্বদিকে বাক্‌লা ও বিক্রমপুরে, দুইটি প্রসিদ্ধ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কুক্ষণে বারভুঁইয়া দলের সহিত বাদসাহ জাহাঙ্গীরের মনোমালিন্য সংঘটিত হয়। তাহারা সম্রাটের অবাধ্য হওয়ায় রাজা মানসিংহ আসিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করেন। এই সুযোগে মঘ ও পর্তুগিজরা প্রশ্রয় পাইয়া পুনবায় সমুদ্রতীরে উৎপাত আরম্ভ করে। তখন পুনরায় আজিম ওসমানের প্রতি ঐ সকল দস্যুদলনের ভার অর্পিত হয়। আজিম ওস্‌মান মঘদিগকে বিতাড়িত করেন এবং কতকগুলি পর্তুগিজকে ধৃত করিয়া চট্টগ্রামে ও ঢাকার নিকটবর্তী মুন্সিগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত একটা স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। এই স্থানটি অধুনা 'ফিরিঙ্গি বাজার' নামে পরিচিত। আজিও তথায় সেই সকল পর্তুগিজদিগের বংশধরেরা বাস করিতেছে।

তৎপর হইতে ক্রমে একজন প্রধান সেনাপতির অধীনতায় কতকগুলি বাদসাহী সৈন্য মেঘনা নদীর মোহানায় নিয়ত অবস্থান করিয়া, মঘ ও পর্তুগিজদিগের উৎপাত নিবারণ করিত। যখন ঔরঙ্গজেব বাদসাহ ভারতবর্ষেব প্রায় একচ্ছত্র রাজা বলিয়া পরিচিত হন, তখন এই দস্যুদমনের ভার, হিন্দু সেনাপতি সংগ্রামসাহের উপর অর্পিত হয়।[২০] বাদসাহ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সংগ্রাম সাহাবাজপুরে আগমন করেন। তখন তথায় এমন কোন দুর্গ ছিল না, যাহাতে নিরাপদে সৈন্য রক্ষা করিতে পারা যায়। এই জন্য সংগ্রাম তথায় একটি দুর্গ নির্মাণ করেন, প্রায় সার্ধ দ্বিশত বৎসর পর্যন্ত লোকে তাহাকে 'সংগ্রামের কেল্লা' বলিয়া নির্দেশ করিত। আলমগীর-নামাতে এই দুর্গের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ১৬৬৫ খ্রিঃ অব্দে উহা নির্মিত হয়। 'কলিকাতা রিভিউ'র ৫৩ ভল্যুমের ৭৩ পৃষ্ঠায় 'চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি' শীর্ষক প্রস্তাবে এই দুর্গ এবং সংগ্রামের প্রতিষ্ঠিত আরও দুইটি দুর্গের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। মিঃ বিভারেজ তাহার বাকরগঞ্জের ইতিহাসের ৪২ পৃষ্ঠায় এই কেল্লা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"প্রফেসার ব্লক ডিক্‌লন এবং বাঞ্জার কৃত একখানা ক্ষুদ্র ম্যাপ আছে, তাহা (১৭২৪-২৬ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত) ফ্রাঙ্কনবেলটাইন কৃত পুস্তকে সংযোজিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, বাক্‌লা একটা দ্বীপ মাত্র ছিল। সংগ্রামের অন্তরীপ বলিয়া একটা চিহ্ন ঐ ম্যাপে দৃষ্ট হইত। ঐ চিহ্নিত স্থান দেখিলে অনুমিত হয়, মেহেদিগঞ্জের থানায় একটি প্রাচীন মোগলদুর্গ ছিল, তাহাকে নির্দেশ করা হইয়াছে।"

আমরা সাহেবের এ কথায় সম্পূর্ণ অনুমোদন করি; কারণ সাহাবাজপুরবাসী অনেক প্রাচীন লোকের নিকট শ্রুত আছি, ঐ পরগণার অন্তর্গত গান্ধিয়া গ্রামের অনতিদূরে ইলিসা নদীর তীরে সংগ্রামের কেল্লা বর্তমান ছিল। এই স্থানটি মেহেদিগঞ্জ থানার অন্তর্গত। পঞ্চ সেনার বন্দোবস্তর[২১] কালেক্টরির কাগজপত্রে সাহাবাজপুর পরগণার অন্তর্গত গান্ধিয়া গ্রামের যে সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে সংগ্রামের গড়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়[২২]। এই কারণে সংগ্রামের অন্তরীপ ও সংগ্রামের কেল্লা যে একই স্থান, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ বোধ হয় না। অর্ধশতাব্দী অতীত হয় নাই, এই প্রাচীন মোগলদুর্গ মেঘনার শাখা ইলিসা নদীর গর্ভস্থ হইয়া, সংগ্রামেব নামের একরূপ বিলোপসাধন করিয়াছে।

বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ঝালকাঠি থানার অধীন রামনগর গাবখান প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া সংগ্রামনীলের খাল বলিয়া একটা দোনের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবত উহা সংগ্রামসাহ কর্তৃক নিখাত হইয়াছিল। এই জন্য তাহার নামের সহিত ঐ খালের নাম সংযোজিত হইয়াছে।

ইহাতে আরও বোধ হয়, সংগ্রামসাহ একটা উপাধিমাত্র ছিল। নীল শব্দের সহিত অন্য কোনও শব্দ যুক্ত থাকিয়া তাহার নামকে পূর্ণাবয়ব করিত; যেমন নীলকণ্ঠ বা নীলচন্দ্র প্রভৃতি। পূর্বাপর যেমন অনেকের উপাধিতেই পরিচয় পর্যবসিত হইয়াছে, নাম কেহ ততটা পরিজ্ঞাত নহেন, তদ্রূপ সংগ্রামসাহ এই উপাধিতেই তিনি পরিচিত ছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ নাম লইবার আবশ্যকতা হয় নাই; কাজেই নামটি একরূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

দস্যু দলের অপসারণ করিবার জন্য সংগ্রাম নানা স্থানে গড়বন্দি করিয়া, সৈন্য রক্ষার উপায় করিয়া লইলেন। পরে মগ ও পর্তুগিজদিগের প্রতিকূলে সৈন্য পরিচালনাপূর্বক তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। এই সময়ে চাঁদ রায় নামে বৈদ্যবংশীয় অপর এক মহাত্মা সংগ্রামের প্রধান সহকারি ছিলেন। সংগ্রাম তাহার দ্বারা নানা বিষয়ে সহায়তা প্রাপ্ত হন। সে যাহা হউক, এই সকল শত্রু দমনের কথা অচিরে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট পৌঁছিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া সংগ্রামকে পুরস্কারস্বরূপ ভূষণা, মামুদপুর ও চাঁদ রায়কে সাহাবাজপুর পরগণার জমিদারি প্রদান করেন।

বঙ্গদেশের দ্বাদশ জন ভৌমিকের মধ্যে যাহারা রাজা মানসিংহের বঙ্গে আগমনের পরেও বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না, তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা হইয়াছিল। যশোহরের প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দ রায়, বিক্রমপুরের কেদার রায়, চাঁদ প্রতাপের চাঁদগাজি কোন মতে বাদসাহকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন না। অনেক ষড়যন্ত্রে ভবানন্দ মজুমদার ও শ্রীমন্ত খাঁ প্রভৃতি কতিপয় কূটবুদ্ধি বাঙালি ব্রাহ্মণের সহায়তায় মানসিংহ এই সকল বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন। তখন বিদ্রোহী রাজন্যগণের রাজ্য কতক সম্রাটের সরকারে খাস রাখা হইল, এবং উহার কতক অন্য জমিদারের হস্তে ন্যস্ত হইল। খাস অর্থাৎ বাজেয়াপ্ত মহাল হইতে জলযুদ্ধ ও নৌপোতের ব্যয় নির্বাহের জন্য নাওরা মহাল সামিল করিয়া রাখা হইল। মুকুন্দ রায়ের ভূষণা মামুদপুর এইরূপ নাওরা মহালের অন্তর্গত রহিয়া ছিল।

ঔরঙ্গজেব এই খাস নাওরা ভূষণা মামুদপুর পুরস্কারস্বরূপ সংগ্রামকে প্রদান করিলেন, সংগ্রাম তথায় এক প্রকাণ্ড বাড়ি নির্মাণ করিয়া বাসস্থান নির্মাণ করেন। আমরা অতঃপর সংগ্রামের পারিবারিক ও জাতীয়-মর্যাদা সম্বন্ধে কতকগুলি কথার অবতারণা করিয়া তৎপরে তাহার প্রধানতম বীরত্বের ও সম্মানের বিষয় বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইব।

আমাদেব দেশে এইরূপ প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে যে, সংগ্রাম বঙ্গদেশে আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণের নিম্নেই এদেশে কোন জাতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়? তদুত্তরে নাকি এইরূপ জানিতে পান যে 'বৈদ্য জাতিই ব্রাহ্মণের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ জাতি'। তখন তিনি আপনাকে 'হাম বৈদ্য' বলিয়া পরিচিত করেন।

সংগ্রাম বাণীবহ গ্রামবাসী শক্তিমাধব বংশীয় সদাশিব সেনের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন[২৩] এবং তৎপুত্র রাধাকান্ত, ধন্বন্তরি আদিত্যবংশীয় কাশীনাথ সেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাহার ছয়টি কন্যা ক্রমে ধন্বন্তরি উচলি বিশ্বনাথ সেনের সহিত ও উচলি রঘুনাথ সেনের সহিত ও আদিত্য রঘুনাথ সেনের সহিত ও বিকর্তন রামচন্দ্রের সহিত ও শক্তিগণবংশীয় দুর্গাদাস সেনের সহিত ও আদ্যগোত্রীয় রঘুনাথ মজুমদারের সহিত পরিণীতা হয়। তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক শেষটির মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন[২৪]। অপর কয়েকটি সম্বন্ধের বিষয় রামকান্ত কবিকণ্ঠহারকৃত কুলপঞ্জিকায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সংগ্রামসাহ কেবল অর্থব্যয়ে কার্য সুসিদ্ধ করিতে না পারিয়া অনেক স্থলে বলপ্রয়োগ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। ধন্বন্তরি উচলিবংশীয় বিজয় সেনের অধস্তন চতুর্থ স্থানীয় রামচন্দ্র সেন বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজের সমাজপতি পদে বরিত ছিলেন। অবশ্য তাহার ধনবল ও কুলকার্য

পরায়ণতা না থাকিলে তিনি কখনও এতাদৃশ উচ্চ সম্মান পাইতে পারেন নাই। সংগ্রামের এইরূপ উচ্চপদস্থ সম্মাননীয় ঘরে কার্য করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু ধন বা জমি জমা প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়াও তিনি তাহাদিগকে কোন মতে বাধ্য করিতে পারেন না। তখন বলপ্রকাশে রামচন্দ্রের পৌত্র রঘুনাথকে ধৃত করিয়া আনিয়া আপনার এক তনয়ার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। কবিকণ্ঠহার কৃত গ্রন্থে উহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে, যথা —

"দুর্দৈবাশনিসম্পাতাদ্রঘুনাথো যুবা মৃতঃ।
সংগ্রামসাহতনয়া পাণিগ্রহণ-পীড়িত ॥"

আমরা আবার এই সংগ্রামকেই ১৬৮৪ খ্রিঃ অব্দে পরিণত বয়সে রাজপুতদিগের বিরুদ্ধে মারওয়াড় প্রদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাই। তখন ঔরঙ্গজেব বাদসাহ দিল্লির সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন।

ইতঃপূর্বে বিবিধ যুদ্ধে বাদসাহের পক্ষে জয়লাভ করিয়া বিশেষতঃ মগ ও পর্তুগিজদিগকে বিতাড়িত করিয়া সংগ্রাম মধ্যবাংলায় কতকগুলি ভূবৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং সম্রাট তাহাকে মনসবদারের সম্মানীয় পদে বরণ করিয়াছিলেন। এখন সেই বয়োবৃদ্ধ সেনাপতি যোধপুরে পৌঁছিয়া কয়েকটি যুদ্ধ করিলেন, বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইল, যোধপুরের বীরপুত্রেরা প্রমাদ গণিয়া যুদ্ধ করিয়াও যোধপুর রক্ষার আর কোন উপায় করিতে পারিল না। তখন তাহারা সেনাপতি সংগ্রামের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া প্রধান ভাট কবিকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিল। মহাত্মা টড সাহেব তাহার রাজস্থান ইতিহাসের দ্বিতীয় ভল্যুমের ৬১ পৃষ্ঠায় এতৎসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বরবাবু তাহার যে সুন্দর অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কতিপয় পংক্তি এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

'সংবৎ ১৭৪১ অব্দের প্রারম্ভ কালে কি যুদ্ধ, কি বিভীষিকা, কিছুই শান্তি হইল না। সুজনসিংহ রাঠোর সেনা লইয়া দক্ষিণাপথে যাত্রা করিলেন। এদিকে লাক্ষ্যচম্পাবত, কেশর কুম্পাবত, ভট্টি ও চৌহান সৈন্যদের সাহায্যে যোধপুরস্থ যবন সেনাদিগকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। সুজনসিংহ হত হইলে ভট্ট কবি সেনাপতি সংগ্রামের নিকট বিনীতভাবে নিবেদন করিল, আপনি স্বজাতীয় ভাতৃ দলে মিলিত হউন। সংগ্রাম তখন মনসবদার পদে অভিষিক্ত থাকিয়া ভূসম্পত্তি সম্ভোগ করিতেছিলেন।'

(বরাট-প্রেস রাজস্থান ২য় খণ্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।)

সংগ্রামও হিন্দু ছিলেন, সুতরাং হিন্দুদিগের দুর্গতি দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অচিরে রাঠোর দলের সহিত তিনি সন্ধি করিলেন, এবং বাদসাহের সর্ববাদিসম্মত প্রভুত্ব রাঠোরদিগকে স্বীকার করাইয়া, তথা হইতে সসৈন্যে চলিয়া আসিলেন। এতৎসম্বন্ধে টড সাহেব, তাহার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভল্যুমের ৬২ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিযাছেন, তাহারও অনুবাদ নিম্নে প্রদান করা গেল। 'সংগ্রাম যে কোন কুলসম্ভূত এবং কিরূপ উচ্চপদারূঢ় ছিলেন, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলাম না। তবে তাহার হৃদয় যেরূপ উচ্চ ছিল, তাহাতে বোধ হয় যে, তিনি কোন মহদ্‌বংশকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।' মহাত্মা টড স্বীকার করিয়াছেন, সংগ্রাম ঔরঙ্গজেব বাদসাহের প্রধান সেনাপতি ও একজন মনসবদার ছিলেন। এই সময়ে আলিবর্দি খাঁকেও একজন সেনাপতি ও মনসবদার পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়। পরে তিনি সৌভাগ্যবশতঃ বাংলার নবাবী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একই সময়ে সংগ্রাম ও আলিবর্দি, একই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সংগ্রাম যে কতকগুলি ভূবৃত্তি ভোগ করিতেছিলেন, তাহাও টড উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই।

এখন দেখা উচিত, কবিকণ্ঠহার ও ভরত মল্লিক-প্রোক্ত সংগ্রাম আর সাহাবাজপুরের কেল্লা

সংস্থাপক ও রাঠোরবিজয়ী সংগ্রাম, একই ব্যক্তি কি না। কবিকণ্ঠহার ১৫৭৫ শকে অর্থাৎ ১৬৫৩ খ্রিঃ অব্দে বা ১৭১০ সংবতে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎপর ভরত মল্লিক চন্দ্রপ্রভা নাম্নী কুলপঞ্জিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, উহা কণ্ঠহারের গ্রন্থের ২২ বৎসর পরে বিরচিত হয়। কিন্তু উভয় গ্রন্থেই সংগ্রামের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কণ্ঠহার যখন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তখন সংগ্রামসাহের পুত্র পর্যন্ত বিবাহ করিয়াছেন। তাহার শ্বশুরকুলের পরিচয় অনুসারে বোধ হয়, সংগ্রাম ও তৎপুত্র রাধাকান্ত এবং কবিকণ্ঠহার এক সময়ের লোক ছিলেন। তৎপর ১৬৬৫ খ্রিঃ অব্দে সাহাবাজপুরে সংগ্রাম স্বনামে গড়বন্দি করেন। আলমগীর-নামাতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তৎপর ১৬৮৪ খ্রিঃ অব্দে সংগ্রামকে রাজস্থানের অন্তর্গত মারবাড় প্রদেশে রাঠোরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখা যায়।

১৬৫৩ হইতে ১৬৮৪ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত প্রায় একত্রিংশৎ বৎসর পর্যন্ত এইরূপে আমরা বঙ্গদেশে ও রাজপুতনায় সংগ্রামকে দেখিতে পাই। আবার এই সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঔরঙ্গজেব বাদসাহই দিল্লির সিংহাসনে রাজত্ব করিতেছিলেন। মোগল রাজবংশ মধ্যে ঔরঙ্গজেব যত দীর্ঘকাল শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন, সেরূপ আর কেহই পারেন নাই। এই সম্রাটের অধীনে থাকিয়া যে একই সংগ্রাম বিভিন্ন স্থানে নানা কার্য সম্পাদন করিযাছিলেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পাবে না। সম্রাট মধ্য-বাংলার ভূষণা মামুদপুর প্রভৃতি স্থান তাহাকে জায়গির অর্পণ করেন এবং কালিয়াতেও তাহার একটা জায়গির ছিল, যাহা আজিও 'নাওরা' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

ভূষণা পরগণার অন্তর্গত মথুরাপুর নামক স্থানে তাহার প্রকাণ্ড বাড়ি বর্তমান ছিল। এই স্থানটি অধুনা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোঁড়কদি ও মধুখালি স্থানদ্বয়ের সন্নিকটে অবস্থিত। কোঁড়কদির মাননীয় ভট্টাচার্য বংশের পূর্বপুরুষ তাহাব গুরু ছিলেন। অদ্যাপি তৎপ্রদত্ত কতিপয় ভূবৃত্তির লিখন উক্ত ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের নিকট বর্তমান আছে। মথুরাপুর গ্রামে আজিও একটা প্রকাণ্ড মঠ দৃষ্ট হয়, যাহাকে সাধারণে সংগ্রামের দেউল বলিয়া থাকে। সংগ্রামসাহের সভায় শ্রীকান্ত বেদাচার্য নামে এক জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি গণনা করিয়া পর দিবস সংগ্রামের মৃত্যু হইবে, এই কথা প্রকাশ কবায় তাহার সম্পত্তি খাস করা হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে সংগ্রামের মৃত্যু হয়, তাহা যে সত্য নয়, আলমগীর নামা—কথিত কেল্লা স্থাপনেই উহা প্রতিপন্ন হইবে। সংগ্রামের পুত্রের পরলোক গমনের পর সীতারাম বায়ের পিতা উদয়নারায়ণ ভূষণার সাজোয়াল হইযা আইসেন।

বিখ্যাতনামা বাণী ভবানীর সময়ে ভূষণাবাসী কোন ব্রাহ্মণের বৃত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তখন ঐ ব্রাহ্মণ রাণীর নিকট যে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে ভূষণার পূর্বস্বামী সংগ্রাম ও সীতারাম রায়ের নাম স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আমরা প্রয়োজন বোধে ঐ আবেদনপত্র হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম

"পূর্ব্বৈঃ সংগ্রাম সাহা নৃপতি প্রভৃতিভিঃ পালিতা ভূষণা যা,
সীতারামেণ পশ্চাত্তদনু রসবতী রামকান্তেন চোঢ়া [২৫]
সা চেদানীং সপত্নীকরযুগলগতা স্বামীহীনা বিরূপা,
কৈঁষাং বা নানুগাসৌ নচ ভবতি কথং কেন বা নানুদম্যা ॥

যশোহর কালেক্টরীর ১২০৯ সালের ১৭০৬ নং তায়দাদ দৃষ্টে অবগত হওয়া যায়, নলদী পরগণার অন্তর্গত ভাঁটুদহ গ্রামের ১০৩১ সালে ১৯ আকবন (১৬২৬ খ্রিঃ অব্দে) রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারকে এবং ১৯৩৩ নং তায়দাদ ১০৪৯ সনের পৌষ মাসে ১৭৪১ খ্রিঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে রামতনু ভট্টাচার্যকে সংগ্রামসাহ ব্রহ্মত্র জমি দান করেন।

সীতারাম রায়

সীতারামের প্রপিতামহ রাম রামদাস রাজমহলের নবাব সরকারের খাস সেরেস্তায় কোন রাজপদে বিচক্ষণতার সহিত কার্য করিয়া বিশ্বাস খাস উপাধি ধারণ করেন। তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র ঐ স্থানের একটি উচ্চ রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র উদয়নারায়ণ, প্রথম পিতৃপদে, পরে নবাব ইব্রাহিম খাঁব অধীনে ঢাকায় রাজকার্যে নিযুক্ত হন। সংগ্রামের বংশধরগণ হইতে ফতেয়াবাদ চাকলা নবাব সরকারে খাস হইলে পর উদয়নারায়ণ বন্দোবস্ত জন্য এই স্থানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ঔরঙ্গজেব বাদসাহের রাজত্ব সময়ে ইব্রাহিম খাঁ বঙ্গদেশের শাসনকার্যে নিযুক্ত হন। (১৬৮৯-১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে) এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে সভাসিংহ ও রহিম খাঁ বিদ্রোহী হইয়া বর্ধমান প্রভৃতি স্থান লুঠ করিয়া উৎসন্ন প্রায় করে। ঠিক ঐ সময়ে ভুঁইয়া মহম্মদপুরের কায়স্থ বংশীয় সীতারাম রায় অভ্যুদয় লাভ করেন। সংগ্রামের কোন বংশধর না থাকায় রাজস্ব আদায় জন্য যৎকালে ভূষণার বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়, তৎ সময়ে সীতারাম আরও কতকগুলি স্থান বন্দোবস্ত করিয়া লন, পরে নবাব ইব্রাহিম খাঁকে দুর্বল বিবেচনা করিয়া, স্বয়ং স্বাধীনতা অবলম্বন করিবার চেষ্টা পান। এই সময় ভূষণা নলদী ও তন্নিকটবর্তী পরগণাগুলি তাহার হস্তগত হয়। ইব্রাহিমকে অকর্মণ্য বিবেচনা করিয়া বাদসাহ তাহাকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে ক্রমে আজিম ওসমান ও তৎপরে মুর্শিদকুলি খাঁকে নিযুক্ত করেন।

মুর্শিদকুলির সময়ে সীতারাম ক্রমেই গর্বিতভাব ধারণ করেন। পরে একবারে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ান, তখন নবাব আবু তোরাপ নামক বাদসাহের নিকট সম্পর্কিত সেনাপতিকে সীতারাম রায়ের দমন জন্য প্রেরণ করেন। আবু তোরাপের সহিত সীতারামের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি নিহত হন। সীতারাম পূর্বে জানিতে পারেন নাই, আবু তোরাপ বাদসাহের নিকট সম্পর্কিত লোক। পরে জানিতে পারিয়াও আবু তোরাপের শৌর্য-বীর্য-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বিশেষ অনুতাপ বোধ করেন।

এদিকে মুর্শিদকুলি জানিতে পারিলেন, আবু তোরাপ যুদ্ধে হত হইয়াছে। তখন তাহার বিশেষ ভাবনার বিষয় হইল, কারণ আবু বাদসাহের স্বসম্পর্কিত লোক। যাহা হউক, কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আপন শালীপতি-ভ্রাতা বক্‌স আলিকেও পরামর্শ প্রদান জন্য রঘুনন্দনকে ভূষণায় প্রেরণ কবিলেন।

সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতী একদিন অতি প্রত্যুষে বিপক্ষের গতিবিধি অবগত জন্য যেমন ছদ্মবেশে বাহির হইয়াছেন, অমনি নবাব সৈন্যগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া বেষ্টন করতঃ পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রবৎ নানা দিক হইতে অস্ত্র প্রহারে হত করিয়া ফেলে। অতঃপর সীতারাম রায়ের সহিত তাহাদের আরও কয়েক বার যুদ্ধ হয়, কিন্তু পরিণামে সীতারাম রায় পরাস্ত হইয়া বন্দিদশায় মুর্শিদাবাদ প্রেরিত হন। তথায় বন্দি অবস্থায় তাহার প্রাণনাশ হয় (১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে)।

নবাবী আমলের জমিদারি খাস হইলে যেরূপ ব্যবহার হইয়া থাকিত, এ সূত্রেও তাহাই হইল। ভূষণার জমিদারি নিম্নলিখিত মত বাঁটোয়ারা হইয়া গেল।

১। রঘুনন্দন স্বীয় ভ্রাতা রামজীবনের নামে নলদী বিভাগে ভূষণা চাকলায় আমিরাবাদ, আরঙ্গাবাদ, বাজুবস্ত, মামুদসাহী, নলদী, তেলীহাটি, নসরৎসাহী সেরদিয়া, কাশীমনগর প্রভৃতি ইহা ১৩০ পরগণায় বিভক্ত এবং রাজস্ব ১৬৯৬০৮৭ টাকা নির্দিষ্ট হয়। নাটোর জমিদারির ইহাই প্রধান অংশ।

২। কৃষ্ণনগরের রাজবংশ, ভূষণার অন্তর্গত হুলদা, চণ্ডিয়া, জগন্নাথপুর প্রভৃতি চাকলা উহা ৭৩ পরগণায় ৫৯৪৮৪৬ টাকা জমা ধার্য হয়।

৩। বঙ্গাধিকারীগণের ভূষণা চাকলায়, জাহাঙ্গীরাবাদ, পাইগা, বাজুবস্ত প্রভৃতি ছিল।

৪। মামুদসাহী জমিদারি, ভূষণা চাকলার মধ্যে অবস্থিত ছিল। উহার কতকাংশ নলডাঙ্গার রাজাদের সহিত বন্দোবস্ত হয়। এতৎসহ আরঙ্গাবাদ বাজুমাল জাহাঙ্গীরাবাদ মামুদসাহী ও তাড়াভাঙ্গা প্রভৃতি কতকাংশ ছিল।

চাকলে জাহাঙ্গীর নগর পরগণে জালালপুর

প্রাচীন ফতেয়াবাদের অন্তর্গত একটি মহাল। উহাব অপর নাম সোয়ামীল। খিলিজি বংশীয় জালালউদ্দিন সাহের নামানুসারে উহার জালালপুর নামকরণ হয়। টোডরমলের বন্দোবস্ত সময়ে, উহার রাজস্ব ছিল, ১৮৫৭২৩০ দাম। নবাব সুজাউদ্দীনের বন্দোবস্ত মতে ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে উহার কর ধার্য হয় ১১০৩৩৫ টাকা। তৎপর নবাব কাশীমআলী খাঁর বন্দোবস্ত মতে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে উহার খাজনা বৃদ্ধি হয়, ১৫৩০০৫ টাকা। সুজাউদ্দীন এবং মীর কাসেমের বন্দোবস্ত সময়ে এই পবগণার মালিক ছিলেন নুরউল্লা, কিন্তু শেষ বন্দোবস্ত সময়ে নুরউল্লা জীবিত ছিলেন না। তাহার শোচনীয় মৃত্যুর বিবরণ উল্লেখ করা যাইতেছে। জালালপুর অতি বৃহৎ পরগণা। এই পরগণা ভূষণার পূর্ব হইতে পদ্মার পশ্চিম পর্যন্ত প্রসারিত। বর্তমান ফরিদপুর জেলা প্রথম "ঢাকা জালালপুর" জেলা নামে পরিচিত ছিল।

নুরউল্লা

চাকলা জাহাঙ্গীর নগরের অন্তর্গত সমস্ত ভূষণা, যশোহর ও ঘোড়াঘাটের কতক খাস ভূভাগ লইয়া, জালালপুর ও অন্যান্য কতকগুলি ক্ষুদ্র জমিদারির সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে জালালপুর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া জানা যায়। নবাব নাজেম মুর্শিদকুলি জাফর খাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন, তৎজামাতা মুর্শিদকুলি খাঁ এই সময়ে শ্বশুরের প্রতিনিধি স্বরূপ ঢাকার শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন। মীর হবীব নামে তাহার এক অমাত্য ছিল, এই ব্যক্তি প্রথমাবস্থায়, হুগলিতে দালালের কার্য করিত, পরে ঢাকার মুর্শিদকুলী খাঁর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রধান অমাত্য পদে বরিত হন।

হবীব অতি ক্রুর প্রকৃতির লোক ছিলেন, বিশেষ ঢাকার সর্বপ্রধান ধনী ও জমিদার আগাবাকের সহিত সখ্য থাকায়, তিনি আর কাহাকেও গ্রাহ্য করিয়া চলিতেন না। যদি জানিতে পারিতেন, কাহারও ধন সম্পত্তি আছে, তবেই অছিলা করিয়া তাহাকে কয়েদ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। বিশেষ শাসন কর্তার প্রিয় পাত্র হওয়ায় ও স্বীয় প্রভু নবাবের জামাতার জামাতা হওয়ায় তাহার সাহস অত্যধিক রূপে বাড়িয়া গিয়াছিল।

এই সময়ে জালালপুরের জমিদার নুরউল্লার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে বলিয়া প্রচারিত ছিল। হবীবের উৎক্রোশ দৃষ্টি তদুপরি নিপতিত হইল। কতকবার ছল করিয়া তাহার নিকট হইতে বহু অর্থ সংগ্রহ করা হয়, পরে যখন আবার তাহাকে অন্যায় মত চাপিয়া ধরা হয়, তখন নুরউল্লা একেবারে উহা অগ্রাহ্য করিয়া এক কপর্দক দিতেও স্বীকৃত হন না।

হবীব তখন স্বীয় প্রভু মুর্শিদকুলি খাঁকে জানাইলেন, জালালপুরের জমিদার বিদ্রোহী হইয়াছে। যেমন জানান, তৎক্ষণাৎ তদ্বিরুদ্ধে সেনা সজ্জিত হইয়া জালালপুরের দিকে অগ্রসর হইল। নুরউল্লাও তখন মরি-বাঁচি বলিয়া বাধা প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন। উভয়পক্ষের যুদ্ধে বহু সৈন্যের পতন হইয়া পদ্মার স্বচ্ছ সলিল রক্তিমাকার হইয়া উঠিল। পরিণামে কিন্তু নুরউল্লা ধৃত হইয়া ঢাকাতে নীত হয়। পরে তথায় সেই শৌর্যশালী ও নিরপরাধ জমিদারের প্রাণদণ্ড বিধান হয়।

তাহার বহু সম্পত্তি ও ধনরত্ন বাজেয়াপ্ত করা হইলে ধনরত্ন কতক মুর্শিদাবাদে নবাব নাজিমের নিকট ও অধিকাংশ হবীবের ও তৎপ্রভু মুর্শিদের ধনাগারে প্রেরিত হয়। নুরউল্লার

পাটপাশার পরগণা হবীব মিত্র আগাবাকেরের পুত্র সাদেককে দান করেন[২৬]। এই মীর হবীবের নামানুসারেই বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পরগণা হবীবপুরের নামকরণ হয়। হবীবের সহকারি সোমকোটবাসী বৈদ্য দেওয়ান নিধিরাম দাস পরে এই পরগণা হস্তগত করেন। বিক্রমপুরের ন্যায় এই পরগণারও কোন জমিদার বর্তমান সময়ে দৃষ্ট হয় না। গবর্নমেন্টের অধীনে বহু তালুকদাব এই পরগণা ভোগ করিতেছে।

চাকলা বিভাগ

আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে মহাত্মা টোডরমল কর্তৃক বঙ্গদেশ ৩৩টি সরকারে বিভক্ত হইয়া রাজস্ব আদায়ের কার্য চলিতে থাকে। উহার পর ঔরঙ্গজেব বাদসাহের সময়ে মুর্শিদকুলি খাঁ যখন বাংলার শাসন কার্য আরম্ভ কবেন, তৎকালে ঐ চাকলার পরিবর্তে বঙ্গদেশকে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করিয়া রাজস্ব আদায়ের সুবিধা করিয়া লন। তন্মধ্যে চাকলে জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) ও চাকলে ভূষণার কতকাংশ লইয়া বর্তমান ফরিদপুর জেলার সংগঠন হইয়াছে। এই চাকলা বিভাগ সময়ে ভূষণার সীতারাম একজন প্রবল প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন, তাহার সহিত ফরিদপুর ইতিহাসের সম্বন্ধ ততটা অধিক নয়। তথাপি সংক্ষেপে তৎ সম্বন্ধীয় বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন ভূষণা ও জাহাঙ্গিরনগর চাকলা হইতে কোন স্থান ফরিদপুরেব এলাকাভুক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা মহাত্মা রেনেলের ম্যাপ হইতে উদ্ধৃত কবিয়া দিলাম।

রেনেলের ম্যাপের পরিচয় স্থান

রেনেল সাহেবের নাম ইতিহাসজ্ঞ এবং ভূগোল ব্যবসায়ী ব্যক্তি মাত্রেই পরিজ্ঞাত আছেন। তৎকৃত ম্যাপের পরিচয় অনেকের নিকট শুনা যায়, কিন্তু তৎকৃত সংগ্রহ সকল অধিক লোকের নয়ন পথের বশবর্তী হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। অনেকে কোন কোন ইংরাজ অথবা বাঙালির লিখিত নোট দেখিয়া তদবলম্বনে তাহার নাম লইয়া থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে. আমাদের উহা দর্শনের সম্যক সুবিধা ঘটিয়াছিল. সেইহেতু এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইলাম।

রেনেলের পদবীসহ নাম—জেমস্ রেনেল, এফ. আর এস্। এই মহাত্মা বঙ্গদেশের সার্ভেয়ার জেনারেল এবং ইঞ্জিনিয়ার শ্রেণিতে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকার সময়ে, কোর্ট অব ডাইরেক্টরগণের অনুমত্যানুসারে তৎকর্তৃক সমগ্র বঙ্গ বিহার ও এলাহাবাদের মানচিত্র অঙ্কিত ও মুদ্রিত হয।

ইংরাজাধিকারের প্রথম সময়ে, বঙ্গ বিহার আট ভাগে বিভক্ত হয়, যথা— (১) হুগলি, (২) মুর্শিদাবাদ (৩) পাটনা (৪) দ্বারভাঙ্গা, মুঙ্গের, বান্দিয়া, ছাপরা (৫) মালদহ (৬) ঢাকা (৭) মেদিনীপুর (৮) পালামৌ ও সিংহভূম প্রভৃতি। এই আটটি বিভাগে, একবিংশতি খানা মানচিত্র অঙ্কিত হয়।

আমরা এস্থলে দ্বাদশ ও সপ্তদশ সংখ্যক ম্যাপের কোন কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া বর্তমান প্রবন্ধ লিখিতে প্রয়াস পাইলাম।[২৭] বঙ্গদেশের প্রাচীন মানচিত্র পরিদর্শন করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে খাস বাংলা প্রধানত নৈসর্গিক কারণে, দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। বর্তমান সময়ে যদিও প্রায় ঐরূপই পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি উহাব অনেক স্থান ও নদী নালার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এস্থলে যে দুইটি ভাগের কথা উল্লেখ করা হইল, উহার এক ভাগ, পশ্চিমে হুগলি নদী হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ব দিকে গঙ্গা বা পদ্মা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উহার উত্তরে বেতবিয়া ; দক্ষিণে, বঙ্গোপসাগর। অপর ভূভাগ, পশ্চিমে পদ্মা হইতে আরম্ভ হইয়া, পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর পশ্চিম তট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উহার উত্তরাংশ পর্বতময় ও

জঙ্গলাকীর্ণ ব্রহ্মপুত্র নদের তটবর্তী স্থাননিচয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ; এই ভূভাগই গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যস্থ "ব" দ্বীপ নামে পরিচিত।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যশাসন সময়ে প্রথম বিভাগে—

(১) রাজসাহী পরগণা, (২) চুনাখালি, (৩) সাজন, (৪) জাহানাবাদ, (৫) কৃষ্ণনগর, (৬) হুগলি, (৭) যশোহর, (৮) ভূষণা, (৯) মহম্মদসাহী, (১০) সুন্দরবন , এবং দ্বিতীয় বিভাগে ১ম—পাটপাসার, ২য়—ঢাকা, ৩য়—আটিয়া, ৪র্থ—পুখরিয়া, ৫ম—কাগমাইর, ৬ষ্ঠ—আমিরাবাদ এই কয়েকটি স্থান পরিলক্ষিত হইত। এতদ্ভিন্ন ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম স্বতন্ত্র দুইটি স্থান, মেঘনা নদের পূর্বতটে কোগইর নদীর আয়ত্তাধীন হইয়াছিল।

তৎসময়ে জাহাঙ্গীর নগর বা ঢাকা চাকলা বলিতে, উত্তরে—কড়ইবাড়ি, গোনাসার পাহাড় ও শ্রীহট্ট, পূর্বদিকে—মেঘনার পূর্বতটবর্তী ভুলুয়া, লক্ষ্মীপুরা ও জুগদীয়ার পূর্ব। পশ্চিমে—পুখরিয়া ও আবীয়ার পশ্চিম এবং ভূষণা, দক্ষিণে—বঙ্গোপসাগর। বর্তমান সময়ের সমুদয় বাকরগঞ্জ বা বরিশাল জেলা ফরিদপুরের চতুর্থাংশ এবং প্রায় সমস্ত নোয়াখালী ইহার অন্তর্গত ছিল।

ভূষণার সীমা তৎসময়ে এইরূপ ছিল—উত্তরে পদ্মা ও বেতরিয়ার ক্ষুদ্রাংশ এবং কুবারসাহী ; পশ্চিমে মহম্মদসাহী, নলডাঙ্গা ও যশোহর ; দক্ষিণে—ঢাকার অন্তর্গত বাকরগঞ্জের অংশ বিশেষ।

ঢাকা বিভাগের সম্পূর্ণ স্থানগুলির পরিচয় দেওয়া এস্থলে সহজসাধ্য নয়। এখানে মাত্র ঢাকা হইতে বরাবর দক্ষিণাভিমুখে গঙ্গা বা পদ্মার সহিত মেঘনা সম্মিলিত হইয়া যে স্থান হইতে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছে, সেই ভূভাগ মধ্যে কতিপয় স্থানের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। তৎসময় নোয়াখালি ও ত্রিপুরার কতকাংশ ঢাকার অন্তর্গত ছিল, তাহাও পরিত্যক্ত হইল।

১. শ্যামপুর, ২. ফতুল্লা, ৩. নারাযণগঞ্জ, ৪. ইদ্রাকপুর, (মুন্সিগঞ্জ প্রভৃতি) ৫. ফিরিঙ্গিবাজার, ৬. আবদুল্লাপুর, ৭. মীরগঞ্জ, ৮. মাকহাটি, ৯. সেরাজদী, ১০. রাজাবাড়ি, ১১. সেকেরনগব, ১২. হাসারা, ১৩ ষোলঘর, ১৪. বারইখালি, ১৫. নুরপুর, ১৬. ধাউদিয়া, ১৭ বালী গাঁ, ১৮. নুনকিশোর, ১৯. চণ্ডীপুর। রেনেলের ম্যাপে ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া এই স্থানগুলি ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা ও কালীগঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যাহা অধুনা আইরলবিল নামে প্রসিদ্ধ, তৎসময় উহা চুরাইনবিল নামে পরিচিত ছিল।

কালীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ-তটবর্তী স্থান—১. মুলফৎগঞ্জ, ২. কবাতীকাল, ৩. জপসা, ৪. কান্দাপাড়া, ৫. শ্যামপুর, ৬. খীলগাঁ, ৭. সারেঙ্গা, ৮. চিকন্দী, ৯. গঙ্গানগর, ১০. রাধানগর, ১১. খাগটিয়া, ১২. সমকোট, ১৩. রাজনগর, ১৪. লড়িকুল, ১৫. নবীপুর, ১৬. ফুলবাড়ি প্রভৃতি।

মেঘনাতটে, কালীগঙ্গার দক্ষিণ

১. বুহার, ২. স্নানঘাটা, ৩. কার্তিকপুর, ৪. ডনুই, ৫. বামগাও, ৬. ভয়রা, ৭. সাদকপুর, ৮. শ্রীরামপুর, ৯. পাতলাভাঙ্গা, ১০. সিরান্দী, ১১. দুদুলিয়া, ১২. সন্সদীয়া (সিলন্দীয়া), ১৩. লক্ষ্মীরদিয়া, ১৪. ঢেউখালী, ১৫. ছোটবাকরগঞ্জ, ১৬. গান্ধিয়া।

পদ্মাতটে, কালীগঙ্গার দক্ষিণ

১. দীঘারিপাড়া. ২ রাজাখালী, ৩. ভাঙ্গাবাড়ি, ৪. কলারগাঁ, ৫. বালীসার, ৬. বুদারশাপ (বদরাসন), ৭. মাছুয়াখালী, ৮. গজারিয়া, ৯. সোনাপাড়া, ১০. সনরপুর, ১১. সলুয়ারহাট, ১২. বগাও, ১৩. কুশারিয়া, ১৪. ইসলারচর, ১৫. মেন্দিগঞ্জ, ১৬. আবদুল্লাপুর, ১৭. সুলতানী, ১৮. কন্দর্পপুর। এই কন্দর্পপুরের নিম্নে মেঘনা ও পদ্মাব সম্মিলন ঘটে।

গঙ্গা বা পদ্মার শাখা হরগঙ্গার তটবর্তী স্থান

১. ফরিদপুর, ২. পাটপাসার, ৩. হাজিগঞ্জ, ৪. চরমনরিয়া (চরমুকুন্দিয়া), ৫. আলিপুর। এই আলিপুর হইতে হরগঙ্গা বরাবর দক্ষিণাভিমুখে হাবুল্লা নাম ধারণ করিয়াছিল। তাহার তীরে, ৬. সাহারপুর, ৭. সাজাদপুর, ৮. পাটিখালী, ৯. বন্দরখলা, ১০. পাঁচচর, ১১. সেকপাড়া, ১২. গোপালগঞ্জ, ১৩. হবিগঞ্জ, ১৪. আলুরাবাদ, ১৫. মাদারিপুর, ১৬. কুলপদ্বীপ, ১৭. কালকিনী, ১৮. সেলাপট্টি, ১৯. টেঙ্গরামারি, ২০. মসজিদ, ২১. রামনগর, ২২. গৌরনদী। আর বাহুল্য প্রযুক্ত উল্লেখ করা হইল না।

ভূষণা চাকলার অন্তর্গত স্থানের নাম

১. কোষাখালী, ২. হোগলা, ৩. হাবাসপুর, ৪. কুমারখালী, ৫. বেরামপুর, ৬. সাদাপুর, ৭. গুলিশপুর, ৮. বেলগাছি, ৯. কলকাপুর, ১০. জাহাজডিঙ্গা, ১১. কমলদিঘি, ১২. মজুল, ১৩. সেনপাড়া, ১৪. বেরপুর, ১৫. বালিয়াকান্দি, ১৬. নহুয়া, ১৭. আভাসকুনারী, ১৮. গোব্রাখালী, ১৯. কৃষ্ণপুর, ২০. ফরিদপুর, ২১. ছোটডোমান, ২২. মথুরাপুর, ২৩. কানাইপুর, ২৪. হীরাপুর, ২৫. সহরভূষণা, ২৬. গোপালপুর, ২৭. মালিকনগর, ২৮. তালমা, ২৯. হাকিমপুর, ৩০. বাবুখালী, ৩১. জয়নগর, ৩২. গড়টি, ৩৩. রাজাপুর, ৩৪. বিনটপুর, ৩৫. মহম্মদপুর, ৩৬. কামারগাঁ, ৩৭. কলনাপট্টি, ৩৮. কাগাইল, ৩৯. কালীনগর, ৪০. নহাট্টা, ৪১. মীরগঞ্জ, ৪২. মুকসুদপুর, ৪৩. বাইটকামারী, ৪৪. টেঙ্গরাখালী, ৪৫. মহারাজপুর, ৪৬. দীঘলনগর, ৪৭. পুলটিয়া, ৪৮. রঙ্গিগঙ্গ, ৪৯. সেকপাড়া, ৫০. কালীনগর, ৫১. গাঙ্গাটিয়া, ৫২. বলাসী, ৫৩. কয়রা, ৫৪. মজুমপুর, ৫৫. শালখীয়া, ৫৬. খাজুরা, ৫৭. শ্রীরামপুর, ৫৮. দামনাথী, ৫৯. গাণ্ডারহাটি, ৬০. রাজাপুর, ৬১. সাতরিয়া, ৬২. ইনাইতপুর, ৬৩. আড়পাড়া, ৬৪. ডুকালী, (ঢেউখালী) ৬৫. রাজাপুর, ৬৬. গোড়াখালী, ৬৭. দাউদপুর, ৬৮. বানসরী, ৬৯. কলনা, ৭০. সামরুল, ৭১. কালনডিঙ্গা, ৭২. শৌনপুর, ৭৩. চামারী, ৭৪. কালীয়া, ৭৫. দেয়ানশ্রী, ৭৬. গোপালগঞ্জ, ৭৭. গোবরা, ৭৮. বারাণী, ৭৯. টাঙ্গিপাড়া, ৮০. ঘোড়াডাঙ্গা, ৮১. শিবরামপুর, ৮২. চাঁদপুর, ৮৩. ফলসী, ৮৪. নেজারহাট, ৮৫ খড়রিয়ার কতকাংশ বিলসমষ্টি।

অধুনা ভূষণার কতকাংশ যশোহর ও খুলনা জেলার অন্তর্গত এবং কতকাংশ ফরিদপুর জেলার অন্তর্বর্তী হইয়াছে। ফরিদপুর জেলার বর্তমান ম্যাপ অনুসন্ধান করিয়া পরে উহা নির্ধারণ করা যাইবে।

ঢাকার দক্ষিণে ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণ তট হইতে বরাবর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলে একমাত্র কালীগঙ্গা নামে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর পরিচয় পাওয়া যায়। উহা বিক্রমপুরের বক্ষদেশে উপবীতবৎ প্রতীয়মান হইত। মেঘনা হইতে একটি পয়ঃনালী বাহির হইয়া, প্রথমত দক্ষিণ তটে মুলফৎগঞ্জ ও উত্তর তটে ফুলবাড়ির নিকট প্রবাহিত হইয়া পরে তথা হইতে দুইটি ক্ষুদ্র শাখা বরাবর পশ্চিমাভিমুখে দুই দিকে বিস্তৃত হইয়া রাধানগরের নিকট পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। রাজনগর, সোমকোট, রাধানগর, ফুলবাড়ি প্রভৃতি স্থান উভয় নদীর মধ্যস্থলে বর্তমান ছিল। দক্ষিণ দিকের শাখা তটে মুলফৎগঞ্জ, নবীপুর, জপসা, লরিকুল, কান্দাপাড়া, সারেঙ্গা চিকন্দী, গঙ্গানগর এবং উত্তর দিকের শাখার উত্তর তটে চণ্ডীপুর, ঢোলসমুদ্র, ধাউড্ডা, ধানকোণা মুলগাঁ প্রভৃতি গ্রামগুলির অবস্থিতি ছিল। তৎসময় কার্তিকপুর কালীগঙ্গার দক্ষিণ ভাগে মেঘনা তটে বিদ্যমান ছিল।

১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে রেনেলের এই মানচিত্র অঙ্কিত হয়। তৎসময় পর্যন্ত বিক্রমপুর মধ্যে কীর্তিনাশা বা ইদিলপুর মধ্যে নয়াভাঙ্গনীর উদ্ভব হয় নাই। পূর্বে রাজাবাড়ি ও চণ্ডীপুর উভয়

স্থান কালীগঙ্গার উত্তর দিকে ছিল; পরে যে সময় কীর্তিনাশার বিস্তার হয়, তৎসময় আমরা কীর্তিনাশার পূর্বোত্তর পারে রাজবাড়ি এবং দক্ষিণ পারে চণ্ডীপুরের অবস্থান দেখিয়াছি। অধুনা চণ্ডীপুর নদীগর্ভস্থ হইয়া পুনরায় চরে পরিণত হইয়াছে।

অতঃপর কালীগঙ্গা হইতে পদ্মা ও মেঘনার সম্মিলিত স্থান কন্দর্পপুর পর্যন্ত আর কোন নদীর অস্তিত্ব এই মানচিত্রে বিদ্যমান নাই। পরে কিন্তু ইদিলপুর মধ্যে নয়াভাঙ্গনী এবং সাহাবাজপুর ও আবদুল্লাপুরের মধ্যে মেন্দিগঞ্জ নামে একটি নদীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই সময় হইতেই কীর্তিনাশা, নয়াভাঙ্গনী, মেন্দিগঞ্জ নদী ত্রয় মেঘনার সহিত পদ্মার সম্মিলন করিয়া দেয়।

ফরিদপুরের উত্তর-পূর্বে পদ্মা বা গঙ্গা বিদ্যমান ছিল। অতি পূর্বকালে এই নদী ফরিদপুর ও পাঠপাসারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। বর্তমান সময়ে পাঠপাসারের পূর্বোত্তর দিক দিয়া ইহার গতি পরিবর্তিত হইয়াছে। পাঠপাসারের নিকট হরগঙ্গা নামে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পদ্মা হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ফরিদপুরের উত্তর দিক এবং কৃষ্ণপুরের দক্ষিণে পুনরায় পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। ফরিদপুরের নিকট হইতে আবার একটি ক্ষুদ্র শাখা বাহির হইয়া আলিপুরের নিকট পুনরায় পদ্মাতে পতিত হইয়াছিল। হরগঙ্গার তটে কলসদিঘি একটি বৃহৎ বন্দর ছিল। পশ্চিমে চন্দনা নদী মধীপুরের নিকট পদ্মা হইতে বাহির হইয়া কানাইপুর, গোপালপুর, কুমারগঞ্জ, কালীনগর, টেঙ্গরাখালি, দিগনগর, কবিরাজপুর, হবিগঞ্জ হইয়া মাদারিপুরের নিকট হারবিলা নদীর সহিত মিলিয়াছিল। রেনেলের পরবর্তী মানচিত্রে দেখা যায়, এই হারবিলার একাংশই ভুবনেশ্বর নাম ধারণ করিয়াছে। অবশিষ্টাংশ আরিয়লখাঁর মধ্যে বিল ও ভূভাগে পরিণত হইয়াছে। চন্দনার দক্ষিণাংশের নাম মধুমতী নদী, ইহার তীরে গোপালগঞ্জ, গোবরা, খড়রিয়ার বিল ও কোটালীপাড়ার বিলসমষ্টি।

বলাবাহুল্য শত বৎসরের মধ্যে পূর্ববঙ্গ বিশেষত ফরিদপুর ও ঢাকার মধ্যভাগে নদী কর্তৃক এমন পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে. তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়। স্থল ভাগ জলে, জল স্থলে এবং এক নদীর স্থানে অন্য আর একটা প্রাদুর্ভাব হইয়া পুরাতনকে সম্পূর্ণ নূতনে পরিণত করিয়াছে। একমাত্র মানচিত্রের সহায়তা ব্যতীত তাহা অনুমানে নির্ণয় করা কাহারও পক্ষে সহজসাধ্য নয়।

গেরদার প্রস্তর লিপি

কস্‌বে মিরচ নামক পুরাতন দলিলে (কাগজে) গেরদার নাম উল্লেখ আছে। গেরদা ফরিদপুর শহরের ৪/৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি মুসলমান প্রধান গ্রাম। পূর্বে এই গ্রাম ও ফরিদপুর শহরের মধ্যে প্রায় ৩ মাইল লম্বা ও ১০/১১ মাইল পরিধি বেষ্টিত একটি প্রকাণ্ড বিল ব্যবধান ছিল, কিন্তু অধুনা এই প্রকাণ্ড বিলটিতে সম্পূর্ণ রূপে চরা পড়ায় এই স্থানটি বহু সংখ্যক লোকের বাসস্থান হইয়াছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, পূর্বে এই স্থানে ঢোলনগর নামে একটি গ্রাম ছিল। কালক্রমে ঐ গ্রাম পদ্মার স্রোতে ধ্বংস হইয়া ক্রমে জল গর্ভে বিলীন হয়। পবে পদ্মা নদী ক্রমে সরিয়া যায়, কিন্তু ঐ স্থানটিতে জল থাকিয়া বিলরূপে পরিণত এবং ঢোলসমুদ্র নামে অভিহিত হয়। ইহাও খুব সম্ভবপর, ঐ ঢোলনগরের কিয়দংশ বর্তমান গেরদা গ্রামের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। কারণ এই গ্রামে মকবেস অর্থাৎ কব্বরস্থান এখনও আছে।

এই কব্বরস্থানের একাংশ মাত্র (যাহা দরগা নামে অভিহিত হয়) এই দরদা গ্রামের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে এখনও অবস্থিত আছে এবং গেরদা গ্রামের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই পরিচিত। নামটি দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গেরদা নামটি মুসলমানী নাম। কারণ গেরদা অর্থ গদী বুঝায়।

গেরদা শব্দের অর্থ যে গদী ইহা 'জয়নজবোলে' অর্থাৎ হজরত সা আলী বগদাদী সাহেবের আগমন স্থান নামক পার্সিয়ান পুস্তকে স্পষ্টই উল্লেখ আছে। এই গ্রামের পুরাতন নাম কি ছিল তাহা কেহই বলিতে পারেন না, কিন্তু ইহা সা সাহেব, অথবা তাহার সমসাময়িক লোকদিগের আগমনের বহু পূর্ব হইতেই যে বেশ সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল, তাহা কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গ্রামের অন্তর্গত দিঘি মুল্লুক খরসাদের উত্তর পাহাড়ে পীলখান অর্থাৎ হস্ত্যাগার খরলা নামে একটি স্থান আছে। ইহারই ঠিক উত্তরে এক খণ্ড জমিতে কয়েকটি বড় পুকুর আছে, ইহার প্রত্যেক পুকুরই সম্পূর্ণভাবে অথবা প্রায়শঃ খুব বড় বড় পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। এই পরিখাগুলিকে স্থানীয় লোকে গড় বলে। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, পূর্বে ঐ স্থানে একটি দুর্গ ছিল। ইহারই ঠিক পশ্চিমে নগর নামে এক স্থান আছে। ঐ স্থান সম্ভবত নিকটবর্তী স্থানের বাজার ছিল। বর্তমান সময়ে অল্প দিন পূর্বেও জমি চাষ করিবার সময় বিভিন্ন স্থানে পুরাতন দেওয়াল এবং ফটকের ভগ্নাবশেষ মাটির তলে পাওয়া গিয়াছে। ইহার নিকটবর্তী স্থানে কয়েকটি বড় বড় দিঘি ছিল, ইহার মধ্যে দিঘি মুল্লুক খরসেদ এখনও বর্তমান আছে। অন্যগুলি বহুদিন পূর্বেই চরা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সাগরদিঘি 'দিঘি মাথব্বখান' নিম দিঘি প্রভৃতি নামে ইহাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ঢোলসমুদ্রের দক্ষিণ পূর্ব পাহাড়িতে কয়েকটি কব্বরস্থান যুক্ত একটি পুরাতন মসজিদের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই মসজিদ সা আলি বাগ্‌দাদের সময়ের বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহার কয়েকটি প্রস্তর স্তম্ভ আছে এবং ইহার একখানি প্রস্তর লিপিতে আরবীয় ভাষায় বাহাদুর খাঁর নাম লিখিত আছে। যে খানখানা বৈরাম খাঁ ফয়েতাবাদের রাজুব দৌলত রায়কে পবাস্ত করিয়াছিলেন, এই বাহাদুর খাঁ সম্ভবত তাহারই বংশধব। সাহ আলি বাগদাদের অন্যতম বংশধর সায়েদ মহম্মদ মড় ওরফে মদন মিঞা এখনও গেরদায় জীবিত আছেন। শাহ আলী বাগদাদের পুত্র শাহ ওসমান সাহেবের কবর অদ্যাপি বর্তমান আছে। গেরদার সায়েদ আফজার হোসেন শাহ হোসেন টেগবরের বংশধর। ঢোল সমুদ্রের দক্ষিণ পারে শাহ হোসেন টেগবর কবব অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

বঙ্গানুবাদ

১। যাহাবা দযালু এবং অনুকম্পাবান পরমেশ্বরের নামে বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহারা যখন মিলন দিবসে প্রার্থনার ডাক পড়িবে , তখন পরমেশ্বরের নাম কীর্তন করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইবে এবং সমস্ত ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিবে।

২। ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, জগদীশ্বর স্বর্গে তাহার জন্য একখানা গৃহ নির্মাণ করেন। এই ভবিষ্যৎ বক্তার প্রতি তাহার আশীর্বাদ বর্ণন করুন তাহাকে শান্তি দান করুন।

৩। ক্ষমাশীলের (ঈশ্বরের) ক্রীতদাস দ্বারবান আজল বাহাদুর খান সুলতান ১০১৩ হিজরী।

এতদ্বারা জানা যায়, ৩১৪/১৫ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদ প্রস্তুত হইয়াছিল।

রাজা শ্যামল বর্মার তাম্রশাসন

কুলপঞ্জিকানুসারে রাজা শ্যামল বর্মা ৯৯৪ শকে (১০৭২ খ্রিস্টাব্দে) সেন রাজাদেব করদরূপে বিক্রমপুর শাসন করিতেন। সেন রাজাগণ যেমন যজ্ঞ জন্য কনৌজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, শ্যামল বর্মাও ঠিক ঐ কারণ পঞ্চ গোত্রীয় পাঁচজন বৈদিককে বিক্রমপুব আনয়ন করেন। তন্মধ্যে শৌনক গোত্রীয় যশোধর শর্মাকে সামন্ত সার প্রদান করেন।

এই তাম্রশাসন খানা কতদূর বিশ্বাস্য, তাহা ঠিক করিতে পারি নাই। তবে দুই শত বৎসরের হস্ত লিখিত পুস্তক হইতে উহা উদ্ধৃত করা হইল।

... বিক্রমপুর নিবাসী—কটকপতেঃ শ্রীশ্রীমতঃ দয়স্কন্ধাবারাৎ স্বস্তি সমস্ত সুপ্রশস্ত্যপেতসততবিরাজমানশ্বপতিগজপতিনরপতি রাজত্রয়াধিপতি বর্মবংশকুলকমলপ্রকাশ-ভাস্করসোমবংশপ্রদীপ--প্রতিপন্ন কর্ণগাঙ্গেয়শরণাগত--বজ্রপঞ্জব পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমসৌর—মহারাজাধিরাজ অরিরাজ বৃষভশর গৌড়েশ্বর শ্যামলবর্ম দেবপাদবিজয়িনঃ সমুপগতাশেষ রাজন্যকরাজ্ঞীরাণকরাজপুত্র রাজামাত্যমহাধার্মিকমহাসান্ধিবিগ্রহিক-পৌরপতিকদণ্ডনায় কবিষয়িপ্রভৃতীনন্যাংশ্চ রাজপাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষ প্রবরান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্ জনপদক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তমান যথার্হং সমাজ্ঞাপয়তি বিদিতমস্ত ভবতাং বঙ্গবিষয়পাঠে বিক্রমপুরভূক্ত্যন্তে পূর্বে নাগরকুণ্ডা দক্ষিণে ধীপুর পশ্চিমে লঙ্গাচুয়া উত্তরে কুলকুণ্ঠী চতুঃসীমাবচ্ছিন্নপাঠকত্রয়া ভূমিঃ সজলস্থলাসখিলনানাসাকল্যপুলা সগুবাক নারিকেলাদি নানাবিধফলা মহাভূপেন ঘটিতা আচন্দ্রার্কক্ষিতিং যাবৎ স্বচ্ছন্দভোগেনোপভোক্তুং ঋগ্বেদীয় ঋগ্বেদান্তর্গতাশ্বায়নশাখৈকদেশ-ধ্যায়িনে শুনকগোত্রায় শ্রীযশোধরদেবশর্মণে ব্রাহ্মণায় প্রাসাদোপরিশকুনপাতিতা যজ্ঞবিধৌ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ। যদেতদ্দি-দেয়া ভূমিস্ত্রিংশোত্তবমতা তাদৃশহরণে, নরকপতনভয়ং পালনীয়ধর্মগৌরবাৎ। ধর্মার্থসংশিষ্টাঃ।

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
তাবুভৌ পুণ্যকর্মানৌ নিয়তৌ স্বর্গগমিনৌ ॥
বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা ফলম্ ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো লবেচ্চ বসুন্ধরাম্।
স বিষ্ঠায়াং কৃমি ভূত্বা পচ্যতে পিতৃ ভিঃ সহ ॥
ময়াদত্তামিমাং ভূমিং যঃ করোতি হি পালনং।
তস্য দাসস্য দাসোঽহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি ॥
তস্য হেয়া ন কর্তব্যা স্ত্রোত্রিয়াণাং কথঞ্চন।
যদীচ্ছসি মহারাজ শাশ্বতীং গতিমাত্মনঃ ॥
ভূমিদানস্য তু ফলং বৈকুণ্ঠগতিরক্ষয়া।”

তথ্যসূত্র

১. মেঃ বিভারেজকৃত বাকরগঞ্জ ইতিহাসের সাধারণ বিবরণ দেখ।

২ Early Travels in India by Farnandez pp 3 & 11

৩. বৈদ্যবংশীয় বিশ্বনাথ সেন চাঁদ ও কেদার রাযেব সময়ে মুন্সিব কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, এই প্রত্যুত্তবেব শ্লোকটি পণ্ডিত বিশ্বনাথের বিবচিত, যথা —

"চাঁদ রায় কেদার রায় বিক্রমপুর শাসক।
বৃয়ীবংশী বিশ্বনাথ তৎপত্র লেখক ॥"
গোপালকৃষ্ণ কবীন্দ্র কৃত অম্বষ্ঠ সম্পাদিকা দেখ।

৪. ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা শ্রুত হওয়া যায়, তন্মধ্যে যেটি বর্তমান ইতিহাস সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য তাহাই বিবৃত করা হইল।

ব্রহ্মানন্দ তান্ত্রিক সম্প্রদায়েব এক মহাসিদ্ধ পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। চাঁদ বায় ও কেদার রায়

তাহাকে যথোচিত ভক্তি করিতেন। তান্ত্রিক গুরুর শিষ্য হইলেও আচার বিষয়ে তাহারা উহার সমুদয় অনুশাসন মানিয়া চলিতেন না, বিশেষত মদ্যের প্রতি তাহাদের বিশেষ দ্বেষ ছিল।

একদা গিরিঠাকুর কারণপানে বিভোর হইয়া রাজসভাতে সমাগত হন। রাজগণ তাহাকে পরমযত্নসহকারে গ্রহণ ও পদবন্দনা করিয়া, মদ্যপানের জন্য একটুকু ব্যঙ্গোক্তি করেন। তাহাতে ব্রহ্মানন্দ বলেন দেখ তোমরা যে কার্য অসঙ্গত বিবেচনা কর, তাহা আমি সঙ্গত বিবেচনা করি, কিন্তু সাধারণের জন্য এই নিয়ম প্রয়োজনীয় নয়, তাহাও স্পষ্ট বলিতে পারি, কারণ যে ব্যক্তি যে বিষয়ে শক্ত তাহার পক্ষে মাত্র উহাব ব্যবস্থা হইতে পারে। তোমাদের এমন কি ক্ষমতা আছে যে মদ্যপান করাইয়া আমাকে অজ্ঞান করিতে পার।

রাজগণ তাহার কথা শুনিয়া বহু পরিমাণে সুরার আয়োজন করিয়া তাহাকে পান করাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মানন্দ অধঃকরণ করিতে আরম্ভ করিলে আর মদ্যে কুলাইয়া উঠিল না। পরে ভাটিখানা হইতে উত্তপ্ত সুরা আসিতে লাগিল, গিরিঠাকুরও অনবরত পান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে তিন দিন গত হইলে, রাজগণ আশ্চর্য মানিয়া গিরিঠাকুরের পদে পতিত হইয়া স্ব স্ব অন্যায়ানুষ্ঠানের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হইলেন।

গিরি বলিলেন যাহা হইবাব হইয়াছে, এখন আমি প্রস্রাব করিব, কিন্তু যেদিকে উহা প্রবাহিত হইবে সে স্থানের যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। তাহার কার্যকলাপ দৃষ্টে এই কথার প্রতি কাহারও অবিশ্বাসের উদ্রেক হইল না। তৎকালে রাজধানীর পশ্চিম দিকে এক শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য ছিল, সকলে তাহাকে তথায় আনয়ন করিয়া প্রস্রাব করিবার স্থান দেখাইয়া দেওয়ায় ব্রহ্মানন্দ প্রস্রাব করিতে লাগিলেন। সকল লোক আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেখিল, বাস্তবিক অরণ্যে যেন দাবানল উত্থিত হইয়া অচিরে সমুদয় পোডাইয়া ভস্মে পরিণত করিয়া দিল। ঠাকুর অন্তর্হিত হইলেন।

তদবধি এই স্থান পোড়াগাছা নামে অভিহিত হয়। তৎপর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি এই স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করেন। মুলফৎগঞ্জেব থানা, পোস্টাফিস এই স্থানে পরে উঠিয়া আইসে। এই স্থান পূর্বে একটি প্রধান বন্দর ছিল। রাজনগর ও এই স্থান এক সময়ে কীর্তিনাশার গর্ভস্থ হয়।

পোড়াগাছাবাসী, বৈদ্য শিয়াল সেনেব বংশধরগণ সমাজে পরিচিত। এখানকার ত্রিপুরগুপ্তগণ পূর্বে কালিয়াবাসী ছিলেন, তাহাদের শেষ বংশধর রাজা রাজবল্লভের পুত্র দেওয়ান রামদাসের সহিত ও লালা রামপ্রসাদের পুত্র লালা জযনারায়ণের সহিত দুই কন্যার বিবাহ দিয়া, পোড়াগাছা গ্রামে বাসস্থাপন করেন। রাজপাশা গ্রাম নদী কর্তৃক ভগ্ন হইলে ধন্বন্তরি রামসেনের বংশধরগণ এই গ্রামে বাস করিতেন। অধুনা এই বৈদ্যগণ কুরাশী দাসারতা ও কোটাপাড়া ও কোয়রপুব বাস করিতেছেন।

৫ গোসাঞি ভট্টাচার্যের দৌহিত্র বামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার পিতাব নাম যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতাব নাম লীলাবতী। এই বেলপুকুরের ভট্টাচার্যবংশীয়গণ মধ্যে কয়েক ঘব বিক্রমপুর আসিয়া বাস করেন; জপসা, রাজনগর, নড়িয়া এই তিন গ্রামে বহুকাল তাহাদের বংশধরগণ বাস করিয়া নদী কর্তৃক গ্রাম বিনষ্টের পর অধুনা সিরঙ্গল, পালং, লোংসিংহ, চান্দনী, ছয়গাঁ প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। ইহাদের বহু কুলীন ব্রাহ্মণ, ঘটক শিষ্য আছে।

৬. যদি কাহারও মনে কোটি টাকার উপর দেবমূর্তি সংস্থাপন সম্বন্ধে সন্দেহ হয, তবে তাহাদের প্রবোধার্থে বলিতেছি, তাহারা এক বাব, সোমনাথদেব ও জগন্নাথদেবেব অতুল ঐশ্বর্যের কথা স্মবণ করিয়া দেখুন। এই সম্পত্তির অধিপতি বলিয়া, বিগ্রহদ্বয়কে মুসলমান হস্তে কত লাঞ্ছনা ভোগ কবিতে হইয়াছিল। প্রাচীন কাল হইতেই কোন দেবতা প্রতিষ্ঠাকালে তন্নিম্নে বেদিমুলে অন্তত এক খণ্ড অষ্টধাতু ও অষ্টরত্ন দিবার প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। প্রবাদ বাক্যেও এইরূপ দেবতার গৃহে কত জন কত অর্থ পাইযাছে, এইরূপ কথা শুনা যায়। প্রবাদ--বাকরগঞ্জ জেলার কোন কায়স্থ জমিদার বংশের পূর্বপুরুষ ছাগ বিক্রয় করিতে গিয়া বাগেরহাট অঞ্চলে কোন দেবগৃহ নদী কর্তৃক ভগ্ন হইবার সময় তন্মধ্য হইতে বিপুল মুদ্রা পতিত হইতেছে দেখিয়া, অজপাল নৌকা হইতে তটে নামাইয়া দিয়া, সেই নৌকাতে ঐ মুদ্রা ভবিয়া লইয়া যান এবং তদ্দ্বাবা ক্রমে বহু বিষয় সম্পত্তি ক্রয় করিয়া জমিদার হইয়া বসেন। নড়াইলেব জমিদাব সুবিখ্যাত রামরতন রায় ও হরনাথ রায়ের সহিত মনোমালিন্য প্রযুক্ত তাহাদের পিতৃব্য পুত্রদ্বয় দুর্গাদাস রায় ও গুরুদাস রায় গৃহবহিষ্কৃত হন। পরে তাহাদের পৈতৃক সংস্থাপিত রূপাপাতের কালীদেবীর বেদির নিম্নে লক্ষাধিক টাকা পাইয়া, দুর্গাদাস ও গুরুদাস তদবলম্বনে রতনবাবুর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যখন এইরূপ আরও অনেক কথা শুনা যায়, তখন চাঁদ ও কেদার রায়ের মত একজন স্বাধীন রাজার পক্ষে এক কোটি টাকার উপর বিগ্রহ সংস্থাপন কিছু আশ্চর্য নহে।

৭. ইলিয়ট ১০৬ পৃষ্ঠা বালাম ৩।

৮. মেঘনাদ ভট্টাচার্য প্রেরিত প্রবন্ধ, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা। জয়দেবপুরের ইতিহাস দেখ।

৯. ইলিয়ট ১১৬ পৃষ্ঠা আকবরনামা। এই যুদ্ধ যে স্থানে হয়, উহা ফতেজঙ্গপুর নামে পরিচিত।

১০. ঐতিহাসিক চিত্র ১৩১৪ সন ১৬ পৃষ্ঠা। কেদার রায় প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বরী মূর্তি নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত লাখরিয়ার চৌধুরীদের বাটিতে অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত আছে। দশমহাবিদ্যা শক্তি মধ্যে উহা চতুর্থ স্থানীয়।

১১. এই রঘুনন্দন চাঁদ কেদার রায়ের প্রধান অমাত্য ও রঘুনন্দন চৌধুরী ইদিলপুরে কায়স্থ চৌধুরীগণের পূর্বপুরুষ সেনাপতি ছিলেন। ভ্রমবশতঃ তৎবংশীয় কমল শরণকে সেনাপতি বলা হইয়াছিল।

১২ এই সময়ে এই জমিদার বংশে রঘুরাম রায়চৌধুরী বর্তমান ছিলেন, কিন্তু অতি বৃদ্ধ নিবন্ধন পুত্রগণই কর্তৃত্ব করিতেন। তাহাদের দোষে এই বংশের অধঃপতন হয়। বৈদ্যঘটককারিকায় উল্লেখ আছে। 'বিক্রমপুরে রঘুরাম রায় সমাজপতি।'

১৩ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পঞ্চম রিপোর্ট ঢাকা নেয়াবতী দেখ।

১৪. ৪০ দামে এক টাকা।

১৫. ১২৯৯ সালের ফাল্গুন মাসের ভারতী দেখ।

১৬. আকবরনামা মুকুন্দ রায় জমিদার দেখ।

১৭. ডাক্তার ওয়াইজ অথবা অন্য কোন ইতিহাস লেখক মুকুন্দ রায় সম্বন্ধে কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। আমরা পারস্য ভাষায় লিখিত মূল 'আকবর নামা' অনুবাদ করাইয়া এসম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এস্থানে উল্লেখ করিলাম।

১৮. এই যুদ্ধ জঙ্গ জিতিয়া ফতে করিয়া রণ স্থানের নাম মান সিংহ ফতেপুর বা ফতেজঙ্গপুব রাখিয়াছিলেন। অধুনা উহা মাদারিপুর সাব ডিভিশনের অন্তর্গত একটি পরগণা।

১৯. বিভারেজ কৃত বাকরগঞ্জের ইতিহাসের ১৩৪ পৃষ্ঠা দেখ। অধুনা সাহাবাজপুর উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি পরগণায় পরিণত হইয়াছে। বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত জেলা সাব-ডিভিশন এই পরগণার মধ্যে স্থাপিত।

২০. "বাকলা সরকার সমুদ্রতীরে অবস্থিত। বর্তমান পাতসাহের (আকবরের) রাজত্বের উনবিংশ বৎসরে একদিন অপরাহ্ন তিনটার সময়ে সমুদ্রজল বাড়িতে আরম্ভ হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন জলপ্লাবন হয় যে, সমস্ত বাকলা সরকার জলমগ্ন হইয়া যায়। বাকলার রাজা সেদিন একস্থানে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, সমুদ্রের জল ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া, তিনি একখানি নৌকায় আরোহণ করেন, কিন্তু পরে জলমগ্ন হন। রাজপুত্র কতকগুলি অনুচরসহ একটি উচ্চ মন্দিরের চূড়ায় আরোহণ করেন। সদাগরগণ যেখানে একটু উচ্চ স্থান পাইল, সেই স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। ক্রমাগত পাঁচ ঘণ্টা ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি ও অশনিপাত হইয়াছিল। ঘরবাড়ি সমস্ত ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া স্রোতোবেগে প্রবল বায়ুর প্রকোপে কোথায় চলিয়া গেল। কেবল দেবমন্দির ব্যতীত আর কিছুরই চিহ্ন রহিল না। প্রায় দুই লক্ষ লোক জীবন বিসর্জন করিল।' —আইন-ই-আকবরী।

২১. ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় জমিদারগণের সহিত প্রথম জমিদারি পাঁচসন মিয়াদে বন্দোবস্ত হয়, তাহাকে পঞ্চসনা বলে, পরে দশ বৎসরের জন্য দশসনা বন্দোবস্ত হয়।

২২. জেলা বাকরগঞ্জের কালেক্টরীর তৌজিভুক্ত ২৭৫০ নং তালুক দুর্গাপ্রসাদ সেনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ১২০৪ সনের মৌজা ওয়ারি দেখ।

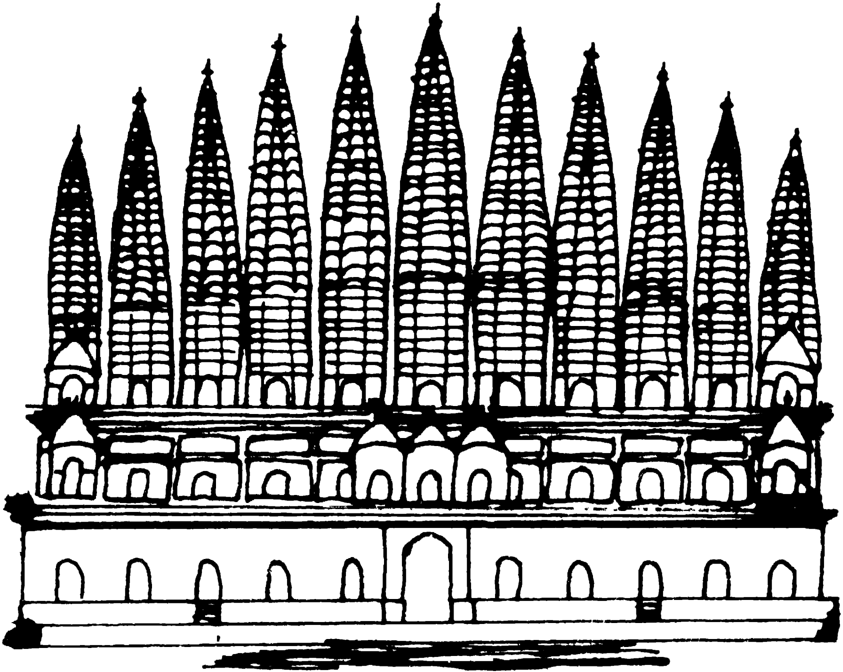
২৩. সদাশিবের পুত্র গোপীরমণ সেন তৎপুত্র মাধব রায় ও জগদানন্দ বায়। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোঁয়ারপুর গ্রামে মাধবের বংশ এবং রাণীবহ গ্রামে জগদানন্দের বংশ বাস করিতেছে। কণ্ঠহার কৃত কুলপঞ্জিকা। ৪০ পৃষ্ঠা দেখ।

২৪. "রঘুনাথ মজুমদার রতিনাথ বিধানকৌ।
চত্বারো রঘুনাথস্য তনয়াঃ বিনয়ান্বিতাঃ ॥
রামকৃষ্ণো রামচন্দ্র রমাকান্তস্তৃতীয়কঃ।
গঙ্গারামোহনুজঃ সর্বে মজুমদার ইতিশ্রুতাঃ
ভূষণা রাজসংগ্রাম সাহাখ্যকন্যকোদ্ভবাঃ ॥ — চন্দ্রপ্রভা ৩৪৯ পৃষ্ঠা।

২৫. রাণী ভবানী নাটোররাজ রামকান্তের সহধর্মিণী ছিলেন। রামকান্তই ভূষণাধিপতি ছিলেন। তদন্তরে রাণী ভবানীর হস্তগত হয়, এই জন্য কবি ভূষণাকে 'সপত্নী-করযুগলগতা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

২৬ Riaz, Text-As 50e Edition, p 300

২৭ ১৭৮০ ও ১৭৮১ সনে এই ম্যাপ দুইখানা মুদ্রিত হয়। বাঙ্গালাদেশ 'আকবর বাদসাহের সময়ে ১৯টি সরকারে বিভক্ত হইয়া পরে মুর্শিদকুলী খাঁর দ্বারা তৎপরিবর্তে চাকলায় পরিবর্তিত হয়।



রাজনগরের একুশরত্ন। সম্মুখের (পূর্বদিকের) দৃশ্য

ফরিদপুরের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

দক্ষিণ বিক্রমপুর ১ম ও ৮ম সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি
বিক্রমপুর ১৭শ অম্বষ্ঠ সম্মিলনী সভার সভাপতি ও
ফরিদপুরের ইতিহাস ১ম খণ্ড এবং বারভুঞা
প্রণেতা শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রের
বিবিধ প্রবন্ধ লেখক—

শ্রীআনন্দ নাথ রায়

সাহিত্যশেখর

প্রণীত

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
জপসা বাবুর বাড়ী, নগর
পোঃ উপসী, জিলা ফরিদপুর।
চৈত্র, ১৩২৮

সাথী প্রেস
২৯নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।
শ্রীহেমচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত।

স্বর্গীয়

অনুজ

নগেন্দ্রনাথ রায়ের

স্মৃতিতে

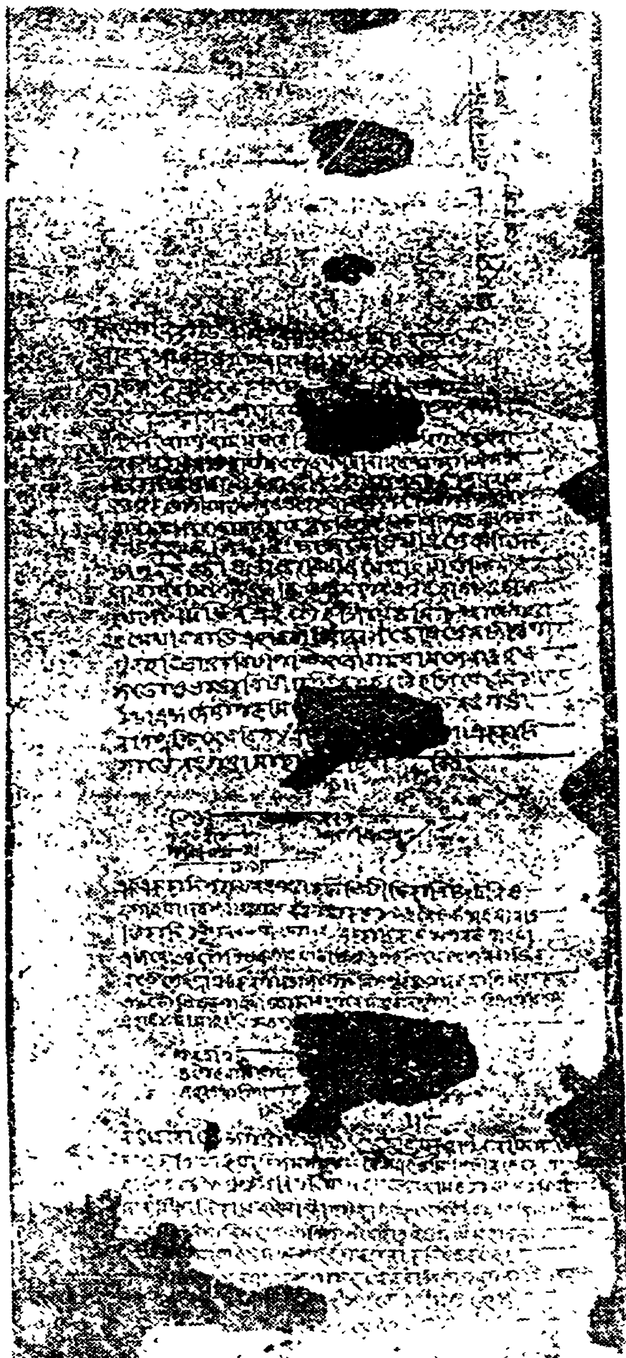
ফরিদপুরের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

উৎসর্গীকৃত হইল।

হতভাগ্য

দাদা।



পরগণা ভিসন সম্বন্ধীয় পারস্য ও বঙ্গভাষার লিখিত দলিল

ভূমিকা

যে আশা বক্ষে ধারণ করিয়া দশ বৎসর পূর্বে ফরিদপুরের ইতিহাস ২য় খণ্ড মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, বিবিধ কারণে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। ভাবিয়াছিলাম এইবারই পরিসমাপ্ত করিব। কিন্তু তদোপযোগী অর্থ সংগ্রহ না হওয়ায় উহা হইয়া উঠে নাই। উহা গ্রন্থকারের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে, কিন্তু অবস্থা পরিজ্ঞাত করিয়া প্রার্থনা সত্ত্বেও দেশবাসী কাহারও মন এদিকে আকৃষ্ট করিতে পারি নাই, কাজেই আমাকে অবস্থা মত ব্যবস্থা করিয়া অপূর্ণ অবস্থায় দীনহীন বেশেই উহাকে সর্বসমক্ষে উপনীত করিতে বাধ্য হইতে হইল।

এই গ্রন্থ সম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে কাহারও নিকট হইতে ১ম ও ২য় খণ্ড ২ টাকা মূল্যে দিব বলিয়া কিঞ্চিৎ দাদন গ্রহণ করিতে বাধ্য হই। কেহ বা সাহায্য কল্পে যৎকিঞ্চিৎও দিয়াছিলেন, যাহাতে গ্রন্থকাবের গমণাগমনের ব্যয় সঙ্কুলন হয় নাই! সেই সমস্ত মহোদয়গণ হয়ত দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল দেখিয়া, গ্রন্থ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া থাকিবেন, তজ্জন্যও আমাকে অসমাপ্ত অবস্থাতেই উহা পরিসমাপ্ত করিতে হইল।

বর্তমান সময়ে গ্রন্থ প্রকাশ করা একরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞ তুল্য ব্যাপার। নানাবিধ চিত্র, সুবর্ণরঞ্জিত মলাট, উচ্চদরের কাগজ সমন্বিত না হইয়া বাহির হইলে কেহ বা পাঠ করিতে চাহেন না এমন কি হস্তে গ্রহণ করিতে চাহেন না। ইহাতে অর্থহীন লেখকগণকে ক্রমশই পশ্চাৎপদ করিয়া ফেলিতেছে। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, আমিও অর্থ সমস্যাতে পতিত হইয়া এই গ্রন্থের অঙ্গে কোনরূপ চারু বসন ভূষণ ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না, পাঠকগণ এইজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

কতকগুলি স্থানের বিবরণ পুস্তক মুদ্রিত হইবার পবে উহার বিপরীত কোন কোন বিবরণ কেহ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা এইবারে উহার কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। পরের খণ্ডে যাহা হয় করা যাইবে।

দপ্তরীর গৃহে কতকগুলি ফর্মা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় আমাকে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, এজন্য অতি অল্প পুস্তক লইয়াই আমাকে কার্য সমাপ্ত করিতে হইল। যাহারা বিলম্ব করিয়া উহার অনুসন্ধান লইবেন, তাহারা হয়ত উহা প্রাপ্ত নাও পাইতে পারেন।

এই খন্ডে যাহাদের গ্রামের বা বংশের পরিচয় প্রদত্ত হইল না তাহারা দেখিবেন একদা প্রচুর কীর্তিকলাপ বক্ষে ধারণ করিয়া যে রাজনগর দিগদিগন্তর নাম বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, যে জপসা কবিতা সম্ভার বক্ষে ধারণ করিয়া দিগদিগন্তর কবিত্ব সুগন্ধি বিতরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং যে কোটালিপাড়ার পণ্ডিতমণ্ডলীর নানাবিধ শাস্ত্রীয় কলধ্বনিতে সমগ্র বঙ্গ মুখরিত হইয়াছিল উহাদের সংস্থানও এই খণ্ডে হইয়া উঠে নাই। যদি সময়ে সুবিধা ঘটে তবে বারান্তরে ৩য় খণ্ডে অন্যান্য স্থানের ও নীলকরের বিবরণ সহ ঐ সকল প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

পরিশেষে যাহাদের দয়ায় ও অর্থে প্রথম খণ্ড বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম সেই দাতা কলিকাতার প্রথিতনামা শ্রীযুত বাবু প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ও কবিরাজপুরবাসী শ্রীযুত কৃষ্ণদাস রায় মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

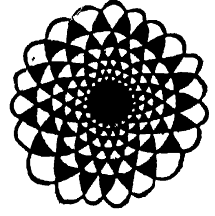
পুস্তক মুদ্রিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় আরম্ভকালের অনেক ঘটনা এবং ব্যক্তি অতীতে পরিণত হইয়াছেন। আমরা উহার কোন প্রতিক্রিয়া করিতে পারিলাম না পাঠকগণ নিজ হইতে উহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

যাহারা নানাবিধ সংবাদ প্রেরণ কবিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া ভূমিকার উপসংহার করা হইল।

ইতি
শ্রীআনন্দনাথ রায়
১৩২৮ সন মধুমাস
শুক্লা দ্বাদশী।

"জপসা লালবাবুব কুটীর"
নগর
পোঃ উপসী (ফরিদপুর)

সূচিপত্র



প্রথম অধ্যায়

মহাল বা পরগণার সূচনা

প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল প্রাচীন দলিলাদি অনুসন্ধান উপলক্ষে, একখানা বাটোয়ারা পত্র আমার হস্তগত হয়। কিন্তু উহাতে যে সনটির উল্লেখ রহিয়াছে তাহা বর্তমান পঞ্জিকার উল্লিখিত সনগুলির সহিত মিলাইয়া দেখিলাম, উহার কোনটির সহিত এই সনের সামঞ্জস্য সাধন হইয়া উঠে না। বহুদিন পর্যন্ত এই সনটির অনুসন্ধান করিয়াও কোনরূপ কূল-কিনারা করিতে না পারিয়া এতদালোচনায় নিবৃত্ত রহিয়াছিলাম।

ঘটনাবশত প্রায় দশ বৎসর পরে আমাদের অপর অংশীর কতকগুলি প্রাচীন দলিল আমার হস্তগত হয়। উহা পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম. পরগণাতি সন বলিয়া একটি সনের উল্লেখ কোন কোন কাগজে রহিয়াছে। আরও দেখিতে পাইলাম তৎসহ বাংলা সন ও তারিখ সংযোজিত আছে। তখন আমার সেই পুরাতন কথা মনে উদিত হইল, বুঝিলাম সেইটি এই পরগণাতি সন হইবারই সম্ভাবনা ; তৎপর হিসাব করিয়া যে ফল লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমার অনুমানের প্রতি কোনরূপ সন্দেহ রহে নাই।

প্রথম হস্তগত সেই দলিলে ৪৯৭ সন মাত্র লেখা ছিল, তৎসহ বাংলা সনের কোনরূপ সংযোগ ছিল না। জপসাবাসী গোপীরমণ সেন তাহার ছয়টি পুত্রকে নিজ বসতবাটি ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া দেন ; এই দলিলখানা সেই বাটোয়ারা পত্র। পরে যে দুইখানা দলিল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সে দুইখানাই তাহার প্রপৌত্রদের সময়ের, এজন্য সন মিলাইয়া লইতে বিশেষ কোনও কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই।

উহার একখানা পরগণাতি ৫৬৬ ও বাংলা ১১৭৫ সনে এবং আর একখানা পরগণাতি ৫৭৪ ও বাংলা ১১৮৩ সনে সম্পাদিত হয়। গোপীরমণের দলিল সম্পাদিত হয় ৪৯৭ সনে। ৫৬৬ হইতে ৪৯৭ অন্তর করিলে দাঁড়ায় ৬৯ বৎসর। আবার ৫৭৪ হইতে ৪৯৭ অন্তর করিলে হয় ৭৭ বৎসর। গোপীরমণ পরিণত বয়সে পুত্রগণকে বাড়ি বিভক্ত করিয়া দেন, সেই হিসাবে ৬৯ কি ৭৭ বৎসর পরে তাহার প্রপৌত্রগণের আমলে এই কাগজ সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অতএব গোপীরমণের দলিলে উল্লিখিত ৪৯৭ সন যে এই পরগণাতি সন, ইহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। এখন এই পরগণাতি সন খ্রিস্টিয় কোন সনে প্রথম উদ্ভূত হয় তাহাই দেখা কর্তব্য।

বাংলা সনের ৫৯১/৯৩ বৎসর পূর্বে খ্রিস্টিয় সন আরম্ভ হয়। এদিকে বাংলা সনের ৬০৯ বৎসরে পরগণাতি সন আরম্ভ হয়। অতএব পরগণাতি সনের প্রথম আরম্ভ হয় খ্রিস্টাব্দের ১১০২/৩ বৎসরে।

এই সনটির সহিত যেন প্রচ্ছন্নভাবে একটা ঐতিহাসিক তথ্য এ পর্যন্ত সাধারণের অগোচরীভূত হইয়া রহিয়াছে। পরগণা শব্দটি মুসলমান রাজত্বের পূর্বে এই দেশে ব্যবহৃত হইত কি না, দেশাংশ পরগণায় বিভক্ত ছিল কিনা, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলেই এই কথার মীমাংসা সাধিত হইতে পারে। যদি পূর্বে উহার কোনরূপ নাম গন্ধ রূপ রেখ কিছুরই পরিচয় না পাই, তবে বলিতে পারি না কি, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ ও বিহার বিজয়ের সহিত এই

পরগণাতি সনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। বর্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ একটা কিছু নূতন পাইলেই স্বীয় মস্তিষ্কের কোমল চিন্তাপ্রসূত প্রমাণ প্রয়োগে হঠাৎ উহার প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়া বসেন। বার্ধক্যে উপনীত হইয়া, অদ্যাপি সেরূপ ভীষণ সাহসের বশবর্তী হইতে পারি নাই। এইজন্য বঙ্গীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিক মহাশয়গণকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা এই পরগণাতি সন সমস্যার মীমাংসা সাধনে অগ্রসর হউন।

এই পরগণাতি সনের পরিচয় ১৩১৪ সনের ঐতিহাসিক চিত্রে মৎকর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। পরে বিক্রমপুরের ইতিহাসেও উহা আলোচিত হইয়াছে। উক্ত ইতিহাসে ও মৎপ্রণীত বারভূঞা গ্রন্থে এতৎ সম্বন্ধীয় দলিল প্রকাশিত হয়। সুবিখ্যাত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রিয়নাথ সেন, ডি, এল, মহাশয়ের খুল্লতাতের নিকট ও এইরূপ পরগণাতি সনযুক্ত দলিল ঘটনাক্রমে কালীয়া নিবাসী ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত রসিকলাল সেন, বি-এ, মহোদয়ের নিকট শুনিয়াছি, সরকারি কার্য উপলক্ষে তিনি যখন ত্রিপুরায় ছিলেন, তথায় এই সনযুক্ত দলিল তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ময়মনসিংহের কোন পত্রিকায় এক সময়ে কোনও এক ব্যক্তি একটি অপ্রচলিত সনের কথা জানিবার জন্য পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল কথার উপর নির্ভর করিলে অনুমান হয় পূর্ববঙ্গে এই সনটি এক সময়ে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। পশ্চিম কি উত্তরবঙ্গে ইহার কোন পরিচয় ছিল কি না তাহা এ পর্যন্ত অবগত হইতে পারি নাই। যদি তাহা পাই তবে বুঝিব সমগ্র বঙ্গের সহিতই এই পরগণাতি সনের কোন সম্বন্ধ রহিয়াছে; অন্যথা যে কারণেই হউক উহা মাত্র পূর্ববঙ্গের সহিতই ঘটনাবশত জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সনটি পঞ্জিকায় গৃহীত হওয়া কর্তব্য।

আমরা যে কয়েকখানি পরগণাতি সনযুক্ত দলিল হস্তগত করিয়াছি উহার মধ্যে একখানার কিছু বিশেষত্ব রহিয়াছে। আমরা ভাবি কেবল ইংরেজ রাজত্বকালেই দলিল পত্রাদির রেজেস্টারি প্রথা সূচিত হইয়াছে। বাস্তবিক এরূপ ভাবা ঠিক নয়; মুসলমান রাজত্বেও রাজ্য রক্ষা ও প্রজাপালন জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে এই রেজেস্টারি প্রথাও ছিল। তবে আজকালকার এত কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না; তখন দলিল গ্রহীতার ইচ্ছানুসারে উহা কখন কখন সম্পন্ন হইত। ঐ রেজেস্টারি কাগজে কাজি সাহেবের শীলমোহর অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইত। আমাদের হস্তগত কাগজে এইরূপ পারস্য ভাষায় লিখিত শীল দেওয়া আছে।

তৎকালে জমি বিক্রয় করিতে হইলে একই কার্যের জন্য দুইখানা করিয়া দলিল লিপিবদ্ধ করিতে হইত। একখানার নাম হইত কবেলা, অপরখানার নাম হইত কবজ। উহার একখানা কেবল বাংলা লেখাতেই সম্পন্ন হইত। অপরখানা বাংলা ও পারস্য এই উভয় ভাষাতে লিখিত হইত। কাগজের নিম্নার্ধে থাকিত বাংলা, উপরার্ধে থাকিত পারসি। এইখানাতেই কাজি সাহেবের শীল ছাপাইয়া দেওয়া হইত।

পরগণা বিভাগ ও বন্দোবস্ত ঃ

সমসুদ্দিনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সেকেন্দরসাহ বঙ্গদেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে, দিল্লিপতি তাহাকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধ চলিতে থাকিল, কিন্তু বাদসাহ এইবারও কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না, অগত্যা তাহাকে ৪৮টি হস্তি ও অন্যান্য উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতে হয়। সেকেন্দর একডালার দুর্গে অবস্থান করিতেন। ইহার সময়ে বঙ্গদেশ জরিপ হইয়াছিল।[১] ইহা হইতে অনুমান হয় তাহার সময়ে একবার জমা ধার্য হয়। আমরা ১২০৩ খ্রিঃ অব্দে প্রথম পরগণাতি সন আরম্ভের কথা বলিয়াছি। সেই হিসাবে সেকেন্দর সম্পাদিত জরিপ জমাবন্দির ১৫৬ বৎসর পূর্বে পরগণাতি সনের আরম্ভ অনুমান করা যায়।

রিয়াজ উস সালাতিনে দৃষ্ট হয়, বাদসাহ হুমায়ুনকে বিতাড়িত করিয়া শেরসাহ দেশের আধিপত্য গ্রহণ করিলে, তৎকর্তৃক বঙ্গদেশ নানাভাগে বিভক্ত হইয়া, বিচারালয় ও কর আদায় কার্যের সুশৃঙ্খলা বিহিত হয়। অতএব তৎকর্তৃক যে একটা জমা নির্দেশের কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেকেন্দরসাহ বা শেরসাহের সময়ের কোন কর বিষয়ক কাগজপত্রের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

অতঃপর আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে টোডরমল কর্তৃক এক জমাবন্দিপত্র প্রস্তুত হয়, যাহা সাধারণের নিকট ওয়াশীল তুমার জমা নামে প্রসিদ্ধ হয়। উহাতে সুবে বাংলার অন্তর্গত সমুদয় জমি ১৮টি সরকারে বিভক্ত হইয়া ৬৮২টি পরগণায় সন্নিবেশিত হয়। এই কাগজে পরগণাগুলি মহাল নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

সাজাহান বাদসাহের রাজত্ব সময়ে তৎপুত্র বাংলার সুবেদার সাহ সুজা কর্তৃক ১৬৫৭ খ্রিঃ অব্দে পুনরায় আর একবার রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত হয়। ১৭২২ খ্রিঃ অব্দে আরঙ্গজেব বাদসাহের রাজত্বকালে জাফর খাঁ কর্তৃক পুনরায় এক রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত হয়। এই হিসাবানুসারে বঙ্গদেশের রাজস্ব পূর্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে বর্ধিত হয়। তজ্জন্য বাদসাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাহার পদগৌরব বর্ধিত করিয়া দেন। এই মহাত্মাই পরে মুর্শিদকুলি খাঁ নামে পরিচিত হন। তৎকর্তৃক যে হিসাব প্রস্তুত হয় তাহার নাম হয় "জমা কামেল তুমারী", মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পরে তদীয় জামাতা সুজাউদ্দিন নবাবীপদ গ্রহণ করিয়া (১৭২৫ খ্রিঃ অব্দে) এই হিসাব পাকা করিয়া লন; ১৭২৮ খ্রিঃ অব্দে উহার সুমার (গোসাহারা) প্রস্তুত হয়। পরবর্তী কাগজগুলিতে পরগণার কথা স্পষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অতঃপর মীরকাসিম আলি খাঁর নবাবী আমলে আর এক হিসাব প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছিল; যাহা পরে সৈয়দ রেজা কর্তৃক ১১৭০ সালে পরিসমাপ্ত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পঞ্চম রিপোর্টে সুজাউদ্দিনের সময়ের ও সৈয়দ রেজার নির্দিষ্ট উভয় হিসাবই উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইংরেজ শাসনের প্রথম অবস্থায় নবাবী আমলের হিসাব দৃষ্টেই কর আদায় হইত। পরে লর্ড কর্নওয়ালিশ গবর্নর হইয়া ১৭৮৭ খ্রিঃ অব্দে পাঁচ বৎসরের জন্য এক বন্দোবস্ত করেন। তৎপর ১৭৯৩ খ্রিঃ অব্দে দশ সনা বন্দোবস্তর সূত্রপাত হইয়া পরে উহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিগৃহীত হয়।

এই সময়ে ফরিদপুর জেলা ছিল না। উহার কতকাংশ ঢাকা, কতকাংশ যশোহর ও অপর কিছু নদিয়া জেলাব অন্তর্গত ছিল। অতএব সেই সময়ের বিবরণ এই স্থানে লিপিবদ্ধ করা হইল না, পরগণা ও গ্রামের বিবরণ মধ্যে যথাসম্ভব উল্লেখ করা হইবে। তবে এই স্থানে বলা আবশ্যক যে ফতেয়াবাদ, খালীফেতাবাদ, সোনারগাঁ, বাজুহায় ও বাকলা সরকার অন্তর্গত কতিপয় মহাল বা মহালের অংশ লইয়া ফরিদপুর জেলার সংগঠন হইয়াছে।

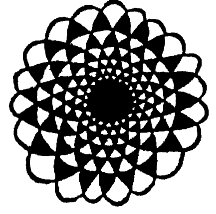
মুসলমান রাজত্বকালে, শাসন সৌকর্যার্থে এক একটি পরগণার জন্য এক একজন কানুনগো নিযুক্ত থাকিতেন। বড় বড় পরগণার মধ্যে ততোধিকও না থাকিত এরূপ নহে। এখনকার ইংরেজ শাসনে যে পুলিশ স্টেশন বা থানা সংস্থাপিত হইয়াছে, উহাতে পরগণার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া নিকটবর্তী কতকগুলি গ্রামসমষ্টি লইয়া গঠন করা হইয়াছে মাত্র। পূর্বে জন্মস্থানের পরিচয় দিতে হইলে গ্রাম ও পরগণার নাম বলিতে হইত, বর্তমান সময়ের পরিচয় উপলক্ষে গ্রাম ও থানার নাম ব্যবহৃত হয়। পরগণার পরিচয় ক্রমশ লোপ প্রাপ্ত হইতেছে। আমাদের বিবেচনায় এই দুইটি অর্থাৎ পরগণা ও থানার কথা লিখিতে গেলে অগ্রে পরগণার বিবরণ প্রদান করাই কর্তব্য। বিশেষত পরগণার সহিত বহু পুরাতন ঐতিহাসিক সম্বন্ধ জড়িত রহিয়াছে। এই জন্য আমরা অগ্রে পরগণার বিবরণ প্রকাশ করিয়া পরে থানা ও তদধীন গ্রামগুলির পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইব।

এই স্থানে একটি কথা বলা সঙ্গত মনে করি। প্রদেশ বিভাগ, পরগণা বিভাগ, জেলা বিভাগ, থানা বিভাগ প্রভৃতি বিধাতার বিধান নয়, রাজশক্তির উপরেই উহার সম্পূর্ণ নির্ভর। রাজা উহা গড়িতেও পারেন, ভাঙিতেও পারেন। যখন যে বিধির বিধান করেন, প্রজাকে তাহাই মানিয়া লইতে হয়। প্রথম যে সকল পরগণার সীমা নির্দিষ্ট ছিল, এই কারণে সময় সময় উহার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই জেলার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে যতগুলি পরগণার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে ১৮৫৭ হইতে ১৮৬০ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত কাপ্তেন জে, ই, গেস্ট্রেল ও এন, টি, ডেলী সার্বেয়ারের অধ্যক্ষতায় যে সার্ভে হয় তাহাতে মাত্র সমগ্র জেলার পরগণাগুলিকে নিম্নলিখিত পবগণায় বিভক্ত করিয়া মানচিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। তৎকালে মাদারিপুর সবডিভিসন ফরিদপুরের অন্তর্গত ছিল না, অতএব তদধীন পরগণা যাহা ঢাকা ও বরিশাল জেলার অন্তর্গত ছিল, তাহা ফরিদপুরের তৎকালীন ম্যাপে না থাকিলেও ঢাকা, বরিশালের ম্যাপ হইতে উহা সংগ্রহ করা হইল।

নং	পরগণা	গ্রাম্য সার্কেল	স্কোয়ার মাইল
১।	নসরৎসাহী	৫৭৮	১৯৭.২৬
৩।	মহম্মদসাহী প্রভৃতি	৭৭	৭৭.২৫
২।	হাবেলী সাতোর প্রভৃতি	৪৪৭	২৮৭.১৩
৪।	নলদী	৩৪৭	১৯৫.৪০
৬।	তেলিহাটি	৮০	৬৮.৩৬
৫।	জালালপুর	৭৫৭	১৬৫.০৯
৯।			১৪৪.৩৬
৭।	মকিমপুর, সুলতানপুর, খড়রিয়া	৭৩৬	৭৮৯.০২
৮।	চরমুকুন্দিয়া	২২	৬৮.১৯
	ঢাকা জেলা হইতে আগত		
	রাজনগব	৫	২৭.৭৭
	বৈকুণ্ঠপুর		
	বরিশাল হইতে আগত		
	কোটালিপাড়া		
	ইদিলপুর		

ফরিদপুর জেলার সমুদয় পরগণাগুলিকে তৎকালে মাত্র এই কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত করিয়া সার্বে করা হইয়াছিল। ভুবনেশ্বর নদের পরিমাণ ৩০.৪৯ ধরিয়া ১৮৬০ সন পর্যন্ত ফরিদপুরেব পরিমাণ ফল ছিল ১৩৫২.৯৫ স্কোয়ার মাইল।

১. বার ভূএা ২০ পৃঃ। ১৩৫৯ খ্রিঃ অব্দে বাদসাহ ও সেকেন্দরেব মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়।



দ্বিতীয় অধ্যায়

পরগণার বিবরণ

সরকার সোনার গাঁ, চাকলে জাহাঙ্গীরনগর

বিক্রমপুর[১]

এই নামটি কতকাল যাবৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা অবধারণ কবা সহজসাধ্য নয়। রাজা বিক্রমাদিত্যের অবস্থান নিবন্ধন অথবা বিক্রমশালী সেন রাজগণ হইতে বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা ঠিকভাবে বলা যায় না। তবে সমতট বঙ্গ বলিয়া একটি স্থানের পরিচয়, বহুকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, উহার ব্যাপকতা কতদূর ছিল অধুনা তাহা নিরূপণ করাও সুকঠিন। ফার্গুসন সমতট বলিতে ঢাকা জেলা, ইৎচিঙের ভারতের পূর্বভাগে অবস্থিত কোনও স্থান এবং ওয়ার্টসার ফরিদপুরের পূর্ব এবং ঢাকার উত্তরবর্তী স্থান নির্দেশ করিতেছেন। ফার্গুসনের কথায় বিক্রমপুর সমতটের মধ্যেই পড়িয়া যায়। ইৎচিঙের বিভাগানুসারে পূর্ব-ভারতের অন্তর্গত বলিয়াও বিক্রমপুরকে সমতটের অন্তর্গত ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ওয়ার্টসার যেভাবে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে একমাত্র বিক্রমপুরকেই নির্দেশ কবিতেছে। অনেকেই এই কথার অনুমোদন করিতেছেন ; আমরাও উহা সমীচীন বলিয়া মনে করি।

সেন রাজগণের তাম্রশাসনে বিক্রমপুরের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। এতদ্দারা অনুমান করা যাইতে পারে এই নামটি হয় সেন রাজত্বকালে অথবা তাহাদের পূর্ববর্তী পাল বাজগণ দ্বারা সংসিদ্ধ হইয়াছিল। এই কারণে বলা যাইতে পাবে সহস্র বৎসর পূর্বে বিক্রমপুরের নামকরণ হইয়াছে।

অধুনা বিক্রমপুর বলিতে যে স্থানটুকু নির্দিষ্ট হয়, বাস্তবিক পক্ষে প্রথমোদ্ভূত বিক্রমপুর কিছু এতটুকু স্থান লইয়া সংগঠিত হইয়াছিল না। তৎকালে বহু বিস্তীর্ণ ভূভাগ লইয়া উহার সংস্থিতি, পরে উহার অনেক স্থান বিভিন্ন পরগণায় পরিগণিত হইয়াছে। কার্তিকপুর, ইদিলপুর, পারজোয়ার প্রভৃতি স্থানগুলি নিশ্চয়ই বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল। চারিশত বৎসর পূর্বে ঐ পরগণাগুলির কোন অস্তিত্ব ছিল না। আমরা ক্রমে এই বিষয় প্রদর্শন করিতেছি।

ইদিলপুরে প্রাপ্ত সেন রাজগণের একখানা তাম্রশাসন[২] এশিয়াটিক জার্নেলের প্রথম অংশের ৮০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে "বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগ প্রদেশে প্রশস্ত * * ঘোড়াঘটক পূর্বে * * স * একা * * ধীগ্রাম সীমা দক্ষিণে শাঙ্কর বসাগোবিন্দ বনান্ত ভূসীমাপশ্চিমে * * ইত্যাদি—"

এই তাম্রশাসনে "লতা" ও "ধীগ্রাম" বলিয়া যে দুইটি স্থানের পরিচয় আছে ; উহা যে বর্তমান ইদিলপুরের অন্তর্গত, লতা ও ধীপুর গ্রাম তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্যামল বর্মার তাম্রশাসনে * নাগরকুণ্ডী, সামন্তসার লঙ্কাচুয়া ও ধীপুর নামের উল্লেখ আছে। ঐ সকল শাসনপত্রের কোথাও ইদিলপুর বা কার্তিকপুরের নামের উল্লেখ নাই। যে সকল নাম বিক্রমপুরের অন্তর্গত বলিয়া শাসনপত্রে দেওয়া হইয়াছে, বর্তমান সময়ে কিন্তু ঐ সকল স্থান ঐ দুই পরগণার অন্তর্গত দেখা যায়।

উপরে যে দুইখানা শাসনপত্রের কথা উল্লেখ করা হইল, উহা প্রায় আট নয় শত বৎসরের পূর্বের বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। যদিও কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে শ্যামল বর্মার শাসনপত্র কৃত্রিম বলিয়া শুনা যায়, তথাপি ঐ কৃত্রিম দলিলও যে বহুশতবৎসর পূর্বে গঠিত হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, ইদিলপুর ও কার্তিকপুর এই দুইটি নাম পরগণা বিভাগেরও বহু পরে উৎপন্ন হইয়াছে।

সাহান্‌সাহ আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে রাজা টোডরমল দ্বারা বঙ্গদেশ উনিশটি চাকলায় বিভক্ত হয়। এই সময়ে সরকার সোনারগাঁর অন্তর্গত ৫১টি মহলের মধ্যে বিক্রমপুর ও কার্তিকপুর এবং সরকার বাকলার অন্তর্গত চারিটি মহলের মধ্যে ইদিলপুরের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস বিক্রমপুরের অংশ হইতেই অন্যান্য নূতন পরগণার ন্যায় এই সময়ে কার্তিকপুর-সুজাবাদ ও ইদিলপুর নামে দুইটি পৃথক পরগণা নির্দেশ করা হয়। এইরূপে বাকরগঞ্জের অন্তর্গত প্রাচীন বাকলা চন্দ্রদ্বীপ হইতে বহু বিভিন্ন পরগণার উৎপত্তি হইয়াছে। মিঃ বিভারেজ তদীয় বাকরগঞ্জের ইতিহাসে উহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুজাবাদ ও ইদিলপুর, এই দুইটি নাম যে মুসলমান নামের সহিত সম্বদ্ধ ও জড়িত তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। অতএব হিন্দু রাজত্বে উহা বিক্রমপুর বলিয়াই পরিচিত ছিল।

দেশের বিভাগ ঠিক রাখা বা না রাখা রাজার ইচ্ছা। আমরা বিক্রমপুর পরগণা দ্বারা ইহা সপ্রমাণ করিতেছি। সেন রাজগণের সময়ে বিক্রমপুরের পরিধি যতদূর বিস্তৃত ছিল তাহার যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। তৎপর নবাবী আমলে এই বিক্রমপুর মধ্যেই আবার, আরাঙ্গাবাদ, রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর প্রভৃতি তিন, চারিটি পরগণার সন্নিবেশ সাধিত হইয়াছে। ১৮৫৭ খ্রিঃ অব্দ হইতে ১৮৬০ পর্যন্ত গেস্ট্রেল ও ডেলি কর্তৃক যে সার্বে হয়, তাহাতে দেখা যায় বিক্রমপুর পরগণাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

৮/৯ নং মকিমাবাদ। ১০ নং বিক্রমপুর। ১৩/১৪ নং রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর। এই তিন খণ্ডের মধ্যে ৮, ৯ ও ১৩, ১৪ নং এই দুই বিভাগে বিক্রমপুর ব্যতীত অপর কয়েক পরগণার জমিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৮/৯ নম্বরে মকিমাবাদ ও আরঙ্গাবাদের মধ্যে উত্তর বিক্রমপুরের দত্তপাড়া, সেকেরনগর, হাসারা, বীরতারা, যোলঘর, দেওভোগ, শ্রীনগর, মাইজপাড়া, কামারগাঁ, পাটাভোগ, বেজগাঁ, পরাণীমণ্ডল, কয়কীর্তন, নাগবভাগ, কুমাবভোগ, মেদিনীমণ্ডল, হলদিয়া, ইছাপাশা, বাজপুর, দেড়শত, ভাওয়ার, মাওয়া, কাওলিপাড়া, কোঁয়রপুর প্রভৃতি বিক্রমপুরের বহু গ্রাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কীর্তিনাশা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী স্থান সমুদয় ১৩/১৪ নম্বর রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর এই দুই বিভাগের অন্তর্গত করা হইয়াছে। ৮/৯/১০ নম্বর উহা বর্তমান সময়েও ঢাকার অন্তর্গত থাকায় সর্বসাকুল্যে বিক্রমপুর নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। কীর্তিনাশার দক্ষিণ তীরস্থ স্থানগুলি সম্প্রতি ফরিদপুরের অন্তর্গত হওয়ায় উহা 'দক্ষিণ' বিশেষণ বিশিষ্ট হইয়া দক্ষিণ বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু বিক্রমপুরবাসী কেহই পরিচয় প্রদানকালে, মকিমাবাদ, আরঙ্গাবাদ ও রাজনগর, বৈকুণ্ঠপুরের পরিচয় প্রদান করেন না। প্রকৃত রাজনগর গ্রামবাসীরাও বাড়ি রাজনগর, পরগণা বিক্রমপুর বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। রাজবিধান কাগজপত্রেই নিবদ্ধ আছে। বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বিস্তৃত বাকলা (চন্দ্রদ্বীপ) পরগণার বহু খর্বতা সাধন হইলেও তত্রত্য পণ্ডিতগণ, যাহারা বিভিন্ন পরগণায় বিভক্ত স্থান সমূহে বাস করিতেছেন, তাহারা সগর্বে বাকলার পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন না।

দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত শ্রীপুর নগরে সুপ্রসিদ্ধ চাঁদ ও কেদার রায়ের রাজধানী ছিল।

এতদ্ভিন্ন সঙ্কট নামক স্থানে, সমতটের সদরস্থান ছিল। সমতটকে বৈদেশিক লেখকগণ কেহ সণকট, কেহ সকাট বা সাকাট লিখিয়া গিয়াছেন। উচ্চারণের বৈষম্যবশত বিক্রমপুরবাসিগণ উহাকে সঙ্কট বা সমকট বলিতেন।[৩] সমগ্র বেহার প্রদেশ মধ্যে যেমন একখণ্ড স্থানের নাম বেহার, সেইরূপ সরকার খলিফেতাবাদ, ফতেয়াবাদ, পূর্ণিয়া প্রভৃতির মধ্যে কয়েকটি খণ্ড স্থানেরও ঐরূপ নাম ছিল, যাহা তৎকালীন সেই সেই বিভাগের সদর স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সমকট (সমতট)ও তদ্রূপ সমগ্র সমতটের সদরস্থান ছিল। রামপালের পূর্বে সমকটের অভ্যুদয় হয়। এক সময়ে এই সমকটের নিম্ন দিয়া সমুদ্র প্রবাহিত থাকাও অসম্ভব নয়। ১৭৬৩ খ্রিঃ অব্দে মেজর জেম্‌স রেনেল গঙ্গা (পদ্মা) ব্রহ্মপুত্র বা মেঘনার সার্ভে উপলক্ষে যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই স্থানটির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই স্থানে বৈদ্যের এক সমাজ ছিল। এতদ্ভিন্ন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্য সম্প্রদায়ের বহু হিন্দু এই স্থানে বাস করিতেন। প্রায় একশত বৎসর অতীত হইল দক্ষিণ বিক্রমপুরের এই প্রসিদ্ধ স্থানটি ও তন্নিকটবর্তী গোবিন্দমঙ্গল, খাগটিয়া প্রভৃতি গ্রামগুলি নদীপ্রবাহে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন দক্ষিণ বিক্রমপুরের নিম্নলিখিত স্থানগুলি কীর্তিনাশা দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজনগর, জপসা, ভোজেশ্বর, লড়িকুল, কানারগাঁ, আকসাইল, সোনার দেউল, গজনাইপুর, পোড়াগাছা, মুলপাড়া, মুলনা, দেভোগ, খীলগাঁ, খারচাকা, বক্‌সীবাজার, রাজপাশা, রাউতপাড়া, পশ্চিমপাড়া, নারিকেলতা, পশাইল, কান্দাপাড়া, রণক, নবিপুর, শ্যামপুর, বিলাসপুর, আমবাড়িয়া, দক্ষিণ সিমলীয়া, পারগাঁ, গাগেরজোড়া, দিয়াপাড়া, হাসেরকান্দি, চণ্ডীপুর, বউলাসার, হাত্তারভোগ, গোপালপুর, মজগুক্রী, ছয়পাড়া, গোকুলগঞ্জ, গোড়াইল, করণগাঁ, বামগাঁ, মাইজপাড়া, একান্দল, লক্ষ্মীপুরা, সাড়া, দগরী প্রভৃতি আরও বহুগ্রাম এবং আংশিকভাবে নড়িয়া, কোমরপুর, চণ্ডীপুর প্রভৃতি স্থানের ভূমিও নদীগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে।

উপরের লিখিত ভগ্নস্থানগুলির মধ্যে আবার অনেক স্থান পয়স্ত (alluvian) হইয়া, চর রাজনগর, চর জপসা প্রভৃতি নামে পরিচিত হইতেছে।

সরকার বাকলা, চাকলে জাহাঙ্গীরনগর

ইদিলপুর

বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায়, ইদিলপুর বিক্রমপুরের একাংশ মাত্র। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত উহা বিক্রমপুরের রাজা চাঁদ ও কেদার রায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। রাজা টোডরমলের বন্দোবস্তে উহা সরকার বাকলার অন্তর্গত হয়।

উত্তরে বিক্রমপুর, পূর্বে মেঘনা নদী, শ্রীরামপুর ও সাহাবাজপুর, দক্ষিণে আরিয়লখাঁ নদী ও আবদুল্লাপুরতপ্পা, পশ্চিমে আরিয়লখাঁ ও ফুলতলা নদী ও বিক্রমপুরের একাংশ ও রায় নন্দলালপুর। দীর্ঘে প্রায় ৩০ মাইল প্রস্থে ২২ মাইল। প্রথম পরগণার বিস্তৃতি এতদূর ব্যাপ্ত ছিল না। জমিদারগণ বল প্রয়োগ দ্বারা উহা ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছেন। ১৭৮০ খ্রিঃ অব্দের রেনেলকৃত ম্যাপে এতন্মধ্যবর্তী নয়াভাঙ্গনি নদীর কোন চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না। টোডরমলের বন্দোবস্ত সময়ে ইহার রাজস্ব ধার্য হয় ২৫৩৪৪০ দাম (৬৩৩৬ টাকা)। পরে ১১৩৫ সনে সুজাখাঁর বন্দোবস্ত সময়ে হয় খালসা বিভাগে ২৮১৬ টাকা ও জায়গির বিভাগে হয় ৪৪১৯৯ টাকা মোট ৪৭০১৫ টাকা। তৎপর কাশীমআলি খাঁর বন্দোবস্ত মত হয় ১০৬২৭০ টাকা (জমিদারির নম্বর ৩ এবং মহলের নম্বর ৮ দেখা যায়)। মালিক স্থানে রামবল্লভের নাম দৃষ্ট হয়।

রামবল্লভ রঘুনন্দনের পৌত্র। চাঁদরায় কেদার রায়ের পরে রঘুনন্দনের হস্তে কিরূপে ইদিলপুর আইসে তাহা মৎ প্রকাশিত বাবভূএঞা গ্রন্থে এবং এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করা হইয়াছে। রঘুনন্দন কেদার রায়ের সেনাপতি ছিলেন।

রঘুনন্দনের পুত্র কমলনারায়ণ। রামবল্লভ, কৃষ্ণবল্লভ, রামনারায়ণ, রঘুনাথ, রামনাথ, রামজীবন, হরিবল্লভ ও রামেশ্বর নামে কমলনারায়ণের আটটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

খন্তাখালী গ্রাম উপলক্ষে ইদিলপুরের জমিদারগণের সহিত উত্তর সাহাবাজপুরের জমিদারগণের বিষম দাঙ্গা উপস্থিত হয়। উহাতে বহু নরহত্যা ও শোণিতপাত হওয়ার পর, মীমাংসাক্ষেত্রে উপনীত হইলে, সাহাবাজপুরের জমিদারগণ বলেন, যদি গোমুণ্ড মস্তকে ধারণ করিয়া চৌধুরীগণ সীমা নির্দেশ করিতে স্বীকৃত হন, তবে এই কলহের নিবৃত্তি হয়। রামবল্লভ চৌধুরী উহাতে স্বীকৃত হইয়া, গোমুণ্ড গ্রহণ করতঃ গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া আইসেন। সাহাবাজপুরের বৈদ্য চৌধুরীগণ তৎক্ষণাৎ ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এতৎ সম্বন্ধে একটি কবিতা চলিয়া আসিয়াছে, যথা—

"রামবল্লভ 'উইঠা' বলেন কৃষ্ণবল্লভ ভাই।
গোমুণ্ড মাথায় লইলে খন্তাখালী পাই।।"

চৌধুরীগণের শাসন সময়ে ইদিলপুরের যথেষ্ট উন্নতি সংসাধিত হয়। কায়স্থ সমাজের বহু কুলীন ঘটক এই স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। বৈদ্যগণের সাতাইশ সমাজের মধ্যে ইদিলপুরের নাম শ্রুত হওয়া যায় কিন্তু বর্তমান সময়ে তথায় একঘরও বৈদ্য দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ ইদিলপুরের কায়স্থ সমাজকে ফতেয়াবাদ সমাজের অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করেন। তাহা একেবারেই অযৌক্তিক কথা। ইহারা কুলকার্য করণনিবন্ধন গোষ্ঠীপতিপদ লাভ করিয়াছেন। দুইটি প্রসিদ্ধ বংশ ইদিলপুর হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।[৪]

এই চৌধুরীগণ অসীম প্রতাপশালী ছিলেন। ভাট কবিতায় "ইদিলপুরের জমিদার, দোহাই মানে বাঘে যার" ইত্যাদি শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে ডাকাইতের দলপতি বলিয়া চির কিংবদন্তি চলিয়া আসিয়াছে। নড়িয়ার ঘটক চৌধুরীগণের গৃহবিবাদ উপলক্ষে ইহারা একপক্ষ অবলম্বন করিযা অপর পক্ষের গৃহ লুণ্ঠন করেন, এই জন্য রাজদ্বাবে অভিযোগ উপস্থিত হয়। বিচারে দোষী প্রতিপন্ন হওয়ায়, দলপতিকে তোপে উড়াইয়া দেওয়ার এবং তাহার সঙ্গিগণকে কারারুদ্ধ করার আদেশ হয়। চৌধুরীগণ অনন্যোপায় হইয়া তৎকালীন দেওয়ান রাজা রাজবল্লভকে হস্তগত করিয়া মুক্তিলাভ করেন।

ইহাদের ডাকাইতি সম্বন্ধে বহু গল্প শুনা যায়। একদা কোন স্থানে ডাকায়িতি করিতে যাইয়া, জমিদার মাধবকৃষ্ণ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধৃত হন। তৎকালীন গৌরনদী থানার দারগা তাহাকে বন্দি অবস্থায় লইয়া, চৌধুরীগণের খানাতল্লাস উপলক্ষে বুড়িরহাট থানায় উপস্থিত হন। মাধব এই কথা অবগত হইয়া বুড়িরহাট আগমন করেন। আসিয়াই শুনিতে পাইলেন উভয় দারগা ভ্রাতাকে বড়ই তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন। তাহার আর সহ্য হইল না। তিনি স্বক্রোধে বলিলেন, "আহা গৌবনদীর থানার দারগার চেতন (ক্রোধ) দেখিয়া আমার বুড়ির হাটের দারগাও "চেত্‌লেন"। বলাবাহুল্য বুড়ির হাট চৌধুরীগণের অধিকার ভুক্ত ছিল। তদবধি এতদ্দেশে সামান্য জনের ক্রোধ প্রকাশে লোকে ঐ কথাটি উল্লেখ করিয়া থাকে। মাধবের সিংহগর্জন ও আরক্ত লোচন দেখিয়া দারগাদ্বয়ের প্রাণ উড়িয়া গেল। বাধা প্রদান করিতে আর সাহস হইল না। মাধব ভ্রাতাকে লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কোম্পানির প্রথম সময়ে জমিদারগণের এতদূরই প্রতাপ ছিল।

রামবল্লভ রায় প্রচুর আহার করিতে পারিতেন। এতদ্দেশে অদ্যাপি মৎস্য ধরিবার সময়ে,

জলে যখন বড়শি ফেলা হয় তখন 'থত্তুরী' জল্লায়, রামবল্লভ রায় এই নাম উচ্চারণ করিয়া কার্য আরম্ভ করে।

কুক্ষণে মীরকাশিমের বন্দোবস্তে এই পরগণার রাজস্ব অধিক পরিমাণে বর্ধিত হয়। নবাবী আমলে রাজস্ব আদায়ের কঠোরতা থাকিলেও সহজে সম্পত্তি ভূম্যধিকারিগণের হস্তচ্যুত হইত না। কোম্পানির অধিকারকালে উহা আদায়ের বিশেষ বন্দোবস্ত হয়। এইকালে পরগণার মালিক দাঁড়ান প্রায় ছত্রিশজন।[৫] কাহারও সহিত কাহারও বনিবনা ছিল না। ভাদুড়ি উপাধিধারী জনৈক ব্রাহ্মণের প্রতি সমুদয়ের ভার অর্পিত ছিল। তিনি প্রধান প্রধান কয়েকজন জমিদারের সন্তোষ সাধন করিয়া অন্যান্যকে ইচ্ছামত যৎকিঞ্চিৎ উপস্বত্ব প্রদান করিতেন মাত্র। সদর রাজস্ব প্রায়ই সম্পূর্ণ আদায় হইত না।

জমির পরিমাণ ধরিয়া কর ধার্য হইত বটে কিন্তু এই জমিদারির অধিক স্থানই জঙ্গলে আবৃত ছিল। তথায় ব্যাঘ্র, মহিষ, শূকর প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাস ছিল মাত্র। 'মনাই' নামে এক ব্যক্তি উহার কতক আবাদ করিয়াছিল, এই জন্য ঐ ব্যক্তি "মনাই জঙ্গলী" নামে প্রসিদ্ধ হয়। পরে ব্যাঘ্র কর্তৃক ঐ ব্যক্তি হত হওয়ায় আর সাহস করিয়া কেহই জঙ্গল আবাদ করিতে স্বীকৃত হইত না। তদবধি একটা কথা চলিয়া আসিয়াছে, "মনাই জঙ্গলীরে খেলো বাঘে, আর মানুষ কিসে লাগে।" অদ্যাপিও এতদ্দেশে পুতুল নাচ উপলক্ষে 'মনাই জঙ্গলী'র অভিনয় প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তাহাতে মনাইর মৃত্যু হইলে, তাহার স্ত্রীর যে অভিনয় দেখান হয় উহাতে দুঃখের উদ্রেক না হইয়া বরং হাস্যরসেরই অবতারণা হইয়া থাকে।

এতন্নিবন্ধন অতি অল্প লোকই ইদিলপুরে বাস করিত। জমিদারের আয় অনুসারে সদর খাজনা বর্ধিত হওয়ায়, উহার বহু রাজস্ব অনাদায় নিবন্ধন সরকার পক্ষ হইতে উহা স্বহস্তে লইয়া কলিকাতা নিবাসী মানিক বসুকে[৬] ৮১১১৫ টাকা কর ধার্যে সাত বৎসরের জন্য ইজারা প্রদান করেন। এই বন্দোবস্ত দ্বারা কোন সুবিধা না হওয়ায়, ১১৯৬ সাল অর্থাৎ ১৭৯০ খ্রিঃ অব্দের ২৯ এপ্রিল গবর্নমেন্ট পূর্বতন জমিদারগণকে আশি হাজার টাকা কর ধার্য করিয়া এই পরগণা পুনরায় ছাড়িয়া দেন। এক বৎসর যাবৎ বহু চেষ্টা করিয়াও জমিদারগণ যখন সদর রাজস্ব আদায় করিতে অশক্ত হইলেন, তখন তাহারা আপনা হইতেই পুনরায় এই পরগণা ছাড়িয়া দিলেন। সেই বৎসর (১৭৯০ খ্রিঃ অঃ) মাত্র ৫৪৭৬৯ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছিল। এই বৎসর ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তথাপি কোম্পানির কর্মচারিগণ জমিদারগণের নিকট হইতে কর আদায় করিতে ত্রুটি করেন নাই। পুনরায় তাহাদিগের সহিত বন্দোবস্ত গ্রহণের কথা হইলে জমিদারগণ উহাতে আর সম্মত হন না। পুনরায় সাজোয়াল নিযুক্ত হয় ; কিন্তু গবর্নমেন্টের ১৮০০ সনের ৯৬৪৪ নং রেকর্ডে অবগত হওয়া যায় জালালপুরনিবাসী রবিউল্লা নামে এক ব্যক্তি ঐ সাজোয়ালের হত্যা সাধন করিয়াছিল। সম্ভবত চৌধুরীগণের প্ররোচনাতেই এই কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকিবে।

১৮০৪ খ্রিঃ অব্দে পুনরায় জমিদারগণ বন্দোবস্ত করেন। ইতিপূর্বে কয়েকজন সুচতুর জমিদার স্ব স্ব নামে কতক তালুক জমিদারির অন্তর্গত করিয়া লন। তন্নিমিত্ত তাহারা জমিদারির প্রতি ততটা মনোযোগী ছিলেন না। ভাদুড়ি ঠাকুরের আধিপত্য এই সময়েও সমভাবে চলিয়াছিল। এবারেও রাজস্ব আদায় হইল না। চৌধুরীগণ দাঙ্গাবাজ ছিলেন। গবর্নমেন্ট এই পরগণা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়েন। তৎকালীন নিয়মানুসারে ১৮১২ খ্রিঃ অব্দে রেভিনিউ বোর্ডে ইদিলপুর পরগণা নিলামে উঠিলে ঐ সময়ে কলিকাতাবাসী সুপ্রসিদ্ধ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র মোহিনীমোহন ঠাকুরের পক্ষ হইতে ৯৮০০০ টাকা মূল্যে এই পরগণা খরিদ হয়।[৭] এই পরগণার বর্তমান রাজস্ব ৬৫৯২৪।১১ পাই ও খারিজাতালুক

১১৯টির সদর রাজস্ব ৮৬৩/৴৯ পাই মোট ৬৬৭৬৭।৶৮ পাই গবর্নমেন্ট পাইয়া থাকেন। জমিদারির সদর রাজস্ব বাকরগঞ্জের কালেক্টরীতে আদায় হইয়া থাকে।

পূর্ব জমিদারগণের সহিত বহু বৎসর পর্যন্ত ঠাকুর বাবুদের দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিয়াছিল। তাহারা সহজে উহা দখল করিতে পারেন নাই। চৌধুরীগণ এই নিলাম রহিত করিবার জন্য প্রিভিকাউন্সেলে পর্যন্ত আপিল করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

মন্তব্য

প্রবাদ এই যে অতিপূর্বে ইদিলপুর একটি সামান্য চররূপে পরিণত ছিল, পরে ইদিল খাঁ নামে কোন ব্যক্তি উহা আবাদ করিয়া বাসোপযোগী করেন। বর্তমান সময়ে বিক্রমপুর ও ইদিলপুর পরগণার মধ্যে যে ধনুর বিল বিদ্যমান রহিয়াছে আমাদের অনুমান অতি পূর্বকালে উহা এক প্রবল স্রোতস্বতীরূপে উভয় পরগণার মধ্যে প্রবাহিত হইত। কালক্রমে সেই নদী মজিয়া বিলে পরিণত হইয়াছে। বর্তমান সময়ে দক্ষিণ বিক্রমপুর ও উত্তর ইদিলপুর একই ভূভাগে পরিণত দৃষ্ট হয়, অথচ প্রবল কীর্তিনাশা নদী উত্তর বিক্রমপুর হইতে দক্ষিণ বিক্রমপুরকে বহু ব্যবধান করিয়া ফেলিয়াছে। ইদিলপুর পরগণাও আবার নয়াভাঙ্গনি নদী কর্তৃক উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, উত্তরাংশ ফরিদপুর জেলার ও দক্ষিণাংশ বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ইদিলপুর বিক্রমপুরের এক অংশ। ইদিলপুরের অন্তর্গত যে সকল গ্রাম এখন বর্তমান, ৯৯৪ শকাব্দে (১০৭২) রাজা শ্যামলবর্মার তাম্রশাসনে ঐ স্থানগুলির "বঙ্গ বিষয় পাঠে বিক্রমপুর ভুক্তান্তে" এইভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। নাগরকুণ্ডী, ধীপুর, লক্ষাচুয়া, কুলকুঠি প্রভৃতি স্থানগুলিও ঐ পাঠের অন্তর্গত, অথচ ঐ স্থানসমূহ অধুনা ইদিলপুরের অন্তর্ভুক্ত। বাস্তবিক একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে ইদিলপুর নামের পত্তন হয় নাই এইটি নিশ্চিত কথা। মুসলমান শাসনকালেই উহা ভিন্ন পরগণা বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে। ইদিলখাঁর নামের সহিত উহার যে প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে তৎপ্রতি লক্ষ করিলেও ইহা যথার্থ বলিয়া অবধারিত হয়। বাস্তবিক তাম্রশাসন সত্য বা মিথ্যা যাহা হউক, যখন শ্লোকগুলি রচিত হইয়াছিল তখন পর্যন্ত ইদিলপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছিল না, ইহা সত্য বলিয়া অনুমান হয়।

চাকলে জাহাঙ্গীরনগর

কোটালিপাড়া

কোটাল (কোতোয়াল) শব্দ হইতে কোটালিপাড়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহা হইলেও যে উহা অসঙ্গত হয় এমন বোধ হয় না। কারণ কোতোয়ালের বন্দোবস্তী মহলের নাম কোটালিপাড়া হওয়া অসম্ভব নয়। এই কারণে আমরা নির্দেশ করতে পারি এই নামের উদ্ভব মুসলমান রাজত্বকালেই ঘটিয়াছিল। বৈদিককুল গ্রন্থে লিখিত আছে এই পরগণা রাজা হরিব্রহ্ম ১০০১ শকের (১০৭৯ খ্রিঃ অব্দের) কিছু পরে যশোধর শর্মাকে দান করেন। উহা কতটা সম্ভবপর তাহা সুধী পাঠকগণ বিচার করিবেন। টোডরমলের বন্দোবস্ত পর্যন্ত যখন এই পরগণা বা মহলের নামকরণ হয় নাই, তখন কোটালিপাড়া যে তৎপরে পরগণায় পরিণত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।[৮]

অতি পূর্বকালে বৈদ্যবংশীয় করমজুমদারগণ এই পরগণার মালিক ছিলেন। পরে দেনার দায়ে তাহারা স্বনামের পরিবর্তে স্বীয় পুরোহিতের নামে সম্পত্তি বেনামী করেন। জমিদারির

কার্য পুরোহিতের নামে চলিতে থাকে। কিছু দিবস পরে পুরোহিত বলিলেন প্রকৃত প্রস্তাবে করগণ পরগণার কেহই নহেন। তিনি অর্থ দ্বারা তাহাদের নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়াছেন। তদবধি প্রকৃতরূপে পুরোহিতই জমিদার হন। করবংশীয়গণ অধুনা, আমতলী, ভহুয়াতলী, কাশাতলী প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

১৮৬৯ খ্রিঃ অব্দে বরিশালের ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট এইচ্, সি, সদরলন্ড সাহেব কোটালিপাড়া পরগণা সম্বন্ধে এক রিপোর্ট ঢাকা বিভাগের কমিশনার সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন, আমরা ইহার সারাংশ এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

১২২৮ সনের বন্দোবস্তে এই পবগণার কর ৬৯২৬ টাকা ধার্য হয়। তৎপূর্বে এতদপেক্ষা অধিক ছিল। এই বন্দোবস্তে অনেক পরগণার কর বর্ধিত হয়, কিন্তু কোটালিপাড়ার কর হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ইহার কারণ এই যে অন্যান্য স্থানের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির সহিত মূল্যের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু কোটালিপাড়ার পক্ষে তাহা হয় নাই।

এই পরগণা ৫০২টি স্টেট বা মহালে বিভক্ত। ইহার মধ্যে ১৮৪টি মহালের কর এক টাকারও ন্যূন আদায় হইয়া থাকে। দশ টাকা পর্যন্ত যে সকল মহলের কর, উহার আদায়ের তারিখ ২৮ জুন। এক পয়সা পর্যন্ত করদাতা আছেন। যে স্থানে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার তথায় যে মোকদ্দমার সংখ্যা অধিক হইবে তাহাতে আশ্চর্যের কিছু কারণ নাই।*

এই সকল নানারূপ অসুবিধা নিবন্ধন ১৮১৫ খ্রিঃ অব্দে মে মাসে এই পরগণা একবার সরকারে আটক করা হয়, আবার ১৮৬৪ খ্রিঃ অব্দের জুন মাসে উহা ছাড়িয়া দেওয়া হয়, কিন্তু মালিকগণের মধ্যে পুনরায় বিবাদ আরম্ভ হওয়ায় পুনর্বার ঐ সরকারপক্ষ মহল গ্রহণ করেন। এতৎসম্বন্ধে মন্তব্য এই যে, এই পরগণার উন্নতি সংঘটন করিতে হইলে, রেভিনিউ (কর) বাকি ফেলিয়া নিলাম করান আবশ্যক। এই অবস্থায় যদি কোন উদ্যোগী ধনী ব্যক্তি এই পরগণার জমিদারি লাভ করিতে পারেন, তবে কোটালিপাড়া পরগণার জমিও অন্যান্য পরগণা হইতে অধিক উন্নতিলাভ করিতে পারিবে। বর্তমান উর্বরতা ও পতিত জমি উঠ্‌তি ইহার প্রধান কারণ। এই স্থানের অধিকাংশ স্থানই বিলপূর্ণ, অতএব বাসের পক্ষে অনুপযোগী।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে কালেক্টার সাহেবের এই সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ উপরস্থিত রাজকমচারিগণ যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। কাজেই একজন ধনীর ধনাগার পূর্ণ মাত্রায় পরিবর্ধিত না হইয়া কতকগুলি মধ্যবিত্তের জীবনোপায়ের সংস্থান হইয়া রহিয়াছে। বর্তমান অবস্থায় জমিদারগণ এই পরগণার বাটওয়ারার প্রার্থনা করায় গভর্নমেন্ট পক্ষগণ মধ্যে উহা বিভাগ করিয়া দিয়াছেন।

মন্তব্য

কোটালিপাড়ার অধিকাংশই বৈদিক জমিদারগণের হস্তগত। বিশেষত এই বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেক সুবিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। আজিও বহু প্রাচীন সুধী জনগণ সেই সকল বংশকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব তাহাদের বিবরণ প্রদান করা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন গচাপাড়ার রাঢ়ী শ্রেণির ব্রাহ্মণ চৌধুরীবংশ এই পরগণার চারি আনি অংশের মালিক আছেন।

বৈদিক কুলপঞ্জিকা পাঠে অবগত হওয়া যায়, শ্যামলবর্মা নামীয় এক রাজা একটি যজ্ঞ নির্বাহার্থে কর্ণাবতীবাসী যশোধর মিশ্রকে বঙ্গদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। তৎসহ আরও চারিটি ব্রাহ্মণ এই দেশে আগমন করেন, যথা বেদগর্ভ, গোবিন্দ, জিতমিশ্র ও পদ্মনাভ। ইহারা যথাক্রমে শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ গোত্রীয় ছিলেন। যশোধর শুনক গোত্রীয় ছিলেন। তাহার শৌনক গোত্রসম্ভূত যশোধর নামে এক বন্ধু ছিলেন। তিনি শুনক যশোধরের

সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়াসে বঙ্গে আগমন কবিলে এই বন্ধু হইতে তদীয় ব্রহ্মাত্রা সামন্তসার গ্রাম প্রাপ্ত হন। শৌনক যশোধর, রাজার দান গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। পরে তাহার হস্তে বৈদিককুলপঞ্জিকা লেখার ভার অর্পিত হয়। ইহারা উভয়েই বংশমর্যাদায় সমতুল্য ছিলেন। আমরা ইতিপূর্বে রাজা শ্যামলবর্মার তাম্রশাসনের উল্লেখ করিয়াছি। এই স্থানে তাহার পুনরালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন বিধায় ক্ষান্ত থাকিলাম। কিন্তু এই তাম্রশাসন এ পর্যন্ত লোক-লোচনের আয়ত্বাধীন হয় নাই। অতএব উহা কতটা সত্য তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ।

সরকার ফতেয়াবাদ চাকলে ভূষণার অন্তর্গত

তেলিহাটি

টোডরমলের বন্দোবস্ত মহালের মধ্যে সরকার ফতেয়াবাদের অন্তর্গত বলিয়া এই স্থানের নাম উল্লেখ আছে। তৎসময়ে উহার কর ধার্য হয় ৩৭৭২ দাম; তৎপরে সুজাউদ্দিনের বন্দোবস্ত সময়ে উহা চাকলে ভূষণার অন্তর্গত হয়। এই পরগণার পূর্বে মালিক কে ছিল উহার কোন পরিচয় অবগত হওয়া যায় না। তবে তেলি নামের প্রতি লক্ষ্য করিলে বোধ হয় কোন তেলিবংশীয় বড়লোকের নাম হইতে তেলিহাটি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এই পরগণাটি তিন ভাগে বিভক্ত। খাস তেলিহাটি, আমিরাবাদ তেলিহাটি ও মহব্বতপুর তেলিহাটি। এই সকল স্থানগুলি সীতারাম রায়ের জমিদারির অন্তর্গত ছিল। তাহার অধঃপতনের পর নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর অনুগ্রহে নাটোরের রঘুনন্দন যে সকল জমিদারি প্রাপ্ত হন, তাহার সহিত তেলিহাটিও তৎকালে তাহার হস্তগত হয়। পরে নড়াইলের কালীশঙ্কর সরকার ঐ জমিদারির কতকাংশ লাভ করিবার পর, তেলিহাটি, রূপাপাত, কালিয়া, বিনোদপুর প্রভৃতি তরফ তাহার হস্তগত হয়। ১৭৯৫ খ্রিঃ অব্দ হইতে ১৭৯৯ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত এই সকল পরগণা ও নলদী, সাতৈর, মকিমপুর, নসরৎসাহী, নসিবপুর, মহিমসাহী, বেলগাছি, হাওলি, হাকিমপুর, বিনোদপুর, সাহপুর, পোকতানী, রোকনপুর, রূপাপাত প্রভৃতি পরগণা ও তরফ, নাটোর রাজবংশের হস্তচ্যুত হইয়া বিভিন্ন নূতন জমিদারের হস্তগত হয়। নাটোরেব রাজপক্ষ হইতে কর্মচারি কালীশঙ্করের নামে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ করা হয়, উহার ফলে কালীশঙ্কর কিছু দিনের জন্য কারারুদ্ধ হন। তিনি জীবিত থাকাকাল পর্যন্ত জমিদারির সুশৃঙ্খল বিধান করিয়া যাইতে পারেন নাই। তৎপরে তদীয় পৌত্র সুবিখ্যাত রামরতন রায় (রতন বাবু) সমুদয় জমিদারিব সুবন্দোবস্ত করিয়া যান।

নড়াইলের বাবুদের নাম বঙ্গবিশ্রুত। রতনবাবুকে তৎসময়ে কে না জানিতেন। তাহার জমিদারি শাসনকালে তেলিহাটির বাইশজন তালুকদার একত্র হইয়া উক্ত জমিদারের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। প্রথমত লাঠিয়ালের দ্বারা বল পরীক্ষিত হইতে লাগিল। জমিদার কর্তৃক বহু প্রজার বাড়ি লুণ্ঠিত হইল, তালুকদারগণও জমিদারপক্ষকে কম নির্যাতন করিলেন না। দূরদর্শী রামরতন রায় পবে বুঝিলেন, আদালতের আশ্রয়গ্রহণ না করিলে, বলের দ্বারা কার্য উদ্ধার হইবে না। অতঃপর সেই উপায় অবলম্বিত হইলে, তালুকদারগণ ক্রমে বশে আসিতে বাধ্য হইলেন।

যে বাইশজন তালুকদার দলবদ্ধ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে উজানীর রাজা, নারায়ণপুরের মুসলমান মুন্সী, খান্দারপাড়ের রায় এবং ডাকরীর সমাদ্দারগণ প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথমোক্ত দুই ঘর বড়লোক বটে; কিন্তু শেষোক্ত দুই জন অতি ক্ষুদ্র তালুকদার ছিলেন। এই জন্য এই দাঙ্গা উপলক্ষ্য করিয়া যে কবিতা রচিত হয় তাহার দুইটি পদ এইরূপ ছিল।

"রাজা হাতি, মুন্সী ঘোড়া, নারায়ণ কুকুর।
বাঁশবনে ফেউ ফেউ করেন সমাদ্দার ঠাকুর।"

অগাধ বিল বক্ষে ধারণ করিয়া তেলিহাটি অতি অল্প গ্রামের সমষ্টিতে নিবদ্ধ ছিল। প্রবাদ রাজা সীতারাম রায় কার্য উপলক্ষে নলডাঙাব রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলে তদীয় সভাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ অভিরাম সেন কবীন্দ্র সঙ্গে যান। নলডাঙার রাজা সকলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, অভিরামের বাড়ি তেলিহাটি পরিচয় দেওয়া হয়। তখন রাজা বলিয়া উঠিলেন, "বার হাত নৌকার তের হাত কাঠি (লগি), তার নাম তেলিহাটি। সেই তেলিহাটি বিলে আপনি বাস করেন?" অভিরাম তখনই বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ যথার্থ বলিয়াছেন! উহারই একখানা গ্রামের নাম "ভাবড়াশুর"। শুনিয়া রাজা অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন, কারণ তাহার পূর্বপুরুষেরা ভাবড়াশুর গ্রামেব শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচিত। ভাবড়াশুর হইতে পরে তাহারা নলডাঙায় উঠিয়া যান। নলডাঙার রাজা সন্ধির প্রার্থী হইলে, সীতারাম ব্রাহ্মণ জমিদারের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ কবেন নাই।

সরকার ফতেয়াবাদ তাণ্ডা, মামুদাবাদ, চাকলে ভূষণা, হাবেলি, মকিমপুর, নসিবসাহী, সাতৈর, নলদী, পুখুরিয়া

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে রাজা সীতারাম রায়ের বিস্তৃত জমিদারি নাটোরের রামজীবন রায়ের হস্তগত হয়। ভূষণার ইব্রাহিমপুর রামজীবনের হস্তগত হইবার পরে, জালালপুরের জমিদার এনায়েতুল্লা রাজস্ব প্রদানে অকৃতকার্য হওয়ায়, তদীয় ফতেয়াবাদ রামজীবন ক্রয় করেন। পুখুরিয়ার জমিদার ইসকিন্দার নরহত্যা অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় ঐ জমিদারি বাজেয়াপ্ত হইয়া রামজীবনের হস্তগত হয়। এইরূপে তাহাব জমিদারি পশ্চিমে সাহজালাল এবং ভূষণা হইতে পূর্বদিকে নলদী মকিমপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

১৭৩৭ খ্রিষ্টাব্দে নলডাঙার রাজা রঘুদেব রাজস্ব আদায় না করায় নবাব সুজাখাঁর অনুমতি মতে ঐ জমিদারি রামকান্তের হস্তগত হয়। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে স্বরূপপুর ও পাতলাদহ তাহার অধিকারে আইসে। এইরূপে চাকলা ভূষণার অন্তর্গত ২১টি পরগণা নাটোরের রাজার জমিদারির অন্তর্গত হইয়া পড়ে।

রামজীবন ও রামকান্তের দ্বারা নাটোরের পূর্ণ উন্নতি। রানী ভবানী ও তৎপুত্র রামকৃষ্ণের সময়ে উহার অবনতির সূত্রপাত হয়। এই অবনতির কারণ লক্ষ্য করিয়া জনৈক প্রধান ব্যক্তি নাটোর রাজের প্রাচীন ও বহুদর্শী কর্মাধ্যক্ষ পরাণ নামক কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনাদের মত বিজ্ঞ কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও এত বড় সংসারের এইরূপ পতন হইতেছে কেন? তদুত্তরে বিচক্ষণ পরাণ একটি কথা তাহাকে শুনাইয়া উহার পরিষ্কার উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। উহার শেষ দুই পদ এই ছিল, "ছেলে রাজা, ভাই দেওয়ান, কি করবে তার একলা পরাণ।" আমরা অন্য কয়েক পদ এই স্থানে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করিলাম না। অথবা লিখিত দুই চরণের ভাষ্য টীকাও করিতে চাহি না। প্রয়োজন হইলে পরে করিব।

এই সময়ে নাটোরের বহু কর্মচারির ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। উহার মধ্যে দীঘাপতিয়ার দয়ারামের পরেই নড়াইলের কালীশঙ্কর সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য। উক্ত সরকার রাজা রামকৃষ্ণের প্রিয় কর্মচারি ছিলেন। সুগায়ক বলিয়া রাজা তাহাকে সমধিক ভালবাসিতেন। রামকৃষ্ণ স্বরচিত গানগুলি কালীশঙ্করের দ্বারা গীত হইলে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। প্রবাদ ঋণাবদ্ধ রাজা এই সময়ে অতি অল্প মূল্য গ্রহণ করিয়া কালীশঙ্করের নিকট করাইহাতি পরগণা বিক্রয়

করেন। ভূষণার উন্নতি সাধন হইলে ঐ চাকলাও তাহাকে ইজারা দেওয়া হয়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ইজারা আরম্ভ হয়। এই বৎসর মহালের প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা বাবদে তিন লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকার স্থানে তিন লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকার দাবি করেন। প্রজারা তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় তাহাদের প্রতি অত্যাচার কবা হয়, তজ্জন্য তাহার নামে রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত হওয়ায় কালীশঙ্কর চারি মাসের জন্য কারারুদ্ধ হন। ইজার' উঠাইয়া রামকৃষ্ণ ঐ চাকলা স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথের হস্তে সমর্পণ করেন। তৎকালে বিশ্বনাথ নাবালক থাকায় উহা কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হয়। জমিদারির নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখিয়া গবর্নমেন্ট, মিঃ ইয়ারলেস্টকে কমিশনার নিযুক্ত করেন।

এই বন্দোবস্তে জমিদারি রক্ষার উপায় কিছুই হইল না, বরং জমিদারির রাজস্ব সমধিক পরিমাণে বর্ধিত হইল। বিশ্বনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জমিদারি তৎকরে পুনঃন্যস্ত হয়। এই সময়ে সরকারি রাজস্ব বহু পরিমাণে বাকি পড়িয়াছিল। আইনের বিধানমতে কোর্ট অব ওয়ার্ডের হাতে থাকা সময়ে জমিদারি নিলামে বিক্রয় হয় নাই। এখন সমুদায় বাকি পড়া রাজস্বের জন্য বিশ্বনাথকে চাপিয়া ধরা হইল। তিনি কর আদায় করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন আংশিকভাবে জমিদারি নিলাম হইতে লাগিল।

১৭৯৯ খ্রিঃ অব্দে যশোহরের কালেক্টর কর্তৃক নাটোরের রাজার নিম্নলিখিত পরগণাগুলি নিলামে বিক্রয় হয়।

পরগণা	রাজস্ব	বিক্রয়ের তারিখ	ক্রেতার নাম
হাবেলি	৩৬৬১৩	১৫/২/১৭৯৯	রামনাথ রায়
মকিমপুর	১৫৩৪৭	২৫/২/১৭৯৯	ঐ
নসিবসাহী	১৬৯৩৭	২৫/২/১৭৯৯	ভৈরবনাথ রায়
সাতৈর	৩৯৯৬৮	২৮/২/১৭৯৯	শিবপ্রসাদ রায়
নলদী	৩৬৭৬০	২৩/৩/১৭৯৯	ভৈরবনাথ রায়

এই সময়ে জমা কি হারে বর্ধিত হইয়াছিল নিম্নলিখিত পরগণা দুইটির হিসাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। ইসফপুরের ২৫২৩৭ টাকার জমা বর্ধিত হইয়া ৩০২৩৭ টাকা এবং সৈদপুরের ৮৮,৫৩৮ টাকাব উপব দুই শত টাকা বৃদ্ধি করিয়া ৮৮৭৩৮ টাকা করা হয়।

মকিমপুর পরগণা, ঢাকা ও ফরিদপুর উভয় জেলাতে দেখা যায়। এই পরগণার অন্তর্গত ৩৭৬ নং তালুক নরসিংহ মজুমদার ঢাকা জেলার অন্তর্গত। এই পরগণা নাটোরের রাজার হস্ত হইতে কি প্রকারে রামনাথ রায়েব হস্তগত হয় তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বর্তমান সময়ে রাণী রাসমণির বংশধর মকিমপুরেব, কান্দীর (পাইকপাড়ার) রাজবংশধর নলদী ও মহিমসাহির, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ (ভূতপূব হাইকোর্টের উকিল) মহবেতপুরের, মহারাজ প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর হাবেলি পবগণার এবং পার্শ্বডাঙাব চৌধুরীগণ সাতৈর ও নসীবসাহীর কতকাংশেব মালিক আছেন।

তপ্পে হয়দরাবাদ

ইহা ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কতক বিচ্ছিন্ন স্থান লইয়া সংঘটিত। জমিদারের দেয় কর ১২৩৭ টাকা। তালুকদার ২০০ শত। দেয় কব ১৯৮৭ টাকা। (W. Daylas) ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টরের রিপোর্ট ১৭৯০/২৬ মে।

চাকলে জাহাঙ্গীরনগর

জালালপুর

এই পরগণার বিস্তৃত বিবরণ এই ইতিহাসের ১ম খণ্ড বিবৃত করা হইয়াছে। সামান্য একটি কথা মাত্র এই স্থানে সন্নিবেশিত করা হইল। ১৮০৪ খ্রিঃ অব্দের ঢাকার কালেক্টর সাহেবের রিপোর্টে অবগত হওয়া যায়, জালালপুর পরগণাব অন্তর্গত প্রায় দুই হাজার খারিজা তালুক নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে একশত টাকা জমার ন্যূন করদায়ী মহালও বর্তমান রহিয়াছে। ১৭৮৭ খ্রিঃ অব্দে এই পরগণায় জলপ্লাবন হইয়া অত্যন্ত ক্ষতির কাবণ হয়। অধুনা ফরিদপুর, ঢাকা ও বরিশাল এই তিন জেলাতেই এই পবগণার অন্তর্গত খারিজা তালুক সমূহের কর আদায় হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে ফরিদপুর জেলাতেই অধিকাংশ ভূমি থাকায়, করও তথায় অধিক পরিমাণে আদায় হয়। পূর্বতন জমিদার নুরউল্লা ও রুহিউল্লার হস্তচ্যুত হওয়ার পরেই উহা বহু তালুকদার মহালে বিভক্ত হয়। পরগণার শেষ জমিদার এনায়েতুল্লা রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হওয়ায় বামজীবন উহা ক্রয় করেন। পরগণাব জমিদাবের দেয় কর ১১০০৲। তালুকদার ২১৪৮ জন। কর ৭৬০০৲। মোট রাজস্ব ৮৭০০৲ টাকা।

W. Davias, রিপোর্ট ২৬ মে, ১৭৯০।

পাটপাসার

১১৫ নং জমিদারি পাটপাসাব পূর্বে নাটোর রাজবংশের হস্তগত ছিল। রাজা রামকৃষ্ণের সময়ে নিলামে বিক্রয় হওয়ায় নদিয়া জেলার অন্তর্গত উলাবীরনগর নিবাসী মহাদেব মুখোপাধ্যায়, বাকি বাজস্বের দায়ে উহা ক্রয় করিয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে উহার কতকাংশ উক্ত মুখোপাধ্যায়ের বংশধরগণ এবং কতক অংশ অন্যান্য ভূস্বামিগণ ভোগ করিতেছেন। পদ্মার উভয় তীরে ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার মধ্যে এই পরগণার জমি দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ ভাগ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত।

চাকলে ভূষণার অন্তর্গত

মহব্বতপুর

ঢাকা নিবাসী "সেখ সাহেব" নামে পরিচিত একজন সুপ্রতিষ্ঠ লোক নবাব সরকার হইতে এই পরগণা প্রাপ্ত হন। এই পরগণা ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, ঢাকা এবং ফরিদপুর প্রভৃতির মধ্যগত কতকগুলি জমিদারির অংশ লইয়া সংগঠিত। তেলিহাটি পরগণার একাংশও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সেখ সাহেবের উত্তরাধিকারিগণ তাহাদের অধীনস্থ কর্মচারিগণ মধ্যে যাহারা প্রধান ছিলেন তাহাদিগকে নগদ মাহিয়ানা প্রদান না করিয়া কতক ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দেন, তাহার আয় হইতে তাহারা মাসহারা প্রাপ্ত হইতেন। যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় তৎকালে এই সকল কর্মচারিরা অযোগ্য প্রভুবংশের হাত হইতে উহা বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া স্ব স্ব নামে পৃথক বন্দোবস্ত করিয়া লন। তদবধি তাহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে গবর্নমেন্টের নিকটই রাজস্ব প্রদান করিয়া আসিতেছেন। এই সকল কর্মচারিগণের মধ্যে বারদিয়ার মজুমদার, মহব্বতপুরের মজুমদার, বোয়ালিয়ার চৌধুরী, করদির করচৌধুরী, আষ্টার বর্ধন মজুমদার, খেরুদিয়ার চৌধুরী, কাঞ্চনপুরের গুপ্তগণ ও গোবিন্দপুরের বলগণ প্রসিদ্ধ।[১৮] ফরিদপুরের অন্তর্গত আঁধারমাণিকের চৌধুরীও এইরূপে সেখ সাহেবের কার্য দ্বারা উন্নতি লাভ করেন ও

ভূস্বামী হন। বাটিকামারী, মহারাজপুর প্রভৃতি স্থান এই পরগণার অন্তর্গত। এই স্থানগুলিও রানী ভবানীর জমিদারির অন্তর্গত ছিল। পরে কোড়কদির মধুসূদন সান্যাল উহা ক্রয় করেন। উহা এখন তদীয় বংশধরগণের হস্তভ্রষ্ট হইয়া কলিকাতা ভবানীপুরস্থ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব উকিল কৃষ্ণকিশোর ঘোষের হস্তগত হইয়াছে। ঘোষ মহাশয় উহা ক্রয় করিয়া লন। মহব্বতপুর পরগণা যে টোডরমলের বন্দোবস্ত সময়ে ছিল না তাহা সরকার বিভাগের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়।

খড়রিয়া

এই পবগণা সুলতানপুব খড়রিয়া নামে খ্যাত। সরকার তাণ্ডার অন্তর্গত একটি মহালের নাম আছে সুলতানপুর। নবাবী আমলের বন্দোবস্তে উহা সুলতানপুর খড়রিয়া নামে পরিচিত হয়। পূর্বে এই স্থানেব অধিকাংশ জলপরিপূর্ণ বিলে পরিণত ছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে এই পরগণা বৈদ্যবংশীয় জানকীবল্লভ বিশ্বাস পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। বিশ্বাস মহাশয় জানকীবল্লভ ঘোষকে অমাত্য পদে বরণ করিয়া তৎসহ মূলঘর গ্রামে বাস করেন। কায়স্থ ভঞ্জ চৌধুরীগণ এই পরগণার চারি আনা অংশের মালিক ছিলেন। শুনা যায় আবাদ কার্যের সহায়তা করায়, বিশ্বাস তাহাকে এই অংশ প্রদান করেন।

প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ সময়ে, জানকীবল্লভও প্রতাপের অধীনে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে প্রতাপের পতন হইলে, তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করেন। সেই সময়ে রাজার লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাজরাজেশ্বর চক্র তাহার হস্তগত হয়। রাজা হরিনাথ রায় বিশ্বাস বংশের প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম রায় ও লক্ষণ রায়কে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে যাইয়া নিজেই জমিদারি হারান। রাম ও লক্ষণ রায়ের সন্তানগণ এই পরগণার দশ আনা অংশের এবং তদীয় পিতৃব্য কর্ণপুর রায়ের সন্তানগণ ছয় আনার মালিক হন। নিয়ম মত কর আদায় না হওয়ায় এই পরগণা গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে কলিকাতা হাটখোলার দত্ত চৌধুরীগণের পূর্বপুরুষ কাশীনাথ দত্তকে ইজারা প্রদান করেন। পরে রেবিনিউ বোর্ড কর্তৃক নিলাম হইলে উক্ত কাশীনাথ দত্ত উহা ক্রয় করেন। বর্তমান সময়ে এক অংশ মাত্র তাহার বংশধরগণের আছে, অপর দুই অংশ অপরের হস্তগত হইযাছে। এই পরগণার অধিকাংশ স্থান ও প্রায় সমুদয় ভদ্রপল্লী খুলনা জেলার অন্তর্গত। যৎকিঞ্চিৎ স্থান মাত্র ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ জেলা মধ্যে বিদ্যমান আছে।

বৈকুণ্ঠপুর

রাইসবর নিবাসী কীর্তিনারায়ণ বসু নবাব সরকারে কার্য করিয়া "লালা" এই গৌরবাত্মক উপাধি লাভ ও বহু ভূসম্পত্তি অর্জন করেন। এই সময়ে স্বীয় বাসস্থান রাইসবরের নামকরণ করা হয় শ্রীনগর। বর্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত শ্রীনগরের বাবুগণ, তাহার ও তদীয় ভ্রাতাদের বংশধর। বিভিন্ন স্থানে যে সকল সম্পত্তি তাহার হস্তগত হয় উহা সমুদয় একত্র করিয়া বৈকুণ্ঠপুর নামে এক পরগণা নবাবী সেরেস্তার অন্তর্গত করিয়া লন। বর্তমান সময়ের ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় এই পরগণার জমি আছে। ফরিদপুরের অন্তর্গত শিবচর থানার অনেক স্থান বৈকুণ্ঠপুর পরগণার অন্তর্গত। উহার কতকাংশ শ্রীনগরের বাবুদের হস্তভ্রষ্ট হইয়াছে, অবশিষ্ট তাহারা আজিও ভোগ করিতেছেন।

দুর্গাপুর

বৈকুণ্ঠপুরের ন্যায় ঐ তিন জেলার কতক ভূমির সমষ্টি লইয়া এই পরগণার উদ্ভব হইয়াছে। মাণিক বসু নামে গবর্নমেন্ট পক্ষের একজন ইজারাদার ছিলেন। এই সময়ে তিনি ইদিলপুরের ইজারাদারি কার্য করিতেন। তাহার নিবাস ছিল কলিকাতা। বসু মহাশয় বিভিন্ন জেলার সমুদয় সম্পত্তি দুর্গাপুর পরগণা নামকরণে বন্দোবস্ত করিয়া লন। মাদারীপুর ও শিবচর থানায় এই পরগণার জমি আছে। বর্তমান সময়ে এই পরগণা বসুবংশের হস্তভ্রষ্ট হইয়া ঢাকা জেলার বালিয়াটির সাহা বাবুগণের হস্তগত হইয়াছে।

চাকলে জাহাঙ্গীরনগর

রাজনগর

বৃহৎ পরগণাগুলির আদায় কার্যে সুবিধার জন্য উহাকে তরফ বা তপ্পায় বিভক্ত করিয়া এক একজন তহশীলদার নিযুক্ত করা হইত। তাহারা পরগণার কানুনগোর অধীনে থাকিয়া স্ব স্ব কার্য নির্বাহ করিতেন। বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত হায়দরাবাদ, পায়ন্দাবেগ, বিল দায়ুনীয়া, সাহাবন্দর, গ্রদবন্দর, রামকৃষ্ণপুর প্রভৃতি কয়েকটি তপ্পা ছিল। রাজবল্লভের উন্নতি সময়ে এই সকল তপ্পার বিশেষত বিল দায়ুনীয়ার সমগ্র ভাগ ও হাবেলি পরগণা হইতে কতক ভূখণ্ড লইয়া, রাজনগর নামে একটি পরগণার নামকরণ করা হয়।

১১৩৫ সনে (১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে) সুজাউদ্দিন যখন বঙ্গদেশের নবাবী কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া সমুদয় জমিদারির গোসাহেরা প্রস্তুত করেন তখন এই রাজনগর পরগণার প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পঞ্চম রিপোর্টে দেখা যায়, ঢাকা নেয়াবতীর জমিদারির তৌজিভুক্ত "২নং পরগণা রাজনগর মহালের নম্বর ৩৮, জমিদারির নম্বর ১৭, মালিক লক্ষ্মীনারায়ণ।" সুজাউদ্দিনের বন্দোবস্ত মতে এই পরগণার কর ধার্য হয় ৮৫২৯৮ টাকা, পরে কাসেম আলি খাঁর সময়ে পুনরায় যে বন্দোবস্ত করা হয়, তৎকালে উহার সদর খাজানা বর্ধিত হইয়া ৮৮,৩৮৯ টাকা।[১১] রাজবল্লভ স্বীয় নামে কোন জমিদারি করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায় না। গৃহদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ ও বাসুদেব বিগ্রহ প্রভৃতির নামে মালিক লেখাইয়া ভূসম্পত্তি করিয়াছিলেন ইহাই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

কোম্পানির প্রথম আমলে নবাবী সেরেস্তার কাগজপত্র দৃষ্টেই কর আদায় হইত। পরে রাজবংশীয়দের মধ্যে কলহ আরম্ভ হইলে রাজবল্লভের তৃতীয় পুত্র রাজা গঙ্গাদাসের পুত্র কালীশঙ্কর, অন্যান্য সরিকগণের যোগে স্বীয় পিতৃব্য রায় গোপালকৃষ্ণের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়া জমিদারি বণ্টনের প্রার্থনায় গবর্নমেন্টের নিকট আবেদন উপস্থিত করেন। তদনুসারে গবর্নমেন্টের পক্ষ হইতে টমসন সাহেব নিযুক্ত হইয়া সমুদয় পরগণা জরিপ করিয়া, উহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া দেন। তৎসহ জমিদারির সদর রাজস্বও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ১১২৬৭৩ টাকা দাঁড়ায়। এইরূপে রাজবল্লভের অন্যান্য জমিদারিরও কর বৃদ্ধি হয়। রাজবংশধরগণ এই রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হওয়ায়, ক্রমে ক্রমে তাহাদের সমুদয় জমিদারি নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। জমিদারির অন্তর্গত কিছু তালুক মাত্র অবশিষ্ট থাকে। অধিকাংশ মহাল গবর্নমেন্ট খরিদ করিয়া লন।

ডে সাহেবের রিপোর্টে অবগত হওয়া যায়, দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবন নিবন্ধন এই পরগণার বিস্তর ক্ষতি হয়। তজ্জন্য কর আদায় সম্বন্ধে কিছু দয়া করার জন্য গবর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু কার্যে উহাতে কোন সুফল ফলে না। রাজবল্লভের চতুর্থ পুত্র রায়

গোপালকৃষ্ণের পুত্র পীতাম্বর বর্ধিত করের কথা উল্লেখ করিয়া যাহাতে উহার ন্যূনতা সম্পাদন হয়, তজ্জন্য তৎকালীন গবর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন (১৭৯৮ খ্রিঃ)। তাহাতে বলেন "আমরা মহারাজ রাজবল্লভের বংশধর। তিনি কোম্পানির সাহায্য করিয়াছিলেন, এই জন্য তাহাকে ও তাহার পুত্র কৃষ্ণদাস বাহাদুরকে কাসেম আলি খাঁ বধ কবিয়া আকা রেজা দ্বারা বাড়ি, জমিদারি ও সম্পত্তি লুণ্ঠন করেন। টমসন সাহেবের প্রতি আমাদের সম্পত্তি বণ্টনের ভার অর্পিত হয় ; কিন্তু তিনি আমাদের সম্পত্তির সদর রাজস্ব অকাবণ বর্ধিত করিয়াছেন। আমরা এই জন্য গবর্নমেন্টের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলাম। তদনুসারে সার ইলাইজা ইম্পের প্রতি তদন্তের ভার অর্পিত হয়। তিনি আমাদের নিকট হইতে এক লক্ষ টাকা রসুম গ্রহণ করেন ; কিন্তু কোন প্রকার অভিমত প্রদান না করিয়া বিলাত চলিয়া গিয়াছেন।" (বিভারেজ কৃত বাকরগঞ্জের ইতিহাস)। বলা বাহুল্য এই স্থানেই এই পর্বের যবনিকার পতন হয়।

সরকার সোনারগাঁ চাকলে জাহাঙ্গীরনগর

কার্তিকপুর

টোডরমলের বন্দোবস্তে এই মহালের নাম উল্লেখ আছে। তৎকালে উহার রাজস্ব ছিল ৮০,০০০ দাম বা ২,০০০ টাকা। পরে সুজাউদ্দিন ও কামেস আলি খাঁর বন্দোবস্ত সময়ে উহার রাজস্ব অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মালিকের স্থানে কাহারও নাম দেখা যায় না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এই পরগণাও বিক্রমপুরের একাংশ মাত্র। এই পরগণার মালিকি স্বত্ব অনেক পরে রাজবল্লভের হস্তগত হয়। তৎপববর্তী বংশধরগণের সময়ে ডে সাহেব এই পরগণা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রদান করেন নিম্নে তাহার সন্নিবেশ করা হইল। রাজবল্লভেব বংশধরগণের হস্তভ্রষ্ট হইয়া এই পরগণা অধুনা ভাগ্যকুলের কুণ্ড, হাসারার সেন ও মাইজপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির হস্তগত হইয়াছে। বিস্তারিত গ্রাম্য বিবরণসহ প্রকাশ করা যাইবে। অন্যান্য পরগণার বিবরণ গ্রামের বিবরণসহ প্রকাশ করার ইচ্ছা রহিল।

"এই পরগণা রাজনগর জমিদারির অন্তর্গত। মিঃ ডে, তাহার প্রস্তাবিত বন্দোবস্ত করিবার উপায় মধ্যে এই পরগণার জন্য আরও ৪০০০ টাকা খরচ করিতে গবর্নমেন্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রজারা গত কয়েক বৎসর যাবৎ জামদারকে যে খাজানা আদায় দিয়াছে তাহার বেশি যদি আদায় করিতে না হয় তাহা হইলে এবং উক্ত ৪০০০ টাকা খরচ হইলে ঐ সমস্ত জমির লাভ আরও খুব বেশি হইবে সে সম্বন্ধে তাহার কোনও সন্দেহ নাই বলিয়া মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছেন।" (বিভারিজ কৃত বাকরগঞ্জের ইতিহাস, ৪০১ পৃষ্ঠা)।

১ বিশেষ বিবরণ প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

২. ফরিদপুবেব ইতিহাসের প্রথমভাগে এই তাম্রশাসন মুদ্রিত হইয়াছে।

৩. বিক্রমপুবেব বহু গ্রামেব নাম আংশিকভাবে পবিবর্তিত হইয়াছে, যথা—সোনাবটং (সোনারঙ্গ), কাউলিপাড়া (কালীপাডা), মাঐসার (মহিসার) প্রভৃতি। সমতট প্রথম সঙ্কটে বা সমকটে উচ্চারিত হইত। পরে এখন যাহাবা ঐ নাম উচ্চারণ করেন বা লেখেন তাহারা গড়িয়া তুলিয়াছেন, সোমকোট।

৪. উহার মধ্যে এক বংশের আদি পুরুষ বেদচবণ সেন, মুর্শিদাবাদবাসী হন। সুপ্রাসিদ্ধ জমিদার ডাক্তাব রামদাস সেন এই বংশোদ্ভব। অপব বংশ উত্তর বিক্রমপুরেব অন্তর্গত শ্রীনগরের বাবুদের পূর্বপুরুষ লালা কীর্তিনারায়ণ প্রভৃতি ইদিলপুরেব অন্তর্গত দিক্‌শূল গ্রামবাসী ছিলেন।

৫. দশসলার বন্দোবস্ত সময়ে রামবল্লভ, কৃষ্ণবল্লভ ও নরসিংহের নামে জমিদারি বন্দোবস্ত হয়।

৬. ইহার নামে কলিকাতা মাণিক বসুর ঘাট ও স্ট্রিট অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। তৎপ্রতিষ্ঠিত একটি প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ ঐ স্ট্রিটে বর্তমান আছে।

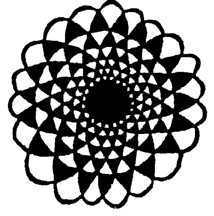
৭. ভাদুড়ির ক্ষমতা এত বর্ধিত হইয়াছিল যে ক্ষুদ্র জমিদার অংশীগণ বলিয়া উঠিলেন এতদিনে ভাদুড়ি ঠাকুরের 'ফটফটি' (স্পর্দ্ধা) ভাঙিল। এই সময়ে তাহারা যে এই পরগণার মালিক উহা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

৮. কোশলার বিচরণে এই কথা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইবে। কোটালিপাড়া নামকরণের কারণ উৎপত্তি কি জন্য হইল, তাহার কতকটা আভাস উহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

৯. সদরলণ্ড সাহেবের রিপোর্টে মোকদ্দমার আধিক্য বিষয়ের যে কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা মিথ্যা নয়। উহার বহু বৎসর পরে যখন নবীনচন্দ্র সেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মাদারিপুরের অফিসার হইয়া গমন করেন, তখন ঢাকার কমিশনার পিকক সাহেব তাহাকে বলেন "মাদারিপুরের অবস্থা বড় শোচনীয়। তিন বৎসর যাবৎ কোটালিপাড়ায় পুলিশের নাকের নীচে হাঙ্গামা ও খুন হইতেছে। কিন্তু একটি আসামীও বিচারে আইসে নাই। ম্যাজিস্ট্রেট জেফ্রী বলেন, কোটালিপাড়ায় হাঙ্গামার পর হাঙ্গামা ও খুনের পর খুন হইতেছে।"

১০. এই স্থানগুলি ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত।

১১. পঞ্চম রিপোর্ট ৩৬৭/৩৬৯ পৃষ্ঠা।



তৃতীয় অধ্যায়

জেলা সংস্থাপনের বিবরণ

১৭৬৫ খ্রিঃ অব্দে কোম্পানি বাহাদুর স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলে পর নবাব নাজেম বেতনভোগী হন। তৎসহ ঢাকার সুবেদারও শূন্য 'নবাব' উপাধি ধারণ করিলে, তাহার জন্য মাসহারা নির্দিষ্ট হয়। ১৮৪৫ খ্রিঃ অব্দে' ঢাকার শেষ নবাব গাজিউদ্দিন বাহাদুরের মৃত্যু হইলে পর কেবলমাত্র নবাবের আত্মীয় ও ভৃত্যগণ কিছু কিছু বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। ১৭৬৯ খ্রিঃ অব্দে শাসনকার্য পরিচালন জন্য কোম্পানির পক্ষ হইতে ঢাকাতে একজন সুপারভাইজার নিযুক্ত হন। ১৭৭২ খ্রিঃ অব্দে এই উপাধির পরিবর্তে 'কালক্টের' নামকবণ হয। এই বৎসর রেজা খাঁব পরিবর্তে দেওয়ানি আফিস কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত হয় ও দেওয়ানি আদালত নামে একটি কোর্ট সংস্থাপিত হয়। কালেক্টব তাহার অধীনে কার্য করিতে থাকেন। ১৭৭৪ খ্রিঃ অব্দে প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল সংস্থাপিত হয়। তদধীন কর্মচারি দ্বারা কর আদায় ও বিচার কার্য সম্পন্ন হইত। আপিল কাউন্সেলে হইত। মেম্বব হইতে কাহাকেও লইয়া গবর্নর স্বয়ং এই বিচার কার্য সম্পন্ন করিতেন। ১৭৮১ খ্রিঃ অব্দে কাউন্সেল উঠিয়া যায়। সেই বৎসর মিঃ ডে সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর নিযুক্ত হন। ১৭৯০ খ্রিঃ অব্দে কালেক্টরগণ ম্যাজিস্ট্রেট পদ প্রাপ্ত হন। ১৭৯৩ খ্রিঃ অব্দে ঐ নিয়ম পরিবর্তিত হইয়া জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যভার একজনের উপরই ন্যস্ত করা হয়। এই বৎসর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আরম্ভ হইয়াছিল। তৎকালে ঢাকাতে দুই জন ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। একজন ঢাকার জন্য, অন্যজন ঢাকা জালালপুরের জন্য। উভয় বিচারকই ঢাকাতে অবস্থান করিতেন। জালালপুর একটি বিস্তৃত পরগণা। এই নামের সহিত ঢাকা সংযোগে ঢাকা জালালপুর নামে আর একটি জেলার নামকরণ করা হয়।

ফরিদপুর জেলা সংস্থাপন ঃ

এই ঢাকা জালালপুর বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে পদ্মার পশ্চিম তীরস্থ কতক স্থান ও পূর্বতটের জাফরগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ থানার কার্য সম্পন্ন হইত। ১৮১১ খ্রিঃ অব্দে একটা পরিবর্তন হয়। এই সময়ে ঢাকা জালালপুরের ম্যাজিস্ট্রেট আফিস ঢাকা হইতে উঠিয়া ফরিদপুরে সংস্থাপিত হয়। চন্দনা নদীর পূর্বতীরবর্তী স্থান যশোহব হইতে খারিজ হইয়া এবং গোপীনাথপুরের থানা বাকরগঞ্জের অধীন হইতে, ঢাকা জালালপুরের অন্তর্গত হয়। ১৮৩৩ হইতে ১৮৩৮ খ্রিঃ অব্দের কোন সময়ে ঢাকা জালালপুর, ফরিদপুর নামে পরিবর্তিত হয়। পদ্মার পূবতীরবর্তী মাণিকগঞ্জ প্রভৃতি স্থান প্রায় ৩৭ বৎসর এই জেলার অন্তর্গত থাকিয়া ১৮৫৬ খ্রিঃ ঢাকার অধীন হয়। ঢাকার জজ বৎসরে দুইবার আসিয়া এই স্থানের আপিল ইত্যাদি বিচাবকার্য সম্পন্ন করিতেন। ১৮৭৪ সন হইতে এই স্থানে স্থায়ী জজ নিযুক্ত হন।

১৮৭১ খ্রিঃ অব্দের ১৭ সেপ্টেম্বব' হইতে গবর্নমেন্টের আদেশে কীর্তিনাশার দক্ষিণ তীরবর্তী মুলফৎগঞ্জ থানার অন্তর্গত ৪৫৮ খানি গ্রাম ঢাকা জেলা হইতে খারিজ হইয়া বাকরগঞ্জের অধীন হয়। মুলফৎগঞ্জ মাদারিপুর সবর্ডিভিসনের মধ্যে ভুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু আদালত সংক্রান্ত মোকদ্দমা ঢাকার অধীনে থাকে। ছোট মোকদ্দমা বহর মুন্সেফিতে' ও বড় মোকদ্দমার আপিল ঢাকাব জজেব নিকট সম্পন্ন হইত। মাদারিপুর সার্বডিভিসন ১৮৭৩/৭৪

খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হয়। তদবধি মুলফৎগঞ্জ বা পালং থানাও ফরিদপুরের অন্তর্গত হইয়াছে। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে ১ম ভাগের ১৪১৩ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনানুসারে ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার সীমা নির্ধারিত হয়। এবং ঐ তারিখে কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৪৪১ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনানুসারে সবডিভিসন সমূহের সীমা নির্ধারিত হয়। বর্তমান সময়ে নদিয়া জেলা হইতে খারিজ হইয়া ৩৩ খানা গ্রাম ফরিদপুর জেলাভুক্ত হইয়াছে। এখন জেলা সীমা এই রূপ দাঁড়াইয়াছে—উত্তর ও ঈষৎ পূর্বদিকে পদ্মা, পূর্বদিকে মেঘনা, দক্ষিণ ভাগে গৌরনদী থানা ও নয়াভাঙ্গনী নদী। পশ্চিমে মধুমতী ও বারাশিয়া নদী ও ‍ষ্ঠিয়া সবডিভিসন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নম্বর ৫৬২৮। পরিমাণ ফল ১৩৫১৪৩৫ একর। কর ৪৩১২৮১। অস্থায়ী বন্দোবস্তের নম্বর ১৪৬। পরিমাণ ফল ২৯৬১৩ একর। কর ৩৭১৬। গবর্নমেন্টের খাস তহশীল ১৭৭ মহাল। পরিমাণ ফল ৪৮৯২২০ একর। রাজস্ব ১৫৬৩৬০ টাকা। মোট রাজস্ব ৬২৭১০৪ টাকা।

সবডিভিসন, থানা, মুন্সেফী ও মিউনিসিপালিটি

বিভাগ	থানা	মুন্সেফী	সাবরেজিস্টার	জনসংখ্যা
সদর	১. ফরিদপুর মিউনিসিপালিটি	ফরিদপুর	ফরিদপুর	৮৬২১১
	২. ভূষণা	ও	ভাঙা	১৮৭৮৮৯
	৩. নাগরকান্দা[৪]	ভাঙা	নাগবকান্দা	১০২৯৪৮
	৪. ভাঙা		ভূষণা	১০১৮২
মাদারিপুর	৫. মাদারিপুর মিউনিসিপালিটি	মাদারিপুর	মাদারিপুর	১৭৯৭৭৬
	৬. পালং	চিকন্দী	পালং	২৭৯০৮৪
	৭. ডামড্যা আউটপোস্ট	ভাঙা	ডামড্যা	
	৮. গোসাইহাট আউটপোস্ট		গোসাইরহাট	
	৯. শিবচর		শিবচর	১৩১৮৫২
রাজবাড়ি	১০. রাজবাড়ি মিউনিসিপালিটি		রাজবাড়ি	১২৬০৩৮
	১১. বালিয়াকান্দি		বালিয়াকান্দি	৯৭৭৯৯
	১২. পাংসা	রাজবাড়ি	পাংসা	১২৬৬১৫
গোপালগঞ্জ	১৩. গোপালগঞ্জ		গোপালগঞ্জ	৭৯১২৯
	১৪. কোটালিপাড়া		কোটালিপাড়া	১৩১৮৫২
	১৫. মুখসুদপুর		মুখসুদপুর	১৭৬৪১৮
	১৬. কাশীয়ানী		কাশীয়ানী	

জেলা, মহকুমা ও থানাসমূহের সীমা নির্দেশের তারিখ

ফরিদপুরের ও ঢাকার সীমা নির্ধারণের তারিখ। ১৮৭৪ খ্রিঃ অব্দ ১৬ সেপ্টেম্বর কলিকাতা গেজেটের ১ম ভাগ ১৪১৩ পৃষ্ঠার বিধান মত নির্দিষ্ট হয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখের ৮৫৫ পৃষ্ঠায় বিধানমতে পরে আবার সীমা নির্দিষ্ট হয়।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ম খণ্ডের ১৪৪১ পৃষ্ঠার বিধানমতে সবডিভিসন বা মহকুমার সীমা নির্দেশ হয়।

বালিয়াকান্দি থানার সীমা — ১৮৮৪ খ্রিঃ অব্দের ২৩ জানুয়ারি, কলিকাতা গেজেট, ১ম খণ্ড ২য় পৃষ্ঠা।

কামারখালি আউটপোস্ট খোলা হয় ১৮৮৫ খ্রিঃ ২২ জানুয়ারি এই গেজেটের প্রথম খণ্ড ৭২৭ পৃষ্ঠা। কামারখালি আউট পোস্ট মধুখালি যায় ১৮৯৪ সনের ২ মে এই গেজেট ১ম খণ্ড ৫৫০ পৃষ্ঠা।

সদরপুর, কাশীয়ানী, ভেদেরগঞ্জ, গোসাইরহাট, মধুখালি থানার সীমা নির্ধারিত হয় (সংশোধিত রূপে) ১৯০৮ ৩ মে এই গেজেট ৮১৭ পৃষ্ঠা।

ঢাকা জেলা হইতে কতিপয় গ্রাম খারিজ হইয়া শিবচর থানার অধীন হয় ১৮৯৪। ৭ নবেম্বর কলিকাতা গেজেট ১ম খণ্ড ১২০ পৃষ্ঠা। ফরিদপুর ও ঢাকার সীমা নির্ধারণ ১৮৭৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কলিকাতা গেজেট ১ম ভাগ ১৪১৩ পৃষ্ঠা এই ১৮১০ সনের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখের ৮৫৫২ পৃষ্ঠা সবডিভিসন সমূহের সীমা নির্ধারণ ১৮৭৪ সনের ১৬ সেপ্টেম্বর এই গেজেট ১ম খণ্ড ১৪৪১ পৃষ্ঠা।

দেওড়া (ভাঙা) থানার কয়েকটি গ্রাম মাদারিপুরেব মধ্যে যায় ১৮৭৫ সনের ২৭ জানুয়ারি এই গেজেট ১ম খণ্ড ১৪৯ পৃষ্ঠা।

গোপালগঞ্জের থানা সদর হইতে মাদারিপুবের অন্তর্গত হয় ১৮৭৫ সনের ১১ আগস্ট এই গেজেট ১০৩০ পৃষ্ঠা।

শিবচর আউটপোস্ট মাদারিপুব থানা হইতে পালং থানার অন্তর্গত হয় ১৮৭৫ সনের ২৫ আগস্ট এই গেজেট ১ম খণ্ড ১০৮১ পৃষ্ঠা।

পালং থানার সীমা নির্ধারণ হয় ১৮৮১ সনের ৯ মার্চ এই গেজেটের ১ম খণ্ড ২৯৫ পৃষ্ঠা।

স্টেশন ফরিদপুর

সদর থানার অধীন কতিপয় গ্রামের নাম উল্লেখ করা হইল। দুর্গাপুর, ভাটলেকচর, দরিচাঁদপুর, দুর্গাপুরচর, চাঁদপুর, নুসিপুর, ফটিকপুর, কৃষ্ণপুর, ফতেপুর, চরবেলাবান, জয়দেবপুর, লক্ষ্মীপুর, পুরাপুর, বঘুনন্দপুর, কোয়ারপুর, পারচর, শিবলুর, রতনগঞ্জ, গোবিন্দপুর, গোপিচাঁদপুর, লক্ষ্মীকুল, বিষ্ণুদিয়া, কাচারদিয়া, বডকান্দিপাড়া, নারায়ণপুর, মাধবপুর, মহম্মদপুর, সাদিপুর, গোপালপুর, মোয়াজপুব, করলাপুর, কানাইপুর, রায়খালি, ফুরসি, বামিচাঁদ, রণকাইল, আউরাকান্দি, চন্দ্রপাড়া, গট্টি, পিপরাইল, হাটুরি থানথানাপুর, ঢুসাজারি, ইচাইল, কুজারদি, বেলবাড়িয়া, উখাইল, ভোগানদা, ছাচিয়া, সাধুহাটি, বোকাই, কাফরা, কমলাপুর, সাদীপুর, ভুজানদরগা, গাজুরি, গীরদা, আলিআরা, আলিয়াবাদ, কৃষ্ণআরিভাঙা, গোপালপুর, রামনগর, শ্রীকৃষ্ণপুর, কৃষ্ণপুর, ফরিদপুর, গাজুলা, মাণিকগঞ্জ, রাধানগর, সুদরবেরা, হাটুরি, পিবারাইল, মারুকি, তালমা, আজিয়া, চর অযোধ্যা, টালিভাঙা, ইমামদিপুর, কারাডাঙা, ঠাকুরপাড়া, দাসপাড়া, গরদানপাড়া, মুন্সীডাঙা, জালচর, চরকুলিয়ানপুর, রতনপুরা খাবাসপুর রুলুপাডা, চরহাজিগঞ্জ, জাঞ্ছু, টুরিয়ারচর, হরিরামপুরের চর ও টেঙ্গরাখলা, দামরাকান্দি, টহলা মুরারীদহ, মুন্সীব, কাফ্রা, সধুহাটি, বাকাইল।

থানা ভূষণার অধীন গ্রামসমূহ

আজনবিরা, চাঁদপুব, চাওব, কুমদপুর, বঙ্গেশ্বরদ্রী, মুজুরদিয়া, কারাকারিদ ভেরাদি, গোলা জয়নগর, মহেশহাটা, হেমামদ্দী, নাওদিয়া, বামচন্দ্রপুব, কুন্দরিযা, কয়রা, দোবা, কৃষ্ণপুর, লক্ষ্মীপুর, আদিয়াসুল, দেওপুর, ভূষণা, সিট্টাছি, মিঠাপুর, দাদপুর, বড়কান্দি, আমগ্রাম,

শিবপুর, হাসামদি, রাইপুর, চলনা, ঢুলপুকুরা, বোয়ালমারি, কালিম, দেব্রামদারপুর, কালীপাড়া, বুরুরকান্দি, মুলিয়াপাড়া, মাসাইল, বেথুর, জয়পাশা, বাজিত, তেলিজুরি, রাইবর, বনচাকি, সাখর, আটজোল, সারণদি, বনচাকি, ভাটপাড়া, বায়রকান্দা, বরঙ্গকোঠা, কুমরাইল, কাশালার, মোরা, রুপাল সাহসরাইল, ষ্কদমি, কালীমাজুটা, ছত্রকান্দি বনমালিপুর, টাঙ্গরাইল, দেওলি, মিছাডাঙা, কারুণ্যপুর, রামদিয়া নাগ, চাপকানদহ, বিশ্বনাথপুর।

থানা নগরকান্দার অধীন গ্রামসমূহ

আলুঘুরা, তেতুলিয়া, ভগারকান্দি, পুঁঠিয়া, গেংয়ালপাড়া, জয়কল, সরমঙ্গল খুর, সরুকদিয়া, বাগাট, জয়ঝাপ, গারলিরা, ফুকরকান্দি, কীত্তা, ভাওয়াল, বনগ্রাম, সাতলা, ভরকামাদিয়া, বেনানীকান্দি, মীনাপাড়া, মেহাবাদিয়া, জয়পুর, তাঁতিপাড়া, সলটা, সোয়ালডুবি, টাগুনদিয়া, কামারকান্তা, বহরদিয়া, ছিনার কামদিয়া, ঈশ্বরদিয়া ও নারায়ণ দিয়া, ফুক্রা, ইশবদিয়া, মাঝারাদিয়া, রাজাবাড়ি, নাটখলা, গোপালিয়া, আজনপটিয়া, মুরটিয়া, সুরাদিয়া, রাঙ্গদিয়া, চাঁদখালি, সোনাপুর, রায়েরচর, ঠাকুরকান্দি, বিষ্ণুদি, ডুকা, ফুলবাড়িয়া, ব্রাহ্মণডাঙা, দুকা, বেইতা, কাজিপুর, জুগনদিয়া, বালিচর, কেদারবাড়ি, বল্লভদি, গজারিয়া, রায়মাল, যোগানাদী, কাদুরবাড়ি, চাঁদেরহাট, দহীসরা, ধরমাদি, তারাকান্দি, নিমারহাটি, রায়জাক, রামচর, আলগদিয়া, নুনক্ষীর, মানিক্দি, ষ্ঠামুহামাদি, আলগাছিয়া, বাসুদেবপুর, পট্টি, নলিয়া, মরদিয়া, বালায়াচর, ট্রিয়াকান্দি, খুলনা, বারইকান্দি, নূরপুর, গোপীনাথপুর, কন্দী, কোদালি, কয়ালা বাড়ি, খালিশপুটি, ছাগলদি, ছিলিনপুর, কাঁচাইল, গজারিয়া, বালিয়া, জগদিয়া, কামালহটি, জাঙ্গারদিয়া, বাগলরা, আইনপুব, সালিখা, রণপাশা, জঙ্গী, পুখরিয়া, বাউতিপাড়া, মাঝকান্দি, গোড়াইল, সাকরাইল, মোনাকোলা, জামপুর, ভাবুকদিয়া, দাদপুর, আটাইল, লক্ষ্মীপুর, বিলভুইরা, সউলভূরি, সেবন্গল, খইয়া, নয়গ্রাম, শ্যামনগর, যাত্রাবাড়ি, ঘরচর, ঠেঙ্গামারি, মিসজিয়াল, নগরকান্দা।

থানা ভাঙার অন্তর্গত গ্রামসমূহ

ফতেপুর, গোয়ালবাহার, বিদ্যামন্দী, হরিদাসদি, বিশ্বম্ভরাদি, শ্রীরামপুর, চাঁদপট্টি, শ্রীকৃষ্ণদি, সাতুবাটি, পাইকপাড়া, ডোনারক, নিলখী, বাগমারা, নাজিরিখান, গোদর, ভাজাডা, প্রথাবিচর, সেনামই, কাকইর, সারুল, সাওতুর, কাশীমপুর, দেওয়া, শ্যামনগর, ভাসরা, আত্রা, খারদিয়া, চামারদি, নোয়াকান্দা, দারমহী, মোকামপট্টি, খামারভাগ, আজিমনগর, ঘোষগ্রাম, তাজপুর, ইনাতপাড়া, দত্তপাড়া, ঈশ্বরদি, গোয়ালদিয়া, চৌধুরীকান্দা, মেদিগ্রাম, দীঘলকান্দি, পুইলা, বিশ্রিকান্দা, আবজুনপট্টি, আটাদি, ভাঙা, তুজুরপুর, চন্দ্রচর, মুকডুবা, পানিবেড়া, মৃজাপুরচর, গোপীনাথপুর, জাহানাবাদ, আবদুল্লাবাদ, মাজিগাতি, দোয়াইর, সরইবাড়ি, কামারদিয়া, হালদি, কাফুরপুর, পুরারিয়া, হাজিপুর, ফুকুরহাটি, গজারিয়া, বেড়া, খাটরা, কোষাভঙা, লোচনগঞ্জি, বাবতলী, যয়দুনণ্ডী, বাগপুর, কুতুবভাঙা, বারতবী, চর ডুবাইল, খাত্রিয়, নুলাল্লাগঞ্জি, পুলসি, ব্রাহ্মণদি, সাতরসি, নরুল্লাগঞ্জ, রাজাপুর, সারে সাতরশি, চরবরমদি, দাসহাজো, শ্যামপুর, সদরপুর, দুর্গাপুর, শুকদেবপুর ঠাকুরগঞ্জ, শ্যামগ্রাব, কালামৃধা, কবিরাজপুর, পাথরাইল, মথুরাপুর, বাগপুর, বেলদারপাড়া, চাঁদপুর, সন্ন্যাসীডাঙা, ময়নাকাটা, বন্দরখলা, মাঝিগাতি।

থানা মাদারিপুরান্তর্গত গ্রামসমূহ

নিল্খী, কামারকান্দি, ঘুনসদী, গেসার, করকান্দা, চানদি, নিজ ধুরাইর, চাচার, বল্লভদি, শিবখাড়া, সাকারপুর, বিরঙ্গন, হোসেনকান্দি, নস্তবাপুর, কাগচামরা, হবিগঞ্জ, সাচারাদি, নন্দী,

বাহাদুরপুর, পাটাভুকা, গন্ধর্বাদি, ইসিফপুর, কাফিমা, দুদখালি, নারায়ণকান্দি, দৌলতপুর, দিয়াপাড়া, সরমঙ্গল, গোপালগঞ্জ, কেন্দুয়া, বনগ্রাম, রাজোর, দুর্গাবিমদি, কুলীয়াপুর বরদিয়া, মিরার, হুগলি দক্ষিণরাজোর, মোজচর, কুনিয়া, ওজ্রাপুর, সাতপার, কাপালিকান্দি, বাজিতপুর, পেয়ারপুর, গজারিয়া, আমগ্রাম, হোগলা, সাতুরিয়া, দত্তেরহাট, নাইয়া, কেন্দুয়া বৈবাশী, মালিভাঙা, ইকাবাড়ি, দিঘিবপার, কাজবার খেল, বেড়া, নাউশুর, সুচিয়ারভাঙা, বেলবাড়ি, জোয়ার হাকারপুর, জালিরপার, পামুলা, গজারিয়া, রোকমেক, বাহদুরপুর, খাজচুরা বেলবাড়ি, পশ্চিমচাটা, পাণ্ডুপাড়া, বিলঝারি, বটা, এইসা, দরশনা, মাইজপাড়া, ধুয়াসার ক্লালগ্রাম, আলিসাকান্দি, কদমপট্টি, ভাটরু বামশীল, ফটিক বাহাদুরপুর, দাস্তরিচর, মাণিকগঞ্জ, চরটেঙ্গামারি, চরকৃষ্ণনগর, অনুচর, চরলক্ষ্মীপুর, লক্ষ্মীপুর, চরকালকিনী, কালীনগর খাজুরতলা, গণ্ডারকান্দি, খোয়াজপুর, মেদাক্ম নবগ্রাম, রাজদি, পুরখান্দলা, বিনতিলক, কাশীমপুর, মাইজপাড়া, কানাইপুর, কবলপাড়া চরগমুগরিয়া, কালাইমারা, ধুলগ্রাম, টুরহিয়া, হোগলপটিয়া, সানমানদি, কটিয়াল, চররিপাড়া, মাদ্রা, ঝাউদি, গানখাম, চাবনা কুলপদী, গইদি, খাগদি মাদারিপুর ঘাটমাঝি, রূপরিয়া, বৌলগ্রাম, মহেশ মাঝীচর, খালিয়া সেনদিয়া, করণবাড়া ও ফাইসাতলা।

থানা পালং-এর অধীন গ্রামসমূহ

নড়িয়া, কলুকাঠি, খএরপটি, লোনাসিং, চাকদহ, মুলফৎগঞ্জ, মানাখান, সিরঙ্গল, যোগপাটা, চান্দভাওরি, সাতপার, ভুমখাড়া, জালিয়াহাটি, ফতেজঙ্গপুর নগর, দেওজুরি, উপসী, মসুরা, আকসা, চান্দনী, আচুড়া, ভূচুড়া, ডিঙ্গামানিক কোয়ারাগ, মান্ডা, কাঠকুলি, আলকাদ, চান্দা, কেদারপুর, কাপাসপাড়া, বিঝারি ভড্ডা, দিনারা, বোকাইনগর, বাঘীয়া, দুপুখণ্ড, মগর, আটিপাড়া, ধামারণ চামটা, গোনমাইজ, কুড়াশি, দাশতরা, পালঙ্গ, তুলাসার, বিলাসখাস, বাটানগোহী, সাধুপুরা, ধামসী, গঙ্গামার, কোমরপুর, জানসার, ডোমসার, শউলা, আবুরা, সুজন্দল, চিকন্দী, সুস্কিসার, দশকান, বিনোদপুর, আড়িগা, পাটানিধি, গুরিপাড়া, লতাবাগ, দাড়খোলা, বড়নিদানপুর, খাসিখোলা, পশ্চিমপার, বাহেরচর, আউলিয়াপুর, জফ্রাবাদ, বড়পাচন, গোবিন্দপুর, খোয়াজপুর, মাধু, শূন্যঘোষ, রামভদ্রপুর, মামুদপুর, নিলকুণ্ডী, কাকদি, ধানুকা, হুগলি, বালিচারা, ছয়ঘরিয়া, মাঐসার, কাঞ্চানপাড়া, লাকারতা, গইড্ডা, দিনারা, পাইয়াতলি, পণ্ডিতসাব, নলতা, হোগলা, ঘড়িসার, আমলতি, পাচলেজা, গুনমাইজ, বাটুগুহি, সিতুপুরা, মহিষকান্দি, সিঙ্গাচূড়া, কামটলা, ভেদেরগঞ্জ, সামন্তসারা, নলমুড়ি, দুরয়ার, মাকসাহা, মির্জাপুর, পুটিজুরি, ছয়গাঁ, দেভোগ, সাজনপুর, পাপরাইল, চন্দনকর, সোনামুখী, রুদ্রকর, চরচাটগণ, মানুষ, আগকসা : সিড্ডা, ভাসানচর, দাদপুর, চররসনন্দী, চরলক্ষ্মী, নারায়ণ, দালুই, ডামাড্ডা, কণকসার, দক্ষিণপাড়া নামুলজদ্দি, সিংহগাড়িয়া, মূলনাপাড়া, পাইকাঠি, বিশাকুড়ি, চলঅস্থা, কাস্থা গোবাড়ি, দাদপুর, লক্ষ্মীপুর, স্নানঘাটা, চরপাড়া, চরমালগাঁ, ধানকাঠি, ভুলুয়া, চরপদ্মা, দিকশূল, কান্দাপাড়া, টিগোলিয়া, কিয়পদা, ছাপকাঠি, দাসের জঙ্গল, মহেশখালি, হাটুরিয়া গজারিয়া, ফাগনসা, কালুরগাঁ, রামচন্দ্রপুর, নাগেরপাড়া, বাঁশগাড়ি, রাণীসার, বানেদগুরি, কাঞ্জারচর, তারুলিয়া, বিনটিয়া, সিংগারডা, চরবতনা, কলারগাঁ, মালনাপাডা, ঝিকারকাঠি, এডিকাঠি, টেঙ্গরা, বেজনিসার, পাতলা, মসুরগাঁ পট্টি, বুড়ির হাট, গোসাইর হাট, ভিলৈ, পিয়কাঠি, কাশাভোগ, মধ্যপাড়া। এতদ্ভিন্ন রাজনগর, জপসা, পোড়াগাছা প্রভৃতি নদীগর্ভস্থ স্থানগুলির পুনরায় উত্থিত হইয়া চড়াতে পরিণত হইয়াছে। চর জাজিরার অন্তর্গত এইরূপ প্রায় ৫০/৬০ খানা গ্রামের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

থানা শিবচরের অন্তর্গত গ্রামসমূহ

রঘুরামপুর, কালিকাপুর, হাসনাবাদ, বোহারচর, বাঘাই, বাউলারচর, ছিলারচর, হবিগঞ্জ, সন্তোষপুর, বাজিতপুর, সেখপুর, লক্ষ্মীপুর, আড়াচণ্ডী, রণখোলা, রায়পুর, শিবপুর, আটপাড়া, শ্রীপাশা, গাজিপুর, ভাণ্ডারিকান্দি, আচইর, জেটমহল. মৃজানগর, খামার, গঙ্গারামপুর, রাযমিগার, বোয়ালিয়া, উমেদপুর, জয়সাগর, গয়ঘর, চরগাজিপুর, রামনগর, সবিত্রগাঁ, বরশি, সাহেবাজনগর, চন্দ্রা, ভাটর, গোপালপুর, বাঘিয়া, চাটিভোগ, ডহরপাড়া, কৃষ্ণনগর, বাহেরচর, পাচ্চর, বরমগঞ্জ, কেশবপুর, রঘুনাথপুর, খাজুর, টডা, বাহাদুরপুর, খানকান্দা, টেঙ্গরামারি, হীজাস্থান, সামাইল, কুবিদপুর, গোপালপুর, নীকান্দি, কাকইর, দতিয়াকান্দি, বয়রাতলা, জোরশিবচব, ফুরাঙ্ক, গোয়ারেকেল, চরবদ্রাসন, চরনিলখী. কাবিদপুর, নিলখী, চান্দারচর, গোলাঘাট, চাইবিবপুর, কেবলনগর, চরজরিপ, সোনাঘাট, মৃজানগর, হাজুরাকান্দা, শিবপুর।

থানা গোপালগঞ্জের অন্তর্গত গ্রামসমূহ

ঢাগরভাঙা, সিংহিপাড়া, টঙ্গিপাড়া, বাসুরি, জিমাভাঙা, ঘোনাপাড়া, পাইককান্দি, গোবরা, হরিদাসপুর, বারসী, পঞ্জরিয়া, গোপালগঞ্জ, গোপালপুর মানিকদহ, খাগবাড়ি, হাতিকান্দা, ওলপুর, খাগাইল, চন্দ্রদি, বশিয়া, ঘোনাপাড়া, গোয়ালডাঙা, পীটশুভাঙা, নিশ্চিন্তপুর, নিজ্রা, নিজামকান্দি, ফুলশা, বৈরাগিপাড়া, বাতবাড়ি, রাউৎপাড়া, রাজবাড়ি, হাতিবাড়ি বাণীহার, ভোজেরগাতি, পারদাঘলীয়া, বন্যাবাড়ি, চন্দ্রদীঘলিয়া, শ্রীরামকান্দী, বনটিয়া, করণকোপা, বায়বাজি, ...পাড়া, গোপীনাথপুব, কায়ালিয়া, বাটবাড়ি, সুরগ্রাম, যাদুপুর, বিদ্যাধর, সীতারামপুর, বিথুরি, শীতলাডাঙা, কাজুলিয়া, বাজনীয়া, মালীবাটা. রায়পাশা, উত্তরপাড়া, নীলবাড়ি, মাণিখারা, হাটবাড়ি, কৃষ্ণপুর, পাটকেলবাড়িয়া, সাতপার, কালিবাড়ি, গন্ধীয়াসার, দোম্রাসার, আরপাড়া, খাম্বারিয়া, গোপালপুর বিল, কজলাবিল, মটরভাঙাবিল, বসুরিবিল, হারজোড়বিল, পটলুভাঙা।

থানা কোটালিপাড়ার অন্তর্গত গ্রামসমূহ

বারইডাঙা, ছোট ডুমরিয়া, খয়রানগর, গোয়ালিয়া, ঘাগর, বাহের সীমলা, তারাকান্দা, ঘুদ্রামতী, ডুমুরিয়া. গোপালপুর, বঙ্গনদীয়া, শ্রীরামপুর, উনশীয়া, গচাপাড়া, রাজাপুর, নাওড়া, মধুনগর, পারকনা, বুরিয়া, ভুলুহার, আমতলী, কাশ্যপপাড়া, বাগডাল, তেরশ্রী, জলীয়া, কশল্যা, বিষ্ণুপুর, আগুলিয়া, ঢারকুরপাড়া, মাজবাড়ি, হরিণ, বিতসী, ছত্রকান্দা. আদগঙ্গা, দেওপুরা, তিলক, জলী. জামুনা, চরখালি, সীতাকুণ্ড, সাদুল্লাপুর, কদমবাড়ি, দীঘলিয়, পুখড়িয়া, সাউপাড়া, কদমবাড়ি, পিঞ্জরি, মদনপাড়া, মাদারবাড়ি, ঝনঝনিয়া—বিল, দেওপুরাবিল, বরুয়াবিল. তেলিবাড়ি, নাকিরপাড়, বাগাট, পারকণা, রাজাপুর, তাড়াশী, কালীগঞ্জ, কাশাতলী, ভউয়াতলী।

থানা মুকসুদপুরের অধীন গ্রামসমূহ

বাহেরক, খাঞ্জাপুর, ফুটিপট্টি, বড়বনগ্রাম, তেঘরিয়া, ঘোষাদি, বনগ্রাম, লোহাইর চাওচা, খাঁপুরা, আগাদিয়া, পাগদিয়া. পদ্মাকান্দা. দিগনগর, রামকৃষ্ণপুর, কুমরিয়া, ভাজনদী, সাতআনি, ষোলঘড়িয়া, বাকাইল. ধোপাদি, বাঘাদিয়া, সুমীয়াকান্দি, ছয়গলিহারা, বাগদিয়া, গোরিনাথকান্দি, দেমনাকান্দি থানাপদিয়া, বামনা খাগদি, রাগদি, প্রসন্নদি, ফতেপুর, গোহালা, গণিয়ারী, খানপদ্রা, ডুমরিয়া, কালীযাগ, ঘুনসী. বালিয়াকান্দি, বামনচোরা, কৃষ্ণপুর, বুটিয়া, পাথরাইপ, নলডাঙা. কালিয়া, বাইটকামারি মহারাজপুর, বোহারো কদমপুর, মুকসুদপুর, পূর্বকান্দি, কমলাপুর, পিলালপুবি. দামোদর. থলনাবাড়দি, সিলনাপুর, বামনগাতি. উজানি,

কইমাড়া, তেলিবাড়ি, মুনকি, বেতিগ্রাম, বাসুদেশপুর, মহাজনী, ধরম, বলহাটি, বেনিনাই, কালিগ্রাম, মহিষদল ধারিয়া, কালিবাড়ি, মুনখী, বেলগ্রাম, ভাট্রা, এরুয়াকান্দি, গুণধর, বহুকলর, হাইতারা, পইসুর, সিঙ্গা আন্ধারকোঠা, পাটিগ্রাম লখারচর, কৃষ্ণদি, টেঙ্গ্রা খলা, কুনাদিয়া, বাহিভাগ, বলুগ্রাম, পাচরিয়া, ভাকুরিয়া, ডলা, সুরুলি দাসেরহাট, হোগলভাঙা, গুপ্তের গাতি, ঝকিয়, দুর্গাপুর, ফুলরাপুর, ফুলহর, কাজিটোলা, খান্দারপাড়া, রামচন্দ্রপুর, কেন্দুয়া, কোরায়ারা, রুপাপাত, গোপালপুর, কানপাড়া দুবলাপুর, ভাবরাশুর, খুরট, বেজ্রা, বড়তারাইল, মাজিগাতি, ছোট ভাড়াইল, মামুদপুর, খান্দালিয়া, লীলাগঞ্জ, দাম্রাকান্দী, ঝিকাবাড়ি, দয়রা, ধাপ্রা, রণা, লক্ষ্মীপুব, পারলিয়া, সাজাইল, মাজিয়া, কুমুরিয়া, শিবপুর, ইক্রাইন, ধুত্তা, ধোপা, বাগঝাপা, খারহিরি, দরবস্ত, মাধুপুর, জোনাশুর, বানিয়াভাঙা, হিজলি, বাগিয়া, হোগলডাঙা, হোত্রা, মহিষপুর, বিশ্বনাথপুর, দস্তান, বায়সখালি বুদপাশা, খানসিয়া খাদি, ধামকোরা, চাপতা, ডালিয়াপাড়া, আবরিয়া, পাচাইল বাটোয়ার, সোচেইন, মামুদপুর, খাগ্রাবাড়িয়া, মাজকান্দি, মাজিগাতি, সীতা, রাজপাট, আরুয়াকান্দি, পরাণপুর ইশরাদি বিল, সীতারামপুর, চন্দনধুলা, ঘৃতকান্দী, তাড়াইল, সকটিডাঙা, বেজয়, ফুএগ্রা, ভুলবাড়ি, পুকুরপার, ঢলগ্রাম বাহিভাটা বাহেরবাড়িয়া, লবলিয়া লোকান্দা, বালিয়াভাঙা দড়রবসন্ত, ইকাইল, কাশীয়ানি রথকান্দা, বানা, পিঙ্গালিয়া, মহানাগ, লীলাগঞ্জ, বোধপাশা, ধানকুরিয়া, ভাটিয়াপাড়া, আরোরা, পাঠাইল, বাটোয়ার।

থানা রাজবাড়ির অন্তর্গত গ্রামসমূহ

মানপাড়া, মালগাড়ি, রামকান্তপুর, ধরমসী, সুলতানপুর, লক্ষ্মণদিয়া, মুচিদা সোনাপুর, শিব্বরপুর, শিবরামপুর, বাজিতপুর, কারউদয়পুর, মীরঝিপুর, নরপুর, কোলো, এরেন্ডা, গৌরীপুর, রাজিয়া, আযজি জয়পুর, মোলগরেক, সারকালো, সৌদপুর, আল্লাদিপুর ইব্রাহিমপুব, বামপুর, সরসোল, বরবাদপুর, পাচরিয়া, লক্ষ্মীচরণপুর, বাণীয়াবহ, কোমরপুল, মাতীবপুরা, ভনবাড়ি, বেথলিয়া কায়েসপুরা, নাওরনদিন্না, চারাখালি, লঙ্কাদিয়া, রাজগঞ্জ, গোপালপুর, দারোযাপুর, লক্ষ্মীকোল, রাজবাড়ি, ভবানীপুর রায়নগর, শ্রীপুর, দুপ্রা, শ্রীকল, কুটিলা, বাবহিপাড়া, চবরাট, ধুলদি, উত্তরজব্রা, কামারডাঙা, বেলিয়াবেঘাটা, বরসিঙ্গা, নাবায়ণদহ, গোবিন্দপুর, গোয়ালন্দ, কাণীদিয়া, দিনানগী, বাবখীপাড়া, বাতুলতলা, মহম্মদপুর, চরদৌলতিয়া, হামস্তর বাণীকা, মাঠকান্দি, কুলটুপি, বাহেবাকাইরী, খানাথানালুর, দুলপাড়া।

থানা বালিয়াকান্দির অন্তর্গত স্থানসমূহ

বাসপুর উজানদিয়া, ভাটমেকিযা, কোরকদি, খুদিরামপুর, মসকুন্দ, শ্যামসুন্দরপুর, ধামনদিযা, কালআচি, নিবকোঠা, ডোমন, জগন্নাথদি, বাসানসী, বনগ্রাম, জানমাগর, সাধুখালি, পমিআমলা, পরতিয়া, বউলাকুণ্ড, ছোচাপুর, জাগলিজানি, ইকারচর, পেট্রা, এনকারর, দড়িয়াকড়ি, বগা, বালিয়াকান্দি, মাশেপুর, লবওয়া, যবোকান্দি, বিলজখান্দ, হিঢজী, মোচারডলা, শাথরিয়া দেলওয়া, চিকামলা, কোলাগ্রাম, পাচগাথি, হির্জলি জিলগাও, কুলুকান্দি, বেরলি, দেলালপুর, নলীয়া, সাদকপুর, পদমদি কোমরপুসী, কালিবাড়ি, মেটিন, চিদামলা, গড়িয়া, দাঘীরবাড়ি, টেনি, নোয়াপাডা, দিয়েরা, শ্রীপুর রামদিয়া, খালকুলা, নারাণপুর, ডহর, বাহাবপুর, পাকরিয়া, ফিয়ারিদপুব, তেতুলিয়া, নসিবসাহী, বরুগ্রাম, ভার, খুবদখুপদি, মালসালিয়া, দুর্গাবরদি, ইলিশকোল, মাতলাকান্দি, রাজ্জ, ইকারচুর, মাগুরি, সউদা, বদটি, জামালপুর, সাগুরা, ইসফপুর, শ্রীকারিকান্দি, গইনা, মসকুণ্ডমথুলোপুর, মেঘচাপি, দড়িয়াপুর, মহেশতিপুর।

থানা পাংশার অন্তর্গত গ্রামসমূহ

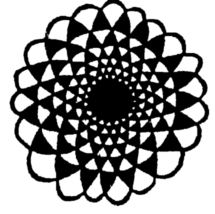
ছোটচিকনটি, বনগ্রাম, মনচারি, পণ্ডিতবাড়ি, কৃষ্ণনগর, বিমিশন, ত্রমডিশ্রী, মলুয়া, লতিবহরগো, বাবকোলা, কোয়াগ্রাম, আকনিপুর, কাগমরি, আরা, কোম্রমাইজহাল, বিলজোনা, দোনোআরাবা, হামোখলা, বেনুগ্রাম পদুনা, আশুরহল, হোদয়বিনগ্রাম, মিচেকঁতলা, নিভা, সরসা, দিউটি, বিরজিনোয়া, জিমটপুর, পাচুরিয়া, বানকুড়ি, হেমেলখলা, কুটলিয়া, বড়বিলা, কুষ্টিয়া, ছিলক্রী, মাঝবাড়ি, দিয়ারামপুর, বাণীপুর, সলফ, লটধু, পঞ্চবাড়ি, কালীপুর, মুশুরিয়া, ঘোড়াদ, বালিয়া, পুলকালও, চৌবেড়িয়া, নকুলডাঙ্গী বাঙ্গলাট, লক্ষ্মীপুর, সুরনগর কোয়বপুর, বিষ্ণুপুর, ইহাগ্রাম, মীরজিডাঙা, ভেলিয়া বোরা, কৃষ্ণপুর, রামনগর, জারসিউনপাড়া, জানাপুর খেতারপাড়া, গুলপাড়া, বাশগ্রাম, হরেকৃষ্ণ, উদিপুর, জোসাই, হলুদবাড়ি, হাবাস এব্রোখালি, মাচপাড়া, কালুপুর, ভানডুম, বাগমারা, বাহাদুরপুর, হাবাসপুর, কেশবপুর, ইউখীখালি, লক্ষ্মীপুর, সেনগ্রাম, মলা, কৃষ্ণবাসদিয়া, ইকদারখালি, নদবিলপুর, আজুদিয়া, পুবপাড়া, আতুসকান্দিয়ার, কালাবাড়ি, ধাবুড়িয়া, ভোনাবাড়িয়া, আজমপুর, মাদাপুর, রাওকোঠা, জোটলগুড়ি, বাওকোলা, চানারি, আফ্রা, জোকাই, সুরিদিয়া, কাশীনাথপুর, গোরিআলা, হারের, বল্লভপুর, খাঞ্জান আটিপুর, করিমগঞ্জ, মহীন্দ্রপুর, চরপদ্ম, রঘুনাথপুর, ভবানীপুর, হরিণবাড়িয়া, সাবাতপুর, রায়নগর, মীরগীডাঙা, দিওটি মশলিয়া, বেলগাছি পাংশা।

১. এই সময় ঢাকার কার্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। উহার নাম হুজুরি ও নেজামৎ। প্রথমটি মুর্শিদাবাদের দেওয়ানের অধীনে ছিল। ঢাকাতে তাহার একজন প্রতিনিধি দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন হইত। এই ব্যক্তির হস্তে রাজস্ব ও তৎসম্পর্কিত মোকদ্দমার ভার ছিল। নেজামত বিভাগে দেওয়ানি ও ফৌজদারি নিষ্পন্ন হইত।

২. ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন তারিখের গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপনানুসারে।

৩. ইতিপূর্বে মুলফৎগঞ্জ (পোড়াগাছাতে) একটি মুন্সেফী আফিস স্থাপিত হইয়া পরে বহব পরিবর্তিত হয়।

৪. আইনপুরের থানা পরিবর্তিত হইয়া নগরকান্দায় আসিয়াছে। পূর্বে নিম্নলিখিত থানা লইয়া ফরিদপুরের জেলা নির্দেশ ছিল। বেলগাছি ফরিদপুর হইতে ১৬ মাইল দূরবর্তী। আউট পোস্ট ধোয়াপাড়া বেলগাছি হইতে ৯ মাইল। বেতকা শহর হইতে ১০ মাইল, তালমা ১০ মাইল, আউট পোস্ট জগন্নাথদীতালামা হইতে ১০ মাইল। ভূষণা শহব হইতে ২০ মাইল, আউট পোস্ট মুকুন্দ বা মসনদপুর ভূষণা হইতে ১২ মাইল। সদরপুব হইতে ১৭ মাইল, থানা মকসুদপুর শহর হইতে ২২ মাইল, আউটপোস্ট কাশীয়ানী মুকসুদপুর হইতে ১২ মাইল, আউটপোস্ট ভাঙা শহর হইতে ৯ মাইল, থানা গোপীনাথপুর শহর হইতে ৪৩ মাইল। থানা শিবচর শহর হইতে ৩৬ মাইল দূরবর্তী ছিল।



চতুর্থ অধ্যায়

নগর ও গ্রামের বিবরণ

ফরিদপুর

প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসর পূর্বে ফরিদপুর স্থানটির প্রথম পরিচয় ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে, তৎপূর্বের বিশেষ কোন পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আরঙ্গজেব বাদসাহের রাজত্বকালে ১৬৬৪ খ্রিঃ অব্দের ১৬ অক্টোবর সায়েস্তা খাঁ যখন রাজমহল হইতে ঢাকা আসিতেছিল, তখন হাজরাহাটি নামক স্থানে উপনীত হইলে, সুবার কয়েকজন বিচক্ষণ লোক তাহাকে বলেন, ফরিদপুরের পথে তাহার ঢাকা গমন করা কর্তব্য নয়। উহা বিপজ্জনক হইতে পারে, কারণ শত্রুপক্ষীয় মগেরা, সর্বদা ঐ স্থান দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে ; অতএব তাহার পক্ষে ঝানকের রাস্তা অবলম্বন করিয়া ঢাকাভিমুখে চলিয়া যাওয়া যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু সায়েস্তা খাঁ ঐ কথা শ্রবণে উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া, সেই বিপদসঙ্কুল পথ অবলম্বন করিয়াই ঢাকাতে গমন করেন।

সায়েস্তা খাঁর শাসন সময়ে সেখ জিয়াউদ্দিন ইউসুফ লড়িকুলের দারগা ছিলেন, তাহার সাহায্যার্থে আবুল হোসেন দেড়শত রণতরীসহ শ্রীপুর অবস্থান করিতে আদিষ্ট হন। এই আবুল হোসেন মীরজুমলার সহকারি ছিলেন, আসাম অভিযানকালে নৌযুদ্ধে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন।

জিয়াউদ্দিন ইউসুফের লড়িকুল অবস্থানকালে মগেরা ফরিদপুরের পথে উহার সমীপবর্তী হয়। এদিকে মহম্মদ আবকাশ আবুল হোসেনের সাহায্যার্থে এই স্থানে আগমন করেন। উভয়পক্ষ সম্মুখীন হইলে বজ্রনিনাদে মোগলের দুর্জয় আগ্নেয়াস্ত্র গর্জিয়া উঠিয়া শত্রুশরীর ও জলযানসমূহ বিধ্বস্ত করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। মগেরা আর তিষ্ঠিতে সক্ষম হইল না, তাহাদের বিপুল বাহিনী দ্বারা এই রণযজ্ঞের আহুতির কার্য সমাধা হইলে, অবশিষ্ট জনগণ পলাইয়া প্রস্থান করিতে বাধ্য হয়। (ফাৎ ইয়া ইব্রিয়া সায়াবদ্দিন ১৩৪/৩৫ পৃষ্ঠা ও শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত ঢাকার ইতিহাস ৫০৮/৯ পৃষ্ঠা।)

আমরা ফরিদপুরের নাম এই প্রথম অবগত হই। পরে রেনেল ১৭৬৪ খ্রিঃ অব্দে বঙ্গদেশের যে মানচিত্র অঙ্কিত করেন তাহাতেও ফরিদপুরের স্থান নির্দেশ করা হইয়াছে। আমাদের অনুমানে এই দুই ঘটনার বহু পূর্ব হইতেই 'ফরিদপুর' এই নামটির উদ্ভব হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী চলিয়া আসিয়াছে, উহাই নিম্নে সন্নিবেশিত করা হইল।

ফরিদ খাঁ নামে এক ফকির এই স্থানে একটি দরগা নির্মাণ করেন, তাঁহার নামানুসারে এই স্থানের নাম হয় ফরিদপুর। ঐ দরগা এখনও কালেক্টারি কাছারির উত্তর দিকে বর্তমান আছে। রেনেলের ম্যাপে এই স্থানের নাম দৃষ্ট হয়। ফরিদপুরের একাংশের নাম কমলাপুর। তথায় দুর্লভ সাহা নামে এক ধনীর বাসস্থান ছিল। প্রবাদ তাহার বাণিজ্য কার্যের জন্য ৮০ খানা নৌকা ব্যবহৃত হইত। তৎকালে পদ্মা নদী এই স্থানের উত্তর পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইত। বহুকাল পর্যন্ত এই স্থানে নিবিড় অরণ্য থাকায় উহা শ্বাপদসঙ্কুল ও ডাকাইতগণের আশ্রয় স্থানে পরিণত হয়। ইহার প্রান্ত দিয়া যে অপ্রশস্ত স্রোতস্বতী ছিল উহার প্রবেশ ও

নির্গম মুখে উহাদের আড্ডা ছিল ; ছবদরা নাম্নী একটি স্ত্রীলোক এই দলের নেত্রী ছিল। প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। এই ডাকাইতের দল নির্মূল করা ব্যপদেশেই প্রথম তথায় একটি সবডিভিসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পরে ক্রমে জেলাতে পরিণত হইয়াছে। তৎকালে নদিয়ার অন্তর্গত কুমারখালি এই স্থানের অন্তর্গত থাকার কথা অবগত হওয়া যায়। ডাকাইতেরা একটি লোকের প্রাণ সংহার করিয়া একটি আম্রবৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখে। 'খুনে আম গাছ' ফরিদপুর ও নদিয়ার মধ্যে বর্তমান ছিল। ফরিদপুরের ও নদিয়ার পুলিশেরা 'উহা আমাদের এলাকার অন্তর্গত নহে, তোমাদের এলাকাধীন' বলিয়া কেহই আর কোনরূপ তদন্ত না করায়, গবর্নমেন্ট কুমারখালিকে ফরিদপুর হইতে নদিয়ার অন্তর্গত করিয়া দিয়া সীমা নির্ধারণ করিয়া দেন।

এই নগর কলিকাতা হইতে ১৬৫ মাইল উত্তর পূর্বে ও ঢাকা হইতে ৩২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পদ্মা নদীর অনতিদূরে অবস্থিত। এই স্থানটিতে স্টিমার স্টেশন ও রেলওয়ে স্টেশন আছে। উহা জেলার সদর স্থান ; স্কুল, মিউনিসিপালিটি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি জেলার উপযোগী যাবতীয় আফিস এই স্থানে বিদ্যমান আছে। ঢোল সমুদ্র সলিল পূর্ণ থাকা সময়ে উহার সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট ছিল। উহা মজিয়া যাওয়ায় মৎস্যাদিরও বড়ই অভাব হইয়া পড়িয়াছে। দুর্ভাগ্যের কথা এই যে ইহা জেলার সদর স্থান হইলেও ২৩টি স্কুল ব্যতীত সাধারণের পাঠোপযোগী কোন পুস্তকালয় (লাইব্রেরি) সংস্থাপিত নাই। এই স্থানটি কলিকাতাবাসী মহারাজ বাহাদুর সার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের জমিদারির অন্তর্গত। তথায় তাহার তহশীল কাছারি আছে। অন্যান্য কতিপয় ভূম্যধিকারিগণের জমি জমাও ফরিদপুর শহরতলিতে না আছে এমত নয়। ঢাকা হইতে যশোহর রোড বরাবর ফরিদপুরের শহর ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই সময়ের রোপিত কতকগুলি বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিদ্যমান থাকিয়া এই রাস্তার শোভা বিশেষভাবে সংবর্ধিত করিয়াছিল। কিন্তু উহা ক্রমেই লয়প্রাপ্ত হইতেছে। উৎকৃষ্ট ইক্ষু ও খেজুর গুড় ও বিছানার চাদর ও কাপড়ের রঙিন ছিট এই স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শতাধিক ইষ্টকালয় বিদ্যমান আছে। ফরিদপুর জজ কোর্ট ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের দালান দুইটি দেখিতে মন্দ নয়। হিন্দুদের কালীবাড়ি, ব্রাহ্মণদের সমাজ মন্দির, মুসলমানদের একটি মসজিদ ও খ্রিস্টানদের ভজনালয় আছে। ফরিদপুর হিতৈষিণী এই জেলার একমাত্র মুখপত্রিকা। পণ্ডিত রাজমোহন মজুমদার ইহার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাখানি আজিও চলিতেছে। সঞ্জয় নামে আর একখানা পত্রিকা আছে। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে বিশপ্ হিবার ফরিদপুর সন্দর্শন করিয়া এতৎসম্বন্ধে যে কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পরিশিষ্ট ভাগে সন্নিবিষ্ট করা যাইবে। এই নগরের সন্নিহিত 'গেরদা' একটি প্রসিদ্ধ স্থান। সে বিষয়ে প্রথম খণ্ডে লেখা হইয়াছে। আর একটি স্থান ছিল হাজিগঞ্জ, উহা নদীগর্ভস্থ হইয়া পুনরায় চড়াতে পরিণত হইয়াছে। পরিশিষ্ট ভাগে হাজিগঞ্জের পূর্ব বিবরণ যথাসম্ভব প্রকাশিত হইবে।

হোগলা কার্তিকপুর ও মুন্সী চৌধুরী

এই স্থানটি পালং থানার অন্তর্গত, মেঘনা নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। যখন দুর্জয় বারোভুঁইয়াগণ পূর্ববঙ্গে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া বাদসাহ পক্ষীয়গণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই সময়ে বহু মোঘল সৈন্য প্রেরণ করিয়া বাদসাহ সেই রাজগণকে আয়ত্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। ফতে মহম্মদ নামে একজন সৈনিক পুরুষ তৎকালে বঙ্গদেশে আগমন করেন। মানসিংহের অধীনে তিনিও একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। প্রবল প্রতাপ কেদাররায় নিহত হইলে, তাহার বিস্তীর্ণ জমিদারি নানাভাগে বিভক্ত হইল। মূল বিক্রমপুর প্রাপ্ত হইলেন বৈদ্য রঘুনন্দন দাশ চৌধুরী ; উহার অপরাংশ কার্তিকপুর প্রাপ্ত হইলেন সেক কালু ; অপরাংশ ইদিলপুর কায়স্থ রঘুনন্দন গুহ চৌধুরীর হস্তগত হইল।

সেক কালুর সহিত কুটুম্বিতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ফতে মহম্মদ কার্তিকপুর বাস করিতে মনস্থ করেন। ঘটনাক্রমে মেঘনা নদী অতিক্রমকালে ফতে মহম্মদ ইদিলপুরের জমিদার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই সময়ে রঘুনন্দনের বংশের একটি অল্পবয়স্কা সুন্দরী কন্যা খেলা করিয়া বেড়াইতেছিল, ফতে মহম্মদ সাগ্রহে তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। এই কথা তত্রত্য জমিদার মহাশয় অবগত হইয়া, যে বালিকা মুসলমানের অঙ্কে গ্রহীতা হইয়াছে, তাহাকে আর গৃহে ফিরাইয়া আনা কর্তব্য বিবেচনা করিলেন না। ইহাতে ফতে মহম্মদ লজ্জিত হন। কি করেন, ঐ কন্যাটিকে লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।[১] অচিরে ঐ জমিদার কন্যার সহিত স্বীয় পুত্রের পরিণয় কার্য সম্পাদন করিলেন। ইদিলপুরের চৌধুরী এই কথা অবগত হইয়া আপনার জমিদারি হইতে ৩৬ খানা গ্রাম জামাতাকে যৌতুক দান করেন। এই কন্যার গর্ভে মাইনদ্দিনের জন্ম হয়। তাহার দুই পুত্র ইমামদ্দি ও নৈমুদ্দি। মাইনদ্দিন হইতেই ইহাদের মুন্সী উপাধি আরম্ভ হয়।

মাইনদ্দিন অল্প বয়সে লোকান্তরিত হন। তাহার দুই পুত্র অল্পবয়স্ক থাকায় জমিদারির সম্পূর্ণ ভার স্বগ্রামবাসী রঘুনন্দন সেনের হস্তে ন্যস্ত হয়। মাইনদ্দিন তাহাকে বিশ্বাসী কর্মচারি বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। মুন্সী ইমামদ্দি এই সময়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদ অবস্থান করিতেছিলেন। প্রবাদ দিল্লি হইতে আগত একখানি চিঠির পাঠোদ্ধার করায়, নাজেম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে কার্তিকপুর হইতে খারিজ করিয়া কতকস্থান প্রদান করেন। পূর্বোল্লিখিত ৩৬ খানি গ্রাম ও এই নূতন ভূসম্পত্তি একত্র করিয়া রসুলপুর নামে এক পরগণার উদ্ভব হয়। এই সকল স্থানের অধিকাংশ কার্তিকপুরের পূর্বতন মালিক চাকদহনিবাসী রাঘব চৌধুরীর অধিকারভুক্ত ছিল। সেক কালু পূর্বেই উহার অধিকাংশ আত্মসাৎ করেন। অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহার কতকাংশ এখন ইমামদ্দিন হস্তগত হইল। রাঘবের বংশধরগণ কতক জমি জীবিকানির্বাহার্থ প্রাপ্ত হয়েন। উহা 'জীবিকা' নামে আজিও প্রসিদ্ধ আছে। মুন্সী ইমামদ্দি ১০৮ বৎসর জীবিত থাকিয়া পরে লোকান্তরিত হন। সাধারণে তাহাকে ধার্মিক বলিয়া মান্য করিত।

মুন্সী নৈমুদ্দি ইমামদ্দির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাহার চারি পুত্র জাহির, জমির, হাসেন ও হোসেন। নৈমুদ্দিনও কৃতবিদ্য লোক ছিলেন. অল্প বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পুত্রগণের মধ্যে মুন্সী জাহির বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাহার সহিত রাজবল্লভের পুত্র দেওয়ান রামদাসের বন্ধুতা ছিল। মুন্সী ইমামদ্দির সহিত মুন্সী জহরদ্দিন বিশেষ প্রণয় ছিল। জহর মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে ইমামদ্দি তাহাকে দেখিবার জন্য উপনীত হন। তখন জহরদ্দিন ইমামদ্দিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "চাচা, বাঁচা অপেক্ষা মরাই ভাল।" ইমামদ্দি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, 'আমরা চারি ভ্রাতা জমিদারির আট আনা অংশ পাইব, আর আপনি একক আট আনা ভোগ করিবেন। আমাদের অন্ন নির্বাহ হইবে কিরূপে?' ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া ইমামদ্দি বলিলেন—"আমার অংশ হইতে আরও দুই আনা অংশ তোমরা প্রাপ্ত হইবে। অদ্য হইতে তোমরা দশ আনা ও আমার বংশধর ছয় আনা অংশ ভোগ করিবেক।"

নৈমুদ্দির পুত্রগণ মধ্যে প্রথম দুইটি এক স্ত্রীর গর্ভজাত, অপর দুইটি অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত। এই জন্য তাহার সম্পত্তি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া বড় পাঁচ আনি ও ছোট পাঁচ আনি নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইমামদ্দির এই সদাশয়তা এস্থলে প্রকৃতভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইতিপূর্বে মুন্সী ইমামদ্দি, সেক কালুর বংশধরগণ হইতে পাকে প্রকারে কার্তিকপুর পরগণার কতকাংশ আত্মসাৎ করেন, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নবাবের দেওয়ান রাজবল্লভের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। ইমামদ্দি নবাবী সেরেস্তায় নাম পত্তন করিবার পূর্বেই

রাজবল্লভ উহা স্বীয় জমিদারির অন্তর্গত করিয়া লন। কিন্তু তথায় যাইয়া সম্যক অধিকার সংস্থাপনের কোন সুযোগ প্রাপ্ত হন না। এদিকে ইমামদ্দি স্বীয় ক্ষমতায় ঐ জমিদারি দখল করিয়া লন। পাছে উহার অংশও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ প্রাপ্ত হন, এজন্য স্বীয় স্ত্রী চাঁদবিবির নামে হোবানামা (দানপত্র) রাখিয়া যান। জহরদ্দি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও পরে আরোগ্য লাভ করেন। তখন খুল্লতাতের স্বোপার্জিত বিষয়ের প্রতিও তাহার লোভ জন্মিল। কিন্তু অন্য কোনরূপ সুবিধা প্রাপ্ত না হইয়া রাজা রাজবল্লভের পুত্র গোপালকৃষ্ণ বাহাদুরের শরণাপন্ন হইলেন।

জমিদারির মালিক হইয়াও রাজবল্লভ তাহার জীবদ্দশায় উহা সম্যক হস্তগত করিতে পারেন নাই। এখন মুন্সীগণের গৃহবিচ্ছেদ অবলম্বন করিয়া গোপালকৃষ্ণ উহা অধিকারে আনয়ন করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইলেন। রায় গোপালকৃষ্ণ বহু সংখ্যক দেশি লাঠিয়াল ও হিন্দুস্থানী সিপাহীদ্বারা কার্তিকপুর অধিকার করিবার জন্য মুন্সীপক্ষকে আক্রমণ করিলেন। মুন্সীদের পক্ষেও বহু লাঠিয়াল ও সিপাহী ছিল, তাহারা বাধা দিতে অগ্রসর হইল।[২] প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয় পক্ষের সমভাবে যুদ্ধ চলিল, কিন্তু পরিণামে মুন্সীপক্ষ পরাস্ত হইয়া পশ্চাৎপদ হন। বর্তমান বাজারের পশ্চিমাংশে ঘড়িসারের খালের পারে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রক্তস্রোত খাল রঞ্জিত করিয়া মেঘনা নদীকে পর্যন্ত উহার অংশ প্রদান করিয়াছিল। হতাহতের সংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক হইবে। এই হত ব্যক্তিগণের অনেকের মস্তক সংগ্রহ করিয়া গোপালকৃষ্ণ স্বীয় আবাস রাজনগরে, "রণদক্ষিণা" নামে দেবীর ঘট সংস্থাপন করেন। তদবধি কার্তিকপুর পরগণা রাজনগরের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয়।

মুন্সী ইমামদ্দিনের তিন পুত্র, মনিরদ্দি, ওয়াহিনদ্দি ও ফৈজদ্দি। মনিরদ্দির কোন সন্তান না থাকায় নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত গজারিযার ঠাকুর উপাধিধারী মুসলমান বংশ হইতে একটি পালকপুত্র গ্রহণ করেন, তাহার নাম হয় মমতাজউদ্দিন চৌধুরী।[৩] তিনি অত্যন্ত তেজিয়ান পুরুষ ছিলেন। মনিরদ্দি মুন্সী. হিন্দু ঠাকুরের প্রতি আস্থাবান ছিলেন। মনিরদ্দির স্ত্রী বাকতেন্নেছা বিষয়কার্য পরিদর্শন করিতেন। তাহার যথেষ্ট নগদ সম্পত্তি ছিল। এই সম্পত্তির কথা অবগত হইয়া ইদিলপুরের জমিদার মাধবকৃষ্ণ রায় স্বীয় ডাকাইতের দলসহ কার্তিকপুর উপস্থিত হইয়া বাকতেন্নেছার নিকট টাকা চাহিয়া পাঠান। কিন্তু তেজস্বিনী রমণী তাহাতে সম্মতা না হইয়া বাধা প্রদান করিতে উদ্যত হন। কার্তিকপুরের তৎকালীন প্রসিদ্ধ মল্ল জেন্দার খাঁর রণকৌশল সন্দর্শন করিয়া মাধবকৃষ্ণ রায় দলবল লইয়া প্রস্থান করেন। জেন্দার পূর্বে চণ্ডালজাতীয় লোক ছিল, পরে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। সে কার্তিকপুর হইতে ঘড়িসারের নীলকুঠি পর্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দেয়। উহা অদ্যাপি জেন্দার খাঁর দরজা নামে প্রসিদ্ধ আছে। পরে জেন্দার নীলকুঠির দেওয়ানি কার্য পর্যন্ত করিয়াছিল। বাকতেন্নেছার অনেক কীর্তি চিহ্ন অদ্যাপি কার্তিকপুরে বর্তমান আছে। তিন গম্বুজবিশিষ্ট মস্‌জিদ, তত্রত্য দিঘি, কাঠকুলি ও ভূমিসারের দিঘি তন্মধ্যে প্রধান।

ফৈজদ্দির পুত্র ফেরউদ্দিন (দানুমিঞা) হিন্দুধর্মে অনুরক্ত ছিলেন। গলদেশে যজ্ঞোপবীত ধারণ ও হিন্দুর ন্যায় মহোৎসবাদি কার্য সম্পন্ন করিলে, পুণ্যার্জন হয় বলিয়া তিনি ধারণা করিতেন। তাহার মনে বিশ্বাস ছিল তিনি শাপভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ, কর্মবৈগুণ্যে মুসলমান গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ওয়াহিনদ্দির পুত্র করিমদ্দি চৌধুরী, ফেরউদ্দিনের কন্যা ওমরজান বিবিকে বিবাহ করেন। করিমদ্দির পুত্র নাজিমদ্দিন চৌধুরী পৈত্রিক ও মাতামহের বিষয়সম্পত্তি লাভ করিয়া বার আনা অংশের মালিক হন। করিমদ্দির সময়ে শরণখলা নিবাসী শিবকান্ত কর দাসের প্রতিষ্ঠিত অষ্টধাতু নির্মিত কালীমূর্তি[৪] করিমদ্দির ব্যয়ে বাজারের পশ্চিমাংশের হিন্দুপল্লীতে

সংস্থাপিত হয়। পূর্ব দেওয়ান রঘুনাথ চৌধুরীর কুল-পুরোহিত বংশধরগণের প্রতি ঐ দেবীর অর্চনার ভার অর্পিত ছিল। মুন্সী করিমদ্দির নিজ ব্যয়ে এই কালীবাড়িতে দোল, চড়ক প্রভৃতি হিন্দু ধর্মানুমোদিত কার্য সকলের অনুষ্ঠান হইত। তৎপুত্র নাজিমদ্দিন চৌধুরী, শালিখাঁর মুন্সী তাজিমদ্দিনের উপদেশে এই সকল হিন্দু ধর্মানুষ্ঠিত কার্য হইতে বিরত হন। করিমাদ্দি চৌধুরীর সখের যাত্রা গানের দল পর্যন্ত ছিল। কার্তিকপুর নিবাসী গোপীকান্ত চক্রবর্তী এই দলের গান বাঁধিয়া দিতেন।

নজিমদ্দিন চৌধুরী সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া যান। রাজনগরের স্টেট পাঁচ ভাগে বিভক্ত হওয়ায়, কার্তিকপুর পরগণাও পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়। ক্রমে ঐ পাঁচ অংশই দেনার দায়ে ও বাকি খাজানায় নিলাম বিক্রয় হওয়ায় বিভিন্ন ব্যক্তিগণ উহা খরিদ করেন। নজিমদ্দিন সেই সমুদয় মালিকগণ হইতে ঐ সম্পত্তি পত্তনি লইয়া প্রায় সমুদয় পরগণা হস্তগত করিয়া গিয়াছেন। তন্নিবন্ধন দেশে তাহার আধিপত্য সমধিক বদ্ধমূল হইয়াছে। কার্তিকপুরবাসী হইয়াও ইতিপূর্বে তাহারা তথাকার ভূমি বা প্রজার উপর কোনরূপ ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন নাই।

ইহার সময়ে কার্তিকপুরের যথেষ্ট উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। ১২৮৪ সালে কার্তিকপুর হইতে ঘড়িসার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও ১২৭৩ সালে ইংরাজি মাইনর স্কুল ইহা দ্বারা সংস্থাপিত হয়। ঢাকার নবাব আবদুল গনি সাহেবের পুত্র নবাব আসানুল্লা সাহেবের সহিত নাজিমদ্দিন চৌধুরীর এক তনয়ার পরিণয় কার্য সম্পাদিত হয়। তাহার গর্ভে আসানুল্লার পুত্র ঢাকার বর্তমান নবাব সলিমোল্লা জন্মগ্রহণ করেন। পরে ঢাকার বর্তমান নবাব বংশের সহিত এই চৌধুরী বংশের আরও আদানপ্রদান কার্য সম্পাদিত হইয়াছে।

কি পারস্যভাষাবিৎ কি সংস্কৃতভাষাবিৎ উভয়বিধ পণ্ডিতগণের প্রতিই ইহারা সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

প্রবাদ মুন্সী ইমামদ্দিন জমিদারি লাভ ও বিদ্যা উপার্জন শেষ করিয়া যখন দেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন কার্য উপলক্ষে পথিমধ্যে নবদ্বীপে নৌকা রাখা হয়। তত্রত্য ব্যক্তিগণ তাহার দেশের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কার্তিকপুরবাসী বলিয়া পরিচয় দেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ উহা কোথায় বুঝিতে পারিলেন না ; কিন্তু তত্রত্য পণ্ডিতসমাজ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'বিক্রমপুর কার্তিকপুর যেখানে রঘু বিদ্যাবাগীশের নিবাস?' চৌধুরী বলিলেন হ্যাঁ, 'সেই কার্তিকপুর'। এই কথা হইতেই তাহার মনে এই ভাবোদয় হইল যে, কোন একজন কৃতী পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া যে কেবল আপনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকেন তাহা নহে, তাহার স্বদেশের নামও চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ঐ দেশটিকেও অমর করিয়া তুলে। ধন্য বিদ্যাবাগীশ! তোমাদ্বারা আমি পরিচিত হইলাম। দেশে প্রত্যাগমন করিয়া সর্বপ্রথমেই বিদ্যাবাগীশকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি উপস্থিত হইলে তাহাকে যথেষ্ট সম্মানের সহিত আসন প্রদান করিয়া পরে নবদ্বীপের সমুদয় কথা বর্ণনা করিলেন। তদবধি তাহার জন্য চৌধুরী সরকার হইতে বৃত্তি নির্দিষ্ট হইল। কার্তিকপুর হোগলা গ্রামের ভট্টাচার্য মহাশয়গণ এই বিদ্যাবাগীশের বংশধর।

মুন্সী চৌধুরী বংশের সকলের অবস্থা সমান না হইলেও এক নাজিমদ্দিন চৌধুরীর বুদ্ধিবলে তাহার সম্পত্তির উন্নতি সংসাধিত হইয়া এই প্রাচীন বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাহার পুত্র মুন্সী কফিলদ্দিন চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মুন্সী সেরাজদ্দিন চৌধুরী সর্বসাধারণের পরিচিত। পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ মধ্যে ইহারা অতিশয় সম্মানিত।

হোগলা

এটিও ভদ্রপ্রধান স্থান। এই স্থানে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের বাস অধিক। বৈদ্য বংশোদ্ভব দুর্গাপ্রসাদ দাশ বহু সৎকার্য করিয়া গিয়াছেন। তৎপুত্র দীনবন্ধু রায় খ্যাত লোক। এতদ্ভিন্ন গোবিন্দচন্দ্র দাশ মুন্সেফকোর্টের উকিল। সেন ও সরকার পরিবার সাধারণের পরিচিত। সেনবংশীয় কবিরাজ মহেন্দ্রচন্দ্র সেন সুশিক্ষিত ও সরকার বংশের রজনীকান্ত সেন একজন লেখক। হোগলার ভট্টাচার্য বংশ প্রসিদ্ধ, কার্তিকপুরের বিবরণে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই গ্রামবাসী গোলকচন্দ্র সার্বভৌম একজন প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। বাস্তবিক পরগণার নাম ভিন্ন কার্তিকপুব বলিয়া কোন গ্রামের পরিচয় নাই। মুন্সী চৌধুরীদের বাসনিবন্ধন হোগলাই কার্তিকপুর বলিয়া খ্যাত হইয়া আসিয়াছে। কার্তিকপুরের বাজারটি প্রসিদ্ধ।

রাহাপাড়া ও শালদহ

ভ্রমবশত এই উভয় স্থানের নাম পালং থানার অন্তর্গত স্থানগুলির মধ্যে লিখিত হয় নাই। কতিপয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এই গ্রামে বাস করিয়া থাকেন। রাহাপাড়ার জনসংখ্যা মোট ২৭৯ জন মাত্র। শালদহও প্রায় তদ্রূপ। রাহাপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়গণ প্রসিদ্ধ। "দহ" শব্দ যোগ থাকায়, শালদহ যে এক সময়ে জলনিমজ্জিত স্থান ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। শালদহ নিবাসী গোকুলচন্দ্র দে একজন সম্পন্ন লোক ছিলেন।

চাকদহ, নলতা ও দক্ষিণপাড়া

কার্তিকপুরের প্রাচীন ভূম্যধিকারীর বংশধরগণ অধুনা এই তিন গ্রামে বাস করিতেছেন। তাহারা বলেন, তাহাদের পূর্বপুরুষ কীর্তিধর বসু রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের নিমন্ত্রণ রক্ষা না করায় তৎকালীন সমাজপতিগণ দ্বারা কুলচ্যুত হন। কীর্তিধরের বংশীয় কৃষ্ণগোবিন্দ রায় চৌধুরী কার্তিকপুর সুজাবাদের মালিক ছিলেন। সদর রাজস্ব আদায় না করায় কারারুদ্ধ হন, পরে অতিভোজনের দ্বারা বাদসাহের বিস্ময় জন্মাইয়া জীবিকাস্বরূপ কার্তিকপুরের অন্তর্গত চাকদহ, ভূমিখাড়া, তেলিপাড়া, বারৈজঙ্গল, মাঐসার, পাঁচগাও, সুরেশ্বর এই সাতখানি মৌজা নিষ্কর প্রাপ্ত হন। আমাদের বিশ্বাস কৃষ্ণগোবিন্দ, চাঁদ ও কেদার রায়ের অধীনে কার্তিকপুরের ভূম্যধিকারী ছিলেন। পরে কেদার রায়ের পতনের পর, যখন তদীয় সেনাপতি সেখ কালুকে এই স্থান মানসিংহ বাদসাহ সরকার হইতে প্রদান করেন, তৎকালে কৃষ্ণগোবিন্দকে মাত্র এই সাতখানি গ্রাম জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রদান করিয়া, অবশিষ্ট সমুদয় কালুকে প্রদান করা হয়। এই সনন্দ ঢাকা কালেক্টরির ২৬৪/৫২১৬ তৌজিভুক্ত ছিল, অধুনা ফরিদপুরের কালেক্টরির লাখেরাজ জীবিকা ১১৭ (বি) বনাম কৃষ্ণগোবিন্দ রায় চৌধুরী বলিয়া লেখা যায়। ইহার মধ্যে কতক জমি ব্রহ্মাত্রা দান কবায় ও ব্যয়নির্বাহার্থে কতক সম্পত্তি বিক্রিত হওয়ায়, এখন অতি অল্প মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহাদের পূর্বপুরুষগণ যে সম্পন্ন লোক ছিলেন, তাহার কতক প্রমাণ প্রাচীন ঝিকটিদালান, পিত্তলনির্মিত লক্ষ্মীগোবিন্দ বিগ্রহ এবং একটি বড় দীর্ঘিকার খাত দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। বাড়ির চতুর্দিকেই গড়খাই ছিল।

চাকদহের ঠাকুরতা উপাধিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ। তাহাদের অনেক বৈষ্ণব-শিষ্য আছে। এই বংশের রেবতীকান্ত ঠাকুরতা বি-এল, মুন্সেফি কার্যে নিযুক্ত আছেন।

সুলেখক ও বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘটক দক্ষিণপাড়া নিবাসী। নলতা গ্রামে একটি বৌদ্ধমূর্তি দেখা যায়।

রামভদ্রপুর

প্রসিদ্ধ সিদ্ধপুরুষ গোসাঞি ভট্টাচার্যের জন্মস্থান বলিয়া সর্বসাধারণের নিকট এই স্থান সুপরিচিত। এই বংশের দ্বারা বহু কুলীন স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "গোসাঞি মিরাইতলায় সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, ঐ বৃক্ষ অদ্যাপি বর্তমান আছে।" এই বংশের বহু শিষ্য বর্তমান দেখা যায়। গোসাঞি ভট্টাচার্যের বিস্তৃত বিবরণ এই ইতিহাসের ১ম খণ্ডে লিখিত হইয়াছে, অতএব তৎসম্বন্ধে আর কোন আলোচনা করা হইল না। রামভদ্রপুর মুন্সেফ চন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।

মামুদপুর

এই স্থানবাসী বৈদ্য চৌধুরীগণ একসময়ে সম্পন্ন লোক ছিলেন। এই বংশের কবিরাজ বসন্তকুমার চৌধুরী কবিরঞ্জন কলিকাতায় প্রতিপত্তি লাভ করিয়া স্বীয় ব্যবসায় পরিচালন করিতেছেন।

পণ্ডিতসার

এই স্থানে বহু ভদ্রলোক বাস করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে বৈদ্যবংশ প্রধান। তত্রত্য শিবচন্দ্র দাশ প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। শরৎচন্দ্র দাশ, বি-এল ফরিদপুর জজকোর্টের একজন প্রধান উকিল। সার শব্দ যোগ থাকায় বোধ হয় এই স্থানে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল।

ঘড়িসার

এই গ্রাম দক্ষিণ বিক্রমপুরের পূর্বসীমায় পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গমস্থানের নিকট অবস্থিত। এই স্থানের হাট বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। এখানে বহু ব্যবসায়ী লোকের বাস। এই স্থানের অনতিদূরে বারুণী ও অশোকাষ্টমীর সময়ে বহু লোক নদী সঙ্গমে স্নান করিয়া, ব্রহ্মপুত্র স্নানের সমান ফল প্রাপ্তি জ্ঞান করিয়া থাকে। উহাই কমলাপুর ও বগিধলির স্নান বলিয়া খ্যাত। এই পুস্তকের ১ম খণ্ডে গোসাঞি ভট্টাচার্য প্রসঙ্গে এই বিষয় বিস্তারিত বলা হইয়াছে। স্নানের সময়ে এখানে মেলা মিলিয়া থাকে। এই স্থানেও বৌদ্ধ সংঘারাম থাকার সম্ভাবনা।

মুলফৎগঞ্জ, পোড়াগাছা, বিলাসপুর

মুলফৎগঞ্জ একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান। রবি ও বৃহস্পতিবার হাট বসিয়া থাকে। একটি মাদ্রাসা, একটি পাঠশালা ও ব্রাঞ্চ পোস্টাফিস বর্তমান আছে। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মৌলবী মহম্মদ ফাজেল হাফেজ সাহেব আরবি ও পারসি ভাষায় অতিশয় বিদ্বান। সমগ্র কোরাণ তাহার কণ্ঠস্থ।

ইংরেজ অধিকারের প্রথম সময়ে দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্যে গোকুলগঞ্জ নামক স্থানে প্রথম থানা সংস্থাপিত হয়, পরে প্রাচীন পদ্মা কর্তৃক এই স্থানের ধ্বংস সাধিত হইলে, উহা মুলফৎগঞ্জে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু অত্যল্পকাল মাত্র তথায় থানা থাকিয়া, পরে পোড়াগাছা গ্রামে উঠিয়া যায়। পোড়াগাছার ধ্বংস সাধন না হওয়া পর্যন্ত থানা (পুলিশ স্টেশন) তথায় ছিল। কিন্তু উহা বরাবর মুলফৎগঞ্জ থানা নামেই কথিত হইত। পোড়াগাছার পোস্টাফিসের নামও মুলফৎগঞ্জ পোস্টাফিস ছিল।

পোড়াগাছার বিশেষ বিবরণ এই পুস্তকের ১ম খণ্ডে উল্লেখ করা হইয়াছে, এজন্য আর বলিবার আবশ্যক নাই। বহুদিন পূর্বে পোড়াগাছাতে একটি মুনসেফী অফিস ছিল। নিত্যানন্দ গাঙ্গুলি মুনসেফ ছিলেন।[৫] উহা উঠিয়া নদীর উত্তর পারে বহর গ্রামে পরিবর্তিত হয়। এই

স্থানের একটি বিখ্যাত কবিরাজের নাম উল্লেখযোগ্য। কবিরাজ রামলোচন সেন কবীন্দ্র, বৈদ্যকুলোৎপন্ন পণ্ডিত ছিলেন। ইহার সান্নিধ্যে বিলাসপুর গ্রামে দীর্ঘলাল শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের বাস ছিল। নিত্যানন্দ গাঙ্গুলি মহাশয়ের একটি সুন্দর উদ্যান এই স্থানে দৃষ্ট হইত। জয়দেবপুরের রাজ জামাতা স্বর্গীয় রাসমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ও প্রধান বৈয়াকরণ উদয়চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়েব জন্মস্থান। পোড়াগাছা ও বিলাসপুর নদীগর্ভস্থ হইয়াছে।

কেদারপুর

সুপ্রসিদ্ধ কেদার রায় এই স্থানে একটি বৃহৎ বাড়ির পত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। বাড়ির চতুর্দিকে যে পরিখা খনন করিয়াছিলেন, উহার চিহ্ন ও কতকগুলি ইষ্টক নানাস্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। দেখিলে স্পষ্ট অনুমান হয় কোন বড় লোক এই স্থানে বাসস্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের নামেই যে, এই স্থানের নাম হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অধুনা এই স্থানে অনেক ব্যবসায়ী লোক ও ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। এক সময়ে এই গ্রামে গোবিন্দ সাহা নামে একজন ধনী লোক ছিলেন, তাহার বাড়িতে ঝুলন যাত্রার সময়ে মহাসমারোহ হইত। মেঘনার পূর্বতীরবর্তী চাঁদপুর বোধ হয় চাঁদরায়ের নামানুসারে হইয়াছে।

দিনাড়া

ইহা কার্তিকপুরের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র স্থান। কার্তিকপুরের প্রাচীন জমিদারবংশীয় প্রসিদ্ধ মস্তাজদ্দিন চৌধুরীর বংশধরগণের সহিত কাছাবি দখল উপলক্ষে ঢাকায় প্রসিদ্ধ জমিদার ওয়াইজ সাহেবের পক্ষীয়, কাজি উপাধিধারী একজন কর্মচারির ভয়ানক দাঙ্গা হয়। উহাতে জপ্সাবাসী মুলুকচাঁদ সর্দার নামে একটি লোক হত হইয়াছিল। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ নবীনচন্দ্র সেন মাদারিপুরের সবডিভিসানেল অফিসার ছিলেন। তদ্বিরচিত "আমার জীবন" নামক গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে "একটি খুন" বলিয়া যে গল্প রহিয়াছে, উহা ঐ খুনের মোকদ্দমা উপলক্ষ করিয়া লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। এই মোকদ্দমার মিথ্যা তদন্ত উপলক্ষে পালং স্টেশনের যাবতীয় পুলিশের কর্মচ্যুতি ঘটে।

এই স্থানে একটি হাট আছে, উহা গোপালগঞ্জের হাট নামে খ্যাত। রাজবল্লভের পুত্র, রায় গোপালকৃষ্ণের নামে উহার এই নাম হয়। উহার সন্নিকটে যুক্তিতলা বলিয়া যে স্থান আছে, প্রবাদ কার্তিকপুরের সহিত রাজনগরের বিবাদ উপলক্ষে, রাজপক্ষীয় লোকেরা এই স্থানে বসিয়া যুক্তি (পরামর্শ) করিয়াছিল বলিয়া উহার এই নামকরণ হয়।

ধামারণ

এই স্থানের দেওয়ান উপাধিধারী তালুকদার মহেশচন্দ্র সেন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কার্তিকপুরের মুন্সী চৌধুরীগণের দেওয়ানি কর্ম করিয়া যথেষ্ট সম্পত্তি সঞ্চিত করেন। এই বাড়িতে অষ্টধাতু নির্মিত কালীমূর্তি সংস্থাপিত থাকিয়া পূজিত হইতেছেন। ইহাদের কার্তিকপুরের বাড়ি নদীগর্ভস্থ হইলে ইনি ধামারণ গ্রামে গৃহসংস্থাপন করেন। সেন পরিবার ভিন্ন আরও কয়েকঘর বৈদ্য এই গ্রামে বাস করিতেছেন। এই স্থানে কয়েকজন জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই গ্রামে একটি সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বৎসরান্তে এক দিন মেলা বসিয়া থাকে।

নগর ও ফতেজঙ্গপুর

উহাদের প্রাচীন নাম শ্রীনগর। আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে এই স্থানে একজন

ফৌজদার অবস্থান করিতেন। যদিও চাঁদ ও কেদার রায় এই প্রদেশের সর্বময় কর্তা ছিলেন, তথাপি বর্তমান রেসিডেন্টের নিয়মানুসারে বাদসাহ সরকারি এক একটি অফিসও উহার অনতিদূরে সংস্থাপিত থাকিত। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে তদীয় রাজত্বের অন্তর্গত মৃজানগর নামক স্থানে এবং ঈশা খাঁর রাজধানীর সন্নিকটে ঢাকাতে এইরূপ ফৌজদার বা থানাদার থাকার বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

মোগলবাহিনীসহ রাজা মানসিংহের বিক্রমপুর শেয আক্রমণ সময়ে তদীয় সহকারি কিলমক্ কেদাব রায় কর্তৃক পরাস্ত হইয়া এই শ্রীনগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানসিংহ তাহার উদ্ধারের জন্য উপনীত হন। এই যুদ্ধে কেদার রায় আহত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। কিছুদিন পরে জয়ের চিহ্নস্বরূপ মানসিংহ শ্রীনগরের পরিবর্তে এই স্থানকে ফতেজঙ্গপুর আখ্যা প্রদান করেন। (১৬০২ খ্রিঃ অব্দ)।

ফৌজদারের অবস্থানকালে, এই স্থানের নিম্নে কালীগঙ্গা নদীর এক শাখাস্রোত প্রবাহিত হইত। উহার তটে বৃহৎ বন্দর সংস্থাপিত ছিল। এই সময়ে বহু হিন্দু মুসলমান নানাজাতীয় লোক এই স্থানে বাস করিত।

আমাদের বিশ্বাস মুসলমান বিজয়ের পূর্বেও এই স্থানটিতে হিন্দু অধিবাসীর বাসস্থান ছিল। কারণ কতিপয় বৎসর অতীত হইল এই স্থানে পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার উপলক্ষে কতকটা স্থান খনিত হইলে তন্মধ্য হইতে কতিপয় দেবমূর্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এইরূপ ধাতুনির্মিত একটি বিষ্ণুমূর্তি এই লেখক কর্তৃক সাহিত্যপরিষদে প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহা অদ্যাপি তথায় বিদ্যমান আছে। উহা হিন্দু রাজত্ব সময়ে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়াই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সম্ভবত মানসিংহ ও কেদাররায়ের যুদ্ধ ঘটনার পর হইতেই এই স্থানের পতন হইয়াছে, কারণ যতদূর অবগত হওয়া যায় দেড়শত বৎসরের পূর্বে যে কোন হিন্দু অধিবাসী এই স্থানে বাস করিত এইরূপ অনুমান হয় না। প্রাচীন মুসলমান অধিবাসীর পরিচয়ও সেইরূপ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উহা রাজা রাজবল্লভের জমিদারির অন্তর্গত হয়। রাজবল্লভের নিকট বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রশেখব জ্যোতির্বিদ প্রথম এই স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করেন। প্রবাদ এই স্থান নিবিড় অরণ্যানীতে পরিণত ছিল। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে চন্দ্রশেখর ঐ জঙ্গল পরিষ্কারের কার্য আরম্ভ করেন, কিন্তু ঐ কার্যে নিযুক্ত থাকায় ঐ দিবস যে বাস্তু পূজা দিতে হইবে তিনি তাহা বিস্মৃত হন। পরে অপরাহ্ণে আয়োজন করিয়া বাস্তু পূজা সমাপন করেন। আজিও তদীয় বংশধরগণ সন্ধ্যার প্রাক্কালেই এই পূজা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ইহা হইতে অনুমান হয় যে বহুকাল অরণ্যে পরিণত থাকার পর সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ফতেজঙ্গপুরে লোকের বাস আরম্ভ হয়।

এই সময়ে এই জ্যোতির্বিদগণের পঞ্জিকার গণনানুসারেই পূর্বে বঙ্গের দিন স্থির ও হিন্দু ধর্মানুমোদিত সমস্ত কার্য সম্পন্ন হইত। বঙ্গের পঞ্জিকা বিক্রমপুরের পঞ্জিকার সময় ধরিয়াই গণনা করা হইত। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পঞ্জিকা সংস্কার সমিতি হইতে যে পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়াছে, উহা পাঠ করিলেই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। নিম্নে উহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। "পূর্বে বিক্রমপুরে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইত এবং বিক্রমপুরের সময় দেওয়া হইত। উজ্জয়িনী হইতে বিক্রমপুরের দেশান্তর দুই দণ্ড পয়ত্রিশ পল এবং উজ্জয়িনী হইতে কলিকাতার দেশান্তর দুই দণ্ড আটপল। বিক্রমপুর হইতে নবদ্বীপ পঞ্জিকা প্রস্তুত হইলেও দেশান্তর আব বদল হয় নাই। উজ্জয়িনী হইতে নবদ্বীপের দেশান্তর দুই দণ্ড চৌত্রিশ পল থাকিল; এক্ষণে কলিকাতার পঞ্জিকা প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রচলিত পঞ্জিকা সমূহের দেশান্তর বদল হয় নাই। সেই দুই দণ্ড চৌত্রিশ পল

রহিয়া গিয়াছে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পাঞ্জিকায় যে মহাবিষুব সংক্রান্তির সময় লিখিত হইয়াছে, তাহা উজ্জয়িনীর মহাবিষুব সংক্রান্তি সময়ের। উজ্জয়িনী হইতে কলিকাতার দেশান্তর দুই দণ্ড আট পল যোগ কবিয়া আনয়ন করিয়া লিখিত হইয়াছে। কারণ রাঘবানন্দ যে দুই দণ্ড চৌত্রিশ পল দেশান্তর স্থির করিয়াছেন, তাহা বিক্রমপুরের দেশান্তর, কলিকাতার নহে।"

আমরা বহু প্রাচীনগণ নিকট হইতে অবগত হইয়াছি, ফতেজঙ্গপুরের জ্যোতির্ষীগণ বহু পুরুষ যাবৎ এই ব্যবসায় করিয়া আসিতেছেন। চন্দ্রশেখরের পূর্ব্ববর্ত্তীগণও এই ব্যবসায় করিতেন। চন্দ্রশেখরের অগাধ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজবল্লভ তাহাকে এই গ্রাম দান করেন। এ দেশীয় অন্যান্য সম্পন্ন লোকের নিকটেও তিনি এইরূপ আরও অনেক ভূবৃত্তি পাইয়াছেন। রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রশেখরকে যে ভূবৃত্তির সনন্দ লিখিয়া দেন তাহা পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল। এই বংশে বহু বিখ্যাত জ্যোতিষী জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কাশীকান্ত বিদ্যালঙ্কারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মদনমোহন বিদ্যাভূষণের সহিত প্রায় উহার বিলোপ সাধিত হইয়াছে। পঞ্জিকা এখন আর প্রস্তুত হয় না। তৎপুত্র ঈশ্বরচন্দ্র কেবল জ্যোতিষী ব্যবসায় করিয়া থাকেন।

কীর্তিনাশা কর্তৃক মূলপাড়া গ্রামের ধ্বংসসাধন হইলে, তত্রত্য অধিবাসী বহু ব্রাহ্মণ এই স্থানের অধিবাসী হন। তন্মধ্যে কেদার রায়ের সৈন্যাধ্যক্ষ সর্দার রাম রাজার বংশধরগণ ও আকসাইলের ভট্টাচার্যবংশীয়গণ প্রধান। রামরাজার বংশধরগণ সর্দার নামেই বিখ্যাত ছিলেন। মূলপাড়ার সর্দার বলিতে তাহাদিগকেই বুঝাইত। বর্তমান সময়ে উহারা পৈত্রিক চাটাতি ও চট্টোপাধ্যায় নামেই পরিচয় দিতে প্রয়াসী। এই বংশের দুর্গাচরণ ও কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। উভয়েই মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় মোক্তারি কার্য করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন। প্রতি বৎসর তাহাদের ফতেজঙ্গপুরের বাড়িতে মহাসমারোহে দীপান্বিতার সময়ে কালীপূজা হইত। উহাতে দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিদায়দান করা এবং ভূরিভোজনের আয়োজন করিয়া সকল সম্প্রদায়ের লোককেই নিমন্ত্রণ করা হইত। এই বংশের শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. বি. এল, জজকোর্টের উকিল ও জগবন্ধু ভট্টাচার্য মহাশয় একজন তালুকদার। শ্রীশচন্দ্র মল্লিক কলিকাতা মাতৃভাণ্ডার নামক মনোহারি দোকানের স্বত্বাধিকারী, অন্নদাচরণ চক্রবর্তী, বি. এল, উকিল। জপসাব প্রধান বৈয়াকরণ হরচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্র কালীমোহন বিদ্যাবাগীশ এই গ্রামে বাস করিতেছেন। এই বাড়িতে কালীদেবী সংস্থাপিত আছেন।

শ্রীনগরের নাম ফতেজঙ্গপুর হইলেও, উহার একাংশ নগর নামে পরিচিত আছে। জপসা নদীগর্ভস্থ হইলে, এই গ্রামবাসী ঢাকার জজকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত এই স্থানে গৃহ সংস্থাপন করেন। জপসার অনেক বৈদ্য ও প্রাচীন জমিদারবংশীয়গণ অধুনা এই স্থানে বাস করিতেছেন। ব্যাঘ্রের নিবসতি স্থান এখন জনপদে পরিণত হইয়াছে।

জ্যোতির্বিদগণের বাড়িতে প্রাচীন অট্টালিকা ও মন্দির আছে। কয়েকটি প্রাচীন ভগ্ন প্রস্তরনির্মিত বিগ্রহ ফতেজঙ্গপুরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। জপসার লালাবাবুদের প্রস্তরনির্মিত বিগ্রহগুলিও প্রসিদ্ধ। শিবলিঙ্গ এখন নগর গ্রামেই পরিদৃষ্ট হয়।

সিরঙ্গল, কানুরগাঁ

বারোভুঁইয়ার দল শক্তিহীন হইবার পর প্রত্যেক বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সেনাবাস সংস্থাপিত হয়। পূর্বে শ্রীনগরে কতিপয় সৈনিক মাত্র অবস্থান করিত। বাদসাহ সবকার হইতে অতঃপব ঐ স্থান হইতে উঠাইয়া তন্নিকটবর্তী কানুরগাঁতে সৈন্যাবাসের জন্য এক কেল্লা সংস্থাপিত করা হয়। বাদসাহ সেলিমের (জাহাঙ্গীরের) নামানুসাবে উহার নাম হয় সেলিমনগর।

উচ্চারণের বৈষম্যতার সহিত উহা সম্প্রতি সিরঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। সিরঙ্গলের মধ্যবর্তী বাগবাড়ি নামক স্থানে প্রকৃত কেল্লা ছিল।[৬]

সিরঙ্গল গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ ও অপরাপর হিন্দু ও মুসলমানের বাস ছিল। এই গ্রামের চক্রবর্তী ও ঘটকগণ বিশেষ সম্পন্ন লোক ছিলেন। জপসা ও কানুরগাঁ নদী সীকস্ত হইবার পরে ঐ স্থানের বহুলোক এই গ্রামে বাস করিতেছে। অথচ সিরঙ্গলের কতকাংশ নদীগর্ভস্থ হওয়ায় তত্রত্য কতক লোক অন্য গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। জপসা ও কানুরগাঁর বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ, জপসার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও জপসার বিল্বপুষ্করিণী ভট্টাচার্য বংশের কেহ কেহ ও জপসার শূদ্র ও অন্য সম্প্রদায়ের অনেকেই অধুনা এই স্থানে বাস করিতেছেন।

শাণ্ডিল্য শ্রীকৃষ্ণ বেদভূষণের প্রপৌত্র প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ দুর্গারাম একজন সাধু প্রকৃতি লোক ছিলেন। তাহার বিশুদ্ধ চরিত্র, পাণ্ডিত্য ও দেবভাব দেখিয়া তাহার পৈত্রিক শিষ্যমণ্ডলী সকলেই তাহার অনুরক্ত হইয়া পড়েন। পিতৃব্যগণ একদিন কৌশল করিয়া জানাইলেন যে, দুর্গারাম পৈত্রিক শিষ্যরক্ষাব্যবসায় গ্রহণ না করিলে তাহাকে পৈত্রিক বিষয়ের ভাগ দেওয়া হইবে না। দুর্গারাম অসঙ্কুচিতচিত্তে পৈত্রিক শিষ্যসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় জননীসহ কাশীবাসী হইবার ইচ্ছায় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন। পথে কানুরগাঁয়ের কৃষ্ণাত্রেয় ন্যায়বাগীশের গৃহে মায়ে পোয়ে অতিথি হইলেন। ন্যায়বাগীশের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাহার একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া দুর্গারাম এইখানেই বাস করিলেন। এই কানুরগাঁয়ে বাসনিবন্ধন তাহার বংশধরগণ "কানুরগাঁয়ের বশিষ্ঠ" নামে খ্যাত। এই বংশে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কানুরগাঁয়ের বৈদিক সম্প্রদায় মধ্যে পদ্ম চক্রবর্তী, ভৈরবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, আনন্দচন্দ্র সার্বভৌম, দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ, হরিদাস বিদ্যারত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

কানুরগাঁতে রাঢ়ীশ্রেণীর কুশারী এবং বটব্যাল শ্রোত্রিয় ও কয়েকঘর কুলীনবংশজ বাস করিতেন।

বারেন্দ্র শ্রেণির রায়পরিবার কানুরগাঁর অন্তর্গত বক্‌সীবাজার পল্লিতে বাস কবিতেন। গৌরসুন্দর রায় ঢাকার একজন শ্রেষ্ঠ মোক্তার ছিলেন। স্বদেশের অনেক জমাজমি ক্রয় করিয়া তালুকদার বলিয়া গণনীয় হন। তাহার বাড়িতে একটি উচ্চ মৃত্তিকানির্মিত দোলমঞ্চ ছিল। দোলোৎসবের সময়ে সমারোহ হইত। এই মহানুভবের জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দচন্দ্র রায় বহুকাল যাবৎ আগরাতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি একজন সুকবিও বটে—

"নির্মল সলিলে বহিছে সদা, তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও।"
"কত কাল পবে বল ভারত রে, দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে।"

প্রভৃতি সঙ্গীত রচয়িতা এই গোবিন্দচন্দ্র রায়। বহুকাল বিগত হয় এই গানটি রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু গোবিন্দের সেই বাঁশরীর সুতান আজিও লেখকের কর্ণে প্রবেশলাভ করিয়া তাহাকে যেন অতীতের সেই স্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিতেছে। গোবিন্দচন্দ্রেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা বঙ্গবিখ্যাত ঢাকা জজকোর্টের উকিল আনন্দচন্দ্র রায়। এই মহাত্মা ওকালতি ব্যবসায়ে কিরূপ তীক্ষ্মমনীষা সম্পন্ন তাহা কাহারও অবিদিত নাই ; কিন্তু সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় তদীয় ব্যুৎপত্তির বিষয় অনেকেই অনবগত। যাহারা আনন্দচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন, ইংরাজি, সংস্কৃত ও বাংলা এই ভাষাত্রয়ে তাহার অগাধ পাণ্ডিত্যলাভ হইয়াছে। এই বয়োবৃদ্ধ স্বদেশের পরিবারবিশেষের অবস্থা যেরূপ পরিজ্ঞাত, আজকালকার দিনে তদনুরূপ অনুসন্ধান লওয়া প্রায় কেহই প্রয়োজন মনে করেন না। এই মহাত্মা লেজিসলেটিব কাউন্সেলের মেম্বর পদে

নিযুক্ত হইয়া বর্তমান সময়ে উহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা মাননীয় আনন্দচন্দ্র রায়ের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি। কিন্তু আমাদের নিতান্ত ক্ষোভের কথা এই যে. এই উন্নত রায়পরিবার দক্ষিণ বিক্রমপুরের সহিত সমুদয় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া সম্প্রতি ঢাকাতেই স্থায়ী বাসস্থান করিয়াছেন।

এই বক্সীবাজারের কুণ্ডুগণ একসময়ে দক্ষিণ বিক্রমপুর মধ্যে প্রধান ধনী বলিয়া গণনীয় ছিলেন। তিলিবংশ মধ্যে তাহাদের মত সৌভাগ্যশালী এই দেশে আর কেহই ছিল না। মৃজাপুরে ইহাদের বিস্তৃত কারবার ছিল।

লোনসিংহঁ

এই স্থানে অনেক ব্রাহ্মণ বাস করেন। কয়েক ঘর কায়স্থের মধ্যে দাসবংশীয় ভূম্যধিকারিগণ সুপ্রসিদ্ধ। এই বংশের বহুলোক ডেপুটি কালেক্টারের কার্য করায় তাহাদের বাড়ি ডেপুটিবাড়ি নামে বিখ্যাত। ইহাদের পূর্ব নিবাস কার্তিকপুরের অন্তর্গত সিংহলমুড়ি গ্রামে ছিল। তৎপুরে বুন্নাগ্রামে বাসস্থাপন করেন। এই গ্রাম নদীকর্তৃক ভগ্ন হওয়ায় লোনসিংহ গ্রামে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া তথায় আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন।

এই দাশবংশের আদিপুরুষ রামকেশব ঢাকার নবাববাড়ির উকিল ছিলেন। তাহার দুই পুত্র, গঙ্গাহরি ও কালীশঙ্কর। গঙ্গাহরি ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ ধনী জমিদার জীবনবাবুর বাড়ির দেওয়ানি পদে এবং কালীশঙ্কর ঢাকা কালেক্টরির মীরমুন্সীপদে কার্য করিতেন। গঙ্গাহরির পুত্র রামচন্দ্র দাস ও গৌরচন্দ্র দাস। কালীশঙ্করের পুত্র অভয়চন্দ্র দাস ও বঙ্গচন্দ্র দাস।

রামচন্দ্র দাস হইতেই এই বংশের প্রকৃত উন্নতির সূত্রপাত হয়। এই ভাগ্যবান পুরুষ কোন কার্যসূত্রে চট্টগ্রাম অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় সার হেনরি রিকেট সাহেব কর্তৃক ১৮৪১ হইতে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চট্টগ্রামের নূতন বন্দোবস্ত হয়। তৎকালে রামচন্দ্র হেন্‌রি রিকেট কর্তৃক ডেপুটিকালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য পারদর্শিতায় সাহেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। এই সময়ে অনেকগুলি ডেপুটি এই কার্যে নিযুক্ত ছিলেন ; কিন্তু রামচন্দ্র সর্বাপেক্ষা প্রধান ছিলেন বলিয়া সকলে তাহাকে 'আলা ডিপুটি' বলিত। তৎসময়ে নিয়মানুসারে প্রথম শ্রেণির ডেপুটিদের ৬০০ টাকা বেতন ধার্য ছিল। রামচন্দ্র তাহা ত পাইতেনই, তদতিরিক্ত ভাতা বলিয়া আরও একশত টাকা প্রাপ্ত হইতেন। তদীয় চট্টগ্রামের বাসভবনে বহুলোক আহার প্রাপ্ত হইত। তাহার অনুরোধে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৌরচন্দ্রও ডেপুটি কালেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার বেতন ছয় শত টাকা পর্যন্ত হইয়াছিল। ইনি বৃদ্ধবয়সে পেন্সিয়ান গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র চট্টগ্রাম হইতে বদলি হইয়া কৃষ্ণনগর গমন করেন। তথায় এক বৎসর কার্য করার পর তিনি তথায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে তদীয় পুত্র প্রসন্নকুমার দাসের পরিণয় কার্য রাজা বসন্ত রায়ের বংশে সম্পাদিত হয়। প্রফুল্লকুমার চট্টগ্রামের কমিশনর অফিসের হেডক্লার্ক ও সেরেস্তাদার ছিলেন। অল্প বয়সেই তাহার মৃত্যু হয়। রামচন্দ্র ও গৌরচন্দ্র উভয়েই রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন।

অভয়চন্দ্র দাস ঢাকার কমিশনর অফিসের কার্যে নিযুক্ত হইয়া পরে ক্রমে অ্যাসিস্টান্ট কমিশনরের পদ প্রাপ্ত হন। ইনি এই কার্যে ঢাকাতে অনেককাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ঢাকার তৎকালীন যে কোন সৎকার্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল। এই জন্য তাহার মৃত্যুর পর ঢাকা নর্থব্রুক হলে তাহার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অ্যাসিস্টান্ট কমিশনরি হইতে ডেপুটি কালেক্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া কিছুদিন আলিপুরে কার্য করিয়া, প্রথম শ্রেণির পেন্সিয়ান গ্রহণ করেন ও রায় বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত হন। লোনসিংহ গ্রামের স্কুল, রাস্তা, পোস্টাফিস, দাতব্য ডাক্তারখানা ইত্যাদি এই মহাত্মার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। অভয়দাস লোনসিংহের

প্রকৃত উন্নতির মূলপুরুষ ছিলেন। ইহার ছয়টি পুত্র। সকলেই কৃতবিদ্য ও কর্মক্ষম। তন্মধ্যে প্রাণকুমার দাস ও ললিতকুমার দাস ডেপুটি কালেক্টর এবং অক্ষয়কুমার দাস মুন্সেফের কার্য করিতেন। প্রাণকুমার দাসের বিদুষী তনয়া আমোদিনী ঘোষ সুকবি। প্রাণকুমারের পুত্র লালবিহারী দাস বর্তমান সময়ে ডেপুটি কালেক্টরের কার্য করিতেছেন। গৌরচন্দ্র দাসের পাঁচ পুত্র উপযুক্ত, তন্মধ্যে চন্দ্রকুমার দাস ও সূর্যকুমার দাস ডেপুটি কালেক্টরের কার্য করিতেন। যাত্রা ও কবিগান রচয়িতা ও কবিতাকুসুম গ্রন্থ প্রণেতা রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রামের লোক ছিলেন। তিনি সুন্দর যাত্রাব পালা প্রস্তুত করিতে পারিতেন। প্রসন্নকুমারের পুত্র রাজবিহারী দাস একসময়ে ঢাকা প্রকাশ ও সারস্বত পত্রের সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদকের কার্য করিতেন। লোনসিংহ স্কুলের পণ্ডিত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় লোনসিংহ হইতে ১৮৯৬ খ্রিঃ অব্দে অবলাবান্ধব নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন, এই দ্বারকানাথ পরে কাদম্বিনী বসু বি-এর পাণিগ্রহণ করেন। বর্তমান সময়ে এই স্থানে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ও টেলিগ্রাফ অফিস সংস্থাপিত হইয়া, জনসাধারণের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে।

নড়িয়ার ঘটক চৌধুরীগণের গুণানন্দী পরগণা নিলামে ক্রয় করিয়া, ইহারা স্বদেশে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ঘটক করুণাচরণ বিদ্যাসাগর ও দুর্গাচরণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি এই স্থানের প্রসিদ্ধ লোক। এই গ্রামের কৃষ্ণকান্ত শীল চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

বিক্রমপুর মধ্যভাগ সমাজ ধুল্লা, নদীতে ধ্বংস হওয়ায় বৈদিক শুনক কৃষ্ণানন্দ বেদবিদ্যালঙ্কারের কনিষ্ঠ পুত্রের বংশধরগণ, নড়িয়া ও লোনসিংহ গ্রামে বাস করিতেছেন। এই বংশে বহু পণ্ডিতের জন্ম হয়, বৈদিক কার্যে ইহারা সুদক্ষ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ শিরোমণি, গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন, চন্দ্রকান্ত চূড়ামণি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

নরিয়া

এই প্রাচীন গ্রামটি বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ, পূর্বে এই স্থান উত্তর ও দক্ষিণদিকে লম্বিত ছিল, প্রায় ৮০ বৎসর অতীত হইল, কীর্তিনাশা নদীর প্রথম উদ্ভবের সহিত এই স্থানের প্রায় আট ভাগের সাত অংশ নদীগর্ভস্থ হয়। তজ্জন্য এই গ্রাম পূর্ব ও পশ্চিমদিকে লম্বিত হইয়া পড়ে। এই গ্রামের উত্তর সীমাতেই, প্রসিদ্ধ বন্দব আলা ফুলবাড়িয়া বিদ্যমান ছিল, উহার বিলয় সাধনও সেই কালে ঘটিযাছে।

রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজে যে কয়েকটা মেলের পরিচয় আছে, তন্মধ্যে নরিয়া মেলের উৎপত্তি এই গ্রামের নামানুসারেই সংগঠিত হয়। কুল গ্রন্থে লিখিত আছে "গাঙ্গে গঙ্গাধরমেলো নরিয়া নাম বিশ্রুত।" এই গঙ্গাধর গাঙ্গুলিব দুই পুত্র, যদুনাথ পণ্ডিত ও রঘুনাথ বাচস্পতি। উক্ত বাচস্পতির কন্যাকে রাঢবাসী মাধামেলের লোকনাথ মুখোপাধ্যায় বিবাহ করেন, তজ্জন্য এই মেলের পালটি ও প্রকৃতি না থাকায় এই দলস্থগণের ববাবর মেলভঙ্গ করিয়া পরিণয় ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন মেলে কন্যাদান ও শ্রোত্রীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বীয় মর্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বাচস্পতির দৌহিত্রগণ ঘটক ভট্টাচার্য উপাধি গ্রহণ করিয়া এই গ্রামের অধিবাসী হন। বাস্তবিক পক্ষে ইহারা প্রকৃত সাবর্ণ ঘটক বংশ।' কীর্তিনাশার প্রথম আক্রমণের সহিত গ্রামের ক্ষীণতা আরম্ভ হইয়া, পুনরায় ঐ নদী কর্তৃক ক্ষীণতর হইলে, এই ঘটক বংশের ও অন্যান্য অধিবাসিগণের মধ্যে অনেকেই এই স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তথাপি পালং থানার মধ্যে এই স্থানের বর্তমান জনসংখ্যা অধিক। জাহাজঘাটার সহিত ইহার লোক সংখ্যা ৪৬৫১। ইহার মধ্যে পুরুষ ২০৬২ জন, স্ত্রী ২৫৮৯টি, হিন্দুর সংখ্যা ৩২১০, মুসলমানের সংখ্যা ১৪৪১।

রঘুনাথ বাচস্পতির তিন পুত্র, তাহাদের উপাধি ছিল, ঘটক সার্বভৌম, ঘটক শিরোমণি এবং ঘটক চক্রবর্তী। উপাধি ব্যতীত ইহাদের প্রকৃত নাম অবগত হওয়া যায় না। বাচস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদুনাথ পণ্ডিত নরিয়া হইতে উঠিয়া যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইল সবডিভিসনের অধীন ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রামে বাস সংস্থাপন করেন। তদ্বংশধরগণ অদ্যাপিও তথায় বাস করিতেছেন।

এই সার্বভৌমের পুত্র ঘটকরায়, ইহারও প্রকৃত নাম অবগত হওয়া যায় না। ঘটক রায়ের অপর দুই ভ্রাতার নাম আদিত্য ও পুরন্দর। ঘটক রায় বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের সহিত মিলিত হইয়া, মোঘল সেনাপতি মানসিংহের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হন, এই জন্য মানসিংহ সংগ্রামে জয়ী হইয়া ঘটকরায়ের ব্রহ্মত্র বাজেয়াপ্ত করেন। পরে রায়ের পৌত্র ইন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক উহার উদ্ধার সাধন হয়। রায় উপাধি ধারণের সহিত ইহারা ঘটকতা ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন।

দোস্ত ফিরিঙ্গি নামে এক পর্তুগিজ বণিক, নরিয়া গ্রামের একটি হীনবর্ণা রমণীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া, গ্রামের একাংশে বাস করিত। ইন্দ্রনারায়ণ রায়কে এই ব্যক্তি স্নেহের চক্ষে অবলোকন করিতেন। এই ফিরিঙ্গির কোন সন্তান সন্ততি না থাকায়. আপন যাবতীয় সম্পত্তি অন্তিমকালে ইন্দ্রনারায়ণকে প্রদান করেন। এই অর্থ বলে ইন্দ্র, গুণানন্দী পবগণার বন্দোবস্ত গ্রহণ ও পৈত্রিক সম্পত্তি গ্রদবন্দর মধ্যে যে তালুক তাহাদের হস্তভ্রষ্ট হইয়াছিল, উহা উদ্ধারসাধন কবেন।

ইন্দ্রনারায়ণের পুত্রগণের সময়ে দেয় রাজস্ব বন্ধ করায়, নবাবসৈন্য তাহাদিগকে অবরুদ্ধ কবার মানসে, নরিয়াতে উপস্থিত হয়। রায়গণও উহাতে বাধা দিতে অগ্রসর হন, কিছুদিনের মধ্যেই নবাব প্রেরিত লোকেরা জয়ী হইয়া. ঘটক রায়গণের বাড়ি লুণ্ঠন কবে, রায়গণ পলাইয়া অন্যত্র অবস্থান করিতে বাধ্য হন। এতৎসম্বন্ধে একটি গ্রাম্য গীত রচিত হইয়াছিল, উহার সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই. যেটুকু পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছি, তাহাই এই স্থানে সংযোজনা করা হইল।

"তীরে পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রৈয়া
নৈরার ঘটক যুদ্ধ করে কচু বনে রইয়া।
ঘটক পলাইল রে নৈরার সোনার পুরী কারে দিলা রে।
দিন নাই ক্ষণ নাই রাত্রি অন্ধকার,
একুশ দিনে সোনার লঙ্কা হৈল ছারখার
ঘটক পালাইল রে—ইত্যাদি
* * তেতৈলের পাতে,
রঘুঘটক তীর ছারে ডান হাতে বা হাতে
ঘটক পলাইল রে—ইত্যাদি
* * *
লক্ষ্মীকান্ত ঠাকুর লৈয়া ফিরেন বাড়ি বাড়ি
* * *
গোপালেরে বালাখানা করল চুরমার।
ঘটক পালাইল রে নৈরার সোনার পুরী
কারে দিলা রে।"

গুণানন্দী পরগণা যতদিন হস্তগত ছিল, ততদিন পর্যন্ত ইহাদের প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল, এই পরগণা ঢাকা, ত্রিপুরা এবং ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত, ফরিদপুরের মধ্যে মোট পরগণার

দুই আনা পরিমাণ অংশ হইবে। আত্মকলহ ইহাদের পতনের প্রধান কারণ। নরিয়া পণ্ডিতপ্রধান স্থান। এই গ্রামের যাবতীয় উন্নতি ঘটক চৌধুরী বংশদ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। নানা শ্রেণির কুলীন ব্রাহ্মণ ইহাদের দ্বারাই সংস্থাপিত হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে বহু উন্নত ও শিক্ষিত কুলীন সন্তান বিদ্যমান আছেন। মুন্সেফ শ্রীযুক্ত রেবতীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বি-এল, ও উকিল শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি-এল প্রভৃতি এই গ্রামবাসী। অতীত সময়ে ঘটক বংশে বহু কৃতি লোক জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। শম্ভুচন্দ্র, শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, হরিপ্রসাদ রায়, উকিল রজনীকান্ত রায় ঘটক প্রভৃতি পরবর্তী সময়ের প্রসিদ্ধ লোক। বর্তমান সময়ে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ রায় প্রভৃতি যোগ্য ব্যক্তি বর্তমান আছেন।

কয়েক বৎসর অতীত হইল, বঙ্গের একজন প্রধান মল্ল শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও তদীয় অনুজ শ্রীযুক্ত সূর্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল নরিয়া গ্রামে বাস স্থাপন করিয়াছেন। শ্যামাকান্তকে কে না অবগত আছেন, এই বীরপুরুষ বর্তমান সময়ে সংসারাশ্রম হইতে দূরে অবস্থান করিয়া সোহং স্বামী নাম পরিগ্রহ করিয়াছেন। তদ্‌বিরচিত সোহং গীতা সর্বসাধারণের নিকট আদৃত হইয়াছে।

নরিয়ার যে অংশ সিকস্ত হইয়াছিল, অধুনা উহা আবার পয়স্ত হইয়া লোকের বাসোপযোগী হইয়াছে, এই গ্রামের নিকটেই প্রসিদ্ধ আলা ফুলবাড়িয়া গ্রাম বিদ্যমান ছিল, পরে নদী কর্তৃক ভগ্ন হয়, সম্প্রতি বসাকের চর বলিয়া যে স্থানটির পরিচয় হইয়াছে, অনেকের বিশ্বাস উহাই প্রাচীন আলা ফুলবাড়িয়া। চর নরিয়ার লোক সংখ্যা ৪৬২ ও বসাকের চরের লোক সংখ্যা ১৩৮২। আমাদের বিশ্বাস নবীপুর নামে যে একটি গ্রাম ছিল, যথায় সর্বপ্রথম ত্রিনাথের মেলা বসে, বসাকের চর মধ্যে কতকটা ঐ নবীপুরের পয়স্ত ভূমির অংশ হইতে পারে। নরিয়াতে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল, সম্প্রতি উহার কতকটা অবনতি ঘটিয়াছে। স্থানীয় সিদ্ধেশ্বরীতলা ও গোপালদেব প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া প্রচলিত। নিকটবর্তী স্থানবাসীগণ আজিও মানস করিয়া তাহার পূজার্চ্চনাদি করে। পালা অনুসারে গ্রামবাসীগণ দ্বারা গোপালের অর্চনা হইয়া থাকে।

অনেক ধনী ব্যবসায়ী এই গ্রাম হইতে উঠিয়া পালং স্টেশনের নানাস্থানে যাইয়া গৃহসংস্থাপন করিয়াছেন। নরিয়াতে অনেক লগ্নাচার্যের বাস, তন্মধ্যে হরিঠাকুরের এক যাত্রার দল ছিল, অধুনা তাহার পুত্র চন্দ্রকান্ত এই দল চালাইতেছেন।

ভোজেশ্বর ও মসুরা

ভোজেশ্বরও বহুকাল যাবৎ বিখ্যাত ছিল। এই গ্রামটি বেদগর্ভ সেনের বংশধরগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। তন্মধ্যে যে অংশ জপসার নীলকণ্ঠ সেনের ভাগে পতিত হয়, উহা জপসার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া ছয়পাড়া ও লালারবাগ নামে পরিগণিত হয়। ভোজেশ্বরের অপরাংশ রাজনগরের শ্রীকৃষ্ণ সেনের বংশে বিভক্ত হইয়া যায়। এই জন্য কৃষ্ণজীবন মজুমদারের বংশধর, রাউতপাড়ার মজুমদার ও পশ্চিমপাড়ার সেন সকলেরই এই গ্রামে সম্পত্তি ছিল রাজবল্লভের বংশধরগণ কর্তৃক এই গ্রামে একটি হাট স্থাপিত হয় ; এই হাটে বিস্তর কাপড় ও গামছা বিক্রয় হইত। মসুরার দিঘিটিও রাজবংশের খনিত বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

এই উভয় স্থানে বহু ব্রাহ্মণ ও তিলির বাসস্থান ছিল। এক সময়ে মসুরার তিলিগণ ধনে মানে তাহাদের সমাজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল ; একটি আশ্চর্যের কথা এই যে এ দেশের তিলি মাত্রই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী কিন্তু মসুরার পাল উপাধিধারীগণ শাক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত। ইহাদের বাড়িতে কালী পূজাও দুর্গোৎসব ইত্যাদি সমারোহে সম্পন্ন হইত। অধুনা এই শাক্তগণ মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব মতাবলম্বী হইয়া পড়িতেছে।

অধুনা ভোজেশ্বরের পালগণ এই দেশের এক ঘর প্রধান ধনী ও ভূম্যধিকারী। রামচন্দ্র, রামলোচন, হরিশ্চন্দ্র এই তিন ভ্রাতা নিজ নিজ অধ্যবসায়ে ও কষ্টসহিষ্ণুতার সহিত ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া এই উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বাকরগঞ্জের অন্তর্গত মধিপুর একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন বন্দর ছিল, উহা জপসার লালাবাবুদের অধিকারভুক্ত থাকিলেও মিঃ মনোরো উহার ইজারাদার ছিলেন। মধিপুরবাসী রামকানাই সাহা এই স্থানের প্রধান ব্যবসায়ী ও ধনী মহাজন, পাল ভ্রাতৃগণ তাহার আশ্রয়েতে প্রথম বাণিজ্য কার্য আরম্ভ করেন। উত্তরোত্তর তাহাদের ভাগ্যে লক্ষ্মী বিবর্ধিত হইতে লাগিল এই সময়ে নদী কর্তৃক এই বন্দরটির ধ্বংসসাধন হইলে, সেলিমাবাদ পরগণার জমিদার কলিকাতাবাসী রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর, তদীয় পরগণার সদর কাছারি গুরুধামের নিকটবর্তী ঝালকাঠি নামক স্থানে বন্দরটি আনয়ন করেন। এই সময় হইতে পালগণের পূর্ণ উন্নতির সূত্রপাত হয়। তৎপর কলিকাতাতে তাহারা এক কারবার খুলিয়া, ঝালকাঠির কারবারের সহিত একীভূত করিয়া ধনাগমের উপায় করিয়া লন। পাল ভ্রাতৃদ্বয় অর্থার্জনের সহিত বিবিধ সদ্‌ব্যয়ের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। মহোৎসব ও মহাভারতাদি পুরাণ পাঠ উপলক্ষে বহু টাকা খরচ করিয়াছেন। ইহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের উত্তরাধিকারীগণ শ্রাদ্ধ ব্যাপারে নানাদিক দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া দানসাগরের ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু দেশীয় সাধারণের উপকারজনক এমন কোন কার্য এ পর্যন্ত সংসাধিত হয় নাই, যদ্দারা এই পালগণ স্মরণীয় হইতে পারেন। রাজকুমার পাল, হরলাল পাল এবং হীরালাল পাল প্রভৃতি এই বংশের প্রধান ব্যক্তি। নদীকর্তৃক ইহাদের ভোজেশ্বরের বাড়ি ভগ্ন হইবার পর, ইহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া মসুরাগ্রামে বাস করিতেছেন। কতিপয় বৎসর অতীত হয়, তাহারা নূতন বাড়ির পুষ্করিণী খনন উপলক্ষে, কালো প্রস্তর নির্মিত একখানা বাসুদেব মূর্তি প্রাপ্ত হন, পরে উহা যথানিয়মে সংস্থাপন করিয়া, অর্চনার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রাচীন ভোজেশ্বর হাটের নামানুসারে মসুরাতে একটি বৃহৎ বন্দর পাল চৌধুরীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মধ্যে ভোজেশ্বরেব বৈদিক, মসুরার মুখটিগণ প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন মৌল্লিক উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণ অধুনা পরিচিত।

এই স্থানীয় বৈদিকগণ। প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত, বশিষ্ঠ ও শাণ্ডিল্য। প্রথম বশিষ্ঠবংশের বিবরণ প্রদত্ত হইল। "বশিষ্ঠ-গোত্রীয় তপন তৎপুত্র গোবিন্দ উপাধ্যায়। বৈদিক কুলজ্ঞ ঈশ্বর বৈদিকের মতানুসারে অবগত হওয়া যায়, ১১৬৪ শকাব্দে গোবিন্দ বঙ্গে আগমন করেন। বঙ্গাধীশ্বরের নিকট হইতে তদীয় পৌত্র হলেশ্বব জয়াডী, চন্দ্রেশ্বর বা চন্দ্রশেখর গৌরালী এবং কনিষ্ঠ পৌত্র সিদ্ধেশ্বব অলাধি গ্রাম প্রাপ্ত হন। পদ্মার প্রকাণ্ড স্রোতোবেগে এই তিনটি স্থানই সলিল গত হওয়ার পর চন্দ্রশেখরের সন্তানগণ, ইদিলপুব, কানুরগাও ও ভোজেশ্বরে আসিয়া বাস করিতেছেন। এই বংশের পূর্ব পুরুষগণ সকলেই সুপণ্ডিত ছিলেন। বর্তমানেও অনেক পণ্ডিত এই বশিষ্ঠবংশে বর্তমান আছেন।"

"গৌরালী সমাজ ভঙ্গের পর এই বংশীয় কার্তিক উপাধ্যায়ের অপর পুত্র পরমানন্দ, ভোজেশ্বরবাসী হন। তাহার পৌত্র শ্রীহর্ষ উপাধ্যায় একজন অদ্বিতীয় শাব্দিক হইয়াছিলেন। শ্রীহর্ষের প্রপৌত্র-পুত্র দুর্গাদাস বেদাচার্য একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন। তিনি বিক্রমপুরের জমিদার বর্গের নিকট প্রভূত বিত্ত লাভ করেন এবং বাসস্থানের চতুর্দিকে গড় বেষ্টিত করিয়া লন। দুর্গাদাসের পৌত্র রঘুনাথ বেদান্তবাগীশ একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান ছিলেন, মহারাজ রাজবল্লভ তাহাকে সাক্ষাৎ "বটুক ভৈরব" বলিয়া ভক্তি করিতেন। রঘুনাথের পুত্র গোবিন্দদেব শিরমণি, কৃষ্ণদেব স্মৃতিবত্ন. গোবিন্দর পুত্র ভবানীপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ। ভবানীপ্রসাদের পুত্র নীলকণ্ঠ তর্কপঞ্চানন, রামরত্ন বিদ্যাবাগীশ ও কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার।

নীলকণ্ঠের পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ, বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়ায় দক্ষ ছিলেন। শাব্দিক রামরত্নের পৌত্র সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় তারিণীচরণ শিরোমণি ; পূর্ববঙ্গের পণ্ডিতগণের মধ্যে এই মহাত্মা সর্বপ্রথমবারে গবর্নমেন্ট হইতে এই উপাধি লাভ করেন। রামরত্নের অপর পৌত্র পার্বতীনাথ বিদ্যাভূষণ। গঙ্গাপ্রসাদের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ গুরুচরণ ও কালীকিশোর। গুরুচরণ বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম সানুবাদ শুক্র নীতি প্রকাশ করেন ; তৎপুত্র চন্দ্রকিশোর বিদ্যানিধি, সম্প্রতি কলিকাতা টালাতে বাস করিতেছেন।

শাণ্ডিল্য বৈদিকগণও প্রসিদ্ধ ছিলেন, এই বংশে বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে স্বর্গীয় কালীনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রকিশোর বিদ্যারত্ন একজন প্রধান বৈয়াকরণ ছিলেন। শ্রীযুক্ত কালীশচন্দ্র কৃতিতীর্থ এতদঞ্চলের একজন পুরাণবেত্তা কথক, তাহার বাগ্মিতাও যথেষ্ট রহিয়াছে। এতদঞ্চলের জল আচরণীয় প্রায় সমুদয় হিন্দু এই বশিষ্ঠ ও শাণ্ডিল্য বংশের যজমান।

মসুরার মুখটি বংশের শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মুখটি বি এল মুন্সেফের কার্যে নিযুক্ত আছেন এবং শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মুখটি বাংলা সাহিত্যের বিশেষ চর্চা করিয়া থাকেন।

ভোজেশ্বরের তহবিলদারবংশ প্রসিদ্ধ ছিল ; রাজনগরের রায় গোপালকৃষ্ণের পুত্র দুর্গাপ্রসাদ বাবু ; তাহার আতাভাই এই তহবিলদার উপাধি লাভ করেন। রাজ-পরিবারের অনুগ্রহে তাহার যথেষ্ট ভূসম্পত্তি লাভ হয়, ইহাদিগকে সাধারণে ভুঁইয়া বলিয়া সম্বোধন করিত। বাড়িতে শিব প্রতিষ্ঠা ছিল, জলাশয়ে বাধা ঘাট ছিল, দুর্গাদালান ছিল। বর্তমান ভোজেশ্বরের পালগণের পূর্বপুরুষেরা পর্যন্ত ইহাদিগকে মান্য করিত। কাশীকান্ত তহবিলদারের সময় পর্যন্ত বাড়িতে দশক্রিয়ার ব্যবস্থা ছিল। অধুনা অবস্থার বিপর্যয় ঘটিয়াছে।

ধোপাবংশে রাধানাথ কীর্তনীয়া একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুগায়ক ছিল, তাহার যাত্রার দল স্বদেশে বিশেষভাবে আদৃত হইত।

অধুনা ভোজেশ্বর সম্পূর্ণভাবে এবং মসুরার কতকাংশ নদীগর্ভস্থ হওয়ায় ভোজেশ্বরের অধিকাংশ লোক এবং জপসার প্রসিদ্ধ সরকারবংশ এই মসুরা গ্রামে বাস করিতেছেন, অথচ মসুরার পালগণ মধ্যে অনেকে ধানুকা, দেভোগ প্রভৃতি স্থানে চলিয়া গিয়াছে। সরকার মহাশয়গণের পৈত্রিক তালুকের অনেক জমি মসুরা গ্রামে বিদ্যমান রহিয়াছে।

আক্‌শা

ভড্ডা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, ভবানীশঙ্কর ঘোষাল নামে দুই ব্যক্তি, আক্‌শা ও ভড্ডা গ্রামে বাস করিতেন, তাহাদের পৃথকত্ব নিরূপণ জন্য দুইজনকে ঘোষালের পরিবর্তে গ্রামের নামে অবিধা দেওয়া হয়। আক্‌শা বংশ বহুকাল যাবৎ এই গ্রামে বাস করিতেছেন, তাহাদের বিষয়সম্পত্তিও কিঞ্চিৎ রহিয়াছে।

এই বংশের কালীকান্ত চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। ১২২০ সনের আশ্বিন মাসে স্বগ্রামে ইহার জন্ম হয়। পিতা রামচন্দ্র চক্রবর্তী দরিদ্র ছিলেন, পুত্রকে ভালরূপ লেখাপড়ার সুবিধা করিয়া দিতে পারেন নাই। কালীকান্ত স্বচেষ্টায় কিঞ্চিৎ পারস্যভাষা অধ্যয়ন করিয়া, সেটেলমেন্ট আফিসে পাঁচ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। তৎপরে কার্যের সাধুতায়, উপরিতন কর্মচারিগণের মন আকৃষ্ট করিয়া ক্রমে ক্রমে একশত টাকা বেতনে প্রথম শ্রেণির দরগার পদে উন্নীত হন। এবং পরে ডিটেক্‌টিভ বিভাগে নিযুক্ত হইয়া শত শত বদমায়েস গ্রেপ্তার করিয়া, তাহাদিগকে দণ্ডিত করেন। গভর্নমেন্ট পরিতুষ্ট হইয়া তাহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া, দুইশত টাকা পর্যন্ত করিয়া দেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সময় সময় নগত পুরস্কারও প্রাপ্ত হইতেন। ৪১ বৎসর গভর্নমেন্টের অধীনে চাকরি করিয়া ১২৫৮ সনে ৬৫ বৎসর বয়সে পেন্‌সন গ্রহণ

করেন। তৎপরে কাশীবাসী হইয়া ১৩০৫ সনের বৈশাখ মাসে কাশীধামে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

কালীকান্তের পুত্র তরণীকান্ত একজন উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক। নানা মাসিক পত্রিকায় তাহার লিখিত সন্দর্ভ বাহির হইয়া থাকে। কালীকান্তের ভ্রাতুষ্পুত্র মহিম চক্রবর্তী (ইহারা এখন এই উপাধি ধারণ করেন) এক সময়ে আসামের একস্ট্রা অ্যাসিস্টান্ট কমিশনর ছিলেন।

ভোজেশ্বর নদী সিকস্ত হইলে এক ঘর বৈদিক তথা হইতে আসিয়া এই স্থানে বাস করিতেছেন। সপ্তশতী ব্রাহ্মণের পরিচয় এই গ্রামে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন আরও কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই স্থানের অধিবাসী দেখা যায়।

মগর ও চাম্‌টা

মগরে কয়েক ঘর বৈদ্য বাস করেন। তথাকার সেন পরিবার জমিদারি ও গবর্নমেন্টের আফিসে কার্য করিয়া উন্নত হইয়াছেন। এই বংশের জগবন্ধু সেন নানাবিধ কার্য করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরাজকুমার সেন সুশিক্ষিত ও কলিকাতা দাসাশ্রম মেডিকেল হলের স্বত্বাধিকারী। এই বংশের কবিরাজ গুরুপ্রসাদ সেন ও তাহার অনুজ ঢাকার বিখ্যাত ডাক্তার রামপ্রসাদ সেন সাধারণের পরিচিত। রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পুত্র মিঃ অতুলচন্দ্র সেন ব্যারিষ্টারি কার্যে নিযুক্ত আছেন। অত্রত্য কায়ুগুপ্তগণের পূর্বনিবাস ছিল—জপসা গ্রাম। এই বংশের হরিপ্রসন্ন গুপ্ত সবরেজিস্টার ছিলেন।

চাম্‌টা ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান। এই গ্রামবাসী ধনী মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। কায়স্থ সোমগণ এই স্থানের প্রাচীন অধিবাসী। চাম্‌টা এখন 'তাম্‌টা' নামে পরিচিত হইতে চলিয়াছে।

বিঝারি

একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই স্থানে বহু ব্রাহ্মণ বাস করেন, তন্মধ্যে ঘোষাল ও বাড়রিগণ তালুকদার ও প্রাচীন অধিবাসী। কায়স্থ করবংশও তালুকদার। ঘোষালগণের আদিম নিবাস ছিল এই গ্রামের নিকটবর্তী কান্দাপাড়া গ্রাম। তথায় ডাকাইতের উৎপাতে তিষ্ঠিতে না পারিয়া তাহারা বিঝারিতে বাসস্থাপন করেন। এই স্থানটি যে প্রাচীন তাহার কোন সন্দেহ নাই, কারণ বর্তমান সময়ে কোনরূপ মৃত্তিকা খনন করিতে, ভূগর্ভ হইতে নানাবিধ প্রস্তর মূর্তি ও ইষ্টক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্বে এই স্থান রাজনগরের জমিদারির অন্তর্গত ছিল। এই জমিদারির কতকাংশ খরিদ করিয়া, ঢাকাবাসী কাদের বক্স দারগা, কাছারি সংস্থাপন করেন, কিন্তু ঘোষালগণের সহিত দরগার কর্মচারিগণের বিবাদ উপস্থিত হইলে, ঘোষালগণ তাহাদিগকে অপমানিত করিয়াছিলেন। এই সূত্রে দারগা লাঠিয়াল প্রেরণ করিয়া ঘোষালবাড়ি লুণ্ঠন করত রামদয়াল ও রামজীবন ঘোষালকে বন্দিভাবে ঢাকা লইয়া যায়। তাহারা কোনমতে পালাইয়া জীবন রক্ষা করেন। শুনা যায় প্রতিবেশী শত্রুর সাহায্যেই কাদেরবক্স এই লুণ্ঠন কার্য করিতে সমর্থ হন। ঘোষাল ও বাওরী এই উভয় বাড়িতেই প্রাচীন ইষ্টকালয় বর্তমান আছে।

করবংশীয়গণ বহুকাল যাবৎ এই গ্রামে বাস করিতেছেন, তাহারাও তালুকদার। হরমোহন কর এই বংশের উন্নত লোক।

কালীগঙ্গার শাখা প্রশাখা দ্বারা অতি পূর্বে এই অঞ্চল পরিব্যাপ্ত ছিল, উহার তীরে এই স্থানে একটি হাট বসে, পরে পয়ঃপ্রণালী বন্ধ হওয়ায় হাট উঠিয়া যায়। ঐ সময় হইতে বহু ব্যবসায়ী ও নিম্নশ্রেণির হিন্দু এই স্থানে অবস্থান করিতেছে। গুণাহারের আন্দী নামে এই স্থানে একটি জলাশয় আছে। আন্দী মাত্রেই পূর্বে ও পশ্চিমে লম্বিত দেখা যায়।

জপসা গ্রাম নদী কর্তৃক বিনষ্ট হইবার পরে তথাকার আধিবাসী বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই গ্রামে বাস সংস্থাপন করেন। তন্মধ্যে হরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রমোহন ও আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সময়ে এই স্থানটির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। হাট, গ্রাম্য রাস্তা ও কালীদেবী প্রতিষ্ঠিত হইয়া গ্রামের সৌষ্ঠব সংসাধিত হইয়াছে। একটি উচ্চ ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়া গ্রামের ঔজ্জ্বল্য বর্ধিত করিয়াছিল ; ঐ স্কুলটি উপসি গ্রামে উঠিয়া গেলেও বিঝারি স্কুল নামেই পরিচিত আছে। শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষাল স্কুলের সেক্রেটারি। ভূতপূর্ব পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সকল উন্নতির মূল ছিলেন।

এই গ্রামে পূর্ববঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ কথক ও সঙ্গীত রচয়িতা কৃষ্ণকান্ত পাঠক মহোদয় জন্মগ্রহণ করেন। তদ্বিরচিত অনেক ভাবোদ্দীপক গান আজিও হিন্দু ও ব্রাহ্ম এই উভয় সমাজেই শ্রুত হওয়া যায়। দক্ষিণ বিক্রমপুর সাহিত্য সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন এই গ্রামে হইয়াছে। সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় উৎসাহী যুবক, এই কার্যের একজন প্রধান উদ্যোক্তা। বিঝারিতে বহু সঙ্গীত রচয়িতার পবিচয় পাওয়া যায়। গান বাজনার আলোচনাও যথেষ্ট ছিল। চন্দ্রকুমার ঘটক একজন গ্রন্থকার, তদ্‌বিরচিত অষ্টবজ্র মিলন ও দিগম্বরী গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই গ্রামের ডেঙ্গর ডাক্তার ক্ষতচিকিৎসার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। জপসাবাসী প্রধান শিল্পী প্রসন্ন মণ্ডল অধুনা এই গ্রামে বাস করিতেছে।

ভড্ডা

এই গ্রামের ঘোষাল পরিবার প্রাচীন তালুকদার, তাহাদের নামের শেষে গ্রামের নামানুসাবে ভড্ডা শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডুমুরিয়া হইতে ঘনশ্যাম ঘোষালের পিতামহ এই স্থানে বাস পরিবর্তন কবেন। তাহার পৌত্রের নাম ভবানীশঙ্কর ঘোষাল। আক্‌শা গ্রামে এই নামে আব একজন লোক বাস করিতেন। কর আদায়ের শৈথিল্য হইলে নবাব-সবকারি কর্মচারি একের পরিবর্তে অন্যকেও ধৃত করিয়া লইয়া যাইতেন। তাহারা এই বিপদবিমুক্ত হইতে চেষ্টা করিলে, নবাব-সরকারি কর্মচারি তাহাদের ঘোষাল পদবীর পরিবর্তে স্ব স্ব গ্রামের নাম যোগ করিয়া, ঘনশ্যাম ভড্ডা ও ঘনশ্যাম আক্‌শা বলিয়া ঠিক করিয়া দেন। অধুনা ইহারা পুনরায় ঘোষাল নামেই পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন ; কিন্তু সরকারি কাগজপত্রে ভড্ডা নামই ব্যবহৃত হয়।

এই স্থানে সোহাগ আন্দী নামে একটি পুরাতন জলাশয় আছে। কতিপয় বৎসর অতীত হয়, উহার ভিতরে একখানি প্রস্তর নির্মিত বাসুদেব মূর্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। খোদাই পুকুব নামে আর একটি পুরাতন জলাশয় আছে, উহার মৎস্য যাহার ইচ্ছা হয় সে ধরিয়া লইতে পারে। এই নাম হইতে অনুমান হয, কোন প্রধান মুসলমান এই জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন।

ভড্ডাতে দুইটি প্রাচীন মঠের চিহ্ন বর্তমান আছে। তন্মধ্যে একটি ইষ্টক স্তূপে পরিণত হইয়াছে। তাহার নির্মাণকর্তার নাম অবগত হওয়া যায় না। দ্বিতীয়টি নম-শূদ্র বংশীয় ঠাকুর মণ্ডল তদীয় মাতৃশ্মশানোপরি প্রতিষ্ঠা করে।

ঘোষাল পরিবারে রত্নেশ্বর ভড্ডা ও ভগবান ভড্ডা পরিচিত লোক ছিলেন। বর্তমান সময়ে এই গ্রামস্থ ভূতপূর্ব নির্মাল্য পত্রিকার সম্পাদক রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, দক্ষিণ বিক্রমপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর প্রথম উদ্যোগকারীগণের অন্যতম। রাজেন্দ্রনারায়ণ দ্বারা "স্বপ্ন ও তন্দ্রা" প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর কাব্যপুস্তক রচিত হইয়াছে। বিঝারি গ্রামের স্কুল, হাট ইত্যাদি প্রত্যেক দেশহিতকর কার্যে ভড্ডাবাসিগণ সহায়ক ছিলেন।

দুলুখণ্ড

বর্তমান সময়ে বহু লোকের বাসস্থান। প্রাচীন অধিবাসীর মধ্যে মুখোপাধ্যায় ও চক্রবর্তী বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বহু বৎসর পূর্বে এতদঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎপুত্র রেবতীকান্ত মুখোপাধ্যায় একজন গ্রন্থকার। তৎপ্রণীত 'প্রাঞ্জল কবিতা' ও 'একটি ফুল' নামক পদ্যগ্রন্থ এবং 'অশ্রুবিন্দু' নামে একখানি উপন্যাস আছে। চক্রবর্তী-বংশে কালীচরণ তর্কালঙ্কারের নাম করা যাইতে পারে।

জপসা নদীগর্ভস্থ হওয়ার পর, ঐ স্থানের কতিপয় ধনী ও শূদ্র এই স্থানে বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে পালগণের বড় ও ছোট বাড়ি প্রসিদ্ধ। শূদ্রগণ দুলুখণ্ডের দিঘিরপাড় বাস করিতেছে। এতদঞ্চলে মাত্র এই দিঘির জল ব্যবহারযোগ্য আছে। রাজবল্লভের পুত্র রাজা গঙ্গাদাস, তৎপুত্র কালীশঙ্কর ; তাহার কর্মচারি রামমণি দেওয়ানকর্তৃক সম্ভবত এই জলাশয় খনিত হইয়াছিল। দেওয়ান বাড়ির ভগ্নাবশেষ আজিও বিদ্যমান আছে।

চান্দনী

এই স্থানের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ সমাজে প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণ কুশারী মজুমদাবগণের বাড়িতে প্রাচীন অট্টালিকা বর্তমান আছে। তাহাদের গুরু বেলপুকুরে ভট্টাচার্য বংশের কেহ কেহ বিল্ব পুষ্করিণী পরিত্যাগ করিয়া, এই স্থানে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে তাহারা তথা হইতে বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামবাসী হইয়াছেন।

"বিশ্বম্ভর সুরের তিন কি চারি পুরুষ পরে রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের অভ্যুদয় হয়। তিনি গাভার ঘোষ বংশীয় পরমানন্দ ঘোষের সহিত আপনার এক তনয়ার বিবাহ দেন। ঘোষ সস্ত্রীক স্বালয়ে প্রস্থান করিলে, চন্দ্রদ্বীপ সমাজস্থ অপরাপর সামাজিকেরা তাহার সহিত সমাজ সামাজিকতা করিতে স্বীকৃত হন না। পরমানন্দ অনন্যোপায় হইয়া বণিতাসহ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার ভুলুয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য তৎপ্রতিকার মানসে বদ্ধপরিকর হন। তৎকালে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রাজা রামচন্দ্র, যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের কেদার রায় এবং ভূষণার মুকুন্দ রায়, এই চারি জন দলপতি ছিলেন। ভুলুয়াধিপতি এই চারি জন দলপতির অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়ায়, সকলেই তাহার সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের বাড়িতে কোন এক বিবাহ ব্যাপারে, এই সকল দলপতিরা নিমন্ত্রিত হইয়া, স্ব স্ব দল সহ ভুলুয়াতে আগমন করেন, কিন্তু বিক্রমপুরের সকল সামাজিক তাহাতে যোগদান করেন না। এই জন্য রাজগণের আদেশে এই উদ্ধত সামাজিকগণকে কুলচ্যুত করিয়া, ঘটকগণ তৎক্ষণাৎ একটি শ্লোক রচনা করেন, যথা—

"বেজগ্রামে স্থিতাঃ সর্বে যে চতুর্মণ্ডলে স্থিতাঃ।
চান্দনী চাকুলি যে চ নাস্তি তেষাং কুলং বুধাঃ"।।

এই কারণে বিক্রমপুরস্থ বেজগাঁ, চতুর্মণ্ডল, চান্দনী ও চাকুলিবাসী শ্রেষ্ঠ কায়স্থগণ কুলচ্যুত হন, এমন কি এই সকল স্থানে যদি কোন কুলীন আসিয়া বাসও করেন, তবে তাহারাও কুলচ্যুত হইয়া থাকেন।" (বারভূঞা ৩৬৪ ও ৩৬৫ পৃষ্ঠা)।

চান্দনী গ্রামের কতকাংশ কীর্তিনাশার উদরসাৎ হইয়াছে।

উপসী

মহারাজ রাজবল্লভ, এই স্থানে আর একটি বাড়ি নির্মাণ করিবেন মনে করিয়া, উহার চতুর্দিক পরিখা খনন করাইয়াছিলেন, বিস্তর ইষ্টক ও তথায় নীত হইয়াছিল, কিন্তু কার্যত

তাহা হইয়া উঠে না। বহুদিন পর্যন্ত উহা অরণ্যে পরিণত থাকিয়া ব্যাঘ্র, শূকর প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাসে পরিণত ছিল, পরে রাজনগর ধ্বংসের পর, তথাকার প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের বংশধর স্বর্গীয় হরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য জমিদার ও চন্দ্রশেখর চাকলাদার প্রভৃতি এই স্থানে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাদের সহিত বহু জনগণ এই গ্রামবাসী হয়। পরে দেভোগের দেওয়ানবংশীয় রজনীকান্ত মুখটিও তথায় বাস স্থাপন করেন। এই মুখটি মহাশয় একজন পণ্ডিত লোক। উক্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রযত্নে বিঝারির উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় উপসিতে সংস্থাপিত হইয়া সাধারণের অধিকতর উপকার সংসাধিত হইয়াছে। উপসিতে একটি পোস্টাফিস আছে।

ঘাঘীয়া, কোটাপাড়া

এই স্থানে বহু ভদ্রলোক বাস করিয়া থাকেন। রাজনগরের ব্রাহ্মণ কাশ্যপবংশসম্ভূত, নবকুমার চক্রবর্তী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি এই স্থানে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। কোটাপাড়ার বৈদ্য মজুমদারগণের পূর্ব নিবাস ছিল সোনার দেউল গ্রামে। তথায় এক ঘর প্রসিদ্ধ কায়স্থ মজুমদার বংশও বাস করিতেন। নদী কর্তৃক সোনার দেউল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, বৈদ্য মজুমদারগণ কোটাপাড়াবাসী হন। এই বংশের হরিশ্চন্দ্র মজুমদার, কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার ছিলেন। তাহার প্রথম পুত্র প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক "কৃষি কার্যের মত" নামক একখানা গ্রন্থ প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে বিরচিত হয়। বোধ হয় উহাই বঙ্গদেশের কৃষিসম্বন্ধীয় প্রথম পুস্তক হইবে। দ্বিতীয় পুত্র নবীনচন্দ্র সেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করিতেন। তৃতীয় পুত্র গিরীশচন্দ্র সেন সবরেজিস্টার ছিলেন। এই বংশের কালীকিশোর সেন কবিরাজ ঢাকাতে সুখ্যাতির সহিত ব্যবসায় চালাইতেছেন।

অত্রত্য কায়স্থ ঘোষ পরিবার স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসী ও তালুকদার ; হরেকৃষ্ণ ঘোষ এই বংশের প্রধান লোক ছিলেন। হাইকোর্টের ট্রানস্লেটার মজুমদার শশীভূষণ বসুর মাতামহালয় এই গ্রামে। তিনি তথায় গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু অধুনা স্বদেশ চাঁদশীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

রাজনগরবাসী বহু কাঁসারি—এখন এই স্থানের অধিবাসী হইয়াছে। ব্যবসায় বাণিজ্যে তাহারা অনেকেই উন্নত। তন্মধ্যে নবচন্দ্র ও রঘুনাথের নাম উল্লেখযোগ্য।

কুরাশী, দাসারত

রাজনগরবাসী দেওয়ান রায় মৃত্যুঞ্জয়ের প্রধান কীর্তিনিকেতন। এই স্থানে কয়েকটি প্রাচীন মঠ ও অনেকগুলি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাপিত আছে। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। সেই সমুদয়ই রায় মৃত্যুঞ্জয়ের অর্থ দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেক দেবালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। কিন্তু তাহার কোন অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই। বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রবাদ, দেওয়ান উহাকে কাশী সদৃশ করিবার অভিপ্রায়ে কোটি শিব প্রতিষ্ঠার মনন করিয়াছিলেন। উনকোটি হইল বটে কিন্তু আর একটি আনীত হইলে সেইটি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। কাজেই আর কাশী হইল না, নাম হইল কুরাশী। এই কথার যে কোন মূল্য নাই তাহা আর বলিতে হইবে না। বহুসংখ্যক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এইরূপ প্রবাদ রচিত হইয়াছে। শিবচতুর্দশীতে এই স্থানে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। বহুকাল যাবৎ এই স্থানে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন, তাহারা কুরাশী উপাধি বিশিষ্ট।

রাজনগর নদীকর্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, রায় মৃত্যুঞ্জয়ের বংশধর কালীপ্রসন্ন, তারাপ্রসন্ন ও রাধাবল্লভবাবু প্রভৃতি এই স্থানে বাড়ি নির্মাণ করেন। তৎসহ অনেক বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ,

কুরাশী ও তৎসন্নিহিত স্থানে বাস করিতেছেন। পোড়াগাছা ও জপসার কয়েক ঘর বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ অধুনা এই গ্রামবাসী হইয়াছেন।

দাসারতা গ্রামে একটি বাজার আছে। এই গ্রামবাসী নোয়াখালির উকিল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন প্রসিদ্ধ। তৎপুত্র বসন্তকুমার সেন, বি-এ, বি-এল, একজন সুলেখক। তৎকৃত বৈদ্যজাতির ইতিহাস প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে। ইহাদের পূর্বপুরুষগণ রাজপাশা গ্রামে বাস করিতেন। তাহারা তৎকালীন বিক্রমপুর পরগণার জমিদার বৈদ্য চৌধুরীগণের প্রধান অমাত্য পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই বংশে কয়েকজন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে জগন্নাথ সার্বভৌমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজপাশা নদীকর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, তাহারা পোড়াগাছা গ্রামে, এবং তৎপরে ঐ গ্রামেরও ধ্বংস হইলে দাসারতা আসিয়া বাস করিতেছেন। রাজকুমার সেন মহাশয়ের এক কন্যা কাশীর পণ্ডিতগণ হইতে 'সরস্বতী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা এই বিদুষীর উন্নতি ও কুশল প্রার্থনা করি।

পালং

অধুনা পালং একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানে গবর্নমেন্টের পুলিশ স্টেশন (থানা), রেজেস্টারি আফিস, মুসলমান বিবাহের রেজেস্টরি আফিস, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস প্রভৃতি সংস্থাপিত আছে। একটি উচ্চ ইংরেজি স্কুল এবং দাতব্য চিকিৎসালয় (ডাক্তারখানা) সংস্থাপিত থাকায় উহার গৌরব বর্ধিত হইয়াছে। অতি পূর্বে এই স্থানে কয়েক ঘর চক্রবর্তী ও অধিকারী উপাধি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, নবশায়ক ও নিম্নশ্রেণির হিন্দুর বাস ছিল। অত্রত্য বৈষ্ণবগণের আখড়াতে ঝুলনযাত্রা হইত। এখানে একটি হাট ও পুলিশ আউটপোস্ট (ফাঁড়ি) ছিল। অধুনা বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি এই স্থানের অধিবাসী হইয়াছেন।

রাজনগরের মহারাজ রাজবল্লভের বংশধরগণ ও রাজনগরস্থ তদীয় জ্ঞাতিগণ, ঐ স্থানীয় মুখটি, ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী উপাধিধারী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণগণ এবং লরিকুলের ধনী সাহাগণ এই স্থানে বাসস্থাপন করায় উহার গৌরব সমধিক বর্ধিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও বহু জনতাবৃদ্ধির সহিত স্থানটি একটি ক্ষুদ্র নগরবৎ প্রতীয়মান হয়। গ্রামের মধ্যে কয়েকটি রাস্তার অবস্থাও মন্দ নয়। এতদ্ভিন্ন এই স্থান হইতে একটি বিস্তীর্ণ রথ্যা বরাবর কার্তিকপুর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, অপর একটি প্রশস্ত রাস্তা বুড়িরহাট পর্যন্ত নির্মিত হইয়াছে। এই দুইটি পথের বিশেষভাবে সংস্কার সাধিত হইলে, পালং স্টেশনের অন্তর্গত বহু স্থানে গমনাগমন পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবার কথা।

এই গ্রামের শ্রীমতী আশালতা দেবী (সেন) সুশিক্ষিতা ও সুকবি।

বাবু রাধাবল্লভ সেন পালং বন্দরের মালিক। গ্রামের তলবাহী খাল বিস্তীর্ণ আকার ধারণ করিয়া উহার অনেকাংশ গ্রাস করিয়াছে, এই জন্য এই সুন্দর বন্দরটির অবস্থা শোচনীয় হইতে চলিয়াছে। এই স্থানে বিস্তর কাঁসারির কারবার। রাধাগোবিন্দ বণিক এই বন্দরের প্রধান ব্যবসায়ী। লরিকুলের ধ্বংস সাধিত হইলে, এই স্থানের প্রধান ধনী প্যারীমোহন সাহা এই স্থানে বাস করিতেছিলেন, জলাবর্তে তাহার বাড়ি পুনরায় নদীগর্ভে নিপতিত হইয়াছে।

অত্রত্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের অনেকের নাম ও বিবরণ রাজনগর প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইল। অতএব এখন উহা হইতে ক্ষান্ত থাকা হইল।

বিলাস খাল

এই স্থানে অনেক বারেন্দ্রশ্রেণির ব্রাহ্মণ বাস করেন। সান্ন্যাল ও রায়বংশ প্রসিদ্ধ। তাহাদের সংস্থাপিত কালীদেবীর মন্দিরে পূজা দিবার জন্য নানাস্থান হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়া

থাকে। এই স্থানের নবকিশোর শীল চিকিৎসাব্যবসায়ে বিখ্যাত ছিলেন। অত্রত্য এই শীলবংশীয়গণ চিকিৎসার জন্য বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আসিয়াছেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে সিদ্ধেশ্বরী কালীর বাড়িতে একটি মেলা বসিয়া থাকে। এই গ্রামের অশ্বিনীকুমার আচার্য (ভূতপূর্ব ইঞ্জিনিয়ার) ও মহিমচন্দ্র রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কাগদি

এই স্থানের চাটাতিবংশ প্রসিদ্ধ। আনন্দমোহন চাটাতি তালুকদার। অতি প্রাচীন একটি ক্ষুদ্র মঠ এই স্থানে দৃষ্ট হয়।

ধানুকা

এই স্থানটি বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। পণ্ডিত ও বিষয়ী বৈদিকবংশ এই গ্রামের প্রধান অধিবাসী। ইহারা প্রসিদ্ধ ময়ূরভট্টের সন্তান বলিয়া পরিচিত। এই ভট্ট সম্বন্ধে বহুবিধ কিংবদন্তী শ্রুত হওয়া যায়।

ময়ূরভট্টের পিতামাতা তীর্থপর্যটনে বহির্গত হইয়া নানাতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া পরে জগন্নাথদেবের সন্দর্শন জন্য পুরীধামে যাইবার জন্য অগ্রসর হন। এই সময়ে রথযাত্রা উপলক্ষে তথায় বহু লোক গমন করিতেছিলেন। এই ব্রাহ্মণ দম্পতি তাহাদের সঙ্গী হন। ব্রাহ্মণী পথিমধ্যে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এই সময়ে তিনি এত দুর্বল যে তাহার গাত্রোত্থানের শক্তি পর্যন্ত ছিল না। অথচ সঙ্গিগণ দস্যুর উপদ্রবের ভয়ে সেই রাত্রিতেই ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। তখন ব্রাহ্মণ মহাবিপদে পতিত হইয়া, এই আসন্ন বিপদ হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইবেন তাহা ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণীকে লইয়া যাওয়াই সঙ্কট, তদুপরি শিশুর ভার কিরূপে বহন করিবেন। অনেক চিন্তার পরে স্ত্রীকে বহন করিয়া কোনরূপে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। সদ্যোজাত সন্তানটির প্রতি আর চাহিয়া দেখিবার অবসরও পাইলেন না। উভয়ে মনোদুঃখে কোনরূপে পুরীতে উপনীত হইলেন। সেই দিবস রাত্রিতে ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদিষ্টে দেখিতে পাইলেন যে, একজন ব্রাহ্মণ তর্জন করিয়া বলিতেছেন, রে পাপিষ্ঠ তুই এখনই আমার পুরী হইতে বহির্গত হইয়া যা, অন্যথা তোর ভাগ্যে কখনই পুরুষোত্তম সন্দর্শন ঘটিবে না। যদি তুই সেই পরিত্যক্ত শিশুটিকে পুনরায় লইয়া আসিতে পারিস তবেই তোর আশা পূর্ণ হইতে পারিবে।

অন্য কাহাকেও কিছু না বলিযা সেই ব্রাহ্মণ অতি প্রত্যুষেই সন্তানের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন, কয়েক দিন পরে তথায় উপনীত হইবামাত্র একটি ময়ূর সেই স্থান হইতে উড়িয়া প্রস্থান করিল। তিনি দেখিতে পাইলেন, শিশুটি তখনও জীবিত রহিয়াছে। তখন ভগবানের নাম স্মরণপূর্বক তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত হইয়া গেলেন। পরে পুনরায় পুরীধামে আগমনপূর্বক সেই পুত্রটিকে স্বীয় বনিতার করে সমর্পণ করিলেন। মাতা হারানিধি পুত্রকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া যে কত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, উহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ময়ুর কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া, এই শিশুর নাম রাখা হয় "ময়ুর"। পিতৃসহায়ে ময়ুর কালে কৃতবিদ্য হইয়া ময়ূরভট্ট নামে বিখ্যাত হন।

ময়ুরভট্টের যশে আকৃষ্ট হইয়া অনেক বিদ্যার্থী তাহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন। প্রবাদ ময়ূর স্বীয় তনয়ার রূপবর্ণনা উপলক্ষে তাহার সর্বাঙ্গের যথাযথ বর্ণনা করায়, কন্যা কর্তৃক অভিশপ্ত হন। তন্নিবন্ধন তদীয় অঙ্গে কুষ্ঠের সঞ্চার হয়। বার্ধক্য দশায় উপনীত হইলে, তদীয় কতিপয় ছাত্র তাহাকে বাসস্থান কনোজ হইতে কাশীধামে লইয়া যান। এই সময়ে তদীয় "সূর্যশতক" বিরচিত হয় ও তিনি দিবাকরের অনুগ্রহে রোগ হইতে বিমুক্ত হন।

প্রবাদ এই ময়ূরের বংশোদ্ভব লক্ষ্মণ মিশ্র বঙ্গে আগমন করিয়া ধানুকা গ্রামে বাসস্থাপন করেন। এই কথা কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কেহ কেহ বলেন শ্রীহট্ট জেলার কোন ভট্ট ধানুকায় আগমন করিয়া এই বৈদিকবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভট্ট হইতেই ময়ূর ভট্টের কল্পনা করা হইয়াছে। বাস্তবিক যাহাই হউক এই কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় বৈদিকগণ যে স্বসমাজে বিশেষ সম্মান অর্জন করিয়াছেন তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। ধানুকা, জপসা ও কানুরগার কৃষ্ণাত্রেয়গণ একই বংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। এই বংশে বহু পণ্ডিতের উদ্ভবই এই সম্মানের প্রকৃত কারণ।

এই বংশের বলরাম বাচস্পতি ১৬৭৫ শকাব্দে ছয়টি মন্দির স্থাপিত করিয়া একটি মণিময় গৃহে পার্বতীসহ শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। মন্দিবে নিবদ্ধ শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"শাকে পঞ্চসমুদ্রষট্‌করজনীনাথে ধরিত্রীতলে
দুর্গাপাদবলাভিরামবলরামোঽহং ভবান্যাত্মজঃ।
কৃত্বা ষট্‌সুরমন্দিরং মণিগৃহে শ্রীপার্বতীসঙ্গতং
শ্রীকাশীশ্বরমর্পাযামি নিতরাং তাতস্য নিঃশ্রেয়সে।।"

অপর মন্দিরের গাত্রে আর একটি শ্লোক পাওয়া যায়। যথা—

"আজন্মসঞ্চিততপঃফলমেতদেব
যন্মূর্তিমান্ স্মরহরো মম মন্দিরেঽপি।
যাচে বরং তদপি লোকসুখায় দেব
পাদারবিন্দবসতিশ্চিরমত্র ভূয়াৎ।।"

ছয়টি মন্দিরের মধ্যে শ্যামাঠাকুরাণী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মীগোবিন্দ, শিব ও অম্বিকার মন্দির সুদর্শনীয়। শ্যামাঠাকুরাণী প্রত্যক্ষ দেবতা। তৎসম্বন্ধে নানাবিধ কিংবদন্তী শ্রুত হওয়া যায়। একদা কোন প্রবল শত্রুপক্ষ ইহাদের বাড়ি আক্রমণ করিলে, স্বয়ং দেবী খর্পরাঘাতে আততায়ীপক্ষের লোক বিনাশ করেন। নিকটবর্তী বহু লোক এই স্থানে দেবীর অর্চনার জন্য সমাগত হয়।

মালখানগরের বসুবংশের আদিপুরুষ পুষ্করিণী খনন উপলক্ষে এই প্রস্তরময়ী দেবীমূর্তি প্রাপ্ত হইয়া ধানুকার স্বীয় গুরুদেবকে উহা প্রদান করেন। তদবধি উহা ধানুকায় সংস্থাপিত আছেন। এই মূর্তি সংস্থাপনের পর হইতে ভট্টাচার্যগণের নানাবিধ উন্নতির সূত্রপাত হয়।

বসুদেব দত্ত গোপাল ধর তালুক ও স্বকৃত হোগলার চর তালুক হইতে তাহাদের বহু আয় হইত। নানাকারণে উহা কমিয়া গিয়াছে। এই মহান-বংশে বহু সুপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে চন্দ্রমণি ন্যায়পঞ্চাননের নামই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। বঙ্গদেশীয় তৎকালীন ন্যায়ের পণ্ডিতগণের মধ্যে এই ন্যায়পঞ্চানন সর্বাপেক্ষা প্রধান ছিলেন। তদীয় বংশধরগণ বহুকাল পর্যন্ত নবদ্বীপের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। মহারাজ রণজিৎ সিংহ এই পণ্ডিতবরকে স্বীয় সভাপণ্ডিত রূপে স্বদেশে লইয়া যান। তৎকালে ইনি কাশীবাসী হইয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। পরে পুনরায় কাশীতে আগমন করেন, এবং তথায় তাহার স্বর্গ লাভ হয়। এই বংশের একটি ললনা-রত্ন বিদ্যা ও খ্যাতিতে বঙ্গীয় পণ্ডিতগণকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। তাহার নাম ছিল জয়ন্তী দেবী। যথাস্থানে এই বিদুষীর পরিচয় প্রদান করা যাইবে।

আমতলী

আমতলীর শাণ্ডিল্যবংশে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুনাথ চক্রবর্তীর জন্ম হয়। তিনি অমরকোষের

একখানি টিকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার পিতা গৌরীকান্ত মাতামহের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া সামন্তসারবাসী হন। এই স্থান নদী কর্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে আমতলী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই বংশে বহুপণ্ডিত জন্মিয়া গিয়াছেন। বর্তমান সময় এই স্থানবাসী শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র তর্কপঞ্চানন একজন প্রধান স্মার্ত পণ্ডিত।

তুলাসার

কোটালিপাড়ানিবাসী গোষ্ঠীপতি হরিহর চক্রবর্তীর বংশে রামনাথের জন্ম হয়। তৎপৌত্র রামকেশব পণ্ডিত ছিলেন। শুনক কাশীনাথের কন্যা যশোদার সহিত তাহার বিবাহ হয়। এই সাধ্বী সহগামিনী হইয়াছিলেন। প্রবাদ তদীয় ভগিনীগণও অনুমৃতা হইয়াছিলেন। রামকেশবের যশোদার গর্ভজাত পুত্র কালীকান্ত ও কাশীশচন্দ্র তর্কালঙ্কার মাতামহের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া তুলাসার আসিয়া বাস করেন। এই বংশেও বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

তুলাসার পালং-এর সংলগ্ন গ্রাম। নদী কর্তৃক স্টেশন ও রেজেস্টরি অফিস ভগ্ন হওয়ায় উহা উঠিয়া এই স্থানে স্থাপিত হইলেও পালং নামেই অফিসের কার্য চলিতেছে। নরিয়ার কতকাংশ নদী কর্তৃক বিনষ্ট হইলে, তথাকার ধনী গুরুদাস সাহা এই গ্রামে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই নূতন বাড়ি হইতে পালং বাজার পর্যন্ত একটি রাস্তা তাহার নিজ ব্যয়ে নির্মিত করিয়া দিয়াছেন। গুরুদাসের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র শচীনাথ সাহা স্বব্যয়ে পিতার নামে একটি ইংরেজি স্কুল সংস্থাপিত করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা সাধারণের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। এই স্থানের চাটাতিগণও প্রসিদ্ধ। তাহাদের বাড়িতে একটি বৃহৎ সরোবর আছে। তুলাসার নাম হইতে অনুমিত হয়, পূর্বে এই স্থানে কার্পাসের আবাদ ও তুলা প্রস্তুত হইত।

ডোমসার

ভট্টাচার্য বংশ এই গ্রামের আদিম অধিবাসী। তাহাদের বাড়িতে মন্দির ও শিব প্রতিষ্ঠিত ছিল।

দানবীর বিখ্যাত বিশ্বেশ্বর দাশের বাস নিবন্ধন এই গ্রাম প্রসিদ্ধি লাভ করে। বিশ্বেশ্বর বরিশাল জজকোর্টের প্রধান উকিল ছিলেন। বিস্তর অর্থ অর্জন করিয়া উহা নানাবিধ সৎকর্মে ব্যয় করিতে ত্রুটি করেন নাই। তদীয় বরিশালের বাসভবনে শতাধিক লোক নিয়ত আহার প্রাপ্ত হইত। ইহার মধ্যে বহুলোককেই তিনি চিনিতেন না। আহারের সময় যে কেহ পাতা করিয়া বসিয়া যাইত তাহার পাতেই অন্ন পরিবেশিত হইত। কাহারও কোন পরিচয় জিজ্ঞাসার আবশ্যক ছিল না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, দীন জনগণ যে কেহ তাহার নিকট প্রার্থী হইয়াছেন, তিনি যথাসাধ্য তাহাদের অভীষ্ট সাধন করিতে ত্রুটি করেন নাই। কত বিদ্যার্থী যে তদীয় অন্নে প্রতিপালিত হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া অর্থ উপার্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। তিনি গবর্নমেন্টের উকিল ছিলেন। তাহার মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র অভয়নান্দ দাশ এই পদে নিযুক্ত হন। অভয়নানন্দ কিছু ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, এবং তাহার পুত্রগণ সকলেই উপযুক্ত হইয়াছেন। দুঃখের কথা এই যে এইরূপ পরোপকারী মহাত্মা বিশ্বেশ্বরের পুত্রগণ সকলেই অকালে কালকবলিত হওয়ায় তাহার বংশের বিলোপসাধন ঘটিয়াছে। এই বংশীয় গোবিন্দচন্দ্র দাশ কলিকাতা হাইকোর্টের বেঞ্চ ক্লার্ক ছিলেন।

এই গ্রামবাসী কবিরাজ কামিনীকান্ত সেন মহাশয় চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। তদীয় পুত্রগণ সুশিক্ষিত। তন্মধ্যে মধ্যম পুত্রকে সেরপুরের জমিদার গোবিন্দকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট দত্তক প্রদান করেন। এই পুত্রটিই সেরপুরের সুশিক্ষিত জমিদার গোপালদাস চৌধুরী এম. এ।

বর্তমান সময়ে এই গ্রামে সমাগত কুণ্ডু পরিবার ধনে জনে পালং স্টেশন মধ্যে প্রধান ও বিশেষ প্রসিদ্ধ। চট্টগ্রাম, কলিকাতা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি বন্দরে তাহাদের বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যাগার সংস্থাপিত আছে। চট্টগ্রামে ইহাদে. ,বস্তর জমিদারি। এই বংশীয় নিত্যানন্দ কুণ্ডু, গবর্নমেন্ট হইতে রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

এই বংশের মূল পুরুষ কৃষ্ণদাস কুণ্ডু, সনাতন কুণ্ডু ও জগচ্চন্দ্র কুণ্ডু তিন সহোদরে বাণিজ্য দ্বারা বিস্তর অর্থ উপার্জন করেন। নদীকর্তৃক রাজনগরের ধ্বংসের সহিত তাহাদের পৈত্রিক বাড়ি বিনষ্ট হইলে, তাহারা এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। ভাগ্যকুলের ধনকুবের গুরুপ্রসাদ ও প্রেমচাঁদ কুণ্ডুর ভাগিনেয় এই তিন মহাজন, মাতুল পরিবার হইতেই উন্নতির সূত্র প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কৃষ্ণদাস ও সনাতনের পুত্র নিত্যানন্দ রায় উন্নতির কারণ; লবণের ব্যবসায়ে ইহাদের প্রচুর আয় হইয়া থাকে। এই বংশীয় হরেন্দ্র রায় আপন জনক জগচ্চন্দ্র কুণ্ডুর নামে একটি উচ্চ শ্রেণির ইংরেজি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া নিকটবর্তী স্থানীয় বালকদের শিক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই ধনকুবেরগণ কর্তৃক এরূপ কোন কীর্তি বা সাধারণের হিতকর কার্য সম্পাদিত হয় নাই, যদ্দ্বারা তাহারা স্বদেশে স্মরণীয় থাকিতে পারেন। রাসযাত্রা উপলক্ষে এই বাড়িতে বিশেষ সমারোহ হইয়া থাকে। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারেই তাহাদের ঐশ্বর্যের একমাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীমান হরেন্দ্রের সংস্থাপিত স্কুল দ্বারা সর্বসাধারণের বিশেষ উপকার সংসাধিত হইয়া, তাহাকে ও তদীয় জনক স্বর্গীয় জগচ্চন্দ্রকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। বিক্রমপুরের সর্বপ্রথম এম-এ, স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জ্ঞাতিগণ মধ্যে কেহ কেহ এই গ্রামে বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে শ্রীনিবারণচন্দ্র সেন বি.এ. একজন গ্রন্থকার।

কোয়রপুর

এই প্রসিদ্ধ গ্রামটিতে বিস্তর ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ও অপরাপর হিন্দু সম্প্রদায় বাস করিতেছেন। মুসলমানের সংখ্যাও অল্প নয়। সাধারণত বৈদ্য সম্প্রদায়ের জন্য স্থানটি প্রসিদ্ধ। বৈদ্যবংশীয় মাধব সেনের বংশধরগণ গ্রামের প্রাচীন অধিবাসী। ইহাদের পূর্বপুরুষ গোয়ালন্দের অন্তর্গত পাঁচথুপী (পঞ্চস্তূপ) হইতে এই স্থানে আগমন করেন।' ইহাদের মধ্যে মাধবরূপ রায় একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন; প্রবাদ তাহার মন্ত্রবলে কতিপয় ভূত তাহার ভৃত্যত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। দুষ্কর কার্য সমূহও তাহাদের দ্বারা সম্পাদন করিয়া লওয়া হইত। বিশেষত স্থানান্তরে গমনাগমন সময়ে তাহারাই তাহার পালকি বহন করিয়া লইয়া যাইত। একবার আহারান্তে তাহার পরিবারস্থ কোন একটি বালকের শরীর উচ্ছিষ্টযুক্ত হয়; তখন একজন ভূত ভৃত্যকে তাহাকে উচ্ছিষ্টমুক্ত করিয়া আনিবার জন্য অনুমতি করা হয়। ভূতের সহিত কথা ছিল যখন যাহা বলা হইবে তখনই তাহা তাহার সম্পাদন করিতে হইবে। ভূত প্রভুর অনুমতি প্রাপ্তি মাত্র বালককে পুকুরে লইয়া গিয়া তাহার শরীরে ও উদর মধ্যে যতটা দ্রব্য পাইল তাহা সমুদয় অপহৃত করিয়া লইয়া আসিল। বলাবাহুল্য যে বালকের উদর বিদীর্ণ করিয়া পাকস্থলী পরিষ্কার করায়, বালকের পঞ্চত্ব পাইতে অধিক বিলম্ব ঘটিল না। এইরূপ অবস্থায় শিশুটিকে ঘরের চালের উপর রৌদ্রে রাখিয়া দেয়। কিছুকাল পরে বালকের অনুসন্ধান হইতেই সেই ভূত ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করা হইল 'বালক কোথায়?' ভূত ঘরের চাল দেখাইয়া দিল। এই দৃশ্যে বাড়িতে শোকের প্রবাহ প্রবাহিত হইল। মাধব রায় ভূতকে তর্জন গর্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সে কেন এ দুষ্কর্ম করিল। ভূত বলিল "হুকুম মান্য করিবার জন্যই আমি উহার ভিতরের বাহিরের সমুদয় উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া দিয়া শুদ্ধ করিয়া লইয়া আসিয়াছি।" তখন তিনি আর কি করিবেন, বুঝিলেন বাহিরের অন্নের কথা বিশেষ করিয়া না বলায়, তাহারই মূর্খতার

কার্য হইয়াছে। ভূত আর তো তাহার বেতনভোগী চাকর নয়, ছুতোয় নাতায় যতটা অনিষ্ট করিয়া বাহির হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিবে। আরও প্রবাদ এক দিবস নিমন্ত্রণ উপলক্ষে ভূত ভৃত্যগণকে আদেশ করা হয় কিছু মৎস্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইস। উহারা কোন মুসলমান বাড়ির পাক করা মৎস্য উপস্থিত করিল। তখন আবার তাহাদিগকে বলা হয় "কেন রাঁধা মৎস্য আনিলে?" উত্তর হইল "আমরা যাহা সম্মুখে পাইয়াছি তাহাই লইয়া আসিয়াছি, জীয়ন্ত মাছ আনিতে হইবে এরূপ তো আমাদিগকে বলা হয় নাই।" এই সকল ব্যাপার অবলোকনে, সর্বসাধারণে রায় মহাশয়কে ভূত বিদায়ের জন্য ধরিয়া বসিল। রায় মহাশয় বাধ্য হইয়া তাহাই করিলেন। কিন্তু যাইবার কালে তাহাদিগকে কিছু পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন কি না তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই।

রায় পরিবার গ্রামের তালুকদার, তন্মধ্যে রামকান্ত রায়, রাধাকান্ত রায়, ঈশানচন্দ্র রায়, নবকৃষ্ণ রায়, জগচ্চন্দ্র ও উকিল শশীভূষণ রায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। রামকান্তের বাড়িতে কালী এবং রাধাকান্তের বাড়িতে মঠ ও শিব প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাজারটি জগৎচন্দ্র রায়ের ও তদীয় ভ্রাতা শশিভূষণ রায় প্রভৃতির ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

নবকৃষ্ণ রায়ের প্রথম পুত্র দুর্গামোহন রায় আগরতলা মহারাজের পেস্কারি হইতে এই স্টেটের ডেপুটি কালক্টেরের পদে বরিত হন। এবং দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রমোহন রায় বহুকাল পর্যন্ত ঢাকাতে মোক্তারি কার্য করিয়াছেন। কোয়রপুরের সার্কেল স্কুল ও পোস্টাফিস ইহাদের বাড়িতেই সংস্থাপিত ছিল। স্বগ্রামের উন্নতিকল্পে এই ভ্রাতৃদ্বয় যথাসাধ্য অর্থ ব্যয় করিতে ত্রুটি করেন নাই। রামকান্ত রায়ের সময়ে তাহার বাড়ির নাম প্রসিদ্ধ ছিল, তৎপুত্র কালীপ্রসন্ন রায় ; তৎপুত্র অনুকূল রায় বর্তমান পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর। এতদ্ভিন্ন গিরীশচন্দ্র রায়, অনুকূল রায় বি,এ, অনুকুল রায় এল, এম, এস প্রভৃতি এই রায় বংশের খ্যাতলোক।

এই সেন পরিবারের শাখায় রামকুমার সেন আগরতলার রাজপরিবারের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। ভারত ভ্রমণ, চাঁদের বিয়ে, হেমপ্রভা প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা প্রসিদ্ধ সুলেখক বরদাকান্ত সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। কয়েক মাস অতীত হইল পণ্ডিত বরদাকান্ত লোকান্তরিত হইয়া বাংলার একজন প্রধান লেখকের স্থান শূন্য করিয়াছেন।

সোমকোট অতি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল ; কীর্তিনাশার প্রথম উদ্ভবকালে, এই স্থান, নদীকর্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায়, তত্রত্য অধিবাসীগণ নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সোমকোটের নিমদাশ বংশে অনেক বিদ্বান ও রাজকর্মচারি জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।

তন্মধ্যে ভুঁইয়া, সরকার, লালা মৌস্তফী প্রভৃতি উপাধিধারী নবাব সরকারি কর্মচারিগণ প্রসিদ্ধ ছিলেন। সোমকোট বিলয়ের পরে সরকার এবং লালা মৌস্তফীর বংশধর ও অপরদাশ মহোদয়গণ গোবিন্দ মঙ্গল গ্রামে, পরে ঐ গ্রাম নদী সিকস্ত হওয়ায় কোয়রপুর গ্রামে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। তৎসহ ইহাদের গুরু পুরোহিতগণও এই গ্রামে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। সরকারগণ বিক্রমপুরান্তর্গত তপ্পে রামকৃষ্ণপুরের ভূম্যধিকারী ছিলেন। এই বংশের তারানাথ দাশ বহুদিন ঢাকা জজকোর্টের নাজিরি কার্য করেন। হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল বৈকুণ্ঠনাথ দাশ, এম-এ, বি-এল, সরকার বংশের উজ্জ্বল রত্ন। মহিমচন্দ্র দাশ এই বংশের একজন সামাজিক ও সাহসিক পুরুষ ছিলেন। এতদ্ভিন্ন নিমদাস বংশে মদনমোহন দাস মোক্তার ও ডেপুটি কালেক্টর গিরীশচন্দ্র দাশ রায় বাহাদুর কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নিম দাশবংশীয় প্রসিদ্ধ রামরাজা দাশ কবিরাজ এইরূপ সুচিকিৎসক ছিলেন যে, দূরদেশ হইতে বহু ধনী তদীয় আলয়ে সমাগত হইয়া তদ্দ্বারা চিকিৎসা করাইতে বাধ্য হইয়াছেন। স্বদেশে তাহার বিস্তর পসার ছিল।

রাজপাশা গ্রাম নদী দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, তত্রত্য রাম বংশোদ্ভব চৌধুরী মহাশয়গণ এই স্থানে গৃহ সংস্থাপন করেন, তন্মধ্যে গৌরকিশোর চৌধুরীর ও বর্তমান সময়ে এই বংশের ব্রজেন্দ্রকুমার সেন, এম-এ, মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

কোয়রপুর নিবাসী ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক রতনমণি গুপ্ত মহাশয় গবর্নমেন্টের নিকট হইতে রায় সাহেব উপাধি প্রাপ্ত হন। স্বগ্রামে জলাশয় খনন করাইয়া ও ঢাকাস্থ রামমোহন লাইব্রেরির ইষ্টকালয় নির্মাণ করিয়া দিয়া এই মহাত্মা সাধারণের স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। এই বংশের পণ্ডিত নবকুমার গুপ্ত মহাশয় বহুদিন পর্যন্ত ঢাকা নবাব স্কুলে পণ্ডিতি কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তৎবিরচিত অনেক পুস্তক স্কুলপাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। তৎপুত্র সুযোগ্য কবিরাজ অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী, তোষিণী নামক মাসিক পত্রিকার এবং অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বিশ্ববার্তা ও শিক্ষা সমাচার এই দুই সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক। এই গ্রামের কবিরাজ রাজকিশোর দাশ কবীন্দ্র একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন।

সরকার বংশ দ্বারা, সেনহাটির হিঙ্গু কৃষ্ণরাম সেন ও লালা মৌস্তফির দ্বারা গণ বংশ এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। গণ বংশীয় উকিল অন্নদাচরণ সেন ও তৎপুত্র মুন্সেফ কালীপ্রসন্ন সেন, বি. এল. প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মধ্যে রাঢ়ী শ্রেণির পাঠক ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ভট্টাচার্যগণ প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই ভট্টাচার্যগণ স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত বৈদ্যগণের গুরু ও পুরোহিত। ভট্টাচার্য বংশের করুণাকান্ত বিদ্যাসাগর ও রামপ্রসাদ শিরোমণি পণ্ডিত ছিলেন। বারেন্দ্র কালীকিশোর চৌধুরী উচ্চ শ্রেণির পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরি কার্য করিতেন, কার্য দক্ষতায় গবর্নমেন্টের নিকট হইতে রায় সাহেব উপাধি প্রাপ্ত হন।

যৎকালে বিক্রমপুরের পশ্চিমাংশ দিয়া পদ্মা নদী প্রবাহিত হইত, তৎসময়ে কোয়রপুরের পশ্চিমদিকের কতকটা পদ্মার গর্ভস্থ হয় ; পরে ঐ নদীর গতি পরিবর্তিত হইয়া কীর্তিনাশার উদ্ভব হইলে, একটি পয়ঃপ্রণালী মাত্র বর্তমান থাকে, উহার পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত চড়া পড়িয়া যায়। এইরূপে বহু বৈদ্য বসতি স্থান সুজন্দল গ্রাম ভগ্ন হইয়া পুনরায় চড়াতে পরিণত হয়। এই সকল স্থান চরকোয়রপুর ও চরসুজন্দল নামে পরিচিত হইয়াছে। আবার কীর্তিনাশা নদী উত্তর দিক হইতে অগ্রসর হইয়া কোয়রপুর গ্রামের কতকাংশ বিনষ্ট করায় বহু লোককেই বাসস্থান পরিবর্তন করিয়া গ্রামের দক্ষিণ দিকে গৃহ সংস্থাপন করিতে হইয়াছে।

চিকন্দী ও সুন্দীপ

চিকন্দী গ্রামে অনেক গোপজাতীয় লোকের বাস। উৎকৃষ্ট দধি ক্ষীরের জন্য উহা চির প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি কতক বৎসর যাবৎ চিকন্দীর মুন্সেফী নামে একটি অফিসের পরিচয় হইয়া আসিতেছে, বাস্তবিক এই অফিসটি চিকন্দীর নিকটবর্তী সুন্দীপ নামক স্থানে সংস্থাপিত, ইহার নিম্নবর্তী খালটি প্রাচীন পদ্মার খাত ; অধুনা খালে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব অধিবাসীরা অধিকাংশ মোসলমান।

প্রায় ৪০ বৎসর অতীত হইল ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে মুকসুদপুরের মুন্সেফী আফিস উঠিয়া মুলকৎগঞ্জ থানায় পরিবর্তিত হয়, কিন্তু ঐ সময়ে মুলকৎগঞ্জ [পোড়াগাছা] নদী সিকস্ত হওয়ায় মুন্সেফীর আফিস সম্বন্ধীয় যাবতীয় সরঞ্জাম, কর্মচারি উকিল ও মুন্সেফ বাবু রমেশচন্দ্র লাহিড়ি, জপসাতে সমাগত হন, এই স্থানটিও নদীর সমীপবর্তী বলিয়া, অন্য স্থান নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত উহার কার্য ডোংসার গ্রামের প্রসিদ্ধ উকিল বিশ্বেশ্বর দাস মহাশয়ের বাড়িতে আরম্ভ হয়। তৎপর সুন্দীপ স্থান মনোনীত হওয়ায় তথায় আফিস সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সুন্দীপ বলিতে নোয়াখালির প্রসিদ্ধ সোণ দ্বীপকে লক্ষ্য করে বলিয়া উহার

নাম নিকটবর্তী চিকন্দী গ্রামের নামানুসারে গঠন করা হইয়াছে। স্কুল, পোস্টাফিস প্রভৃতিও চিকন্দী নামে চলিতেছে।

আফিস সংস্থাপিত হইবার পরে, এই স্থানের আকার একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনটি মুন্সেফী আফিস, মুন্সেফগণ ও আমলা উকিলগণের বাস নিবন্ধন তথায় বহু কৃতবিদ্য লোকের সমাগম হইয়াছে; তদ্ধেতু পোস্টাফিস ও একটি উচ্চ ইংরাজি স্কুল এই স্থানে সংস্থাপিত হয়। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যে এই স্থানে একটি পুকুর ও রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। সাধারণের অর্থে একটি কালীবাড়ি ও টিনের ঘর নির্মিত হইয়া তন্মধ্যে দেবী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সুন্দীপ হইতে এক রাস্তা পালং-এর দিকে অপর একটি রাস্তা কোয়রপুর পর্যন্ত গিয়াছে।

মাঐসার, কাঞ্চনপাড়া

দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত এই স্থানটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। বহু ব্রাহ্মণের বাস বিশেষত অত্রত্য সিদ্ধপীঠ দিগম্বরী তলার জন্য এই স্থানের পরিচয় বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে; সুপ্রসিদ্ধ গোসাঞি ভট্টাচার্য এই পীঠে সিদ্ধি লাভ করেন, তদীয় বিবরণ এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গঙ্গাচরণ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের জন্মস্থান।

এই স্থানের অবয়বের সহিত নিকটবর্তী স্থান সমূহের অবয়ব ও মৃত্তিকার কতকটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়! এই প্রদেশে বহু দিঘি সরোবর দৃষ্ট হয়, কিন্তু তটের উচ্চতার প্রতি লক্ষ্য করিলে মাঐসারের প্রাচীন দীর্ঘিকার তট যতটা উচ্চ বলিয়া বিবেচিত হয়, অন্যত্র তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই বৃহৎ সরোবরটি পুনরায় খনন করিলে সম্ভবত বহু প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন উহার ভিতর হইতে উদ্ভুত হইতে পারে। অত্রত্য গাঙ্গুলি ও ঘোষাল বংশ প্রসিদ্ধ।

কাঞ্চনপাড়া গ্রামে একটি বাজার আছে, তৎস্থানীয় চক্রবর্তীগণ তালুকদার। ইহার সন্নিকটে নিলগুণ নামক স্থানে একটি প্রাচীন দীর্ঘিকা পরিদৃষ্ট হয়।

ছয়গাঁ

ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান, এত ব্রাহ্মণ দক্ষিণ বিক্রমপুরের আর কোন গ্রামে বাস করেন না। অতি পূর্ব সময়ে লেদাম নদী উহার প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইত। অধুনা উহা একেবারে স্থলে পরিণত হইয়া, কৃষিক্ষেত্র ও জনগণের বাসোপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। মৃত্তিকা খননকালে তথায় প্রাচীন নৌকার কাষ্ঠ ও লোহার শিকল ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই ব্রাহ্মণ সমাগমের পূর্বে, বর খাঁ নামে জনৈক মুসলমান তথায় ক্ষমতাশালী ছিলেন। বর্তমান চৌধুরীগণের ছয় আনির বাড়ি তাহার গৃহ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া জানা যায়। তাহার ছয়টি স্ত্রী ছিল। উহাদের প্রত্যেকের নামে একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়া উহার পাড়ও সেই নামানুসারে গঠন করেন। এই ছয়টি পাড় হইতে গ্রামের নাম হয়ত ছয়গাঁ হইয়াছে। উহার কোন কোন জলাশয়ে কার্তিক অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত সলিল পূর্ণ থাকে। এই সকল দিঘিগুলি পূর্ব পশ্চিমে লম্বিত বলিয়া অনেকে উহাকে মগদের দ্বারা খনিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন। মগেরা পরে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া এই স্থানেই বাস করিয়াছিল। ছয়গাঁতে একটি হাট ছিল; তথায় সুপারির যথেষ্ট কারবার হইত, বাণিজ্য উপলক্ষে মগের তথায় আগমন অসম্ভব নয়, তাহারা মুসলমান ধর্মও গ্রহণ করিতে পারে। "বর খাঁ" সেই দলের লোক বলিয়াই অনুমিত হয়।

তৎপর বসন্ত রায় নামে জনৈক কায়স্থ সিঙ্গাচূড়া গ্রামে প্রাধান্য লাভ করে, ছয় গাঁ প্রভৃতি স্থান তাহারই কর্তৃত্বাধীন হয়, তৎগঠিত রাস্তাটি কাচকির দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কয়েক বৎসর হইল মৃত্তিকা খননকালে প্রাচীর বেষ্টিত আর একটি বাড়ির চিহ্ন তথায় দৃষ্টিগোচর হয়, উহা কাহার দ্বারা নির্মিত তৎসম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেহ কেহ উহা ডাকাতের নিভৃত নিকেতন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক গ্রামটির অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় উহা অতি পুরাতন স্থান।

বর্তমান ঘোষাল চৌধুরীগণের পূর্বপুরুষ রামচন্দ্র আচার্য শূন্য ঘোষগ্রাম হইতে আসিয়া ছয়গাঁতে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। রামচন্দ্র প্রসিদ্ধ গোসাঞি ভট্টাচার্য মহাশয়ের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, সম্ভবত গোঁসাঞির শিষ্য চাঁদ ও কেদার রায়ের অনুগ্রহে এই গ্রামের ভূসম্পত্তি বন্দোবস্ত পাইয়া, তথায় বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে এই গ্রামের কর ছিল ৭৫০ টাকা। পরে রাজবল্লভের পুত্র দেওয়ান রামদাসের অনুগ্রহে উহার ন্যূন হয়।

ছয়গাঁ চিরকাল সংস্কৃত শাস্ত্রালোচনার স্থান। আচার্য চূড়ামণির বংশধর কৃষ্ণদাস সার্বভৌম প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। হরিচরণ বিদ্যালঙ্কার ও বৈয়াকরণ রামহরি চক্রবর্তী প্রভৃতি এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। কয়েকটি টোল বরাবর এই স্থানে সংস্থাপিত ছিল। বর্তমান সময়ে এই গ্রামবাসী বঙ্গচন্দ্র ন্যায়ভূষণ মহাশয় একজন প্রধান নৈয়ায়িক। ইনি প্রাচীন হইলেও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। তৎপুত্র শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ. বি-এল, ওকালতি কার্য করিতেছেন। ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভোলা মহকুমায় একজন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। বহুলোক তাহার বাসা বাটিতে থাকিয়া আহার প্রাপ্ত হইত। বিখ্যাত পাঠক গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ এই গ্রামবাসী ছিলেন। তৎবংশীয় তারাকান্ত পাঠক বর্তমান আছেন। এই গ্রামবাসী শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, বি-এ, দক্ষিণ বিক্রমপুর সাহিত্য সম্মিলনীর একজন প্রধান উদ্যোক্তা; অত্রত্য গাঙ্গুলীবংশও প্রসিদ্ধ, তন্মধ্যে পার্বতীচরণ পুলিশ সবইনস্পেক্টর ছিলেন। স্থানীয় মধুসূদনচক্র পালা ক্রমে ছয়গাঁ বাসীও দেভোগবাসীগণ কর্তৃক অর্চিত হন। জাগ্রত দেবতা বলিয়া দূরবর্তী স্থান হইতে লোক সমাগত হইয়া তাহার অর্চনা করিয়া থাকে। এই স্থানে একটি হাট আছে। বিক্রমপুর মধ্যে এই স্থানে প্রচুর নারিকেল জন্মে বলিয়া সাধারণে ইহাকে নারিকেলি ছয়গাঁও বলিয়া থাকে।

দেভোগ

এই স্থানে বহু ব্রাহ্মণ ও ব্যবসায়ী লোকের অবস্থান। জপসা নদী সিকস্ত হইলে এই স্থানের জমিদার বংশীয় ভূতপূর্ব মহাফেজ দীননাথ রায় এবং বরিশালের প্রধান মোক্তার ভবানীচরণ রায় এই দেভোগ গ্রামে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। পালং হইতে দেভোগ পর্যন্ত যে লোকাল বোর্ডের রাস্তা বুড়িরহাট পর্যন্ত গিয়াছে তাহা এই দেভোগ ভেদ করিয়া যাওয়ায় স্থানটি মনোরম বলিয়া বোধ হয়। ভবানীচরণ রায়ের পুত্র এবং তদীয় ভ্রাতা গিরিশিচন্দ্র রায় ও ডাক্তার অম্বিকাচরণ রায় কর্তৃক তাহাদের পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত পাষাণময়ী কালী বর্তমান সময়ে এই স্থানে সংস্থাপিত হইয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

চাঁদ ও কেদার রায়ের জ্ঞাতি রায় উপাধিধারী কেহ কেহ এই গ্রামে বাস করেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

রাস্তা প্রস্তুত উপলক্ষে মৃত্তিকা খনন করিতে, দেভোগ ও বুড়িরহাটের মধ্যবর্তী একটি স্থানে প্রস্তর নির্মিত এক বৃহৎ খণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায়, সম্প্রতি উহা ঢাকা মিউজিয়মের জন্য তথায় প্রেরিত হইয়াছে, প্রত্নতত্ত্ববিদগণ যেন উহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় কোন নূতন কথা অবগত হওয়া যাইতে পারিবে। স্বদেশি কেহই এতৎ সম্বন্ধীয় কোন কথা অবগত

নহে। দেভোগের বা তন্নিকটস্থ অধিবাসীগণের প্রতি লক্ষ্য করিলে বোধ হয় না তাহাদের পূর্ব পুরুষগণ মধ্যে এমন কোন সম্পন্ন লোক ছিলেন যাহা দ্বারা এইরূপ প্রস্তরমূর্তি আনীত হইতে পারে। অবশ্য কোন সম্পন্ন লোক দ্বারা উহা আনীত হইয়াছিল। এই বৃষভ যে একক আসিয়াছিল এমনও অনুমান হয় না ; কারণ প্রভু শিব ব্যতীত ধাতু প্রস্তর নির্মিত একমাত্র বৃষভ কোথাও দৃষ্টি গোচর হয় না। নিশ্চয় শিব বৃষভোপরি আসীন হইয়া আসিয়াছিলেন। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপিত হইতে পারে। ঢাকা মিউজিয়মের কমিটি হইতে এই বিষয়ের অনুসন্ধান হওয়া অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

কাশাভোগ, মধ্যপাড়া

এই স্থানে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও বহু ব্যবসায়ী লোক বাস করিয়া থাকে। জপসার প্রসিদ্ধ রামমোহন ক্রোড়ীর সংস্থাপিত কালী এই স্থানে বর্তমান থাকিয়া আজিও পূজিত হইতেছেন, ক্রোড়ী প্রদত্ত দেবোত্তর ভূমি দ্বারা উহার অর্চনাব সহায়তা চলিতেছে।

কৃষ্ণকান্ত পাঠক মহাশয় সর্বসাধারণের পরিচিত লোক, বিঝন্নর গ্রামে তাহার জন্ম হইলেও কাশাভোগ গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায়ই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। কথকতা ব্যবসায়ে ইনি যেরূপ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন, গান রচনা দ্বারা তাহার ততোধিক যশঃ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পাঠক মহাশয়ের বিরচিত "ওরে মন বসে ভাব কি? তোমার মরণের বিলম্ব আছে কি" এই গানটি হিন্দু ব্রাহ্ম উভয় সম্প্রদায় মধ্যে গীত হইত। প্রবাদ উড়িষ্যায় ডাকাত কালেগুা কামাল, এই সঙ্গীত শুনিয়া ডাকাতি পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করে। "আমার গতি কি হবে, যদি পাতকী বলিয়া ত্যাজিবে তবে" গানটি ভারতের নানাস্থানে নানাভাবে গীত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন "জানি কার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়া গৌর হয়েছে।" এই সঙ্গীতটিও পূর্ববঙ্গের পথে, ঘাটে গীত হইত। তাহার বিরচিত সঙ্গীত একত্র করিলে একখানা বৃহৎ পুস্তক বিবচিত হইতে পারে। কৃষ্ণকান্ত প্রেমিক কবি, অথচ সঙ্গীতের ব্যঙ্গোক্তিতে রসিকতার ভাবও পরিস্ফুট হইয়া পড়িত। "আত্মীয়তা কুটুম্বিতা টাকা, টাকাব জন্য কে না হয় ঠেকা" ইত্যাদি সঙ্গীত উহার উদাহরণ। ১২২৮/২৯ সনে তাহার আনুমানিক জন্ম সন ধরিয়া লইলে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলা যায়। বাস্তবিক তিনি অত্যন্ত প্রাচীন হইয়াছিলেন। পাঠক মহাশয় প্রায়ই কৃষ্ণকমল গোস্বামী বিরচিত "অয়ি রাধে" এই সংস্কৃত গানটি করিতেন। তাহার বহু শিষ্য সেবক ছিল। কাশাভোগের রাজকুমার পাঠকও ভোজেশ্বরবাসী পাঠক কালীশচন্দ্র কৃতিতীর্থ এই মহাত্মার প্রধান ছাত্র।

আঙ্গারিয়া, রায়গঞ্জ

ভেন ডেকব্রুক তদীয় ম্যাপে এই স্থান ওলরি কুলের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। ১৫৪১ খ্রিঃ অব্দে ডিপারোজের যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতেও এই দুইটি স্থান নির্দেশিত আছে। ব্লকম্যানকৃত বঙ্গদেশের ভূগোল ও ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, মেঘনা ও পদ্মার মধ্যবর্তী ঢাকার দক্ষিণাংশে এই দুইটি বন্দরেব সংস্থিতি। বাস্তবিক পক্ষে, এই দুইটি বন্দর যে বহুদিনের তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উহা রাজনগরের রাজাদের হস্তগত হইলে আঙ্গারিয়ার বন্দর রাজগঞ্জের হাট নামে পরিচিত হয়। মূল কথা, বাজাদের পদবী অনুসরণে উহার নাম হয় রাজগঞ্জ। কেহ কেহ বলেন এই বন্দরে প্রচুর কয়লার* আমদানি হইত বলিয়া উহা আঙ্গারিয়া নামে প্রসিদ্ধ ছিল। লৌহ, পিত্তল, স্বর্ণ, তাম্র প্রভৃতি ধাতুকার্যের জন্য এই কয়লার আবশ্যক হইত। এই বৃহৎ হাট যে স্থানে বর্তমান ছিল, উহা নদী কর্তৃক ধ্বংস হওয়ায় নীলকুণ্ডী নামক

স্থানে স্থাপিত হইলেও পূর্ব নামেই পরিচিত আছে। এই স্থানে একঘর কায়স্থ সাধারণের পরিচিত ছিল, কেহ কেহ তাহাকে ভুঁইয়া বলিত। বারেন্দ্র বাক্‌ছীগণ এই স্থানের সর্বপ্রধান প্রসিদ্ধ, তন্মধ্যে হরিশচন্দ্র বাক্‌ছী মহাশয় সুখ্যাতির সহিত আসাম ডিব্রুগড়ে ওকালতি করিতেন, অধুনা তৎপুত্র শ্রীযুত বিপিন বাক্‌ছী তথায় ওকালতি করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন বহু ব্যবসায়ী লোকের বাস নিবন্ধন স্থানটি উন্নত বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

আঙ্গারিয়ার সংলগ্ন পরাশরদির খালের পারে একটি নীলকুঠি ছিল, এই স্থানে অনেক 'বেদে' বাস করিত। কিংবদন্তী, এই খালের দ্বারা বিক্রমপুর ও ইদিলপুরের সীমা নির্দেশিত হইয়াছিল। এই স্থানের নিকটবর্তী দাদপুর, গোবিন্দপুর, খাজুরতলা প্রভৃতি স্থানে অনেক মুসলমান বাস করিয়া থাকে।

পম ও সাজনপুর[১০]

বহু দিবস পর্যন্ত এই দুই স্থান অরণ্যে পরিণত ছিল, দুই তিন ঘর মুসলমান মাত্র বাস করিত। অধুনা উহা জনপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। জপসার রাজ (স্থপতি) বংশ অনেকে যাইয়া তথায় গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। স্থানটি চতুঃসীমান্তর্গত স্থান হইতে উচ্চ।

তেলিপাড়া

সম্ভবত এই স্থানে বহু তেলি বাস করিত বলিয়া উহার নাম হয় তেলিপাড়া। বর্তমান অধিবাসী দৃষ্টে উহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অধুনা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতির সংখ্যাই এই স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অত্রত্য চক্রবর্তীবংশ মধ্যে রমানাথ চক্রবর্তী কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তদ্বিরচিত গান মন্দ ছিল না। তৎকনিষ্ঠ কৈলাস চক্রবর্তী মোক্তার একজন বহুদর্শী কাব্যজ্ঞ ছিলেন। এই চক্রবর্তী ভ্রাতৃদ্বয় উপসীর ভট্টাচার্য সরকারের প্রধান কার্যকারক ও মোক্তার ছিলেন।

জোয়ার বিনোদপুর

বাহেরচর ও দাতরা

পরগণে রাজনগরের অন্তর্গত জোয়ার বিনোদপুর পূর্বে রাজা রাজবল্লভের জমিদারিভুক্ত ছিল। রাজা রাজবল্লভের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র গোপালকৃষ্ণ অন্যান্য জমিদারির সহিত বিনোদপুর জমিদারিরও উত্তরাধিকারী হন। গোপালকৃষ্ণের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে জোয়ার বিনোদপুর জমিদারি হাওলা স্বরূপ তাহার পুত্র পীতাম্বর সেনকে প্রদান করিয়া যান। সেই অবধি হাওলা পীতাম্বর সেন মধ্যগত জোয়ার বিনোদপুর বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে। পীতাম্বর সেনের বংশধরগণের অবস্থার পরিবর্তন হেতু এই সম্পত্তি নিলাম হইয়া যায়।

কালক্রমে জোয়ার বিনোদপুর ঢাকার মোঘলবংশ সম্ভূত মৃর্জা জয়নাল আবদীন ও মৃর্জা জাফর সাহেব ভ্রাতৃদ্বয় কট কবলায় ষোল আনা অংশ ক্রয় করিয়া লন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মৃর্জা জাফরের মৃত্যুর পর তাহার কন্যা আছমতন্নেছা খাতুম অর্ধাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋণ দায়ে এই ৷৷৹ আট আনা অংশের ৵১০ নিলাম হওয়ায় ময়মনসিংহ জেলার রামগোপালপুরের জমিদার কালীকিশোর রায়-চৌধুরী স্বীয় পত্নী হরসুন্দরী দেবী-চৌধুরাণীর নামে ১২৭৬ বঙ্গাব্দে প্রথম ক্রয় করেন। বাকি ৷/১০ গণ্ডা অংশ আছমতন্নেছা খাতুমের পর সরফন্নেছা বেগম, গোলাপচাঁদ বাবু ও মৌলবী আমিরউদ্দিন নিলাম ক্রয় করিয়াছিলেন। সরফন্নেছা বেগম মৃর্জা জয়নাল আবদীনের পুত্রবধূ। তিনি আছমতন্নেছা খাতুমের ৵৹ আনা অংশ ক্রয় করেন।

বাকি ৴১০ গণ্ডা গোলাপচাঁদ বাবু ও মৌলবি আমিরউদ্দিন ক্রয় করিয়াই কালীকিশোর রায়-চৌধুরীর নিকট বিক্রয় করেন। ইহাও হরসুন্দরী দেবী-চৌধুরাণীর নামে ক্রয় করা হইয়াছিল। মৃজা জয়নাল আব্দীনের পুত্রবধূ সরফন্নেছা বেগম জোয়ার বিনোদপুরের ।৷০ আনা অংশ হেবা দানসূত্রে স্বামী মৃজা কুচকের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বিনোদপুরের ।৴০ আনা অংশের অধিকারিণী হইয়াই ৶০ আনা অংশ ১২৭৭ সালে হরসুন্দরী দেবী-চৌধুরাণীর নিকট খাস কবলায় বিক্রয় করেন। হরসুন্দরী দেবী-চৌধুরাণী এক্ষণে ।৷৶০ আনা অংশের অধিকারিণী হইলেন।

সরফন্নেছা বেগমের ৶০ আনা অংশ বাদে ।৶০ আনা অংশ মধ্যে তাহার কন্যা সমসেরন্নেছা ৴৪ গণ্ডা, প্রথম পুত্র ছদাকত মহম্মদ খাঁ ৶৮ গণ্ডা ও দ্বিতীয় পুত্র মৃজা মহম্মদ তকী ৶৮ গণ্ডা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কন্যা সমসেরন্নেছা তাহার অংশ বিক্রয় করাতে কালীকিশোর রায়-চৌধুরী তদীয় পুত্র যোগেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর নামে ১২৮৯ সালে উহা ক্রয় করেন। ছদাকত মহম্মদ খাঁর অংশ তাহার স্ত্রী জিবনন্নেছা বেগম প্রাপ্ত হন। মৃজা মহম্মদ তকীর অংশ সাহাজাদা বেগম ক্রয় করেন। অল্পকাল পরেই সাহাজাদা বেগমের মৃত্যু হইলে তাহার স্বামী মৃজা মহম্মদ কাজেম উত্তরাধিকারীসূত্রে ঐ অংশ প্রাপ্ত হইলেন, জিবনন্নেছা বেগম ও মৃজা মহম্মদ কাজেমের ।১৬ চারি আনি ষোল গণ্ডা অংশ বিক্রয় করাতে রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী পিতার মৃত্যুর পর উহা নিজ নামে ১২৯৬ সালে ক্রয় করিয়া বিনোদপুরের ষোল আনা অংশের অধিকারী হইলেন।

রাজনগর পরগণার অন্তর্গত জোয়ার বাহেরচর ও কিসমত দাতরা পূর্বে পীতাম্বর সেনের হাওলা ছিল। এই দুই মহাল বিনোদপুরের সংলগ্ন। কালক্রমে ইহাও ঢাকার মোগলবংশীয়েরা ক্রয় করেন। কিন্তু তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন হেতু জোয়ার বাহেরচরের ।৴১২ নয় আনা বার গণ্ডা ও কিসমত দাতরার ৴১০ গণ্ডা ঢাকার মোঘলবংশীয়গণ বিক্রয় করাতে কালীকিশোর রায়-চৌধুরী তাহা ক্রয় করেন। জোয়ার বাহেরচরের অংশ কালীকিশোর নিজ স্ত্রীর নামে ও দাতরার অংশ পুত্রের নামে ক্রয় করিয়াছিলেন। জোয়ার বিনোদপুর, জোয়ার বাহেরচরের ।৴১২ গণ্ডা ও কিসমত দাতরার ৴১০ গণ্ডার সদর খাজনা ২২৩৮৸৶১১ ও সেস ৬২১।৴২ মাত্র। বিনোদপুর ৬৩৪২ নং কালেক্টরির তৌজিভুক্ত। জোয়ার বাহেরচর ও কিসমত দাতরার হিসাব পৃথক। রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীই বর্তমানে বিনোদপুরের ষোল আনা, জোয়ার বাহেরচরের ।৴১২ গণ্ডা ও কিসমত দাতরার ৴১০ গণ্ডা হিস্যার মালিক দখলিকার আছেন।

বিনোদপুর ও তাহার সংলগ্ন স্থানের অধিবাসিগণ মধ্যে মুসলমানই অধিক। ইহাদিগের মধ্যে অবস্থাপন্ন লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। মুসলমান অধিবাসিগণ স্বভাবতই দুর্ধর্ষ। ইহাদিগের মধ্যে অনেক ঘরই দস্যুতাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া উন্নীত হইয়াছে। জমিদার নিজব্যয়ে পয়ঃপ্রণালী খনন করিয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিয়াও বৃদ্ধি নিরিখে আদায় করিতে সাহসী হন না।

বিনোদপুরের নায়েব লোকনাথ চক্রবর্তীকে প্রজাগণ হত্যা করে, পরেও অনেক নায়েব ইহাদের দ্বারা অপমানিত হইয়াছে। হত্যাপরাধে বিনোদপুরের একজন প্রধান তালুকদার শম্ভু মৃধার প্রাণদণ্ড হয়।

বড় বিনোদপুর, চর বিনোদপুর, মামুদপুর, গৈয়াতলা, মৃধাকান্দী, রণখোলা প্রভৃতি স্থান লইয়া বিনোদপুর জোয়ার। একবার এই সকল স্থানের প্রজাগণ মোঘল জমিদারগণের কাছারি লুণ্ঠন করাতে ও নানাবিধ আইনবহির্ভূত কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ায়, গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে দমন

করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে স্থানে প্রজারা এই সেনাগণের সম্মুখীন হইয়াছিল, উহা অদ্যাপি "রণখোলা" নামে পরিচিত আছে। এই সম্বন্ধে একটি গ্রাম্য কবিতা আছে। যথা—

বাজিল রণের কাড়া, সিপাহী হইল খাড়া,
বিনোদপুরে পৈল সাড়া। ইত্যাদি।

শূন্যঘোষ

এই স্থানটি বিক্রমপুর পরগণার মধ্যবর্তী হইলেও ইদিলপুর পরগণার জমিদারির অন্তর্গত হইয়াছে। এই স্থানটির অবস্থা নিকটবর্তী অন্যান্য স্থান হইতে স্বতন্ত্র। এইরূপ উচ্চ ভূভাগ দক্ষিণ বিক্রমপুর মধ্যে নাই বলিলেই হয়, যেন কোন নৈসর্গিক কারণে উহার উন্নয়ন কার্য সংসাধিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের বসতি জন্য গ্রামটি প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে কালীপ্রসন্ন চৌধুরী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাহাদের পূর্বনিবাস আন্ধারমাণিক নদী কর্তৃক বিধ্বস্ত হইলে তথা হইতে আসিয়া ইহারা এই স্থানে বাস স্থাপন করেন। রাজনগরের ভট্টাচার্য বংশের কেহ কেহ এবং কানারগাঁর প্রসিদ্ধ দত্ত ও জপসার দাস উপাধিধারী কায়স্থগণ অধুনা এই গ্রামে বাস করিতেছেন। এই স্থানটি মুসলমান-পরিবেষ্টিত।

রুদ্রকর

এই গ্রামটি বিক্রমপুর ও ইদিলপুরের মধ্যবর্তী। বহু ব্রাহ্মণ এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। চক্রবর্তী বংশ প্রসিদ্ধ তালুকদার , ইহারা কুলীন চট্টোপাধ্যায় বংশ হইলেও চক্রবর্তী নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের বাড়ি বহু হর্ম্যমালা ও একটি মঠ দ্বারা পরিশোভিত। একদিকে নানাবিধ সদানুষ্ঠান ও অপর দিকে দাঙ্গাবাজ বলিয়া ইহারা দেশ মধ্যে বিশেষ পবিচিত। গুরুচরণ, শশিভূষণ, অভয়াচরণ ও শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি এই বংশের প্রধান লোক। এই স্থানবাসী শ্রীযুত গঙ্গাচরণ বিদ্যাভূষণ একজন প্রধান বৈয়াকরণ। তৎপুত্র পণ্ডিত শ্রীরাজকুমার চক্রবর্তী একজন সুলেখক। গ্রামে সংস্কৃত টোল ও সার্কেল স্কুল আছে। স্নানঘাটা নামক স্থানের প্রজাদের সহিত বিবাদ হইয়া চক্রবর্তী বংশের কোন ব্যক্তি এবং কর্মচারি হত হওয়ার বিবরণ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। গুরুচবণ, শশিভূষণ, বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী মহাশযগণেব মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিপুল দান ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় এবং ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করা হইযাছিল। ইহাদের বাড়িব তিন হিস্যাতে প্রতিদিন শত শত লোকের আহার প্রাপ্তির ব্যবস্থা আছে। এইরূপ স্বজন-প্রতিপালক আজকালকার দিনে অতি বিরল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নবীনচন্দ্র সেন "আমাব জীবনচবিত" পুস্তকের তৃতীয়ভাগে "আল্লাব ঢিল" বলিয়া যে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, উহা স্নানঘাটার প্রথম বিবাদ উপলক্ষের বিবরণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এতদ্ভিন্ন একখানি দলিল রেজেস্টারি ব্যাপারে চক্রবর্তীদের যে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয় উহাও ঐ গ্রন্থের অংশবিশেষ পাঠ করিয়া উপলব্ধি কবা যায়। মহাভারত পাঠ সমাপন উপলক্ষেও ইহারা বিস্তব ব্যয় করিয়াছিলেন।

নলমুড়ি

প্রাচীন জমিদার বংশের কেহ কেহ এই গ্রামে বাস করিতেন। সম্প্রতি মেঘনার দ্বারা বাড়ি ধ্বংস হওয়ায় তাহারা অন্যত্র গৃহ সংস্থাপন করিয়াছেন। এই বংশের শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী একজন অভিজ্ঞ লোক, ইনি ঐতিহাসিক বহু তথ্য পরিজ্ঞাত আছেন। এই গ্রামেব অল্পাংশ মাত্র বর্তমান আছে।

পিয়কাঠি, তিলৈ

উভয় গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ বাস করেন। পিয়কাঠির মুখোপাধ্যায় ও বারড়ী এবং তিলৈর চক্রবর্তীগণ প্রসিদ্ধ। অত্রত্য মুসলমান হাজামজাতীয় ঢুলিগণ প্রসিদ্ধ ছিল। বহু শূদ্র এই সকল স্থানে বাস করিতেছে।

টেঙ্গরা

এই স্থানে অনেক ভদ্রলোক অবস্থান করেন ; তন্মধ্যে কায়স্থ বংশ প্রধান। পরগণার পূর্ব জমিদারবংশ অধুনা তালুকদারে পরিণত হইলেও বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত এই স্থানে বাস করিতেছেন। এই বংশীয় রামচন্দ্র রায় ও মহেশচন্দ্র রায় বিখ্যাত লোক ছিলেন। রামচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বি-এ, শিক্ষিত ও প্রসিদ্ধ লোক। বহু গোষ্ঠী একই বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। বাড়িতে কালীদেবী সংস্থাপিত আছেন। প্রতি অমাবস্যায় ভোগ ও বলিদান হইয়া থাকে। টেঙ্গরার বাৎসরিক মেলাটি কম প্রসিদ্ধ নয়।

বেজনীসার

এই স্থানটি মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত, একটি স্টিমার স্টেশন আছে। বহু কায়স্থের বাসস্থান। পূর্বতন জমিদারবংশের এক শাখা এই স্থানে বাস করেন। কতিপয় বৎসর অতীত হইল, এই স্থানবাসী ভূম্যধিকারী পূর্ণচন্দ্র রায়কে তাহার তালুকদারির অন্তর্গত নাগেরপাড়ার প্রজাগণ নৃশংসভাবে হত্যা করে। ভূম্যধিকারীর অত্যাচারই নাকি ইহার মূল কারণ, কিন্তু উহার কোনরূপ প্রমাণ না হওয়ায় প্রজারা কোনরূপ শাস্তি প্রাপ্ত হয় না। চন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি এই বংশের প্রধান লোক।

দিক্‌শূল

এই স্থানের শিকদার-উপাধিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ স্বসমাজে প্রসিদ্ধ।

পাতলা ধানকাটি

এই গ্রামেও পরগণার ভূতপূর্ব জমিদারবংশ বাস করিতেছেন। ইহা কালীপ্রসাদ রায়ের ভগিনী সন্তোষের ভূম্যধিকারিণী সুবিখ্যাত জাহ্নবী চৌধুরাণীর জন্মস্থান। এই স্থান মেঘনার গর্ভে বিলীন হওয়ায়, কালীপ্রসাদের পুত্র কৈলাসনাথ রায়, ধানকাটি গ্রামে বাস পরিবর্তন করিয়াছেন। পিতৃষ্বসা চৌধুরাণীর অনুগ্রহে তাহার অবস্থা বিশেষরূপে পরিবর্তিত হইয়া সৌভাগ্যে পরিণত হইয়াছে। ধানকাটি ইতিপূর্বে জপসা স্টেটের অন্তর্গত ছিল।

মসুরগাঁ, দাসের জঙ্গল

পূর্বতন জমিদারবংশের গোলোকচন্দ্র রায় ও অন্যান্য সকলে পূর্বে মসুরগাঁ গ্রামে বাস করিতেন। পরে নদী কর্তৃক গ্রাম ধ্বংসের পর দাসেব জঙ্গলে গৃহ সংস্থাপন করিয়াছেন। গোলাকচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র রায় তালুকদার। এক সময়ে এই স্থানে একটি সখের উৎকৃষ্ট যাত্রার দল ছিল।

সিঙ্গারডা. বিনটিয়া

কায়স্থপ্রধান স্থান। পূর্বতন জমিদার বংশের এক শাখা এই স্থানে বাস করেন। হরিচরণ রায় প্রধান লোক। বিনটিয়াতে বৈশাখ মাসে একটি মেলা বসিয়া থাকে।

এড়িকাটি

কায়স্থপ্রধান স্থান। অত্রত্য গুহবংশ ধনী ও প্রসিদ্ধ। এখানে একটি বাজার ও পোস্টাফিস আছে।

পট্টি

এই স্থানে বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের ঘটক ব্রাহ্মণ বংশের এক শাখা বাস করিয়া থাকেন। এই ঘটকবংশীয় গোলাকচন্দ্র ঘটক ও লোকনাথ ঘটক কর্তৃক সন্তোষের জাহ্নবী চৌধুরাণীর অর্থানুকূল্যে বঙ্গজ কায়স্থগণের এক কুলকারিকা লিপিবদ্ধ হয়। এই ঘটক মহোদয়গণ কায়স্থ সমাজে বিশেষ সম্মানিত। এই স্থানের ঘোষবাড়ি প্রসিদ্ধ।

গোসাইর হাট

এই স্থানে একটি আউট্‌পোস্ট আছে। ইদিলপুরের উচ্চ ইংরেজি বঙ্গবিদ্যালয়টি এই স্থানে সংস্থাপিত। এই গ্রামে কালীদেবী সংস্থাপিত আছেন।

বুড়ির হাট

অতি পূর্ব সময়ে এই স্থানে একটি পুলিশ স্টেশন বা থানা ছিল। লেদাম নদী এই স্থানের প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইত; উহার তীরে একটি প্রসিদ্ধ হাট ছিল, উহারই নাম বুড়িরহাট। এখন নদী মজিয়া প্রান্তরে ও গ্রামে পরিণত হইয়াছে। যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি হাটের মালিক। এখানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রম আছে। বর্ষাকালে এই হাটে বিস্তর নারিকেল ও মালগার বন (খড়) বিক্রয় হয়।

কনকসার (কনেশ্বর)

এইটি ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান। এই স্থানবাসী জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায় হুদাভুলুয়ার চাকরি করিয়া বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করেন। তাহাদের এক জ্ঞাতি নীলকমল চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিষয়ঘটিত বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, জ্ঞাতি কার্তিকপুরের জমিদার মমতাজউদ্দিন চৌধুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। চৌধুরী তদুপলক্ষে জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। পরে এই জন্য মোকদ্দমা স্থাপিত হইলে চৌধুরী ও তৎপক্ষীয়গণের শাস্তি বিধান হয়।

তৎপুত্র শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। পিতা ইদিলপুর পরগণার মধ্যে কতকগুলি স্থান পত্তনী গ্রহণ করিয়া যান, উহার আয় দ্বারা তিনি মহাসমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ ও মহাভারত পাঠ উদ্‌যাপন করেন। এই স্থানে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে।

হাটুরিয়া

বর্তমান জমিদার ঠাকুর বাবুদের ইদিলপুর পরগণার সদর কাছারি এই স্থানে সংস্থাপিত আছে। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র মোহিনীমোহন ঠাকুরের নামে এই পরগণা নিলামে খরিদ হয়। মোহিনীমোহনের দুই পুত্র, প্রথম কানাইলাল, দ্বিতীয় গোপাললাল। কানাইলাল নিঃসন্তান থাকায় তিনি জমিদারির নিজ অংশ গোপাললালকে পত্তনী প্রদান করিয়া বার্ষিক ২৪,০০০ হাজার টাকা মালিকানা বাবদ প্রাপ্ত হইতেন। বাবু গোপাললাল ঠাকুরের পুত্র কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, তৎপুত্র প্রথম শরদিন্দ্রমোহন, দ্বিতীয় শৈরীন্দ্রমোহন, কনিষ্ঠ নিঃসন্তান; জ্যেষ্ঠের পুত্র প্রশংসনীয় শ্রীযুত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর পরগণার মালিক ও জমিদার।

হাটুরিয়ার কাছারি ইষ্টকনির্মিত গৃহে সংস্থিত। বাসন্তী দুর্গোৎসবে যথেষ্ট ব্যয় হইয়া থাকে।

গোলাম আলি চৌধুরী (নকড়ি মিঞা) ইদিলপুর পরগণার সর্বপ্রধান তালুকদার। তাহার পিতা আশক মৃধা ঠাকুর জমিদারগণের সরকারে কার্য করিয়া যথেষ্ট সম্পত্তি সঞ্চয় করেন। ইদিলপুর দখল উপলক্ষে যখন পূর্বতন মালিকগণের সহিত ঠাকুর বাবুদের বিবাদ চলিতেছিল, তৎসময়ে আশক ঠাকুর পক্ষ অবলম্বন করিয়া, প্রভুর অনুকূলে যথেষ্ট কার্য সাধন করেন। তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র গোলামালী ঐ সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতি সংসাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার প্রতি ডাকাইতির অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল ও দাঙ্গা ইত্যাদি এবং ঠাকুর বাবুদের সহিত মোকদ্দমা করিয়া গোলাম আলির কম অর্থ ব্যয় করিতে হয় নাই। তথাপি তাহার অর্থে প্রাচুর্যতার খর্ব সাধন হইয়াছিল না। তদীয় অর্থে সবডিভিসনের ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে মাদারিপুরের নদীতে পাকা ঘাট, পাকা পোল নির্মিত হইয়াছিল। তৎপ্রতিষ্ঠিত স্বনিবাস হাটুরিয়া গ্রামের মেলাটি আজিও প্রতি বৎসর যথা সময়ে বসিয়া থাকে। গোলাম আলি চৌধুরী একজন ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তদীয় পুত্রগণের দ্বারা এই বিষয় সম্পত্তির অপচয় হইয়া পড়িতেছে। এই বাড়িতে ইষ্টকালয় আছে, নয়াভাঙ্গনী নদীতীরে এই স্থানটির সংস্থিতি, রাস্তার বন্দোবস্ত মন্দ নয়, হাট ও একটি স্টিমার স্টেশন আছে।

ভেদেরগঞ্জ

এই স্থানে একটি হাট, পুলিশ আউট পোস্ট (ফাড়ি) ও রেজেস্টরি আফিস আছে। ইহার নিকটবর্তী পাইয়াতলীচরে বিস্তর মুসলমান বাস করে।

গঙ্গানগর

ইতিপূর্বে এই গণ্ডগ্রামে অনেক ব্যবসায়ী ও ব্রাহ্মণ, কায়স্থের বাস ছিল। কীর্তিনাশা নদী উহার অনেকাংশ উদরসাৎ করায়, বহু বাসেন্দা এই স্থান হইতে অন্যত্র যাইয়া বাসস্থাপন করিয়াছে, অথচ নগর বোয়ালিয়া নদী সীকস্ত হওয়ায় তথাকার অনেকে আসিয়া এই স্থানে বাসস্থাপন করিয়াছে। এই স্থানে একটি হাট ও স্টিমার স্টেশন আছে।

গয়ঘর ও উমেদপুর

এই উভয় গ্রামে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সংখ্যা মন্দ নয়। রায়বাড়ি প্রসিদ্ধ। অধিবাসীর মধ্যে উকিল ও মোক্তারের সংখ্যা অধিক। উমেদপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল মহাশয় ফরিদপুর গবর্নমেন্টের ওকালতি কার্যে নিযুক্ত আছেন। গয়ঘরে একটি পোস্টাফিস ও স্কুল আছে। এই স্থানে সাহাজাতীয় বহু ধনীর বাসস্থান।

কৃষ্ণনগর

কীর্তিনাশা নদীর অতি সন্নিকটে দক্ষিণ পারে অবস্থিত। উহা পূর্বে রাজনগরের জমিদারির অন্তর্গত ছিল। এই স্থানের হাট মন্দ প্রসিদ্ধ নয়।

শীলার চর

আড়িয়ল খাঁর অতি সন্নিকটে, একটি হাট আছে, মুসলমানের সংখ্যা অধিক। এই স্থানটিও রাজনগরের জমিদারির অন্তর্গত ছিল। অধুনা সুয়াপুরের জমিদার শ্রীযুত কুলদাকিঙ্কর রায় বি, এল মহাশয় এই স্থানের মালিক।

নীলখী

আড়িয়ল খাঁর সন্নিকটে। এই স্থানে পূর্বে একটি বৃহৎ বন্দর ছিল, অধুনা ভগ্নাবস্থা।

জপসাবাসী রামানন্দ সরকারের কাছারি আজিও বর্তমান আছে। পূর্বে একটি পোস্টাফিস ছিল ; সম্প্রতি উহা এই স্থান হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

কাকর ও সরদার মামুদের চর

এই সকল স্থানে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভৃতি নানাশ্রেণির হিন্দুগণ বাস করিয়া থাকেন। মুসলমানের বাসও মন্দ নহে।

পাচ্চর ও বরমগঞ্জ

পদ্মা ও আরিয়লখাঁর সঙ্গম স্থানের অতি সন্নিকটে কয়েকটি চর দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা সাধারণত মধ্য, বাহের ও বড় চর নামে অভিহিত হয়। অতঃপর সর্বশেষ আর একটি চর একপার্শ্বে অবস্থিত ছিল, উহার নাম ছিল পাশচর, পরে উহাই পাচচর নামে পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। জানা যায় এই চর প্রথমত ২৪ পরগণার অন্তর্গত ভূকৈলাসের রাজাদের বিষয়-সম্পত্তির অন্তর্গত ছিল ; পরে জালালপুরের কোন মুসলমান উহার স্বত্বাধিকারী হন। রমানাথ গোপ এই স্থানে বিস্তর গরু চরাইত, দুগ্ধের ব্যবসায়াবলম্বনে তাহার বিস্তর অর্থ সঞ্চয় হয়, তদ্দ্বারা রমানাথ একটি তালুক খরিদ করিয়া পাচচরে বাস সংস্থাপন করে। আজিও তদীয় আবাসে একটি প্রাচীন মঠ দৃষ্ট হয়, যাহা হইতে গোপবংশের সমৃদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সম্ভবত বৈদ্যগণ মধ্যে ধন্বন্তরি গোত্রজ বিনায়কবংশীয় কেহ কেহ সর্বপ্রথম এই স্থানে বাস স্থাপন করেন, পরে বিক্রমপুরের দক্ষিণপার হইতে শক্তিমাধব সেনের বংশধর বক্শী উপাধিবিশিষ্ট কেহ কেহ তথায় বাস করিতে থাকেন।

জ্ঞাতিগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া. আইনপুর থানার অন্তর্গত ভাবুকদিয়া গ্রাম হইতে এক বিধবা বর্ষিয়সী আগমন করিয়া, পাচচরবাসী রামশরণ সেনের বাড়িতে তদাশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। একমাত্র শিশু পুত্র ব্যতীত তাহার আর কিছুমাত্র সম্বল ছিল না। এই বালকের নাম ছিল দেবীচরণ ; বৈদ্য ধন্বন্তরি গোত্রজ রোষবংশসম্ভূত মুরারি সেনের বংশে তাহার জন্ম হয়।

বয়োবৃদ্ধির সহিত পাঠশালার পাঠ পরিসমাপ্ত করিয়া দেবীচরণ, নারায়ণগঞ্জের কোন মহাজনের হিসাব-লেখক পদে নিযুক্ত হন। স্বীয় বুদ্ধিবলে ও চতুরতায় তিনি অচিরে বাণিজ্য কার্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া, মহাজনের প্রিয়পাত্র ও সর্বপ্রধান কার্যকারকের পদে বরিত হন। একদা মহাজনের অনুপস্থিতিতে দেবীচরণ এক জাহাজের সমুদয় লবণ ক্রয় করিয়া উহার বায়নাস্বরূপ কিছু অর্থ প্রদান করেন। পরে মহাজন উপস্থিত হইলে তাহাকে এই কথা পরিজ্ঞাত করেন ; কিন্তু মহাজন এই কথা শ্রবণ করিয়া, দেবীকে বলেন, আজকাল বাজারের যেরূপ ভাব, তাহাতে এই দরে খরিদ করিয়া কখনও লাভবান হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব আমি উহা প্রত্যাখ্যান করিলাম, উহা ক্রয় করিয়া কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হইব না।

মহাজনের বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবীচরণ মহাবিপদে পতিত হইলেন, তখন কি করেন, একমাত্র অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করিয়া সেই দিন অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু তৎপরদিবস সূর্যোদয় সহিত দেবীর সৌভাগ্য সূর্যও সমুদিত হইল, দেখা গেল যে দরে লবণ ক্রয় হইয়াছে উহার দ্বিগুণ মূল্যে বাজারে তাহা বিক্রয় হইতেছে ; তৎক্ষণাৎ সমুদয় লবণ বিক্রয় করিয়া, তাহার প্রায় লক্ষ টাকা মুনাফা দাঁড়াইল। প্রভুভক্ত দেবী কিন্তু, তখনও উহা আপনার লভ্য বিবেচনা মনে না করিয়া লভ্য অর্থ মহাজনের নিকট উপস্থিত করিলেন। মহাজন সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিলেন, দেখ দেবী, এই টাকা আমার নয়, তোমার কার্যে আজ যদি

লভ্য না দাঁড়াইয়া ক্ষতি হইত উহা যখন আমি বহন করিতাম না, তখন এই লভ্যাংশ আমি লইব কিরূপে? ভগবান তোমাকেই দয়া করিয়া উহা অর্পণ করিয়াছেন, তুমি উহা লইয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতে আরম্ভ কর, নিশ্চয় তোমার উন্নতিলাভ হইবে। দেবী মহাজনের আজ্ঞাক্রমে সেই দিন হইতেই পৃথক ভাবে বাণিজ্য ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করিলেন, দেখিতে দেখিতে ক্রমশই তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিল। এই সময়ে নারায়ণগঞ্জের মহাজনগণ মধ্যে, নন্দী, পাম্থি, লোহাগড়ার রায়, দেবুসেন প্রধান ব্যবসায়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

প্রবাদ, কোন যোগীপুরুষ দেবীচরণকে শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র প্রদান করেন, তৎপর হইতে তাহার ভূসম্পত্তিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। ক্রমে ঢাকা ফরিদপুরের মধ্যে অনেক স্থান তাহার অধিকারভুক্ত হয়। এই সময়ে তিনি জমিদার মধ্যে পরিগণিত হন।

দেবীচরণের দুই পুত্র, রাজকিশোর ও রামকিশোর। জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর বিষয় ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্যভার অর্পণ করিয়া দেবীচরণ একমাত্র লক্ষ্মীনারায়ণ সেবাতেই জীবন অতিবাহিত করিতে থাকেন, পরে সেই আরাধ্যদেবের পাদপদ্মে আত্মনির্ভর করিয়া ইহলোক হইতে পঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ পবিত্যাগপূর্বক নিত্যধামে প্রস্থান করেন।

পুত্রদ্বয় দেবীচরণের শ্রাদ্ধ মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন। নানাস্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়, দীনহীনগণকে অন্নবস্ত্র দান ও দানসাগর শ্রাদ্ধের আনুসঙ্গিক ব্যাপারে বহু অর্থ ব্যয় হয়। এই কার্যে দধি, ক্ষীর, ঘৃত, মধু প্রভৃতি তরল খাদ্য সংরক্ষণ জন্য যে সকল কূপ ইষ্টক দ্বারা বাঁধান হইয়াছিল, উহার চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

দেবীচরণের উত্তরাধিকারীরা আর কিন্তু বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রতি মনোযোগী থাকিলেন না, তাহারা জমিদার হইয়া তদ্রূপ ভাবেই চলিতে লাগিলেন। উহাতে একদিকে যেমন তাহারা "বাবু ও রায়চৌধুরী" আখ্যায় বিভূষিত হইলেন, অপরদিকে মূল সম্পত্তির প্রধান কারণ, নারায়ণগঞ্জের বাণিজ্যাগারও ক্রমশ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। অতঃপর আবার দেবীচরণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকান্ত, ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সহিত সম্পত্তি লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত করিলেন। বহুদিন বিবাদ বিসম্বাদের পর, উভয় পক্ষ সালিশগণের ব্যবস্থায় ১২১৩ সনের ৭ বৈশাখ উহার মীমাংসা সাধন করেন। এই বাড়িতে বিস্তর দালান দৃষ্ট হয়, এতদ্ভিন্ন ইষ্টকনির্মিত দোলমঞ্চ ছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের নামে বিস্তর দেবোত্তর ছিল। পাচ্চরের হাট এই লক্ষ্মীনারায়ণের নামানুসারে লক্ষ্মীগঞ্জ নামে পরিচিত ছিল। ইহাদের বিস্তর নীলের কুঠি ছিল, তদুপলক্ষে ফরাজি সম্প্রদায়ের নেতা দুধুমিয়ার সহিত ইহাদের বিস্তর দাঙ্গা ও মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। এই সকল নীলের কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন জর্জ ওয়ারেন সাহেব।

রাজকিশোরের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র গোপীমোহন সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হন। গোপীমোহন একজন বিদ্যোৎসাহী জমিদার ছিলেন, তাহার সমকালে পাচচরবাসী স্বর্গীয় পণ্ডিত রামকুমার ন্যায়ভূষণ মহাশয় মুগ্ধবোধ, সারস্বত ও কলাপ ব্যাকরণ সার সংগ্রহপূর্বক যে কলাপসার নামক ব্যাকরণ রচনা করেন তাহা গোপীমোহনের বিদ্যালোচনার প্রভাবে ও উৎসাহেই সংসাধিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থোক্ত নিম্নলিখিত করিতাটিই উহার সাক্ষ্যস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

"ধ্যাত্বেষ্ট দেবতাংশ শ্রীরামপূর্বকুমারকঃ।
ব্যাকরণং মুগ্ধবোধ সারস্বত-কলাপকং।।
দৃষ্টাকলাপসারাখ্যং কুরুতেচাশুবোধকং।
ব্যাক্রিয়াং * * * শ্রীল গোপীমোহন * * *।।
আদেশাৎ পাচ্চরগ্রামনিবাসী বন্দ্যবংশজঃ।
সুধীরো রামগতি বাচস্পতিসুতোনতঃ।।

দিন কাহারও সমান ভাবে যায় না, তাই আজ দেবীচরণের বংশধরগণের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহাদের কতক সম্পত্তি গোপীমোহনের ভগ্নিপতি সেনহাটি নিবাসী গৌরচন্দ্র দাশ মহাশয়ের নামে বেনামী করা হয়, দাশ মহাশয়ের কোন পুত্র সন্তান না থাকায়, তদীয় উত্তরাধিকারী এই সম্পত্তি তাহার প্রাপ্য বলিয়া দাবি করায়, বহু অর্থব্যয় করিয়া তাহার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করা হয়। ইহারা বৈদ্যবংশ মধ্যে কুলকার্যাদি দ্বারা বিশেষ সম্মান অর্জন করিয়াছেন।

গোপীমোহনের পুত্র প্রসন্নকুমার বঙ্গভাষার যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন, সপ্তাশতক প্রণেতা সুকবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ঢাকার তৎকালিক কবি হরিশ্চন্দ্র ও প্রসন্নকুমার একত্রে সম্মিলিত হইয়া কবিতা প্রণয়ন করিয়া কাগজ বাহির করিতেন। গোপীমোহনের কনিষ্ঠ ব্রজমোহন, যিনি ফরিদপুর উকিল সরকার ছিলেন, তিনিও কাব্যপ্রিয় ছিলেন, তদ্বিরচিত বহু সঙ্গীতের কথা অবগত হওয়া যায়।

এই পরিবারের অন্তঃপুরেও বিদ্যাচর্চার অনুশীলন ছিল। গোপীমোহনের দ্বিতীয়া কন্যা শরৎকুমারীর হস্তলিপি তৎকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই পরিবারের রমণীগণ অধুনাতন কালে সমাদৃত মেয়েলি কবিতার যথেষ্ট আলোচনা করিতেন। তন্মধ্যে শরৎকুমারীর রচিত একটি ছড়া উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল ঃ—

"তাঁতির ঘরে ছিল এক বেঙের ছানা।
খায় দায় নিদ্রা যায় তাঁত ঘরে তার খানা।।
সুবুদ্ধি তাঁতির ছেলে কুবুদ্ধি লাগিল।
তার একটি বেঙের ছানা গুতাতে মারিল।।
একদিন তাঁতির ছেলে গিয়াছিল হাটে।
সোনা কোলা বেঙের সহিত পরে গেল হটে।।" ইত্যাদি

গোপীমোহনের খুল্লতাত ভ্রাতা জগচ্চন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের সময়ে সুপ্রসিদ্ধ দুধু মিয়ার প্রাদুর্ভাব। কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাবে দুধু মিয়া তাহাদের বিশেষ কোনও অনিষ্ট সাধন করিতে সক্ষম হন নাই। এই সকল নানাবিধ কারণেই তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়েন।

পাচচরের জমিদারবংশের হরিহর, কালীপ্রসন্ন, বৈকুণ্ঠরঞ্জন, সতীশনিরঞ্জন, নিরঞ্জন, সতীনাথ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর এই গ্রামের শম্ভুচন্দ্র কবিভূষণ করিরাজ একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষাতে একখানা ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, যাহা তৎপুত্র ফরিদপুরের ভূতপূর্ব প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র সেন কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রামবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট উমেশচন্দ্র সেন ও নগেন্দ্রনাথ সেন, ভূতপূর্ব সবজজ রমেশচন্দ্র সেন, কবিরাজ রামনিধি দাস, গোবিন্দচন্দ্র সেন কবিরাজ, তারাপ্রসন্ন সেন কবিরাজ, বিশ্ববিষ গ্রন্থপ্রণেতা ডাক্তার হরিমোহন সেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বাসস্থান।

পাচচর গ্রামবাসী সাহাবংশোদ্ভব বংশীবদন, পীতাম্বর ও নিলাম্বর সাহা প্রধান ব্যবসায়ী ও ধনী। কলিকাতা বেলেঘাটাতে তাহাদের চাউলের বৃহৎ কারখানা আছে। শিবচরের ইংরাজি বিদ্যালয়টি ইহাদের ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত।

বরমগঞ্জ প্রসিদ্ধ স্থান, তথায় বৃহৎ বন্দর, থানা ও রেজেস্টারি আফিস বর্তমান, শিবচরের থানা বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ, উহা এই বরমগঞ্জতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। বহু ব্রাহ্মণ ও ব্যবসায়ী লোক এই স্থান বাস করিয়া থাকেন।

রামদাস বিদ্যালঙ্কার, রামকুমার ন্যায়ভূষণ, দুর্গাপ্রসাদ ন্যায়ালঙ্কার স্মার্ত গুরুনাথ ও উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতির জন্মস্থান।

টেঙ্গরামারী

বহু ব্যবসায়ী লোকের বাসস্থান নিবন্ধন স্থানটি পরিচিত।

মাদারিপুর

মাদারিপুর স্থানটি অতি সুদৃশ্য, উহার একদিকে আরিয়লখাঁ ও অন্য দিকে কুমার নদ প্রবাহিত থাকায়, বাণিজ্যকার্যপক্ষেও বিশেষ সুবিধাজনক। প্রকৃতপক্ষে মাদারিপুর একটি গ্রামের ও একটি পরগণার নামের সহিত জড়িত। সাহ মাদার নামে জনৈক মুসলমান ফকির এই স্থানে থাকিয়া যোগ সাধনা করিতেন। প্রবাদ তাহার নাম হইতে স্থানের নাম হয় মাদারিপুর। পরে উহা একটি পরগণায় পরিণত হয়। মাদারিপুরের কতকাংশ আবার পরগণা রাজনগরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই পরগণার পরিমাণ ৭৮৩৬ একর বা ১২.২৪ স্কোয়ার মাইল। ৪২টি স্টেটের কর ৮২ পাউন্ড ৮ শিলিং। বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত থাকা সময়ে, উহার লোকসংখ্যা ছিল দুই সহস্র, বর্তমান সময়ে দ্বিগুণ হইয়াছে। রেনেলের মানচিত্রে এই স্থানের নাম দেখা যায়। সম্ভবত জালালপুর ও কাশীমপুরের কতকস্থান লইয়া এই মাদারিপুর পরগণার উদ্ভব হইয়াছে।

বাকরগঞ্জ জেলার বহুপূর্বতন জজ সিরিটার মফঃস্বল পরিদর্শন উপলক্ষে গোবিন্দপুরের নিকটবর্তী আরিয়লখাঁ নদে বজরায় অবস্থান করিতেছিলেন, এই সময় একদল ডাকাত তাহাকে আক্রমণ করে, কিন্তু উহারা অকৃতকার্যাবস্থায় প্রস্থান করিতে বাধ্য হয়। সিরিটার জেলায় আগমন করিয়া, আরিয়লখাঁর তীরে একটি মহকুমা স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে এই বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হয়, পরে নয় বৎসর অতীত হইলে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে মাদারিপুর মনোনীত হইয়া, তথায় ফৌজদারি ও দেওয়ানি কার্যের বিচার জন্য মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়।

গৌরদাস বসাক এই সবডিভিসনের অফিসার হইয়াও অধিকাংশ সময় বরিশালে অবস্থান করিতেন। বলরামের আখড়াতে এই সময়ে মুন্সেফের বিচারালয় ছিল। ঠাকুরদাসবাবু এই স্থানের সর্বপ্রথম মুন্সেফ হইয়া আগমন করেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি নির্মিত হইলে, জে, এ, রিকেট সাহেব প্রথম সবডিভিসনাল অফিসার হইয়া এই স্থানে আগমন করেন। বরিশাল জেলার অধীন থাকা সময়ে, বুড়িরহাট, কোটালিপাড়া, মুলফৎগঞ্জ এবং শিবচর থানার কতকাংশ এই মহকুমার অন্তর্গত ছিল। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে মুলফৎগঞ্জ ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমা হইতে খারিজ হইয়া, এই মহকুমার অন্তর্গত হয়। এই সময়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দীনবন্ধু মৌলিক এই মহকুমায় অপ্রতিহত-প্রভাবে শাসন করিতেন। তাহার সময়ে ফৌজদারি মোকদ্দমা হইতে বিমুক্ত গোলাম আলি চৌধুরীর অর্থব্যয়ে মাদারিপুরের ইষ্টকপোল নির্মিত হয়। দীনবন্ধুবাবুর পূর্বে, ই, বি, গড়ফ্রী মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারি ছিলেন। এই সময়ে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে মুন্সেফ ভগবান চক্রবর্তী মহাশয়ের উদ্যোগে মাদারিপুর মাইনর স্কুল সংস্থাপিত হয়। তারকনাথ মল্লিক ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সময়ে কাছারির নিকটবর্তী নদীতে পাকা ঘাট নির্মিত হয়। তারকবাবু সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। প্রত্যেক রবিবার কোন না কোন সম্প্রদায়ের লোক ভোজন করাইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। ডেপুটি তোজেম্বল আলির সময়ে বঙ্গের ছোট লাট সার রিচার্ড টেম্পল মাদারিপুর আগমন করেন। ইতিপূর্বে আর কোন গবর্নর এই স্থানে আসেন নাই। এই সময়ে এই মহকুমা বাকরগঞ্জ হইতে ফরিদপুরের অন্তর্গত হয়। এই বৎসর, আর. এফ. ককরেল মাদারিপুর মিউনিসিপালিটি সংস্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ইহার সময়ে ঢাকার খ্যাতনামা জমিদারবাবু মোহিনীমোহন দাসের

অর্থানুকূল্যে স্কুলের দালান এবং হাটুরিয়ার গোলাম আলি চৌধুরীর ব্যয়ে ডাক্তারখানার দালানের নির্মাণ আরম্ভ হয়। এই সময়ে এই মহকুমায় মিউনিসিপালিটির প্রবর্তন হয়।

অতঃপর সুবিখ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে এই স্থানে আগমন করেন। ইহার সময়ে স্কুলের দালান-নির্মাণকার্য শেষ ও মিউনিসিপালিটির কার্যের জন্য মেথর আনয়ন করা হয়। মধুর ও অম্লসংযুক্ত চাট্‌নির ন্যায় ইহার শাসনকার্যে জনগণের একটি রুচি জন্মিয়া গিয়াছিল। মাদারিপুর হইতেই তাহার শ্রেষ্ঠ কাব্য রঙ্গমতী প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে সুবিখ্যাত পার্শী সিভিলিয়ান কে. জে. বাদশা মাদারিপুর মহকুমার ভার প্রাপ্ত হন। ইনি অতি পরিশ্রমী লোক ছিলেন। অধিকাংশ সময় এলাকার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাহার সময়ে মাদারিপুরের অন্তর্গত স্থানসমূহের জঙ্গল পরিষ্কৃত হয়। ১৮৮৬ সনে দ্বারকানাথ রায় মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হন। এই সময়ে স্বায়ত্তশাসন প্রথার প্রচলন হওয়ায়, মাদারিপুর লোকাল বোর্ড সংস্থাপিত হয়।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে স্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ান উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন। তৎকালে স্থানীয় প্রবীণ মোক্তার দীননাথ সেন মহাশয়ের দ্বারা মিউনিসিপাল বাজার বসাইবার প্রস্তাব হয়। তৎপরে স্ট্যাটুটরি সিবিলিয়ান সূর্যকুমার অগস্তির সময়ে ঐ বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে রাজমোহন চক্রবর্তী মহকুমার ভার প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে ছোটলাট স্যর চার্লস ইলিয়ট পরিদর্শন উপলক্ষে মাদারিপুর আগমন করেন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলবি ফজল করিমের সময়ে মাদারিপুর পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০১/২ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গাচরণ রায় মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হন। তৎকালে ছোটলাট. স্যর জন উডবরণ 'বিল-রুট' পরিদর্শন উপলক্ষে এই স্থানে আগমন করেন। তৎপর ১৯০২ সনের জুলাই মাসে মৌলবী আবদুল করিম মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হন। এসেসর কর্তৃক অন্যায়রূপে ইনকামট্যাক্স ধার্য হওয়ায়, ইহার সুবিচারে অনেকেই ঐ দায় হইতে অব্যাহতি পায়।

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ হইতে এই স্থানে রেজেস্টারি আফিস সংস্থাপিত হয়। তৎকালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের হাতেই এই কার্যের ভার ছিল। পরে ঐ বিভাগ স্বতন্ত্র হইলে, ১৮৮৩ সনের ৯ আগস্ট তারিখে স্বতন্ত্র রেজেস্টারি আফিস স্থাপিত হয়। এই আফিস সংস্থাপনের প্রথম তারিখ হইতেই দ্বারকানাথ সেন রেজিস্টারের কার্য আরম্ভ করিয়া, ১৮৯১ সন পর্যন্ত ঐ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি প্রথমাবধিই মাদারিপুর লোকাল বোর্ডেরও চেয়ারম্যান ছিলেন। তাহার চেষ্টায় ও সাধারণের অর্থব্যয়ে কুমার নদের পাকা ঘাট প্রস্তুত হয়। এই ঘাট 'জুবিলি ঘাট' নামে অভিহিত হইত। ১৮৮৯ সন পর্যন্ত কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ, শিবচর প্রভৃতি থানার রেজেস্টারি কার্য মাদারিপুরে সম্পন্ন হইত। দ্বারকানাথ সেন দক্ষতার সহিত এই সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হন। তাহার কার্যকাল অতীত হইলে তৎপুত্র শ্রীমান উপেন্দ্রনাথ সেন কতককাল মাদারিপুরের সবরেজিস্টারের কার্য সম্পন্ন করিয়া অন্যত্র বদলি হইয়াছেন। তাহার পিতাপুত্র উভয়েই সাধারণের প্রিয় ছিলেন।

মাদারিপুরের ফৌজদারির দালান ১৯০০ সনে, মুন্সেফীর দালান ১৯০১ সনে এবং ইনস্পেকসন বাংলা ১৯০৩ সনে নির্মিত হয়। ১৮৮২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে তত্রত্য মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় এন্ট্রান্স স্কুলে পরিণত হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন এই স্কুলের প্রথম হেড মাস্টার নিযুক্ত হন। এই সময়ে মিঃ ফ্রেজার সবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। ইহার ২০ বৎসর পূর্বেই ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে উহা মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৮৮২ সালে মিঃ গডফ্রে সবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। শ্রীযুক্ত

রাসবিহারী বসু সবজজ, ক্ষীরোদচন্দ্র সেন, বি.এ. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, উকিল শশিকান্ত রায়, বি-এল ও নিবারণচন্দ্র দাশ, এম-এ, বি-এল, এবং রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ (রায় বাহাদুর) কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু গণনীয় লোকে এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই স্কুল পুনরায় মহাবিদ্যালয়ে এবং পরে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় এন্ট্রেন্স স্কুলে পরিণত হয়। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাসা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার ছাত্র কমিয়া যায়।

স্কুল ঘরখানি প্রথমত খড়ের ছিল। পরে সর্বজয়া নাম্নী এক পতিতা রমণী ঘরের জন্য ৩০০ টাকা দান করিয়া লোকান্তরিত হয় এবং ঢাকার বিখ্যাত জমিদার মোহিনীমোহনবাবু এই জন্য ৬০০ টাকা দান করেন। তদ্দ্বারা পাকা বাড়ি প্রস্তুত হয়। প্রথমাবস্থায় স্কুল সাহায্যপ্রাপ্ত ছিল, পরে উহা গবর্নমেন্ট স্কুলে পরিণত হইয়াছে।

এই স্থানে একটি প্রেস আছে। এই শান্তিপ্রেস হইতে মালিক শ্রীযুত স্বর্ণকমলবাবুর প্রযত্নে "শান্তি" নামে একখানি সংবাদপত্র বাহির হইত। সম্প্রতি উহা বন্ধ হইয়াছে। অত্রত্য লোন্-আফিসটি বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে।

মাদারিপুরের মাইনর মাদ্রাসা ও মস্‌জিদ, ঢাকার নবাব বাহাদুরের অর্থানুকূল্যেই চলিয়া আসিতেছে। সাধারণের সাহায্যও না আছে এমন নয়।

অত্রত্য কালীদেবী হিন্দু সম্প্রদায়ের যত্নে সংস্থাপিত। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাজমোহন চক্রবর্তীর উদ্যোগে কবিরাজপুরবাসী পার্বতীচরণ রায় মহাশয়ের অর্থে দেবীর প্রস্তরমূর্তি নির্মিত হয়। এই বাড়ি মহকুমার মধ্যে এক দর্শনীয় স্থান। মাদারিপুরের পশ্চিমাংশে লক্ষ্মীগঞ্জ নামক স্থানে মহাপ্রভু চৈতন্য ও নিত্যানন্দের কাষ্ঠনির্মিত প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। রাজনগরের রাজগণ এইস্থানের মালিক ছিলেন। এই প্রতিমা ও বলরামের শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত মূর্তি তাহাদের অর্থানুকূল্যেই সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাহাদের প্রদত্ত বাড়ি ও বৃত্তি দ্বারা এই বিগ্রহ সেবার সহায়তা আজিও চলিতেছে। উহা হাওলা পীতাম্বর সেনের অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয় রায় গোপালকৃষ্ণ অথবা তৎপুত্রের সময়ে, তাহাদের সাহায্যে বিগ্রহ সংস্থাপিত হয়। এই বৃত্তির ভূমিতে মাদারিপুরের প্রধান ব্যবসায়ী ও ধনী গোবিন্দ সাহা এবং লোকনাথ সাহার বাসভবন বলিয়া, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের সেবার ভার তাহারাই গ্রহণ করিয়াছেন। মোহন্তের নাম চণ্ডীচরণ শর্মা। পূর্বে যে ইষ্টকালয়ে বিগ্রহ সংস্থাপিত ছিলেন, উক্ত সাহাদ্বয় প্রচুর অর্থ ব্যয়ে সেই মন্দিরের নূতন সংস্করণ করিয়া উহা সুদর্শনীয় করিয়াছেন। সম্মুখে সুন্দর নাট-মন্দির। সাহাদের বাসভবন হর্ম্য দ্বারা পরিশোভিত। এতদ্ভিন্ন জগন্নাথ-বিগ্রহও রাজাদের বৃত্তি দ্বারা অর্চিত হইতেছেন। নদী কর্তৃক বলরামের আখড়া বিনষ্ট হইলে, ঐ বিগ্রহ আমিরাবাদ গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। অত্রত্য বণিক বাড়িটি দেখিতেও সুন্দর।

মাদারিপুরের বৈদিক পাঠক বাড়ি প্রসিদ্ধ। ইহাদের পূর্বপুরুষগণ পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতির কথকতা করায় পাঠক নামে পরিচিত হন। বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা এই বংশের রামকৃষ্ণ পাঠক বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। তদীয় উপার্জিত অর্থে বহু সৎকার্য সংসাধিত হইয়াছে। এই বংশের ভুবনমোহন পাঠক, বি.এ. বিখ্যাত লোক।

মাদারিপুর একটি প্রধান বাণিজ্য-স্থান। এই স্থানে যথেষ্ট পরিমাণ পাটের আমদানি ও রপ্তানি হয়। বহু দেশীয় ও ইংরেজ ব্যবসায়ীর পাটের গুদাম এই স্থানে ও তৎসংলগ্ন চরমুগরিতে দৃষ্ট হয়। ইতিপূর্বে যে সাহ মাদারের কথা বলা হইয়াছে, যাহার নাম হইতে মাদারিপুর নামের উৎপত্তি, স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ সন্ধ্যার সময়ে ধূপ দীপ প্রদানকালে তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন।[১১] এইস্থান বাণিজ্য ব্যবসায়ের উপযুক্ত বলিয়া কলিকাতা, আসাম, ঢাকা, গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থান হইতে নিয়তই স্টিমার গমনাগমন করিয়া থাকে।

আরিয়লখাঁর আক্রমণে মাদারিপুরের অনেকাংশ জলসাৎ হইয়া উহাকে অনেকটা শ্রীভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। বর্তমান সময়ে ইষ্টকনির্মিত ফৌজদারি ও মুন্সেফি আদালত, স্কুল, পোস্টাফিস এবং সব্‌ডিভিসনাল অফিসারের অবস্থানগৃহ প্রভৃতিই উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দালান আরও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। মাদারিপুর হইতে একটি বৃহৎ রাস্তা বরিশালের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

কুলপদ্দী

মাদারিপুরের সংলগ্ন। এইস্থানে বহু কলুজাতির বাস ছিল। এই সকল কলুর তৈলের ঘানি টানিতে যে সকল বলদ ব্যবহার হয়, উহা এতদ্দেশীয় অন্যান্য স্থানের বলদ অপেক্ষা সমধিক হৃষ্টপুষ্ট। কুলপদ্দীর অনেকাংশ আরিয়লখাঁর গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

মাইজপাড়া

মাদারিপুরের দক্ষিণে ; বরিশাল রাস্তার সন্নিকটে। এই গ্রাম ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি হিন্দুজাতির বাসস্থান। খালিয়া গ্রামবাসী রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পরে এই গ্রামবাসী হইয়াছিলেন। তাহার পুত্রদ্বয় শ্রীযুত হেমচন্দ্র ও শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যে নিযুক্ত আছেন। অত্রত্য ব্রাহ্মণ লস্কর বাড়ি প্রসিদ্ধ। তাহারা ভূম্যধিকারী। এই বাটিতে অনেক পদস্থ লোক আছেন তন্মধ্যে শ্রীযুত আশুতোষ লস্কর প্রসিদ্ধ। একটি ইংরেজি বিদ্যালয় আছে। কোন কোন স্থানে জঙ্গল থাকায় মধ্যে মধ্যে ব্যাঘ্রের উপদ্রব হইয়া থাকে। একটি ক্ষুদ্র মঠ আছে।

ধুলগাঁও

এই স্থানটিও বরিশাল রাস্তার সন্নিকট, ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান। রায়চৌধুরীগণ ইহার প্রাচীন অধিবাসী। এই বংশের চিন্তাহরণ রায়চৌধুরী মাদারিপুরে মোক্তারি কার্য করিয়া থাকেন। এই স্থানে একটি বৃহৎ দিঘি আছে।

খৈয়ারভাঙা

অধিবাসিগণের মধ্যে বৈদ্যই প্রধান। ইহার নিকটে একটি বৃহৎ সরোবর আছে। তাহা 'সেনাপতির দিঘি' বলিয়া পরিচিত। চৈত্র-সংক্রান্তি দিবসে বহু লোক তথায় উপস্থিত হইয়া স্নান করিয়া থাকে ও জলে মানত 'খৈ' দান করিয়া থাকে। তত্রত্য অমরচন্দ্র দাশ প্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপচন্দ্র দাশ সুসঙ্গের মহারাজের পারিবারিক চিকিৎসক। মধ্যম পুত্র ললিতমোহন দাশ মাদারিপুরে কবিরাজী করেন। অত্রত্য শরচ্চন্দ্র দাশ, বি-এল, ফরিদপুর জজকোর্টের অন্যতম উকিল।

ধুয়াসার

এই গ্রামটি বরিশাল রাস্তার সন্নিকটে, ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান। চৌধুরীগণ প্রসিদ্ধ। এই স্থানে পুষ্করিণী খননকালে একটি প্রস্তরনির্মিত বাসুদেব-মূর্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই স্থানে একটি দিঘি আছে। এই চৌধুরীগণ ও ধুলগাঁয়ের চৌধুরীগণ একবংশ-সম্ভূত। তাহাদের ও এই চৌধুরীগণের সম্বন্ধে একটি প্রাচীন কাহিনী এই দিঘির সহিত জড়িত রহিয়াছে। প্রবাদ এই চৌধুরীগণের সহিত অপর কোন ব্যক্তির বিষয়ঘটিত মোকদ্দমা ছিল। তাহার জয়পরাজয়ের উপর তাহাদের জীবনোপায়ের নির্ভর ছিল। চৌধুরী-পক্ষ হইতে যিনি মোকদ্দমার তদ্বিরের জন্য গমন করেন, তাহার সহিত একটি পোষা কবুতর দেওয়া হয় ; উদ্দেশ্য, জয় পরাজয়ের

বার্তা তাহারা সত্বর প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এদিকে তাহারা মোকদ্দমায় জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু শত্রুপক্ষ তাহাদের গোপনীয় তথ্য অবগত হইয়া, তৎসদৃশ্য আর একটি কবুতরের গলদেশে পরাজয়সূচক লিপি বদ্ধ করিয়া উহা উড্ডীন করিয়া দেন। কবুতব চৌধুরীদের প্রাঙ্গণে উপনীত হইলে, তাহারা উহার গলবদ্ধ চিঠি উন্মোচনপূর্বক পাঠ করিয়া অবগত হন যে মোকদ্দমায় তাহাদেরই পরাজয় হইয়াছে। তাহাতে এই চৌধুরী-বংশের যাবতীয় স্ত্রীপুরুষ দলবদ্ধ হইযা এই দিঘিতে প্রাণ বিসর্জন করেন। এই সময়ে একটিমাত্র কুলবধূ অন্তসত্ত্বাবস্থায় পিত্রালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি মাত্র জীবিত থাকেন। সেই গর্ভে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই এই বর্তমান চৌধুরী-বংশের বীজিপুরুষ। ধুলগাঁও ও ধুয়াসারের চৌধুরীগণ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ; তাহাদের সংস্থাপিত কুলীনগণ এই উভয় স্থানে বাস করিতেছেন।

ঘাটমাঝি

এই গ্রাম মাদারিপুবের নিকটবর্তী। এখানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় লোকের বাস আছে। এই স্থানের একটি পুরাতন ঘটনা উল্লেখ করা যাইতেছে। এই স্থান পূর্বে জালালপুর জমিদারির অন্তর্গত ছিল। তাহাদের কর্মচারি রতিরাম দাস ঐ জমিদারির মধ্যে এক বৃহৎ তালুক করিয়া লন। এজন্য জমিদারগণের সহিত তাহার মনোমালিন্য হয়। জমিদার মেঘা মিঞা রতিরামের তালুক লুণ্ঠন করিতে গমন করিলে উভয়পক্ষে একটি দাঙ্গা হয়। তাহাতে জমিদাব মেঘা মিঞা হত হন। এই সময়ে জমিদারের অধিকৃত বহুস্থান রতিরাম লুণ্ঠন করিয়া লন। এতৎসম্বন্ধে একটি গ্রাম্য কবিতা শুনা যায়।

"মেঘা মিঞা চেগা হইল বিধি হইল বাম।
ঘাটমাঝি লুটিয়া নিল বুড়া রতিবাম।।"

উল্লিখিত ঘটনার পবে মেঘামিঞার স্ত্রী, রতিরামের আত্মীয় তিতুরাম মিত্র ও ভীমদাস দ্বারা কৌশলে রতিবামকে আবদ্ধ করিয়া বলেন—'রতি যদি আমাকে বিবাহ করে, তবে তাহার মুক্তি . অন্যথা বতিকে হত্যা করা হইবে।' রতিরাম এই প্রস্তাবে স্বীকৃত না হওযায, তাহাকে বধ করা হয়।

ফাসিয়াতলা

আরিয়লখাঁর তীববর্তী এই স্থানে বহুকালের একটি হাট আছে। উহার নাম "ফাসিয়াতলার" হাট। এই সম্বন্ধে এক কিংবদন্তী অবগত হওয়া যায় যে, ইংরেজ অধিকারের প্রথমাবস্থায় রাজদণ্ডে দণ্ডিত এক ব্যক্তির ফাঁসি এইস্থানে হইয়াছিল. এইজন্য উহার নাম হয় 'ফাসিয়াতলা'। তৎকালে ডাকাইতির সংস্রবে যে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইত, উহাদিগকে ডাকাইতির স্থানে লইয়া যাইয়া ফাঁসি দেওয়া হইত। বহুকাল যাবৎ আরিয়লখাঁ নদী ডাকাইতগণের লীলাক্ষেত্র ছিল। এইস্থান হইতে প্রচুর লোনা ইলিশ মৎস্য বিদেশে বপ্তানি হইযা থাকে।

খাজুরতলা ও কাল্‌কিনী

কাল্‌কিনীর উসুল-তহশীলের জন্য গবর্নমেন্ট কর্তৃক খাজুরতলাতে একটি কাছারি সংস্থাপিত হয়। একজন ডেপুটিকালেক্টর উক্ত কার্যে নিযুক্ত হইয়া তথায় অবস্থান করিতেন। এই জন্য তথায় একটি হাটও বসিয়াছিল। আনন্দচন্দ্র বসু ডেপুটি কালেক্টব কর্তৃক এই স্থানের বিশেষ উন্নতি সংসাধিত হয়। আরিয়লখাঁ হইতে একটি ধারা ফাসিয়াতলার নিম্ন দিয়া বরাবর দক্ষিণদিকে প্রধাবিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র স্রোতোধারা বেগবতী হইয়া গৌরনদী প্রভৃতি বহু

জনপদ উদরসাৎ করে। সেই সকল গ্রাম পুনরায় চর পড়িয়া যে স্থানের উৎপত্তি হয় তাহাই 'কাল্‌কিনী' নামে অভিহিত হয়। খাজুরতলা ও কাল্‌কিনীর চর এই উভয়ের মধ্যে এখন একটি ক্ষীণতোয়া স্রোতস্বতী বিদ্যমানা আছে। গবর্নমেন্টের খাস মহাল কাল্‌কিনীতে প্রায় লক্ষ টাকা আদায় হইয়া থাকে। অধিকাংশ অধিবাসীই নমশূদ্র ও মুসলমান।

বাজিতপুর

এই গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বাস করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মজুমদার বংশ প্রসিদ্ধ। এই বংশের আদিপুরুষ আত্মারাম সান্যাল বরেন্দ্রভূমি হইতে রাজকার্য ব্যপদেশে এই দেশে আগমন করিয়া এখানেই বাস স্থাপন করেন। নবাব সরকারের কার্যদ্বারা তিনি কতক ভূসম্পত্তি ও মজুমদার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার প্রাচীন বাড়িতে একটি বৃহৎ সরোবর ও প্রাচীন ইষ্টকালয় অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, প্রভৃতি এই বাড়িতে বাস করেন। আত্মারামের বংশধরগণ মধ্যে কেহ এই গ্রাম মধ্যে নূতন বাড়ি নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেছেন ; এই বাড়ির ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তন্মধ্যে একটি অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। অপর চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ করুণাকান্ত মজুমদার, দ্বিতীয় রাজকুমার, তৃতীয় দীনবন্ধু ও চতুর্থ সূর্যকান্ত জীবিত থাকেন। মুক্তাগাছার জমিদার কাশীকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রী লক্ষ্মীদেব্যা চৌধুরাণী এই সূর্যকান্তকে দত্তক গ্রহণ করেন। এই মহাত্মাই মহাবাজ সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী বাহাদুর, পরে ময়মনসিংহের মহারাজ নামে পরিচিত হন। সূর্যকান্ত লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়াও বীণাপাণির অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন না, তৎপ্রণীত শিকার-কাহিনী গ্রন্থই উহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সূর্যকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় অগ্রজ রাজকুমার মজুমদার মহাশয়কে জমিদারির সর্বপ্রধান তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত কবেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজকুমার যথাবিধানে সুশৃঙ্খলার সহিত স্বপদোচিত কার্য সমাধা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, এই কারণে মহারাজ সূর্যকান্ত তাহাকে কতকগুলি বিষয় সম্পত্তি করিয়া দেন। এতদ্ভিন্ন মহারাজের সাহায্যে রাজকুমার আপনার জ্যেষ্ঠ তনয়া ইন্দুবালাকে ময়মনসিংহের রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীব সহিত ও দ্বিতীয়া কন্যাকে রাজসাহী খাজুরাবাসী ভোলানাথ খাঁর সহিত বিবাহ দেন। এই উভয় কার্যে যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে কুলীন ও ঘটক নিমন্ত্রিত হইয়া যথোচিত বিদায় প্রাপ্ত হন। আমরা যে ইন্দুবালা দেবীর নাম উল্লেখ কবিলাম তিনি একজন বিদুষী গ্রন্থরচয়িত্রী।

মহারাজ স্বীয় গর্ভধারিণী মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় বাজিতপুর গ্রামে সংস্থাপিত করিয়া সমুদয় ব্যয় স্বযং বহন করিয়াছেন। উহাতে যে এই স্থানের যথেষ্ট উপকার সংসাধিত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। মহারাজের অর্থানুকূল্যে ও রাজকুমার মজুমদার মহাশয়ের উদ্যোগেই এই সকল কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহার অল্পকাল পরেই রাজকুমার মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজকুমার দ্বারা হিন্দু ধর্মানুমোদিত বহু সৎকার্য সংসাধিত হয।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার মজুমদার তাহাদের পিতৃদেব রাজকুমার মজুমদার মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ বহু সমারোহে সম্পন্ন করেন। উহাতে দানসাগর কার্যের অনুষ্ঠান হয় এবং বহু লোককে পরিতোষ সহকারে ভোজ্য প্রদানের এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় স্বীয় পিতৃদেব রাজকুমারের নামে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

মস্তাফাপুর

এই গ্রামটি মাদারিপুরের অনতিদূরে কুমার নদের তীরে সংস্থাপিত। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের বাস নিবন্ধন গ্রামটি উন্নত। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মজুমদারগণ প্রসিদ্ধ; বৈদ্যদের মধ্যে কয়েকজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। এই স্থানে একটি মঠ আছে। সম্ভবত আলিবর্দিখাঁর প্রধান সেনাপতি মস্তাফাখাঁর নাম অনুসারে এই স্থানের নাম হইয়াছে।

রাজোর ও গোবিন্দপুর

এই উভয় স্থানে অনেক ব্রাহ্মণ বাস করিয়া থাকেন। রাজোর গ্রামে পূর্বে একটি পুলিশ আউট-পোস্ট ছিল। গোবিন্দপুর গ্রামে একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্থানে একজন ফৌজদার অবস্থান করিতেন। সেনদিয়ার মজুমদার বংশের পূর্বপুরুষ বাণীনাথ মজুমদার গোবিন্দপুরে যে তারা দেবীর বিগ্রহ সংস্থাপন করেন, উহা অদ্যাপি বর্তমান আছেন। মজুমদার বংশের বৃত্তিদ্বারা তাহার অর্চনা চলিতেছে।

সেনদিয়া

বৈদ্য বিষ্ণুদাশবংশীয় শ্রীনায়ক দাশ মহাশয়ের, জানকীবল্লভ, বাণীনাথ, গৌরীনাথ, রমানাথ ও লক্ষ্মীনাথ নামে পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জানকী স্বীয় ক্ষমতায় খুলনার অন্তর্গত খড়রিয়া পরগণার জমিদারি লাভ করেন,[১২] কিন্তু তাহার আশঙ্কা হয়, পাছে কনিষ্ঠগণ উহার অংশ দাবি করিয়া বসেন। রমা ও লক্ষ্মী ইতিপূর্বেই কালগ্রাসে পতিত হন; এখন বাণী ও গৌরী এই দুই শিশুভ্রাতাও যাহাতে সেই পথের বশবর্তী হন জানকীবল্লভ তাহার চেষ্টাতেই ব্রতী হইলেন। জানকীর পত্নী কিন্তু উহা লক্ষ্য করিয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়েন, কারণ পতির এই বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণকে তিনিই মাতৃস্থানীয়া হইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখন অনন্যোপায় হইয়া, এক বৃদ্ধ ভৃত্যকে বশ করিয়া, তদ্দ্বারা যাহাতে এই শিশুদ্বয় দূরদেশে প্রস্থান করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। কার্যে তাহাই হইল; এক তমসাবৃত নিশিতে ভৃত্য এই দুই শিশুকে লইয়া স্বদেশ হইতে প্রস্থান করিল। প্রবাদ, জানকীবল্লভের স্ত্রী ভৃত্যকে বলিয়া দেন যে, সে যেন উহাদিগকে লইয়া ভূষণার রাজমহিষীর করে সমর্পণ করে; তিনি অবশ্যই তাহাদের সম্বন্ধে যে কোন সুবিধা করিয়া দিতে পারিবেন। ভৃত্য আদেশমত কার্য করিল। ভূষণার রাণী ইহাদিগকে অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিলেন, এবং তাহারা যাহাতে উত্তরকালে ক্ষমতার্জন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন, তদুপযোগী বিদ্যার্জনের উপায়ও নির্দেশ করিয়া দিলেন।

দিন কাহারও সমভাবে বিগত হয় না। বয়োবৃদ্ধির সহিত বাণী ও গৌরী কৃতবিদ্য হইয়া, বিষয় কর্মানুসন্ধানের জন্য রাণীর নিকট বিদায় গ্রহণান্তর তৎকালীন রাজধানী ঢাকাতে উপনীত হন। এই সময় গোবিন্দপুর গ্রামে একজন ফৌজদার অবস্থান করিতেন। বাণী তদধীনে এক কার্য গ্রহণ করিয়া, গোবিন্দপুরে আগমন করেন। তদীয় কার্যকুশলতায় পরিতুষ্ট হইয়া ফৌজদার তৎপ্রতি যারপরনাই অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ফৌজদারের সহায়তাতেই তিনি ফতেজঙ্গপুর পরগণার তিন আনা পাঁচ গণ্ডা জমিদারি লাভ করিতে সমর্থ হন এবং গোবিন্দপুরেই প্রথম বাসস্থান নির্মাণ করিয়া তথায় তারাদেবী মূর্তি সংস্থাপন করেন। এই সময়ে বাণীনাথের 'মজুমদার' উপাধি লাভ হইয়াছিল। বাণীনাথের এই জমিদারি, কবিশেখর নামের সহিত জড়িত দেখিয়া, বোধ হয় যে উহা তদীয় পৌত্র কৃষ্ণদেব কবিশেখরের নামে গৃহীত হইয়াছিল। এই কবিশেখর গোবিন্দপুর পরিত্যাগ করিয়া কানুড়িয়াতে বাস স্থাপন করেন। পরে বাণীর দ্বিতীয় পুত্র রত্নেশ্বর গোবিন্দপুর পরিত্যাগ করিয়া সেনদিয়া আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

সেনদিয়া অতি ক্ষুদ্র স্থান, ইহার চতুর্দিক গড়ে পরিবেষ্টিত। তন্মধ্যে একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা বিদ্যমান দেখা যায়। কিংবদন্তী, উহা মুকুটরায় নামক জনৈক সমৃদ্ধিসম্পন্ন লোক কর্তৃক নিখাত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের নানা স্থানে মুকুট রায় নামধারী বহু লোকের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে কে এই মুকুট রায় ছিলেন উহা নির্দেশ করা সহজ সাধ্য নয়। কেহ কেহ এই দিঘি মজুমদারগণের খনিত বলিয়াও নির্দেশ করিয়া থাকেন। এক সময়ে এই সরোবরে যে ইষ্টক নির্মিত ঘাট ছিল তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই মজুমদার বংশে রামচন্দ্র কর্ণাভরণ ও বিষ্ণুরাম কবিরাজচন্দ্র মজুমদারের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন আরও পণ্ডিত এই বংশে ছিলেন বলিয়া তাহারা গৌরব করিয়া এই স্থানকে, সেন-দিয়া বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিতেন। কবিরাজচন্দ্র মজুমদার সেনদিয়া জন্মগ্রহণ করিলেও পশ্চাৎ খান্দাবপাড় গ্রামে যাইয়া বাস করেন। এতন্নিবন্ধন তাহার ও তদ্বংশধরগণের বিবরণ খান্দারপাড়ের বিবরণে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকিবে।

রামচন্দ্রের পুত্র রঘুরাম ও মধুসূদন। কিন্তু শুধু জমিদারির অংশ প্রাপ্ত হন নাই। তাহার অংশে একখানা তালুক মাত্র ছিল। মধু মজুমদার সম্বন্ধে এই কিংবদন্তী শ্রুত হওয়া যায় যে, তিনি অপরিমিত ভোজন কবিতে পারিতেন। বিবাহ রাত্রিতে বাসরঘরে নবপরিণীতা অকস্মাৎ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভয়ে চীৎকার করায় বাটিস্থ জনগণ তথায় সমবেত হইয়া চীৎকারের কারণ অবগত হন। অনেকেই মধুর পরিচয় অবগত ছিলেন; একডোল খৈ ও ৩/৪ কাঁদি কলা দ্বারা ফলাহার করা যে মধুর পক্ষে কোনরূপ আশ্চর্যের কথা নয়, এই কথা তাহারা বধূকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলায়, মধুর স্ত্রী আশ্বস্তা হন।

শ্রুত হওয়া যায় যে বাণীনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণ কণ্ঠাভরণ ভ্রাতাদিগকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া সমুদয় সম্পত্তি হস্তগত করেন। পরে কণ্ঠাভরণের সর্বকনিষ্ঠ রত্নেশ্বরের পৌত্র রঘুরাম মজুমদার উহার উদ্ধার সাধন করিয়া কতক অংশ বাহির করিয়া লন। তদবধি তদীয় সন্তানগণ এই জমিদারি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। রামচন্দ্র কর্ণাভরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুরামের চারি পুত্র উহা সমানভাবে প্রাপ্ত হইলেও তদীয় তৃতীয় পুত্র রামশঙ্কর এই জমিদারির অন্তর্গত এক বিস্তৃত তালুক করিয়া অন্যান্য অংশীদারগণের অপেক্ষায় বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হন।

জপসাবাসী লালা রামপ্রসাদের চতুর্থ পুত্র লালা রাজনারায়ণের সহিত রামশঙ্কর মজুমদারের কন্যার এবং রামশঙ্করের পুত্র কীর্তিনারায়ণ মজুমদারের কন্যার সহিত রাজনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র কবিবর লালা জয়নারায়ণের পুত্র জগচ্চন্দ্র বাবুর পরিণয় কার্য সম্পন্ন হয়। কীর্তিনারায়ণ অতি তাপস লোক ছিলেন, অধিক বয়সে জপসা গ্রামে তাহার মৃত্যু সংঘটিত হয়। তৎসম্বন্ধে যে সকল বিবরণ মদীয় পিতা ও পিতৃব্যগণ এবং অন্যান্য প্রাচীন লোকের নিকট অবগত হইতে পারিয়াছি উহা নিম্নে বিবৃত করা হইল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, কীর্তিনারায়ণ সর্বদাই তপস্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। যৎকালে স্বদেশে থাকিতেন তখন প্রায়ই পূর্বপুরুষ সংস্থাপিত গোবিন্দপুরের তারাদেবীর আলয়ে এবং যখন জপসা আসিতেন তৎকালে লালা জয়নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত কালীদেবীর মন্দিরেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি প্রচুর আহার করিতে সমর্থ ছিলেন। অশীতি বৎসর অতিক্রান্ত হইলে, তাহার অন্নাহারের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা হয়, তদ্দৃষ্টে তিনি তাহার তনয়া শশীদেবীকে (জগচ্চন্দ্রবাবুর স্ত্রীকে) বলেন, 'আমার আসন্নকাল উপস্থিত, অতি শীঘ্রই আমার জীবনাবসান হইবে, তোমার ভ্রাতাকে সত্বর এই স্থানে আসিতে পত্র প্রেরণ কর।' তদুত্তরে কন্যা বলিলেন, 'আপনি কি বলিতেছেন? এক সেরের স্থানে তিন পোয়া অন্ন হওয়াতেই

আপনার মৃত্যু হইবে! আপনি এখন যে পরিমাণ খাইয়া থাকেন উহার একচতুর্থাংশ খাইয়া কত লোক বাঁচিয়া রহিয়াছে।' কীর্তিনারায়ণ আর কোন কথা না বলিয়া স্বয়ং নিজ বিবরণ পুত্রকে লিখিলেন, পুত্রও ভগ্নীর ন্যায় এই অবস্থায় মৃত্যু অসম্ভব বিবেচনায়, বৈষয়িক কার্য সমাপনান্তে কিছুদিন পরে পিতৃসকাশে যাইবেন স্থির করিয়া, পিতৃদেবকে তাহাই লিখিয়া পাঠাইলেন।

এই চিঠি প্রাপ্ত হওয়ার পর দিবস অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া কীর্তিনারায়ণ প্রাতস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে সূর্যোদয় হইলেই যখন সকলে গাত্রোত্থান করিল, তখন তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা সকলে শীঘ্র সমবেত হও অদ্য আমার শেষদিন উপস্থিত।' এই কথায় সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়া কেহ বিশ্বাসে, কেহ অবিশ্বাসে, তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এই কথা ক্রমশ গ্রামময় রাষ্ট্র হইলে সকলেই কীর্তিনারায়ণকে শেষ দেখার জন্য আসিয়া উপস্থিত। লালার বাড়িতে যেন হাট বসিয়া গেল ; শুনিয়াছি আত্মীয় স্বজন সকলেই উপস্থিত কিন্তু কীর্তিনারায়ণের ভাগিনেয়-পুত্র বিশ্বনাথ বাবুর স্ত্রী তখন পর্যন্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হন নাই। তাহার সহিত দেখা না করিয়া বা তাহাকে আশীর্বাদ না করিয়া বৃদ্ধ যাইতে পারেন না, কিছু পরেই তিনি আসিয়া বৃদ্ধের পদধূলি গ্রহণ করিতেই, আর বিলম্ব করা উচিত নয় বলিয়া কীর্তিনারায়ণ বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। ক্রমে তিনখণ্ড অতিক্রম করিয়া যখন চতুর্থ তোরণে উপনীত হইলেন, তখন আর তাহার স্বয়ং হাটিয়া যাইবার বল থাকিল না, তাহারই আজ্ঞামত তাহার দুইজন সজাতি তাহার বাহু তাহাদের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া চলিতে লাগিলেন। তাহার ইচ্ছা ছিল স্বয়ং পদব্রজেই কালীদেবীর মন্দিরে উপনীত হন কিন্তু বিশ্বনাথের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ উপলক্ষে বিলম্ব হওয়ায় তাহা আর পারিয়া উঠিলেন না।

এই সময়ে তিনি কন্যা ও জামাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ কালীদেবীর বাড়িতেই যেন আমার সৎকার কার্য শেষ হয় ; আর যে ভূমিতে আমাকে দাহ করা হইবে, উহা আমার নিজস্ব হওয়া চাই, এই পাঁচগণ্ডা কড়ি, আমি দিতেছি, তৎপরিবর্তে আমাকে কতকটুকু জমির স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দেও। তাহারা আসন্নকাল নিকটবর্তী বলিয়া আর কোন কথা না বলিয়া কতকটুকু জমি নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কীর্তিনারায়ণ কালীবাড়িতে উপস্থিতান্তে দেবীর নিকট বসিয়া কিঞ্চিৎকাল জপ করিয়া পুনরায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া তত্রত্য পঞ্চবটী মূলে কুশাসনে শয়ন করিয়াই বলিলেন, আমি চলিলাম এখন তোমরা তোমাদের কার্য সম্পাদন কর। ইতিপূর্বেই তথায় জনতা সমবেত হইয়া হরিসংকীর্তন, কালী কীর্তন চলিতেছিল, কীর্তিনারায়ণের দেহাবসানের সহিত উহা শতগুণে বর্ধিত হইয়া, দূরদূরান্তরে তাহার স্বর্ণগমন বিঘোষিত করিয়া দিল। কীর্তিনারায়ণের পুত্র তথায় উপস্থিত না থাকিলেও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র তারিণীপ্রসাদ স্বীয় মাতামহ ভবন এই লালাবাবুর বাড়িতেই অবস্থান করিতেছিলেন, তিনিই তাহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য সম্পাদনের ভার প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য সজাতির সহায়তায় তাহার শেষকার্য সম্পাদন করেন।

কীর্তিনারায়ণের পুত্র রামকিশোর মজুমদার তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ঘোর বিষয়ী লোক ছিলেন। তৎপুত্র রাধামাধব কিন্তু পিতামহের ন্যায়ই জপ ও তপেই নিযুক্ত থাকিতেন। এই রাধামাধব মজুমদার মহাশয়ের যথাক্রমে পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে স্বদেশহিতৈষী বাগ্মীপ্রবর অনারেবল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার চতুর্থ। এই বংশের সকলেই বিশেষ বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠভ্রাতা রাসবিহারী মজুমদার, বি, এল, তদীয় মধ্যমভ্রাতা পার্বতীচরণ মজুমদার মহাশয়ের পুত্র যতীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের পুত্র চারুচন্দ্র মজুমদার, বি. এল, ওকালতি কার্যে এবং অম্বিকা মজুমদার

মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র কিরণচন্দ্র মজুমদার বি, এ, শিক্ষা ও তদীয় তৃতীয় পুত্র হেমচন্দ্র মজুমদার, বি, এল্. কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি কার্যে নিযুক্ত আছেন। অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গুরুচরণ মজুমদার মহাশয়ের প্রণীত একখানি গ্রন্থ আছে, তৎপুত্র শীতলচন্দ্র মজুমদার বি. এ.। মধুসূদন মজুমদার মহাশয়ের বংশে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মজুমদার যশোহরের জজকোর্টের সেরেস্তাদারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শশধর মজুমদার, বি-এ, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কীর্তিনারায়ণ মজুমদার মহাশয়ের ভ্রাতা কালীপ্রসাদ মুন্সী মজুমদার উপযুক্ত লোক ছিলেন। মুন্সী মজুমদারের বংশধর চন্দ্রকুমার মজুমদারকে অনেকেই পরিজ্ঞাত আছেন।

বহুকাল পর্যন্ত সেনদিয়া গ্রামে বৈদ্যবংশ মধ্যে একমাত্র মজুমদার বংশই অবস্থান করিতেছিলেন, পরে শক্তিগোত্রজ হিঙ্গুবংশীয় মহিমাচন্দ্র রায় ও শ্রীযুত দুর্গাচরণ রায় সিদ্ধকাঠি গ্রাম হইতে এবং শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ রায় খান্দারপাড় গ্রাম হইতে আসিয়া এই গ্রামে বাস স্থাপন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন দুই তিন ঘর ব্রাহ্মণ মাত্র এই স্থানে বাস করেন। জনহীনতা প্রযুক্ত স্থানীয় গৌরব ততটা পরিস্ফুট নয়।

খালিয়া

ফরিদপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম, ইহা মাদারিপুর সবডিভিসনের অন্তর্গত। মাদারিপুর হইতে খুলনা পর্যন্ত স্টিমার গমনাগমনের জন্য যে খাল কাটান হইয়াছে, উহার অনতিদূরে এই গ্রাম অবস্থিত। খালিয়া গ্রাম হইতে একটি খাল দক্ষিণমুখ হইয়া পরে পশ্চিমে বিলের দিকে এবং অপর একটি খাল পূর্বদিক দিয়া বিলের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সম্প্রতি স্টিমার চলাচলের জন্য 'বিলরুট' হওয়ায় এই খালগুলি ক্রমশই মজিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। কালে খালগুলির লোপনিবন্ধন গ্রামবাসিগণের যে বিশেষ অসুবিধা হইবে তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই।

খালিয়া ফতেজঙ্গপুর পরগণার অন্তর্গত এই স্থানে পরগণার জমিদার ব্রাহ্মণ চৌধুরীগণের বাসস্থান।[১৩] এই পরগণায় পাঁচ ভাগের দুই ভাগের মালিক চৌধুরীগণ, ইহাদের পূর্বপুরুষ রাজারাম রায়চৌধুরী এই জমিদারি অর্জন করেন। এক সময়ে তদীয় বংশীয়গণ বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত এই জমিদারি সংরক্ষণ করিয়া নানাবিধ সৎকার্য করিয়া গিয়াছেন। দাঙ্গাবাজ বলিয়া ইহারা সুপরিচিত ছিলেন। প্রবাদ, বিখ্যাত জমিদার রামরতন রায় কোন পদস্থ লোককে বন্দি অবস্থায়, খালিয়ার চৌধুরীগণের জমিদারির মধ্য দিয়া লইয়া যাইতেছিলেন ; চৌধুরীগণ উহা অবগত হইয়া এই প্রবল জমিদারের বিক্রম গ্রাহ্য না করিয়া সেই বন্দিকে মুক্ত করিয়া লইয়া যথাস্থানে প্রেরণ করেন। বর্তমান অবস্থায় এই জমিদারি বহু অংশে বিভক্ত হওয়ায়, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, এই কারণে উহার কতকাংশ বৈদ্য ও কায়স্থ ধনিগণের হস্তগত হইয়াছে।

এই চৌধুরীগণ রাঢ়ীয় ডিংসাই শ্রোত্রিয় এবং ভরদ্বাজ গোত্রসম্ভূত, এইজন্য মুখোপাধ্যায় বংশ ব্যতীত বাঢ়ী শ্রেণীর অপরাপর কুলীনগণের সহিত ইহাদের যথেষ্ট কার্য সম্পাদিত হইয়াছে। কন্যা কুলীনে সম্প্রদান করিয়া বহু কুলীন স্বগ্রামে সংস্থাপন করিয়াছেন। রাঢ়ীয় শ্রেণীর যে যে স্থানে বড় সমাজ আছে, খালিয়ার কুলীনগণের সহিত কার্য নাই এমন স্থান অতি বিরল। এই জন্য এই গ্রাম সর্বত্র সুপরিচিত।

খালিয়ার চট্টোপাধ্যায় বংশ রায় চৌধুরী বংশের সহিত নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। স্বর্গীয় কৃষ্ণজীবন চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস বরিশাল জেলার অধীন বার্থীগ্রামে ছিল ; কৃষ্ণজীবনের পুত্র রামনাথ, প্রথম জমিদার রাজারাম চৌধুরী মহাশয়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া খালিয়াতে

বাস করেন। তাহার তিন পুত্র ; অযোধ্যারাম, কৃষ্ণচন্দ্র এবং নারায়ণচন্দ্র। ইহাদের বংশধরগণ খালিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। এই চট্টোপাধ্যায় বংশে বহু কৃতী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, যখন অতি অল্পলোকেই পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে সাহসী হইত, তখন এই চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, দিল্লি, হামিরপুর, বান্দা, কটক প্রভৃতি সুদূর প্রবাসে যাইয়া রাজকার্য সম্পাদন করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে ইহার পৌত্র কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রপৌত্র অমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জীবিত আছেন।

দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতা কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্রগণ মধ্যে রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ইনি পরে খালিয়া হইতে বাসস্থান পরিবর্তন করিয়া মাদারিপুরের নিকটবর্তী মাইজপাড়া গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় বাস করেন। রজনীবাবু ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে বি-এ পাশ করিয়া তৎকালীন ছোটলাট ক্যাম্বেল সাহেব প্রবর্তিত প্রতিযোগী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। তৎকনিষ্ঠ ভ্রাতা উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, বি, এল মুন্সেফ ছিলেন। এই সময়ে খালিয়া বরিশাল জেলার অন্তর্গত ছিল। উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় তৎকালে বরিশাল জেলার প্রথম এম-বি ছিলেন। কৃষ্ণকান্তের অপর পৌত্র শ্রীযুক্ত নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায় বি-এল, ওকালতি কার্য করিতেছেন। এই চট্টোপাধ্যায় বংশের অপর শাখার রায় গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এম-এ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটি পদে নিযুক্ত ছিলেন।

কৃষ্ণজীবন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশধর রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চৌধুরী বংশের নীলকান্ত রায় মহাশয়ের কন্যা বিবাহ করিয়া খালিয়াতে বাস করেন। তদীয় বংশের আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় পুলিশে কার্য করিতেন, আনন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন।

বর্তমান সময়ে চট্টোপাধ্যায় বংশের রেবতীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি কার্যে এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ, কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন। শ্রীযুত বিমালচরণ চট্টোপাধ্যায় মুন্সেফী কার্যে নিযুক্ত আছেন।

গঙ্গোপাধ্যায় বংশও চৌধুরীগণের সহিত কার্য সূত্রে এই গ্রামে বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে স্বর্গীয় কৈলাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বহু দিবস বরিশালের কালেক্টরি বিভাগে কার্য করিয়া পরে ঐ বিভাগের সেরেস্তাদারি পদে উন্নীত হন। ইনি অতি যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। যে সময়ে কালেক্টরি পদে অবস্থান করিয়া বিভারিজ সাহেব বরিশালের ইতিহাস প্রণয়ন করেন, সেই সময়ে কৈলাস গঙ্গোপাধ্যায় তাহার এই গ্রন্থ প্রণয়ন ব্যাপারে বহু সহায়তা করিয়াছিলেন। বিভারেজ স্বীয় গ্রন্থের ভূমিকায় উহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তদীয় পুত্রগণ সকলেই কৃতবিদ্য। তন্মধ্যে শ্রীযুত প্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ, রায় বাহাদুর ডেপুটি কালেক্টরি কার্য এবং অপর পুত্র শ্রীযুত অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল ওকালতি কার্য করিতেছেন।

গ্রামের ভূম্যধিকারী বংশ বৃত্তি, ব্রহ্মত্র দান করিয়া এই সমুদয় কুলীন সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অধুনা চৌধুরীবংশ হইতেও এই কুলীনগণ মধ্যে অনেক সম্পন্ন লোক দেখা যায়। চৌধুরীবংশে বহু কীর্তিমান লোক জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন ; তন্মধ্যে স্বর্গীয় কালীকিঙ্কর রায় মহাশয় অগ্নিহোত্র করেন ; এতদ্ভিন্ন তৎপ্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণা দেবীর নাম উল্লেখ করাও কর্তব্য। কাশী হইতে শিল্পী আনয়ন করিয়া এই অষ্টধাতু নির্মিত দেবীমূর্তির নির্মাণ

করা হয়। এতদ্ভিন্ন স্বর্গীয়া ইন্দ্রমণি চৌধুরাণী কালীমূর্তি সংস্থাপিত করিয়া ঐ দেবীর অর্চনার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। রাজারাম নির্মিত মঠ ও উহাতে সংস্থাপিত গোবিন্দদেবের কথাও উল্লেখযোগ্য। এই বংশের দীপচন্দ্র রায়চৌধুরী ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমান সময়ে চৌধুরী বংশে কয়েকটি গ্রাজুয়েট বর্তমান আছেন।

ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পরেই অত্রত্য বৈদ্যগণের কথা উল্লেখযোগ্য। এই বৈদ্যগণ কবিরাজ ব্যবসায়ী, চৌধুরীগণ স্বগ্রামে ইহাদিগকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। তাহারা ইহাদিগকে এরূপ যত্ন করিতেন যে, শারদীয়া পূজার প্রথমক্ষণেই ইহাদের দেবীর বোধন হইলে, তবে চৌধুরীগণের বাড়ির পূজা আরম্ভ হইত। এই কবিরাজ বংশের স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র সেন কবিরাজ মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তৎসদৃশ অতিথিপবায়ণ লোক অতি অল্পই দৃষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে বহু আশ্চর্য কিংবদন্তী পরিশ্রুত হওয়া যায়। বাহুল্য প্রযুক্ত উহা আর লিপিবদ্ধ হইল না। তদীয় পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সেন কবিরাজ ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেন কবিরাজ বর্তমান আছেন। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেন কলিকাতার মহামহোপাধ্যায় কবিরাজপ্রবর দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ক্ষেত্রনাথ বহুকাল স্বদেশে চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন ও পরোপকার সাধন করিয়াছেন। দেশের জলকষ্ট সন্দর্শনে তিনি স্বব্যয়ে একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছেন। বর্তমান সময়ে ক্ষেত্রনাথ আর দেশে অবস্থান করেন না। কাশীধামের যোগাশ্রমেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া আশ্রম কার্যের সাহায্য করিয়া থাকেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহনচন্দ্র সেন কবিরাজ মহাশয়ের অতি আশ্চর্য নাড়ীজ্ঞান ছিল। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন, এল. এম, এস্ ডাক্তারি কার্য করিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ইহারা সাধারণের নিকট মহলানবীশ বলিয়া পরিচিত।

বল্লভদী ও শিরখাড়া

এই উভয় স্থানে বহু ভদ্রলোক বাস করেন। বল্লভদীর বৈদ্যগুপ্ত ও কাকরের সেনদের পূর্বপুরুষগণ জমিদার সরকারে কার্য করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত এই উভয় স্থানে বাস করিতেন। শশিকুমার ও প্রসন্নকুমার গুপ্ত ভ্রাতৃদ্বয় যথাক্রমে ঢাকা ও মাদারিপুরে মোক্তারি কার্য করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়াছেন। বল্লভদীর সেন পরিবার প্রসিদ্ধ। তদ্বংশীয় তারিণীচরণ সেন একজন কৃতবিদ্য ও সুলেখক ছিলেন। এক সময়ে তৎকর্তৃক "বঙ্গজীবন" নামীয় একখানি মাসিকপত্র পরিচালিত হইত। তৎপ্রণীত "সহানুভূতি" নামক গ্রন্থ যাহারা পাঠ করিয়াছেন তাহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, তারিণীচরণ একজন ভাবুক ও সুলেখক ছিলেন। দুঃখের কথা এই যে, এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়া বাহির হইবার অব্যবহিত পূর্বেই গ্রন্থকার মানবলীলা সংবরণ করেন। এই গ্রন্থখানার সুসমালোচনা তিনি পরিজ্ঞাত হইয়া যাইতে পারেন নাই। অর্থাভাবপ্রযুক্ত দুঃস্থ গ্রন্থকারগণ, তাহাদের বিরচিত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন, তাহার ভাগ্যে যে সমুদয়ই ঘটিয়াছিল। শিরখাড়া গ্রামে বহু লোক বাস করিয়া থাকেন। এই উভয় স্থান রাজনগর স্টেটের অন্তর্গত ছিল।

কাজুলিয়া

গোপালগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম। বৈদ্যকুলীন বিষ্ণুদাস বংশোদ্ভব জানকীবল্লভ বিশ্বাস, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অধীনে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যেরূপে খড়রিয়া পরগণা প্রাপ্ত হন তদ্বিবরণ পরগণার ইতিবৃত্তে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, অতএব পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

জানকীবল্লভের প্রথম পুত্র রামভদ্র কবিকর্ণপুর, দ্বিতীয় পুত্র বলভদ্র কবীন্দ্রচন্দ্র।

কবীন্দ্রচন্দ্রের বংশধরগণ জমিদারি দশ আনা অংশের এবং কবিকর্ণপুরের সন্তানগণ পরগণার ছয় আনা অংশের মালিক ছিলেন। কালক্রমে এই পরগণার রাজস্ব অনাদায় হেতুতে তৎকালীন আইন অনুসারে রেভিনিউ বোর্ডে নিলামে উঠিলে, কলিকাতা হাটখোলা (নিমতলা) নিবাসী কাশীনাথ দত্ত উহা ক্রয় করেন, এই দত্ত ইতিপূর্বে গবর্নমেন্টের পক্ষ হইতে এই পরগণার উসুল তহশীলের ভার প্রাপ্ত হন।[১৪]

জমিদারি হস্তান্তরিত হইলে কর্ণপুরের পৌত্র রামদেব কর্ণাভরণের বংশধরগণ আর এই পরগণায় বাস করা যুক্তিসঙ্গত নয় মনে করিয়া খড়রিয়ার অন্তর্গত মুলঘর গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, ফতেজঙ্গপুর পরগণার অন্তর্গত কাজুলিয়া গ্রামে আসিয়া গৃহ স্থাপন করেন। বৃহৎ বিলের মধ্যে এই গ্রাম সংস্থাপিত। তাহারা ফতেজঙ্গপুর পরগণার মালিক না হইলেও ঐ পরগণা মধ্যে এক বিস্তৃত তালুক করিয়া লইতে সক্ষম হন, উহার রাজস্ব জমিদার সরকারে প্রদান না করিয়া একেবারে গবর্নমেন্টের কালেক্টরিতেই প্রদত্ত হইয়া থাকে। কাজুলিয়াতে বসতি স্থাপনের পরে তাহারা পৈত্রিক সম্পত্তি খড়রিয়া পরগণা উদ্ধার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু উহাতে কোনরূপ সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না।

রামদেব কর্ণাভরণের দুই পুত্র, রঘুনাথ রায় কবিরত্ন ও কন্দর্প রায়। রঘুনাথের পুত্র রমাকান্ত রায়, তৎপুত্র হরিপ্রসাদ রায়। কন্দর্প রায়ের প্রথমা পত্নীর গর্ভে একটি পুত্রসন্তান ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পরে এই পত্নী লোকান্তরিতা হইলে তিনি জপসাবাসী দেওয়ান কৃষ্ণরাম রায়ের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই শেষোক্ত গৃহিণীর গর্ভে কোন সন্তানসন্ততি হইবার পূর্বেই কন্দর্প রায় মানবলীলা সংবরণ করেন।

কন্দর্প রায়ের পুত্র কৃষ্ণরাম রায় পিতৃবিয়োগের অব্যবহিত পরেই লোকান্তরিত হইলে, তদীয় শিশুপুত্র রত্নেশ্বরের ও তদীয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার রঘুনাথের পুত্র রমাকান্ত রায়ের হস্তে ন্যস্ত হয়। দুর্ভাগ্যেব বিষয় এই যে রমাকান্ত ভ্রাতুষ্পুত্রের বিত্ত সম্পত্তি যেরূপ সাদরে গ্রহণ করেন, ভ্রাতৃতনয় রত্নেশ্বরকে সেই ভাবে গ্রহণ করিতে না পারিয়া, তাহাকে দূরীভূত করিয়া দেন। এই সময়ে এক বিশ্বস্ত ভৃত্য রত্নেশ্বরকে লইয়া তাহার পিতার বিমাতার নিকট জপসা গ্রামে উপস্থিত হয়। এই রমণী পৌত্র রত্নেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া ও তাহার গৃহ পরিত্যাগের কারণ অবগত হইয়া সমুদয় বিবরণ স্বীয় ভ্রাতা লালা রামপ্রসাদকে অবগত করান। রামপ্রসাদ ভগ্নীকে ঐ শিশুর বক্ষণাবেক্ষণ করিবার অনুমতি প্রদান করেন, এতদ্ভিন্ন রামপ্রসাদ স্বীয় ভাগিনেয় পুত্রবৎ রত্নেশ্বরের সর্বদা তত্ত্বাবধান করিতেন।

রমাকান্ত রায় সমুদয় সম্পত্তি হস্তগত করিলেন বটে কিন্তু, এইরূপ নানা ঘটনা ঘটিল যে, তাহার পরে রাজস্ব আদায় অসম্ভব হইয়া পড়িল। নবাব সরকার হইতে তাহার নিকট রাজস্ব আদায়ের জন্য লোক প্রেরিত হইল, তখন আর তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া স্বয়ং ঢাকাতে উপস্থিত হন। এই সময়ে ঢাকাতে রামপ্রসাদ, দেওয়ান রাজবল্লভের সহকারি দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রমাকান্ত কুটুম্বিতা সূত্রে রামপ্রসাদের শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু যে কন্দর্পরায়ের সম্পর্কে কুটুম্বিতা সেই কন্দর্পের পৌত্রের সহিত তিনি যে কুব্যবহার করিয়াছেন, উহা তখন আর তাহার স্মরণ পথে উপনীত না হইলেও রামপ্রসাদ কিন্তু উহা বিস্মৃত হন নাই। তিনি রমাকান্তকে বলিলেন, রায় মহাশয়, আমি স্বীয় কন্যার বিবাহ উপলক্ষে শীঘ্রই দেশে যাইতেছি, আপনি এখন দেশে চলিয়া যান। আবার যখন আপনাকে আসিতে লিখিব তখন আসিলেই সমুদয় কথার মীমাংসা হইতে পারিবে। তবে যতদিন পর্যন্ত উভয়ের পুনরায় সাক্ষাৎ না হয়, ততদিন মধ্যে আপনার কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

অতঃপর রামপ্রসাদ দেশে গমনান্তে পয়োগ্রাম নিবাসী বৈদ্যকুলীন প্রভাকর বংশীয় রামধন

সেন মহাশয়ের সহিত তনয়া সর্বেশ্বরীর সম্বন্ধ সুস্থির করিয়া, চন্দনের আয়োজন করেন। এই কার্য উপলক্ষে সমুদয় বৈদ্য কুলীন উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। নিমন্ত্রিত হইয়া সকলে আসিলেন ; কাজুলিয়াবাসী রমাকান্ত রায়ও তদুপলক্ষে তথায় আগমন করেন। বিবাহ কার্য নির্বাহ হইয়া গেলে পর, ক্রমে ক্রমে সমুদয় কুলীন বিদায় হইলেন, অবশিষ্ট রহিলেন রমাকান্ত ; কারণ তিনি একমাত্র বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আইসেন নাই, স্বীয় বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য।

একদিন রামপ্রসাদ অন্যান্য স্বজনগণ সহিত একত্র উপবেশনান্তে রমাকান্ত রায়চৌধুরীকে ডাকিয়া পাঠান, চৌধুরী উপস্থিত হইবামাত্র তাহাকে সম্ভ্রমের সহিত গ্রহণ করিয়া একটি বালকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, চৌধুরী মহাশয়, আপনি কি ইহাকে আর কখন দেখিয়াছেন? রমাকান্ত বিশেষরূপ নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, এই রত্নেশ্বর ; তখন চৌধুরী মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। রামপ্রসাদ সমুদয় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, মহাশয়, এই হইতেছে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র রত্নেশ্বর ; আপনি অন্যায় করিয়া ইহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া উহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছেন। আমি বলিতেছি, আপনি ইহাকে গ্রহণ করিয়া সমুদয় সম্পত্তি সমান অংশে বিভক্ত করিয়া দিন, যদি না দেন তবে জানিবেন, রামপ্রসাদ সেন উহার যে হয় প্রতিবিধান করিবেন। রমাকান্ত নিতান্ত বিপদে পড়িয়াই লালা বামপ্রসাদের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়াছিলেন, এখন এই কথা শ্রবণ করিয়া আর কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া রত্নেশ্বরকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন, রত্নেশ্বরও তাহার পদে প্রণত হইল। বলা বাহুল্য, অতঃপর আর সদর রাজস্বের জন্য রমাকান্তকে ভাবিতে হইল না ; বামপ্রসাদ ঐ টাকা পরিশোধ করিয়া দিলেন। রমাকান্ত, রত্নেশ্বরের সহিত কাজুলিয়া আগমন করিয়া তাহাকে সম্পত্তির অর্ধাংশ বিভাগ করিয়া দিলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন নামে অর্ধাংশ হইলেও রমাকান্তের দিকের তুলাদণ্ডটি নিম্নাভিমুখী হইয়া পড়িয়াছিল। পরে এই রমাকান্ত রায়ের কন্যার সহিত মহারাজ রাজবল্লভের পুত্র রায় রতনকৃষ্ণের শুভপরিণয় কার্য সম্পন্ন হয়।

এই রায় চৌধুরী বংশ বিশেষ সম্মানের সহিত কাজুলিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। তাহার মধ্যে উমাকান্ত রায় ও কবিরাজ রেবতীকান্ত রায়, ঈশানচন্দ্র রায়, প্রতাপচন্দ্র রায়, ভূতপূর্ব সবরেজিস্টার বনমালী রায়, উকিল শ্রীযুক্ত শশীকান্ত রায়, বি-এল, রাজকুমার রায়, লালবিহারী রায় ওভারসিয়ার, অনন্তকুমার রায় বি-এল, উকিল ও প্রমথনাথ রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই বিষ্ণুদাস বংশের সহিত কার্যসূত্রে ধন্বন্তরি গোত্রীয় আরও কয়েকঘর কুলীন বৈদ্য এই স্থানে বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষক বিপিনবিহারী সেন, উকিল শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুত দুর্গাচরণ সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কাজুলিয়াতে কয়েকঘর ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র বাস করিতেছেন। গ্রামবাসী সকলেই সম্পন্ন, অথচ এই স্থানে শিক্ষাবিধানের জন্য ভাল বিদ্যালয়ের অভাব, এইটি বড়ই লজ্জার কথা। গোপালগঞ্জ হইতে বৎসরের সমুদয় ভাগ এই স্থান পর্যন্ত নৌকা গমনাগমন করিতে পারে। খালের পার দিয়া একটি রাস্তা প্রস্তুত হওয়ায় পদব্রজে গমনপক্ষেও সুবিধা হইয়াছে।

ভোজেরগাঁতি, রায়পাশা, মালিখাড়া ও বাজুনিয়া

এই স্থানগুলি খড়রিয়া পরগণার অন্তর্গত। ভোজেরগাঁতি গ্রামে কয়েকঘর রাঢ়ীয় শ্রেণির ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইহাদের পূর্বপুরুষ মাধবানন্দ চক্রবর্তী বিক্রমপুর নিবাসী ডিংসাই শ্রোত্রিয় ছিলেন। রায়পাশা ও মালিখাড়া গ্রামে বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণির ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই খড়রিয়া পরগণার পূর্ব জমিদার বৈদ্য রায়চৌধুরী বংশের দত্ত ব্রহ্মত্র অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন।

এই স্থানগুলি সমুদয়ই বিলের মধ্যবর্তী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বোধ হয় যেন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই সকল স্থানের নিকটবর্তী বিলসমূহের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। কারণ এই সকল স্থানের কালো একটা স্তরের পরে বালুকাময় স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জলাভূমি হইতে এক বিস্তৃত বিল (কাজল বিল) বাকরগঞ্জের দক্ষিণবর্তী আমুয়া পর্যন্ত প্রধাবিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে "রাজবাড়ি" বলিয়া একটা স্থানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় যে জলাশয় বিদ্যমান আছে, উহাতে ইষ্টক নির্মিত ঘাট দৃষ্ট হয়। উহার নিকটবর্তী আর একটি স্থানের নাম হাতিবাড়ি অর্থাৎ পীলখানা। ইহাতে বোধ হয় এস্থানে কোন রাজার বাড়ি ছিল। নমশূদ্র জাতি এই স্থানের প্রধান অধিবাসী।

ওলপুর

যে পঞ্চজন কায়স্থ সন্তান প্রথম বঙ্গে আগমন করেন, তাহাদের মধ্যে দশরথ বসুর নাম অবগত হওয়া যায়। তাহার অধস্তন সপ্তম পুরুষে অহস্পতি বসুর জন্ম হয়। এই মহাত্মার চারি পুত্র, বনমালী, পুরবসু, সাদু ও রাঘব।

পুরবসু স্বীয় তনয়াকে শক্তি হিঙ্গুসেনের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এজন্য তৎকনিষ্ঠদ্বয় অগ্রজের প্রতি কুলাচারী হন। এজন্য পুরবসুর অভিসম্পাতে তাহারা কুলচ্যুত হন। রাঘবের বংশ বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। সাদুর বংশধরগণ বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ভাতশালা ও সতীগ্রাম বাস করিতেছেন। পুরবসুর বংশধরগণ মধ্যে বহরের চৌধুরীগণ কৌলিন্য ভ্রষ্ট, কারণ তাহারা ভুলুয়ার লক্ষণমাণিক্যের সমন্বয় ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন না। এতদ্ভিন্ন বাকরগঞ্জের হস্তীশুণ্ড, কাচাবালিয়া, শীতলাপাড়া এবং ফতেয়াবাদ সমাজের ভাজনভাঙা গ্রামে বাস করিতেছেন।

পুরবসুর অধঃস্থানীয় সপ্তম পুরুষে বলভদ্র বসু চন্দ্রদ্বীপের রাজা জয়দেব দেবের[১৫] কন্যা কমলার পাণিগ্রহণ করেন। বলভদ্রের পুত্র পরমানন্দ মাতামহের সম্পত্তির অধিকারী হইয়া রাজা উপাধি ধারণ করেন। তৎপুত্র রাজা জগদানন্দ বসু তৎপুত্র রাজা কমলনারায়ণ ও রাজবল্লভ। রাজবল্লভের সন্তানগণ ইদিলপুরে বাস করিতেছেন।

পুরবসুর বংশীয় থাকবসুর সন্তানেরা, বাকরগঞ্জের অন্তর্গত, আঠক, কেন্দুয়া, লক্ষ্মণকাটিতে এবং এই বংশের যাদবেন্দ্র বসু মজুমদারের সন্তানগণ, চাঁদসি হইতে ফতেয়াবাদের অন্তর্গত আলগি গ্রামে যাইয়া বাস করেন।

পুরবসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বনমালীর অধঃস্তন দশম স্থানীয় গোপাল বসু বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই মহাপুরুষ কাশীধামে ২২টি পুরশ্চরণ করিয়া সিদ্ধপুরুষ মধ্যে গণনীয় হয়। তাহার যথাক্রমে চারটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ১ম মহেশ ওরফে রাজবল্লভ. ২য় গোবিন্দ, ৩য় শিবনাথ, ৪র্থ যদুনাথ। দ্বিতীয় গোবিন্দ বসুর সন্তানগণ বিক্রমপুর মালখানগরে বাস করিতেছেন।

সর্বজ্যেষ্ঠ মহেশ বসুর দুই পুত্র রমানাথ ও যাদবেন্দ্র, রমানাথের সন্তানগণ বাকরগঞ্জের নথুল্লাবাদে ও তারাপাশায় ও ইদিলপুরে বাস করিতেছেন, ইহারা মীর বহর উপাধিতে প্রসিদ্ধ।

বনমালী বংশীয় পৃথ্বীধর বসুর বংশধরেরা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত, কাশীপুর, কড়াইতলী এবং বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে বাস করেন। পৃথ্বীধরের অধঃস্তন পঞ্চম স্থানীয় কেশব বসু রাজা প্রতাপাদিত্যের মাতুল ছিলেন, এই কারণে সকলেই তাহাকে রায় কেশব নামে সম্বোধন করিত। তাহার সন্তানেরা ফতেয়াবাদের রামনগর গ্রামে কুলজ ভাবে অবস্থান করিতেছেন।

যশোহর সমাজের কুলীন শ্রেষ্ঠ চক্রপাণি বসুর সন্তান, গোপাল বসু ঠাকুর বংশাবতংস রঘুনন্দন বিক্রমপুরের কোন আত্মীয় গৃহে গমনকালে পথিমধ্যে উজানীর রাজবাড়িতে আতিথ্য

গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজার অনুরোধ স্বত্ত্বেও রাজবাটিতে আহার করিতে প্রথম স্বীকার করেন নাই। কিন্তু রাজা নির্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিয়া তাহাকে পক্কান্ন ভোজন করাইলেন এবং সাতখানি মৌজা (গ্রাম) ভোজনদক্ষিণা প্রদান করিয়া ও রায়চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাহার মর্যাদা রক্ষা করিলেন। সেই সুবৃহৎ সাতখানা মৌজা ২৭ মৌজাতে পরিণত হইয়াছে; তদবধি রঘুনন্দন ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী গোপালগঞ্জ সবডিভিশনের অধীন উলপুর গ্রামে বসবাস করিতে লাগিলেন। উলপুরের বসু রায়চৌধুরীবংশ কি শিক্ষায়, কি সভ্যতায়, কি স্বদেশসেবায়, কি স্বদেশানুরাগে, কি সমাজ সংস্কারে, কি স্বাধীন চিন্তায়, কি ধনবলে, কি জনবলে, কি বুদ্ধিবলে, সকল বিষয়েই ফরিদপুরে প্রসিদ্ধ। বরিশালের উকিল নবীনচন্দ্র রায়, ময়মনসিংহের উকিল পূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী, হাইকোর্টের উকিল সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী, প্রসিদ্ধ লেখক পৃথ্বীশচন্দ্র রায়চৌধুরী, আলিপুরের উকিল শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর রায়চৌধুরী, অধ্যাপক সতীনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতি মনস্বী ও যশস্বীগণ এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উলপুরের রায়চৌধুরী বংশের মধ্যে ছোট তেরপাই বা কোটাবাড়ির মালেক ঐশ্বর্যে ও ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণরাম রায়ের ন্যায় ও ধর্মবুদ্ধির উপর এই বাড়ির গৌরব প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণরাম রায়ের মধ্যম পুত্র নন্দরাম রায়ের পত্নী সহমরণে যাইয়া অনন্যসাধারণ পতিভক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন।"

এই বংশের কৃষ্ণচন্দ্র রায় একজন খ্যাত লোক ছিলেন। তাহার পাঁচ পুত্র কালীপ্রসন্ন (সবজজ), শ্যামাপ্রসন্ন, দেবীপ্রসন্ন, রমাপ্রসন্ন ও গিরিজাপ্রসন্ন হাইকোর্টের উকিল। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় এই জেলায় কেন বঙ্গদেশে কাহারও নিকট অবিদিত নাই, তিনি স্বদেশ প্রেমিক, স্বদেশের অভাব সম্বন্ধীয় বিষয় প্রতিবিধানকল্পে এই মহাত্মা যতটা আয়াস স্বীকার করিয়াছেন বোধ হয়, ফরিদপুরের জন্য আর কেহ ততটা করে নাই। যথায় দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নিপতিত হইয়া মহা আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া দিয়াছে, যেখানে মহামারীতে জনগণ উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে, তথায় দয়াল দেবীপ্রসন্ন অন্ন ও ঔষধ পথ্য সহ উপস্থিত। এজন্য তাহাকে সেই সময় কত কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য সাধারণের অর্থ দ্বারাই এই কার্য সংসাধিত হইয়াছে কিন্তু উহা সংগ্রহ ও নিয়মিতরূপে ব্যয় করিবার ভার দেবীর উপর। ফরিদপুর সুহৃদ সভার একমাত্র প্রাণ দেবীপ্রসন্ন। কত জেলায়, পরগণায় এইরূপ সভা হইয়া বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু দেবীর আশ্রয় লাভ করিয়া এই সভা অদ্যাপি জাগ্রত রহিয়াছে। ধন্য দেবীপ্রসন্ন। বহুলোকের অন্নদাতা, নব্য ভারতের সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন।* তদীয় নিরাভরণা অথচ লাবণ্যময়ী নব্যভারত বর্ষীয়সী হইয়া আজিও লোক লোচনানন্দদায়িনী হইয়া রহিয়াছে। নানা গ্রন্থের প্রণেতা দেবীপ্রসন্ন। এক কথায় বড় ধনীর সন্তান বা ধনী না হইয়াও এই মহাত্মা যেরূপভাবে যশঃ অর্জন করিয়াছেন, তাহা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। তদীয় একমাত্র পুত্র প্রভাতকুসুম রায় হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করিতেছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে বলিতে গেলে এই বংশে লক্ষ্মী সরস্বতী চিরবিবাজমান, তথায় কোনরূপ কীর্তি কলাপের চিহ্ন না থাকিলেও একমাত্র বিদ্যা ও জ্ঞান বলে উহার ঔজ্জ্বল্য বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এই শ্রদ্ধেয় দেবীপ্রসন্ন ও তদীয় সুযোগ্য পুত্র অকালে কাল কবলিত হইয়া দেশ তমসাচ্ছন্ন করিয়া গিয়াছেন।

** দেবীপ্রসন্নের একটি রচনা ৫৩৭ পৃষ্ঠায় সংযোজিত হয়েছে।*

কবিরাজপুর

সদরের অন্তর্গত, ভাঙা থানার অধীন, এই গ্রামে অনেক ভদ্রলোক বাস কবিয়া থাকেন। তন্মধ্যে রায় উপাধিধারী রাঢ়ী শ্রেণির ব্রাহ্মণগণ প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের পূর্বনিবাস বিক্রমপুরের অন্তর্গত ধূল্লা, তথা হইতে জালালপুরের অন্তর্গত ধুরাইল গ্রামে বাস স্থাপন করেন। পরে নদী কর্তৃক ঐ স্থান ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে ১২৭২ সালে এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। এই বংশেব তিলকচন্দ্র রায় একটা শিব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

কবিরাজপুরের মৃত পার্বতীচরণ রায় একজন খ্যাতনামা মহাত্মা লোক ছিলেন। বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা স্বীয় ক্ষমতায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া তদ্দ্বারা বহু সৎকার্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় ইহার বিস্তীর্ণ কারবার রহিয়াছে। কলিকাতার বাড়িতে প্রতি বৎসর মহাসমারোহে জগদ্ধাত্রী পূজা সম্পন্ন হইত, উহাতে ভূরিভোজনের আয়োজন হইত এবং আহুত অনাহুত অনেকেই তথায় পরিতোষ সহকারে আহার্য প্রাপ্ত হইতেন।

রায় মহাশয় মহাভারত পাঠ ও তুলাচতুরঙ্গি প্রভৃতি কার্য দ্বারা বিশেষ যশোলাভ করিয়াছিলেন। এই কার্য উপলক্ষে বিরাট অন্নসত্র খোলা হইয়াছিল, কাশী কাঞ্চীর কোন কোন এবং বঙ্গদেশের প্রায় যাবতীয় স্থানের প্রধান পণ্ডিতগণ আহুত হইয়া উপযুক্তভাবে গৃহীত ও বিদায় প্রাপ্ত হন।

এই মহাত্মার সংস্থাপিত সংস্কৃত টোল অদ্যাপি তাহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে, অষ্টাদশটি ছাত্র তদীয় অন্নের সাহায্যে এই টোলে নিয়ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিভিন্ন স্থান হইতে অন্য আবাসে আশ্রয় পাইয়াও কত ছাত্র এই টোলে পাঠ করিয়া কৃতবিদ্য হইতেছে। স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এই টোলের স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন।

জালালপুর পরগণার বহু স্থান রায় মহাশয়ের অর্থে ক্রীত হইয়াছে, দেশের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ভূম্যধিকারী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তদীয় পুত্র কৃষ্ণদাস রায় ও আশুতোষ রায় পিতার উপযুক্ত পুত্র। কারবার ও জমিদারির উত্তরাধিকারী হইয়াও ইহারা পরোপকারী ও দাতা। ফরিদপুরের এমন কোন সদানুষ্ঠান নাই যাহাতে রায় মহাশয়েরা প্রচুর অর্থ সাহায্য না করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস রায় মহাশয় দেশহিতকর প্রায় সমুদয় কার্যেই যোগদান কবেন ও পরিশ্রমের সহিত কার্যোদ্ধার করিতে সচেষ্ট হন। বাস্তবিক পক্ষে ইহারা এই জেলার মধ্যে আদর্শ মহাজন।

ইহাদের প্রতিষ্ঠিত মাইনর স্কুল ও ডাক্তারখানা সাধারণের উপকার সাধন করিতেছে।

খান্দারপাড়

মুকসুদপুর থানার অন্তর্গত এই স্থানটিতে বহু বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাদি জাতি বাস করা নিবন্ধন উহা বিশেষভাবে পরিচিত। বৈদ্য মজুমদার ও কবিরাজ সেন এবং ব্রাহ্মণ চক্রবর্তীগণ স্থানীয় ভূম্যধিকারী। এই মজুমদার বংশের পূর্বপুরুষ গৌরীনাথ দাশের বিবরণ ইতিপূর্বে সেনাদিয়ার কাহিনী সহ বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। বাণী ও গৌরী উভয়েই বাল্যাবস্থায় ভূষণার রাণী কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া পরে গোবিন্দপুরের ফৌজদারের অধীনে কার্য করিয়া আপন আপন সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন। বাণীনাথ ফতেজঙ্গপুরের কতকাংশের জমিদারি লাভ করেন, গৌরীনাথ তেলিহাটি আমিরাবাদ পরগণার খান্দারপাড় প্রভৃতি স্থানে এক তালুক লাভ করিয়া খান্দারপাড়ে বাস স্থাপন করেন। এই হইতে গৌরীনাথ "মজুমদার" বলিয়া পরিচিত হন।

এই মজুমদার বংশে যে সকল লোক জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে সদাশিব মজুমদারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সদাশিব জপসার জমিদার বংশের দেবীপ্রসাদ রায়ের

কন্যার পাণিগ্রহণ করেন ; রাজনগরের রাজবংশ ও জপসার জমিদার বংশ পরস্পর ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধে আবদ্ধ। সেই সূত্রে সদাশিব রাজবংশের নিকট পরিচিত হইয়া রাজার জমিদারি পরগণে বোজেরগোমেদপুর পরগণার নায়েবি পদ প্রতিষ্ঠিত হন। বিভারিজ কৃত বাকরগঞ্জের ইতিহাসে ইহার নাম উল্লেখ রহিয়াছে, আমরা নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।[১৬]

বোজোরগোমেদপুর পরগণার অন্তর্গত, বামনা মৌজাতে সদাশিব কর্তৃক মহম্মদ সাফী এক তালুক প্রাপ্ত হন। উহা রাজপক্ষ হইতে নায়েব সদাশিব প্রদান করেন বলিয়া, বামনার চৌধুরী বংশের পূর্বপুরুষ প্রকাশ করিয়া, দশসনা বন্দোবস্তের সময়ে উহা স্বীয় নামে বন্দোবস্তের উদ্যোগী হইলে, সদাশিবের পুত্র রামকৃষ্ণ প্রভৃতি উহা প্রকৃত প্রস্তাবে চৌধুরীগণও সত তালুকদার মাত্র এবং তাহারাই প্রকৃত তালুকদার বলিয়া দাবি করিয়া বসেন। কিন্তু তাহারা কৃতকার্য হইতে পারেন নাই মুসলমান চৌধুরীগণই জয়ী হইয়া সুবিস্তৃত বামনা মৌজার মালিক হন। এতদ্ভিন্ন বোজেরগোমেদপুর পরগণার মধ্যেও বিক্রমপুরের চিকন্দী প্রভৃতি স্থানে সদাশিব যে তালুক করিয়া গিয়াছিলেন উহা বহুদিন পর্যন্ত তদীয় উত্তরাধিগণের হস্তগত ছিল, পরে ঐ সকল তালুকও তাহাদের হস্তভ্রষ্ট হয়। সদাশিব গ্রামের উন্নতি কল্পে ভিন্ন স্থান হইতে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য আনয়ন করিয়া স্বগ্রামে সংস্থাপন করেন। রজনীকান্ত স্মৃতিভূষণ এই গ্রামের একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন ; তাহার পূর্বপুরুষ বিক্রমপুরান্তর্গত মূলপাড়া গ্রাম হইতে সদাশিব কর্তৃক আনীত হইয়া এই গ্রামে সংস্থাপিত হন। ইহারা মূলপাড়ার সর্দার বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত।

খান্দারপাড় গ্রামে বিষ্ণুদাশ বংশীয় রায় উপাধিধারী যে সকল ব্যক্তি বাস করেন, তাহাদের পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীনারায়ণও সদাশিব কর্তৃক এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন।

খড়রিয়া পরগণার ভূতপূর্ব জমিদার জানকীবল্লভ বিশ্বাসের পুত্র বলভদ্র কবিন্দ্রচন্দ্র রায়, তৎজ্যেষ্ঠপুত্র রাজা হরিনাথ নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু বৈমাত্র ভ্রাতৃগণসহ কলহ করিয়া তাহাকে জমিদারিভ্রষ্ট হইয়া মাত্র তালুক লইয়া জীবন ধারণ করিতে হয়। লক্ষ্মীনারায়ণ রায় এই রাজা হরিনাথের প্রপৌত্র। সম্ভবত লক্ষ্মীনারায়ণ বিষয় সম্পত্তি পরিভ্রষ্ট হইয়া জপসার জমিদারবংশীয় বানেশ্বর ক্রোড়ীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে বানেশ্বরের খুল্লতাত পুত্র দেবীপ্রসাদের কন্যা বিবাহ করিতে খান্দারপাড়বাসী সদাশিব মজুমদার এবং সদাশিবের জ্ঞাতি নন্দকিশোর মজুমদার দেবীপ্রসাদের ভগ্নী বিবাহ করিতে জপসাতে গমন করেন, তাহারা অবগত হইলেন তাহাদেরই জ্ঞাতি লক্ষ্মীনারায়ণ বিবাহ করিয়া জপসাতে অবস্থান করিতেছেন। এই সূত্রে, লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের সহিত সদাশিব ও নন্দকিশোরের পরিচয় হয়, তাহারা স্বীয় জ্ঞাতি লক্ষ্মীনারায়ণকে স্বগ্রামে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলে তিনি সম্মত হইয়া খান্দারপাড় গমন করেন। তদবধি এই গ্রামেই গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করেন। তদীয় উত্তরাধিকারীগণ অদ্যাপি এই স্থানে বাস করিতেছেন। কলিকাতা ভবানীপুরের সুবিখ্যাত কবিরাজ পঞ্চানন রায় কবি চিন্তামণি এই লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি, কলিকাতা চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। তাহাদের পিতা পুত্রের জন্মস্থানও এই খান্দারপাড়। বর্তমানে ইহারা খান্দারপাড়বাসী নহেন। পঞ্চানন রায় ও তাহার ভ্রাতৃগণ খান্দারপাড় পরিত্যাগ করিয়া মাতামহালয় খুলনা জেলার অন্তর্গত পয়োগ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় বাস স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের অপর বংশধর বিপিনবিহারী, লালবিহারী ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী রায় প্রভৃতিও খান্দারপাড় হইতে উঠিয়া স্বীয় মাতুলালয়ে পয়োগ্রামে যাইয়া বাস করিতেছেন। লক্ষ্মীনারায়ণের বংশধর মধ্যে কেহ কেহ অধুনা বিক্রমপুরের নানা স্থানে বাস করিতেছেন। লক্ষ্মীনারায়ণের অপর বংশধরগণ এই স্থানেই

বিদ্যমান আছেন। তন্মধ্যে জজকোর্টের উকিল যাদবচন্দ্র রায়, বি-এল ও গুণেন্দ্রনাথ রায় বি-এল প্রসিদ্ধ।

সদাশিব মজুমদারের প্রতিষ্ঠিত কালীদেবী এই গ্রামের প্রধান বিগ্রহ। কালীবাড়িতে প্রতি সপ্তাহে হাট বসিয়া থাকে। বহু দূরদূরান্তর হইতে জনগণ আগমন করিয়া এই দেবীর অর্চনার জন্য উপস্থিত হয়। নন্দকিশোর মজুমদার বাড়ির শিবও জাগ্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সেনদিয়ার বিবরণে বলা হইয়াছে বাণীনাথ দাস মজুমদারের দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বর মজুমদার ও তৃতীয় পুত্র রত্নেশ্বর মজুমদার সেনদিয়া গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করেন। বাণীনাথের প্রথম পুত্র কানুড়িয়াবাসী রামনারায়ণ কণ্ঠাভরণের পুত্র কৃষ্ণদেব কবিশেখরের "কবিশেখর" ও দ্বিতীয় রামেশ্বরের পুত্র যাদবেন্দ্রের নাম সহিত যোগ করিয়া "যাদবেন্দ্র কবিশেখর" নামে ফতেজঙ্গপুরের জমিদারির নামকরণ হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে দেখা যায় এই যাদবেন্দ্রের বংশধরগণ ফতেজঙ্গপুর পরগণার স্বত্ববান নহেন। কি কারণে তাহারা জমিদারির অংশ প্রাপ্ত হন না, তাহার কোন কারণ অবগত হওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, রামেশ্বরের বংশধরগণ সেনদিয়া পরিত্যাগ করিয়া খান্দারপাড়ে বাস স্থাপন করিবার কালে, ঐ সম্পত্তি রত্নেশ্বরে বংশধরগণের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আইসেন। কারণ তৎকালে ঐ সম্পত্তির আয় দ্বাবা সদর রাজস্ব চলাই দুষ্কর ছিল। এই কাল হইতেই, তাহারা এই সম্পত্তি সম্বন্ধে আর কোন অনুসন্ধান লন না, দশসনা বন্দোবস্ত কালে রত্নেশ্বরের বংশধরগণ সমুদয় সম্পত্তির মালিক বলিয়া উহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লন।

এই যাদবেন্দ্র মজুমদারের পৌত্র বিখ্যাত কবি, বিষ্ণুরাম কবিরাজের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত ভাষায় তাহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি কালীদাস কৃত শৃঙ্গার তিলক কাব্যের শান্তি পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া বুধজনকে আশ্চর্যান্বিত করিয়া গিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন কবিরাজ মহাশয় যে শ্লোক তৎ বিরচিত কুলীন বংশাবলী গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন উহা উদ্ধৃত করা হইল—

যেনোত্তর রাঘব পাণ্ডবীয়ং।
মুক্তাপ্রবালৌ বিবমান্যসাক্তন্।।
কণ্ঠে সতাং সাধুবিকাশমানং।
কেযাৎ নাচতাংমি চ মধ্যকর।।
কাব্য চ শৃঙ্গার রসপ্রধানং।
ব্যাখ্যানয়হশান্তিরসেন পূর্ণং।।
বিধায় যঃ প্রাপ যশোদুবানং।
নবেত্তিকস্তৎ কবিরাজচন্দ্রং।।

ইহার প্রকৃতনাম বিষ্ণুরাম মজুমদার, উপাধি কবিরাজ চন্দ্র। পরে উপাধিতেই তাহার নাম পর্যবসিত হয়। কবিরাজ চন্দ্র আপনাকে তৎকালীন বঙ্গাধিকাবীর সভাপণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন যথা—

গঙ্গাতটে যবন রাজধান্যাৎ।
বঙ্গাধিকারি সমিতৌ কবিমণ্ডিতায়ান্
যঃ কাব্য কৌশলকবিত্ব প্রদশর্য্য।
বিখ্যাতমান কবিরাজ শিরোমণি।

বিষ্ণুরাম কবিরাজ চন্দ্র মহাশয়েব নিজবংশে কেহ বর্তমান নাই। তদীয় ভ্রাতৃবংশের বহুকৃতবিদ্যলোক তাহার নাম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার পি. এইচ্-ডি ফরিদপুর হিতৈষিণী পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা। পণ্ডিত শ্রীরাম মজুমদারও কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল, প্রকাশচন্দ্র মজুমদার বি. এল তদনুজ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ সতীশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি এই বংশের খ্যাতনামা লোক।

জয়রামের পুত্র মধুসূদন মামুদপুরে নয়বংশে বিবাহ করেন। সেই সূত্রে মধুসূদনের পুত্র অভিরাম মামুদপুরে যাতায়াত করিবার অবসর পান। জয়রামের এই পৌত্র অভিরামই মামুদপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরে খান্দারপাড়ায় বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি খান্দারপাড়ায় বিষ্ণু দাশবংশীয় গৌরীনাথ মজুমদারের কন্যা বিবাহ করেন। তদ্বংশীয়গণ অদ্যাপি সেই স্থলেই বাস করিতেছেন।

এই বংশে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অভিরামের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অভিরাম কবিরাজ ভূষণাধিপতি সীতারাম রায়ের সভাসদ ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। সীতারাম কবিরাজ মহাশয়কে যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং তাহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করেন। একদা অভিরামের ছাত্রমণ্ডলী মধ্যে সীতারামের প্রতিকূলে কোন কথার আলোচনা হওয়ায়, সীতারাম ক্রুদ্ধ হইয়া অভিরামকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু অভিরাম কোন কথারই মধ্যে ছিলেন না এই কথা প্রমাণিত হওয়ার পরে মুক্তিলাভ করেন। অভিরাম কৃত একখানা চিকিৎসা গ্রন্থ সংগ্রহ আছে উহা খান্দারপাড় সংগ্রহ নামে প্রসিদ্ধ। অতঃপর এই বংশে যে সকল ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন কবিরাজ মহাশয় ভারত বিশ্রুত। এই কবিরাজ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাচরণ সেন খুলনাতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন। জয়রামের পরবর্তীগণ পুরুষানুক্রমিক পণ্ডিত ও কবিরাজ হওয়ায়, তাহার বংশধরগণ কবিরাজ এবং তাহাদের বাড়ি কবিরাজ বাড়ি নামে প্রসিদ্ধ। এই বাড়িতে বহুকাল পর্যন্ত সংস্কৃত অধ্যয়নের টোল থাকায় বহুদূর হইতে বিদ্যার্থী উপস্থিত হইয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত। এই সকল ছাত্রদের অধিকাংশের আহার তাহারাই যোগাইতেন। এই কবিরাজ বাড়িতে যত অতিথিই উপস্থিত হউক না কেন তাহারা কখনও বিমুখ হইয়া প্রত্যাগমন করে নাই। বর্তমান সময়ে বাড়িতে সংস্কৃত টোল না থাকিলেও, মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথের কলিকাতাস্থ ভবনে বহু ছাত্র সমবেত হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন। উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের নিকট বহু বাঙালি ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত উত্তর পশ্চিম ভারতের জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি রাজপুতবাসী এবং বোম্বাই, মাদ্রাজের বহু ছাত্র এই স্থানে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, কৃতিত্বের সহিত নানাস্থানে কবিরাজী ব্যবসা চালাইতেছেন। জয়পুর আয়ুর্বেদ কলেজের প্রধান অধ্যাপক আয়ুর্বেদাচার্য পণ্ডিত লক্ষ্মীরাম স্বামী এই মহাত্মার নিকট আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। ভারতীয় কবিরাজগণের মধ্যে গবর্নমেন্ট কর্তৃক দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহাশয়ই সর্বপ্রথম মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। এই উপাধি উপলক্ষে যাবতীয় কবিরাজ মণ্ডলী ও জনসাধারণ এলবার্ট হলে এক বৃহতীসভার অধিবেশন করিয়া দ্বারকানাথের সংবর্ধনা করেন। তাহার মৃত্যুর পরেও টাউন হলে এইরূপভাবে বিরাট সভার অধিবেশন করিয়া তাহার জন্য শোক প্রকাশ করা হয়, এবং সর্বসাধারণের ব্যয়ে তদীয় প্রস্তর নির্মিত প্রতিমূর্তি বিডন গার্ডেনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হাইকোর্টের সর্বজনপ্রিয় চিফ জাস্টিস স্যর লরেন্স জেঙ্কিন্স, এই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ বক্তা তদুপলক্ষে ঐ স্থানে সমবেত হইয়া কবিরাজ মহাশয়ের নানাগুণের কথা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। দ্বারকানাথ কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন এবং বঙ্গদেশের নানাস্থলে, সুদূর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এবং উদয়পুর প্রভৃতি রাজ্যে রাজগণ কর্তৃক আহুত হইয়া প্রায়ই মফঃস্বলে গমন করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রত্যাগমন করিযাছেন। তিনি একদিকে যেরূপ অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, অন্যদিকে তদ্রূপ দীনজনকে, অসমর্থ আত্মীয়গণকে ও ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতগণকে সর্বদাই মুক্তহস্তে দান করিতেন। তাহার কলিকাতাস্থ ভবনে এক বিরাট অন্নসত্র খোলা ছিল ; তথায় উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই আহার প্রাপ্ত হইত এবং শতশত ছাত্র তদন্নে পরিপুষ্ট হইয়াছেন। তন্মধ্যে অনেকেই বর্তমানে উচ্চশ্রেণীর কবিরাজ মধ্যে পরিগণিত। অধুনা তদীয় উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সেন এম,এ গবর্নমেন্ট হইতে বিদ্যারত্ন উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি পিতৃদেবের আচরিত পথেই অগ্রসর হইতেছেন। খান্দারপাড়বাসী উপরোক্ত বৈদ্যসম্প্রদায় ব্যতীত হিন্দু বংশোদ্ভব আরও কয়েকজন সিদ্ধকাঠী গ্রাম হইতে উঠিয়া এই স্থানে বাস করিতেছেন। তাহারা রায় ও রায়চৌধুরী উপাধি ধারণ করেন। শক্তিগোত্রীয় পীতাম্বর সেন পূর্বোক্ত কবিরাজ বংশের আদি পুরুষ। ঢাকার প্রসিদ্ধ খ্যাতনামা কলাবিদ্ চন্দ্রনাথ রায় মহাশয় এই বংশের সুসন্তান ছিলেন। কবিরাজ বাড়ির খুলনার উকিল শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ সেন বি-এল্ ও তদীয় কনিষ্ঠ কবিরাজ পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন বি-এ, কবিরত্ন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, বিদ্যাবাগীশ এবং মজুমদার বংশে মুন্সেফ শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এবং তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিরাজ এবং রায়চৌধুরী বংশে মুন্সেফ মধুসূদন রায় এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ রায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রসিদ্ধ লোক। খান্দারপাড়ের অন্য নাম রামচন্দ্রপুর। অতি পূর্বকাল হইতেই এই গ্রামে টোল ছিল বলিয়া ইহাকে সাধারণত টোলা রামচন্দ্রপুর বলা হইত।

কানুড়িয়া

বাণীনাথ দাশের বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণের বিষয় সেনদিয়ার বিবরণে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। বাণীনাথের প্রথম পুত্র রামনারায়ণ কণ্ঠাভরণ, তৎপুত্র কৃষ্ণদেব কবিশেখর মহবতপুর পরগণার অন্তর্গত কানুড়িয়া আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন তাহার পৈত্রিক জমিদারি ফতেজঙ্গপুরের অংশও তিনি প্রাপ্ত হন। বাণীনাথের বংশীয় মজুমদারগণের জমিদারি "কবিশেখর যাদবেন্দ্র" নামে লেখা যায়। কৃষ্ণদেব কবিশেখরের—"কবিশেখর" এবং বাণীনাথের দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বর মজুমদারের পুত্র যাদবেন্দ্র মজুমদারের—"যাদবেন্দ্র" একত্র করিয়া, এই "কবিশেখর যাদবেন্দ্র" নাম সন্নিবিষ্ট হয়। তৎকালে এইরূপ বহু নামের যোগে, জমিদারি ও তালুকদারি পত্তন গ্রহণের বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

কৃষ্ণদেব কবিশেখরের পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহারাজ রাজবল্লভের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামরাম মজুমদারের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তদীয় বংশধরগণই উপরোক্ত বিষয় সম্পত্তির অধিকারী। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র ও রাজকিশোর। ঈশ্বরচন্দ্র একজন প্রতিষ্ঠান্বিত পুরুষ ছিলেন। তিনি যথাক্রমে পুষ্করিণী উৎসর্গ, তুলা, চতুরাগ্নি প্রভৃতি শাস্ত্রানুমোদিত কার্য করিয়া ছিলেন। উহাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়, দীনহীনকে অর্থদান ও বহুলোককে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হইয়াছিল। জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে এই বাড়িতে বিশেষ সমারোহ হইত।

এই গ্রামে কয়েকঘর ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাহারা আজিও মহবতপুর পরগণার ভূতপূর্ব মালিক রাণী ভবানীর প্রদত্ত ব্রহ্মত্র ভোগ করিতেছেন। এই গ্রামের তিলকচন্দ্র ন্যায়ভূষণ একজন প্রধান স্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন।

বহুকাল পর্যন্ত এই স্থানে বৈদ্যের মধ্যে একমাত্র মজুমদারগণেরই বাস ছিল ; পরে ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার মহাশয় স্বীয় জামাতা ঈশ্বরচন্দ্র রায় মহাশয়কে সিদ্ধকাঠি গ্রাম হইতে আনয়ন করিয়া, এস্থানে সংস্থাপন করেন। এই রায় বংশের শ্রীযুত গঙ্গাধর রায় কবিরাজ ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মন্মথনাথ রায় বি.এ. এবং মজুমদার বংশে কালীপ্রসন্ন মজুমদার ও কৃপানাথ মজুমদার বি.এ. প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

চাওচা

এই স্থানের কায়স্থ দত্ত পরিবার প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহাদের পূর্ব পুরুষগণ বাকরগঞ্জ জেলার কলসকাঠির জমিদারগণ মধ্যে কার্য করিয়া কতক ভূসম্পত্তি লাভ করেন। এই পরিবারের পদ্মদত্ত পরিচিত লোক ছিলেন। ইনি স্বীয় আবাস বাটি ইষ্টক নির্মিত পাঁকাচকে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তদীয় অর্থে ইষ্টক গ্রথিত দোলমঞ্চটি, অদ্যাপি বর্তমান থাকিয়া, গবর্নমেন্টের প্রাচীন কীর্তি রক্ষণ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পদ্মদত্ত মহাশয়ের দুই পুত্র, উমেশচন্দ্র ও রাজকুমার, তাহাদের কোন পুত্র সন্তান বিদ্যমান না থাকা প্রযুক্ত, রাজকুমারের কন্যা নির্মলা মাত্র এখন উত্তরাধিকারিণী। দত্ত পরিবারের অপর শাখায় কালীপ্রসন্ন দত্ত একজন সুশিক্ষিত ও চরিত্রবান লোক ছিলেন, তিনি বহু দিবস পর্যন্ত আসামের অন্তর্গত বিজনী স্টেটের সবম্যানেজারের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপ্রণীত "রুষ ও জাপান যুদ্ধ" গ্রন্থ সাধারণের নিকট আদৃত হইয়াছিল। দত্ত পরিবারের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অত্রত্য ঘোষ পরিবার পরিচিত।

বাইটকামারী ও মাহারাজপুর

বাইটকামারী ও মাহারাজপুর, মহবতপুর পরগণার অন্তর্গত মুকসুদপুর থানার অধীন। বাইটকামারী গ্রামে বহু ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান ; তন্মধ্যে ভট্টাচার্য বংশ প্রসিদ্ধ। ইহারা রাঢ়ীয় সর্বনন্দী মেলের কুলীন। তাহাদের পূর্বপুরুষ নিষ্ঠাবান ও তপঃসিদ্ধ ছিলেন বলিয়া ভট্টাচার্য খ্যাতি লাভ করেন। এই ভট্টাচার্য বংশ বিষয় সম্পত্তিবান লোক ছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীরাম ভট্টাচার্য মহাশয়ের নাম উল্লেখ করা কর্তব্য।

এই স্থানে বহু ব্যবসায়ী লোক বাস করিয়া থাকে। এতন্মধ্যে সাহা বংশ ধনে শ্রেষ্ঠ ছিল। প্রায় শতাধিক বৎসর অতীত হইল সুবোধচন্দ্র রায় এই স্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এই মন্দিরটিও গবর্নমেন্টের কীর্তিরক্ষণ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রবাদ সাহাগণ দত্ত ভূবৃত্তিতে ভট্টাচার্যগণ গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন।

দিগনগর

বাইটকামারীর অনতিদূরে, এই স্থানে একটি হাট আছে। প্রায় আড়াই শত বৎসর অতীত হইল মুসলমান জাতীয় দেওয়ান সাহাওয়াজ নামক এক ব্যক্তি এই স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এই স্থানে বহু ব্যবসায়ী ও মুসলমান বাস করিয়া থাকে। উপরোক্ত মন্দিরটিও গবর্নমেন্টের কীর্তিরক্ষণ তালিকার অন্তর্গত।

কালামৃধা

কুমার নদী তটে, আধারমাণিক, একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। তথায় বহু ভদ্রলোক বাস করিতেন ; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ চৌধুরীগণ সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তাহাদের পূর্বপুরুষ বিক্রমপুরান্তর্গত বিলাসপুর হইতে এই স্থানে আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন। এই বিলাসপুরের রাঢ়ী ব্রাহ্মণ শ্রেণির অন্তর্গত দীর্ঘলাল (দীঘাল) শ্রোত্রীয়গণ সমাজপ্রসিদ্ধ, এই চৌধুরীগণও সেই দীঘাল শ্রোত্রীয়। উপরোক্ত চৌধুরী বংশে হরিনারায়ণ চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন ; তাহা হইতেই এই বংশের উন্নতি সংসাধিত হয়।

প্রবাদ হরিনারায়ণ বয়স্ক হইয়াও কোনরূপ উপার্জনের চেষ্টা না করায়, তদীয় মাতা বিরক্ত হইয়া একদা তাহার অন্নের সহিত কিঞ্চিৎ ভস্ম রাখিয়া দেন ; হরিনারায়ণ তদ্দৃষ্টে উহা পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্নমনে গৃহ পরিত্যাগ করেন। সেই রাত্রিতে তিনি স্বপ্নাবস্থায় দেখিতে পান কোন দেবী তৎসমীপে আগমন করিয়া বলিতেছেন "বৎস! তোমার দুঃখ

অপনোদন মানসে আমি এই স্থানে সমাগত হইয়াছি। আমার বাক্য প্রতিপালন করিলে তোমার নিশ্চয় সৌভাগ্যের সঞ্চার হইবে। তুমি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া, মেঘনা নদীর পূর্বতীরস্থ মতলবগঞ্জের হাটে গমন কর, দেখিতে পাইবে তথায় এক ব্যক্তি কালীদেবীর প্রতিমূর্তি বিক্রয় জন্য উপনীত হইবে। সে যে মূল্য চাহিবে, তুমি যদি সেই মূল্যে ক্রয় করিয়া উহা সংস্থাপিত করিতে পার, তবে নিশ্চয় সৌভাগ্য সঞ্চার হইয়া, তোমাকে যশস্বী করিয়া তুলিবে।" এই স্বপ্ন সন্দর্শনের পরে হরিনারায়ণ জাগ্রত হইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু উহা দেববাক্য বলিয়া তাহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল এবং তিনি মতলবগঞ্জাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। স্বপ্নাদেশের সমুদয় কথাই যাথার্থে পরিণত হইল, হরিনারায়ণ দেবী প্রতিমা ক্রয় করিয়া উহা প্রতিষ্ঠা করিলেন, অচিরে তত্রত্য মহবতপুরের মুসলমান জমিদারের মধ্যে তাহার চাকরি জুটিল ও সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল। ক্রমে তিনি ময়মনসিংহ জেলায় একটি পরগণার জমিদারি ক্রয় করেন। অদ্যাপি তদীয় বংশধরগণ মধ্যে কেহ কেহ উহার অংশ ভোগ করিতেছেন। প্রাচীন জমিদারবংশ যে যে সৎকার্যের দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন, হরিনারায়ণের বংশে উহা প্রায় সমুদয়ই সুসম্পন্ন হইয়াছে। আধারমাণিক গ্রামে ইহারা বাস করিতেন, পরে আরিয়লখাঁ উহার বিলোপ সাধন করিলে, তাহারা দেওরা থানার অন্তর্গত কালামৃধা গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন। এই গ্রামে একটি হাট আছে। বহু ব্যবসায়ী লোকের বাসস্থান ; তন্মধ্যে সাহা বংশীয়গণ শ্রেষ্ঠ। চৌধুরীদের স্থাপিত বহু কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এই গ্রামে বাস করিতেছেন। অধুনা অনেকেই চাকরি ব্যবসায় দ্বারা সম্মান রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। পুলিশ সবইনস্পেক্টর লালমোহন চৌধুরী, সবরেজিস্টার চণ্ডিচরণ চৌধুরী, সবডেপুটি রজনীকান্ত চৌধুরী ও ভুবনমোহন চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামবাসী কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় একজন সুলেখক ও গ্রন্থকার।

বাণীবহ

ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার অন্তর্গত বাণীবহ গ্রাম অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। ১৫৭৫ শকে কবিকণ্ঠহার কর্তৃক বৈদ্যগণের যে কুলজীগ্রন্থ বিরচিত হয়, তৎকালেও এই স্থানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈদ্যশ্রেষ্ঠগণের বহু নিবাসিত স্থান, মূলঘর, সেনদিয়া, কাজুলিয়া. খান্দারপাড়. জপসা, রাজনগর, সোনারং প্রভৃতি গ্রামের নাম যৎকালে খ্যাতিলাভ করে নাই, তৎকালে এই স্থানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈদ্য শক্তিগোত্রোদ্ভব মাধব সেনের বংশ ও ধন্বন্তরি গোত্রজ বলভদ্র বংশ এই স্থানেব প্রথম অধিবাসী বলিয়া অবগত হওয়া যায়।[১৭] এতন্মধ্যে মাধব বংশীয় জগদানন্দ ও মাধবানন্দ রায়ের বংশধরগণই বিশেষ প্রসিদ্ধতা লাভ করেন।

গোয়ালন্দ থানার অন্তর্গত পাঁচথুপি গ্রাম পূর্বে পঞ্চথুপি নামে[১৮] পরিচিত ছিল। কণ্ঠহার কৃত গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, এই স্থানে শক্তি মাধব সেন বাস স্থাপন করেন। আমাদের বিবেচনায় পঞ্চস্তূপ হইতেই পঞ্চথুপি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নহে যে, এই স্থানে অতি পূর্বকালে বৌদ্ধসম্প্রদায়গণের নিবসতি ছিল। বৌদ্ধ সংস্থাপিত পঞ্চস্তূপ হইতে প্রথমত উহা পঞ্চথুপি ও বর্তমানকালে আরও সরল উচ্চারণ হেতু উহা পাঁচথুপিতে পরিণত হইয়াছে। এই পাঁচথুপি বৌদ্ধ পরিহীন হইবার বহু বৎসর পরে, বৈদ্য মাধব সেন এইস্থানে বাস সংস্থাপন করেন। মাধব বংশের উন্নতিসাধন সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায় তাহা এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

আরঙ্গজেব বাদসাহার রাজত্বকালে, সংগ্রাম সাহা নামে. এক সেনা নায়কের নাম পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। মগ পর্তুগিজ প্রভৃতি আততায়ীর হস্ত হইতে বঙ্গীয় প্রজাদিগকে রক্ষাকল্পে.

বাদসাহার আদেশে সংগ্রাম প্রেরিত হইয়া পদ্মা ও মেঘনাব সঙ্গম স্থলে দলবল সহ অবস্থান করেন, কারণ এই দুই পথ অবলম্বন করিয়া, জলযান যোগে, উক্ত দস্যুগণ পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করিয়া, প্রজাগণের যথাসর্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিত। এই পর্যন্ত বহু চেষ্টা করিয়াও বাদসাহপক্ষ তাহাদিগকে নির্যাতন করিতে পারেন নাই, এবার বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিয়া তৎপ্রতি এই আদেশ প্রদত্ত হইল যে, মগ ও পর্তুগিজদিগের গর্ব যেন একবারে খর্ব করা হয়, এ কার্যের সাফল্যে অবশ্য পুরস্কার, অন্যথায় অপরিমেয় তিরস্কার তজ্জন্য নির্দিষ্ট রহিল। সাজাহান বাদসাহর রাজত্বকালে এই ভাবে প্রেরিত হইয়া সংগ্রাম ইতঃপূর্বে আর একবার পূর্ববঙ্গে আগমন করিয়া ভুলুয়ার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরে এক গড়বন্দি দুর্গ নির্মাণ করেন। উহাতে জলদস্যুর উৎপাত কতকটা প্রশমিত হয়, পরে আরঙ্গজেব বাদসাহ পদ প্রাপ্ত হইলে, তৎ আদেশে, দিল্লিতে যাইতে বাধ্য হন এবং রাজপুতানার নানাস্থানে যুদ্ধ কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কৃতকার্যতা লাভ করেন। এই সময়ে দস্যুগণের পীড়ন বর্ধিত হওয়ায় পুনরায় তাহাকে বঙ্গে প্রেরণ করা হয়। এবার আসিয়া সংগ্রাম পুনরায় পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গমে সাহাবাজপুর পরগণার কন্দর্পপুর স্থানে আর একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া নদী প্রবেশের মুখেতেই সৈন্য সংস্থাপন করেন।[১৯] উহাতে তাহার আশা ফলবতী হইল, মগ ও পর্তুগিজেরা জলযান যোগে এইবার বঙ্গের এই ভাগে প্রবেশলাভ করিয়া একেবারে পরাস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পরিশেষে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে।

এই জলদস্যুর উৎপাত নিবারণ জন্য যে যুদ্ধ খরচ হয়, সেই খরচ সঙ্কুলান জন্য আবার যে জমি নির্দিষ্ট হয় উহাকে "নাওরা মহাল" বলিত। বহু পরগণাতে এইস্থান নির্দেশিত হইয়াছিল, ঢাকা, বাকরগঞ্জ, ফরিদপুর, খুলনা প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের জেলা কয়েকটিতেই নাওরার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জমির আয় হইতে, জলযান নির্মাণের নাবিকগণের, সৈন্য সেনাপতিগণের ও যুদ্ধোপযোগী অন্যান্য আসবাবের যাবতীয় খরচ প্রদত্ত হইত। তৎকালে ঢাকা, বিক্রমপুর, চট্টগ্রাম, ভুলুয়া এবং ফরিদপুর জেলাস্থ বড় বড় নদীতীরে যুদ্ধোপযোগী রণতরী নির্মাণের কারখানা ছিল। সংগ্রাম পরিদর্শন উপলক্ষে এই স্থানে সময় সময় গমন করিতেন। এই সময়ে চন্দনা তীরবর্তী স্থানের মনোরমনীযতায় মুগ্ধ হইয়া তিনি তথায় বাসস্থান নির্মাণ করেন। দস্যু নির্যাতনের পুরস্কার স্বরূপ ইতঃপূর্বেই তিনি বাদসাহর নিকট হইতে তত্র অঞ্চলের কতক ভূমি বৃত্তিস্বরূপ প্রাপ্ত হন। কেহ কেহ বলেন রায়নগর নামক স্থানে সংগ্রাম প্রথম বাস সংস্থাপন করেন। তদীয় কীর্তির নিদর্শন স্বরূপ একটি মঠ অদ্যাপিও মথুরাপুর নামক স্থানে দৃষ্ট হয়, যাহাকে সর্বসাধারণে সংগ্রামের দেউল বলিয়া নির্দেশ করে।

সংগ্রাম সম্ভবত রাজপুত জাতীয় লোক ছিলেন, বঙ্গে বাসস্থাপন করিয়া তাহার আর স্বজাতি প্রাপ্তির আশা ছিল না, তখন কিরূপে কোন সমাজ প্রবেশলাভ করিবেন তাহার উপায় অন্বেষণ করিয়া স্থির করিলেন, ব্রাহ্মণের নিম্নে যে জাতি এই দেশে শ্রেষ্ঠ, তাহাদের সঙ্গেই মিলিত হইবেন। ব্রাহ্মণগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের নিম্নে এই দেশে কোন জাতি শ্রেষ্ঠ? তাহারা বলিলেন বৈদ্য। এইরূপে বৈদ্য হইয়া, তিনি প্রথমত কোরকদির ভট্টাচার্যগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, বৈদ্যকন্যা প্রাপ্তির জন্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে পাঁচথুপি গ্রামে নাওরার তহশিলদার সদাশিব নামে এক মহাত্মা বাস করিতেন, তাহার এক সুন্দরী বয়স্কা তনয়া ছিল; সংগ্রাম অনুসন্ধানে এই কথা অবগত হইয়া তাহার সমীপে কন্যা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন, নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত, সংগ্রামের পরাক্রমে ভীত হইয়া সদাশিব উহাতে সম্মত হইলেন।[২০] এইরূপে সংগ্রামের সহিত কুটুম্বিতাতে আবদ্ধ হইয়া সদাশিব যে কতকটা সৌভাগ্যের পথে উপনীত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সময় হইতেই তাহারা নাওরার চৌধুরী বলিয়া খ্যাত হন।[২১]

বর্তমান পাঁচথুপি, বারবাকপুর, হন্দসপুর প্রভৃতি গ্রামের পূর্ব দিয়া যে মরা পদ্মার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, উহা বহু পূর্বে অত্যন্ত বেগবতী ছিল। এই সময়ে নদীপথে ও প্রশস্ত বর্ত্মের নিকটই দস্যুভয় ছিল। এই জন্য সম্পত্তি ও প্রাণরক্ষার জন্য নাওয়াব চৌধুরীরা পাঁচথুপি পরিত্যাগ করিয়া বাণীবহ গ্রামে বাস সংস্থাপন করেন। বিশেষত পাঁচথুপির উত্তরে রাধাগঞ্জ নামে বড় একটি বন্দর ছিল। পদ্মাতীরে এই বন্দর সংস্থাপিত ছিল এবং তথা হইতে দক্ষিণ দিকে রাজাপুর পর্যন্ত পাঁচথুপির পূর্বদিক দিয়া এক বিস্তীর্ণ বর্ত্ম বিদ্যমান ছিল। উহাকে সাধারণে পল্টনের রাস্তা বলিত। মোগল শাসন সময়ে সৈনিকগণের যাতায়াতের জন্য এই রাস্তা ব্যবহৃত হইত, এই জন্য লোকে ইহাকে পল্টনের রাস্তা নামে অভিহিত করিত। উহা তৎনিকটবর্তী লোকের পক্ষে আশঙ্কার কারণ ছিল। এইরূপ স্থান তখন ভদ্রলোকদিগেরও বাস করিবার পক্ষে বিশেষ ভয়ের কারণ ছিল। বাণীবহ বোধহয় তৎকালে নিভৃত স্থান ছিল, এই কারণে নাওয়ার চৌধুরীরা সেই স্থানকেই বাসোপযোগী বলিয়া মনোনীত করেন। এই সময়ে বাণীবহের পশ্চিম দিক দিয়া পুরাই নদী (পদ্মার ক্ষুদ্র শাখা) প্রবাহিত হইত। রাধাগঞ্জ হইতে কুপাইখাল নামে একটা সোতা পুরাইখালের সহিত মিলিত হইয়াছিল। এখন বিল বুড়ি বা বাড়িয়া বিল যাহাকে বলে তাহাই এই নদীর উত্থিত জমি। রাধাগঞ্জের নিম্নস্থ পদ্মাভরটি স্থান, এখন রাধাগঞ্জের অথবা পেইজঘাটার বিল নামে প্রসিদ্ধ। যাহা হউক চৌধুরীগণ নানা উপদ্রবের আশঙ্কায়, পাঁচথুপি পরিত্যাগ করিয়া প্রায় ২০০ শত বৎসর পূর্বে বাণীবহে আগমন করেন।

বাণীবহ গ্রাম উত্তর দক্ষিণে সাড়ে তিন মাইল ও পূর্বে পশ্চিমে তিন মাইল হইবে। এই গ্রামে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ প্রায় সাত আটশত ঘর, বৈদ্য প্রায় দুই শত ঘর, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতি প্রায় আড়াই হাজার ঘর ছিল শুনা যায়। এই গ্রাম এইরূপ জনতাপূর্ণ ছিল যে, কাহারও বাহির খণ্ড ছিল না, স্ব স্ব বাস গৃহের বারেন্দাতেই বৈঠকখানা ছিল। এইরূপ জনতানিবন্ধন ১২৩৩ সালে তথায় ভীষণ মহামারী উপস্থিত হয়। উহাতে বহু লোক মৃত্যুমুখে ও বহু লোক স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তথাপি তথায় এইরূপ জনপূর্ণ ছিল যে, গ্রামটিকে রক্ষা করিতে ১২৬২ সালে তথায় মিউনিসিপাল প্রবর্তন উদ্দেশে গবর্নমেন্ট হইতে এক নোটিশ জারি হয়। যথা স্থানে উহা সন্নিবেশিত হইবে। নানা কারণে উহা আর হইয়া উঠে নাই।

বিদ্যাবাগীশপাড়া, আচার্যপাড়া,[২২] সরখেলপাড়া, ভট্টাচার্যপাড়া, সেনহাটিপাড়া, বসুপাড়া, বেনেপাড়া, ন্যনেপাড়া, পাচপাড়া প্রভৃতি জনহীন পাড়া আজিও গ্রামে বিদ্যমান রহিয়াছে।

সংগ্রাম সাহের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন চৌধুরীগণ স্ব সমাজে কতকটা নিন্দিত হওয়ায়, উহার পূরণার্থে যশোহর সমাজের কুলীন বৈদ্যের সহিত বহু আদানপ্রদান করিয়া পুনরায় সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই সূত্রে সেনহাটিস্থ কুলীন বৈদ্য অরবিন্দ বংশের সহিত কার্য করিয়া তাহাদের এক শাখা আনয়ন করিয়া স্ব গ্রাম বাণীবহে সংস্থাপন করেন। এই দাশগণ যে স্থানে বাস করেন, উহারই নাম হয় সেনহাটিপাড়া। যদুনাথ দাশ তলাপাত্র এই বংশের আদিপুরুষ, তাহার বংশধর দ্বারা এই গ্রামে যে পুষ্করিণী খনিত হয় উহা আজিও তলাপাত্রদের দিঘি নামে প্রসিদ্ধ। নাওরার চৌধুরীগণের বাড়ি, স্বদেশীয়গণের নিকট রাজবাড়ি নামে অভিহিত হয়। সাধারণত ইহারা মহাশয় নামে খ্যাত। তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত ; তন্মধ্যে সদাশিবের পৌত্র মাধবানন্দ রায় সম্পত্তির নয় আনা ও জগদানন্দ রায় সাত আনা[২৩] অংশ বিভাগ করিয়া লন। এই নাওরার ভূম্যধিকারীগণের বংশধরগণ নানাবিধ সৎকার্য দ্বারা যশোভাজন হইয়াছিলেন। ইহাদের দত্ত বৃত্তি, ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি জমি দ্বারা আজি পর্যন্তও বহুলোক প্রতিপালিত হইতেছে। ইহাদের বদান্যতার সাক্ষ্য স্বরূপ একটি গল্প চলিয়া আসিয়াছে, উহা এই স্থানে উল্লেখ করা হইল।

নওরার মহাশয়দের নিয়ম ছিল যে, গ্রামের ভিতর কোন লোক উপবাসী আছে কিনা উহার অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে আহার প্রদান করা। এই প্রকার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে একদা চৌধুরীদের কেহ এক ব্রাহ্মণের আলয়ে উপনীত হইয়া দেখিতে পান, একটি লোক পান্তাভাত খাইতে বসিয়াছেন, তাহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ আহার ত্যাগ করত আচমনান্তর তাম্বুল চর্বন করিতে লাগিলেন। উপস্থিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে এরূপ করাব কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বিপ্র তাহার বক্ষস্থলে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "দেশেব অধিকারী হইয়া কোথায় লোকে সুখ সাচ্ছন্দে থাকিবে তাহার ব্যবস্থা না কবিয়া, উপস্থিত হইলেন, পান্তভাত খাইবার সময় উপহাস করিতে।" চৌধুরী উহাতে কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখিত না হইয়া, তাহাকে বলিলেন "মহাশয়, আপনি এই তাম্বুল চর্বনাবস্থায় যতদূর পর্যন্ত অতিক্রম করিতে পারিবেন ততদূর ভূমি আপনার ভরণপোষণেব জন্য উৎসর্গীকৃত হইবে। কথামত কার্য হইল, ব্রাহ্মণ যতদূর পর্যন্ত গিয়াছিলেন ততটা ভূমি তাহাকে দান করা হইল, ঐ স্থান সিদ্ধান্তের গাতি বলিয়া আজিও পরিচিত আছে। যিনি এই বৃত্তি প্রাপ্ত হন, তাহার উপাধি ছিল সিদ্ধান্ত, এতৎসম্বন্ধে এই কথাটি রচিত হয়—

"পান খাইয়া মারিল লাথি।
তাইতে হইল সিদ্ধান্তের গাতি।।"

এই স্থানটি ভীমনগরের থাক নক্সায় একটি বৃহৎ চক। এই নক্সাতেও উহা নিষ্কর লিখিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় সিদ্ধান্ত বংশ একেবারে জনহীন হইয়া পড়ায়, নানা জনে উহা বেদখল করিযা ভোগ করিতেছেন।

চন্দনা নদীর তীরস্থ আড়কান্দি গ্রামে নাওরাব নৌকা প্রস্তুতের প্রধান কারখানা থাকার জন্য তথায় চৌধুরী মহাশয়গণের প্রধান কাছারি ছিল। নবাবী আমলের জলযুদ্ধের জন্য এই সকল যানের ব্যবহার হইত। পঞ্চথুপী গ্রাম বৈদ্যগণের প্রাচীন সাতাইশ সমাজের অন্তর্গত।

নবাব শাসন সময়ে যৎকালে সীতারাম রায় বিদ্রোহী হন, নাওরার বহু সম্পত্তি তিনি অধিকার করায়, চৌধুরীরা অবসন্ন হইয়া পড়েন। এই সময়ে অতি সামান্য সম্পত্তি মাত্র তাহাদেব হস্তগত থাকে। দশসনা বন্দোবস্তকালে উহার কর ধার্য হয় ; কারণ ইংরেজ গবর্নমেন্টেব অধিকারকালে আর এই সকল জলযানের আবশ্যক ছিল না। কাজেই নাওরার জমি যাহাবা ভোগ করিতেন, তাহাদিগকে কর দিতে বাধ্য হইতে হয়। এই নৌকা প্রস্তুত জন্য যে সকল সূত্রধর, কর্মকার প্রভৃতির ভূমি নির্দিষ্ট ছিল, এই কালে সেই সকল জমিরও কর ধার্য হয়। বর্তমান সময়ে ঐ সকল সূতারের তালুক ও কামারের তালুক নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বিভারিজ কৃত বাকরগঞ্জের ইতিহাসে নাওরার বিবরণে এই চৌধুরীবংশীয উদয়নারায়ণের নাম উল্লেখ আছে। পরবর্তী খণ্ডে নাওরার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই নাওরার ভূম্যধিকারী বংশের বিজয়কৃষ্ণ রায় এক্ষণে পূর্ণিয়া জেলার রায় লছমত সিংহ বাহাদুরের ম্যানেজার এবং তথাকার মিউনিসিপাল কমিশনর ও অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট এবং শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার রায় ফবিদপুরের জজকোর্টের উকিল এবং তত্রত্য মুনসেফকোর্টের গবর্নমেন্ট প্লীডার ও গোয়ালন্দ বিভাগের লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান।

বর্তমান সময়ে যাহারা এই গ্রামের মধ্যে বিশেষ অবস্থাপন্ন, সেই অরবিন্দ বংশপ্রভব মজুমদার বাবুগণের বিবরণ এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

বৈদ্য কুলীন বংশপত্রিকা (পাতরা) দৃষ্টে অবগত হওয়া যায়, অরবিন্দ যদুনাথ তলাপাত্রের বংশীয় নন্দকিশোর দাশ, বাণীবহ মাধববংশীয় রামনারায়ণ চৌধুরীর কন্যা এবং তৎপুত্র কৃষ্ণজীবন দাশ বাণীবহের মনোহর রায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই সকল কার্যসূত্রে এই

দাশবংশ সেনহাটি পরিত্যাগ করিয়া চৌধুরীগণের প্রদত্ত বৃত্তিভূমি প্রাপ্ত হইয়া বাণীবহ গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাহারা বাণীবহ গ্রামের যে পাড়ায় বাস করেন, উহাই সেনহাটিপাড়া নামে খ্যাত। প্রায় দেড়শত বৎসর অতীত হইল এই দাশবংশীয়গণ এই গ্রামে স্থায়ী হইয়াছেন।

কৃষ্ণজীবন দাশের দুই পুত্র, বিনোদ রায় ও সদাশিব। এই বংশের শিবশঙ্কর স্বীয় প্রতিভাবলে ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি গভর্নর জেনারেলের শাসন সময়ে, নাটোর রাজ সরকারের সরবরাহকার নিযুক্ত হইয়া অত্যন্ত দক্ষতা ও প্রশংসার সহিত কার্য করিয়াছিলেন। তৎকালে বড় বড় জমিদার সরকার গবর্নমেন্টের তত্ত্বাধীনের অন্তর্গত হইলে, গবর্নর জেনারেলের কাউন্‌সেল হইতে তাহারা নিযুক্ত হইতেন। নাটোরের রাজস্টেট এই সময়ে নানারূপ গোলযোগ নিবন্ধন ঋণী এবং রাজস্বপ্রদানে শিথিল প্রযত্ন হইলে, গবর্নমেন্টের পক্ষ হইতে শিবশঙ্কর এই কার্যে নিযুক্ত হন। এই উচ্চকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া শিবশঙ্কর বহু সম্পত্তি অর্জন করেন, এই সময় ইহাতে তাহার উপাধি মজুমদার হয়।

শিবশঙ্করের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ রামশঙ্কর ও কনিষ্ঠ জয়শঙ্কর। এই জয়শঙ্কর মজুমদার মহাশয় মুর্শিদাবাদের প্রভিন্সিয়াল কোর্টের মিরমুন্সী ছিলেন। বলা বাহুল্য এই সকল কার্যে থাকিয়া মজুমদারগণ বহু সম্পত্তির অধিকারী এবং জমিদার বলিয়া পরিচিত হন।

এই মজুমদার বংশের গিরিজাশঙ্কর মজুমদার, কলিকাতা হাইকোর্টে বহুকাল সুখ্যাতির সহিত ওকালতি কার্য করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান সময়ে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র প্রিয়শঙ্কর মজুমদার, হাইকোর্টের ওকালতি কার্যে নিযুক্ত আছেন। কমলা ও বাণীর অনুগৃহীত এই বংশের লোক স্বদেশে ও স্বসমাজের সর্বসাধারণের পরিচিত।

এই মজুমদাব বংশীয় পার্বতীশঙ্কর অপুত্রকাবস্থায় দুইটি কন্যা রাখিয়া লোকান্তরিত হন। প্রথমা কন্যার পুত্র বিপিনবিহারী সেন মুন্সী ও দ্বিতীয়া কন্যার পুত্র জ্ঞানদানন্দ ও সুখদানন্দ সেন মাতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া সেনহাটি গ্রাম হইতে আসিয়া এই স্থানে বাস করিতেছেন।

বাণীবহের মজুমদার বাবুদের অর্থব্যয়ে রাজবাড়ি মহকুমাতে একটি উচ্চ ইংরেজি স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের ব্যয় তাহাদের সম্পত্তি হইতে প্রদত্ত হয়। বিদ্যালয়ের জন্য বহু ব্যয়ে সুরম্য ইষ্টকালয় ও ছাত্রনিবাস (বোর্ডিং) স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্বগ্রামেও ইহাদের প্রতিষ্ঠিত একটি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

আমরা উপরে বাণীবহের নাওরার চৌধুরী এবং মজুমদার বংশের বিবরণ প্রদান করিলাম, এতদ্ভিন্ন এই গ্রামের মুন্সী পরিবারগণও এক সময়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহারাও মাধববংশীয়। এই মুন্সীবংশের রাধাকান্ত মজুমদার লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে একাউন্টেন্ট জেনারেলের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। যৎকালে বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তৎকালে রাধাকান্ত এই দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাণীবহ গ্রামে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্মাণ করান, উহার অধিকাংশ এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, বর্তমান সময়ে এই মাধব বংশের শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন একজন সুদক্ষ লেখক, তিনি বহুকাল পর্যন্ত পুলিশ বিভাগে কার্য করিয়া পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন, সম্প্রতি পেন্সন গ্রহণ করিয়াছেন। তদীয় পুত্র বসেরা যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত প্রফুল্লচন্দ্র সেন, বি.এ ডেপুটি কলেক্টর পদে মনোনীত হইয়াছেন। এই বংশের গোবিন্দপ্রসাদ সেন মুন্সী সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে তৎকালীন হায়দারাবাদের রেসিডেন্ট, স্যার রিচার্ড টেম্পল ও নাগপুরের চিফ কমিশনার প্লাউডেনের অধীনে কার্য করিয়া বিশেষ যশ অর্জন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র কবিরাজ শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র সেন কবিরঞ্জন, এক্ষণে সুখ্যাতির সহিত কলিকাতাতে চিকিৎসা কার্য সম্পাদন করিতেছেন।

লক্ষ্মীকুল

নবাব আলিবর্দি খাঁর অধীনে কোন কার্য করিয়া, কায়স্থ গুহ বংশীয় প্রভুরাম রায় প্রভূত সম্পত্তি অর্জন করেন। রায় সরকার হইতে কোনরূপ উপাধি না পাইলেও, স্বদেশীয়েরা ইহাদিগকে রাজা বলিয়াই সম্বোধন করিয়া থাকে। প্রভুরামের পুত্র গৌরীপ্রসাদ ও তৎপুত্র বিশ্বদিগীন্দ্রপ্রসাদ তৎপুত্র সূর্যকুমার। শেষোক্ত মহাত্মা রাজবাড়ি মহকুমার একটি উচ্চশ্রেণির ইংরেজি বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের পাকা বাড়ি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। অনেক দিন পর্যন্ত মহকুমার অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, এতদ্ভিন্ন ফরিদপুরের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ও রাজবাড়ির লোকালবোর্ডের মেম্বর ছিলেন। গবর্নমেন্ট সন্তুষ্ট হইয়া সূর্যকুমারকে রায় বাহাদুর উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর অতীত হইল সূর্যকুমার কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

কোড়কদি

এই স্থানটি বালিয়াকান্দি থানার অন্তর্গত। ঠাকুর রামচন্দ্র ভট্টাচার্য মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত সাইকুল গ্রাম হইতে আসিয়া এই গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। ভট্টাচার্য সিদ্ধপুরুষ বলিয়া খ্যাত থাকায় প্রসিদ্ধ সংগ্রাম সাহ তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন এবং গুরুদেবকে কোড়কদি ও আরও অনেক স্থান ব্রহ্মোত্তর জমি প্রদান করেন। এই বংশে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত রামধন তর্কপঞ্চানন এই বংশের লোক ছিলেন।

ভট্টাচার্যদের স্থাপিত কুলীন সান্যাল, ভাদুড়ি, লাহিড়িগণ মধ্যে অনেকেই সম্পত্তিশালী ছিলেন, তন্মধ্যে মধুসূদন সান্যাল বিখ্যাত ছিলেন। নীলকুঠীর আয়ের দ্বারা এই সান্যাল মহাশয় কয়েকটি পরগণার মালিক হন। এই মহাত্মা কলিকাতা বাস করিতেন। জোড়াসাঁকোর রাস্তার পর যে ঘড়িসংযুক্ত বৃহৎ বাড়ি দৃষ্ট হয়, তথায় মধু বাস করিতেন। পরে ঋণদায়ে এই বাড়ি মল্লিকদের হস্তগত হয়। কোড়কদির সান্যাল বাড়িতে এক রাত্রিতে ১০১ খানা শ্যামা পূজা নির্বাহ হইয়াছিল। এই গ্রামের পোস্টাল ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল রাধিকাপ্রসাদ লাহিড়ি মহাশয় শেষ সময়ের বিখ্যাত লোক। মুনসেফ যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ি ও অনঙ্গমোহন লাহিড়ির বাসস্থানও এই গ্রামেই।

বেলেকান্দি

রাজবাড়ি হইতে ১৩ মাইল দূরে। এই স্থানে বহু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাস করেন। তন্মধ্যে চৌধুরী উপাধিধারী ব্যক্তিগণ প্রসিদ্ধ। পাইকপাড়ার রাজাদের মহিমসাহি পরগণার সদর কাছারি এই স্থানে সংস্থাপিত। এখানে একটা থানা ও হাট আছে। তত্রত্য মুন্‌সেফ কানাই লাহিড়ির নাম উল্লেখযোগ্য।

বারৈখালি

বৈদিক আগমাচার্যের এক শাখা এই গ্রামে বাস করেন। বহু পণ্ডিত এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। এই বংশের বর্তমান শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় উপদেশ দ্বারা বহু উশৃঙ্খল যুবককে হিন্দুধর্মে পুনরানয়ন করিয়াছেন। তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও বাগ্মী। এই মহাত্মার পুত্র নৈয়ায়িক রাখালচন্দ্র তর্কতীর্থ কাশ্মীর রাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে অত্যল্প বয়সে ইনি পিতৃদেবকে ও দেশবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে গমন করিয়াছেন।

উজিরপুর

কুমার নদ তীরে সাতোর পরগণার অন্তর্গত একটি প্রাচীন স্থান। আড়াই শত বৎসর পূর্বে বৈদিক ব্রাহ্মণবংশে রামানন্দ ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। দেবীর আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করায় তাহাকে সকলে দেবীবর বলিয়া সম্বোধন করিত। তৎপ্রতিষ্ঠিত শিব ও পঞ্চমুণ্ডের উপর সংস্থাপিত কালীমূর্তি অদ্যাপি মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। এই দেবদেবীর অর্চনার জন্য নাটোরের ও চাচড়ার রাজগণ বহু ভূ-সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। চাচড়ার রাজাদের দত্ত ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের তায়দাদ অদ্যাপি বর্তমান আছে। ১৬৯১ শকে (১১৬৬ সালে) এই মন্দির নির্মিত হয়। কুমার নদের পূর্বতীরে, উজীরপুর হাটের অব্যবহিত উত্তর দিকে দেবীবরের শ্মশানঘাট অদ্যাপি বর্তমান আছে, জনগণ অদ্যাপি তথায় মানত ও মাল্য প্রদান করিয়া থাকে।

মেঘচামী

প্রাচীন বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজের মধ্যে যে ২৭টি স্থানের পরিচয় আছে, মেঘচামী উহার অন্যতম। মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত দাশড়া সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ভানুদত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতার বংশধরগণ দ্বারা মেঘচামী ও ভোগিলহট্টের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থানের শ্রীমন্ত খাঁ ও বংশীবদন মৌলিক খ্যাত লোক ছিলেন। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে বৈদ্যবংশীয় অযোধ্যারাম সেন কর্তৃক স্থানীয় বিগ্রহ গোপালের মন্দির নির্মিত হয়। স্থানটি বালিয়াকান্দি থানার অন্তর্গত।

লূনক্ষীর

থানা নাগরকান্দার অন্তর্গত এই স্থানে অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করেন। কোটালিপাড়াতে ইহাদের পূর্বপুরুষেরা বাস করিতেন। ইহাদের ব্যবসায় যাজকতা, তন্মধ্যে অনেকের পাণ্ডিত্য খ্যাতি ছিল। এই স্থানে একটি প্রাচীন সুদৃশ্য মন্দির আছে। এই মন্দির কাহা দ্বারা কখন নির্মিত হয়, উহা অবগত হওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, উজানীর জমিদার এই বৈদিকবংশের শিষ্যত্ব নিবন্ধন তাহারাই স্বীয় গুরুধামে এই মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

কাজীটোলা বা ফুলহারা

মুকসুদপুর থানার অধীন এই স্থানে কয়েক ঘর ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ তালুকদার বাস করিয়া থাকেন। এই স্থানে সুলতান দীর্ঘিকা নামে একটি প্রকাণ্ড জলাশয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। উহার অনেক স্থান জমিতে এবং অপরাংশ জঙ্গল ও নানারূপ দাম ও শৈবালে পরিপূর্ণ। স্থানের নাম এবং দিঘির নাম হইতে বুঝা যায়, এই স্থানে কোন প্রধান মুসলমান ব্যক্তি বাস করিতেন। তালুকদার চক্রবর্তীগণের যাজনিক ব্যবসায়। খান্দারপাড়ার অধিকাংশ বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের ইহারাই পুরোহিত।

ভূষণার আচার্য বংশ

বঙ্গ দেশের কয়েকটি জেলায় সরযুপারী গ্রহবিপ্রগণ বাস করেন। এই সমাজ পাণ্ডিত্য দ্বারা বহুকাল হইতে বিখ্যাত ছিলেন। এই সমাজস্থ গ্রহবিপ্রগণের মধ্যে যাহারা ফরিদপুর জেলায় বাস করেন, কেবল তাহাদের বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ হইতেছে। ফরিদপুরের গোয়ালন্দ সবডিভিসনেই সরযুপারী গ্রহবিপ্রগণের বাস। ইহারা তিনশত বৎসর পূর্ব হইতে একশত বৎসরের পূর্ব মধ্যে এই জেলায় আসিয়া বাস করিয়াছেন।

কাশ্যপ গোত্রীয় মধুসূদন উপাধ্যায় নামক এক বিখ্যাত জ্যোতির্বিৎ পঞ্চকোটের রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি অনুমান সপ্তদশ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে চন্দ্রনাথ তীর্থদর্শন করিয়া

পঞ্চকোটে প্রত্যাগমনকালে ভূষণার রাজা মুকুন্দরাম রায়ের সভায় উপস্থিত হন। সঙ্গে যুবা পুত্র বিশ্বরূপ। মধুসূদন ও তৎপুত্র উভয়েই মহাপণ্ডিত ছিলেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রে তাহাদের বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। রাজসভার পণ্ডিতগণের সহিত পিতা-পুত্রের অনেক শাস্ত্রীয় বিচার হইল। তাহাদের পাণ্ডিত্য দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর মধুসূদন বলিলেন "ভূষণারাজের এত বড সভায় ভাল জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত নাই। জ্যোতিষ শাস্ত্র বেদের চক্ষু এবং প্রধান বেদাঙ্গ, কালজ্ঞান জ্যোতিষ শাস্ত্রে বুৎপত্তি সাপেক্ষ, অতএব কালজ্ঞান ব্যতীত বৈধ ক্রিয়া কোন প্রকারেই যথাবিধি সম্পন্ন হইতে পারে না।"[১৮] তখন রাজা মুকুন্দরাম রায় ও অন্যান্য সভাসদগণ পণ্ডিত মধুসূদনকে ভূষণার রাজপণ্ডিত হইতে অনুরোধ করেন। তিনি স্বয়ং ভূষণা রাজধানীতে না থাকিয়া তাহার সুপণ্ডিত পুত্র বিশ্বরূপকে সেখানে রাখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। তাহার পর মধুসূদন উপাধ্যায় মহাশয় পঞ্চকোটে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় আরাধ্য দেব বাসুদেব বিগ্রহ সহ পুত্র বিশ্বরূপকে ভূষণায় প্রেরণ করেন। ভূষণারাজ চন্দনা নদীর বামতীরে পাঁচ শত বিঘা ব্রহ্মত্রা ভূমিসহ বিশ্বরূপকে বাসস্থান প্রদান করেন। বিশ্বরূপ স্বীয় ইষ্টদেব বাসুদেব বিগ্রহের নামানুসারে চন্দনা নদীব চরভূমিস্থিত স্থানকে বাসুদেবপুর নাম রাখেন। এই বাসুদেবপুব এখন "বাসপুর" নামে খ্যাত।

উক্ত মাহাত্মা বিশ্বরূপ হইতে অধস্তন একাদশ পুরুষ পণ্ডিত মহাদেব আচার্য (ইনি মহাদেব ঠাকুর নামে বিখ্যাত ছিলেন)। মহাদেবের যথেষ্ট বিদ্যার খ্যাতি ছিল এবং তিনি একজন সাধক ছিলেন। তিনি তাহাদের পূর্বপুরুষাধিষ্ঠিত পুণ্যস্থান বাসপুরের অধিকাংশ চন্দনার গর্ভস্থ হইলে কিছুদিনের জন্য বর্তমান মরা পদ্মার পশ্চিম তীরস্থ মুলঘর গ্রামে বাস করেন। তৎকালে মধুমতীর তীরস্থ মহম্মদপুরের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ রাজা সীতারাম রায় প্রবল পরাক্রান্ত ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি পরম সাধক পণ্ডিত মহাদেবকে আহ্বান করিয়া শিবত্রা ও ব্রহ্মত্রা ভূমি পাঁচশত বিঘা দান করিয়া বাসপুরের সন্নিহিত চন্দনাব অপর পাবস্থিত বাগাট গ্রামে বাসস্থান নির্দেশ করেন। সাধক প্রবব মহাদেবের বাটির সম্মুখে শ্যামল তৃণমণ্ডিত বিস্তৃত ভূমি ও উহার প্রান্তদেশে নদীর উপরে রাজা সীতারাম রায়ের ব্যয়ে নির্মিত এক শিব মন্দির ছিল। অপরাহ্নে গ্রাম্য ভদ্রলোকেরা মন্দির সম্মুখস্থ বিস্তৃত ভূমিতে বসিয়া পণ্ডিতবব মহাদেবের মুখে শাস্ত্রীয় কথা শ্রবণ করিতেন। সাধক প্রবব মহাদেবেব সে মনোহর পুষ্পোদ্যান এবং সুপারি নারিকেল আম-কাঁঠালের সুবিস্তৃত বাগান এখন আর নাই। আর সেই ধনধান্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত জীবন গ্রামবাসীর শাস্ত্রীয় আলাপ শ্রবণে ঔৎসুক্য এবং পঞ্চানন তুল্য মহাদেবের সবস শাস্ত্রীয় কথা, মনোবম গল্পও আর নাই। এখন সমস্তই কথা মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে।

মহাদেব ঠাকুবের এক পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্র কালীপ্রসাদ ঠাকুরও পিতার ন্যায় সুপণ্ডিত ও সাধক ছিলেন। তাহার ধনতৃষ্ণা অধিক ছিল না, তিনি বাটি হইতে অন্য স্থানে যাইতেন না। ব্রহ্মত্রা ও শিবত্রা ভূমিব আয় ও গ্রাম্য লোকে শাস্ত্রীয় ব্যবসায়ের জন্য যাহা প্রদান করিত, তদ্দারা অতি শান্তিতে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তাহার অধিক সময় শিবের সম্মুখে ধ্যানধারণায় অতিবাহিত হইত। মহাদেব ঠাকুর জীবিত থাকিতে তাহার তিন কন্যাকেই সংস্কৃতভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই তিন কন্যার নাম সুলোচনা, সাবিত্রী ও অপর্ণা। ইহাদের মধ্যে সুলোচনা দেবী সংস্কৃত ব্যাকরণ, বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পিতার নিকট পাঠ করিয়াছিলেন। ইনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন। সুলোচনা দেবী স্বামী ও পুত্রগণের সহিত নৌকাযোগে কাশী যাত্রা করেন। ত্রিরাত্রি-বাসের পর স্বামী উমাকান্ত বিদ্যানিধি মহাশয় কাশীলাভ করিলে ইনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আর গৃহে ফিরিবেন না। তাহার বিশ্বাস ছিল, স্বামী বিয়োগের পর, এক বৎসবের মধ্যে দেহত্যাগ করিলে পুনরায় সেই স্বামীকে লাভ করা যায়। তজ্জন্য তিনি প্রত্যাগমনকালে নবদ্বীপে তাহার শ্বশুর কুলের

জ্ঞাতিগৃহে বাস করেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাহার সজ্ঞান গঙ্গালাভ হয়। এই বিদুষী সুলোচনা দেবীই পীতাম্বর বিদ্যানিধি মহাশয়ের জননী ও মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম.এ, পি.এইচ.ডি, মহাশয়ের পিতামহী। কালীপ্রসাদের পুত্র তারকনাথ আচার্য কিছুকাল বাগাটে বাস করেন। তাহার পরলোক গমনের পর তাহার দৌহিত্র বাসুদেব বিগ্রহ ও শিবের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন, উপর্যুপরি তাহাদের দৈব বিপদ ঘটায় তাহারা ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন। এখন সেই সুখ সমৃদ্ধিপূর্ণ বাগাট গ্রাম জনশূন্য, দুই চারি ঘর মাত্র লোক বাস করে। পাঁচ সাত বৎসর পূর্বেও সেই শ্বেত পাষাণের মহাদেব মূর্তি চন্দনা তীরস্থ প্রাচীন কালী বাড়ির সম্মুখস্থ একটি অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে দৃষ্ট হইত। এই বাণলিঙ্গ শিব গৌরীপট্ট হইতে এক হাত উচ্চ। মহাদেব ঠাকুরের অধস্তন বংশের দৌহিত্রকুলের মধ্যে মধুখালি বন্দরের সন্নিহিত আড়কান্দি নিবাসী শ্রীমোহন আচার্য ও আশুতোষ আচার্য রাজা সীতারামের ব্রহ্মত্রা শিবত্রা ভূমির নষ্টাবশেষ ভোগ করিতেছেন।

বাসুদেবপুর নদী গর্ভস্থ হইলে মধুসূদন উপাধ্যায়ের বংশের আর এক শাখা গোপীকৃষ্ণ আচার্য পাবনা জেলার আড়াই ক্রোশ পশ্চিমে প্রতাপপুর গ্রামে গিয়া বাস করেন। এই বংশে কোষ্ঠী কৌমুদী নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ গ্রন্থের প্রণেতা গঙ্গাগোবিন্দ আচার্য মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। গঙ্গাগোবিন্দ আচার্য মহাশয় সূর্যসিদ্ধান্ত অনুযায়ী একখানি করণ গ্রন্থ ও সূর্যসিদ্ধান্তের বঙ্গানুবাদ করেন। তাহার পৌত্র শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর আচার্য ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পাংশানিবাসী মাতুল মধুসূদন আচার্যের উত্তরাধিকারী হইয়া তাহার পৈতৃক ব্রহ্মত্র ভূমির কিয়দংশ ভোগ করিতেছেন। এই ব্রহ্মত্র ভূমি নাটোরের রাজা রামজীবন রায়ের প্রদত্ত।

রাজা শশাঙ্কানীত সরযুপরী গ্রহ বিপ্রগণের আর একটি প্রসিদ্ধ বংশ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খালকুলা গ্রামে বাস করেন। এই বংশেব আদিপুরুষ মৌদগল্য গোত্রীয় কমলাকর মিশ্র। ইনি সাধারণের মধ্যে কমলাকর জ্যোতিষী নামে খ্যাত ছিলেন। কমলাকরের কৃত জ্যোতিষ গ্রন্থের টীকা আছে। এই কমলাকর মিশ্র এবং নদিয়ার মহারাজের পঞ্জিকাকার বংশের আদি পুরুষ গর্গগোত্রীয় হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব (ইহাদের কুলোপাধি দুবে বা দ্বিবেদী) পঞ্চকোটের নিকটে বাস করিতেন। এখান হইতে নদিয়ার রাজবংশের অভ্যুদয়ের পূর্বে নবদ্বীপে আসিয়া বাসে করেন। নবদ্বীপ কমলাকরের বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। এই কমলাকরেব বংশে প্রসিদ্ধ রাজীবলোচন বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন। রাজীবলোচন সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাহার বৃহৎ-চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই অধ্যাপিত হইত। এই রাজীবলোচনের পৌত্র শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চম্পকাদহ বিলের সন্নিহিত ধরমাটি গ্রামে কিছুকালের জন্য আসিয়া বাস করেন। পূর্বে যখন কলিকাতা মহানগরীর পত্তন হয় নাই, তখন ভূষণা নগরী বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। ভূষণার রাজা ও তৎপর ভূষণা প্রদেশের শাসনকর্তা সংগ্রাম সাহা ও মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায়, ইহারা সকলেই বিদ্যারসজ্ঞ ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তজ্জন্য অনেক পণ্ডিত ও গুণী লোক ভূষণার সন্নিহিত স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বিশেষত বহু সংখ্যক জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ভূষণা ও তাহার নিকটে বাস করিতেন। পণ্ডিত শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় ধরমাটিতে বাস করায় এখানে সংস্কৃত চচার বিলক্ষণ অভ্যুদয় হইল। তাঁহার আর তিন চারি ভ্রাতা নবদ্বীপেই বাস করিতে লাগিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ স্থানীয় ভূম্যধিকারীদের নিকট হইতে অনেক ব্রহ্মত্রা ভূমি ও স্বীয় পৈতৃক উপাস্য দেবতা রঘুনাথ, সুদর্শন, দধিবামন প্রভৃতি শালগ্রাম নারায়ণের দেবত্রা ভূমি অর্জন করিয়াছিলেন। এতভিন্ন দুই তিনখানি গ্রামের তহশিলদারী নিজ তত্ত্বাবধানে কর্মচারি দ্বারা নির্বাহ করিতেন। তাহার পরলোক গমনের পর জমিদারগণের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের পুত্রগণ কোন পক্ষ

অবলম্বন করাই শ্রেয় মনে করেন নাই। তাহারা দেবত্রা ভূমি ব্যতীত অন্য সকল ভূমি হস্তান্তর করিয়া ঐ স্থানের উত্তর পশ্চিমাংশে চন্দনা নদীর তীরে খালকুলা নামক একটি নূতন পল্লীতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। চন্দনা নদী কঙ্কণের ন্যায় এই গ্রামটি পরিবেষ্টন করিয়া বেগবতী মধুমতী (গরাই) অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। চন্দনা নদীর ঠিক উত্তর তীরে শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পাঁচ পুত্র উমাকান্ত বিদ্যানিধি প্রভৃতি আসিয়া বাস করেন। শ্রেণিবদ্ধ সুপারি ও নারিকেল তরু দ্বারা সুশোভিত ইহাদের বাসভবন অতি সুন্দর দেখাইত। এখন নদীর গতি পরিবর্তন হইয়া কিঞ্চিৎ দূর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। উমাকান্ত বিদ্যানিধির চারি পুত্রের মধ্যে তৃতীয় পীতাম্বর রিদ্যাবাগীশ জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। সাধারণের নিকটে তিনি বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া সম্মানিত ও পূজিত হইতেন। তিনি ভূম্যধিকারী ও ধনীদের গৃহে বৎসরে প্রায় ৩০/৪০টি গ্রহ স্বস্ত্যয়ন ও গ্রহযাগ করিতেন, (তাহার এমনই অসাধারণ দৈববল ছিল যে) তাহাদের সকলেরই সংকল্প সিদ্ধি হইত। তিনি যেমন শাস্ত্র ব্যবসায় আশাতিরিক্ত অর্থোপার্জন করিতেন, তেমনি মুক্ত হস্ত ছিলেন। দোল দুর্গোৎসব ব্রত নিয়মাদি সমুদয় তিনি অতি নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিতেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় পরোপকারী ছিলেন। নানা প্রকারে পরোপকার করিতেন। বিশেষত অনেকের বিবাহে, মাতৃপিতৃ শ্রাদ্ধে মহাজনেরা উপযুক্ত বন্ধক না পাওয়ায় টাকা ধার না দিতে চাহিলে তিনি প্রতিভূ হইয়া টাকা ধার লইয়া দিতেন।

এই বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা ও গবর্নমেন্ট পঞ্জিকাব প্রণেতা ছিলেন। সমস্ত জীবন গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন কবায় ভারতের স্টেট সেক্রেটারি ইহার জন্য মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি দেওয়ার আদেশ করেন। অল্পদিন বৃত্তি ভোগ করিয়া জ্যোতিষার্ণব মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ই সর্বপ্রথম স্টেট পেনসন প্রাপ্ত হন। মধ্যম পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ও তৃতীয় মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম.এ, পি.এইচ-ডি। চতুর্থ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন আচার্য। ইহারা এখন খালকুলার বাটিতে বাস করেন না। পূর্বপুরুষগণের অধ্যুষিত নবদ্বীপে বাটি নির্মাণ করিয়াছেন। কলিকাতায়ও ইহাদের বাটি আছে। ইহারা এখন অধিকাংশ সময় কলিকাতায় বাস করেন। ইহাদের জ্ঞাতিগণ খালকুলায় বাস করেন।

গোয়ালন্দ মহকুমার সন্নিহিত মরা পদ্মার তীরে হম্‌দম্‌পুব নামে একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে, উহার একাংশকে মূলঘর বলে। মূলঘরের সরযুপারী গ্রহ-বিপ্রকুল সম্ভূত রামকান্ত আচার্য মহাশয়ের পূর্বপুরুষেরা স্ফটিক প্রস্তরের একটি সূর্যমূর্তি ও দামোদর নামক এক নারায়ণ মূর্তির সেবা করিতেন। সূর্যমূর্তি আকারে তত বড় নহে, গোলাকার। প্রতিদিন পূজার পূর্বে স্নান করাইবার সময় চন্দন ধৌত হইলে ঐ মূর্তি হইতে অপূর্ব রশ্মি নির্গত হয়। আমরা স্ফটিক পাযাণ অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ উজ্জ্বল স্বচ্ছ মূর্তি আর কখনো দৃষ্টিগোচর করি নাই। কোন যুগে কোন দেশ হইতে এই মূর্তি সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। দামোদর প্রকাণ্ড শালগ্রাম নারায়ণ মূর্তি—প্রতিদিন পূজার পূর্বে স্নান করাইবার সময় হাতে করিলে অতিশয় ভার বোধ হয়। এই দুই বিগ্রহের জন্য পূর্বকালে বাংলার প্রাচীন রাজারা যে সকল দেবত্রা ও ব্রহ্মত্রা ভূমি দান করিয়াছিলেন রামকান্ত আচার্যের পূর্বপুরুষেরা তাহা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, তদ্ভিন্ন রাজা সীতারাম রায়ের রাজ্যাবসানে নাটোরের রাজা রামজীবন ঐ প্রদেশ জমিদারি প্রাপ্ত হইলে তিনিও রামকান্ত আচার্যকে দামোদরের সেবার নিমিত্ত ২৫ বিঘা দেবত্র ভূমি তাম্রপত্রে লিখিয়া দান করেন। রামকান্তের বংশে অধস্তন পুরুষ পুত্রহীন হওয়ায়, ঐ মহকুমার শিঙ্গ দ্বাদশী নিবাসী বিখ্যাত ভরদ্বাজগোত্রীয় বাণীকণ্ঠ বৃহজ্জ্যোতিষীর চতুর্থ পুরুষ

হরিপ্রসাদ বৃহজ্জ্যোতির্ষী ঐ বংশের একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাহার বংশধরগণ মূলঘরে বাস করিয়া ঐ ব্রহ্মত্রা ও দেবত্রা ভূমি ভোগ করিতেন। ইহাদের ভূমির পরিমাণ অনেক, সরিকগণ পরস্পর পরস্পরের ভাব দেওয়ায় অনাস্থা বশত অনেক ভূমি বেদখল হয়, যখন ফরিদপুর জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ঐ সকল স্থান যশোর জেলার অধীন ছিল, তখন ঐ বংশের গোলকচন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতি উহার অনেকাংশ উদ্ধার করেন। এই গ্রামটি অতি প্রাচীন। প্রাচীনতার চিহ্ন যে সকল বৃহৎ দীর্ঘিকা বিদ্যমান দেখা যায়, তাহার তীরে যেমন নিবিড় অরণ্য, জলের উপর দামদল, তাহার উপর অসংখ্য বৃক্ষরাজি উৎপন্ন ঘন বন। ঐ সকল গভীর জলাশয়ের জলে কুম্ভীর ও দামদলের অরণ্যের মধ্যে ব্যাঘ্র বাস করে। কোন কোন স্থলে ব্যাঘ্র ভাল্লুক কি শৃগালেরা জলাশয়ের এক কোণে দামদলপানা ভেদ করিয়া জল পান করায় কিছু স্থানে জল দৃষ্ট হয়। ঐ সকল স্থান দিবসে যাওয়াও বিপজ্জনক। পূর্বোক্ত আচার্য মহাশয়গণের বাটিটি প্রায় ২০ বিঘার উপর, তাহার তিনদিকেই ঐরূপ সকল দীর্ঘিকা। অনেক লোক পূর্বেই এই পুরাতন গ্রাম ত্যাগপূর্বক দূরে গিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। আচার্য মহাশয়েরা ভূমি বিত্তি, সুপারি নারকেল ও আম কাঁঠালের বাগানের আশা ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার ফলে তাহাদের বংশ বিলুপ্ত প্রায়, এক পণ্ডিত কাশীচন্দ্র আচার্য মহাশয় গ্রামের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, সংপ্রতি তিনিও পরলোক গমন করিয়াছেন। যে স্থান পূর্ব দুই তিনটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপক ও ছাত্রগণের শাস্ত্রালোচনায় সর্বদা মুখর ছিল, তাহা এখন অরণ্য সঙ্কুল এবং কয়েকটি বিধবা ও রোগে জীর্ণ দুই একটি পুত্র ও বালকের নীরব নিকেতন। এখনও সায়ংকালে দেবগৃহে টিম্‌টিম্ করিয়া আলোক জ্বলে, ইহার পরে কি হইবে ভগবান সূর্যদেবই জানেন।

পূর্বোক্ত হমদম্‌পুরের সন্নিহিত মরাপদ্মার ঠিক পশ্চিম তীরে পাঁচথুপি নামে একটি অতি প্রাচীন অরণ্যপূর্ণ গ্রাম দেখা যায়। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে এই গ্রাম অতিশয় সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল। এই গ্রামে বৈদ্য জাতীয় এক প্রাচীন জমিদার বংশ বাস করিতেন। সমগ্র নাওয়ারা পরগণাটি তাহাদের অধীন ছিল। তাহাদিগকে সচরাচর নাওয়ারার জমিদার বলে। নাওয়ারার জমিদার বংশ অতিশয় শাস্ত্রনিষ্ঠ ও অতি ধূমধামের সহিত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিতেন। এক সময় ঐ জমিদার বংশের কোন প্রধান ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার অন্তর্গত গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমস্থল ত্রিবেণী তীর্থে গমন করেন। তিনি কয়েক দিন ত্রিবেণীতে বাস করেন। ত্রিবেণী বহু পূর্ব হইতে পণ্ডিত প্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেখান অনেক পণ্ডিতের সহিত নাওয়ারার পরগণার অধিকারী রায় মহাশয়ের পরিচয় হয়। তন্মধ্যে পরাশর গোত্রীয় মুকুন্দরাম চক্রবর্তী নামক একজন সরযুপারী গ্রহবিগ্রহের সহিত আলাপে তিনি পরম সন্তুষ্ট হন। মুকুন্দরাম যে শুধু জ্যোতিঃশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন তাহা নহে, ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রেও তাহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। রায় মহাশয় বিশেষ অনুরোধ করিয়া মুকুন্দরামকে পাঁচথুপিতে আনয়ন করেন এবং প্রচুর ব্রহ্মত্রা ভূমি প্রদান করিয়া ঐ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন। কালক্রমে মহামারীতে পাঁচথুপী শ্মশানে পরিণত হইলে রায় মহাশয়েরা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া সন্নিহিত বাণীবহ গ্রামে গিয়া বাস করেন। মুকুন্দরামের বংশধরেরাও তাহাদের সহিত আগমন করেন। মুকুন্দরামের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার বাণীবহ গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইহার পৌত্র রামরুদ্র অসাধারণ পণ্ডিত ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাহার বাটির নিকটে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন।

বেথুলিয়া

এই স্থানটি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। কাজী উপাধিধারী বহু

মুসলমান এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কোন মুসলমান বাদসাহ কর্তৃক প্রদত্ত নিষ্কর তালুক ইহারা ভোগ করিতেন। কিন্তু দাতার নাম অবগত হওয়া যায় না। মুসলমান আইনের বিধান অনুসারে ৫২ জন লোক এই তালুকের মালিক হইয়া পড়েন। বর্তমানে উহার মধ্যে ১৪ জনের বংশধর মাত্র উহা ভোগ করিতেছেন। অন্যান্য অংশীদারগণের কোন সন্তান সন্ততি বর্তমান নাই। এই নিষ্কর তালুকের কর কি প্রকারে নির্দিষ্ট হইয়াছিল সেই প্রবাদটি বড়ই কৌতূহল জনক, উহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

কোন ঘটনা উপলক্ষে একজন সুবেদার বেথুলিয়া পরিদর্শনে উপস্থিত হন। কাজি তালুকদারগণ নিয়ম মত নজর দেওয়ার উদ্যোগী হইলেন। সুবেদার কিন্তু উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পাছে তালুকদারগণ অসন্তুষ্ট হয়, এই বিবেচনা করিয়া, ঐ টাকাগুলি সরকারে গ্রহণ করিয়া জমার কাগজে কর বাবদ লিখিয়া দেন। এই সূত্রে তাহাদের তালুকের কর ধার্য হয়। এই তালুকদার বংশীয় কাজী গোলাম সবদর মোগল প্রভাব সময়ে বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে, তিনি ক্ষমতায় অপরাধী ব্যক্তিকে ফাঁসি বা শূলে দিতে পারিতেন। তৎকর্তৃক নির্মিত একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা ছিল, উহা বর্তমান সময়ে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই বাটি অদ্যাপি কাজি বাড়ি নামে প্রসিদ্ধ।

বেথুলিয়াতে নীলের কুঠি ছিল, এখন পর্যন্ত উহার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এই গ্রামটি বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, সংক্রামক রোগে অধিকাংশ লোক বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, বর্তমান সময়ে উহা একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থান মধ্যে পরিগণিত। অধুনা এখানে কাজি আবদুল লতিফ ও মুন্সী আবদুল আলী এই দুই জনের অবস্থাই সমৃদ্ধিশালী।

কুরসী, পদমদী, রাজধারপুর

বালিয়াকান্দি থানার অধীন ঃ—কুরসির মৌলবি আবদুল কাদের ও খোন্দকার উজির আলীর বংশ প্রসিদ্ধ ও পুরাতন। পূর্বোক্ত বংশের বর্তমান গৌরব মাননীয় চৌধুরী মহাম্মদ এসমাইল খাঁ। ইহার পিতা বরিশাল চড়ামদ্দির চৌধুরী মহাম্মদ আসমত আলি খাঁ পরোপকারী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কুরসির জমিদার বংশ দান ধ্যানের জন্য বিশেষ বিখ্যাত।

পদমদীর মির সাহেবদের বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বংশের মিরআলি আসরাফ সাহেব বৃহৎ জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ইংরাজ রাজ সরকার হইতে "খান বাহাদুর" সম্মানসূচক উপাধি ভূষণে ভূষিত হন। ইহার পূর্ববর্তী কতিপয় পুরুষ সরকারি কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। খান বাহাদুর মিরআলি আসরাফ সাহেবের গুণধর পুত্রই নবাব মির মহাম্মদ আলি সাহেব। দুঃখের বিষয় এই বংশের কোন সন্তান সন্ততি নাই। নবাব সাহেবের তিনটি ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিল, দুইটি বঙ্গের কৃতি সন্তান, বাংলা গবর্নমেন্টের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর মাননীয় নবাব শামসোল হোদা এম এ., বি. এল. সাহেবের সহিত এবং কনিষ্ঠটি কুরসির জমিদার চৌধুরী মহাম্মদ এসমাইল খান সাহেবের সহিত বিবাহ হয়। কাহারই কোন সন্তান বিদ্যমান নাই। এই স্থানবাসী ভূতপূর্ব ডেপুটিকালেক্টর নবাব আবদুল লতিফ বিখ্যাত লোক ছিলেন।

দক্ষিণ বাড়িতে বিখ্যাত সাধক মনুমিয়া ও সনুমিয়ার আবাস বাটি ও সমাধি বিদ্যমান আছে। এখনও হিন্দু মুসলমানে স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত ইহাদের নামে মানত করিয়া থাকেন।

শেখ আড়ায় সাধক শাহ পাহলোয়ানের সমাধি আছে। ইনি জীবদ্দশায় অনেক অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করাইয়াছেন। মৃত্যুর পর মৌলবী সাহেবরা ঐ প্রকার কবর দেওয়া মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করায় চিরপ্রচলিত প্রথামত উত্তর দক্ষিণ লম্বভাবে সমাধি প্রদত্ত

হয়। ভোরে উঠিয়া দেখা গেল যে সমাধি পূর্ব পশ্চিম দীর্ঘ হইয়া রহিয়াছে। এখনও এই সমাধি পূর্ব পশ্চিম লম্বভাবেই রহিয়াছে। ইহার খাদেম বা সেবাইত বংশ বিখ্যাত।

রাজধরপুরের মৌলবি বংশ প্রসিদ্ধ। এই বংশের স্থাপয়িতার অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে, তাহার সম্মানার্থ নবাব সরকার হইতে যে আয়মা প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাই ফরিদপুরের কালেক্টরির তৌজির বর্তমান ২৫৩১ নং তালুক। দুঃখের বিষয় যে এই সম্পত্তি প্রায় তিন পুরুষ পূর্বে এই বংশের হস্তচ্যুত হইয়াছে। এই বংশের বর্তমান গৌরব মৌলবী আকছারউদ্দিন বিদ্বজন সমাজে বিশেষ পরিচিত এবং বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ও সুবক্তা। ইনি দেশের কল্যাণে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। রাজধরপুরের বেগদের বংশ বিখ্যাত। এই বংশের মির্জা কাজেম বেগ ও মির্জা নাজেম বেগ অনেক কায়স্থ বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের শিক্ষাগুরু ছিলেন।

কোমরপাড়া, বাগমারা, কাজিকান্দা, বারৈজুরি ও বাওগাড়া

রাজবাড়ি থানার অধীন ঃ—কোমরপাড়ার তাপস-কুল-শ্রেষ্ঠ শাহ কামালের দরগা আছে। এই দরগার সেবাইতেরা উচ্চ বংশ বলিয়া পরিচিত।

বাগমারার ইন্সপেক্টর মৌলবি দেরাজ তুল্যার বংশ এতদঞ্চলে বিশেষ মাননীয়। এক্ষণে কাজি আবদুল্ লতিফ ও কাজি আবদুল গণি এই বংশ উজ্জ্বল করিতেছেন।

কাজিকান্দার কাজি ও রুমি বংশ বিখ্যাত ও মাননীয়। শেষোক্ত বংশ সম্ভূত মৌলবি সৈয়দ আবদুল কাদুম রুমী বিখ্যাত মৌলবি ও বক্তা। ইনি দেশের কল্যাণে আপন জীবন অর্পণ করিয়াছেন। ইহার প্রপিতামহ রুম দেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া ইহারা রুমি নামে পরিচিত। পাংশা থানার অধীন শাহজিআড়া (শাহুয়ারা) গ্রামে তাহার সমাধি আছে। সেই সমাধি রক্ষার নিমিত্ত তৎকালীন নওয়ারার চৌধুরীরা প্রায় ৫০০ বিঘা জমি নিষ্কর দিয়াছিলেন। এখনও তাহার কতকাংশ উহাদের দখলে আছে।

পাংসা থানার বারইজুড়িতে বিখ্যাত তাপস শাহ গরিবের সমাধি আছে। ইনি মৃত মানুষ ও গবাদি পশু জীবিত করিয়া দিয়া স্বীয় অলৌকিকতার পরিচয় দিয়াছেন। কথিত আছে যে ইনি সাধনার প্রথমাবস্থায় একদা ভিক্ষার্থে বেলগাছির বিখ্যাত চৌধুরী বংশের কোন মহাত্মার নিকট উপস্থিত হইলে চৌধুরী সাহেব ইহাকে মজুরি করিতে বলেন। পরদিন ইনি কার্য প্রার্থী হইয়া পূর্বোক্ত চৌধুরী সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে চৌধুরী সাহেব ইহাকে স্বীয় কলাবাগানে কলা গাছ রোপন করিতে বলেন। পরে দেখা গেল যে কলাগাছের মধ্যস্থল কর্তন করত মূল উর্দ্ধে দিয়া কর্তিত স্থলটি মাটির মধ্যে পুতিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে চৌধুরী সাহেব অনেক ভর্ৎসনা করেন। পরদিন দেখিয়া সকলেই আশ্চম্বিত হইলেন যে গাছগুলি শিকড় হইতে উর্দ্ধদিকে পাতা ছাড়িয়া বৃদ্ধি পাইতেছে এবং মাটিতে পোতা কর্তিত অংশে শিকড় বাহির হইয়াছে।

বাওগাড়ার মিঞা বংশ প্রসিদ্ধ। এক্ষণে হেরাজ তুল্যা মিঞার বংশে আকেলউদ্দিন মিঞা এবং মানউল্যা মিঞার বংশে আব্বাছ আলি বিদ্যমান আছেন।

ঘৃতকান্দি ও ফুক্রা

ঘৃতকান্দি কায়স্থ প্রধান স্থান, মুকসুপুর থানার অন্তর্গত। এই স্থানবাসী গিরিধর বসু বিখ্যাত লোক ছিলেন, বসু মহাশয় কলিকাতাবাসী বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও দাতা তারক পরামাণিকের অধীনে কার্য করিয়া পরে স্বয়ং স্বাধীনভাবে ব্যবসায় পরিচালনে স্বয়ং একজন ধনী মধ্যে পরিগণিত হন। নিমতলা গঙ্গাতটে তৎনির্মিত গঙ্গাযাত্রীর জন্য দ্বিতল রক্ষিতাগার ও গঙ্গাবক্ষের

ইষ্টক নির্মিত ঘাট তাহার কীর্তি আজিও ঘোষণা করিতেছে। তাহার অধীনে কার্য করিয়া আত্মীয় ঘৃতকান্দী নিবাসী বেণী মাধব পালও ধনী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। এই মহাত্মাও সৎব্যয়ী। নিকটবর্তী বহু ব্রাহ্মণ ও অপরাপর জাতির বাসস্থান ফুক্রা গ্রামে পালমহাশয় একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া দিয়া সর্বসাধারণের বিদ্যা শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তিনি সাধারণের ধন্যবাদ পাত্র।

খালকুলা

চন্দনানদীর তীরে সংস্থাপিত। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্রগণ ধরমাবী গ্রাম হইতে উঠিয়া এই গ্রামে বাস স্থাপন করেন। এই জ্যোতির্বিদবংশ ভূষণার প্রধান ভূম্যধিকারীগণ হইতে বহু বৃত্তি ব্রহ্মত্রাপ্রাপ্ত হন। তৎপর বারেন্দ্র শ্রেণির অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়া এই স্থানে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে মৈত্র বংশীয় রমাকান্ত মৈত্র নাটোরাঞ্চল হইতে আসিয়া খালকুলায় বাস করেন। মুসলমান রাজত্বকালে নবাব সরকারে তহশীলদারী কার্য করিয়া তিনি বহু অর্থ উপার্জন করেন ও মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন। তদ্বংশীয় বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি. এল. বর্তমান সময়ের একজন বিখ্যাত লোক। তৎকৃত ইংরাজি ভাষায় লিখিত শোনপুরের ইতিহাস, বহুবিধ বাংলা গ্রন্থ ও সংস্কৃত গীতগোবিন্দের এবং লোরি গাথা ও উদানম্ নামে দুইখানা পালি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রসিদ্ধ। ইহার একমাত্র কন্যা সুনীতিবালা দেবী বি.এ. জেলার শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে গণনীয়া।

কারণ্যপুর

এই গ্রামটি তত বিখ্যাত না হইলেও ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত স্থান। তত্রত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ কৌলীন্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাহাদের সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায় যে মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র গৌরীকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ২৪ পরগণায় বিবাহ করেন। তৎপুত্র দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মহাত্মা তৎকালীন ডাক্তার শ্রেণির মধ্যে একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তৎপুত্র সুবিখ্যাত বাগ্মী ও বর্তমান বঙ্গীয় মসনদের প্রধান মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ আজিও ফরিদপুর বিস্মৃত হন নাই।

১. এই কন্যা শশাবিবি নামে পরিচিতা ছিলেন। বোধহয় শশী নামের পরিবর্তে মুসলমান গৃহে শশা নামই প্রচলিত হইয়াছিল।

২. ইমামদ্দির স্ত্রীর নাম চাঁদবিবি। প্রবাদ—এই যুদ্ধ ঘটনার সময়ে স্বীয় পক্ষের সৈন্যগণের নিরুৎসাহ সন্দর্শনে এই বীররমণী তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধকার্যে প্রবৃত্ত করান।

৩. কনকেশ্বর গ্রামের ভূম্যধিকারী জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি মমতাজ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়।

৪. এই কালী বর্তমান সময়ে ধামারণ গ্রামে মুন্সীগণের ভূতপূর্ব দেওয়ান মহেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়িতে সংস্থাপিত আছেন।

৫. একখানি প্রাচীন দলিলে দৃষ্ট হয়, "চৌকি মুলফৎগঞ্জ মোকাম পোড়াগাছা জিলা ঢাকা বৈঠক শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচাঁদ বসু মুনসেফ। সন ১৮৫৪ ইং ২৯ নভেম্বর মোতাবেক সন ১২৬১ বাংলা ১৫ অগ্রহায়ণ। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পোড়াগাছার বিস্তৃত বিবরণ লেখা হইয়াছে।

৬. বাগবাড়ি জপসার লালাবাবুদের কৃষ্ণরাম সেন তালুকের অন্তর্গত বলিয়া কাগজপত্রাদিতে উল্লেখ দেখা যায়। ইহার চতুর্দিকে গড়ে পরিবেষ্টিত ছিল।

৭. গোপী গাঙ্গুলি, প্রথিতনামা সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভের বংশোদ্ভব। এই মহাত্মলক্ষণ সেনের সময়ে বিক্রমপুর অবস্থান করেন। এই কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে।

৮ ফবিদপুবেব ইতিহাসেব প্রথম খণ্ডে লেখা হইয়াছিল, কোয়বপুবের মাধববংশের সহিত সংগ্রাম সাহেব সম্বন্ধ ঘটিযাছিল, কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল উহা সত্য নহে।

৯. বিক্রমপুবাঞ্চলে কযলা "আঙ্গার" বলিযা কথিত হয়।

১০. সাজনপুব সম্ভবত বাদসাহ সাহজাহানেব নামানুসারে সাহজাহানপুরের অপভ্রংশ হইবে।

১১. মাদারিপুবের পূর্বদিকে সাহ মাদাবেব দবগাতে তাহাব সমাধিস্থান অদ্যাপি দৃষ্ট হইযা থাকে। যে বটবৃক্ষমূলে উক্ত ফকিব যোগ সাধনা কবিতেন ঐ বৃক্ষ না থাকিলেও উহাব শাখা হইতে উদ্ভূত দুইটি বটবৃক্ষ অদ্যাপি সজীবাবস্থায বিদ্যমান আছে। বৃক্ষমূল ইষ্টক গ্রথিত . কি হিন্দু কি মুসলমান উভয সম্প্রদাযই ঐ স্থানটিকে প্রীতিব চক্ষে অবলোকন কবিয়া থাকেন। টিনেব ঘব ও একটি সমাধি তথায দেখা যায়। এই স্থানে 'মানত' প্রদত্ত হইয়া থাকে।

১২ খডবিযা পবগণাব বিবরণ দেখ।

১৩ ইহাদেব বংশ-স্থাপয়িতা বাজাবাম রায প্রথমত ফতেজঙ্গপুবেব অন্তর্গত নারাযণপুব গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা কবেন। অদ্যাপি তথায ইষ্টক সোপান সমন্বিত দীর্ঘিকাব চিহ্ন প্রাপ্ত হওযা যায। তাহার পবে ঐস্থান পবিত্যাগ করিয়া খালিয়া আসিয়া বাসস্থাপন কবেন।

১৪ নবাবী আমলে এই পদকেই ওযাদেদাব বলা হইত। কোম্পানির আমলে উহাব নাম হয সাজলদার। মূল কথা এই যে, জমিদাব বাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইলে অযথা অন্য কোন ত্রুটি প্রদর্শন কবিলে, গবর্নমেন্ট হইতে ঐ সম্পত্তির খাজানা আদায জন্য লোক নিযুক্ত হইত। রাজকর্মচাবিদেব মধ্য হইতে ঐ লোক মনোনীত হইতেন বটে, তবে তিনি অথবা তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ যে কেহই ঐ আদায়ী কার্য করিতে পাবিতেন। গবর্নমেন্টের প্রাপ্য আদায় হইলে পূর্ব মালিক পুনরায় ঐ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতেন। অন্যথা উহা নিলামে বিক্রয় হইযা যাইত।

১৫ মতান্তবে কৃষ্ণবল্লভ বাযেব।

১৬. The property was at one time in the prossession of one Sadashib Majumdar who was Naib of the former jamindar of Buzurgumedpur SadaShiv's sons disputed Mohomed Shuffee's claim to it and said that he was only aurat-taluqdar and that their father held a palta for it given in 1188 by Raja Laki Narain Rai

১৭ সন্তি বাণীবহ গ্রামে গোবিন্দান্বয়সম্ভবা।

১৮. গণস্তেনায়িস্তে ঘর্ঘ্যাং পয়োগয়ঞ্চ হিঙ্কুকঃ
মাধব পঞ্চথুপ্যাঞ্চ বসতিং তোহি জজ্ঞিরে।।
কণ্ঠহাব।

১৯ বিভাবেজ কৃত বাকবগঞ্জের ইতিহাস, ৪২ পৃষ্ঠা।

২০. সদাশিবা ত্রয়ঃ পুত্রা গোপীবমণ সেনকঃ।
রামানন্দ স্তথা কৃষ্ণানন্দশ্চ কন্যাকে উডে।।
হৃষিকেশ সুতা পুত্রাঃ কন্যামেকং ব্যুবাহচ।
শালঙ্কাযণসম্ভূত সংগ্রামসাহ ভূপতি।
কণ্ঠহাব কৃত কুলপঞ্জিকা, ১৪০ পৃষ্ঠা।

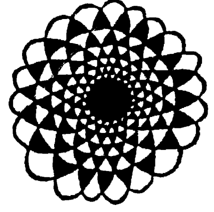
২১ যশোহরেব কালেক্টরির তৌজি ৬৭নং নবোত্তম বায় ও ফরিদপুবের কালেক্টরিব ২৫৩৬ নং নাওরা কৃষ্ণকিঙ্কব রায় ও বাজচন্দ্র রায় নামে উল্লেখ দেখা যায়। বিক্রমপুর কেয়রপুবের মাধব এই সদাশিবের বংহ নাহে।

২২. মহামহোপাধ্যায সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়েব লিখিত বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায়, রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার আচার্য, বায়গণ হইতে ভূবৃত্তি লাভ করিয়া বাণীবহবাসী হন।

২৩ মাধবোজগদানন্দো গোপীরমণতঃ সুতৌ।
কুলপঞ্জিকা, কণ্ঠহার কৃত ৪০ পৃষ্ঠা।

২৪. ভাস্করাচার্য কৃত সিদ্ধান্ত শিরোমণি কালমানাধ্যায় পাঠ করুন।

দ্বিতীয খণ্ড সমাপ্ত।



ফরিদপুরের ইতিহাস* ১ম খণ্ডের সমালোচনা

বাংলা প্রাচীন দেশ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও এশিয়ার সভ্যতায় বাংলা এক সময় অসাধারণ প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল। বাংলার ভূমি সমতল ও কোমল বলিয়া এই প্রদেশে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মত প্রাচীন গৃহের বা জীর্ণ মন্দিরের সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয় না—কারণ, বাংলায় কালজয়ী প্রস্তরের বহুল ব্যবহার ছিল না। কিন্তু বর্তমান কালে অনুসন্ধানের ফলে বাংলার বহু স্থানে পুরাবস্তুর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এই সকল পুরাবস্তু ইতিহাসের অক্ষয় উপাদান। দিনাজপুরে কান্তনগরের মন্দির, মহিপাল দীর্ঘিকা, তাম্রলিপ্তিস্থ বর্গভীমার মন্দির, যশোহরে সীতারামের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ—বাংলার এই সকল কীর্তিও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহার বহু পূর্বে—সম্ভবত খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীতে বাঙালি যবদ্বীপে ও বলিদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল। বাঙালি সিংহল জয় করিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্মের উন্নত দশায় বাংলা হইতে যে ধর্মমত ও শিল্পাদর্শ চীনে, জাপানে ও কোরিয়ায় বিস্তৃত হইয়াছিল আজও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই ; পরন্তু সেই শিল্পাদর্শ স্বাতন্ত্র্য হেতু আপনার সজীবতা সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাই সর্বাপেক্ষা অধিককাল মুসলমান শক্তির প্রতিকূলে দাঁড়াইতে পারিয়াছিল। পাঠানগণ প্রায় ৪০০ বৎসরের চেষ্টাতেও বাংলাদেশ জয় করিতে পারেন নাই। কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্ত তাহার পূর্ববর্তী নন্দের নিকট হইতে বাংলা বাজ্য পাইয়াছিলেন।

বাংলা প্রাচীন দেশ। কিন্তু এদেশের প্রকৃত ইতিহাস নাই। বহুদিন পূর্বে স্টুয়ার্ট বাংলার ইতিহাস গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাব সে চেষ্টা নানা কারণে আশানুরূপ ফলবতী হয় নাই। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ও রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাংলার ইতিহাস বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য লিখিত, একান্ত ক্ষুদ্রায়তন। দ্বিতীয় পুস্তকে মৌলিক তত্ত্বের একান্ত অভাব। এশিয়াটিক সোসাইটির 'জর্নালে' ও 'কলিকাতা রিভিউ'-এর পৃষ্ঠায় যে সকল উপাদান সংগৃহীত হইয়া আছে—সে সকলেরও সম্যক সদ্ব্যবহার হয় নাই।

বহুদিন পূর্বে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"বাংলার ইতিহাস চাই ; নহিলে বাংলার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙালি তাহাকেই লিখিতে হইবে। * * * * আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাংলার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি যাহার যতদূর সাধ্য, সে তত দূর করুক ; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।"

মনে হইতেছে, এতদিন পরে বাঙালি এই আহ্বানে বাংলার ইতিহাস উদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। তাই বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"ধাতু, পাথর ও মাটির টুকরায় আমরা স্তূপ নির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; ছেঁড়া কাগজের ও পোকায় কাটা তালপাতার জঞ্জালে আমাদের

* ফরিদপুরের ইতিহাস।—১ম খণ্ড—শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত। ২১০/৫, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট। নব্যভাবত প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১০ আনা।

মার্বেল-মণ্ডিত কুঠরি যুগপৎ অধৃষ্য ও অভিগম্য হইয়া পড়িয়াছে; হিজিবিজি হস্তাক্ষরের দৌরাত্ম্যে আমাদের পরিষৎ পত্রিকা সভ্যগণের ভয়প্রদ হইয়া উঠিয়াছে, এবং প্রত্নতত্ত্বের বিভীষিকা আমাদের কাব্য-কলা-কুতুহলী বন্ধুগণের হৃদয় আতঙ্ক-সঞ্চারের উপক্রম করিয়াছে।" তাই সুধী কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় মহাশয়ের উদ্যোগে রাজসাহী অঞ্চলে ঐতিহাসিক অভিযান আরব্ধ হইয়াছে। তাই অল্পদিনের মধ্যে বাকরগঞ্জ, মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ, বিক্রমপুর, রাজসাহী, ফরিদপুর প্রভৃতি বাংলার অনেকগুলি জেলার ইতিহাস রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাই বাংলায় বহু উপাদেয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে।

দেশকে জানিবার জন্য বাঙালির এই আগ্রহ যে ইতিহাস উদ্ধার চেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সে চেষ্টা ফলবতী হইলে যে আমাদের পরম উপকার হইবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই বলিয়াছিলেন—"বাংলার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙালি কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই জন্মে।"

বাংলার ইতিহাস উদ্ধার কার্যে বাংলার জেলাগুলির ইতিহাস যে বিশেষ সাহায্য করিবে—সেই ইতিহাস যে একান্ত আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য। দেড় শত বৎসর পূর্বে ইংরাজের আগমনকালে কলিকাতা কেবলই লোকবাসের যোগ্য হইয়া উঠিতেছে। আর তখন বাংলার মফঃস্বলে কত পরিত্যক্ত রাজধানী শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যে আবৃত হইয়া গিয়াছে, কত দীর্ঘ দীর্ঘিকা জলজগুল্মে পূর্ণ হইয়াছে, কত দেবমন্দিরের অম্বরচুম্বী চূড়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছে। তখন বাংলার মৃত্তিকায় কত কবির, কত ধর্ম-সংস্কারকের, কত বীরের, কত রাজনীতিকেব, কত পণ্ডিতের, কত শিল্পীর চিতাভস্ম মিশাইয়া গিয়াছে। তখন বাংলার নদী বহিয়া কত পণ্য দ্রব্যপূর্ণ তরণী দেশে ধনসংগ্রহ করিতে গিয়াছে। তখন বাংলার প্রান্তর কত সৈন্যের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে। তখন বাংলার পল্লী কত শিল্প কীর্তিতে শোভিত হইয়াছে। তখন বাংলার সমাজের স্তরে স্তরে কত পরিবর্তন প্লাবনের পলি সঞ্চিত হইয়াছে। তখন বাঙালির জীবনে কত পণ্ডিতের প্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। পলাশীর যুদ্ধ দেড়শত বৎসরের ঘটনা; কিন্তু বিষ্ণুপুরের যে রাজগণ মল্লাব্দ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি প্রায় তিনশত বৎসরের (১৬২২ খ্রিস্টাব্দের)। বাংলার স্থাপত্য বাংলার বিশেষত্ব ব্যঞ্জক, বাংলার সাহিত্য বাঙালির নিজস্ব। এই শিল্প ও এই সাহিত্য বাংলার মফঃস্বল শোভিত করিয়াছিল, বাংলার পল্লীতে উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্বে বাংলায় ধনবানগণ জলাশয় ও রাজপথ প্রস্তুত করাইয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতেন। সেই প্রাচীন কীর্তির অবশেষ আজও বঙ্গের সর্বত্র বিদ্যমান। আলোচ্য গ্রন্থেও সেই সকল কীর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কেদার রায় চাঁচুরতলার নিকটে যে গৃহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন সেই "রাজবাড়ির অনতিদূরে 'কেশার মার দিঘি' নামে এক বৃহৎ জলাশয় ছিল। প্রবাদ, কেশা অথবা, কেশবের মাতা, পতি-পুত্রহীনা হইয়া পতিকূলের প্রভু চাঁদরায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন যাপন করে। * * * * কেদার রায় জন্মগ্রহণ করিলে পর, কেশার মাকে তাহার ধাত্রীপদে নিযুক্ত করিয়া, রাজা পুত্রের প্রতি পালনভার তৎকরে ন্যস্ত করেন। কেদার রায় বয়ঃপ্রাপ্ত ইয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, ধাত্রীর ইচ্ছানুসারে এই বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া তদ্দ্বারা উৎসর্গ করাইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ইহার নাম হয়, কেশার মার দিঘি। আরও প্রবাদ, কেশার মা যতদূর হাঁটিয়া যাইতে পারিবে, ততদূর পর্যন্ত এই সরোবর খনিত হইবে বলিয়া কেদার রায় প্রতিশ্রুত হন। তদনুসারে ধাত্রী প্রায় ১ মাইল ব্যাপী স্থান হাঁটিয়া অতিক্রম করার পর অন্য কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষান্ত হয়। এজন্য দিঘিও

এক মাইল ব্যাপী স্থান ব্যাপিয়া খনিত হইয়াছিল। অদ্যাপি উহার ভগ্নাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে।" কাচকির দরজা রায়দিগের আর এক কীর্তি। "উহা এক বৃহৎ রথ্যা—ইদিলপুরের নিকটস্থ বুড়িরহাট ও দেওভোগ স্থান হইতে উহার এক শাখা আরম্ভ হইয়া বিক্রমপুর ভেদ করিয়া উত্তর দিকে বরাবর ধলেশ্বরী নদীর তট পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। অপরটি মেঘনার তট হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দিকে বরাবর পদ্মাতট পর্যন্ত প্রসারিত হয়। রাস্তা দুইটি বক্র গতিতে নানা জনপদ ঘুরিয়া ফিরিয়া যাওয়ায় বিক্রমপুরের অধিকাংশ গ্রামের যাতায়াতের সুবিধা ছিল। সেন রাজগণের সময়ে যে সমস্ত রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ এই কাচকির দরজার সহিত পরে সংযোজিত হয়। সুতরাং এই রাস্তার সমুদয় ভাগ রায় মহাশয়দের নিজকৃত নয়। * * * * এই রাস্তাটির উৎপত্তি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় যে, কেদার রায়ের মাতার অদৃষ্ট গণনা করিয়া কোন জ্যোতির্বিদ বলিয়াছিল মৎস্যের কণ্টক বিদ্ধ হইয়া তাহার মৃত্যু সংঘটন হইবে। এই কারণে কেদার রায় (?) রাণীর জন্য কণ্টকহীন মৎস্যের ব্যবস্থা করেন। কাচকির গুড়া নামে এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য নদীতে প্রত্যহ ধৃত হইয়া যাহাতে সুবিধামত রাণীর জন্য পৌঁছিতে পারে, তন্নিমিত্ত চাঁদ রায় কর্তৃক এই রাস্তার পত্তন আরম্ভ হইয়া কেদার রায়ের সময়ে পরিসমাপ্ত হয়। কথার মূলে যাহাই থাকুক, কাচকি মৎস্য ধৃত করিবার ব্যপদেশে উহার সৃষ্টি, এই কিংবদন্তীই চলিয়া আসিয়াছে, এবং এই জন্য রাস্তার নামও 'কাচকির দরজা' হইয়াছিল। প্রবাদ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, এই চতুর্দিক প্রসারিত পথগুলি যখন পূর্ণাবয়বে, বিক্রমপুরে বিদ্যমান ছিল, তখন তদ্দেশবাসীরা যে বর্তমান অধিবাসীগণের অপেক্ষা অধিক সুখস্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

বাংলার মফঃস্বল এইরূপ ঐতিহাসিক উপাদানে পূর্ণ। তাহার অনুসন্ধান কিম্বদন্তীর সংগ্রহ ও উপহৃত উপাদানের বিশ্লেষণ ও সংযোজন আবশ্যক। বাংলার জেলা সকলের ইতিহাস রচনা সম্বন্ধে আমরা গভর্নমেন্টের ও সরকারি ইংরাজ কর্মচারিদিগের নিকট বিশেষভাবে ঋণজালে আবদ্ধ। সরকারি 'গেজেটিয়ার' প্রভৃতিতে এই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের আরম্ভ। তাহার পর বেভারিজ বাকরগঞ্জের, ওয়েশল্যান্ড যশোহরের, টেলার ও ব্রাড্‌লি বার্ট ঢাকার। ওয়াল্‌স মুর্শিদাবাদের, টয়েনবী হুগলির যে সকল প্রামাণ্য ইতিহাস লিখিয়াছেন সে সকল ঐতিহাসিক উপকরণের আকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর সৌধনির্মাণ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছে।

বাংলার পল্লীতে ঐতিহাসিক উপাদানের সন্ধান বিশেষ যত্নসহকারে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। বাংলার পল্লীর নামই স্থানে স্থানে তাহার বয়সজ্ঞাপক। প্রাকৃত-প্রভাব-প্লাবিত বাংলায় পরিশেষে সংস্কৃত-সমাদর যুগে যে সকল গ্রামের প্রতিষ্ঠা, সে সকলের নামেই তাহাদের বয়স সপ্রকাশ। শ্রীপুর, লক্ষ্মী-নগর, ইচ্ছাপুর, শ্যামনগর, যশোহর, কৃষ্ণনগর—এই সকল মার্জিত সংস্কৃত নামের বয়স বিচার কষ্টসাধ্য নহে। পূর্ববর্তী লোকালয়ের নাম এরূপ মার্জিত নহে। অবশ্য বলা বাহুল্য অন্য প্রমাণের অভাবে কেবল নামের উপর নির্ভর করিয়া গ্রামের বয়স বিচার নিরাপদ নহে। গ্রামে সন্ধান করিলে যদি কোন অস্পৃশ্য জাতিয়ের জীর্ণ গৃহে 'ধর্ম ঠাকুরের' মূর্তি পাওয়া যায়, বা গ্রামের কোন শ্রেণির লোকের মধ্যে 'ধর্মঠাকুরের' পূজার প্রমাণ পাওয়া যায়—তবে বুঝিতে হইবে, সে গ্রাম এক কালে বৌদ্ধ প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করে নাই। সে প্রভাব কতদিন পূর্বে—কিরূপে—কেন আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বাংলার সকল প্রাচীন পল্লীগ্রামেই দেবালয় ও জলাশয় ছিল। সেই সকলের সম্বন্ধে কিম্বদন্তীরও অভাব ছিল না। এই সকল কিম্বদন্তীর অতিরঞ্জনের মধ্যে সত্যের অংশ উদ্ধার করিতে হইবে। হয়ত মন্দিরের সম্বন্ধে শুনা যায়, কিছুকাল পূর্বে কোন নৈসর্গিক কারণে পূর্ববর্তী মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে বর্তমান মন্দির নির্মিত হয়। সে

কিছুকাল কতদিন পূর্ববর্তী বর্তমান মন্দিরের বয়স অনুমান কত দিনের—এই সকল সন্ধান করিলে ফললাভের সম্ভাবনা। বর্তমান মন্দির যদি পূর্ববর্তী মন্দিরের ভিত্তির উপর গঠিত না হইয়া অন্যত্র গঠিত হইয়া থাকে, তবে পূর্ববর্তী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পরীক্ষায় ঐতিহাসিক উপকরণের আবিষ্কার অসম্ভব নহে। দেবমন্দির অধিকাংশ স্থলেই প্রতিষ্ঠাতার সাম্প্রদায়িক মতের পরিচায়ক। কিন্তু যদি নিকটবর্তী কতকগুলি গ্রামে একই দেবতার মন্দির লক্ষিত হয়, তবে সেই সকল গ্রাম যে শৈব, শাক্ত বা বৈষ্ণব প্রভাবে প্লাবিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করিতে পারা যায়। তখন সেই প্রভাবের পোষক প্রমাণের সন্ধান করিলে অনেক অনাবিষ্কৃত সত্যের আবিষ্কার হইতে পারে। জলাশয়গুলির পরীক্ষায় আরও মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান প্রাপ্তির সম্ভাবনা। মুসলমানের ও মার্হাট্টার আগমনে ও লুণ্ঠনে বাংলা বহুবার বিপন্ন হইয়াছে। গ্রান্ উইডেল বলিয়াছেন, অন্য ধর্মের প্রতি মুসলমানদিগের দারুণ ঘৃণার ফলে ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যাদির চিহ্নমাত্র নাই।—মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধেও শিল্পকীর্তিধ্বংসের অভিযোগ বর্তমান। মুসলমানের ও মহারাষ্ট্রীয়ের আগমন সম্ভাবনায় শঙ্কিত জনগণ কতবার বিগ্রহ বা অলঙ্কারাদি আগমন সম্ভাবনায় শঙ্কিত জনগণ কতবার বিগ্রহ বা অলঙ্কারাদি মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়াছিল বা জলাশয়ে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা কে বলিবে? এই সকল লুপ্তপ্রায় জলাশয়ের গর্ভে কত ঐতিহাসিক উপকরণ লুপ্ত হইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

এক্ষণে যে সকল উপাদেয় ইতিহাস প্রকাশিত হইতেছে, সে সকলে এইরূপ অনুসন্ধানের পরিচয় অধিক নাই। এরূপ অনুসন্ধান যে শ্রম, সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। কিন্তু এরূপ অনুসন্ধান ব্যতীত ইতিহাস সম্পূর্ণ বা সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে বাঙালির সমবেত চেষ্টায় এইরূপ অনুসন্ধানের আবশ্যক অর্থ সংগৃহীত হইবে ও বাংলার সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনাব পথ পরিষ্কৃত হইবে।

আনন্দনাথবাবু পরিণত বয়সে যে উৎসাহে ফরিদপুরের ইতিহাস উদ্ধারকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা অনুকরণ যোগ্য এবং বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি বহু যত্নে যে সকল কিম্বদন্তীর সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সকল ঐতিহাসিক হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। ভরসা করি, এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে বিশেষ সমাদৃত হইবে।

গ্রন্থখানির সম্বন্ধে আর দুই চারিটি কথা বলিয়া আমরা বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। গ্রন্থখানির ভাষা আরও মার্জিত ও প্রাদেশিকতা বর্জিত হইলে ভাল হয়। গ্রন্থকার মহাশয় ৩২ পৃষ্ঠায় আদিশূরের ও সেনরাজগণের কালনির্ণয়ের কথায় সূক্ষ্মবিচারকারীদিগের কার্যে কিছু বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। সত্যের উদ্ধার চেষ্টা সর্বত্রই প্রশংসার যোগ্য তাহাতে আনন্দবাবুর মত প্রবীণ লেখকের বিরক্তি প্রকাশ সঙ্গত নহে। গ্রন্থমধ্যে এক স্থানে সম্প্রদায় বিশেষের বর্তমান অবস্থার সহিত অতীত অবস্থার যে তুলনা করা হইয়াছে, তাহা অবান্তর। সে তুলনায় গ্রন্থ অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত না করিলে ক্ষতি ছিল না। ১৭ পৃষ্ঠায় লেখক লিখিয়াছেন—"বর্তমান বর্ষে পাটের দর ন্যূন হওয়ায় অনেক মহাজনের ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু চাষীরা তাহা অদ্যাপি অনুভব করিতে সমর্থ হয় নাই।"

এইরূপ মন্তব্য সংবাদপত্রে শোভন—সাময়িকপত্রেও চলিতে পারে কিন্তু ইতিহাসে স্থান প্রাপ্তির যোগ্য নহে। গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের বিন্যাস বিষয়ে গ্রন্থকার মহাশয় আরও মনোযোগী হইলে ভাল হয়। বিষয়বিন্যাসে অমনোযোগ এরূপ গ্রন্থের উপযোগিতার পক্ষে অনিষ্টকর। আমাদের সর্বশেষ বক্তব্য—এরূপ গ্রন্থে মুখপত্রের বা টাইটেল পেজের ও সূচির অভাব এবং আবরণেই "ভূমিকা" মুদ্রণ গ্রন্থের গৌরবধর্বক না হইয়া গৌরবনাশক হইয়া দাঁড়ায়। এই ক্ষুদ্র বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থকার মহাশয়ের অমনোযোগ পাঠকমাত্রেরই পক্ষে দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

আর্যাবর্ত, ১৩১৭ বৈশাখ—আশ্বিন

ফরিদপুরের ইতিহাস ১ম খণ্ড সম্পর্কে সংবাদপত্রের অভিমত

HISTORY OF FARIDPUR

We have received a copy of the first part of the History of Faridpur by Babu Ananda Nath Roy. It is one of the happiest and most pregnant signs of the time that along with political and economic movements there is a movement for historical researches in Bengal. We have thus got a history of Murshidabad, of Rajshahi, of Dacca, of Backergunj and now Babu Ananda Nath Roy has come forward with a valuable contribution in the shape of a history of his own district. These little books dealing separately with the histories and traditions of the various important districts of Bengal are particularly valuable at this period of transition, as they are sure to supply very important materials for the future historian of Bengal. It was very much to be wished that the present book were published as a whole and not in parts ; but we have no doubt the enterprising author will complete it in no time and establish his claim among the pioneers of historical researches in this country. The book bears unmistakable evidence of the author's grasp of his subject and the labour he has taken in compiling and marshalling the various important and useful informations which has has collected. The language of the book is elegant and its subjects highly interesting. Some of the maps and photographs. particularly those of Rajnagore, the ancient capital of Maharaja Rajbullubh, which illuminate this book are, indeed very valuable, and we heartily wish the learned and adventurous author a complete success in his arduous task.

The Bengalee, 21st December, 1909.

HISTORY OF FARIDPUR

It is one of the best signs of the time that our literary men have directed their energies to the historical researches of the country. In the absence of a comprehensive history of Bengal beyond a certain period these men have very prudently proceeded to compile and record the history of the country district by district. Thus we have got a history of Murshidabad, Rajshahi, Dacca, Mymensingh and Backergunge and now we are about to have a history of Faridpur by Babu Ananda Nath Roy, a scion of the ancient family of Lala Ramprosad Sen, the nephew of the

historical Rajah Rajbullubh. These fragmentary chronicles will at no distant date from the basis for a comprehensive history of Bengal. We have received a copy of the First Part of this history of Faridpur and it shews an amount of research which is truly admirable. Babu Ananda Nath seems to have taken considerable pains in getting all the interesting facts connected with his district, collecting pictures and drawings of the famous monuments and temples and ressuscitating the relics of the famous Chand Roy, Kedar Roy, Rajah Seetaram Roy and Maharaja Rajbullabh. We are told he has collected also some of the ancient coins and plates relating to the bygone days of the district. Mr. Higgins, the late Sub-divisional Officer, seems to have interested himself in this laudable enterprise of Baub Ananda Nath Ray. He writes as follows :–"I have read the first volume of Babu Anandanath Rai's 'Faridpurer Itihash' and am very pleased to testify to its worth. By unremitting labour and study Ananda Babu has succeeded in making it interesting and instructive. My limited knowledge of the language prevents me for speaking of its literary quality, but I have no hesitation in pronouncing it of considerable value as a work of archæological and historical research."

We are glad to notice that in his arduous task Babu Ananda Nath Roy is also being materially assisted by some of the leading men in his district. We heartily wish the enterprising author complete success in the noble but arduous task he has undertaken.

The Bengalee, 14th July, 1910.

HISTORY OF FARIDPUR

"Faridpurer Itihash", Part I, by Ananda Nath Roy, Calcutta, Price As. 10.

This brochure forms no. 25 of the Bengal Sahitya Parishat series. As the name implies, it seeks to give the ancient history and geographical position of the district of Faridpur and as such reflects very great credit on the author for the research and labour which he must have undertaken to get at the materials. If similar accounts of all our districts, towns, etc. could be prepared it would be advancing the cause of the country a long way because it is in these there lie the germs of future greatness. A map of ancient Faridpur from Rennel's Atlas, as also some photo engravings have been inserted in the work to enhance its value.

The Amrit Bazar Patrika, 16 August, 1910.

HISTORY OF FARIDPUR

It is gratifying sign of the times that efforts are being made together materials for a comprehensive history of these Province which are to be brought out from oral traditions, old manuscripts or other sources. To vary and apply the well-known words of Colonel Todd, every District in Bengal has a tale to tell, and there are stone mounds, and other ruins which have not yet been turned to the required advantage. Indian scholars have exceptional opportunities for the performance of this task and we wish that many more may be forth-coming to share such fruitful toil. The labour of the future historian of Bengal may well be lightened if the history of every District is compiled beforehand, and unless the materials that still exist are turned to use, we are afraid, they will irretrievably be lost before it is too late. There are the chronicles of several important Districts put together after diligent research by several English civilians, and it is curious that Indian scholars were so long blind to the significance of this branch of literary activity. Happily, a change has come over their spirit in these days, and we have already the histories of other Districts dealt with by competent writers. Among this batch, the name of Babu Ananda Nath Rai is prominently before the public. He has already made important contributions to elucidate several dark corners in the history of Bengal. His account of the twelve *Bhuinya* chiefs of Bengal is characterised by such originality as is unfortunately not often met with in the domain of historical research in this country.

In his present work which is expected to be completed in three volumes, the author has strange together a few interesting accounts of the geography, topography, statistics and history of Faridpur, which cannot but be highly prized not only by the inhabitants of the District, but by all interested in the history of Bengal. The compiler has to undertake extensive travels to collect the variety of information which he hs given— drawn from sources which would not have been available a few years hence. Fortunately he received the ungrudging help and co-operation of some well-known gentlemen which stood him in good stead in the accomplishment of his task. It speaks well for the compiler that he has published information on several matters which remained unknown so long, and was not obtained even by the diligence of Western scholars. The heartiness which he brought to bear upon his work, abundantly illustrated in every page of the book before us, has made possible the publication of such an eminently instructive and informing piece of history. He entered into his task, fired by the true historical spirit, and we hope that his work will meet with due recognition at the hands of the public. The book is included in the publications of the Sahitya Parishad. which makes clear the verdict of this competent literary body on the

labours of the compiler. We hope that the two remaining volumes of the book will soon see the light, so that there may be a work in the historical branch of Bengali literature which is found to be regarded as a acquisition to it. The whole book is priced at two rupees which is hardly to be accounted much, considering the immense paiws which the compiler has taken to give the public the result of his valuable researches.

—*Indian Mirror. 30th July, 1910*

শিক্ষা-সমাচার (ঢাকা)

বুধবার, ২২ অগ্রহায়ণ, ১৩১৬

ফরিদপুরের ইতিহাস

আনন্দনাথ রায় প্রণীত প্রথম খণ্ড

আনন্দবাবু দ্বাদশ ভৌমিক লিখিয়া ঐতিহাসিক সমাজে যশস্বী হইয়াছেন।

আমাদের দেশে প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার ন্যায় দুরূহ কার্য অতি অল্পই আছে। ভারতের অতীত ইতিহাস বিলোপের কুক্ষিগত, গ্রহণযোগ্য প্রমাণ সিদ্ধান্তের ক্ষীণ আলোকরেখার অভাবে প্রাচীন যুগের ইতিবৃত্ত মন্দির গভীর তিমিরাচ্ছন্ন, সুতরাং দুষ্প্রবেশ্য। কিন্তু শ্রমসাধ্য ব্যাপার বলিয়া পুরাতত্ত্ব নির্ণয়ে ভয়ে ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়াও কর্তব্য নহে। যে সকল সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসপ্রিয় জ্ঞানবান ব্যক্তি বিভীষিকাময়ী পুরাকাহিনীর নিরপেক্ষ সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, বিশুদ্ধ প্রমাণযুক্তিসঙ্কলনে যে সকল নিরলস অনুসন্ধিৎসু মহাত্মা পরিশ্রমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন তাঁহারা ধন্য, প্রশংস্য ও আমাদের নমস্য। যাহারা দেশের বিলুপ্তপ্রায় রত্নরাজির উদ্ধারে উদারভাবে প্রাণপাত করিতেছেন, যাহারা দেশের বিনষ্ট গৌরব বিস্মৃতির জলধিতল হইতে স্মরণপথে লোকচলাচলের সম্মুখে আনয়ন করিতে, উপস্থাপিত কবিতে যত্ন করিতেছেন, তাহারা ধন্য, প্রশংস্য ও আমাদের নমস্য।

আনন্দবাবু ইতিপূর্বেই অদম্য উৎসাহে অক্লান্ত পরিশ্রমে দুর্গম অতীত প্রবিষ্ট হইয়া তিমিরাবৃত পুরাতত্ত্বের দ্বারোদঘাটনের চেষ্টা করিয়া দেশবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থ হইয়াছেন। ইনি ইতিপূর্বেই বিস্মৃতিপঙ্কত্বেবিলনী "দ্বাদশ ভৌমিক"কে জনসমাজের নিকট সজীবভাবে যথাযথরূপে পরিচয় প্রদানে প্রয়াস পাওয়াতে পণ্ডিতমণ্ডলীর আশীর্বাদ লাভ করিয়াছেন। "বারোভুঁইয়ার" বিলুপ্তকীর্তি কীর্তনে আনন্দবাবু সত্যনিষ্ঠা, সরলতা ও উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়াই আমরা তাহার পক্ষপাতী।

ফরিদপুরের ইতিহাস আলোচনাতেও ইনি যেরূপ গবেষণা-ভূয়ো-দর্শনের পরিচয় প্রদান করিতেছেন তাহাতে তাহার পূর্বগৌরব অতিমাত্রায় বর্ধিত হইবে বলিয়াই ভরসা করি! ফরিদপুরের ইতিহাস শেষ হইলে নিশ্চয়ই এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাচীন ঐতিহাসিকের যশোরাজি দিগদিগন্তে ছড়াইয়া পড়িবে!

এই বহু জ্ঞাতব্য তথ্যেপূর্ণ পুস্তকের কিয়দংশ মাত্র প্রচার করা হইয়াছে, শীঘ্রই এই পুস্তকখানিকে পূর্ণাবয়বে প্রকাশিত দেখিতে ইচ্ছা করি। আমবা গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইলে উহার বিস্তৃত সমালোচনা কবিব, ইচ্ছা করিতেছি।

বঙ্গবাসী

১৮ অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩১৬

ফরিদপুরের ইতিহাস প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এবং শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ২১০/৫নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। প্রথমেই রেনেল সাহেব কর্তৃক অঙ্কিত ফরিদপুরের প্রাচীন মানচিত্র। রাজনগরের একুশ রত্নের চিত্রও এই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই খণ্ডে ফরিদপুরের সীমা, প্রধান চর, বিল, নদী, খাল, পথ, পশু, পক্ষী, মৎস্য ইত্যাদির বিবরণ এবং বিক্রমপুরের সেন রাজবংশের কথা, চাঁদরায় ও কেদার রায়ের কথা, কালাপাহাড়, সীতারাম রায় প্রভৃতির কথা আলোচনা হইয়াছে। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের ইতিহাস যত অধিক সঙ্কলিত হয়, ততই ভাল। এই ইতিহাসের পরিসমাপ্তি বাঞ্ছনীয়।

নায়ক

শুক্রবার, ২ পৌষ, ১৩১৬

ফরিদপুরের ইতিহাস

শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রণীত

এই গ্রন্থে শিক্ষণীয় বিষয় অনেক আছে। এই গ্রন্থ প্রকাশে গ্রন্থকার যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। আমরা সেই পরিশ্রমের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

ফরিদপুর হিতৈষিণী

২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩১৬

ফরিদপুরের ভূগোল ও ইতিবৃত্ত বিস্তৃতভাবে লিখিত হইতেছে। ইহাতে ভুলভ্রান্তি থাকিলে গ্রামে গ্রামে সকলকে তাহা সংশোধন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই পুস্তকে পরগণা, জমির সংখ্যা, খাস, তৌজী, চর, বিল নদী, খাল, পশু, পক্ষী, মৎস্য, প্রাচীন মন্দির, জাতি, ধর্ম, হিন্দুদিগের শ্রেণিবিভাগ, জাগ্রত দেবতা, ধর্মশালা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, শস্যের স্থান নির্দেশ, প্রাকৃতিক বিবরণ, বিক্রমপুর, সেন রাজবংশ, দ্বাদশ ভূম্যধিকারীর বৃত্তান্ত, কালাপাহাড়, সংগ্রামসাহা ইত্যাদি। ফরিদপুরের প্রাচীন ও আধুনিক বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। রচনানৈপুণ্য অতি সুন্দর, পুরাতন বিলুপ্তপ্রায় রত্নরাজী উদ্ধার করিয়া আনন্দবাবু সাধারণের ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইবেন এবং তিনি অমর হইয়া ভাবী বংশধরগণের নিকট বহুল সম্মানে বিরাজ করিবেন। ফরিদপুরের জনসাধারণ ইহাকে অর্থ ও সংবাদ প্রদানে উৎসাহিত করেন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

হিতবাদী

২৭ ফাল্গুন, ১৩১৬

ফরিদপুরের ইতিহাস প্রথম খণ্ড, শ্রীআনন্দনাথ রায় কর্তৃক প্রণীত। আমরা এ পুস্তকের প্রশংসা করিতে বাধ্য, কেন না ইহা সুলিখিত।

নব্যভারত

অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ সাল

ফরিদপুরের ইতিহাস প্রথম খণ্ড। ভৌগোলিক তত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত। শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত। একখানি ম্যাপ ও একখানি ছবি আছে। আমরা বহুদিন এই গ্রন্থের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। যদিও কতকাংশ পাইলাম বটে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত বলিয়া তৃষ্ণা মিটিল না। গ্রন্থকারের গবেষণা অসাধারণ। তাঁহার লেখা বারোভুঁইয়ার কথা চুরি করিয়া কত লেখক প্রত্নতত্ত্ববিৎ হইয়া উঠিয়াছেন। সে কথা থাকুক। আনন্দবাবুর বাংলা প্রাঞ্জল। আশা করি, ফরিদপুরের প্রতি হিতৈষীর নিকট এই পুস্তক বিশেষ আদর পাইবে। স্বদেশী মিলের কাগজে ছাপা।

প্রবাসী

মাঘ, ১৩১৬ সন

ফরিদপুরের ইতিহাস, শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রণীত। নব্যভারত প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ইহা প্রথম খণ্ড। ইহাতে ভৌগোলিক তত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত আছে। ফরিদপুর জেলার নদ, নদী, খাল, বিল, পথ, ঘাট, জাতি, ধর্ম, পশু, পক্ষী, মৎস্য, দেবমন্দির ও ধর্মশালা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। একখানি ম্যাপ ও রাজনগরের একুশ রত্নের মঠের একখানি চিত্র আছে। ইহা সাহিত্যপরিষদ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত। জাতীয় ঐতিহাসিক ইহার মধ্যে বহু উপকরণ পুঞ্জীভূত দেখিতে পাইবেন। ভাষা ভাল। ছাপা কাগজ চলনসই। এই সকল গ্রন্থ প্রত্যেক লোকের পাঠ করিয়া দেখা উচিত। এই রকম গ্রন্থেই আমাদের দেশের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিক্রমপুর এক্ষণে ঢাকা ও ফরিদপুরের এজমালি সম্পত্তি। সুতরাং বিক্রমপুরের গৌরব এখন উভয় জেলার আলোচ্য বিষয়। সম্প্রতি বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ও বর্তমান সমালোচ্য গ্রন্থে দুই গ্রন্থকার স্বাধীন গবেষণায় যে সব তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন তাহা তুলনায় সমালোচনা করিয়া ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিতে পারিবেন। এইরূপ গ্রন্থ ভাষাকে সম্পৎশালী করিতেছে। আমরা আশা করি, ফরিদপুর ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই দেখিতে পাইব।

ঐতিহাসিক চিত্র

ফাল্গুন, ১৩১৬ সন

ফরিদপুরের ইতিহাস শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রণীত। প্রথম খণ্ডেই রায় মহাশয় ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানের এবং তৎসম্বন্ধে নিজের যুক্তিতর্ক বলে তথ্য নির্ণয়ের অপূর্ব শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ফরিদপুরের ভৌগোলিক তত্ত্ব লইয়াও বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন জমিদারির কাগজপত্র দেখিয়া তিনি যেরূপ গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অল্পদিনের ও অল্প পরিশ্রমের ফল নহে। এই খণ্ডে ফরিদপুরের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় তিনি সেন বংশের, পাল বংশের, মুসলমান রাজত্বকালের নবাব ও সুলতানের, বারোভুঁইয়ার এবং বহু প্রাচীন জমিদারবংশের অধিকার, রাজত্ব, যুদ্ধ, বিদ্রোহ প্রভৃতির সপ্রমাণ বিবরণী এত অধিক সংগ্রহ করিয়াছেন যে, পড়িতে গেলে আশ্চর্য বোধ হয়। তিনি পুস্তকখানিতে কৌতূহলজনক

বাঙালি জাতির গৌরবজনক, দেশের প্রতি শ্রদ্ধাবর্ধক, আত্মসম্মানবর্ধক ও অতীতের বহু পুরাতন মধুর কথা সন্নিবেশিত করিয়া পাঠকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রার্থনা করি ভগবৎকৃপায় রায় মহাশয় সত্বরে অপরখণ্ডগুলি প্রকাশিত করিয়া দেশের ও দশের নিকট আদর ও সম্মান লাভ করুন। আশা করি ফরিদপুরবাসী প্রত্যেকে এবং ইতিহাসপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই এই পুস্তকের গ্রাহক হইয়া দেশের প্রাদেশিক ইতিহাস সঙ্কলনকর্তাদিগকে উৎসাহিত করুন।

ভারতী

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭ সন

ফরিদপুরের ইতিহাস

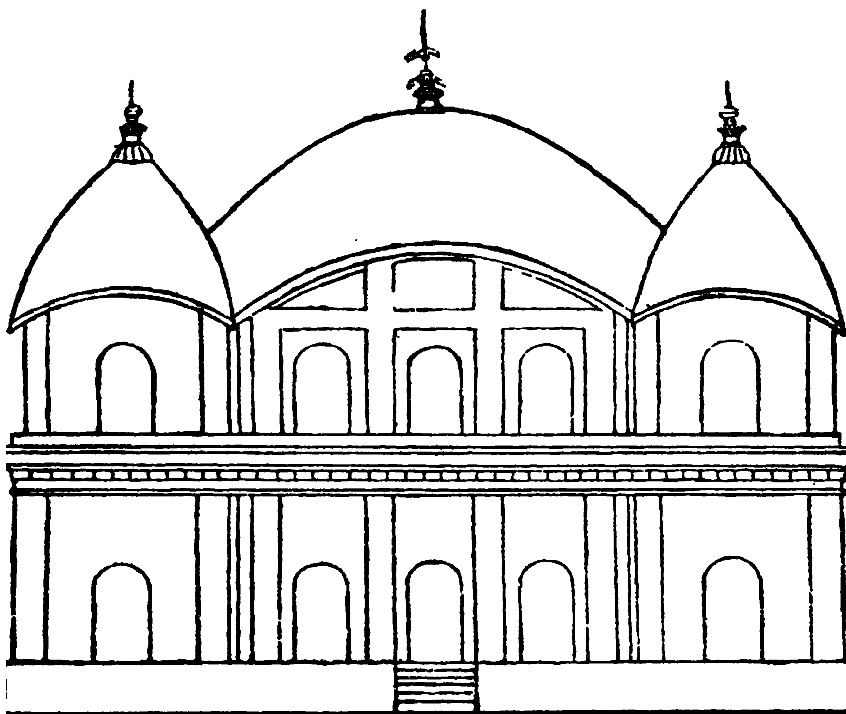
শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রণীত ১ম খণ্ড

ইতিহাসের প্রতি বাঙালি লেখক ও পাঠক উভয়েরই যে আগ্রহদৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহা যে দেশের পক্ষে শুভ লক্ষণ সে সম্বন্ধে এতটুকুও সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানি হইতে লেখকের অনুসন্ধিৎসা ও পরিশ্রমের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানিতে একখানি প্রাচীন মানচিত্র ও রাজনগবের একুশ রত্নের একখানি প্রাচীন ম্যাপ আছে।

বঙ্গদর্শন

বৈশাখ, ১৩১৭ সন

ফরিদপুরের ইতিহাস ১ম খণ্ড শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত। ইতিহাসের উপকরণ যতই সংগ্রহ হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। সে হিসাবে সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে উপকারিতা আছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।



একটি দেবমন্দির (সেঘড়া)

পরিচয়

(বঙ্গজ কায়স্থগণের, সামাজিক ইতিহাস সহ দক্ষিণ ফরিদপুরের বিলপ্রদেশের বিবরণ)

প্রথম মুদ্রণ ঃ বৈশাখ ১৩৪৪ সাল

৺দীনবন্ধু রায় চৌধুরী

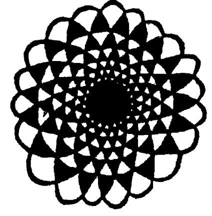
ও তদাত্মজ

শ্রীসতীশ্চন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী এম. এ., বি. এল.

প্রণীত।

প্রাপ্তিস্থান
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও প্রকাশকের নিকট এবং
উলপুরে শ্রীজীবনকুমার রায় ও উপেন্দ্রনাথ গুহর নিকট প্রাপ্তব্য

২০৯ নং কর্নওয়ালীস স্ট্রীট, কলিকাতা
জীবনীকোষ প্রেস হইতে শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক মুদ্রিত



প্রথম অধ্যায়
প্রাকৃতিক বিবরণ

১। উলপুর

বর্তমান ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ অতি নিম্ন বিলময় স্থান। (খ্রিস্টিয়) বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরেজ গবর্নমেন্ট এই প্রদেশের মধ্য দিয়া একটি সুপ্রশস্ত খাল খনন করাইয়াছেন। ঐ খালের নাম বিলরুট খাল (Beel route Canal) ; স্থানীয় লোকে উহাকে লাইনের খাল বা লাইন বলে, কারণ বিল প্রদেশে দুই পার্শ্বে সরল রেখা (লাইন-line) টানিয়া ঐ খালের সীমানা স্থির করা হইয়াছে, এবং ঐ খাল সর্বত্রই সরল রেখার মত চলিয়াছে, কোথাও বেশি বাঁক নাই। এই খাল মধুমতী নদীকে কুমার নদের সহিত সংযোগ করিয়াছে। ইহার প্রস্থ ক্রমে ক্রমে বর্ধিত করা হইয়াছে। এই খালের উত্তর পশ্চিম পার্শ্বে উলপুর গ্রাম অবস্থিত। খালের অপর পার্শ্বেও উলপুরের জমি আছে। তাহাতে পূর্বে লোকের বসতি ছিল না ; কেবল শস্য ও ঘাস উৎপন্ন হইত। লাইনের খাল হইবার পর উহার দক্ষিণ-পূর্ব পারস্থিত জমি অনেক উঁচু হইয়া বসতির যোগ্য হইয়াছে। এখন সে পারেও ১৫/২০ ঘর লোক বাস করিতেছে। মূল উলপুর গ্রামের সাবেক বসতি সকল খালের উত্তর পশ্চিম পারেই অবস্থিত। এই খাল যেখানে মরা মধুমতীর সহিত মিলিত হইয়াছে সেইস্থান হইতে উলপুর গ্রামের ব্যবধান ৩½ মাইল। বর্তমান জারি মধুমতী নদী হইতে উলপুরের দূরত্ব প্রায় ৫ মাইল। গোপালগঞ্জ বন্দর (যে স্থানে সাবডিবিসন্, থানা ও সাব রেজেস্টারী অফিস আছে) উলপুর হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে দক্ষিণদিকে অবস্থিত। ২৩°৩' উত্তর অক্ষরেখা ও ৮৯°৭৩' পূর্ব দ্রাঘিমার সংযোগস্থলে উলপুরের অবস্থান।

এই খাল কাটিবার সময়ে খালের অনেক মাটি উলপুর গ্রামে পতিত হইয়াছে ; তজ্জন্য উক্ত খালের সন্নিহিত স্থান সমূহ সমধিক উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়া নদী-তীরবর্তী স্থানের ন্যায় উচ্চ এবং দৃঢ় ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বর্ষার কয়েক মাস ব্যতীত অপর সকল ঋতুতে ঐ সকল স্থানের দৃশ্যের সঙ্গে অন্য কোন নদী তীরবর্তী স্থানের দৃশ্যের বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। তবে এই সকল স্থান একেবারেই বৃক্ষাদি শূন্য এবং বর্ষাকালে সম্পূর্ণ জলমগ্ন থাকে। গ্রামের অন্যান্য অংশ এখনও অনেক নিচু, কিন্তু ৪০/৫০ বৎসর পূর্বে যেরূপ গভীর বিলময় ছিল এখন সেরূপ নহে। উলপুর এবং তাহার চতুর্দিকস্থ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ প্রতি বৎসর আষাঢ় মাস হইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত সম্পূর্ণ জলমগ্ন থাকে। তখন লোকের বাসগৃহের স্থানসমূহ অসীম জলরাশি মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় দৃষ্ট হয়। চারিদিকে অনন্ত অম্বুরাশি প্রায়শ নয়নরঞ্জন ধান্যরাজিতে আচ্ছাদিত, স্থানে স্থানে কচুরিতে আবৃত, ক্বচিৎ কোথাও পদ্ম, কুমুদ ও পানিফল প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদে শোভিত। গ্রীষ্মকালে শুষ্ক মাঠের উপর বর্ষাকালে ৭/৮ হাত জল হয়। আবার বর্ষাপগমের সঙ্গে সঙ্গে এই জল নামিয়া যায়। বৎসরের ৪/৫ মাস সমস্ত জমি জলমগ্ন থাকে ; এ কারণে বাসগৃহের অংশভূত উচ্চভূমি ভিন্ন কুত্রাপি কোন বৃক্ষ দেখা যায় না। শুধু হিজল, বন্যা, পিঠাপোড়া গাছ এবং বেতবন ও অন্যান্য জঙ্গল যাহা জলেও জীবিত থাকে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। লাইনের খাল হইবার পূর্বে মাঠের জমি কর্দমময় থাকিত। এমন

কি গ্রীষ্মের সময়েও অনেক স্থানে হাঁটু পর্যন্ত পঙ্কমগ্ন হইত। এখন সে অবস্থা দূর হইয়াছে। গ্রীষ্মের সময়ে সমস্ত স্থানের মৃত্তিকাই শক্ত হয়।

পূর্বে উলপুর গ্রামের বহু স্থানই জঙ্গলময় ছিল ; বেতবন, নল, লটা, উলুবন, হিজল, বন্যা ও নানারূপ জঙ্গলাগাছে পূর্ণ ছিল। মাঝে মাঝে দুই একটি ভিটা, তাহাও প্রায় জঙ্গলাবৃত ছিল। ঐ সব জঙ্গলে বৃহৎ বৃহৎ বিষধর সর্প, চিতাবাঘ, খেঁকশিয়াল, খাঁটাস প্রভৃতি নানারূপ হিংস্র জন্তু বাস করিত। গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্তী বিল ও জলাভূমি ধাপদলে পূর্ণ থাকিত। মশা, মাছি, ভেক্‌, জলৌকা ও নানাবিধ কীট পতঙ্গ প্রভৃতির বড়ই উপদ্রব ছিল। বর্ষাকালে গ্রামটি জলময় ও অন্যান্য ঋতুতে মরুভূমির ন্যায় উত্তপ্ত বালুকাবৃত। বর্ষার সময়ে যেমন সর্বত্রই জল, গ্রীষ্মের সময়ে তদ্রূপ জলেব একান্ত অভাব। বর্ষাকালে নৌকায় গমনাগমনের সুবিধা ছিল ; অন্য সময়ে নৌকাপথে কষ্টে নিকটবর্তী মধুমতী নদীতে বাহির হওয়া যাইত, কিন্তু পরগণার মধ্যে যাতায়াতের কোন সুবিধা ছিল না।

২। সাহাপুর পরগণা

উলপুর, থানা ও সব্‌রেজেস্টারী আফিস গোপালগঞ্জ ও পরগণা তপ্পে সাহাপুরের অন্তর্গত। পূর্বাপর এই পরগণা ২৭টি মৌজার সমষ্টিতে গঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু বর্তমানকালে সাধারণের গণনায় মৌজার সংখ্যা ৪২।

১১৯৮ সালে এই পরগণার দশশালা বন্দোবস্ত হয়। তাহাতে এই পরগণার বাজস্ব ১৩৩০ সিক্কা টাকা স্থির হয়। ঐ বন্দোবস্তের কাগজে জমিদারগণের পক্ষে গোমস্তা রামচরণ দাস স্বাক্ষর করেন ; এবং তাহাতে সূর্যনারায়ণ রায় ও কালীনারায়ণ সিংহ রায় নামে দুইজন গবর্নমেন্টের কানুনগো সাক্ষীস্বরূপে দস্তখত করেন। তৎপর ১২০৪ সালের ৫ আশ্বিন তারিখে জমিদারগণের পক্ষ হইতে পঞ্চসনা কাগজ ও ১২১৬ সালে ইসিমনবিসী কাগজ কালেক্টরীতে দাখিল হয়। এই দুই প্রস্ত কাগজে পরগণার মৌজা সমূহের নাম নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত হইয়াছে।

১। উলপুর। ২। মোল্লাকান্দি ময় বিলমোল্লা। ৩। তেঁতুলিয়া ময় বিল গাঙ্গনী। ৪। নিজরা। ৫। রাউৎখামাব ময় বিলচামুনি (বর্তমান বিল চাপনি)। ৬। খাটিয়াগড়। ৭। আড়ুয়া কংসুর। ৮। কংসুর। ৯। ডোমরাসুর। ১০। করপাড়া। ১১। বনগ্রাম। ১২। পানাইল। ১৩। হাটবাড়িয়া। ১৪। বৌলতলী। ১৫। পদ্মবিলা। ১৬। কড়িগাও। ১৭। পুইসুর ময় পনসী। ১৮। কলপুর। ১৯। শূরগাঁও। ২০। বারখাদিয়া। ২১। রাউতপাড়া। ২২। গান্দিয়াসুর। ২৩। বলাকড়ি ময় বিলসিংদয় (সিংহদহ বা সিংদহ)। ২৪। তারগাঁও। ২৫। ডেমাকড়ি। ২৬। কৃষ্ণপুর। ২৭। ঠুটামান্দ্রা। পনসী নামে একটি পৃথক কিসমত পুইসুর মৌজার সামিল অনেকদিন পরিচিত ছিল। কিন্তু প্রায় একশত বৎসর পূর্বে এই নাম লোপ পাইয়াছে। কড়িগাঁও মৌজার নাম সমস্ত প্রাচীন কাগজে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা বর্তমান বারখাদিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং ইহার স্বতন্ত্র নাম লোপ পাইয়াছে।

পূর্বোক্ত পঞ্চসনা কাগজে এই পরগণার বিবরণ ও চৌহদ্দী নিম্নলিখিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে ঃ—"হকিকত চৌহদ্দিবন্দি তপ্পে সাহাপুর মামুলে পরগণে ইদরাকপুর সরকার বাকলা মহাল খালিসা মুদাফত পরগণে তেলিহাটী সরকার ফতেয়াবাদ তালুক শ্রীরামদেব বসু রায়চৌধুরি তপা মজকুরের হদ্দ ও মহদুদ ঃ—পশ্চিমের হদ্দ পরগণে নলদি ও মকিমপুর, উত্তরের হদ্দ পরগণে তেলিহাটী, ও পরগণে ফতেপুর, দক্ষিণের হদ্দ পরগণে পুব খড়রিয়া, পুবের হদ্দ পরগণে কোতালীপাড়া ও পরগণে তালিমপুর। এই কএ পরগণায় মৈদ্দে তপা মজকুরের মৌজা হায় ইতি"—'পরগণা ফতেপুর সম্ভবত ফতেজঙ্গপুরের স্থানে লেখকের ভুলক্রমে লিখিত হইয়াছে।)

বিগত ডিস্ট্রিক্ট সেটলমেন্টে এই পরগণায় ২৬ মৌজার নাম দৃষ্ট হয়। যাহা সাধারণের নিকট ২/৩ বা ততোধিক মৌজা বলিয়া পরিচিত তাহারই কোন কোনটি সেট্‌লমেন্ট কাগজে একটি মৌজা বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নিম্নে সেটলমেন্ট রেকর্ডে তম্নে সাহাপুর পরগণাভুক্ত যে সকল মৌজার নাম আছে তাহা লিখিত হইল ; যে মৌজার মধ্যে সাধারণের পরিচিত অপর কোন মৌজা অন্তর্ভুক্ত আছে তাহার বিবরণ সেই মৌজার পার্শ্বে বন্ধনী মধ্যে প্রদত্ত হইল।

১। উলপুর, ২। তেঁতুলিয়া (তেঁতুলিয়া, মালেঙ্গা), ৩। রাউতখামার, ৪। মোল্লাকান্দি, ৫। কাঁঠালবাড়ি, ৬। নিজরা (নিজরা, বটবাড়ি, পারকুল, পশ্চিম নিজরা, নারিকেলবাড়ি, আন্ধারকোটা, পদ্মবিলা), ৭। রাউতপাড়া, ৮। বারখাদিয়া (বারখাদিয়া, ফুলতলা, কড়িগাঁও), ৯। শূরগ্রাম, ১০। কলপুর (কলপুর, তেলিভিটা) ১১। বৌলতলী, ১২। কৃষ্ণপুর, ১৩। গান্দিয়াসুর, ১৪। ঠুটামান্দ্রা (ঠুটামান্দ্রা, পাটকেলবাড়ি, ঘোষাল কান্দি, বারইকান্দি), ১৫। বড়ডোমরাসুর (ডোমরাসুর, কলাকোপা, মাঝকান্দি, ডুমুরিয়া), ১৬। ডেমাকড়ি, ১৭। পুঁইসুর ১৮। পানাইল (পানাইল, গোয়ালবাড়ি), ১৯। তারগ্রাম (তারাগাঁও, লক্ষ্মীপুর), ২০। করপাড়া (করপাড়া, উত্তর করপাড়া), ২১। হাটবাড়িয়া, ২২। বলাকড়ি, ২৩। বনগ্রাম, ২৪। কংসুর, ২৫। আড়ুয়াকংসুর, ২৬। খাটিয়াগড়। মোল্লাকান্দি গ্রামের পশ্চিমে যে সুবৃহৎ গজারিয়ার বিল ছিল তাহা ভরাট হইয়া জমি উঠিত হইলে তাহার নাম গজারিয়ার ডাঙা হইয়াছে। তাহা মোল্লাকান্দি মৌজারই অন্তর্ভুক্ত।

৩। আয়তন ও লোকসংখ্যা

সাহাপুর পরগণাতে পূর্বে গবর্নমেন্টের মাপের আশি হাজার বিঘা জমি ছিল বলিয়া খ্যাতি ছিল। তন্মধ্যে লাইনের খালের জন্য অনেক জমি গবর্নমেন্ট কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। লোকসংখ্যা পূর্বে যেরূপ ছিল তাহা অপেক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ৫০/৬০ বৎসর পূর্বে পুঁইসুর, ডেমাকড়ি প্রভৃতি গ্রামে কোন লোকের বাস ছিল না। ক্রমে সেইসব স্থানেও লোকের বসতি হইয়াছে। ১৯৩১ সালে গবর্নমেন্ট কর্তৃক শেষ লোক গণনা হইয়াছে, তাহার পরও ৫ বৎসর অতীত হইয়াছে ; সুতরাং একেবারে ঠিক লোকসংখ্যা দেওয়া সম্ভবপর নহে। তবে যতদূর সম্ভব শুদ্ধমত নিম্নে বিভিন্ন গ্রামের আয়তন ও লোকসংখ্যা দেওয়া হইল :—

গ্রামের নাম	আয়তন একর	আয়তন গবর্নমেণ্ট প্রচলিত বিঘা	লোকসংখ্যা
উলপুর	১৪০৬	৪২৫৩	৩০০০
তেঁতুলিয়া	৮০৪	২৪৩২	১৮৫০
রাউতখামার	৫৯৩	১৭৯৪	১২৫০
মোল্লাকান্দি	৬২০	১৮৭৫	৭০০
কাঁঠালবাড়ি	১৫৯	৪৮১	৩৫০
নিজরা	৪০৪৫	১২২৩৬	৬০০০
রাউতপাড়া	৩১১	৯৪১	৪০০
বারখাদিয়া	৩৯৬	১১৮৮	৪৫০
শূরগ্রাম	৪২১	১২৭৩	৭৫০
কলপুর	১৪৫২	৪৩৯২	৯০০
বৌলতলী	৪৮৭	১৪৭৩	৬০০
কৃষ্ণপুর	৫৬১	১৬৯৭	৯৫০

গ্রামের নাম	আয়তন একর	আয়তন গবর্নমেন্ট প্রচলিত বিঘা	লোকসংখ্যা
গান্দিয়াসুর	৪৭৮	১৪৪৬	৬০০
ঠুটামান্দ্রা	২২১৭	৬৭০৬	১৫০০
বড়ডোমরাসুর	২২৭০	৬৮৬৭	১০০০
ডেমাকড়ি	১৬৩	৪৯৩	১৫০
পুঁইসুর	২৪২	৭৩২	৫০
পানাইল	৬৪৭	১৯৫৭	১৫০
তারগ্রাম	১১৭০	৩৫৩৯	৩০০
করপাড়া	১০৫৩	৩১৮৫	১৯০০
হাটবাড়িয়া	৬১৭	১৮৬৬	১০০০
বলাকড়ি	৯৮৩	২৯৭৯	১৫৫০
বনগ্রাম	১৫২৯	৪৬২৫	২০০০
কংসুর	৪০৫	১২২৫	৯৫০
আড়ুয়াকংসুর	৫১৫	১৫৫৮	৭৫০
খাটিয়াগড	৬৪৭	১৯৫৭	১১০০
	২৪১৯১	৭৩১৭০	৩০২০০

ইংরেজি হিসাবে মোট আয়তন প্রায় ৩৮ বর্গমাইল, মোট লোকসংখ্যা ৩০০০০ (ত্রিশ হাজার)। ইহার সঙ্গে লাইনের খালের জন্য গৃহীত জমি যোগ দিলে মোট আয়তন প্রায় ৪০ বর্গমাইল হইবে। প্রতিবর্গ মাইলে লোকসংখ্যা ৭৫০।

উলপুরে বাদ্যকর শ্রেণির কয়েক ঘর মুসলমান আছে। তাহাদের সংখ্যা ৭০ জনের বেশি নহে। অবশিষ্ট অধিবাসী হিন্দু। অন্যান্য গ্রামের মধ্যে মোল্লাকান্দি, কাঁঠালবাড়ি, বারখাদিয়া, শূরগ্রাম, রাউতপাড়া, বৌলতলী, ঠুটামান্দ্রা, কৃষ্ণপুর, ডেমাকড়ি ও পানাইল গ্রামের সমস্ত অধিবাসীই হিন্দু। কলপুর, নিজরা, বলাকডি, তারগ্রাম, করপাড়া, কংসুব, আড়ুয়াকংসুর, বনগ্রাম ও খাটিয়াগড় মৌজায় হিন্দু ও মুসলমান উভয ধর্মাবলম্বী লোকেরই বাস আছে। এই পরগণায় অন্য কোন ধর্মাবলম্বী লোকের বাস নাই। পবগণায় মুসলমান অধিবাসীগণের মোট সংখ্যা প্রায ৯০০০ হইবে, অবশিষ্ট প্রায় ২১০০০ অধিবাসী হিন্দু। উভয় ধর্মাবলম্বী লোকের মধ্যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব নাই। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি, আত্মীয়তা ও সদ্ভাব আছে।

উলপুরগ্রামে বঙ্গজ কায়স্থের সংখ্যাই প্রায় অর্ধেক, অল্প সংখ্যক দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ, ১৪/১৫ ঘর বারেন্দ্র শ্রেণির ব্রাহ্মণ, ৩ ঘর রাঢ়ীয় শ্রেণির ব্রাহ্মণ, ও কয়েক ঘর ধোপা, নাপিত এবং নমঃশূদ্রের বাস। অন্যান্য গ্রামের মধ্যে কাঁঠালবাড়ি, নারিকেলবাড়ি, রাউতপাড়া, শূরগ্রাম, করপাড়া, হাটবাড়িয়া ও কংসুর গ্রামে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের বাস আছে। এবং উহার কোন কোন গ্রামে ধোপা, নাপিতেরও বাস আছে। তেঁতুলিয়ার অর্ধেকের উপর অধিবাসী রাজবংশী। পরগণার অবশিষ্ট সমস্ত হিন্দু অধিবাসী নমঃশূদ্র।

৪। বিলের পরিচয়

পূর্বে এই অঞ্চলে যে সকল বিল ছিল তাহার অনেকই এখন ভরাট হইয়া গিয়াছে। লোকে সেই সকল বিলের নাম ও অবস্থান প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। উলপুর গ্রামের পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম তিনদিকই বিলে মগ্ন ছিল, কেবল মাত্র দক্ষিণ পশ্চিম দিকে কতকগুলি উঁচু ভিটাতে লোকের বাস ছিল। পুবের বিলকে উলপুরের বিল, উত্তরের বিলকে আন্ধারকোঠার বিল এবং

উত্তর-পশ্চিমের বিলকে ভুরভুরিয়ার বিল বলিত। তেঁতুলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে প্রসিদ্ধ গাঙ্গনীর বিল এখনও বর্তমান আছে ; দক্ষিণ-পশ্চিমদিকস্থ খড়িয়ার বিল প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে। রাউতখামারের দক্ষিণাংশে চাপনীর বিল এখনও আছে। মোল্লাকান্দির পূর্বদিকে অল্পস্থান ব্যতীত সমস্তই বিল ছিল। এখনও মোল্লার বিল মোল্লাকান্দির পশ্চিম অংশে বর্তমান। মোল্লাকান্দির সর্ব পশ্চিমাংশে ও তদ্দক্ষিণস্থ খাগাইল গ্রামের উত্তর পশ্চিমাংশে চন্দ্রদিঘলিয়া গ্রামের উত্তর পূর্বাংশে গজারিয়ার বিল ছিল, তাহা এখন ভরাট হইয়া গজারিয়ার ডাঙা নামে বিখ্যাত। তাহার পশ্চিমে চন্দ্রদিঘলিয়া, নিশ্চিন্তপুর ও নিজামকান্দির কতকাংশে পত্নীডাঙা নামে বৃহৎ বিল ছিল। পশ্চিম নিজরার এবং কাঁঠালবাড়ির সীমানায় চোগনারা বিল এবং কাঁঠালবাড়ি বিল ছিল। এখনও তাহার কতকাংশ বর্তমান আছে। পশ্চিম নিজরার উত্তরে নিজামকান্দি ও বিদ্যাধর গ্রামে হারজোরা নামে প্রসিদ্ধ বিল ছিল। ইহাতে শীতকালে বহু পার্বত্য পক্ষী উড়িয়া আসিত। রাউতপাড়ার পশ্চিমাংশে কুমারিয়া বিল ছিল। বারখাদিয়ার পূর্বাংশ ও শূরগ্রামের উত্তরাংশে বারখাদিয়ার বিল, এবং কলপুরের পূর্ব ও উত্তরাংশ সমস্তই তেলিভিটার বিল নামে পরিচিত ছিল। ডোমরাসুর, ডেমাকড়ি, পুইসুর, পানাইল, তারগ্রাম এবং হাটবাড়িয়ার কতকাংশ এবং পাটিখেলবাড়ি ও ঘোষালকান্দি সমস্তই বিলময় ছিল। তাহার কতকাংশকে ডুমুরিয়া বিল বলিত। বলাকড়িতে সিংদহ ও তারগ্রামের দক্ষিণাংশে এবং তাহার দক্ষিণস্থ মানিকহারের উত্তরাংশে মাটিভাঙার বিল ছিল। বনগ্রামের দক্ষিণ-পূর্বাংশে বাসরিয়া বিল ও তাহার পশ্চিমে বনগ্রাম বিল এবং খাটিয়াগড়ের উত্তর ও আড়ুয়াকংসুর প্রায় সম্পূর্ণ মৌজাই কংসুরের বিল নামে পরিচিত ছিল। এই সকল বিলের মধ্যে মোল্লার বিল, চাপনী ও গাঙ্গনীর বিল এখনও সঙ্কুচিত আয়তনে বর্তমান আছে। অন্যান্য বিল সমস্তই প্রায় ভরাট হইয়া চাষী জমি ও গরলায়েক পতিত জমিতে পরিণত হইয়াছে।

৫। বিলের উৎপত্তি

পূর্বে মধুমতী নদীর উভয়পার্শ্বে ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা ও বাকরগঞ্জ জেলার অনেকাংশ ব্যাপিয়া এক বহুবিস্তীর্ণ সুগভীর জলরাশি ছিল। ক্রমে তাহার মাঝে মাঝে ভরাট হইয়া অবশিষ্টাংশ এখন নানা বিভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন বিলরূপে বর্তমান আছে। অথচ এই বিলভূমির পরিধির বাহিরের চতুর্দিকের জমির দৃঢ় এবং উচ্চ, সুতরাং স্বভাবত এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়—কি কারণে কি ভাবে চতুর্দিকস্থ উচ্চ ও দৃঢ় ভূমির মধ্যে এই সুগভীর জলরাশির উৎপত্তি হইল। কোন একটি কি দুইটি নদীর মুখ হঠাৎ ভরাট হইয়া এইরূপ বহুবিস্তীর্ণ স্রোতহীন জলরাশির সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে এক মত এই যে পূর্বে এই সমস্ত স্থান বঙ্গোপসাগরের অংশ ছিল। পার্বতীয় জলরাশি নদীপথে এই সমস্ত স্থানে পতিত হওয়ায় সমুদ্রের মুখে অর্থাৎ যেখানে এখন সুন্দরবন অবস্থিত সেইস্থানে প্রথম চর পড়িতে থাকে। ক্রমে নদীর জলসমূহ নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হওয়াতে এবং সুন্দরবন প্রভৃতি স্থান উচ্চ হইয়া যাওয়াতে বিল প্রদেশ হ্রদাকৃতি সমুদ্রের শাখাতে (lagoon) পরিণত হইল এবং তাহার মুখ অর্থাৎ মূল সমুদ্রের সঙ্গে সংযোগস্থল অত্যন্ত অগভীর হইয়া গেল। প্রথমত এই জলরাশি লবণাক্ত ছিল। উত্তর হইতে আগত পার্বতীয় জলস্রোত এই স্থানের উপর দিয়া বহু বর্ষ প্রবাহিত হইবার ফলে এই জলের লবণ আস্বাদ দূর হইয়াছে।[১]

অন্য মত এই যে বহুশত বর্ষ পূর্বে সংঘটিত ভূমিকম্পের ফলে এই স্থান ধ্বসিয়া গিয়া জলমগ্ন হইয়াছিল। ক্রমে স্থানে স্থানে জমি ভরাট হইয়া লোক বসতি হইয়াছে, বাকি অংশ বিলময় রহিয়াছে। উলপুরে ও অন্যান্য কোন কোন গ্রামে মাটি খুঁড়িয়া প্রাপ্ত ইন্দারা প্রভৃতি এই মতের পোষক।[২]

৬। রাস্তা

প্রাকৃতিক অসুবিধার জন্য এ অঞ্চলে বারমাস স্থায়ী ভাল রাস্তা রক্ষা করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। লাইনের খাল কাটিবার পর বর্ষাকালের দক্ষিণমুখী জলস্রোতের গতি পরিবর্তিত করিয়া তাহা এই খাল দিয়া প্রবাহিত করিবার উদ্দেশ্যে গবর্নমেন্ট বহু অর্থ ব্যয়ে এই খালের দক্ষিণ পাড় বাঁধাইয়া বর্ষাকালীন সর্বোচ্চ জলের সীমানা হইতে উচ্চ করিয়াছেন, এবং স্থানে স্থানে পয়ঃপ্রণালী রাখিয়া তাহাতে গেট (sluice gate) করিয়া দিয়াছেন। রাস্তা নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত না হইলেও তদ্দ্বারা প্রকারান্তরে গোপালগঞ্জ হইতে ফতেপুর (সিন্দিয়াঘাট) পর্যন্ত ১৭ মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা হইয়াছে। গবর্নমেন্ট একটু দৃষ্টি দিলে এই রাস্তা বারমাস কাল ব্যবহারের উপযোগী হইতে পারে।

ইহা ছাড়া এই অঞ্চলে কোন রাস্তা নাই। বিস্ময়ের বিষয় এই যে মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে ও ইংরেজ রাজত্বের প্রথম আমলে এই দেশে একটি ভাল রাস্তা ছিল। ১৭৬৫ খ্রিঃ অব্দে মেজর রেনেল বঙ্গদেশের যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন তাহাতে উলপুর হইতে কোটালিপাড়ার মধ্য হইয়া বাকরগঞ্জ পর্যন্ত একটি রাস্তা (common road) বর্তমান থাকা দৃষ্ট হয়। এই রাস্তা ভূষণা হইতে আরম্ভ হইয়া জয়নগর, কালীনগর, মুকসুদপুর পর্যন্ত আসিয়া, সেখান হইতে সোজা দক্ষিণদিকে গান্দারহাটি, শিবরামপুর ও নিজেরহাট হইয়া উলপুর পর্যন্ত আসিয়া, উলপুর হইতে দক্ষিণপূর্ব দিকে কামারপাড়া, তাড়াসী প্রভৃতি গ্রাম হইতে গৌরনদী ও তৎপর ইদ্রাকপুর, নলচিড়া, মাধবপাশা ও কাশীপুর হইয়া বাকরগঞ্জ পর্যন্ত গিয়া শেষ হইয়াছিল। কিন্তু ১০০ বৎসর পরে রেভিনিউ সার্ভে হইয়া যে মানচিত্র প্রস্তুত হয় তাহাতে ঐরূপ কোন রাস্তার নিদর্শন ছিল না। এখন ঐরূপ কোন রাস্তা নাই। রেনেলের মানচিত্রে উলপুর হইতে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত আর একটি রাস্তা অঙ্কিত আছে। ঐ মানচিত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে মধুমতী তখন আরপাড়া ও হরিদাসপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত।[৩]

৭। খাল

বারমাস জল থাকে না বলিয়া এদেশে খাল বেশি নাই। লাইনের খাল ছাড়া যে অল্পসংখ্যক খাল আছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

১। **উলপুরের খাল** মোল্লার বিল হইতে উঠিয়া মোল্লাকান্দির মধ্য দিয়া উলপুর গ্রামের পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়া হাতিখাদা, খাটিয়াগড়, দুর্গাপুর, মাঝিগাতি, ভোজেরগাতি, বাজুনিয়া ও কাজুলিয়া গ্রাম এবং কোটালিপাড়া পরগণার মধ্য দিয়া ঘাঘর নদী পর্যন্ত যে খাল গিয়াছে, তাহাই এ দেশের একমাত্র খাল বলিলে চলে। পূর্বে ইহা অতি অপ্রশস্ত ও অগভীর ছিল ; এখন লাইনের খালের স্রোতবেগে পূর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও গভীর হইয়াছে; দুর্গাপুরে এই খালের সঙ্গে গোলাবাড়িয়ার খাল মিশিয়াছে।

২। **তেঁতুলিয়ার খাল** উলপুরের খাল হইতে তেঁতুলিয়ার হাটের নিকট উঠিয়া পূর্বতন হরিদাসপুরের খালের সঙ্গে বর্তমান টোল আফিসের নিকট মিলিত হইয়াছে। হরিদাসপুরের খাল এখন লাইনের খালের অন্তর্গত হইয়াছে। পূর্বে ঐ দুইটি খালই অতি অপ্রশস্ত ও অগভীর ছিল। উলপুর হইতে মধুমতীতে বাহির হইবার এই একটিমাত্র পথ ছিল। তখন তেঁতুলিয়া গ্রামের মধ্য হইতে আর একটি ছোট খাল গাঙ্গনীর বিলে পতিত হইয়া তদ্দক্ষিণস্থ পচার বিলে মিশিয়াছিল ; তাহাকে পচার খাল বলিত।

৩। **রাউতখামারের খাল** মোল্লাকান্দি ও রাউতখামারের মধ্য দিয়া তেঁতুলিয়ার খালের সহিত মিশিয়াছে। এই খাল দ্বারা চাপনীর বিল ও মোল্লার বিল সংযুক্ত হইয়াছে।

৪। উলপুরের উত্তর দিকে পশ্চিম নিজরার দক্ষিণ ও পূর্ব এবং কাঁঠালবাড়ির পশ্চিম দিয়া

প্রথমত পূর্বমুখী ও পরে উত্তরমুখী একটি দোয়াল (জলপথ) নারিকেলবাড়ি পর্যন্ত গিয়াছে।

৫। সাহাপুর পরগণার পূর্ব জোয়ারে (বিভাগে) কোন খাল ছিল না। কিন্তু একটি প্রসিদ্ধ দোয়াল বহুদূর পর্যন্ত বৎসরের ১০/১১ মাস খালের কার্য করিত। এই দোয়ালের কতকাংশ এখনও বর্তমান আছে। ইহা হাটবাড়িয়ার দোয়াল নামে পরিচিত। ইহা বৌলতলী গ্রামের পশ্চিমাংশ হইতে আরম্ভ হইয়া করপাড়া ও উত্তর করপাড়ার মধ্য দিয়া হাটবাড়িয়াকে পূর্ব ও পশ্চিম হাটবাড়িয়া এই দুই অংশে বিভাগ করিয়া, হাটবাড়িয়া, করপাড়া ও আড়ুয়াকংসুরের দক্ষিণ সীমানা, বলাকড়ি ও বনগ্রামের উত্তর সীমানা এবং কংসুরের পূর্ব ও বনগ্রামের পশ্চিম সীমানা দিয়া ধবলিয়া বিলে পতিত হইয়াছে। এই দোয়ালের উত্তর সীমানা যাহা বৌলতলী-গ্রামে অবস্থিত তাহার অধিকাংশ লাইনের খালের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, এবং উক্ত খালের দক্ষিণ পাড় উচ্চ করিয়া বাঁধিয়া দেওয়াতে বৌলতলী ও উত্তর করপাড়ায় দোয়ালের অংশ প্রায় অন্যান্য মাঠের সমান উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছে। হাটবাড়িয়া, করপাড়া ও আড়ুয়াকংসুরের সীমানায় দোয়ালের যে অংশ অবস্থিত তাহা লাইনের খালের স্রোতবেগে গভীর ও প্রশস্ত হইয়া খালের আকার ধারণ করিয়াছে।

লাইনের খাল হইবার পর উলপুর, আন্ধারকোটা, বৌলতলী, নারিকেলবাড়ি, কাঁঠালবাড়ি, নিজরা প্রভৃতি গ্রামের জল নিকাশের জন্য কয়েকটি ছোট ছোট খাল সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা অল্প ; প্রায় কোনটিতেই বারমাস নৌকা চলাচল করিতে পারে না।

লাইনের খাল হইবার পর এই স্থানের লোকের যাতায়াতের খুব সুবিধা হইয়াছে। ঐ খালের দ্বারা নৌকাযোগে এবং স্টিমারযোগে সর্বত্রই গমনাগমন সহজসাধ্য হইয়াছে। খুলনা হইতে মাদারিপুর যে স্টিমার যাতায়াত করে উলপুর ও বৌলতলীতে তাহার স্টেশন আছে।

৮। অন্যান্য জলাশয়

এই অঞ্চলের লোকেরা জলের আধিক্য ও অত্যন্তাভাব এই উভয়বিধ অসুবিধাই ভোগ করিয়া থাকে। শীতকালে বর্ষার জল নামিয়া যায়। বিলের জল ক্রমশ সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়। পূর্বে গ্রামসমূহ শীতকালের শেষে ও গ্রীষ্মকালে একেবারেই জলশূন্য হইত। পুষ্করিণী খনন করিলেও বেশি গভীর হইত না। যে কয়েকটি ছোট খালের উল্লেখ করিয়াছি তাহাও প্রায় শুষ্ক হইয়া যাইত। গ্রীষ্মকালে লোক নিদারুণ জলকষ্ট ভোগ করিত। কথিত আছে একবার এরূপ জলকষ্ট হইয়াছিল যে উলপুরের অধিবাসীগণেব পানীয় জল মোল্লার বিল হইতে আনিতে হইয়াছিল। জলকষ্ট দূর করিবার জন্য বিভিন্ন সময়ে অনেকে অনেক পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত প্রয়োজনের সময়ে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে প্রায় পুষ্করিণীতেই জল থাকে না। উলপুর গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে কালীবাড়ির পশ্চিমে কৃষ্ণরাম রায়ের খনিত দীর্ঘিকা এখনও বিদ্যমান আছে। ঐ দিঘি খুব গভীর ছিল, জলাভাবের সময়ে উহার জলে উলপুর ও পার্শ্ববর্তী ৩/৪ গ্রামের লোকের জলকষ্ট অনেক পরিমাণে নিবারিত হইত। পশ্চিম নিজরা এবং করপাড়াতেও এইরূপ কয়েকটি গভীর পুষ্করিণী ছিল। এখন লাইনের খালের জোয়ারের ফলে এত দীর্ঘকাল জলকষ্ট স্থায়ী হয় না, তথাপি ফাল্গুন চৈত্র দুই মাস অনেক গ্রামেই জলের দারুণ অভাব হয়। অধুনা অনেক গ্রামে নলকূপের (Tube-well) প্রচলন হইতেছে। অনেকদিন পূর্বে উলপুরের দক্ষিণ পাড়ায় মাটির নিচে একটি ইন্দারার ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

৯। পশুপক্ষী

প্রায় সমস্ত স্থানই ৫/৬ মাস জলে মগ্ন থাকায় কোন বৃহৎ বন্যজন্তু এদেশে থাকিতে পারে না। গৃহপালিত গো, মেষ, ছাগাদি পশু ব্যতীত যে সকল জন্তু ছাড়া ভিটাতে, ঝোপে, জঙ্গলে

থাকিতে পারে তাহাদের মধ্যে খাটাশ, বাঘডাসা ও শৃগাল পূর্বে অনেক ছিল, এখন ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। নানা জাতীয় সাপ, গোসাপ, বেজি ও ভেক প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আছে।

সাধারণ পক্ষীর মধ্যে কাক, কোকিল, চিল, বাজ, চড়ুই, বাবুই, দোয়েল, বাদুড়, চামচিকা, শকুনি, বক, পাণিকৌড়ি, মাছরাঙা, কাঠঠোক্‌রা, হাড়গিলা, কোড়া ও ডাহুক প্রভৃতি এবং গৃহপালিত পক্ষীর মধ্যে পারাবত, পাতিহাঁস ও মোরগ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। বহুপূর্বকাল হইতে শীতের সময়ে নানাবিধ পাহাড়িয়া পক্ষী দূর দেশ হইতে উড়িয়া আসিয়া বিলে বসে। তাহাদের মধ্যে সরালি, দিগড়ী, নড়ালী, পিপি ও মাথালাল উল্লেখযোগ্য। এই সকল পাখির মাংস সুখাদ্য। শিকারিরা জাল পাতিয়া একসঙ্গে বহু পাখি ধৃত করে। ঐ জালকে ছারজাল বলে।

১০। মৎস্য

এই দেশে পূর্বে আহার্য জিনিসের মধ্যে মৎস্য ও দুগ্ধ প্রচুর পাওয়া যাইত। পূর্বে নদীর মাছ বেশি মিলিত না; অল্প পরিমাণে মধুমতীর ও আড়িয়লখাঁর ইলিশ মাছ মিলিত। তন্মধ্যে মধুমতীর ইলিশ খুব সুস্বাদু। রুই, কাতল, মৃগেল, কালিবোস, শউল, গজাল, চিতল, বোয়াল, ফলুই, কই, খলিসা, শিঙ্গি, মাগুর, সরপুঁটি, পুঁটি, চেলা, চান্দা, বালিয়া, বাইন, টাকি, পাবদা, টেংরা, চিংড়ি প্রভৃতি বিলের সবরকম মাছ প্রচুর পরিমাণে মিলিত। নদীর মাছের মধ্যে রুই, কাতল, ইলিশ, আইর, বোয়াল, চিতল, শিলন, বাচা, টাট্‌কিনী, খরশুল, চাপিলা, ফেশা, গলদাচিংড়ি প্রভৃতি অল্প পরিমাণে মিলিত। লাইনের খাল হইবার পর বিলের মাছ অনেক কমিয়াছে। কিন্তু নদীর মাছ পূর্বাপেক্ষা বেশি পাওয়া যায়। তাহার ফলে পূর্বে যেরূপ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে মাছের খুব অভাব হইত এখন সেরূপ হয় না। এখন ঐ সময়ে নানাবিধ নদীর মাছ পাওয়া যায়।

মাছের এইরূপ আধিক্য থাকা বশতঃ এ দেশে অনেক মৎস্য ব্যবসায়ী লোক আছে। তেঁতুলিয়াগ্রামে তাহাদের বাস। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে বিদেশ হইতে এখানে অনেক জিয়ানি আসিয়া বাসা করিয়া থাকে। এইসব লোকে নানাবিধ উপায়ে মৎস্য ধরিয়া থাকে। ক্ষেপলা জাল, ভেসাল, ভুলকী, সাঙ্গলা, খড়কী, চাপজাল, কই ও খলিসা জাল, ও হোচা জাল প্রভৃতি জাল এবং চান্দ, চারা, দুয়ার, চাঁই, হোচা, পোলো প্রভৃতি বাঁশের নির্মিত মাছ ধরার যন্ত্র এবং কোচ এওড়া, জুতি প্রভৃতি ধারাল লৌহ ফলকযুক্ত অস্ত্র ও নানা রকমের ছিপ ও বড়শী দ্বারা সময়ে সময়ে ধাপ টানিয়া, পুষ্করিণীতে মাটির কলসী ডুবাইয়া রাখিয়া, নৌকা ডুবাইয়া তাহাতে গাছের ছোট ছোট ডাল দ্বারা জাগন দিয়া, এমন কি কর্দমময় অল্পজলে শুধু হাত দিয়া এ দেশের লোকে মাছ ধরিয়া থাকে।

১১। শস্যাদি

এ দেশের প্রধান শস্য ধান। যখন দেশে অনেক বিল ছিল তখন বোরো ও রাঁএদা ধান বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং আউস ও আমন অল্প জমিতে হইত। এখন ক্রমে আউস, আমন ও দীঘার চাষের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বোরো ধানের পরিমাণ কমিয়াছে। পূর্বে আউস, আমন ও বোরো তিন জাতীয় ধান্যই মোটা এবং নিকৃষ্ট ছিল; এখন উৎকৃষ্ট শ্রেণির ধান্যের বীজ রোপণ করায় পূর্বাপেক্ষা অনেক সরু ও উৎকৃষ্ট ধান্য জন্মে। পূর্বে অনেক জমিতে তিল এবং অল্প জমিতে সরিষা উৎপন্ন হইত। এখন তাহার পরিমাণ খুব কমিয়া গিয়াছে। ডাইল এ পরগণায় মোটেই উৎপন্ন হইত না। এখন খালের পার্শ্ববর্তী উচ্চ জমিতে মটর, কলাই প্রভৃতি ডাইল ও অন্যান্য রবিশস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পূর্বকালের বোরো চাউলের ভাতের একটু মিষ্ট আস্বাদ ছিল, তখন অনেকে আমন চাউল

অপেক্ষা বোরো চাউলের ভাত পছন্দ করিত। যে সকল আমন ধানের গাছ অন্ততপক্ষে ৮/১০ হাত লম্বা হয় তাহাই এ দেশে রোপণ করা হয়, কারণ বর্ষাকালে প্রায় সকল মাঠের উপর ৭/৮ হাত জল হয়। এই সকল আমন ধানের গাছ জল বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়ে; সুতরাং জলে কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। সাধারণত আউস ও আমন ধানের বীজ মিশাইয়া একই ক্ষেত্রে বপন করা হয়। আউস ধান্য শীঘ্র পাকে এবং আষাঢ় শ্রাবণ মাসের মধ্যে কাটিতে হয়। আউস ধান্য কাটিবার সময়ে আমন ধান্যের গাছেরও মাথা কাটা যায়, তাহাতে ঐ গাছ শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বোরো ধান্যের বীজ অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে নরম জমিতে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহা হইতে যে চারা হয় তাহা পরে অন্য জলা জমিতে পাতলা করিয়া রোপণ করিতে হয়। উহাকে পাতো বলে। ঐ ধান্য সাধারণত চৈত্র বৈশাখ মাসে পাকে। দীঘা ধান আমন ধানের মতই রোপিত ও উৎপন্ন হয়। কিন্তু দীঘা চাউল আমন অপেক্ষা একটু মোটা ও ভারী। দীঘা ধান্য হইতে আতপ চাউল হয় না। এ দেশে নানা রকমের আমন ধান হয়, যথা : লেপা, পিত্তিরাজ, খইয়ামটর, দলকচু, ঝিঙ্গাসইল, মালভোগ, বানরজটা, ছত্রভোগ, দুধকলম, কাচকলম, লালবাদল প্রভৃতি। আউসও কয়েক রকমের উৎপন্ন হয় যথা : বিন্নাফুল, লৌহশল, কালীজিরা, দশনহর, সাইটা, কৌজুরি, কচারনড়ি প্রভৃতি ; এবং বোরো ধান্যের মধ্যে কইজোর, বাটারপাইতা, সোনারগাইজা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

তরিতরকারীর মধ্যে লাউ, কুমড়া, শিম, বেগুন, মূলা, পেঁপে, শসা, কচু, চালকুমড়া, কাচকলা প্রভৃতি বেশ উৎপন্ন হয়। অন্যান্য তরকারি নিকটবর্তী স্থান সমূহ হইতে আমদানি হয়।

১২। হাটবাজার

উলপুরের হাট উলপুরের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে তেঁতুলিয়ার সীমানায় অবস্থিত, সেজন্য সাধারণত লোক তাহাকে তেঁতুলিয়ার হাট বলে। এই হাটের অবস্থা পূর্বে ভাল ছিল না, কিন্তু এখন ইহা একটি সমৃদ্ধিপূর্ণ বন্দরে পরিণত হইয়াছে। করপাড়ার হাট করপাড়া ও বনগ্রামের সীমানায় অবস্থিত। হাটবাড়িয়া, করপাড়া, খাটিয়াগড় কংসুর, বনগ্রাম ও বলাকড়ি প্রভৃতি স্থানের লোকের পক্ষে এই হাট বিশেষ উপযোগী। কিন্তু হাটের অবস্থা তেমন ভাল নহে। এই দুইটি হাটই বহু পূর্বকাল হইতে আছে। লাইনের খাল হইবার পর বৌলতলী গ্রামে ঐ খালের পাড়ে একটি ভাল হাট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উলপুরের হাট রবি ও বুধবার, করপাড়ার হাট মঙ্গল ও শনিবার এবং বৌলতলীর হাট সোম ও শুক্রবার বসে। ইহা ছাড়া বড় বড় গ্রামে (বিশেষত উলপুরে) অনেকগুলি ভাল স্থায়ী দোকান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত দ্রব্য কিনিতে পাওয়া যায়।

ইদানীং কেহ কেহ বলেন যে উলপুরের হাট ১২৯৪ সালের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মতের পোষক কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই। ১৮৫৮—১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার গবর্নমেন্ট কর্তৃক রেভিনিউ সার্ভে পরিমাপ হইয়া যে মানচিত্র প্রস্তুত হয় তাহা ১৮৭৯ খ্রিঃ অব্দে মুদ্রিত হয়। তাহাতে তেঁতুলিয়ার হাট অঙ্কিত আছে ; তাহাতে দেখা যায় ঐ হাট রবিবার ও মঙ্গলবার বসিত। সুতরাং ঐ হাট উক্ত জরিপের ২৪ বৎসর পরে (কিংবা উক্ত মানচিত্র মুদ্রিত হইবার ৮ বৎসর পরে) সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর নহে। ঐ মানচিত্রে ঐ হাটের অবস্থান মিথ্যা এবং সার্ভেয়রগণের কল্পনাপ্রসূত বলিবার কোন কারণ নাই। প্রকৃত ব্যাপার এইরূপ,—রেভিনিউ সার্ভের সময়ে অর্থাৎ বাংলা ১২৬৫—১২৭০ সালে হরিদাসপুরে হাট ছিল না। উক্ত মানচিত্র হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। তাহার অনেক পরে হরিদাসপুরের হাট (ভেড়ার হাট নামে অভিহিত) স্থাপিত হয়। এখনকার মত তখনও ঐ হাট রবিবার ও বুধবারে

বসিত। রাউতখামার, মোল্লাকান্দি ও পশ্চিম নিজরায় তখন অনেক হাটুরিয়া দোকানদার ছিল। তাহারা নোয়াপাড়া ও ফুলতলার হাট হইতে মালপত্র কিনিয়া নৌকাযোগে দেশীয় হাটে বিক্রয় করিত। কিন্তু ঐ সকল হাট করিয়া মঙ্গলবার উলপুরে পৌঁছান সম্ভব ছিল না, সুতরাং তাহারা বুধবার ভেড়ারহাটে যাইত, ফলে রবিবারেও তাহারা তেঁতুলিয়ার হাটে না আসিয়া ভেড়ারহাটে যাইত। তাহাতে তেঁতুলিয়ার হাটে মালপত্রের ভাল আমদানি হইত না এবং হাটও ভালরূপ মিলিত না। তদ্দৃষ্টে উলপুরের জমিদারগণ তাহাদের যেসব প্রজা ভেড়ারহাটে জিনিসপত্র বেচিতে যাইত তাহাদিগকে সেখানে না যাইয়া তেঁতুলিয়ার হাটে মাল বেচিতে আদেশ দিলে সেই ব্যবসায়ীগণ বুঝাইয়া দেয় যে মঙ্গলবার হাট হইলে তাহারা নোয়াপাড়া, ফুলতলা প্রভৃতি হাট হইতে মাল আনিয়া হাট করিতে পারে না। বুধবার দিন হাট হইলে ভেড়ারহাট ত্যাগ করিয়া তাহারা উলপুরের (তেঁতুলিয়ার) হাটে মালপত্র বেচিতে আসিতে পারে। তখন জমিদারগণ তেঁতুলিয়ার হাট মঙ্গলবারের পরিবর্তে বুধবার বসাইতে আরম্ভ করেন। তাহাতে পূর্বোক্ত রাউতখামার প্রভৃতি স্থানের ভেড়ারহাট ছাড়িয়া উলপুরের হাটে মাল বেচিতে আরম্ভ করে। ফলে ভেড়ারহাটের অনেক ক্ষতি হওয়ায় কিছুদিন গোলযোগ ও বিবাদ চলিয়াছিল। সেই সময়ে বহুস্থান হইতে দোকানদার ও খরিদ্দার আকৃষ্ট করিবার জন্য শ্রীপঞ্চমীর সময়ে প্রায় মাসাবধি তেঁতুলিয়ার হাটে মেলার বন্দোবস্ত হয়। তাহাতে যাত্রা, কবি, জারি, ঢপ, রামায়ণ গান, পুতুলনাচ ও ঘোড় দৌড় প্রভৃতি নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ হইত। এক সময়ে এই মেলা খুব প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। বহু দূরবর্তী স্থান হইতে লোকজন এই মেলাতে আসিত। হাটের এই বার পরিবর্তন এবং মেলার সৃষ্টি ১২৯৩-১২৯৪ সালে হইয়াছিল। সম্ভবত এই কারণে কেহ কেহ এই সময়ে উলপুরের হাটের সৃষ্টির কথা বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে ঐ স্থানে হাট উলপুরের জমিদারির সৃষ্টির অল্পকাল পর হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

এই কথা অন্যান্য বিষয় হইতেও প্রমাণিত হয়। সাহাপুরের জমিদারি সৃষ্টির পর পাঁচ হিস্যার মালিক জমিদারগণের মধ্যে সমগ্র পরগণার জমি আপোষ বণ্টন হইয়া বাংলা ১১২৬—১১২৯ সালে ষোল আনার চিঠা প্রস্তুত হয়। ঐ সময়ে উলপুর গ্রামের মধ্যে শুধু ৪টি স্থান ষোল আনার এজমালি থাকে ; অবশিষ্ট সমস্ত জমি বণ্টন হইয়া পৃথক পৃথক শরিকের অংশগত হয়। সেই ৪ স্থান এই ঃ (১) কালীবাড়ি ও তাহার সংলগ্ন পূর্বদিকস্থ মাঠান জমি, (২) ষোল আনার বাস্তুপূজার স্থান (বর্তমান সীতানাথ সরখেলের বাড়ির দক্ষিণ পূর্বদিকে অবস্থিত), (৩) ছোট ৩ আনীর বাড়ির পূর্বদিকস্থ পুষ্করিণী ও (৪) বর্তমান হাটের স্থান। কালীবাড়ি ও বাস্তু পূজার স্থান এজমালি রাখিবার কারণ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ছোট ৩ আনী বাড়ির পূর্বদিকের পুষ্করিণী এজমালি রাখিবার কারণ যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। বর্তমান হাটের স্থানে যদি তাহার পূর্ব হইতেই হাট না বসিত তবে ঐ স্থান পাঁচ হিস্যার জমিদারগণের এজমালি রাখিবার কোন কারণ ছিল না, এবং ১১২৬ সাল হইতে ১২৯৪ সাল পর্যন্ত অনর্থক ঐ স্থান এজমালি পড়িয়া থাকিত না। জমিদারগণ উলপুরে উপনিবিষ্ট হইয়া তাহাদের এলাকার মধ্যে বাসস্থানের সন্নিকটে নিত্য প্রয়োজনীয় আহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কোন হাট পত্তন না করিয়া প্রায় ২০০ বৎসর অন্য জমিদারের এলাকাস্থিত দূরবর্তী স্থানে জিনিসপত্র ক্রয় করিতে যাইতেন এরূপ অনুমান করিবার কারণ নাই।

বহুদিন পর্যন্ত তেঁতুলিয়ার হাটে কোন স্থায়ী দোকান বা বাসিন্দা দোকানদার ছিল না। সর্বপ্রথম যশোহর জেলার মহিষেরগোপ নিবাসী হরি ঘোষ ও তাহার ভ্রাতা শ্রীনাথ ঘোষ এই হাটে স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধিয়া গোয়ালদোকান করে। তৎপরে গুরুচরণ কুণ্ডু স্থায়ী দোকান স্থাপন করে। তাহার পুত্র পৌত্রগণ এখনও সেই দোকান সুনামের সহিত চালাইতেছে। তৎপরে ক্রমে ক্রমে ঐ হাটে অনেক স্থায়ী দোকান হইয়াছে।

প্রথম অবস্থায় উলপুরের হাট অতি ছোট ছিল এবং তাহাতে সর্ববিধ মালপত্র পাওয়া যাইত না। লাইনের খাল হইবার পর উলপুরের খাল (যাহার পার্শ্বে উলপুরের হাট অবস্থিত) বর্ধিতায়তন ও গভীরতর হইয়াছে। এখন ঐ খালে বড় বড় নৌকা বারমাস যাতায়াত করিতে পারে। মালপত্র আমদানির এই সুবিধার জন্য হাটের ক্রমশ উন্নতি হইতেছে।

উলপুরের জমিদারগণ এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ উপযুক্তরূপে মনোযোগ করিলে এই হাটের আরও অনেক উন্নতি হইতে পারে। শ্রীপঞ্চমীর মেলা এখন আর হয় না। প্রথম ১৫/১৬ বৎসর ঐ মেলা বিশেষ উৎসাহের সহিত পরিচালিত হইয়াছিল। ক্রমে সেই উৎসাহ হ্রাস হইয়াছে। পূর্বের ভাবও এখন নাই। সুতরাং সেভাবে সম্ভবত মেলা বসান এখন সুবিধাজনক হইবে না। কিন্তু অন্যভাবে এবং পরিবর্তিত আকারে প্রদর্শনীসহ উহা পুনঃ প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।

১৩। শিল্প বাণিজ্য

শিল্প ও বাণিজ্যেব বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন বিষয় এখানে নাই। পূর্বকালে এদেশে নৌকা নির্মাণ ও ক্রয়-বিক্রয় খুব হইত। তখন সুন্দরবন হইতে অনেক সুন্দরি কাষ্ঠের চালান এদেশে আসিত। সেই সকল গাছ হইতে করাতিয়া (ঢায়ই) ভাল তক্তা করিত, এবং তদ্দ্বারা স্থানীয় কাষ্ঠশিল্পীগণ (বারই) ছোট বড় অনেক নৌকা নির্মাণ করিত। সে সমস্ত নৌকা প্রায় এদেশেই বিক্রয় হইত। তখন অনেক সুদক্ষ বারই এদেশে ছিল। ক্রমে সুন্দরী গাছের আমদানি বন্ধ হইলে কিছুদিন শালকাঠেব নৌকা প্রস্তুত হইত। কিন্তু তাহা অত্যন্ত ভারী এবং মন্দগামী ; একারণে এখন ভাল নৌকা সমস্তই সেগুন কাঠের দ্বারা নির্মিত হয়। এখনও নৌকা নির্মাণ ও খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে ; কিন্তু পূর্বের মত বহু পরিমাণে নহে।

নৌকা নির্মাণের আনুষঙ্গিকরূপে লোহার ব্যবসাও পূর্বে এদেশে বেশ চলিত। লোহার কর্মকার অনেক ছিল এবং গজারিয়া ও পাতাম লোহা, এবং দা, বটি, ছুরি, কাঁচি, সমস্তই তাহারা প্রস্তুত করিত। এখন সেরূপ লোহার কর্মকারও বেশি দেখা যায় না।

আড়ুয়াকংসুর ও করপাড়া অঞ্চলে মুসলমান তন্তুবায়গণ পূর্বাপর বস্ত্রবয়ন ও বিক্রয় করিয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে তাহাদের এই ব্যবসা মন্দা পড়িলেও তাহারা এ যাবত ইহা চালাইতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ খুব সুন্দর বস্ত্র বয়ন করিতে পারে।

পূর্বে এদেশে দুইটি উল্লেখযোগ্য গৃহশিল্প ছিল। বর্ষাকালে যখন জমিক্ষেতের কাজ থাকিত না তখন অনেকে বাদায় গিয়া নল কাটিয়া আনিত ; ঐ নল পিটাইয়া চওড়া করিয়া দরমা বুনাইত। দরমা দ্বারা গৃহের বেড়া ও বসিবার আসনের কাজ বেশ চলিত। কিন্তু এদেশে এখন এ ব্যবসা দেখা যায় না।

যখন পাটের দাম কম ছিল, তখন লোকেরা নিজ নিজ গৃহ প্রাঙ্গণে উদ্বাস্তু জমিতে কিয়ৎপরিমাণে পাটের চাষ করিত ; সেই পাট বিক্রয় করিলে বিশেষ লাভ হইত না ; কিন্তু অনেকেই তাহা পাকাইয়া দড়ি করিত,—তাহার নাম তাউতা। সেই সময় নারিকেল কাতার তেমন আমদানি হয় নাই। সেকারণে তাউতার ব্যবসা বেশ চলিত। ক্রমে নারিকেল কাতার আমদানি হওয়ায় তাহার খরিদ বিক্রয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বাণিজ্যের মধ্যে এদেশে একটি ব্যবসায়ের খুব চল। তাহাকে নৌকার চালানী কারবার বলে। মূলধনী একখানি নৌকা ও মূলধন সরবরাহ করে ; ৩/৪ জন ভাগী থাকে,—তাহারা ঐ নৌকা বাহিয়া যে বন্দরে যে জিনিস সস্তায় বিক্রয় হয় সেখান হইতে সেই মাল কিনিয়া যেখানে বেশি দামে বিক্রয় হয় সেখানে গিয়া বিক্রয় করে। তাহারা সাধারণত ধান, চাউল, ডাইল, গুড়, লঙ্কা, হলুদ ও আম কাঁঠালের ক্ষেপ দেয়। এক এক ক্ষেপের মাল বিক্রয় করিয়া

নৌকা মূলধনীর ঘাটে আসিলে হিসাব নিকাশ হইয়া মূলধন ও খরচ বাদে যাহা লাভ থাকে তাহা মূলধনী (মহাজন) ও ভাগিগণের মধ্যে নির্দিষ্ট অংশ অনুসারে বিভাগ হয়। আবার সুসময় দেখিয়া নৌকা ক্ষেপে বাহির হয়। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে ক্ষেপ আরম্ভ হয় এবং আশ্বিন মাসে বন্ধ হয়।

এস্থান হইতে অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইবার মত উৎপন্ন কোন ফসলই নাই। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে মৎস্যের রপ্তানি বহু পরিমাণে হইয়া থাকে। মৎস্য ব্যবসায়ের কেন্দ্র তেঁতুলিয়া গ্রামে। মৎস্যের পাইকারী ক্রেতাগণকে সাধারণত নিকারী বলে। তাহারা তেঁতুলিয়ার খালে বড় বড় নৌকা বাঁধিয়া থাকে, সেই স্থানকে পাবা বলে। ধীবরগণের নিকট হইতে তাহারা কই, খলিসা, সিঙ্গী, মাগুর ও শউল প্রভৃতি জীবিত মৎস্য পাইকারী হিসাবে ক্রয় করিতে থাকে ; নৌকা বোঝাই হইলেই তাহা কলিকাতায় পাঠাইয়া দেয়। নিকারীগণের এই মৎস্যের ব্যবসা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত লাইনের খালে স্টিমার যাতায়াত আরম্ভ হইবার পর হইতে শীতকালে অনেক মৎস্য ব্যবসায়ী বরফ দিয়া কলিকাতায় স্টিমার ও রেলযোগে মাছ চালান দিয়া থাকে।

১৪। দুর্ভিক্ষ

একমাত্র ধান্য ফসল এদেশবাসীর অবলম্বন। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অকালবৃষ্টি, বর্ষার জল অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়া বা অতিরিক্ত কম হওয়া, পঙ্গপাল, ফরিঙ, পোকা, পামরী প্রভৃতি ধান্যের অসংখ্য অপায়। ষোল আনা ফসল ঘরে উঠান প্রায়ই কৃষকের ভাগে জোটে না। এই সকল কারণের কোন কারণ প্রবলভাবে দেখা দিলে এদেশে দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর উপস্থিত হয়। বহুকাল পূর্বে ১২৭৩ সালে এদেশে এবং ফরিদপুর জেলার অনেক স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল ; সে দুর্ভিক্ষ সাহাপুর পরগণায় তেমন প্রবল হয় নাই। ১৩০৪ সালে প্রায় সমস্ত বঙ্গদেশে, বিশেষত এই প্রদেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়। ১৩০২ ও ১৩০৩ সালে উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় এই দুই বৎসর ভাল ফসল হয় নাই ; লোকে পর বৎসরের ফসলের আশায় অতি কষ্টে এই দুই বৎসর কাটাইয়াছিল ; কিন্তু পরবৎসর বৃষ্টির অভাবে একেবারেই অজন্মা হইল। ব্রহ্মদেশের চাউল ১০ টাকা মন দরে বিক্রয় হইতে লাগিল। তাহাতেই অনেক লোকের প্রাণরক্ষা হইল। বহুলোক একবেলা খাইয়া থাকিত ; অনেকে অনশনে প্রাণত্যাগ করিল। আমাদের জীবনকালে ঐরূপ ভীষণ দুর্ভিক্ষ আর দেখা যায় নাই। পুনরায় ১৩১৩ সালে এদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল কিন্তু তাহা ১৩০৪ সালের দুর্ভিক্ষের ন্যায় গুরুতর কিংবা ব্যাপক হয় নাই।

১৫। অগ্নিকাণ্ড

এই স্থানের অধিকাংশ বাসগৃহে খড়ের চাল, বাঁশের খাম ও হোগলা কিংবা দরমার বেড়া। চালের খড় বদলাইবার জন্য অনেকে খড় মজুত রাখে। বাসের উপযোগী স্থান কম এবং তাহার তুলনায় লোকের সংখ্যা অধিক, একারণে ঘরগুলি শহরের মত প্রায় গায়ে গায়ে মিশান। হঠাৎ কোন কারণে একঘরে আগুন লাগিলে অনেক ঘর দগ্ধ হইয়া যায়। ছোট খাট অগ্নিকাণ্ড এদেশে অনেক সময়ে হইয়াছে। কিন্তু দুইবার ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া বহু ঘর বাড়ি দগ্ধ হইয়াছে।

১২৯৫ সালের কার্তিক মাসে ছোট সোয়া ৩ আনীর বাড়ির (কোঠা বাড়ি) ছোট হিস্যার চাকরদের থাকিবার একখানি ঘরে আগুন লাগিয়া এই বাড়ির সমস্ত ঘর ও পার্শ্ববর্তী বাড়ির ২/১ খানা ঘর পুড়িয়াছিল। তখন বর্ষাকাল বলিয়া অন্য বাড়িতে অগ্নি বিস্তৃত হইতে পারে নাই। ইহা অপেক্ষাও গুরুতর অগ্নিকাণ্ড ১৩০৫ সনের চৈত্র মাসে সংঘটিত হয়। বেলা

১/২টার সময়ে দক্ষিণের বাড়ির নন্দকুমার রায়ের একখানি ছোট ঘরে অসাবধানে রক্ষিত কল্কির আগুন হইতে আগুন লাগে। সে সময়ে দক্ষিণের বাড়ি ও কোঠাবাড়িতে অসংখ্য খড়ের ঘর। চৈত্র মাসে কোন পুষ্করিণীতে জল ছিল না, এবং দারুণ রৌদ্রে ঘরের চালগুলি এমন শুষ্ক হইয়াছিল যে সামান্য একটু আগুন লাগিলেই পুড়িয়া ভস্মীভূত হইত। ফলে ঐ আগুনে দক্ষিণের বাড়ি (বড় সোয়া ৩ আনী) ও কোঠাবাড়ির (ছোট সোয়া ৩ আনী) প্রায় সমস্ত ঘরও তদুত্তরস্থ গিরিধুপীর বাড়িও পুড়িয়া গিয়াছিল। প্রায় ১৫০/১৭৫ খানি ঘর ঐ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল। তৎপর কয়েক বৎসর লোকের মনে সতত অগ্নিভয় বিদ্যমান ছিল। তারপরই অনেকে মূলবাড়ি ত্যাগ করিয়া পৃথক বাড়ি করিতে আরম্ভ করে।

১৬। ঝটিকাবর্ত ও জলপ্লাবন

বর্ষাকালে এ দেশ স্বভাবতই জলমগ্ন থাকে। পূর্বে কোন বৎসর এত জলবৃদ্ধি পাইত যে অনেকের উঠানের উপর, এমন কি ঘরের মধ্যে জল প্রবেশ করিত। তাহাতে বাসের পক্ষে নিদারুণ কষ্ট হইত। সৌভাগ্যের বিষয় ঐরূপ প্লাবন প্রায়ই দীর্ঘদিন স্থায়ী হইত না। আজকালও জলবৃদ্ধি পায় এবং সময়ে সময়ে অনেকের বাসগৃহের মধ্যে জল উঠে।

স্থানীয় লোকের বাসগৃহ সমূহ প্রায়ই বেশি মজবুত নহে, সুতরাং ঝড়ের ভয় সর্বদাই আছে। প্রতি বৎসরই দুই একদিন ভীষণ ঝড়ে অনেক ঘর পতিত হয়।

১৩০২ সালের পূজার পর এবং ১৩১৬ সালের পূজার ২/১ দিন পূর্বে এ দেশে ভীষণ ঝটিকাবর্ত হয়। তাহাতে দেশের বহু লোক গৃহহীন হইয়াছিল। ১৩২৬ সালের পূজার পূর্বের ভয়ঙ্কর ঝটিকার (cyclone) কথা এখনও সকলের মনে জাগরুক আছে। বৈশাখ মাসই ঝড়ের কাল সত্য, কিন্তু আশ্বিন কার্তিক মাসের ঝটিকা সর্বাপেক্ষা প্রবল ও অনিষ্টকর হয়।

১৭। স্বাস্থ্য

এ দেশের লোকের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল। পূর্বে আরও ভাল ছিল। ব্যারাম পীড়ার মধ্যে আষাঢ় মাসে নূতন জলের সময়ে, এবং কার্তিক মাসে জল কমিবার সময়ে অনেকের জ্বর হইয়া থাকে। পূর্বে কলেরা মহামারীতে বহুলোক মারা যাইত। পৌষ মাঘ মাসে নূতন চাউলের সময়ে, এবং ফাল্গুন চৈত্র মাসে পানীয় জলাভাবের সময়ে কলেরা রোগ দেখা দিত। পূর্বে ইহার কোন চিকিৎসা ছিল না। এক ঘরে কলেরা হইলে গ্রামবাসী সকলের মনেই ভয়ঙ্কর ভয় হইত ; সেই ভয়ের ফলেও অনেকে ঐ রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত।

১২৭৪ সালের পৌষ মাসে একবার উলপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমুহে কলেরা মহামারী ভীষণভাবে দেখা দিয়াছিল। বহুগৃহ তাহাতে একেবারে জনশূন্য হইয়াছিল। অনেক লোক বিনা চিকিৎসায় ও বিনা শুশ্রূষায় ঐ রোগের আক্রমণে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল।

১২৮৩ সালের পৌষমাসে আর একবার এই প্রদেশে কলেরা মহামারীর ভীষণ আক্রমণ হইয়াছিল। ঐ ব্যারামে প্রসিদ্ধ মহেশচন্দ্র রায়ের গৃহ হইতে ১১/১২ জন লোক মারা যায় এবং আরও অনেক গৃহ হইতে বহু লোক প্রাণত্যাগ করে।

১৩০৫ সনের চৈত্রমাসে যে অগ্নিকাণ্ডের কথা লিখিত হইয়াছে ঐ অগ্নিকাণ্ডের পর উলপুরে কলেরা মহামারীর আক্রমণ হয়। তাহাতে রাজেন্দ্রনাথ রায়, বি. এ. এবং অন্যান্য অনেক লোকের মৃত্যু হয়।

১৩১৩ সালের পৌষমাসে আর একবার কলেরা মহামারীর আক্রমণ হইয়াছিল। তখন কলেরা চিকিৎসার অনেক উন্নতি হইয়াছে। এ কারণে অনেক আরোগ্য লাভ করে ; কিন্তু সেবারও ১২/১৪ জন লোক উলপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে ঐ রোগে প্রাণ ত্যাগ করে।

১৮। চিকিৎসক ও চিকিৎসার ব্যবস্থা

পূর্বে এদেশে চিকিৎসকের একান্ত অভাব ছিল। রঘুনন্দন রায় সাহাপুর জমিদারি প্রাপ্ত হইবার পর তাহার সন্তানসন্ততিগণ যখন উলপুরে বাস আরম্ভ করেন তখন মুসলমানের রাজত্ব, ডাক্তারী চিকিৎসা প্রবর্তন হয় নাই। রঘুনন্দনের ৩য় পুত্র কৃষ্ণরাম উলপুরে বাস স্থাপন করিবার পর একজন কবিরাজ আনাইয়া তাহাকে অনেক জমি বৃত্তি স্বরূপ প্রদান করিয়া উলপুরে স্থাপন করেন। তাহার উত্তর পুরুষগণ সেই ব্যবস্থা বহাল রাখিয়াছেন। তখন উলপুরে এবং সাহাপুর পরগণায় ঐ একমাত্র চিকিৎসক ছিলেন। তাহার অনেককাল পরে বানরিপাড়া নিবাসী বনমালী দাশগুপ্ত কবিরাজ উলপুরে আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি দীর্ঘকাল এখানে ঐ ব্যবসা করিয়া বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করিয়া প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র কেশবচন্দ্র দাশগুপ্ত কলিকাতা ক্যাম্পবেল স্কুল হইতে ডাক্তারি পাশ করিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ৫ বৎসর পড়িয়া উলপুরেই চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। তাহার অপর ভ্রাতুষ্পুত্র জিতেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এম. বি পাশ করিয়া গোপালগঞ্জে ডাক্তারি করিতেছেন। সম্প্রতি উলপুরে আরও তিনজন কবিরাজ চিকিৎসা ব্যবসা করিতেছেন।

উলপুর নিবাসী স্বর্গীয় দুর্গাচরণ চক্রবর্তী উলপুরে প্রথম ডাক্তারি ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি নেটিভ ডাক্তার হইলেও চিকিৎসা কার্যে তাঁহার বেশ সুনাম ছিল। উলপুরের রায়চৌধুরি বংশীয় শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র রায় ক্যাম্পবেল হইতে প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমত ভাঙায় চাকুরি লইয়া যান। সেখানে কিছুদিন থাকিবার পর তিনি ১৩০১/১৩০২ সালে উলপুরে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি সুচিকিৎসক। সর্বপ্রকার চিকিৎসায়, বিশেষত ধাত্রীবিদ্যায় তাহার বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া দেবেন্দ্রনাথ রায় এবং অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় অনেকদিন উলপুরে ডাক্তারি চিকিৎসায় নিযুক্ত আছেন।

কৃষ্ণরাম রায় এদেশে প্রথম চিকিৎসক আনয়ন করেন। তাহারই একজন উত্তর পুরুষ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও দেশ হিতৈষী দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরি ১৩০৯ সালে স্বীয় পিতার নামে উলপুরে "রামচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়" স্থাপন করেন। একজন বেতনভোগী ডাক্তার প্রতিদিন পূর্বাহ্নে উক্ত চিকিৎসালয়ে সমবেত রোগিদিগকে পরীক্ষা করিয়া বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিয়া থাকেন। ১৩২৭ সালে দেবীবাবুর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই চিকিৎসালয়ের যাবতীয় ব্যয় ভার বহন করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরি এই চিকিৎসালয়ের পরিচালন করিয়াছেন এবং ইহার নানারূপ উন্নতি বিধানের জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর দুই বৎসরের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হওয়ায় তাহার সে সঙ্কল্প পূর্ণ হয় নাই। তাহার মৃত্যুর পব তাহার স্ত্রী ফুল্লনলিনী কয়েক বৎসর এই ডাক্তাবখানা রীতিমত পরিচালিত করিয়া পরে ইহার স্থায়িত্ব কামনায় এই চিকিৎসালয় উলপুবের ইউনিয়ন বোর্ডের হস্তে অর্পণ কবিয়াছেন ; এই চিকিৎসালয়ের দ্বারা বহুলোক উপকৃত হইয়াছে। উপযুক্তরূপে পরিচালিত হইলে ইহা হইতে দেশবাসীগণ প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হইতে পারে।

১৯। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পূর্বে উলপুরে ৩/৪টি পাঠশালা মাত্র ছিল। তাহাতে অল্প বয়স্ক বালক ও বালিকাগণকে সামান্য বাংলা ভাষা, শুভঙ্করী, মানসাঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। উলপুরনিবাসী বারেন্দ্র শ্রেণির ব্রাহ্মণ ত্রিলোচন চক্রবর্তী, কোটালিপাড়া গোয়ালঙ্ক নিবাসী দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ শিবচন্দ্র সজ্জন ও উলপুর নিবাসী দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ বাজকিশোর চৌধুরি সেই আমলের নামজাদা গুরুমহাশয় ছিলেন। সাড়ে ৩ আনী বাড়ির দক্ষিণদিকস্থ ঘোষের বাড়ির পূর্ব খণ্ডে

রাজকিশোর চৌধুরির বাস ছিল। তাহার পুত্র পঞ্চানন চৌধুরি অনেকদিন পাঠশালার গুরু মহাশয় ও পরে মধ্য ইংরেজি স্কুলে গুরুমহাশয়ের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। শেষকালে তিনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ গিরীশ বসুর কাঠগোলায় কার্য করিতেন এবং সেই সময়ে উলপুরের বাস ত্যাগ করিয়া দুর্গাপুরে বাস স্থাপন করেন। ৩/৪ বৎসর পূর্বে সেখানে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

১২৭০ সাল হইতে উলপুরে শিক্ষাবিস্তারের জন্য অভিভাবকগণের দৃষ্টি পড়ে। তখন একটি উচ্চ প্রাইমারী স্কুল স্থাপিত হয়। তাহাতে সামান্য ইংরেজি ভাষাও শিখান হইত। সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কিছুদিন এই স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। ১২৭৯ সালে এই স্কুলকে ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পরিণত করা হয়। তাহার কয়েক বৎসর পরে ইহা মাইনর (মধ্য ইংরেজি) স্কুলে পরিণত হয়। এই মাইনর স্কুল ১৩০৬ সালে এন্ট্রান্স (উচ্চ ইংরেজি) স্কুলে পরিণত হয়। মাইনর স্কুলের শেষ সময়ে শিমুলিয়া নিবাসী চন্দ্রমোহন রায় প্রধানশিক্ষক, (বরিশাল) রণমতী গ্রাম নিবাসী কুঞ্জবিহারী দাশগুপ্ত হেডপণ্ডিত, কাশীপুর নিবাসী অমরচন্দ্র গুহ দ্বিতীয় শিক্ষক, ও উলপুর নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন ও পঞ্চানন চৌধুরি গুরুমহাশয়ের কার্য করিতেন।

উক্ত মাইনর স্কুলে বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিত। অনেক দূরবর্তী স্থান হইতে ছাত্রগণ এখানে আসিয়া লেখাপড়া শিখিত। উলপুরের উত্তর ও পশ্চিম দিকের অনেক গ্রামের নিম্ন প্রাইমারী ও উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের পরীক্ষার কেন্দ্র উলপুর মাইনর স্কুলে ছিল। যে সকল ছাত্র দূরদেশ হইতে ঐ সকল পরীক্ষা দিতে আসিত তাহারা উলপুরে আহার ও বাসস্থান প্রাপ্ত হইত।

১৩০৬ সালের পূজাবকাশে উলপুরের প্রবাসী ভদ্রলোকগণ বাড়িতে আসিলে যুবকগণের চেষ্টায় উলপুরে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য একটি মহতী জনসভা হয়। সেই সকল যুবক এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, কেহ কেহ বা পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহাদের এই কার্যে এত উৎসাহ ছিল যে প্রাচীনগণ সর্বসম্মতিক্রমে উলপুরে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৩০৬ সালের মাঘ মাসে স্কুলের কার্য আরম্ভ হয়। ২/৩ বৎসরের মধ্যে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। বহু দূরদেশ হইতে ছাত্র সমূহ আসিয়া এই স্কুলে ভর্তি হইতে লাগিল। উলপুরে যে বিল প্রদেশে অবস্থিত তাহার মধ্যে উলপুরের স্কুলই প্রাচীনতম উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়।

উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ছাড়া গ্রামের মধ্যে ২/৩টি পাঠশালা ছিল এবং ২টি বালিকা পাঠশালা ছিল। ডাক্তার অনন্তবন্ধু রায় একটি ভাল বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এবিষয়ে যত্নবান হন। বহু চেষ্টায় এবং অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি দুইটি বালিকা পাঠশালাকে মিলিত করিয়া নবীনচন্দ্র রায়ের বাড়িতে নবীনচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। দলাদলি ও বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া সকলে এই বালিকা বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব বিধানে যত্নবান্ হইলে ইহা গ্রামের মহদুপকার সাধন করিতে সক্ষম হইবে।

১৩০০ সালের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে কয়েক বৎসর পর পর্যন্ত উলপুরে একটি ভাল সাধারণ পুস্তকালয় (Public library) ছিল ; তাহাতে তৎকালীন বঙ্গসাহিত্যের অনেক উৎকৃষ্ট পুস্তক ছিল। সেই সময়ে স্থানীয় অধিবাসীগণের মধ্যে বাংলাসাহিত্যের চর্চায় বিশেষ আগ্রহ ছিল। সেটি বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। তখন সমস্ত বঙ্গদেশেই বাংলা সাহিত্যের অধ্যয়ন ও আলোচনায় লোকের বিশেষ উৎসাহ ছিল। উলপুরের ঐ লাইব্রেরির সাহায্যে স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক বাংলা সাহিত্যে ভালরূপ শিক্ষিত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় অনেক বৎসর পরে সুবন্দোবস্তের অভাবে ঐ লাইব্রেরি উঠিয়া যায় এবং তাহার পুস্তকাদি অপহৃত হয়।

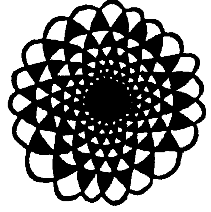
ইদানীং উলপুরের অনেক বাড়িতেই এক একটি ছোট পুস্তকালয় আছে। সম্প্রতি একটি সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। ভালরূপ রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে তাহা শিক্ষার বিশেষ সহায়ক হইবে।

১. There is every reason to suppose that the action of these tides has been constant and uniform ever since the Bay of Bengal took its present shape and consequently, it is probable that there may have always existed a bar or spit on the neutral line between the oceanic and river forces somewhere not far from where the Soonderbans are. If this were the case, the deltaic places would then have been, as hinted above, a great lagoon or inland sea, a circumstance which would tend very considerably to accelerate the deposition of mud in them, and thus account for the rapidity of some of the changes, which might otherwise seem strange." *James Ferguson, F. R. S. in the Quarterly Journal of the Geographical Society for August 1863, quoted in Col J E. Gastrell's Geographical and statistical Report of the districts of Jessore, Foridpur and Bakerganj, p 22*

২. "The second theory is that the Ganges had already performed its work in this area and had passed on after completion of the work and that an earthquake then created a subsidence which accounts for the marshes. There is some local tradition supporting this view and in the marshes themselves masonry foundations and more particulary old coins have been discovered On the whole this seems the better explanation of the existence of the bils" *Jack's Final Report on the Survey and Settlement operations in the district of Faridpur, Para 3 Page 2.*

৩ "There can be no question that the district is considerably handicapped by the absence of convenient means of communication. Curiously enough it was much better supplied with roads even at the end of the Moghul rule Besides the roads in the Goalanda Subdivision and the Jessore Road, Rennell's maps show two roads into Bakergunj. one on the east from Patpasar (Faridpur) through Habibpur and Madarapur (Madaripur) and another on the west through Talma, Muxoodpur, Oulpoor and Cotalipara, and two roads east and west to Bhushna, one through Talma and Hakimpur and the other through Habibpur and Muxoodpur." *Jack's Final Report on the Survey and settlement operations in the district of Faridpur. P 6 Para 11*

"The roads to Barisal shown in Rennell's map are not now traceable Not a vestige now exists of any road between Olpur and Kotalipara, but traces are still to be found of the road from Talma to Bhushna, and near Gohala of a Badshahi Road as it is locally termed, which apparently ran in the direction of Muxoodpur." *Letter of J. G. Dunlop Esqr, District Magistrate, Faridpur, to the Divisional Commissioner on the survey and settlement Report dated 21 December 1916, printed at the end of the said Report.*



দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক বিবরণ

২০। প্রাচীন ইতিহাস

ভারতবর্ষের ধারাবাহিক প্রাচীন ইতিহাস অতি অপ্রচুর; উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ রাজ্যসমূহের কতক ইতিবৃত্ত এখন প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্তের উপকরণের অত্যন্ত অভাব। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে চারি হাজার বৎসর পূর্বে প্রায় সমগ্র বঙ্গভূমি লবণাম্বুরাশিতে নিমগ্ন ছিল; বঙ্গোপসাগর তখন হিমালয়ের পাদদেশ বিধৌত করিত। ক্রমে উত্তর ও পশ্চিম হইতে পার্বতীয় জলস্রোতের সংঘর্ষে উভয়ের স্রোতবেগ মন্দ হওয়ায় পলি পড়িয়া ভূমি উচ্চ হইয়াছে এবং সমুদ্র সরিয়া আসিয়া বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। লবণ সমুদ্র ক্রমশ উত্তর ও পশ্চিম দিক হইতে বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণ পূর্ব দিকে সরিতে থাকে। পূর্বদিকের অংশের পৌরাণিক নাম লোহিত্য বা লোহিত সাগর ; ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া এখন ঐ শাখা ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীতে পরিণত হইয়াছ। ব্রহ্মপুত্র নদের অপর নাম লোহিত্য। ("লোহিতাম্‌ নদভেদঃ সচ ব্রহ্মপুত্র ইতি মেদিনী। সাগর ইতি শব্দমালা," শব্দকল্পদ্রুম)

পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করিবার সময়ে আর্যাবর্ত প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। প্রথমে তাহারা পূর্বদিকে গমন করত লোহিত সাগরের কূলে উপনীত হইলে অগ্নিদেবের বাক্যানুসারে অর্জুন গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় সাগরেব জলে নিক্ষেপ করিলেন।[১] তৎপর পাণ্ডবেরা দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া লবণ সমুদ্রের (বঙ্গোপসাগরের) উত্তর-তীর প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে দক্ষিণ পশ্চিম মুখে দ্বারকায় গমন করত তথা হইতে উত্তর মুখে হিমালয় পর্বতে প্রস্থান করেন। ইহা হইতে সমুদ্রের পূর্ব ও দক্ষিণে দুইশাখা থাকা এবং দক্ষিণের শাখা তখনও প্রায় সমস্ত পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কতকাংশের উপর প্রবাহিত থাকা অনুমিত হয়।

মনুসংহিতার সময়ে লোহিত্য সাগরের পূর্বদিকে আর্যজাতির বাস ছিল না, ঐ সাগরই আর্যাবর্তের পূর্বসীমা ছিল ; একারণে মনুসংহিতায় আর্যাবর্তের পূর্বসীমানায় সাগরের উল্লেখ আছে।

> আসমুদ্রাত্তুবৈ পূর্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
> তযোরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাংবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ মনু, ২য় অঃ, ২২ শ্লোক

অনুবাদ : পূর্বে সমুদ্র ও পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত সেই দুই পর্বতের (হিমালয় ও বিন্ধ্য) মধ্যবর্তী স্থানকে পণ্ডিতগণ আর্যাবর্ত বলিয়া জানেন।

বঙ্গোপসাগর দক্ষিণদিকে ক্রমশ সরিয়া আসার ফলে যে ভাবে ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা ও বরিশাল জেলার কতক অংশে বিলের সৃষ্টি হয় তাহা পূর্ব অধ্যায়ের ৫ম প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে। বিলপ্রদেশে কতদিন পূর্বে লোকেব বসতি আরম্ভ হয় তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। সম্ভবত ১৫০০ বৎসর পূর্বে এই স্থান লোক বসতির উপযোগী হয় নাই।

সাহাপুর পরগণা ও তৎসমীপবর্তী বিল প্রদেশ ইহারও বহু পরে বাসের উপযোগী হইয়াছে। সুতরাং ভারতে হিন্দু-অধিকারের সময়ে এবং মুসলমান অধিকারের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে এই প্রদেশের নামগন্ধ কোথাও পাইবার সম্ভব নাই। একারণে এই প্রসঙ্গে হিন্দু

অধিকার সময়ের ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন নাই। সামাজিক ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়ে আবশ্যক মত তাহার উল্লেখ করা যাইবে। এস্থলে মুসলমান অধিকারের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

২১। ভারতবর্ষে মুসলমান অধিকার

(ক) পাঠান রাজত্ব ঃ

১১৯৪ খ্রিঃ অব্দে সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী তিরৌরীক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিয়া ক্রমে উত্তর ভারতের সম্রাট হন। তৎপর কুতুবুদ্দিন আইবক হিন্দুস্থানের অধিপতি হন। ভারতে তুর্ক-আফগান অধিকার ১২০৬ হইতে ১৫২৬ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল।

(খ) মোঘল রাজত্ব ঃ

১৫২৬ খ্রিঃ অব্দে বাবর দিল্লির শেষ পাঠান সম্রাট ইব্রাহিম লোদীকে পানিপথের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ভাবতে মোঘল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ১৫৩০ খ্রিঃ অব্দে তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র হুমায়ুন সাহ প্রথম ১৫৩০ হইতে ১৫৪০ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন, তৎপর তিনি বিখ্যাত পাঠান সম্রাট শেবসাহ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। শেরসাহ ১৫৪০ হইতে ১৫৪৫ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত বাজত্ব করেন। তৎপর সেলিম বা ইসলাম সাহ ১৫৪৫ হইতে ১৫৫৩ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত এবং মুবারিজ খাঁ আদিল সাহ নাম গ্রহণে ১৫৫৩ হইতে ১৫৫৫ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার হস্ত হইতে হুমায়ুন ১৫৫৫ খ্রিঃ অব্দের জুলাই মাসে পুনরায় দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন। তাহার অল্পকাল পরে সিঁড়ি হইতে পদস্খলন হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপর তাঁহার পুত্র প্রসিদ্ধ আকবর সাহ দিল্লির সম্রাট হন (১৫৫৬—১৬০৫ খ্রিঃ অব্দে)। পরবর্তী মোঘল সম্রাটগণের নাম ও রাজত্বকাল ২৬শ প্রকরণে লিখিত হইল।

২২। বঙ্গদেশের কথা

পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের পর ১১৯৪ খ্রিঃ অব্দে মুসলমানগণ কনোজ রাজ্য অধিকার করেন। তৎপর মগধ তাহাদের হস্তগত হয়। মগধ অধিকার করিবার পর মুসলমানগণ ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করেন। এই সময়ে বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। তিনি ১১৬৯ খ্রিঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপে বাজধানী স্থাপন করিয়া তাহাকে একটি সমৃদ্ধ নগরে পরিণত করেন। তিনি গৌড়ের শাসন ভাব তাঁহার ২য় পুত্র কেশব সেনের উপর ন্যস্ত করিয়া নিজে নবদ্বীপেই বাস কবিতেন। তাহার কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ সেন বীর ছিলেন। মুসলমান গৌড় আক্রমণ করিলে তিনি মধ্যম ভ্রাতা কেশব সেনের সেনাপতিরূপে তাহাদিগকে বারবার পরাস্ত করেন, কিন্তু অবশেষে মুসলমানগণ কর্তৃক ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে গৌড় অধিকৃত হয় এবং ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে মুসলমান সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি নবদ্বীপ অধিকার করেন। লক্ষ্মণ সেন বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে তাহার মৃত্যু হয়। তৎপর মাধবসেন, কেশব সেন এবং তাঁহাদের পুত্র পৌত্রগণ বিক্রমপুরে (সোনারগাঁও) থাকিয়া পূর্ববঙ্গে হিন্দু রাজত্ব রক্ষা করেন। এই বংশের শেষ রাজা দনৌজামাধব সেন। খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুসলমান কর্তৃক তাহার রাজ্য অধিকৃত হয়।

২৩। বাংলার পাঠান সুবাদারগণ

বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি কর্তৃক উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গজয়ের পর দিল্লির সম্রাটের নিয়োজিত সুবাদার কর্তৃক এই প্রদেশের শাসনকার্য নির্বাহিত হইত। এই শাসনকর্তাগণের সময়ে গৌড় নগরই মুসলমান শাসিত বঙ্গের রাজধানী ছিল। ১২০৪ খ্রিঃ অঃ হইতে ১৩৪০ খ্রিঃ অঃ পর্যন্ত এই প্রদেশের পাঠান সুবাদারগণ দিল্লির সম্রাটেব অধীন ছিলেন। ইহাদের মধ্যে তোগ্রল খাঁ নামক সুবাদার (১২৭৭—১২৮২) ১২৮০ খ্রিঃ অব্দে নিজ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরিশেষে

গিয়াসুদ্দিন বলবনের সেনাপতি কর্তৃক তোগ্রল ধৃত ও নিহত হইলে সম্রাট স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র বগ্‌রা খাঁকে বাংলার রাজত্ব প্রদান করেন এবং নাসিরুদ্দিন আখ্যা প্রদান করেন। পিতার মৃত্যুর পর সুলতান নাসিরুদ্দিন বগ্‌রা খাঁ দিল্লির সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও তাহা ত্যাগ করিয়া বাংলায় রাজত্ব করিতে থাকেন। কিন্তু সম্রাট আলাউদ্দিন খিল্‌জি ১২৯৯ খ্রিঃ অব্দে তাঁহার রাজ্য দুইভাগ করিয়া তাহাকে লক্ষণাবতী (গৌড়) ও দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের সুবাদারীতে বহাল রাখেন; এবং বাংলার পূর্ব বিভাগের শাসন ভার বাহাদুর খাঁর উপর ন্যস্ত করেন। এই নূতন প্রদেশের রাজধানী সোনারগাঁও নগরীতে স্থাপিত হয়। ১৩২৪ খ্রিঃ অব্দে বাহাদুর খাঁ স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিলে সম্রাট গিয়াসুদ্দিন তুঘলক তাহাকে অপসারিত করিয়া তৎস্থানে বহরাম খাঁকে সোনারগাঁওর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান নাসিরুদ্দিন বগরা খাঁর মৃত্যু হইলে সম্রাট মহম্মদ তুঘলক তৎস্থানে কুদ্দর খাঁকে লক্ষণাবতীর সুবাদার নিযুক্ত করেন।

২৪। মুসলমান আমলে বাংলার স্বাধীন ভূপতিগণ

ফখরউদ্দিন : ১৩৩৮ খ্রিঃ অব্দে বহরাম খাঁর মৃত্যু হইলে তাহার অস্ত্রবাহক ফখরউদ্দিন সম্রাটের বিনা অনুমতিতে সোনারগাঁওর শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং সুলতান সেকেন্দর আখ্যা গ্রহণে নিজ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কুদ্দর খাঁর সহকারি আলি মুবারক ১৩৪০ খ্রিঃ অব্দে ফখরউদ্দিনকে যুদ্ধে নিহত করিয়া কিঞ্চিদধিক এক বৎসর রাজত্ব করিবার পর হাজি ইলিয়াস কর্তৃক হত হন।

হাজি ইলিয়াস ও তাহার বংশধরগণ : হাজি ইলিয়াস ক্রমে প্রায় সমস্ত বঙ্গদেশ তাঁহার শাসনাধীনে আনেন ; এবং দিল্লির সম্রাট ফিরোজ তুঘলক তাঁহার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। হাজি ইলিয়াস পাণ্ডুয়া নগরীতে রাজধানী স্থাপিত করেন। তিনি সামসুদ্দিন আখ্যা গ্রহণে ১৩৫৬ খ্রিঃ অঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। তাহার বংশধরগণ ১৪০৯ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

রাজা গণেশ : ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজা গণেশ ইলিয়াস সাহর বংশের শেষ নৃপতি ২য় সামসুদ্দিনকে নিহত করিয়া ১৪০৯ খ্রিঃ অব্দে রাজা হন। এই সময়ে বঙ্গজ কায়স্থ কুলোদ্ভব মহেন্দ্র দেব গৌড়ের প্রধান সামন্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৪১৪ খ্রিঃ অব্দে রাজা গণেশের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র যদু মুসলমান ধর্মাবলম্বী হইয়া জালালুদ্দিন নাম গ্রহণে বঙ্গদেশের অধিপতি হন। তিনি রাজধানী পাণ্ডুয়া হইতে গৌড়ে স্থানান্তরিত করেন। ১৪৩১ খ্রিঃ অব্দে তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আহম্মদ সাহ গৌড়াধীপ হন।

দনুজমর্দন দেব : ১৪১৪ খ্রিঃ অব্দে মহেন্দ্রদেবের পুত্র[২] দনুজমর্দন দেব পাণ্ডুয়া নগরের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি এরূপ প্রতাপশালী ছিলেন যে, অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পাণ্ডুয়া হইতে আরাকান পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগের অধিপতি হন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল পাণ্ডুয়ানগরে আধিপত্য করিতে পারেন নাই ; মুসলমানগণের হস্ত হইতে সমস্ত রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব নহে দেখিয়া তিনি ১৪১৭ খ্রিঃ অব্দে পাণ্ডুয়া ত্যাগ করিয়া সমুদ্র কূলে চন্দ্রদ্বীপে (কচুয়া নগরীতে) রাজধানী স্থাপন করেন এবং তথায় বহুকাল রাজত্ব করেন। তাহার সময়ে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য মধুমতীর পূর্ব হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত এবং ইছামতী নদী হইতে সমুদ্রকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময়ে বর্তমান ফরিদপুরের দক্ষিণাংশ চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের সীমানার মধ্যে ছিল। মহারাজ দনুজমর্দন দেবই চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের এবং চন্দ্রদ্বীপ অথবা বাকলা সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

পুনরায় ইলিয়াস শাহের বংশ ও হাবসী রাজগণ : জালালুদ্দিনের পুত্র আহম্মদ শাহের ১৪৪২ খ্রিঃ অব্দে মৃত্যু হইলে পুনরায় ইলিয়াস শাহের বংশীয় ভূপতিগণ ১৪৮৫ খ্রিঃ অব্দ

পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপর রাজপ্রাসাদের খোজাদিগের অধ্যক্ষ বারীক সুলতান সাহজাদা নামে ৮ মাস রাজত্ব করিবার পর প্রধান সেনাপতি মুলুক আন্দিয়েল হাবসী (আবিসিনীয়াবাসী) কর্তৃক হত হন ; ও মুলুক আন্দিয়েল ফিরোজ সাহ আখ্যা গ্রহণে সিংহাসন আরোহণ করেন। হাবসী রাজগণ ১৪৯৩ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

হোসেন সাহ : তৎপর শেষ হাবসী রাজা মজফর শাহের উজীর হোসেন সাহ ১৪৯৩ খ্রিঃ অব্দে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার সুশাসন গুণে দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হন (১৪৮৫-১৫৩৩) ; তাঁহার শিষ্য প্রসিদ্ধ সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী সুলতান হোসেন শাহের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ইহারা কর্ণাট দেশের ব্রাহ্মণ রাজবংশ সম্ভূত। ইঁহাদের পিতা কুমারদেব ফতেয়াবাদে বাস স্থাপন করেন। ইহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভের অপর নাম অনুপম। তাহার পুত্র প্রসিদ্ধ জীব গোস্বামী। হোসেন সাহ ১৫১৯ খ্রিঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার দুই পুত্র নসরত সাহ ও মামুদ সাহ ১৫৩৮ খ্রিঃ অঃ পর্যন্ত রাজ্য করেন।

শের সাহ : মাহমুদ সাহ বিখ্যাত শের সাহ কর্তৃক বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হন। শের সাহ বঙ্গদেশকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক প্রদেশে একজন শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাহার পুত্র সেলিম সাহ সম্রাট হইয়াই (১৫৪৫) পুনরায় সমগ্র বঙ্গের শাসন কর্তারূপে মহম্মদ খাঁকে প্রেরণ করেন।

মহম্মদ খাঁ : মহম্মদ খাঁ ১৫৫৩ খ্রিঃ অব্দ হইতে স্বাধীন নৃপতি রূপে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। ১৫৫৬ খ্রিঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র বাহাদুর সাহ (১৫৫৫-১৫৬০) ও জালালউদ্দিন (১৫৬০-১৫৬৪) বঙ্গে রাজত্ব করেন। উভয়েরই রাজধানী গৌড়ে ছিল।

সুলেমান কেরানি ও দায়ুদ খাঁ : তৎপর বিহারের শাসনকর্তা সুলেমান কেরানি ১৫৬৪ খ্রিঃ অব্দে বঙ্গের অধিপতি হন। ইনি টাণ্ডানগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন, এবং উড়িষ্যা দেশ জয় করিয়া তথায় একজন প্রতিনিধি শাসক নিযুক্ত করেন। সুলেমান কেরানি ১৫৭২ খ্রিঃ অব্দে স্বীয় রাজধানীতে পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়েজিদ রাজত্ব গ্রহণ করিয়া অল্পদিনের মধ্যে নিহত হইলে, সুলেমানের দ্বিতীয় পুত্র দায়ুদ খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার সহিত দিল্লির বাদসাহ আকবরের বিরোধ হওয়ায় সম্রাট মুনাইম খাঁকে বঙ্গ ও বিহারের শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া রাজা টোডরমলকে তাহার সাহায্যার্থ রাখিয়া দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন। অনেক যুদ্ধের পর সন্ধি হইয়া দায়ুদ খাঁ সম্রাটের অধীনে উড়িষ্যার অধিপতি রহিলেন এবং বঙ্গ ও বিহার প্রদেশ সম্রাটের অধিকার ভুক্ত হইল। মুনাইম খাঁ (১৫৭৫ খ্রিঃ অঃ) টাণ্ডা হইতে গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ঐ বৎসরই গৌড় নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মুনাইম খাঁর মৃত্যুর পর দায়ুদ খাঁ পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া সম্রাটের সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করেন। কিন্তু দায়ুদ সম্রাটের নবনিযুক্ত শাসনকর্তা খাঁ-জাহান হোসেন কুলিখাঁর সহিত আগমহলের (রাজমহলের) যুদ্ধে নিহত হন (১৫৭৬ খ্রিঃ জুলাই)।

২৫। আকবরের অধীন বঙ্গের শাসনকর্তাগণ

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে নিম্নলিখিত সুবাদারগণ বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন :

১। মুনাইম খাঁ — ১৫৭৫ খ্রিঃ অঃ

২। খাঁ জাহান (হোসেন কুলি খাঁ) (১৫৭৬-১৫৭৯ খ্রিঃ অঃ)

৩। মুজাফর খাঁ — (১৫৭৯-১৫৮০ খ্রিঃ অঃ)

৪। রাজা টোডরমল — (১৫৮০-১৫৮২ খ্রিঃ অঃ)
৫। খাঁ আজিম (আজিজ খাঁ) (১৫৮২-১৫৮৪ খ্রিঃ অঃ)
৬। সাহবাজ খাঁ — (১৫৮৪-১৫৮৭ খ্রিঃ অঃ)
৭। উজির খাঁ — (১৫৮৭ খ্রিঃ অঃ)
৮।। রাজা মানসিংহ — (১৫৮৭-১৬০৪ খ্রিঃ অঃ)
৯। আসফ খাঁ — (১৬০৪-১৬০৫ খ্রিঃ অঃ)।

মুজাফর খাঁকে সুবাদার নিয়োগ করিয়া (১৫৭৯ খ্রিঃ অঃ) সম্রাট তাহার কার্যের ভার কমাইবার জন্য রায় পুত্র দাস ও মির আদমকে দেওয়ান বা বাজস্ব সচিব পদে নিয়োগ করেন। এই সময় হইতে বঙ্গদেশের রাজস্ববিভাগের ও দেওয়ানি বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ ভার দেওয়ানের উপর ন্যস্ত হয়।

মুজাফর খাঁ সুবাদারী সময়ে বঙ্গ ও বিহার প্রদেশের মোঘল সর্দারগণ বিদ্রোহী হয়। তখন মোঘল জাতীয় লোকের হস্তে শাসনভার রাখিতে সাহসী না হইয়া সম্রাট আকবর রাজা টোডরমলকে সুবাদার করিয়া পাঠান। রাজা টোডরমলের শাসনকালে মোঘল বিদ্রোহের সুযোগে কতলু খাঁর নেতৃত্বে পাঠানগণ উড়িষ্যা হইতে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের অনেক স্থান অধিকাব করিয়াছিলেন।

মুকুন্দ রায় ঃ এই সময়ে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভূষণা অঞ্চলে বঙ্গজ কায়স্থ দেব বংশীয় মুকুন্দ রায় একজন সাধারণ জমিদার ছিলেন। ফতেয়াবাদের পাঠান শাসনকর্তা মুরাদ খাঁ মোঘলেব বশ্যতা স্বীকার করায় কতলু খাঁ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে দমন করিবার জন্য একদল সেনা প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে মুরাদ খাঁর মৃত্যু হয়। মুকুন্দ রায় জমিদারি বিস্তার সম্পর্কে মুরাদ খাঁ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন, এইজন্য মুরাদ খাঁর পুত্রগণের রক্ষার্থ মুকুন্দ বায় পাঠান সৈন্যের বিরুদ্ধে সমর সজ্জা করিয়াছিলেন। এদিকে মোঘল সৈন্য আসিয়া পড়ায় পাঠানগণ যুদ্ধ না করিয়াই প্রত্যাবর্তন করে। মুকুন্দ রায় পাঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ করায় তাহাকে মোঘলের পক্ষাবলম্বী জানিয়া বাজা টোডরমল তাহাকে সমগ্র ফতেয়াবাদ সরকারের জমিদারি প্রদান করেন। তিনি বিশেষ প্রতাপের সহিত উক্ত সরকার এবং পার্শ্ববর্তী অনেক স্থানের অধিস্বামিত্ব করিয়াছিলেন। বর্তমানকালের প্রায় সম্পূর্ণ ফরিদপুর জেলা ও যশোহর, খুলনা ও বাকরগঞ্জ জেলার কতক অংশ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি বিখ্যাত বার ভুঞার অন্যতম। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র শত্রুজিৎ রায় এবং শিবরাম রায় ঐসব স্থানে আধিপত্য করিয়াছিলেন। শেষে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের পর ১০৫৫ সালে (১৬৪৮ খ্রিঃ অব্দে) বঙ্গের সুবাদার সুলতান সুজার সৈন্যের নিকট শত্রুজিৎ রায় পরাস্ত এবং বন্দি হন। তাহার নামে যশোহর জেলার নবগঙ্গা নদীর তীরে শত্রুজিৎপুর নামক গ্রাম বর্তমান আছে। তাহার ভ্রাতা শিবরাম এবং তাহাদের বংশধরগণ কিছুকাল ভূষণা ও তাহার নিকটবর্তী স্থানে আধিপত্য করিয়াছিলেন এবং ঢালি সেনার নায়ক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। মুকুন্দরায় ভূষণায় বঙ্গজ কায়স্থের একটি সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাকে ফতেয়াবাদ সমাজ বলে। (আনন্দনাথ রায় কৃত "বারভুঞা" ৩৫৮-৩৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য—দে'জ সংস্করণ)।

রাজা মানসিংহ ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে তাণ্ডা হইতে আগমহলে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং উহার নাম রাজমহল রাখেন। দায়ুদ খাঁর সময় হইতে মাঝে মাঝে উড়িষ্যার পাঠানগণ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিত। মুনাইম খাঁ হইতে মানসিংহ পর্যন্ত প্রত্যেক শাসনকর্তাই তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে সেরপুর আতাই-এর সুবিখ্যাত সমরাঙ্গনে রাজা মানসিংহ পাঠানগণকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া দেন। তাহার পর ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে ওসমান

খাঁর নেতৃত্বে তাঁহারা আর একবার মোঘলের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করিয়াছিলেন ; কিন্তু সুবর্ণরেখা তীরে মোঘল সেনাপতি সুজাত খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পুনরায় মোঘলের অধীনতা স্বীকার করেন।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য ঃ সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মহারাজ প্রতাপাদিত্য দক্ষিণ বঙ্গে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার প্রপিতামহ বঙ্গজ কায়স্থ রামচন্দ্র গুহ চন্দ্রদ্বীপ সমাজে বাস করিতেন। তিনি চন্দ্রদ্বীপের রাজা পরমানন্দ বসুর সামাজিক বিধি ব্যবস্থায় ও অনুচিত ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া প্রথমে সপ্তগ্রাম, পরে গৌড়ে গমন করেন। তাহার তিন পুত্র ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ। ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি ও গুণানন্দের পুত্র জানকীবল্লভ। ইহারা সুলেমান কেরানির রাজত্বকালে তাহার পুত্র দায়ুদের প্রিয় সহচর ছিলেন। দায়ুদ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া এই দুইজনকে প্রধান অমাত্য পদে নিযুক্ত করেন, এবং শ্রীহরিকে রাজা বিক্রমাদিত্য ও জানকীবল্লভকে রাজা বসন্ত রায় উপাধি দেন ও সুন্দরবন প্রদেশে চাঁদ খাঁর জায়গির নামে প্রসিদ্ধ বিস্তীর্ণ জনপদ জায়গির দেন। এই জায়গির দক্ষিণবঙ্গে নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ প্রদেশে অবস্থিত, বর্তমান ২৪ পরগণা ও খুলনা জেলার অন্তর্গত। দায়ুদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় তাহাদের জমিদারিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কালীঘাট তাহাদের রাজ্যভুক্ত ছিল এবং নিবিড় অরণ্যে পূর্ণ ছিল। রাজা বসন্ত রায় কালীমাতার প্রথম সেবক ভুবনেশ্বর চক্রবর্তীকে কালীঘাট গ্রাম ব্রহ্মোত্তর দান করেন। পরে ঐ স্থান সাবর্ণ চৌধুরিগণের হস্তগত হইলে তাহারা কালীর বর্তমান মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। ভুবনেশ্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র বংশীয় হালদারগণ কালীমাতার বর্তমান সেবক।

বিক্রমাদিত্যের পুত্র মহারাজ প্রতাপাদিত্য। তাঁহার রাজধানী যশোহর নগর বর্তমান খুলনা জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। এই স্থান এখন শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে আবৃত। প্রতাপাদিত্য স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলে সম্রাটের সৈন্যের সহিত ইহার অনেক যুদ্ধ হয়। পরিশেষে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে রাজা মানসিংহ পুনরায় বঙ্গের সুবাদারী গ্রহণ করিয়া প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া প্রথমত প্রতাপাদিত্যের নিকট পরাস্ত হন (১৬০৫ খ্রিঃ অব্দে) ; পরে ভবানন্দ মজুমদার প্রভৃতি গোপনীয় পথের সন্ধান বলিয়া দেওয়াতে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাস্ত ও বন্দি করিয়া লইয়া যান। পথিমধ্যে বারাণসীধামে তাহার মৃত্যু হয় (১৬০৬ খ্রিঃ অব্দে, ১০১৩ সাল)।[৩]

রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়, রামচন্দ্র রায়, চাঁদ রায় ও কেদার রায় ঃ প্রসিদ্ধ বারভুঞার অন্যতম রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের পুত্র ও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জামাতা রাজা রামচন্দ্র বসু তখন চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের দুর্ব্যবহারের জন্য বিবাহের দিন হইতে শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে ঘোরতর শত্রুতা ছিল। এ কারণে রাজা রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যকে সাহায্য না করিয়া মোঘলের অধীনতা স্বীকার করেন। বিক্রমপুরান্তর্গত শ্রীপুর নগরে বারোভুইয়ার অন্যতম বঙ্গজ কায়স্থ দেববংশীয় চাঁদ রায় ও তৎপুত্র কেদার রায় প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন ইহারা ও ভূষণার মুকুন্দ রায় ও চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজমর্দন দেব একই বংশ সম্ভূত। পরিশেষে রাজা মানসিংহের হস্তে ১৬০৪ খ্রিঃ অব্দে তিনি পরাস্ত ও নিহত হন। তৎপরও তাহাব সেনাপতি রঘুনন্দন রায় কিছুদিন যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। পরে সন্ধি হয় ; কেদার রায়ের পত্নী মোঘলের অধীনে শ্রীপুরের অধিস্বামিনী থাকেন ; তাহার মৃত্যুর পর তাহার অধিকৃত স্থান বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। সেনাপতি রঘুনন্দন রায় ইদিলপুর পরগণা প্রাপ্ত হন। ইনিই ইদিলপুরের চৌধুরি বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

২৬। পরবর্তী মোঘল সম্রাটগণের অধীন বঙ্গের অবস্থা

রাজা মানসিংহের পর নিম্নলিখিত শাসনকর্তাগণ বঙ্গের সুবাদার নিযুক্ত হন :

দিল্লির সম্রাটের নাম	বঙ্গের সুবাদারের নাম	কার্যকাল
জাহাঙ্গীর	রাজা মানসিংহ	১৬০৫-১৬০৬ খ্রিঃ অ
১৬০৫-১৬২৮	কুতুবুদ্দিন খাঁ	১৬০৬-১৬০৭
	জাহাঙ্গীর কুলি	১৬০৭-১৬০৮
	ইসলাম খাঁ	১৬০৮-১৬১৩
	কাসিম খাঁ	১৬১৩-১৬১৮
	ইব্রাহিম খাঁ	১৬১৮-১৬২২
	সাহজাহান	১৬২২-১৬২৫
	খানেজাদ খাঁ	১৬২৫-১৬২৬
	মকরম খাঁ	১৬২৬-১৬২৭
	ফেদাই খাঁ	১৬২৭-১৬২৮
সাহজাহান	কাসিম খাঁ জবাণী	১৬২৮-১৬৩২
১৬২৮-১৬৫৬	আজিম খাঁ	১৬৩২-১৬৩৭
	ইসলাম খাঁ মুসিদি	১৬৩৭-১৬৩৯
আওরঙ্গজেব	সুলতান সুজা	১৬৩৯-১৬৬০
১৬৫৬-১৭০৭	মীর জুমলা	১৬৬০-১৬৬৪
	সায়েস্তা খাঁ	১৬৬৪-১৬৬৭
	আজম খাঁ (ফেদাই খাঁ)	১৬৭৭-২৫ মে, ১৬৭৮
	হাজি সফিখাঁ (দেওয়ান)	১৬৭৮ জুন পর্যন্ত
	সুলতান মহম্মদ আজিম	১৬৭৮-১৬৮০
	সায়েস্তা খাঁ (২য় বার)	১৬৮০-১৬৮৯
	ইব্রাহিম খাঁ	১৬৮৯-১৬৯৭
	সুলতান আমিজ ওসান	১৬৯৭-১৭০৪
বাহাদুর সাহ	মুরসিদ কুলি খাঁ	
১৭০৭-১৭১২	(নায়েব নাজিম)	১৭০৪-১৭১২
জাহান্দার সাহ		
১৭১২-১৭১৩	মুরসিদ কুলি খাঁ	১৭১২-১৭২৫
ফেরোখসিয়ার	(নাজিম ও দেওয়ান)	
১৭১৩-১৭১৯		
মহম্মদ সাহ—	সুজাউদ্দিন খাঁ	১৭২৫-১৭৩৯
১৭১৯-১৭৪৮		
	সরফরাজ খাঁ	১৭৩৯-১৭৪০
আহম্মদ সাহ	আলিবর্দি খাঁ	১৭৪০-১৭৫৬
১৭৪৮-১৭৫৪		
দিল্লির সম্রাটের নাম	**বঙ্গের সুবাদারের নাম**	**কার্যকাল**
আগমগীর ২য়	সিরাজদৌল্লা	১৭৫৬-১৭৫৭
১৭৫৪-১৭৫৯		

সাহ আলম ১৭৫৯-১৮০৬	মীরজাফর	১৭৫৬-১৭৬০
	মীরকাসিম	১৭৬০-১৭৬৩
	মীরজাফর	১৭৬৩-১৭৬৫
	নাজিমুদ্দৌলা	১৭৬৫-১৭৬৬
	সৈয়ফুদ্দৌলা	১৭৬৬-১৭৭০
	মুবারকউদ্দৌলা	১৭৭০-১৭৯৩

ইসলাম খাঁ সুবাদার হইয়াই ১৬০৮ খ্রিঃ অব্দে রাজমহল হইতে ঢাকা নগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার পর মগ ও পর্তুগিজ দস্যুদিগের আক্রমণ হইতে প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ঢাকা শহরে নওয়ারা বিভাগ (নৌ সৈন্য বিভাগ) স্থাপিত হয়। নওয়ারা বিভাগের ব্যয় নির্বাহের জন্য যে সমস্ত ভূমির উপস্বত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহাকে নওয়ারা মহাল বলিত। ঐ বিভাগের কার্য পরিচালনার জন্য নবাব নাজিমের অধীনে একজন উচ্চ কর্মচারি ছিলেন। তদধীন নওয়ারা কানুনগো, খাসনবিস প্রভৃতি কর্মচারী ছিল।

ইব্রাহিম খাঁর সুবাদারীর সময়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র সাহজাহান বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে সুবাদার ইব্রাহিম খাঁকে পরাস্ত করিয়া সুলতান সাহজাহান বাঙ্গলার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন (১৬২২ খ্রিঃ অঃ)।

সুলতান সুজা ঢাকা হইতে পুনরায় রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। মীরজুমলা নবাব হইয়া পুনরায় ঢাকা নগরীতে রাজধানী আনয়ন করেন (১৬৬০)। ফেদাই খাঁ আজম খাঁর সুবাদারীর সময়ে ১৬৬৭ খ্রিঃ অব্দে হাজি সফি খাঁ বঙ্গদেশের দেওয়ান নিযুক্ত হন। হাজি খাঁ ১৬৯০ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত দেওয়ান ছিলেন। তাহার দেওয়ানি আমলে ১৬৮১ খ্রিঃ অব্দে মালখাঁনগরের বসুবংশের মূল পুরুষ দেবীদাস বসু ঠাকুর নওয়ারা মহালের কানুনগো ছিলেন।

আজিমওসানের সুবাদারি সময়ে ১৭০১ খ্রিঃ অব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব মুর্শিদকুলি খাঁকে বঙ্গদেশের দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া পাঠান। সুলতান আজিমওসানের সহিত মুর্শিদকুলি খাঁর ঐক্য না হওয়ায় তিনি তাহার কার্যসংক্রান্ত সমস্ত অফিস মুক্‌সুদাবাদে স্থানান্তরিত করেন (১৭০২ খ্রিঃ অঃ) ; পরে ঐ শহরের নাম মুর্শিদাবাদ রাখেন। ১৭০৪ খ্রিঃ অব্দে সম্রাট তাঁহাকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ান ও বঙ্গ ও উড়িষ্যার নায়েব নাজিম পদ প্রদান করেন। ১৭১৩ খ্রিঃ অব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ বঙ্গদেশের নাজিম ও দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে মাহমুদপুরে রাজা সীতারাম রায় স্বাধীন রাজত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু পরিশেষে ১৭১২-১৩ খ্রিঃ অব্দে তিনি নবাবী সৈন্যের হস্তে পরাস্ত ও বন্দি হন এবং তাহার রাজ্য নাটোরের জমিদার ও অন্যান্য জমিদারগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

১৭৫৭ খ্রিঃ অব্দে পলাশী ক্ষেত্রে ইংরেজগণ নবাব সিরাজদ্দৌলাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন ; ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে তাহারা সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে বঙ্গদেশের দেওয়ানি সনদ প্রাপ্ত হন।

২৭। রাজস্বের বন্দোবস্ত

আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে বঙ্গের সুবাদার রাজা টোডরমল ১৫৮২ খ্রিঃ অব্দে সমস্ত বঙ্গদেশের রাজস্ব নির্ধারণ করেন। তাহার নাম আসল তুমার জমা। তিনি সমগ্র বঙ্গদেশকে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক সরকার কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল। সমগ্র

বঙ্গদেশে তখন মোট ৬৮২ পরগণা ছিল। তখন **সাহাপুর** পরগণার নাম হয় নাই, কিংবা তাহা একটি পরগণা বলিয়া পরিগণিত হয় নাই ; লোকের বাসের পক্ষে এবং যাতায়াতের পক্ষে নানাবিধ অসুবিধা ছিল ; একারণ কোন জমিদার আগ্রহ করিয়া এই স্থান অধিকার করেন নাই ; কিংবা রাজ সরকার হইতে বন্দোবস্ত লন নাই। এই বিল প্রদেশে তখন সরকার মাহমুদাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং ফতেহাবাদ, মামুদাবাদ ও বাকলা এই তিন সরকারের সীমানায় অবস্থিত ছিল।

সাহ সুজার আমলে ১৬৫৮ খ্রিঃ অব্দে উক্ত রাজস্বের বন্দোবস্তের আবশ্যকীয় পরিবর্তন হইয়া পুনরায় জমা বন্দোবস্ত হয়। তাহাতে পরগণার সংখ্যা ৩৬১টি বাড়িয়া যায়। মুর্শিদকুলি খাঁ সুবাদার হইবার পর পুনরায় রাজস্বের বন্দোবস্ত হয়। ১৭২২ খ্রিঃ অব্দে (১১২৮-১১২৯ সালে) বন্দোবস্তের কার্য শেষ হইয়া যে জমাবন্দি কাগজ প্রস্তুত হয় তাহার নাম জমা কামেল তুমারি। ১৯ সরকারের পরিবর্তে তিনি বঙ্গদেশকে ১৩ চাকলায় বিভক্ত করেন। পূর্বের অনেক বড় পরগণা একাধিক পরগণায় বিভক্ত হয়, এবং অনেক নূতন পরগণার সৃষ্টি হয়। এইরূপে তাহার কাগজে ১৬৬০ পরগণার নাম পাওয়া যায়। সরকার মাহমুদাবাদ সম্পূর্ণ ও ফতেহাবাদের অধিকাংশ ও সম্ভবত সরকার বাক্‌লার অল্প কতকাংশ লইয়া ভূষণা চাকলা গঠিত হয়। ফতেহাবাদের অবশিষ্ট অংশ, সোনারগাঁও ও বাক্‌লা প্রভৃতি সরকার চাকলে জাহাঙ্গীর নগর বা ঢাকার অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই সময়ে **সাহাপুর** পরগণা চাকলা ভূষণার মধ্যে পতিত হইয়াছিল। পরে সাহাপুর, মহিমসাহী, নলদি, নসীবসাহী ও বেলগাছী পরগণা ভূষণা চাকাল হইতে খারিজ হইয়া জাহাঙ্গীরনগরের অন্তর্ভুক্ত হয়। (Fifth Report on East India Affairs, edited by W. K. Firminger, Vol II., Page 350, Grant's analysis of the Finances of Bengal).

এই চাকলা বিভাগের পূর্বে সাহাপুর পরগণা সরকার বাকলার অন্তর্গত পরগণা ইদ্রাকপুরের বিচ্ছিন্ন অংশ বলিয়া জমিদারি বন্দোবস্ত হয়।

২৮। ইংরেজ শাসনকাল

১৭৬৫ খ্রিঃ অব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গদেশের দেওয়ানি সনদপ্রাপ্ত হন। মুসলমান আমলে দেওয়ানের উপর রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য ও ফৌজদারি ব্যতীত যাবতীয় মোকদ্দমার বিচার ভার ছিল। দেওয়ানি সনদ প্রাপ্তিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর সেই ভার পড়িল। চারি বৎসর পর্যন্ত ইংরেজগণ শাসন ও বিচার সংক্রান্ত কার্যে বিশেষ হস্তক্ষেপ করেন নাই। ১৭৬৯ খ্রিঃ অব্দে রাজস্ব ও বিচার বিভাগের দেশীয় কর্মচারিগণের কার্যের তত্ত্বাবধানার্থ ইউরোপীয় সুপারভাইজার নিযুক্ত হয়। ২ বৎসর পরে তাহাদের কালেক্টর উপাধি হয়। প্রত্যেক কালেক্টরের সাহায্যার্থে একজন দেশীয় দেওয়ান অথবা আমিল নিযুক্ত হয়। দুই বৎসর পরে কালেক্টরের পদ উঠাইয়া দেওয়া হয় ; শুধু দেওয়ানগণের উপর রাজস্ব ও বিচারের ভার দেওয়া হয়। ১৭৮০ খ্রিঃ অব্দে কলিকাতা, বর্ধমান, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর ও পাটনা এই ছয়টি বিভাগে দেওয়ানি আদালতের সুপারিনটেন্ডেন্ট নামে ৬টি দেওয়ানি কোর্ট স্থাপিত হয়। ১৭৮১ খ্রিঃ অঃ আরও ১২টি প্রধান শহরে ঐরূপ কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক কোর্টে একজন ইউরোপীয় জজ নিযুক্ত হয়। ঐ জজদিগের সমস্ত দেওয়ানি মোকদ্দমা বিচারের অধিকার এবং ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ছিল। ঐ সময়ে বর্তমান বাকরগঞ্জ জেলার নলচিঠি থানার অন্তর্গত বারইকরণ নামক স্থানে ঐরূপ একটি জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট স্থাপিত হয়। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ সমগ্র বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার প্রদেশ ২৩টি জেলায় বিভক্ত হইয়া প্রতি জেলা একজন কালেক্টরের অধীনস্থ হয়। রাজস্ব

সংক্রান্ত সমস্ত কার্যের ভার কালেক্টরের উপর থাকে। কোন কালেক্টরের এলাকার স্থান দুইভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগে এক একজন জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হইলেও সমস্ত স্থানকে একটি জেলাই বলা হইত। ১৭৮৬ খ্রিঃ অব্দে বঙ্গদেশ এইরূপে যে সকল জেলাতে বিভক্ত হইল যশোহর তাহার অন্যতম। ১৭৯৩ খ্রিঃ অব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে চাকলা ভূষণা যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং তদন্তর্গত **সাহাপুর** পরগণায় চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত যশোহর কলেক্টরী হইতে হয়।

১৭৮৬ খ্রিঃ অব্দে বিভিন্ন কালেক্টরের এলাকা অনুসারে জেলা সৃষ্টি হইবার সময়ে বর্তমান ঢাকা, বাকরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার অধিকাংশ স্থান ঢাকা-জালালপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই জেলার কালেক্টরের কার্যালয় ঢাকাতে বারইকরণ নামক স্থানে যে জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট ছিল তাহা ১৭৯২ খ্রিঃ অব্দে বাকরগঞ্জ নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। ১৭৯৭ খ্রিঃ অব্দে বিচার ও শাসন কার্যের সুবিধার্থ ঢাকা-জালালপুর জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং তাহার দক্ষিণ বিভাগের নাম বাকরগঞ্জ জেলা রাখা হয় ; তাহার সদর স্টেশন উক্ত বাকরগঞ্জে থাকে এবং তদনুসারে জেলার নাম হয়। সেই সময়ে ৪/৫টি জেলা লইয়া একটি ডিভিসন গঠিত হইল। প্রত্যেক ডিভিসনে একটি সার্কিট কোর্ট ছিল ; তাহাতে ৩ জন জজ থাকিত। তাহাবা সেই ডিভিসনের অন্তর্গত জেলা সমূহের জজদিগের রায়ের বিরুদ্ধে দেওয়ানি আপলের বিচার করিত, এবং তাহারাই ঘুরিয়া ঘুরিয়া পৃথক পৃথক জেলায় যাইয়া ফৌজদারি সেসন জজের কার্য করিত। ১৭৯৭ খ্রিঃ অব্দে বাকরগঞ্জে স্বতন্ত্র জেলা হওয়া অবধি **সাহাপুর** পরগণা উক্ত জেলার অন্তর্ভুক্ত হয় ; এবং নলচিঠি থানার মধ্যে থাকে। বাকরগঞ্জ হইতে জেলার সদর স্টেশন ১৮০১ খ্রিঃ অব্দে বরিশাল শহরে স্থানান্তরিত হয়। বাকরগঞ্জ এইভাবে পৃথক জেলা হইলেও প্রথমত সেখানে কোন স্বতন্ত্র কালেক্টর ছিল না ; উহা ঢাকার কালেক্টরের অধীন ছিল। ১৮১৪ খ্রিঃ অব্দে বাকরগঞ্জে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর এবং ১৮১৭ খ্রিঃ অব্দে পৃথক কালেক্টর নিযুক্ত হয়। তখন হইতে দেওয়ানি, ফৌজদারি ও রেভিনিউ সর্ববিধ বিষয়ে বাকরগঞ্জ একটি স্বতন্ত্র জেলাতে পরিণত হয়। সুতরাং ১৮১৭ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত **সাহাপুর** পরগণার দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার বাকরগঞ্জে হইলেও রাজস্ব সম্বন্ধে উহা ঢাকার কালেক্টরের অধীন ছিল ; এবং তখন পর্যন্ত ঢাকা-জালালপুর জেলাব অধীন বলিয়া পরিচিত ছিল।

১৮১২ খ্রিঃ অব্দে কোটালিপাড়ায় থানা প্রতিষ্ঠিত হইলে সাহাপুর পরগণা ঐ থানার অধীন হয়। সেই সময়ে গোপালগঞ্জ ও তাহার পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণের অনেক গ্রাম মধুমতী নদীর পশ্চিম তীরে ছিল এবং যশোহর জেলার মধ্যে ছিল।

১৮১১ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুরে কাছারিগৃহ প্রভৃতি নির্মিত হয়। তখন পর্যন্ত ঐ জেলাকে ঢাকা-জালালপুর বলিত ; এবং তাহার সদর স্টেশন ঢাকা নগরীতে ছিল। ১৮৩৫ হইতে ১৮৩৮ খ্রিঃ অব্দের মধ্যে ঐ জেলার নাম ফরিদপুর হয়। এই সময়ে মধুমতীর তীরস্থিত গোপীনাথপুর ও তৎসন্নিকটবর্তী চন্দ্রদিঘলিয়া প্রভৃতি স্থান ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং গোপীনাথপুরে একটি থানা স্থাপিত হয়।

১৮৫৪ খ্রিঃ অব্দে বাকরগঞ্জ জেলার গৌরনদী, কোটালিপাড়া, বুড়িরহাট এবং ফরিদপুর জেলার শিবচর থানা লইয়া মাদারিপুর সাবডিবিসন গঠিত হয়। (Calcutta Gazette dated 12-6-54 Part I P. 572) তখন সাহাপুর পরগণা ঐ মহকুমার অধীন হয়। তৎপূর্ব পর্যন্ত বাকরগঞ্জ জেলার সদর ভিন্ন অন্য কোন মহকুমা ছিল না।

তখন গোপালগঞ্জ যশোহর জেলার মধ্যেই ছিল। এখানে কোন থানাও ছিল না।

আঠারবাঁকি ও মধুমতীর সংযোগ স্থলের কাছে চাপোল নামক স্থানে একটি ফাঁড়ি ছিল। তাহা ও লোহাগড়া থানা লইয়া ১৮৫৭ খ্রিঃ অব্দে গোপালগঞ্জে একটি সাবডিবিসন স্থাপিত হয়।

(Calcutta Gazette dated 8-12-1857 Part I. p. 2030-31.

"The Lieutenant Governor has sanctioned the formation of a subdivision in the eastern part of the district of Jessore composed of thana Lohagara and the pharee of Chapoul with its head quarter at Gopalgunj.")

পরবর্তী বৎসর ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোপীনাথপুর ফাঁড়ি গোপালগঞ্জ সাবডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর বৎসরই ঐ সাবডিবিসন গোপালগঞ্জ হইতে মহেশখোলায় স্থানান্তবিত হয় এবং গোপীনাথপুর ফাঁড়ি পুনরায় ফরিদপুরের সদর সাবডিভিসনের অধীন হয়।

এ পর্যন্ত ফরিদপুরে একজন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর থাকিতেন। ১৮৫৯ খ্রিঃ অব্দ হইতে ফরিদপুরে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের অধিষ্ঠান হইল।

এই সময়ে ফরিদপুর, যশোহর ও বাকরগঞ্জ জেলার রেভিনিউ সার্ভে জরিপ হইতেছিল। যশোহরের জরিপ ১৮৫৫ খ্রিঃ অব্দে আরম্ভ হইয়া ১৮৫৮ খ্রিঃ অঃ শেষ হয় ; ফরিদপুরের জরিপ ১৮৫৭ খ্রিঃ অব্দে আরম্ভ হইয়া ১৮৬০ খ্রিঃ অব্দে শেষ হয়। তৎপর বাকরগঞ্জে জরিপ আরম্ভ হইয়া ১৮৬৩ খ্রিঃ অব্দে শেষ হয়। এই জরিপ কালে দেখা গেল যে অনেক স্থান পূর্বে মধুমতীর এক তীরে ছিল তাহা নদীর গতি পরিবর্তনে অন্য তীরে আসিয়াছে। এজন্য জেলা সমূহের সীমানা পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়।

১৮৬১ খ্রিঃ অব্দের ১১ ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের ৩৭৪০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন অনুসারে তৎকালীন মধুমতী নদীর পূর্বতীরস্থিত গোপালগঞ্জের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণে যে সমস্ত গ্রাম যশোহর জেলার মধ্যে ছিল (যথা : কাঠি, ভোজেরগাতি, কন্দর্পগাতি, বাঘাজুড়ি, কাঁড়ারগাতি, খানারপার, কালা গোপীনাথপুর, কুড়ানটোলা, গোপালপুর, খেলনা, ডালিনা, রায়পাশা কাটরবাড়ি, ভূতরিয়া, খাগবাড়ি, মানিকহার, দুর্গাপুর, গরইগাতি, আড়পাড়া, বাদেখাগাইল, বাজুনিয়া, বারইহাটি, মাঝিগাতি, রঘুনাথপুর, শ্রীরামকান্দি, গোপেরডাঙ্গা প্রভৃতি) তাহা বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে মধুমতী নদীকে যশোহর জেলার পূর্ব সীমানা স্থির করিয়া দেওয়াতে গোপালগঞ্জ বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই সময়ে বেভিনিউ সার্ভে শেষ হয়। রেভিনিউ সার্ভেয়ারগণ ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ জেলাব একটি নূতন সীমানার লাইন ঠিক করিয়া দেন। তাহা গবর্নমেন্ট কর্তৃক গৃহীত হইয়া ১৮৭০ খ্রিঃ অব্দে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। তাহার ফলে বর্তমান গোপালগঞ্জ থানার যে সমস্ত গ্রাম বাকরগঞ্জ জেলার মধ্যে ছিল তাহা ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত হইল। **সাহাপুর** পরগণাও ফরিদপুরের মধ্যে আসিল। কিন্তু গোপালগঞ্জে তখনও থানা স্থাপিত হয় নাই। এই স্থান সমূহ গোপীনাথপুর থানার অন্তর্ভুক্ত হইল।[৪]

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে গোপীনাথপুর থানা গোপালগঞ্জে উঠাইয়া আনা হয়। এই সময়ে ফরিদপুর জেলা ২টি সাব-ডিভিসনে বিভক্ত হয়, একটি সদরে ও অপরটি গোয়ালন্দে। সাহাপুর পরগণা (গোপালগঞ্জ থানার সহিত) ফরিদপুর সদর সাব ডিভিসনের অধীন থাকে।

১৮৭৩ খ্রিঃ অব্দের নভেম্বর মাসে বাকরগঞ্জ জেলার মাদারিপুর সাবডিভিসনের গৌরনদী থানা বাদে অবশিষ্ট অংশ ফরিদপুর জেলা ভুক্ত করা হয়। এ পর্যন্ত ফরিদপুর জেলার কোন জজ ছিল না। ঢাকার জজই ফরিদপুরে জেলার জজের কার্য করিত। ১৮৭৪ খ্রিঃ অব্দে গবর্নমেন্ট হইতে ঢাকার এডিসনাল জজ ফরিদপুরে আসিয়া কোর্ট করিবার আদেশ হয়। তৎপর বৎসর (১৮৭৫ খ্রিঃ অঃ) ফরিদপুর স্বতন্ত্র জজ হয়। ঐ বৎসর (১১ আগস্ট ১৮৭৫

খ্রিঃ অঃ) গোপালগঞ্জ থানা মাদারিপুর সাব-ডিবিসন ও মুন্সেফির অধীন হয়। কয়েক বৎসর পরে গোপালগঞ্জে প্রথমত রেগুলার (Regular), পরে ১৮৯৬ খ্রিঃ অব্দে ইন্ডিপেন্ডেন্ট (independent) বেঞ্চ নামে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের বেঞ্চ কোর্ট স্থাপিত হয়। এইভাবে অনেক বৎসর চলিবার পর ১৯০৯ খ্রিঃ অব্দের (১৩১৬ সালে) ১ নভেম্বর তারিখে গোপালগঞ্জ, কোটালিপাড়া, মুকসুদপুর ও কাশিয়ানী থানা লইয়া গোপালগঞ্জে ফৌজদারি কোর্ট ও মহকুমা হয়, কিন্তু মুকসুদপুর ও কাশিয়ানী থানার মুন্সেফ কোর্ট ভাঙাতে এবং কোটালিপাড়া ও গোপালগঞ্জ থানার মুন্সেফি মাদারিপুরেই থাকে। ১৯০৫ খ্রিঃ অব্দে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ সৃষ্টি হইলে ঢাকাতে রাজধানী ও স্বতন্ত্র রেভিনিউ বোর্ড স্থাপিত হয়। ঐ সময় হইতে ১৯১২ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত এই স্থান ঐ প্রদেশের মধ্যে ছিল।

১৯২৬ খ্রিঃ অব্দে গোপালগঞ্জে মুন্সেফি স্থাপিত হয়। তখন হইতে সাহাপুর পরগণার দেওয়ানি মোকদ্দমা গোপালগঞ্জ মুন্সেফ কোর্টে হইতেছে। এই পরগণার অধিবাসীগণ বিভিন্ন সময়ে এইরূপ বিভিন্ন থানা, মহকুমা, মুন্সেফি, জেলা ও রেভিনিউ বোর্ডের অধীনে বাস করিয়াছে। পূর্বকালে যাতায়াতের যেরূপ অসুবিধা ছিল তাহাতে দূরবর্তী স্থানে মহকুমা ও মুন্সেফ কোর্ট জজকোর্ট থাকাতে তাহাদের বহু কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে।

এই বিল অঞ্চল দুর্গম ছিল ; একারণ উচ্চতর রাজকর্মচারিগণ প্রায়ই এই স্থানে পদার্পণ করিতেন না। সুতরাং গবর্নমেণ্টের পুরাতন কাগজপত্রে এই সব স্থানের উল্লেখ অতিশয় বিরল।

১৮৬৮ খ্রিঃ অব্দে গবর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত "Principal Heads of the History and Statistics of Dacca Division" নামক পুস্তকের বাকরগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ. সি. সদারল্যান্ড সাহেবের প্রদত্ত "Report on the History and Statistics of the district of Backerganj" অংশে উল্লেখ আছে যে তৎকালে উলপুর গ্রামে একটি গবর্নমেণ্ট সাহায্যকৃত ইংরেজি ও বাংলা স্কুল ছিল ; তাহাতে ৭৭ জন ছাত্র ছিল (১৬৩ পৃঃ)।

ঐ পুস্তকের ১৯১ পৃষ্ঠায় এই অঞ্চলের নিম্নলিখিত হিতকর কার্যের উল্লেখ আছে :

যিনি হিতকর কার্য করিয়াছেন	কার্যের বিবরণ	যে স্থানে ঐ কার্য করা হইয়াছে	
সুজারদ্দিন	১টি পুষ্করিণী	হাটবাড়িয়া,	থানা কোটালিপাড়া
জন্মজয় সমাদ্দার	"	খাগাইল	ঐ
চণ্ডীচরণ কর	"	কাজুলিয়া	ঐ

বাংলা সনের একাদশ শতাব্দীতে তপ্পে সাহাপুর পরগণার জমিদারি সৃষ্টি হয়। উলপুরের বসু বংশীয় রায়চৌধুরিগণের পূর্ব পুরুষ **রঘুনন্দন বসু** ঠাকুর ঐ জমিদারি অর্জন করেন। অতঃপর তাহার বংশের সামাজিক ও পারিবারিক ইতিবৃত্ত লিখিত হইবে।

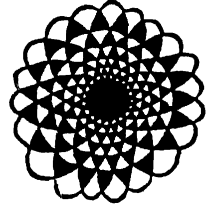
১. কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারতের মহাপ্রস্থানিক পর্বের ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২. কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মহেন্দ্র দেব দনুজমর্দন দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

৩ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতন সম্বন্ধে প্রচলিত মত লিখিত হইল। প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মত এই যে রাজা মানসিংহ প্রতাপকে পরাজিত বা বন্দি করেন নাই। ইসলাম খাঁর সুবাদারী আমলে ১৬১২ খ্রিঃ অব্দে (১০১৮-১০১৯ সালে, ইসলাম খাঁর সেনাপতি ইনায়েৎ খাঁ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দি করিয়া ঢাকায় লইয়া যান। বঙ্গশ্রী (মাসিক পত্রিকা) কার্তিক ১৩৪১ সাল ৫২৬-৫২৭ পৃঃ ও ভারতবর্ষ ১৩৩৯ সাল ফাল্গুন সংখ্যা ২০শ বর্ষ ও ২য় খণ্ড ৩৫৩-৩৬৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ঐতিহাসিক সত্য নলিনী বাবুর মতের অনুকূল।

8 Calcutta Gazette, dated 24-8-1870 p 1581 notification dated 9-8-1870

"The Boundary between districts Furreedpore and Backerganj as laid down in the Revenue Survey passes along the Koomer in the north-westerly direction as far as the village Patabooka, thence along the southern limits of the village Nugurdee and Prasannaderchut — Doibokirchur, Singardewk, whence it runs along villages Henrchur, Gungarampur, Dhunkor, Beel Chanda, Satpar, Dourasir, Kajulia, Bajunia, Betangi, Barnihati, Gopalpoor, Chaprail, again Gopalpoor and Tungipara, then along Bugeanaddee till it meets the Salduha river, then along Salduha river southward to its junction with the Balasore" *A Eden, Secretary to the Govt*



তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক ইতিহাস

২৯। সৃষ্টি-প্রকরণ

জগতের সকল ধর্মের শাস্ত্রাদিতেই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে। ভারতীয় আর্যগণেব সমস্ত পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ ও সংহিতা প্রভৃতিতে সৃষ্টি বর্ণন আছে। সকল গ্রন্থে একরূপ বর্ণনা নাই। মোটের উপর মিল আছে। তাহার সারমর্ম এই ঃ

প্রলয়কালে জগৎ প্রকৃতিতে লীন ছিল ; প্রত্যক্ষ, অনুমান কিংবা শব্দ কোন উপায়ে তাহা উপলব্ধিব বিষয় ছিল না। তখন স্বয়ম্ভু ভগবান্ স্বেচ্ছায় দেহধারী হইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ তন্মাত্র হইতে স্থূল তন্মাত্র প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন। প্রথমত আকাশ, তৎপর বায়ু, তৎপর তেজঃ বা অগ্নি ও তৎপর জল সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ তাহাতে আপন শক্তিরূপ বীজ নিক্ষেপ করিলেন, —তাহা হইতে সুবর্ণবর্ণ সহস্র সূর্য-সদৃশ প্রভাযুক্ত একটি অণ্ড হইল ; তাহা হইতে সর্বলোক পিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা জন্মিলেন। ব্রহ্মার জন্মগ্রহণকালীন ঐ হৈম অণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হইল। তাহার উর্ধ্ব খণ্ডে স্বর্গ ও অপর খণ্ডে পৃথিবী ও মধ্যভাগে আকাশ হইল। তাহার তপস্যার ফলে দশটি মানসপুত্র হইল, যথা : মরীচি, অত্রি, অঙ্গিবা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ। নারদ ব্যতীত অপর সকলেই প্রজা সৃষ্টি করেন। তাহাদিগকে প্রজাপতি বলে। তাহারাই হিন্দু শাস্ত্র মতে সমস্ত মানবের আদি পুরুষ।

৩০। গোত্র ও প্রবর

আর্য জাতির প্রথম অবস্থায় বর্ণ, জাতি বা বংশ ভেদ ছিল না, সকলেই ব্রহ্মার সন্তান বলিয়া ব্রাহ্ম নামে অভিহিত ছিল। তখন কোন ব্যক্তিব জাতিগত বা বংশগত উপাধি অর্থাৎ শর্মা, বর্মা, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র উপাধি ছিল না। তখন পরিচয় দিতে গেলে পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে মূল একজনের নাম বলিতে হইত। সেই মূল পুরুষের নামকে তদ্বংশীয়গণের গোত্র বলে। যখন এক গোত্রেব লোক বহু শাখায় বিভক্ত হইল, তখন গোত্র নামের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ শাখার মূল পুরুষগণের এবং তাহার উর্ধ্বতন ও অধস্তন মূল পুরুষের নামও প্রকাশ করিতে হইত। তাহাদের নামকে প্রবর বলে। ("প্রবরস্তু গোত্র প্রবর্তকস্য মুনের্ব্যাবর্তকো মুনিগণ" ইতি মাধবাচার্য)। কোন ব্যক্তির পরিচয়ে পাঁচটির অধিক প্রবর দেখা যায় না। পরে সমাজ বৃদ্ধির সঙ্গে মানবগণ বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত হইল। কর্মানুসারে তখন প্রথমত চারিবর্ণে বিভাগ হয়। মহাভারতের শান্তি পর্বের ১৮৮তম অধ্যায়ে লিখিত আছে ঃ

"ভৃগু কহিলেন, ইহলোকে বস্তুত বর্ণ সমূহেব কোন ইতব বিশেষ নাই। সমুদয় জগৎই ব্রাহ্ম। মনুষ্যগণ পূর্বে ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া ক্রমে কর্ম দ্বারা বিভিন্ন বর্ণপ্রাপ্ত হইয়াছে।"

অনেকের ধারণা এই যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণেব নিজস্ব কোন গোত্র বা প্রবর নাই। তাহাদের গুরু বা পুরোহিতের গোত্র প্রবরই তাহাদের গোত্র প্রবর। এই ধারণা শাস্ত্র সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বর্ণ বিভাগের পর হইতে কোন শাখার নূতন গোত্র বা প্রবরের নাম হয় নাই ; তাহা হইলে কেবল ক্ষত্রিয় বা কেবল বৈশ্য বর্ণের গোত্রকারীর নাম প্রচলিত হইতে পারিত। তাহা না হওয়াতে শুধু পূর্বপ্রচলিত গোত্র ও প্রবরের নামই চলিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণগণও ঐ সব গোত্রপ্রবর্তকের বংশোদ্ভূত ; বর্ণ বিভাগকালে ব্রাহ্মণই প্রথম স্থানাধিকারী

ছিলেন, সুতরাং পরবর্তীকালে লোকের এই ধারণা হইয়াছে যে পূর্ব প্রচলিত গোত্র ও প্রবরের নাম কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব পুরুষগণেরই নাম ; অন্য বর্ণের পুরুষের নাম নহে। বাস্তবিক পক্ষে সেই সমস্ত ঋষিগণ ক্ষত্রিয়াদিবর্ণেরও পূর্ব পুরুষ ছিলেন। প্রচলিত গোত্র প্রবরাদির মধ্যে অনেক ক্ষত্রিয়ধর্মীর নামও আছে।[১]

যে কয়েকজন প্রজাপতির নাম পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে পুলহ রাক্ষসগণের এবং পুলস্ত্য পিশাচগণের পূর্ব পুরুষ। ক্রতু ষাট হাজার বালখিল্ল মুনিগণের পিতা, প্রচেতার বংশাবলীর বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশিষ্ট ৫ প্রজাপতি এবং অগস্ত্য ও বিশ্বামিত্র হইতে সমস্ত গোত্র ও প্রবর হইয়াছে। ইহারা ভারতীয় সমস্ত আর্যজাতির পূর্বপুরুষ।

বর্ণভেদ প্রবর্তিত হইলে যাহারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহারাও পূর্বোক্ত সাতজন মূল পুরুষের বংশধর। অত্রির নিজ নামে ও তদ্বংশীয় গবিষ্ঠির নামে গোত্র আছে। বশিষ্ঠের নিজ নামে ও তদ্বংশীয় উপমন্যু, পরাশর ও কুণ্ডিন নামে গোত্র আছে। অগস্ত্যের বংশীয় অগস্তির নামে গোত্র আছে। ভৃগুর নিজ নামে গোত্র নাই। কিন্তু তাহার বংশধরগণের মধ্যে জমদগ্নি, বৎস, সালঙ্কায়ণ, জৈমিনি, শুনক প্রভৃতির নামে গোত্র আছে।

অঙ্গিরার নিজ নামে গোত্র নাই ; তাহার বংশধরগণের মধ্যে ভরদ্বাজ, গৌতম, উতথ্য, বামদেব, অগ্নিবেশ্য, হারীত, গর্গ ও সঙ্কৃতি প্রভৃতির নামে গোত্র আছে।

মরীচির নিজ নামে গোত্র নাই ; তাহার পুত্র কশ্যপের নামে এবং তদ্বংশীয় নিধ্রুব, রেভ ও শাণ্ডিল্যেব নামে গোত্র আছে।

বিশ্বামিত্রের নিজ নামে ও তাহার বংশধর ও পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে কুশিক, ঘৃতকৌশিক, চিকিত, গালব, অঘমর্ষণ, রেণু, বেণ, ধনঞ্জয় প্রভৃতির নামে গোত্র আছে।

ইহার মধ্যে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় নৃপতি ছিলেন। তাহার পূর্ব পুরুষ কুশিকও ক্ষত্রিয় ছিলেন। সুতরাং বিশ্বামিত্র শাখায় সমস্ত গোত্রকে খাঁটি ক্ষত্রিয় গোত্র বলা চলে। গৌতম চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় শাক্য বংশীয় রাজগণ গৌতমের বংশধর বলিয়া বিখ্যাত। গৌতমের বংশে আরও অনেক ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আঙ্গিরস বংশীয় গর্গ একজন গোত্রপ্রবর্তক। গর্গের ভ্রাতা মহাবীর্য, তৎপুত্র উরুক্ষয় —তাহার তিন পুত্র ত্রয্যারুণ, পুষ্করী ও কপি, ইঁহারা তিনজনেই ক্ষত্রিয়। এতদ্ভিন্ন বীতহব্য, মিত্রয়ু, শুনক, বেণ, বথিতর, মুদগল, বিষ্ণুবৃদ্ধ, হারীত, কণ্ব এবং সঙ্কৃতির নামীয় গোত্রও ক্ষত্রিয় গোত্র। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের শাস্ত্রে বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, প্রাচীন শাস্ত্রমতে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য মিত্র ও বরুণের পুত্র। তাহারা ক্ষত্রিয় প্রজাপতি। বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী ক্ষত্রিয় কর্দম রাজার কন্যা। সুতরাং বশিষ্ঠ শাখার গোত্র সমূহকেও ক্ষত্রিয় গোত্র বলা যাইতে পারে।

হরিবংশে (হরিবংশ পর্ব ৩২ অধ্যায়) লিখিত আছে যে রাজা দুষ্মন্তের পুত্র ভরতের পুত্রগণ মাতৃক্রোধে বিনষ্ট হইলে অঙ্গিরানন্দন বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ যজ্ঞদেবতা মরুদ্‌গণ কর্তৃক ভরতের পুত্ররূপে সংক্রামিত হন। ভরদ্বাজের পুত্র বিতথ, বিতথের ৫ পুত্র, সুহোত্র, সুহোতা, গয়, গর্গ ও কপিল। সুহোত্রের দুই পুত্র কাশিক ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শুনকের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র পুত্র ছিল। ভরদ্বাজের ভরতপুত্ররূপে সংক্রমণের কথা বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও বায়ু পুরাণেও আছে। সুতরাং ভরদ্বাজ গোত্রীয় এবং ভরদ্বাজ শাখার অন্যান্য গোত্রীয় (যথা আগ্নিবেশ্য, কণ্ব, শৌঙ্গ, শৈশিরী প্রভৃতি) সকলেই মূলে ক্ষত্রিয় ; কেহ কেহ ব্রাহ্মণের ধর্ম ও আচার গ্রহণ কবিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছে।

মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৯৭-২০০ শ্লোকে উক্ত আছে সুকালিনগণ বশিষ্ঠের সন্তান ; তাহারাই শূদ্রগণের পিতৃপুরুষ। অথচ সৌকালীন গোত্রীয় বহু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদিও

আছে। ইহার দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে মূলে একই ব্যক্তির বংশধরেরা বিভিন্ন ধর্ম ও কর্ম গ্রহণ করাতে বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের মূল পুরুষ, এবং গোত্র ও প্রবর অভিন্ন।

এইরূপ দৃষ্টান্ত পুরাণাদিতে অনেক আছে। একই গোত্রপ্রবর্তক ঋষির বংশধরগণ কর্মবিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছে ; এরূপ ক্ষেত্রে মূল গোত্র শুধু গোত্র প্রবর্তকের বংশধর ব্রাহ্মণগণের নিজস্ব, তাহার বংশীয় অপরবর্ণীয় ব্যক্তিগণের গোত্র ও প্রবর ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত, এইরূপ মতবাদ শাস্ত্রসম্মত বলা যায় না।

৩১। কায়স্থ জাতি

কায়স্থগণ পূর্বোক্ত চারিবর্ণের কোন্ বর্ণের অন্তর্গত তাহা লইয়া গত ৩০/৪০ বৎসর যাবৎ অনেক তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছে এবং বহু গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহারা যে ক্ষত্রিয়বর্ণের শাখা তাহা সুপ্রমাণিত হইয়াছে। এই পুস্তকে সে বিষয়ের আলোচনার স্থানাভাব। যাহারা এই বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হইতে চাহেন তাহারা কালীপ্রসন্ন সরকার, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্মা ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণের প্রণীত পুস্তকাবলী এবং কায়স্থসভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা ও পুস্তকাদি পাঠ করিবেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বিখ্যাত হলায়ুধ ধর্মাধিকারী ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতি মন্ত্রী ছিলেন। হলায়ুধ বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদির সার সংগ্রহপূর্বক মৎস্যসূক্ত রচনা করেন ; এবং ব্রাহ্মণসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব, পুরাণসর্বস্ব ও পণ্ডিতসর্বস্ব নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন। শূলপাণি ভট্টাচার্যও এই সময়ের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তিনি দীপকলিকা নামে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার টীকা রচনা করেন। এই সময়ে এ দেশে হিন্দুর রাজত্ব। হিন্দু রাজত্বে ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য। সেই সময়ে শূলপাণি ভট্টাচার্যের দীপকলিকায় এবং হলায়ুধের পুরাণ সর্বস্বে কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত ধরা হইয়াছে। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা অধিক প্রমাণ অনাবশ্যক।

হিন্দু অধিকারে প্রায় সমস্ত বঙ্গদেশ ও গৌড়মণ্ডল দীর্ঘকাল ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন কায়স্থ রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। আকবরের সভাসদ্ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীর মতে মুসলমান অধিকারের পূর্বে আঠারো শত বৎসরের ঊর্ধ্বকাল কায়স্থগণ বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন, এবং আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের ভূস্বামীগণ প্রায়ই কায়স্থ ছিলেন।

৩২। আদিশূর

কিংবদন্তী এই যে বঙ্গের নৃপতি আদিশূর যজ্ঞার্থ কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আনয়ন করেন। পঞ্চজন কায়স্থের নাম : দশরথ বসু (চেদি বংশোদ্ভব), মকরন্দ ঘোষ— (সূর্যধ্বজবংশীয়), বিরাট গুহ (অগ্নিকুলোদ্ভব), কালিদাস মিত্র (চন্দ্র বংশোদ্ভব) ও পুরুষোত্তম দত্ত (সকসেন বংশোদ্ভব)। ইহাদের আগমনের কাল ৭৩২ কিংবা ৭৪৬ খ্রিঃ অব্দ বলিয়া উল্লিখিত হয়। ভিনসেন্ট স্মিথ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ আদিশূর নামক রাজার অস্তিত্বেই সন্দিহান।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও অন্যান্য আধুনিক সামাজিক ইতিহাস লেখকগণের মত এই যে আদিশূরের সময়ে ঐ পঞ্চ কায়স্থের বঙ্গ আগমনের কথা ঠিক নহে ; পঞ্চজন কায়স্থ ৮৮২ খ্রিস্টাব্দে আদিত্যশূর নামক রাজা কর্তৃক কোলাঞ্চ দেশ হইতে এদেশে আনীত হন। অন্য মতে ১০৭২ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ বিজয় সেনের রাজত্বকালে পঞ্চ কায়স্থ বঙ্গে আগমন করেন। যাহা হউক উক্ত পঞ্চ কায়স্থের অন্য দেশ হইতে এদেশে আগমন সম্বন্ধে কোন তর্ক নাই। তাহারা রাজকর্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন, এবং তাহাদের উপজীবিকার জন্য গ্রামাদি প্রদত্ত হইয়াছিল।

পূর্বোক্ত দশরথ বসুর অধস্তন বিংশ পুরুষে **রঘুনন্দন বসু** জন্মগ্রহণ করেন। তিনি **সাহাপুরের** জমিদারি অর্জন করেন।

৩৩। বল্লালসেন ও তাহার কুলবিধি

বঙ্গে পালরাজগণের পর সেনরাজগণ রাজত্ব করেন। তাহাদের নাম ঃ হেমন্ত সেন (১০৪৫—১০৭৯ খ্রিঃ অঃ), তৎপুত্র বিজয় সেন (১০৭৯—১১১৯ খ্রিঃ অঃ), তৎপুত্র বল্লাল সেন (১১১৯—১১৬৯ খ্রিঃ অঃ), তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন (১১৬৯—১২০৬ খ্রিঃ অঃ)। তৎপরবর্তী রাজগণের নাম পূর্ব অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

মহারাজ বল্লাল সেন দেখিলেন বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে অনাচার প্রবেশ করিয়াছে ; উচ্চ নিচ ভেদ উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে ; এবং ধর্মানুমোদিত কার্যাদিতে ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ শিথিলপ্রযত্ন হইয়াছে। তিনি সমাজকে এই উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া প্রত্যেক সম্প্রদায় ও বংশের যথোচিত কুলমর্যাদা নির্দেশের জন্য কুলবিধি সমূহ প্রচলিত করেন। তাহার রাজত্বের প্রথম দশ এগারো বৎসরের মধ্যে (সম্ভবত ১১২৫ খ্রিঃ অব্দে) ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির এই কুলবন্ধন হয়।

বল্লাল সেন কৃত বঙ্গজ কায়স্থ কুলবন্ধনের দ্বারা কুলীনগণের পর্যায় স্থির হয়। তাহাদের মূল পুরুষ অর্থাৎ দশরথ বসু, বিরাট গুহ, মকরন্দ ঘোষ ও কালিদাস মিত্র হইতে পর্যায় গণনা হয়। বঙ্গজ কুলীনগণের কন্যাগত কুল হয়। সমপর্যায় ব্যতীত বিবাহাদির কার্য করিলে কুলচ্যুতি হয়। সমাজভ্রষ্টস্থানে বাস করিলে কৌলিন্য নষ্ট হয়। কুলীনে সৎপাত্র না পাইলে মধ্যকুলের নিকট কন্যাদানেও কুলরক্ষা হওয়ার বিধান হয়।

বল্লালকৃত কুলবন্ধনের সময়ে মূল পঞ্চ কায়স্থের উত্তর পুরুষগণ বাসস্থান ভেদে বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। ঐ কুলবন্ধনের সময়ে বঙ্গজ কায়স্থগণের মধ্যে দশরথ বসুর পৌত্র পূষণ ও লক্ষ্মণ বসু, বিরাট গুহের পৌত্র দশরথ গুহ, মকরন্দ ঘোষের পৌত্র চতুর্ভুজ ঘোষ ও কালিদাস মিত্রের পৌত্র তারাপতি মিত্র কৌলীন্য মর্যাদা প্রাপ্ত হন। কালক্রমে বঙ্গজ মিত্র বংশ পোষ্য পুত্রে পরিণত হওয়াতে কুলচ্যুত হয়।

দশরথ বসুর পূর্ব পুরুষগণের নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

অনন্তানন্দ, তৎপুত্র বিজয়ী, তৎপুত্র মহার্ণব, তৎপুত্র গুণাকব, তৎপুত্র জয়ধন, তৎপুত্র যশোধন, তৎপুত্র গৌতম, তৎপুত্র বীরনাথ অথবা রাবণ, তৎপুত্র দশরথ।[৩]

৩৪। কুলীন কায়স্থগণের বংশাবলী

বঙ্গজ কুলীন কায়স্থগণের বংশ বৃদ্ধি হইয়া বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছে এবং তাহারা বহু স্থানে বাস করিতেছে। নিম্নে পঞ্চকায়স্থের বংশ, গোত্র এবং প্রবরের নাম, এবং মূল পুরুষ হইতে পঞ্চদশ পুরুষ পর্যন্ত কুলীন কায়স্থগণের বংশবল্লী প্রদত্ত হইল।

বংশ	**গোত্র**	**প্রবর**				
বসু	গৌতম	গৌতম,	অঙ্গার,	আঙ্গিরস,	বার্হস্পত্য,	নৈধ্রুব।
গুহ	কাশ্যপ	অঙ্গার,	নৈধ্রুব,	কাশ্যপ।		
ঘোষ	সৌকালীন	সৌকালীন,	আঙ্গিরস,	বার্হস্পত্য,	অঙ্গার,	নৈধ্রুব।

ঘোষ বংশে এখন নিম্নলিখিত আরও ২টি গোত্র দেখা যায় :

	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য,	অসিত,	দেবল।		
	বাৎস্য	ঔর্ব,	চ্যবন,	ভার্গব,	জামদগ্ন্য,	আপ্নুবৎ।
মিত্র	বিশ্বামিত্র	বিশ্বামিত্র,	মরীচি,	কৌশিক		
দত্ত	মৌদগল্য	ঔর্ব,	চ্যবন,	ভার্গব,	জামদগ্ন্য,	আপ্নুবৎ।

মন্তব্য : পরবর্তী বংশ তালিকায় কোন নামের নিচে বাসস্থান লিখিত থাকিলে তাহার বংশধরগণ সেইস্থানে বাস করেন বুঝিতে হইবে।

বসু বংশবল্লী

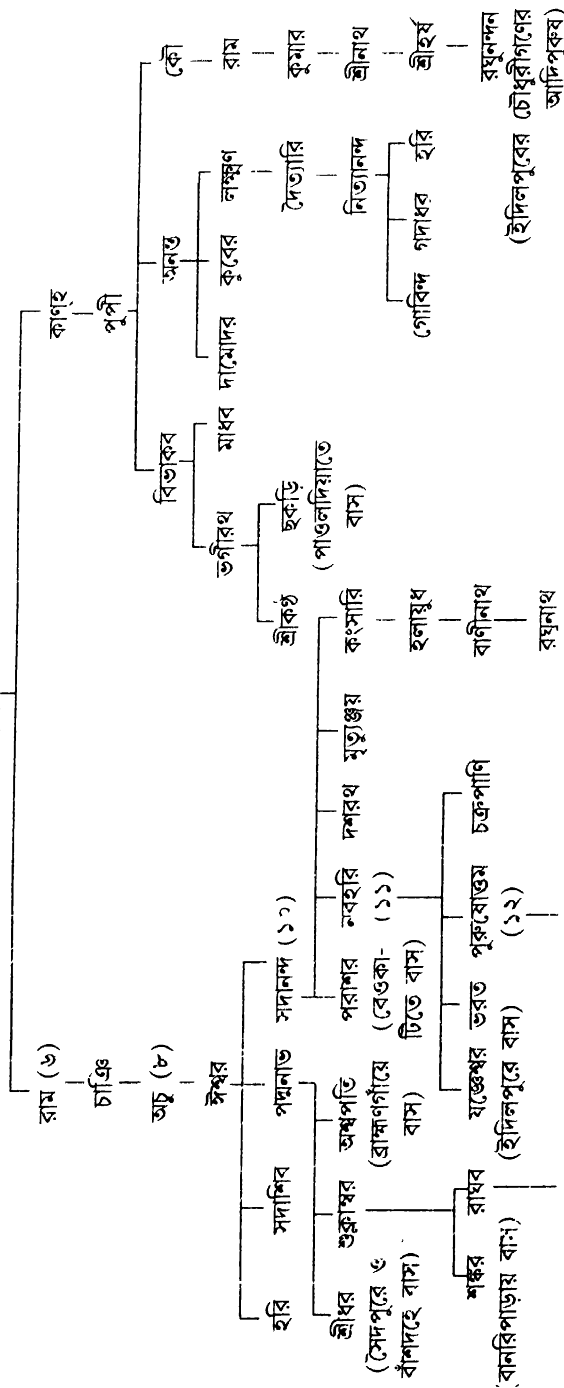
দশরথ বসু

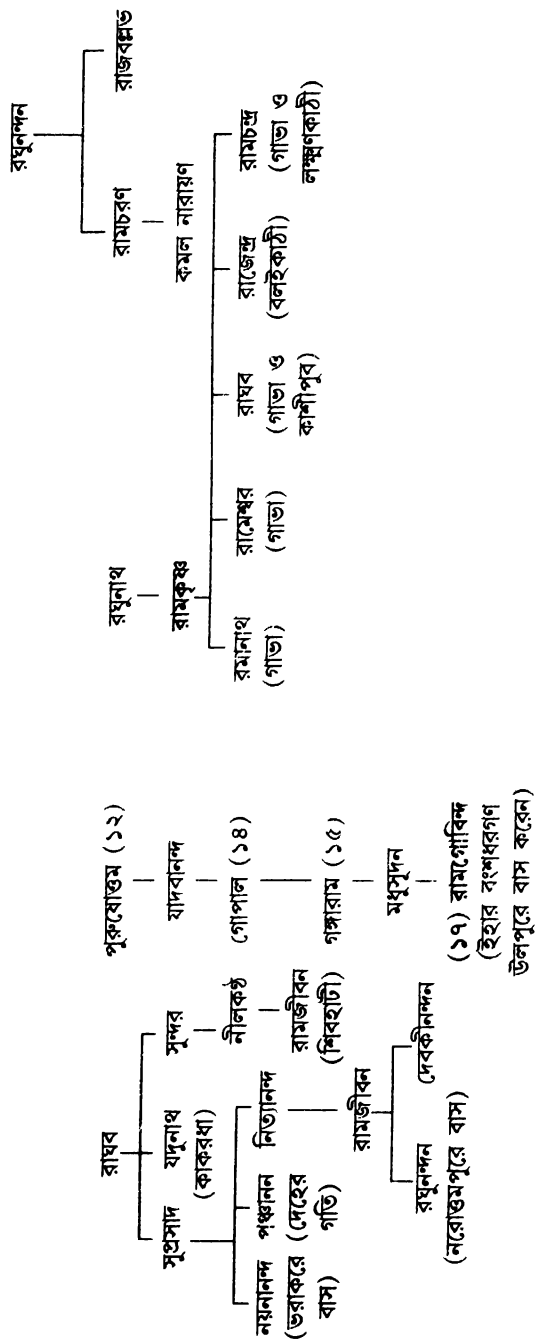
- পরম
  - **পূষণ**
    - দিবাকর
      - বাগ্‌ভট
        - উদন
        - দণ্ডপাণি
        - তমোপহ
          - অহর্পতি
            - সঞ্জয়
            - পুর
              - ভাঞি
                - থাক
                  - কন্দর্প
                    - মার্কণ্ডেয়
                  - চক্রপাণি
                    - যুধিষ্ঠির (চাঁদসীতে বাস)
                    - সূর্য
            - রাঘব
            - **বনমালী**
              - চাঞি
                - বিক
                  - কোক
                    - গোবিন্দ
              - মধুসূদন
                - মুক্তি
                  - গাভ
                    - হৃষীকেশ
                      - আন্‌
                      - তিনকড়ি (ইহার বংশধরগণ হাউলি ও কাড়াপাড়ায় বাস করেন)
        - বিভাকর
  - লক্ষ্মণ
    - অভয়
      - ত্রিলোচন
        - হংস
          - সোম
            - শঙ্কর

- মার্কণ্ডেয়
  - উষাপতি
    - বলভদ্র
      - মানন্দ (চন্দ্রদ্বীপের রাজা)
        - জগদানন্দ
          - কন্দর্পনারায়ণ
            - রামচন্দ্র (প্রতাপাদিত্যের জামাতা)
              - কীর্তিনারায়ণ
              - বাসুদেব নারায়ণ
                - প্রতাপ নারায়ণ
                  - গৌরীচরণ মিত্র—কন্যা
                    - উদয়নারায়ণ মিত্র (চন্দ্রদ্বীপের রাজা)
                      - শিবনারায়ণ
                    - রাজনারায়ণ মিত্র (প্রতাপপুরে বাস)
                  - প্রেমনারায়ণ
          - রাজবল্লভ
            - রামবল্লভ (উলপুরে ও পরে ইতনায় বাস)
        - রামরায় (দেহের গতি ও রৈভদ্রদি)

- সূর্য
  - সর্বানন্দ
    - রাম
      - তপন (বামড়াইলে বাস)
  - লক্ষ্মীধর (ইহার বংশধরগণ ভরাকরে বাস করেন)

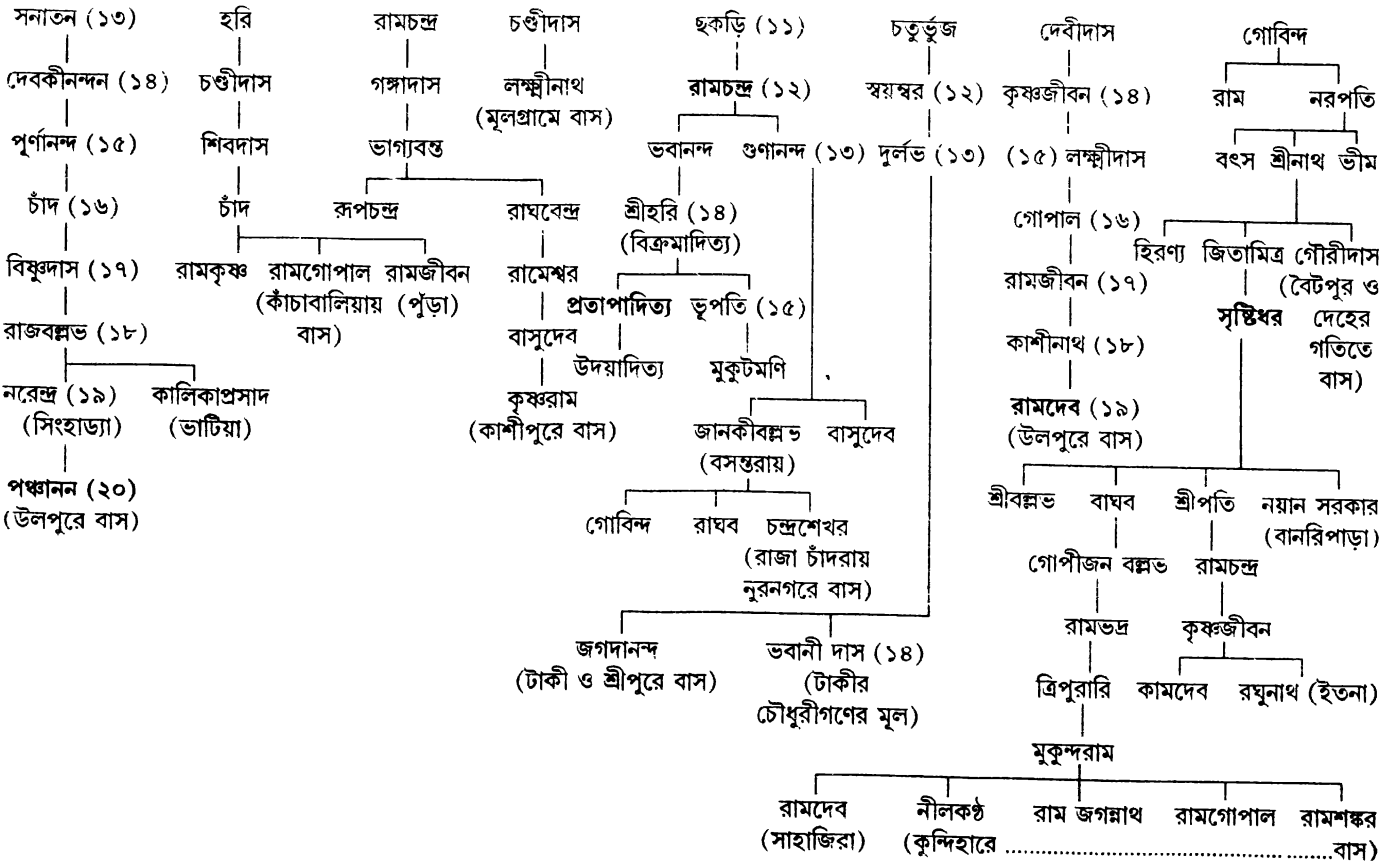
- গোবিন্দ
  - রাঘব
  - বৎস
    - রাঘব (টাকী)
    - ভাস্কর
      - শ্রীহর্ষ
      - শ্রীনাথ
      - গৌরীবর
      - ভগীরথ
        - শ্রীবল্লভ
        - শ্রীগর্ভ
        - শ্রীনিবাস
        - শ্রীনিধি
          - গোপাল বসু ঠাকুর
            - রাজবল্লভ
              - যাদবেন্দ্র
                - রঘুনন্দন
                  - রামদেব
                  - রমাবল্লভ
                  - কৃষ্ণরাম (উলপুরে বাস)
                  - রামজীবন
                  - রূপরাম
              - রামচন্দ্র
                - রাজীবলোচন (নথুল্লাবাদে বাস)
            - গোবিন্দ
              - দেবীদাস
            - সদাশিব (খোড়গাছি)
            - যদুনন্দন (ইদিলপুরে বাস)
          - নয়নানন্দ
        - জগদীশ (পুঁড়া খোড়গাছি ও শ্রীপুর)
      - উগ্রকণ্ঠ
    - দুর্গাবর (ধুলঝুড়ী)
  - পৃথ্বীধর (টাকী ও শ্রীপুরে বাস)


ঘোষ বংশবল্লী
(১) মকরন্দ ঘোষ
(২) সুভাষিত
(৩) চতুর্ভূজ
(৪) গঙ্গাধর
(৫) শুভ
রাম (৬)
চাঞ্চি
অচু (৮)
ঈশ্বর
হরি
সদাশিব
পদ্মনাভ
সদানন্দ (১০)
শ্রীধর (সৈদপুরে ও বাঁশদহে বাস)
শুক্লাম্বর
অশ্বপতি (ব্রাহ্মণগাঁয়ে বাস)
পরাশর (বেওকাটিতে বাস)
নবহরি (১১)
দশরথ
মৃত্যুঞ্জয়
কংসারি
শঙ্কর (বানরিপাড়ায় বাস)
রাঘব
যজ্ঞেশ্বর (ইদিলপুরে বাস)
ভরত
পুরুষোত্তম (১২)
চক্রপাণি
হলায়ুধ
বাণীনাথ
রঘুনাথ
কাণ্হ
পুপী
বিভাকব
অনন্ত
কৌ
ভগীরথ
মাধব
দামোদর
কুবের
লক্ষ্মণ
রাম
শ্রীকণ্ঠ
ছকড়ি (পাওলদিয়াতে বাস)
দৈত্যারি
কুমার
নিত্যানন্দ
শ্রীনাথ
গোবিন্দ
গদাধর
হরি
শ্রীহর্ষ
রঘুনন্দন (ইদিলপুবের চৌধুরীগণের আদিপুরুষ)


রঘুনন্দন
রামচরণ
রাজবল্লভ
কমল নারায়ণ
রামচন্দ্র (গাভা ও লক্ষ্মণকাঠী)
রাজেন্দ্র (বলইকাঠী)
রাঘব (গাভা ও কাশীপুর)
রামেশ্বর (গাভা)
রঘুনাথ
রামকৃষ্ণ
রমানাথ (গাভা)
পুরুষোত্তম (১২)
যাদবানন্দ
গোপাল (১৪)
গঙ্গারাম (১৫)
মধুসূদন
(১৭) রামগোবিন্দ (ইহার বংশধরগণ উজলপুরে বাস করেন)
রাঘব
সুপ্রসাদ
যদুনাথ (কাকরধা)
সুন্দর
নীলকণ্ঠ
রামজীবন (শিবহাটী)
নয়নানন্দ (ভরাকরে বাস)
পঞ্চানন (দেহের গতি)
নিত্যানন্দ
রামজীবন
রঘুনন্দন (নরোত্তমপুরে বাস)
দেবকীনন্দন

গুহ বংশবল্লী

- (১) বিরাট গুহ
  - (২) নারায়ণ
    - (৩) দশরথ
      - রাম
      - লক্ষ্মণ
        - হাড়ো
          - রুদ্র
            - চন্দ্রশেখর
              - (৮) গোবিন্দ
                - এডু (৯)
                  - বশিষ্ঠ (লক্ষ্মীকুল)
                  - (১০) কৃষ্ণ
                    - নিত্যানন্দ (১১)
                      - কেশব (১২)
                        - সনাতন (১৩)
                    - দশরথ
                      - সুপ্রসাদ
                        - হরি
                    - শুক্লাম্বর
                      - শিবানন্দ
                        - রামচন্দ্র
                    - পশুপতি
                      - গঙ্গাধর
                        - চণ্ডীদাস
                  - ব্যাস
                  - স্থির
                  - পদ্ম
                  - নিধি
                  - নারায়ণ
                    - জটাধর (এড়িকাঠি, ও জগদ্দল)
                    - কার্ণ্য
                - মহেশ্বর
              - শিব
            - বায়ু
          - বামন
          - কামদেব
      - (৪) ভরত
        - (৫) পীতাম্বর
          - (৬) শাঞি
            - (৭) তপন
              - কেশব
                - বিদ
              - (৮) শঙ্কর
                - (৯) আশ
                  - গজপতি (১০)
                    - ছকড়ি (১১)
                    - চতুর্ভুজ
                - (৯) বিন
                  - রাঘব (১১)
                    - গঙ্গাধর
                    - কন্দর্প (১০)
                      - বিশ্বাস (১২)
                        - দেবীদাস
            - ভাণ্ডু
              - গোণ্ডু
                - উধ
                  - গোবিন্দ
                - নন্দন
                  - কুবের (কাগমাবী)
              - আভ
                - দায়ু
                  - মার্কণ্ডেয়
                    - নকড়ি
                      - কৃষ্ণ (শ্রীনগরের মুস্তফী)
                      - কংসারি (বিকনা গ্রামে বাস)
                - পুপী
        - শূলপানি
      - শত্রুঘ্ন
      - উদন
      - ব্রহ্মা


সনাতন (১৩)
দেবকীনন্দন (১৪)
পূর্ণানন্দ (১৫)
চাঁদ (১৬)
বিষ্ণুদাস (১৭)
রাজবল্লভ (১৮)
নরেন্দ্র (১৯) (সিংহাড্যা)
কালিকাপ্রসাদ (ভাটিয়া)
পঞ্চানন (২০) (উলপুরে বাস)
হরি
চণ্ডীদাস
শিবদাস
চাঁদ
রামকৃষ্ণ
রামগোপাল (কাঁচাবালিয়ায় বাস)
রামজীবন (পুঁড়া)
রামচন্দ্র
গঙ্গাদাস
ভাগ্যবন্ত
রূপচন্দ্র
রাঘবেন্দ্র
রামেশ্বর
বাসুদেব
কৃষ্ণরাম (কাশীপুরে বাস)
চণ্ডীদাস
লক্ষ্মীনাথ (মূলগ্রামে বাস)
ছকড়ি (১১)
রামচন্দ্র (১২)
ভবানন্দ
গুণানন্দ (১৩)
শ্রীহরি (১৪) (বিক্রমাদিত্য)
প্রতাপাদিত্য
ভূপতি (১৫)
উদয়াদিত্য
মুকুটমণি
জানকীবল্লভ (বসন্তরায়)
বাসুদেব
গোবিন্দ
রাঘব
চন্দ্রশেখর (রাজা চাঁদরায় নুরনগরে বাস)
চতুর্ভুজ
স্বয়ম্বর (১২)
দুর্লভ (১৩)
জগদানন্দ (টাকী ও শ্রীপুরে বাস)
ভবানী দাস (১৪) (টাকীর চৌধুরীগণের মূল)
দেবীদাস
কৃষ্ণজীবন (১৪)
(১৫) লক্ষ্মীদাস
গোপাল (১৬)
রামজীবন (১৭)
কাশীনাথ (১৮)
রামদেব (১৯) (উলপুরে বাস)
গোবিন্দ
রাম
নরপতি
বৎস
শ্রীনাথ
ভীম
হিরণ্য
জিতামিত্র
গৌরীদাস (বৈটপুর ও দেহের গতিতে বাস)
সৃষ্টিধর
শ্রীবল্লভ
রাঘব
শ্রীপতি
নয়ান সরকার (বানরিপাড়া)
গোপীজন বল্লভ
রামচন্দ্র
রামভদ্র
কৃষ্ণজীবন
ত্রিপুরারি
কামদেব
রঘুনাথ (ইতনা)
মুকুন্দরাম
রামদেব (সাহাজিরা)
নীলকণ্ঠ (কুন্দিহারে
রাম জগন্নাথ
রামগোপাল
রামশঙ্কর
....বাস)

৩৫। প্রথম সমীকরণ

মহারাজ বল্লাল সেন একটি সাধারণ নিয়ম করিয়াছিলেন যে প্রতি ছত্রিশ বৎসর অন্তর কুলীনগণের সামাজিক অবস্থার পরীক্ষা হইবে, এবং তাহাদের বিশুদ্ধিরক্ষার চেষ্টা এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় নিয়মাদি প্রবর্তন হইবে। এবং নিয়মানুসারে স্বীয় রাজত্বের শেষভাগে (আনুমানিক ১১৬১—৬২ খ্রিঃ অব্দে) তিনি ব্রাহ্মণ কায়স্থগণকে নিজ সভায় আহুত করেন। এই সময়ে কুলীনগণের মধ্যে পদমর্যাদা লইয়া একটু গোলযোগ হইতেছিল এবং কোন কোন বংশে বেশি পর্যায় ও কোন কোন বংশে কম পর্যায়ের লোক থাকাতে সমপর্যায়ে বিবাহেরও ব্যাঘাত হইতেছিল। ইহার সমাধানার্থ বল্লাল সেন উক্ত সময়ে বঙ্গজ কায়স্থগণের সমীকরণ করেন। উহাই কুলগ্রন্থে প্রথম সমীকরণ নামে অভিহিত। সেই সময়ে দশরথ বসুর অধস্তন ৭ম পুরুষ অহর্পতি ও সোম, বিরাট গুহের অধস্তন ৫ম পুরুষ হাড়ো ও পীতাম্বর, মকরন্দ ঘোষের ৫ম পুরুষ শুভ ও অনন্ত এবং কালিদাস মিত্রের ৭ম পুরুষ জয়ীমিত্র জীবিত ছিলেন। প্রথম সমীকরণ দ্বারা এই ৭জন কুলীন সমমর্যাদাযুক্ত ও সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া অবধারিত হন। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর রায়চৌধুরিকৃত কায়স্থজাতির ইতিহাসে লিখিত আছে যে এই সমীকরণ দ্বারা "ঘোষ ও গুহ বংশের কোন ব্যতিক্রম হইল না, কিন্তু বসুবংশে লক্ষ্মণ ও পূষণের পিতা ও পিতামহ (পরম ও দশরথ) ও মিত্র বংশের তরাপতি মিত্রের পিতা ও পিতামহ (অশ্বপতি ও কালিদাস) পর্যায়গণনায় বহির্ভূত হইয়াছিল।" কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পর্যায়ের হারজিত এইখানেই সৃষ্টি হইল। এই সমীকরণ কালে বসুবংশ ও মিত্র বংশের দুই পর্যায় জিত হইল ; প্রকৃতপক্ষে ৭ম পর্যায়ভুক্ত অহর্পতি বসু ৫ম পর্যায়ভুক্ত হাড়ো গুহ ও শুভ ঘোষ প্রভৃতির সমপর্যায় বলিয়া গণ্য হইলেন, এবং তাহাদিগকে ৫ম পর্যায়ভুক্ত বলিয়া গণনা করা হইল। সমাজে বিবাহাদি কার্যের সুব্যবস্থার জন্য মাঝে মাঝে এইরূপ পর্যায়ের সমতা করা প্রয়োজন। পরেও কয়েকবার এইরূপ হইয়াছে। কিন্তু শেষে কোন কোন কুলীনগণ পর্যায়ের হার হওয়া অপমান বোধ করিতেন। বাস্তবিক পক্ষে পর্যায়ের হার ও জিত উভয়ই পর্যায়ের ব্যতিক্রম। যদি এই বিপর্যয়ে কার্য সামাজিক বিধানানুসারে না হয় তবে ইহার দ্বারা উভয়েরই কুলচ্যুতি হইতে পারে। কিন্তু সামাজিক অবস্থার বিবেচনায় কুলক্রিয়া প্রচলিত রাখিবার জন্য সমাজপতি বা সামাজিক নেতাগণ মাঝে মাঝে এইরূপ বিপর্যস্ত কার্যকে বিধিসঙ্গত করিয়া দেন। তাহারই নাম সমীকরণ। এখন যেরূপ পর্যায় হারিতে লোকের অপমান হয়, প্রথম সমীকরণ দ্বারা ঘোষ ও গুহ বংশের পর্যায় হার হওয়াতে তখনও সেইরূপ বোধ হইতে পারিত। কিন্তু এই ব্যবস্থার উপযোগিতা সকলের হৃদয়সঙ্গম হওয়ায় ইহা সকলেই মানিয়া লইয়াছিলেন। এক্ষেত্রে হার শব্দের দ্বারা অপমান বোধ করিবার কোন কারণ নাই। এইরূপ বিধি না হইলে কুলক্রিয়া লোপ পাইত।

এই সমীকরণ লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সম্প্রতি-প্রকাশিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ডের ১ম খণ্ডের ৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, 'পূর্বে ৭০ পৃষ্ঠায় সোম বসুর বৃদ্ধ পিতামহ লক্ষ্মণকে ও অহর্পতির বৃদ্ধ পিতামহ পূষণকে, শুভ ঘোষের ও অনন্ত ঘোষের পিতামহ চতুর্ভুজকে, হাড়ো গুহ ও পীতাম্বর গুহের পিতামহ দশরথকে ও জয়ী মিত্রের বৃদ্ধ প্রপিতামহ তারাপতিকে বল্লাল সেনের সমসাময়িক বলা হইয়াছে, তাহা সম্ভবপর নহে। সম্ভবত তাহারা রাজা বিজয় সেন কর্তৃক বঙ্গজ বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিলেন।'

একই বল্লাল সেনের কুলবন্ধনের সময়ে পূষণ বসু এবং পরে তাহারই কৃত সমীকরণ সময়ে পূষণ বসুর পঞ্চম অহর্পতি বসু বর্তমান থাকা আপাতত অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা সামঞ্জস্য করিতে গিয়া বসু মহাশয় যে অনুমান করিয়াছেন তাহা দ্বারা সমস্যার সমাধান

হয় নাই। কারণ যদি পূষণ বসু প্রভৃতি বল্লাল সেনের পূর্ববর্তী হয়, তবে কুলবন্ধন কালে বল্লাল কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে কৌলীন্য-মর্যাদা প্রদান করিলেন? তাহার উত্তর বসু মহাশয়ের সিদ্ধান্ত হইতে পাওয়ার উপায় নাই। যদিচ স্বেচ্ছামত কোন উত্তর দেওয়া যায় তাহা কোন কুলগ্রন্থ কর্তৃক সমর্থিত হইতে পারে না।

পূষণ বসু প্রভৃতি বল্লালের কুলবন্ধনের সময়ে ছিলেন না, ইহা সিদ্ধান্ত করার প্রয়োজন নাই। এই কুলবন্ধনের ৩৫/৩৬ বৎসর পরে ১ম সমীকরণ সময়ে তাহার পঞ্চম পুরুষ অহর্পতি বসুর বিদ্যমান থাকা আশ্চর্য বোধ হইলেও অসম্ভব নহে। কুলবন্ধনের সময়ে পূষণ বসু ৮০/৮৫ বৎসরের বৃদ্ধ থাকা ধরিয়া নিলে সেই সময়ে তাহার পুত্র দিবাকরের বয়স ৬০। ৬৫ বৎসর ও পৌত্র বাগ্‌ভট্টের ৪০/৪৫ বৎসর ও প্রপৌত্র তমোপহের ২০/২৫ বৎসর এবং তৎপুত্র অহর্পতির বয়স ২/৩ বৎসর হইতে পারে। এই হিসাবে কুলবন্ধনের ৩৫/৩৬ বৎসর পরে ১ম সমীকরণের সময়ে পূষণ, দিবাকর, বাগভট্ট ও তমোপহের পরলোক প্রাপ্তি এবং অহর্পতির বয়স ৩৫/৪০ বৎসর হওয়া সম্ভব হইতে পারে। যদি তাহা নিতান্তই অসম্ভব বলিতে হয় তবে আমাদের বিবেচনায় বরং ১ম সমীকরণ লক্ষ্মণ সেনের সময়ে হওয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু পূষণ বসু প্রভৃতিকে বল্লালের পূর্বকালের লোক বলিয়া স্থির করা যায় না। তাহা হইলে সামাজিক ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিপর্যয় করিতে হয়।

প্রথম সমীকরণের সময় হইতে বঙ্গজ বসুবংশীয়গণের পর্যায় পূষণ হইতে গণনা হইতেছে।

৩৬। অন্যান্য সমীকরণ

যে যে কারণে বঙ্গজ কায়স্থগণের প্রথম সমীকরণ হয়, কালক্রমে বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে সেইসব কারণের আরও অনেকবার উদ্ভব হইয়াছে। সেইজন্য আরও কয়েকটি সমীকরণ হইয়াছে। তাহার সমস্তগুলি এখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় সমীকরণ রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময়ের এবং তৃতীয় সমীকরণ রাজা দনুজমাধব সেনের সময়ে হয়।

যখন দনুজমর্দন দেব চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন তখন সেই প্রদেশেই বঙ্গজ কায়স্থের সমাজ হইল এবং তিনি বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের গোষ্ঠীপতি হইলেন। তাহার সভায় বঙ্গজ কুলীনগণের একবার সমীকরণ হয়, এবং সমাজ সংস্কার এবং বল্লালের কুলবিধির আবশ্যকীয় পরিবর্তনান্তে বঙ্গজ কায়স্থগণের নূতন কুলবিধি প্রচলিত হয়।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর রায়চৌধুরি প্রণীত কায়স্থ জাতির ইতিহাসে ৪২টি সমীকরণের শ্লোক এবং ৪২টি সমীকরণের উল্লেখ আছে। কার্যত যাহা এক সমীকরণ তাহাই ২ বা ততোধিক শ্লোকে উল্লিখিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ, ঐ গ্রন্থের ২য় ও ৩য় সমীকরণ বাস্তবিক পক্ষে লক্ষ্মণ সেন কৃত ২য় সমীকরণ। বিশ্বেশ্বর বাবুর গ্রন্থের লিখিত ২০শ সমীকরণে দেখা যায় ১০ম পর্যায়ের সদানন্দ ঘোষ, ১০ম পর্যায়ের ব্যাস গুহ ও ১১ পর্যায়ের বৎস বসু ও পৃথ্বীধর বসু সমীকৃত হন।

চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশে যথাক্রমে দনুজমর্দন দেব, রমাবল্লভ, কৃষ্ণবল্লভ, হরিবল্লভ ও জয়দেব রাজত্ব করেন। জয়দেবের পুত্র না থাকায় তাহার দৌহিত্র বসুবংশীয় পরমানন্দ বসু চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন। তাহার সময়ে বঙ্গজ কুলীনগণের শেষ সমীকরণ হয়। তিনি পূষণ বসু হইতে ত্রয়োদশ পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। তাহার সমীকরণে বসু বংশের ১৩ গুহ বংশের ১২ ও ঘোষ বংশের ১১ পর্যায় সমীকৃত হয়। কিন্তু সকল কুলীন কায়স্থ এই সমীকরণ মান্য করেন নাই। গোপাল বসু ঠাকুরের বংশধরগণ, এবং গাভা, লক্ষ্মণকাঠী, কাশীপুর প্রভৃতি স্থানের ঘোষগণ ও হানুয়া, কাঁচাবালিয়া, কাশীপুর প্রভৃতি স্থানের গুহগণ এই সমীকরণ অনুসারে কার্য করিয়া আসিতেছেন।

৩৭। চন্দ্রদ্বীপ সমাজ

রাজা পরমানন্দের পর তৎপুত্র রাজা জগদানন্দ, তৎপুত্র রাজা কন্দর্পনারায়ণ (প্রসিদ্ধ বার ভুঁইয়ার অন্যতম), তৎপুত্র রাজা রামচন্দ্র (রাজা প্রতাপাদিত্য গুহের জামাতা), তৎপুত্র রাজা কীর্তিনারায়ণ ও রাজা বাসুদেব নারায়ণ, তৎপুত্র বাসুদেব নারায়ণের পুত্র রাজা প্রতাপনারায়ণ ও তৎপুত্র প্রেমনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন। ইহারা বসু বংশীয়। প্রেমনারায়ণের পুত্র না থাকায় তাহার দৌহিত্র উদয়নারায়ণ মিত্র রাজা হন। এই মিত্র বংশের হাত হইতেই ক্রমে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের সম্পত্তি পরহস্তগত হয়। এখনও মিত্র বংশীয়েরা চন্দ্রদ্বীপের রাজা নামে অভিহিত হইয়া মাধবপাশায় বাস করিতেছেন।

রাজা পরমানন্দ কুলীন কায়স্থ ; অপর কুলীন কায়স্থগণ তাহার আধিপত্যে সন্তুষ্ট ছিলেন না, রাজা পরমানন্দের নানাবিধ যথেচ্ছাচারের কথাও শুনা যায়। এই সব কারণে তাহার সময়ে অনেক কুলীন কায়স্থ চন্দ্রদ্বীপ ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানে বাসগ্রহণ করেন।

৩৮। যশোহর সমাজ

রাজা পরমানন্দ বসুর সময়ে চন্দ্রদ্বীপ সমাজে ১২শ পর্যায়ভুক্ত রামচন্দ্র গুহনিয়োগী বাস করিতেন। তিনি পরমানন্দের সমীকরণ মানেন নাই এবং তাহার যথেচ্ছাচারের জন্য অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি চন্দ্রদ্বীপ ত্যাগ করিয়া প্রথমে সপ্তগ্রামে যান, তৎপর বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড়ে গিয়া রাজকার্যে নিযুক্ত হন। তাহার পৌত্র রাজা বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্ত রায় ও বিক্রমাদিত্যের পুত্র মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিষয় পূর্ব অধ্যায়ে ১৯শ প্রকরণে লিখিত হইয়াছে।

দশরথ বসু হইতে ১৪শ পুরুষ ভাস্কর বসু, তাহার ৯ পুত্র ; চতুর্থ ভগীরথ ও কনিষ্ঠ উগ্রকণ্ঠ ; ভগীরথ বসুর পাঁচ পুত্র শ্রীবল্লভ, শ্রীগর্ভ, শ্রীনিবাস, শ্রীনিধি ও জগদীশ। শ্রীনিধির সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের ভগিনীর ও জগদীশের সঙ্গে বসন্ত রায়ের ভগিনীর বিবাহ হয় ; এবং উগ্রকণ্ঠের কন্যার সহিত বিক্রমাদিত্যের বিবাহ হয় ; তাহার গর্ভে প্রতাপাদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৭৬ খ্রিঃ অব্দে (৯৮৩ সালে) বিক্রমাদিত্য যশোহরে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিয়া নিজ আত্মীয়স্বজনকে চন্দ্রদ্বীপ ও বিক্রমপুর সমাজ হইতে আনিয়া যশোহর সমাজে স্থাপিত করেন। তাহার ভাগিনেয় শ্রীনিধি বসুর পুত্র গোপাল বসু ঠাকুর এবং বসন্ত রায়ের ভগিনীপতি জগদীশ বসু তাহার আহ্বানে যশোহর সমাজে আগমন করিয়া তাহার সমাজের বল বৃদ্ধি করেন। বৎস বসুর ভ্রাতা পৃথ্বীধর বসুর পৌত্র যদুনন্দন বসুও এই সময়ে যশোহর সমাজে আগমন করেন।

৩৯। গোপাল বসু ঠাকুর

শ্রীনিধি বসুর দুই পুত্র, গোপাল ও নয়নানন্দ। গোপাল বসু ঠাকুর মাতুল বিক্রমাদিত্যের প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। গোপাল বসু ঠাকুর ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি অতিশয় শুদ্ধাচারী ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। মধ্যম বয়সে তিনি ধর্মকর্মোদ্দেশ্যে হিন্দুর প্রাচীন তীর্থ বারাণসীধামে দীর্ঘকাল বাস করেন। সেখানে তিনি একে একে ২২টি পুরশ্চরণ এবং নানাবিধ যাগযজ্ঞ করেন। তাহার শুদ্ধাচার, শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য কায়স্থ হইয়াও তিনি ঠাকুর উপাধি প্রাপ্ত হন। তাহার বংশধরগণ অদ্যাপি বসু ঠাকুর বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি সামাজিক সভায় ব্রাহ্মণগণের মত সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। বঙ্গজ কায়স্থসমাজে গোপাল বসু ঠাকুরের সন্তানগণ বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

৪০। গোপাল বসু ঠাকুরের বংশধরগণ

গোপাল বসু ঠাকুরের পুত্র পৌত্রগণের পরিচয় পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র

রাজবল্লভ প্রতাপাদিত্য অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। মোঘল সৈন্যের হস্তে প্রতাপাদিত্যের পতনের সঙ্গে (১০১৩—১০২০) যশোহর সমাজ ধ্বংস হইল! সেই সমাজে যাহারা বাস করিতেন তাহারা ইতস্তত চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তৎপর মুসলমান রাজের সহায়তায় বসন্ত রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রশেখর গুহ নূরনগরে রাজা উপাধি গ্রহণে জমিদারি পত্তন করিলেন। প্রতাপাদিত্য বসন্ত রায়কে এবং তাহার একাধিক পুত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন। তদবধি বসন্ত রায়ের পুত্র প্রতাপাদিত্যের ঘোর শত্রু। গোপাল বসু ঠাকুর প্রতাপাদিত্যের পিতৃস্বসাপুত্র। সুতরাং তাহার বংশধরগণ তখন বসন্ত রায়ের পুত্রের সমাজে বাস করা নিরাপদ মনে করিলেন না। আবার চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের জামাতা হইলেও তাহার পরম শত্রু হইয়াছিলেন। সুতরাং গোপাল বসু ঠাকুরের বংশধরগণ তখন সেখানে যাইয়া বাস করাও বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন না। এ কারণে তাহারা সেই অরাজকতার সময়ে কিছুদিনের জন্য উভয়ের আধিপত্যের সীমার বাহিরে থাকা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন। এই সময়ে ভূষণা প্রদেশে বঙ্গজ কায়স্থ দেববংশীয় রাজা মুকুন্দ রায় (২য় অধ্যায়, ১৯শ প্রকরণ ৩৬ পৃঃ) নূতন সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার নিকটবর্তী ইত্না গ্রামের রামভদ্র রাহা রায়ের কন্যার সহিত রাজবল্লভের পুত্র যাদবেন্দ্র বসু ঠাকুরের বিবাহ হইয়াছিল। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে রামভদ্র রায় পরম সমাদরে জামাতাকে ইত্না গ্রামে আহ্বান করিলে যাদবেন্দ্র স্ত্রী ও পুত্রসহ ইত্নায় গমন করেন। সেখানে তিনি কতক ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। যাদবেন্দ্র বসু ঠাকুর পিতামহের অনেক গুণ পাইয়াছিলেন। তিনি অনেক তীর্থ দর্শন ও ধর্ম-কার্য করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র রঘুনন্দন বসু ঠাকুর সাহাপুরের জমিদারি অর্জন করিবার পর তাহার পুত্রগণ উলপুরে বাস করেন।

কথিত আছে রাজবল্লভ বসু ঠাকুরের অন্যতম পুত্র রামচন্দ্র ঢাকা অঞ্চলে চলিয়া যান। সেখানে তাহার পুত্র রাজীবলোচন নিজ ক্ষমতাবলে বাদসাহী নৌবহরের অধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হন। তদবধি তাহার বংশীয়গণ মীরবহর (মীর অধ্যক্ষ) উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার বংশধরগণ এখন বরিশাল জেলার অন্তর্গত নথুল্লাবাদে বাস করেন। রাজবল্লভের ভ্রাতুষ্পুত্র দেবীদাস বসু ঠাকুর যশোহর সমাজ ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশের রাজধানী ঢাকায় যান। সেখানে নাওয়ারা সেরেস্তায় কার্যগ্রহণ করিয়া শেষে তিনি নওয়ারার কানুনগো পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৌলীন্যলোপের আশঙ্কায় তিনি ঢাকা শহর ত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালখাঁনগর গ্রামে বাসস্থান নির্দেশ করেন। তাহার সন্তান সন্ততিগণ মালখাঁনগরের বসু ঠাকুর নামে বিখ্যাত। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় বৃন্দাবনে বাস করিতেন।

রাজবল্লভের অন্য ভ্রাতা সদাশিবের বংশধরগণ টাকি সমাজের অন্তর্গত খোড়গাছিতে বাস করেন। রাজবল্লভের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদুনাথের বংশধরগণ ইদিলপুরে বাস করিতেছেন।

৪১। বসুরায় চৌধুরিগণের বিভিন্ন বাসস্থান

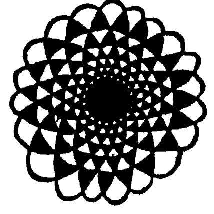
চন্দ্রদ্বীপ-সমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে বসু বংশীয়গণ বিক্রমপুর সমাজে ছিলেন। কিন্তু তাহার কোন বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। চন্দ্রদ্বীপ-সমাজে তাহারা যে স্থানে বাস করিতেন তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যশোহর সমাজ স্থাপন করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য ভগিনী ও ভাগিনেয়গণকে নিজের বাসস্থানের নিকটেই স্থাপিত করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু সে যশোহর নগরের অবস্থান এখন পর্যন্ত নির্ণয় হয় নাই। ঐতিহাসিকগণের মতে বর্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জের এলাকায় ঐ স্থান ছিল। যশোহর সমাজে গোপাল বসু ঠাকুর ও তাহার পুত্রগণ মাত্র ৩০/৩৫ বৎসর (৯৮৫—১০২০ সাল পর্যন্ত) বাস করিয়াছিলেন,

(১৯ ও ৩৮ প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং সেখানে তাহাদের কোন স্থায়ী কীর্তি থাকিবার সম্ভবনা নাই। ইত্না গ্রামে যাদবেন্দ্র ঠাকুর কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন এবং রঘুনন্দন বসু ঠাকুরও বাস করিয়াছিলেন। সেখানে তাহাদের যে বাড়ি ছিল তাহা পুত্রগণ তাহা একজন ব্রাহ্মণকে দিয়া আসিয়াছিলেন। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে সেই বাটি মধুমতী নদীর অঙ্কশায়ী হইয়াছে। ইত্নায় উলপুরের বসুবংশের পুরোহিতগণের বাস। ঐ গ্রামে রঘুনন্দন বসু ঠাকুর ও তাহার পুত্র রামদেব ও কৃষ্ণরামের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর জমি ঐ পুরোহিতগণ এখনও ভোগ করিতেছেন। যশোহর কালেক্টরিতে বর্তমান পুরোহিতগণের পূর্বপুরুষ নন্দকিশোর চক্রবর্তী ও সদাশিব চক্রবর্তী কর্তৃক ১২০৯ সালের ৩ অগ্রহায়ণ তারিখের দাখিলি তায়দাতে নিম্নলিখিত ৪ খানি ব্রহ্মোত্তর সনদের উল্লেখ আছে .

সনদ দাতার নাম	সনদ গ্রহীতার নাম	যে গ্রামে জমি তাহার নাম	জমির পরিমাণ	সনদের সন তারিখ
রঘুনন্দন বসু	রঘুদেব চক্রবর্তী	খড়িগাতি	১/০	সন ১০৭৮, ১৯ জ্যৈষ্ঠ
রামদেব রায়চৌধুরি	কৃষ্ণদেব চক্রবর্তী	বল্লভপুর	১৷৹	সন ১০৯২, ৬ মাঘ
কৃষ্ণরাম বসু	সুখদেব চক্রবর্তী	বল্লভপুর	১/০	সন ১১০৮, ১ বৈশাখ
কৃষ্ণবাম বসু	রামগোপাল চক্রবর্তী	বারপাড়া	২৷২	সন ১১৬৮, ১১ চৈত্র

"We have good reasons for supposing that the Kshatriyas and more particularly the princely families were regarded as belonging to the Mulagotrani" *Hastings' Encyclopaedia of Religions, vol 6 p 356 Article on Gotra by Dr R. Fick*

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য কাণ্ড ৩১৬ পৃষ্ঠায় ধৃত আচার্যচূড়ামণির কারিকা ; ও তৎপ্রণীত দক্ষিণ রাঢ়ীর কায়স্থ কাণ্ডের ৬৬ পৃষ্ঠা।



চতুর্থ অধ্যায়

উপনিবেশের ইতিহাস

৪২। রঘুনন্দন বসু

অনুমান ১০১০ হইতে ১০১৫ সালের মধ্যে (১৬০৩-১৬০৮ খ্রিঃ অঃ) উলপুরের জমিদারগণের বীজপুরুষ রঘুনন্দন জন্মগ্রহণ করেন। তখন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের শেষ সময়। সেই রাষ্ট্রবিপ্লবকালে এই মহাপুরুষের জন্ম। তাহার শৈশবে পিতা যাদবেন্দ্র পরিবার পরিজনসহ ইত্‌নাতে বাস গ্রহণ করেন। তখন ফতেহাবাদ ও মাহমুদাবাদ সরকারদ্বয় (যাহা পরে চাকলা ভূষণা নামে অভিহিত হয়) পরাক্রমশালী বঙ্গজ কায়স্থ মুকুন্দ রায়ের পুত্র শত্রুজিৎ ও শিবরামের শাসনাধীনে ছিল। তাহারা নামে বাদশাহের অধীন হইলেও, কার্যত সমস্ত স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। মুকুন্দ রায়ের প্রতিষ্ঠিত ফতেহাবাদ সমাজে কুলীনের বাস ছিল না ; অথচ কুলীন না থাকিলে সমাজের কোন প্রতিষ্ঠা ছিল না। একারণে তিনি কুলীনের বিশেষ সম্মান ও সমাদর করিতেন। ইত্‌না মুকুন্দ রায়ের অধিকারের মধ্যে ছিল। যাদবেন্দ্র বসু ঠাকুর ইত্‌নায় বাস গ্রহণ করিলে মুকুন্দ রায়ের পুত্রগণ স্বীয় সমাজে বিখ্যাত কুলীন গোপাল বসু ঠাকুরের বংশধরের অধিষ্ঠানে সমাজের মর্যাদা বৃদ্ধি হওয়ায় তাহাকে যথোচিত সমাদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ক্রমে রঘুনন্দন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার বিবাহ হয়। প্রচলিত মতে তাহার দুই বিবাহ; প্রথম পক্ষে ৩ পুত্র ও দ্বিতীয় পক্ষে ২ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে তাহার তিন বিবাহ, ১ম পক্ষে এক পুত্র, ২য় পক্ষে দুই পুত্র ও শেষ পক্ষে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রচলিত মতে তাহার যে দুই বিবাহ হয়, তাহার প্রথম স্ত্রীর নাম উমাতারা, তিনি যশোহর সমাজের গুহ বংশের কন্যা, এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ললিতা, ইদিলপুরের রায়চৌধুরি উপাধিধারী ঘোষবংশের কন্যা। প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত তিন পুত্রের নাম রামদেব, রমাবল্লভ ও কৃষ্ণরাম ; দ্বিতীয় পক্ষের দুই পুত্রের নাম রামজীবন ও রূপরাম। আমাদের অনুমান রঘুনন্দনের তিন বিবাহ ছিল। এক স্ত্রীর গর্ভে কেবল একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ সদানন্দ ঘোষের বংশীয় রামগোবিন্দ ঘোষের সহিত তাহার বিবাহ হয়। জমিদারি প্রাপ্তির পর যখন বসুচৌধুরিগণ উলপুরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন তখন তাহারা রঘুনন্দনের ঐ কন্যার পুত্রগণকে উলপুরে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহাদের বংশধরগণ এখন উলপুরে বাস করিতেছেন। তাহাদের বিবরণ ৮ম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

৪৩। জমিদারি প্রাপ্তি

রঘুনন্দন বসুর জমিদারি প্রাপ্তি সম্বন্ধে উলপুরে দুইটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। (১) প্রথম প্রবাদ এই যে তাহার নিকট-জ্ঞাতি খুল্লতাত দেবীদাস বসু ঠাকুর ঢাকার নওয়ারাবিভাগের কানুনগো থাকা কালে তাহার সাহায্যে রঘুনন্দন এই জমিদারি প্রাপ্ত হন।

(২) অপর কিংবদন্তী এই যে তখন উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে আগত রাজা উপাধিধারী উজানির জমিদারগণ কায়স্থ সমাজে মিশিবার জন্য শ্রেষ্ঠ কুলীন রঘুনন্দনকে ৭ গ্রাম দান করেন; লেখকের ভুলে ৭ গ্রাম স্থানে ২৭ গ্রাম লিখিত হয়; তদবধি ২৭ গ্রামে সৃষ্ট সাহাপুর

পরগণার জমিদারি রঘুনন্দনের অধিকারে থাকে।

(৩) তৃতীয় আর একটি প্রবাদের কথাও (কায়স্থ সমাজ পত্রিকার সম্পাদক, আলগী-নিবাসী **শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র** ঘোষ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট) শুনা গিয়াছে, তাহার মর্ম এই : ভূষণা অঞ্চলে বহুকাল হইতে জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে ভূষণার অধিপতি মুকুন্দ রায়ের পুত্র শত্রুজিৎ রায় তাহার ভ্রাতা শিবরাম রায়ের কন্যার সঙ্গে রঘুনন্দনের বিবাহ দিয়া, প্রথমত তাহাকে ভূষণার নিকটে একটি গ্রাম যৌতুক দেন, তাহাকে লোকে এখনও রঘুনন্দনপুর বলে ; তৎপুত্র শত্রুজিৎ রায় ২৭টি গ্রামের জমিদারি রঘুনন্দনকে অর্পণ করিয়া সাহাপুর পরগণা নামে নতুন পরগণা সৃষ্টি করেন।

তিন মত সম্বন্ধে আলোচনা ঃ উজানির রাজাগণের জমিদারি সাহাপুর পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এরূপ কোন প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। সাহাপুর পরগণার সংলগ্ন কোন গ্রামেও তাহাদের জমিদারি নাই। রঘুনন্দন যখন সাহাপুর পরগণার জমিদারি প্রাপ্ত হন তখন উজানির রাজাগণ জমিদারি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিনা তাহারও নিশ্চয়তা নাই। বর্তমানে তাহারা তেলিহাটী পরগণার অংশ-বিশেষের মালিক, তাহা খারিজা তালুক, অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে অন্য জমিদার কর্তৃক সৃষ্ট তালুক। পূর্বেও তাহাদের সম্পত্তি এইরূপ তালুক থাকিলে নতুন পরগণা সৃষ্টি করিয়া অপরকে জমিদারি প্রদান করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না; বিশেষত ৭ গ্রামের স্থলে ভুলক্রমে ২৭ গ্রামের নাম লিখিত হওয়াও সহজে বিশ্বাস করা যায় না।

দেবীদাস বসু ঠাকুর বাংলা ১০৮৭ সালের চৈত্র মাসে হাজি সফি খাঁর দেওয়ানি আমলে নওয়ারা বিভাগের কানুনগো ছিলেন ; তাহা ২৬শ প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে। মালখাঁনগরে তাহার তিন কুঠরীযুক্ত একটি দালান ছিল, ঐ দালানে ২ খানি ইষ্টক ফলকে এইরূপ লিপি ছিল —

১ম ইষ্টক ফলক	**২য় ইষ্টক ফলক**
বাদসাহ .... আওর	শ্রীগোবিন্দচরণ আসরন্দ
ঙ্গেব য়ালমগীর য়ামলে	শ্রীদেবীদাস বসুকা
নওয়াব য়ামেরুল	নোগোই নাওয়ারা এতমা
ওমরা দেওয়ান বাদসা	ম শ্রী নষাই খাসনবি
হা হাজি সফি খাঁ শ্রী	সন ১০৮৭ বাংলা মাহে চৈত্র।

১০৮৭ সনের বহু পূর্বে (সম্ভবত ১০৮০-১০৮৫ সালের মধ্যে) রঘুনন্দন সাহাপুরের জমিদারি প্রাপ্ত হন। সে সময়ে দেবীদাস বসু ঠাকুরের রাজকার্যে নিযুক্ত হওয়া সন্দেহের বিষয় ; তাহা সম্ভব হইলেও তখনও তিনি কোন উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন না। বিশেষত তিনি নওয়ারা বিভাগে কার্য করিতেন। জমিদারি বন্দোবস্ত খালসা বিভাগ হইতে হইত, নওয়ারা বিভাগে কার্য করিয়া খালসা মহাল হইতে জমিদারি সৃষ্টি করিয়া দেওয়া সহজ নহে। এই সমস্ত কারণে তাহার চেষ্টায় সাহাপুরের জমিদারি প্রাপ্তিও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

এই সময়ে সম্পূর্ণ ফতেহাবাদ ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অনেক স্থল ভূষণার মুকুন্দ রায়ের পুত্রগণের অধিকারে ছিল। এই স্থানে ঐ সময়ে জমিদারি সৃষ্টি তাহাদের দ্বারাই সম্ভব। আমাদের বিবেচনায় ভূষণার ভূস্বামী শত্রুজিৎ রায়ের নিকট হইতে (১০৮০—১০৮৫ সালে) রঘুনন্দন প্রথম এই জমিদারির অধিকার প্রাপ্ত হন।

জমিদারি প্রাপ্ত হইয়াই (১০৮০-১০৮৫ সালে) রঘুনন্দন সেখানে যাইয়া কিছু দিন বাস করেন। কিন্তু সেই স্থান তখন ভদ্রলোকের বাসের উপযোগী ছিল না ; কোন ভদ্রবসতি নিকটে ছিল না ; তথায় ভদ্রলোকের বাসের অনেক অসুবিধা ছিল। তদৃষ্টে তিনি সেখানে স্থায়ী বাসের

অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া ইত্‌নায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং তথা হইতে ঐ জমিদারির যথাসম্ভব শাসন সংরক্ষণ করিবার চেষ্টা করেন।

১০৫৫ সালে ভূষণাধিপতি শত্রুজিৎ রায়ের পতনের পর তাহার ভ্রাতা শিবরামের ও তাহাদের বংশধরগণের পূর্বের মত প্রতাপ বা আধিপত্য রহিল না। নবাব সরকার হইতে ঐ সমস্ত স্থানের রাজস্ব আদায়ের জন্য অন্য ব্যক্তি নিযুক্ত হইলেন।

পরে বিচক্ষণ রঘুনন্দন নিজের স্বত্ব সুদৃঢ় করিবার জন্য নবাব সরকার হইতে এই জমিদারির বন্দোবস্ত মঞ্জুর করিয়া লইবার সঙ্কল্প করিলেন, এবং ফতেহাবাদ সমাজে কোন কুলীন কায়স্থের বাস না থাকায় ঐ সমাজভুক্ত হইয়া থাকিলে ভবিষ্যতে কুলচ্যুতি হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি নিজ জমিদারি কুলীনপ্রধান বাকলা (চন্দ্রদ্বীপ) সমাজের অন্তর্গত করিয়া রাখিবার অভিলাষী হইলেন। সুতরাং (১০৭৫—১০৮৫ সালের মধ্যে) রঘুনন্দন নিজের বার্ধক্য জানাইয়া নবাব সেরেস্তায় সাহাপুর পরগণা নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র রামদেবের নামে সরকার বাক্‌লার অন্তর্গত ইদরাক্‌পুর পরগণা হইতে খারিজা (বিচ্ছিন্ন) পরগণা স্বরূপে লেখাইয়া লইবার জন্য প্রার্থী হন। ঐ সমস্ত স্থান হইতে পূর্বে কখনও কোন রাজস্ব পাওয়া যায় নাই ; জমিদার স্বয়ং রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া লইতে প্রার্থী হওয়ায় সহজেই রঘুনন্দনের ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। দেবীদাস বসু ঠাকুর এই সময়ে ঢাকার নওয়ারা সেরেস্তায় উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন, সম্ভবত এই বন্দোবস্ত সম্বন্ধে তিনি রঘুনন্দনকে সাহায্য করিয়াছিলেন; সেজন্য এই জমিদারি প্রাপ্তির সহিত তাহার নাম সংযুক্ত আছে। ফরিদপুরের বিল অঞ্চলের জমিদারিসমূহের সৃষ্টি সম্বন্ধে সেটলমেন্ট রিপোর্টে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ঃ

"মোঘল আমলে যশোহর জেলার হিন্দু ভদ্রলোকগণের চেষ্টায় (ফরিদপুর) জেলার মধ্যভাগস্থিত মুকসুদপুর ও নগরকান্দার বিলপ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তাহারা নদীর তীরদেশে বাস গ্রহণ করিয়া ভূভাগ সমূহ উচ্চ করিয়া গ্রামের অবস্থানের উপযোগী করিতেন, এবং পার্শ্ববর্তী প্রদেশ চাষ আবাদ করিবার জন্য ভৃত্য বা প্রজা আনয়ন করিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথমে তাহারা কোন ভূভাগ দখল করিয়া বসিতেন, এবং পরে মোঘল সরকার হইতে তাহার জায়গির মঞ্জুর করাইয়া লইতে চেষ্টা করিতেন।"[১]

ইহার প্রায় প্রত্যেক কথাই সাহাপুর জমিদারির সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

জমিদারি প্রথম প্রাপ্ত হইয়া যখন (১০৪০—১০৪৫ সালে) রঘুনন্দন উলপুরে যান, তখন তিনি কয়েকজন কুটুম্ব ও আত্মীয়স্বজন সঙ্গে করিয়া নিয়া গিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে বিক্রমপুরের অন্তর্গত শ্রীনগরের সুপ্রসিদ্ধ লালা কীর্তিনারায়ণের পিতামহ কৃষ্ণজীবন বসুও সপরিবারে সেখানে বাস করিবার জন্য গিয়াছিলেন। উক্ত লালা কীর্তিনারায়ণের বংশধর শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন বসু "শ্রীনগর লালা বংশের ইতিহাস" নামে একখানি পুস্তক গত বৎসর প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহার আরম্ভ এইরূপ ঃ

"কংসনারায়ণ বসু নামক জনৈক কায়স্থ কুলীন ভদ্রলোক ১০৪৫ বঙ্গাব্দে বরিশাল জেলার অন্তর্গত উলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, এই উলপুর বর্তমান ফরিদপুর জেলাভুক্ত।

"কিছুকাল পরে তিনি উলপুর ত্যাগ করিয়া ইদিলপুর আসিয়া বসবাস করেন, তারপর ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে বেজগাঁ গ্রামে আসিয়া অবস্থিত হন ; এখানে আসার পরে "বেজগ্রামে কুলং নাস্তি" বলিয়া ঘটকগণ তাহাকে কুলজ করিয়া ২ আনা বিদায় কমাইয়া দেয়। কৌলীন্যরক্ষার্থ বিক্রমপুরের অন্তর্গত রায়েসবর গ্রামে প্রসিদ্ধ কুলীন গুহমুস্তফী বংশে বিবাহ করিয়া কংসনারায়ণ রায়েসবর গ্রামেই বসবাস করিতে থাকেন; স্বগ্রাম বেজগ্রামে আর ফিরিয়া গেলেন না।"

এই কংসনারায়ণ পূর্বোক্ত কৃষ্ণজীবন বসুর পুত্র। কংসনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র লালা কীর্তি নারায়ণ পরে ঢাকা নবাব সরকারে উচ্চপদে নিযুক্ত থাকিয়া রায়েসবর গ্রামের বহু শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন এবং তাহার নাম শ্রীনগর রাখেন। কৃষ্ণজীবন বসু রঘুনন্দন বসু ঠাকুরকে উপলক্ষ্য করিয়া উলপুরে বাস করিতে গিয়াছিলেন ; রঘুনন্দন উলপুরে বাস না করায় কৃষ্ণজীবন ঐ স্থান ত্যাগ করেন ; কিন্তু কংসনারায়ণের উলপুরে জন্ম হওয়ায় তৎপ্রতি আজীবন তাহার টান ছিল। তিনি তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যার কন্যাকে রঘুনন্দনের তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণরামের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন।

৪৪। উলপুরে বাস আরম্ভ

৪১শ প্রকরণে পুরোহিতগণের দাখিলি যে তায়দাদ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে কয়েকটি অনুমান করা যাইতে পারে। সেকালে শ্রাদ্ধকার্যে ভূমিদানের অনুকল্প স্বরূপ সামান্য মূল্য দিবার প্রথা ছিল না ; সম্ভব হইলে লোকে ভূমিই দান করিত। ১০৭৮ সালে রঘুনন্দন বসু ঠাকুর ব্রহ্মোত্তর দান করেন ; সম্ভবত মাতৃশ্রাদ্ধে তিনি ঐ ভূমিদান করেন। তৎপর ১০৯২ সালের ৬ মাঘ তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামদেব ব্রহ্মোত্তর দান করেন। পিতা বর্তমানে পুত্রের কোন সম্পত্তিতে অধিকার ছিল না, সুতরাং ১০৭৮ হইতে ১০৯২ সালের মধ্যে রঘুনন্দনের মৃত্যু হয়। সম্ভবত ১০৯২ সালেই তাহার মৃত্যু হয় এবং তাহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে রামদেব পুরোহিতকে এই ভূমিদান করেন। কৃষ্ণরাম ১১০৮ সালে প্রথম ব্রহ্মোত্তর দান করেন। ইহা হইতে নিম্নলিখিত ২টি অনুমান করা যাইতে পারে :

(১) ১১০৮ সালের পূর্বে রঘুনন্দনের পুত্রগণ পৃথকান্ন হইয়াছিলেন, নতুবা কৃষ্ণরামের একার কোন সম্পত্তি দান করিবার অধিকার হইত না। (২) সম্ভবত মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে তিনি পুরোহিতকে এই ভূমিদান করিয়াছিলেন ; এবং জ্যেষ্ঠ রামদেব তখন জীবিত ছিলেন না, সুতরাং কনিষ্ঠ কৃষ্ণরাম শ্রাদ্ধের অধিকারী হইয়াছিলেন। ১১৬৮ সালে কৃষ্ণরাম পুনরায় ব্রহ্মোত্তর দান করেন, সুতরাং তখনও তিনি জীবিত ছিলেন। অতি বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুকাল আসন্ন মনে করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কালে স্বীয় পুরোহিতকে তিনি এই ভূমিদান করিয়া থাকিবেন।

নবাব সরকার হইতে জমিদারি বন্দোবস্ত স্থায়ীভাবে মঞ্জুর হইবার পর রঘুনন্দন পুত্রগণকে উলপুরে যাইয়া বাস করিবার জন্য বলিতে থাকেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সেই আমলে ইত্‌নার মত দূরদেশ হইতে সাহাপুরের ন্যায় বিলময় অনাবাদী জমিদারি সুশাসন করা সম্ভব নহে; এবং নিজের জমিদারি থাকিতে পরের অধিকারে বাস করা সম্মানের বিষয় নহে। ঐ জমিদারি সরকার বাক্‌লার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, তথায় থাকিলে কুলেরও কোন দোষ ঘটিবে না। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া তিনি পুত্রদিগকে উলপুরে যাইয়া বাস করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদেব ঐ অসুবিধাজনক স্থানে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। তাহার পত্নী বিশেষ বুদ্ধিমতী ছিলেন। উলপুর না গেলে পরিণামে তাহার সন্তানগণের অন্নাভাব হইবে মনে করিয়া তিনি দেবর কৃষ্ণরামকে বলিলেন যে তিনি উলপুরে বাস্তব্যের জন্য উপযুক্ত গৃহাদি নির্মাণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া যেন তাহাকে ও তাহার পুত্রগণকে উলপুরে নিয়া যান। তদনুসারে উলপুরে সমস্ত স্থির করিযা কৃষ্ণরাম ইত্‌নায় ফিরিয়া আসিলে রামদেবের স্ত্রী স্বামীর অনুমতি গ্রহণে পুত্রগণ সহ কৃষ্ণরামের সঙ্গে উলপুরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে (অনুমান ১০৯২ সালের পৌষমাসে) রঘুনন্দন বসু ঠাকুর পুত্রদিগকে তাহার বহু চেষ্টায় অর্জিত উলপুরের জমিদারিতে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া পুত্র পৌত্রাদির সমক্ষে শান্তচিত্তে ইহলোক ত্যাগ করেন।

রঘুনন্দনের জ্যেষ্ঠপুত্র রামদেব বসু চৌধুরি বিশেষ ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। স্ত্রী, পুত্র ও

ভ্রাতাগণ উলপুরে চলিয়া গেলে এবং পিতার মৃত্যু হইলে, রামদেব কখনও ইত্‌নায় কখনও গুরুগৃহে, কখনও বা কোন তীর্থস্থানে থাকিতেন। তাহার স্ত্রী পুত্র ও ভ্রাতাগণ মাঝে মাঝে তাহাতে দেখিয়া আসিতেন। কিন্তু তিনি কখনও উলপুরে বাস করেন নাই।

৪৫। বাসভূমি নির্বাচন

বসুগণের উপনিবেশ স্থাপনের সময়ে উলপুর একটি ছোট গ্রাম ছিল, চারিদিকে বিল ; গ্রামের মাঝে কয়েকটি উচ্চ ভিটা মাত্র ছিল ; তাহার কয়েকটি ভিটাতে অল্প কয়েক ঘর লোক বাস করিত ; অপরগুলি বন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। ইহার নানাবিধ অসুবিধার কথা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের বাল্যাবস্থায় মনে এই প্রশ্নের উদয় হইত যে পরগণার মধ্যে করপাড়া, হাটবাড়িয়া প্রভৃতি গ্রাম উলপুর অপেক্ষা ভাল এবং উচ্চ থাকিতে মূল জমিদারগণ পরগণার এককোণে উলপুরে কেন তাহাদের বাসভূমি ও জমিদারির কেন্দ্র করিলেন। পূর্বাবস্থা সম্যক্ আলোচনা করিয়া এখন মনে হয় তাহাদের এরূপ করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল :

(১) সাহাপুর পরগণা বিলময় দুরধিগম্য প্রদেশ হইলেও ভূষণা হইতে বাকরগঞ্জ পর্যন্ত যে রাস্তার কথা ১ম অধ্যায়ে ষষ্ঠ প্রকরণে লিখিত হইয়াছে উলপুর তাহার পার্শ্বে অবস্থিত ছিল এবং উলপুর হইতে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত একটি রাস্তা ছিল। বাসের পক্ষে ইহা বিশেষ সুবিধার কথা।

(২) মধুমতী নদী হইতে সহজে উলপুরে যাতায়াত করা যাইত ; মধুমতী তখন উলপুরের আরও নিকটে ছিল। পরগণার অন্য কোন গ্রামে (তেঁতুলিয়া ব্যতীত) শীত ও গ্রীষ্মকালে সহজে যাতায়াতের উপায় ছিল না। স্ত্রীলোক ও মালপত্র লইয়া অন্য সব গ্রামে যাওয়া নিতান্ত কষ্টকর ছিল।

(৩) উলপুরে বেশি লোকের বাস ছিল না, এবং হিন্দু ভিন্ন অন্য ধর্মাবলম্বী কোন অধিবাসী ছিল না। সুতরাং অনেক লোককে বাস্তু হইতে উঠাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল না। এইরূপ স্থানে নতুন উপনিবেশ স্থাপন সহজসাধ্য।

সম্ভবত এই সমস্ত কারণে অন্যান্য বহুবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও প্রথমাগত জমিদারগণ এই গ্রামেই তাহাদের বাস নির্দেশ করেন।

তখন উলপুব গ্রামের যে অংশ বাসের যোগ্য ছিল তাহার পূর্ব দক্ষিণদিকে পুবের বিলের পশ্চিম পাড়ের স্থান জমিদারগণ নিজ বাসস্থানের জন্য নির্বাচন করিলেন। রামদেব উলপুরে না আসায় উপনিবেশীগণের মধ্যে রমাবল্লভই জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি দক্ষিণ দিকের বাসভূমি নিজের জন্য নিলেন। কৃষ্ণরাম সর্ব পূর্বদিকের বাসভূমি রামদেবের পুত্রগণকে দিয়া রমাবল্লভের বাড়ির উত্তর দিকের ভিটা নিজে নিলেন। পুব ও দক্ষিণের বাসভূমির তুলনায় ইহা নিকৃষ্ট হইলেও কৃষ্ণরাম সন্তুষ্টচিত্তে তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। রামদেবের পুত্রগণের বাড়ি ও কৃষ্ণরামের বাড়ির মধ্যে আর একটি ভিটা পড়িয়া রহিল। তাহা কিছুদিন পরে কাজে লাগিল।

৪৬। রঘুনন্দনের কনিষ্ঠপুত্রদ্বয়

যখন রমাবল্লভ প্রভৃতি উলপুরে বাস আরম্ভ করেন তখন রঘুনন্দনের শেষ পক্ষের পুত্রদ্বয়, রামজীবন ও রূপরাম অল্প বয়স্ক ছিলেন। উলপুরে স্থায়ীভাবে বাস আরম্ভ হইবার পর কৃষ্ণরাম কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতাকে ইত্‌না হইতে উলপুরে আনিবার প্রস্তাব রমাবল্লভের নিকট উত্থাপন করেন। রমাবল্লভ তাহাতে নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া অমত করেন। তাহারা আসিয়া উলপুরের জমিদারির অংশ নিলে নিজের অংশ কমিয়া যাইবে এই জন্য প্রথমত রমাবল্লভ কিছুতেই তাহাদিগকে উলপুরে আনিতে কিংবা জমিদারির ভাগ দিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু পিতৃসম্পত্তিতে সকল ভ্রাতারই অধিকার ; অসহায় বালকবিধায় কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতাকে বঞ্চিত

করা অতিশয় অধর্মের কাজ বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণরাম রমাবল্লভের অমতেই কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতাকে উলপুরে আনয়ন করিয়া নিজ বাড়িতে রাখেন। ইহাতে রমাবল্লভ অসন্তুষ্ট হইয়া উক্ত বালকদ্বয়কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে একদিন সন্ধ্যার সময়ে একখানি রামদাও হস্তে নিয়া নিজ বাড়ি হইতে কৃষ্ণরামের বাড়িতে আসিয়া যে গৃহে ঐ বালক দুটি থাকিত, তাহার মধ্যে দ্রুতবেগে প্রবেশ করিলেন। সে কালের ভয়ঙ্কর মশকের উপদ্রপ নিবারণের জন্য সন্ধ্যার সময়েই ঘরে বিছানা পাতিয়া মশারি টানান হইত। রমাবল্লভ দেখিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ের বিছানা পাতা আছে ; তিনি পাশ বালিশ দুইটিকে শায়িত বালক দুইজন মনে করিয়া তাহারই উপরে সজোরে রামদার দুই কোপ দিয়া ছুটিয়া নিজ বাড়িতে আসিলেন। বাটিস্থ সকলেই কি হইল কি হইল বলিয়া তুমুল কোলাহল করিয়া উঠিল। অদৃষ্টক্রমে রামজীবন ও রূপরাম তখন রান্নাঘরে ভাত খাইতেছিলেন। সে সময়ের নিয়মানুসারে ছোট ছোট বালক বালিকারা সন্ধ্যার সময়েই ভাত খাইয়া মশারির মধ্যে যাইত, নতুবা মশার জন্য টিকিতে পারিত না। ভগবানের অনুগ্রহে বালক দুইটির প্রাণ বাঁচিয়া গেল। কৃষ্ণরাম বহির্বাটিতে গোসাঞির দালানে ছিলেন ; গোলমাল শুনিয়া বাড়ির মধ্যে আসিয়া সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু রমাবল্লভ বড় ভাই, তাহার অসম্মানসূচক কিংবা অনিষ্টকর কোন কার্য করা কৃষ্ণরামের প্রবৃত্তিবিরুদ্ধ। তিনি তখন কোনরূপ উচ্চ বাচ্য না করিয়া, ঝি চাকর ও পরিবারস্থ লোকদিগকে সতত সতর্ক থাকিতে বলিলেন ; পরে অবসর মত মধ্য ভ্রাতাকে তাহার দুষ্প্রবৃত্তি হইতে বিরত হইবার জন্য নানারূপ বুঝাইলেন। রমাবল্লভও দেখিলেন যে তাহার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। ফলে তিনি শুধু অপযশের ভাগী হইয়াছেন। সুতরাং অবশেষে তিনি কৃষ্ণরামের প্রস্তাবানুযায়ী বৈমাত্র ভ্রাতাগণকে জমিদারির ভাগ দিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন কৃষ্ণরামের বাড়ির পুবে ও রামদেবের পুত্রগণের বাড়ির পশ্চিমে যে ভিটা ছিল উহা বাসের উপযোগী করিয়া তাহাতে রামজীবন ও রূপরামের বাসগৃহ করিয়া দেওয়া হয়। উহা উক্ত দুই বাড়ির মধ্যে বলিয়া 'মধ্যের বাড়ি' নামে পরিচিত। রূপরাম বড় হইয়া রামজীবনের সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় বর্তমান নূতন বাড়ি তাহাকে দেওয়া হয় ; এবং উহার পূর্বদিকে ষোল আনার ব্যয়ে পুষ্করিণী খনন কবিয়া তাহার মৃত্তিকা দ্বারা ঐ বাড়ি বাঁধাইয়া দেওয়া হয়। মূল পাঁচ বাড়ির মধ্যে এই বাড়িই সর্বশেষে প্রস্তুত বলিয়া ইহাকে 'নতুন বাড়ি' বলে। উহার পূর্বদিকের পুষ্করিণী ষোল আনার ব্যয়ে খনিত হইয়াছিল বলিয়া উহা ১৩২১ সাল পর্যন্ত এজমালি ছিল. ঐ সালে কালেক্টরি কর্তৃক জমিদারি বাটোয়ারাতে উহা নূতন বাড়ির শরিকগণের অংশে প্রদত্ত হইয়াছে।

৪৭। উলপুরের কালীবাড়ি

ইহার কিছুদিন পরে উলপুরের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ব্যাপার সংঘটিত হয়। যেখানে এখন কালীবাড়ি আছে সেইস্থানে পূর্বে নিবিড় অরণ্যময় একটি ছোট ছাড়া ভিটা ছিল ; তাহাতে কয়েকটি বট ও অশ্বত্থ গাছ ছিল , সেগুলি কতদিনের গাছ তাহা কেহ জানে না। বহু বড় বড় বিষধর সর্পে ঐস্থান পূর্ণ ছিল। বর্ষার সময়ে সমস্ত গ্রাম জলমগ্ন হইলেও ঐ ভিটা ডুবিত না। এই হেতু বর্ষাকালে এই গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা এই ভিটার প্রান্তে শবদাহ করিত। বৎসরের অন্য সময়েও কেহ কেহ এই স্থানে শবদাহ করিত। ইহা উলপুর গ্রামের পশ্চিম উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। ইহার পরই সুগভীর বিল ছিল। অনুমান ১১০০—১১১০ সালের মধ্যে রামানন্দ ভট্টাচার্য নামক একজন তান্ত্রিক ব্রহ্মচারী এই মহাশ্মশানে জঙ্গলের মধ্যে পঞ্চ মুণ্ডের উপর যথাশাস্ত্র কালীমাতার ঘটস্থাপন করিয়া নিত্য পূজা আরম্ভ করেন। এই ব্রহ্মচারী ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থানার অন্তঃপাতী কুমারনদেব তীরস্থিত উজিরপুর

গ্রামের অধিবাসী বৈদিক শ্রেণির ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া উলপুরে, এবং নিজ বাসস্থান উজিরপুর গ্রামে ও ফরিদপুর জেলা ভূষণা থানার অন্তঃপাতী কয়রা গ্রামে মহাশ্মশানে পঞ্চমুণ্ডের উপর কালীমাতার ঘট স্থাপন পূর্বক পূজা প্রবর্তন করেন। ইহার সম্বন্ধে আনন্দচন্দ্র রায় প্রণীত ফরিদপুরের ইতিহাস ২য় খণ্ডের ১৬০ পৃষ্ঠা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত হইল :

"ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত উজিরপুর কুমার নদীর তীরে সাতৈড় পরগণার অন্তর্গত একটি প্রধান স্থান। ২৫০ শত বৎসর পূর্বে বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশে রামানন্দ ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। দেবীর আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করায় তাহাকে সকলে দেবীবর বলিয়া সম্বোধন করিত। তৎপ্রতিষ্ঠিত শিব ও পঞ্চমুণ্ডের উপর সংস্থাপিত কালীমূর্তি অদ্যাপি মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। এই দেব দেবীর অর্চনার জন্য নাটোর ও চাঁচড়ার রাজগণ বহু ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন। ১১৬৬ সালে এই মন্দির স্থাপিত হয়। কুমার নদের পূর্বতীরে উজিরপুরের অব্যবহিত উত্তর দিকে দেবীবরের শ্মশানঘাট অদ্যাপি বর্তমান আছে। জনগণ অদ্যাপি তথায় ফুল ও মাল্য প্রদান করিয়া থাকে।"

এই ব্রহ্মচারীর পুত্র সন্তান ছিল না; দুই কন্যা ছিল। প্রথম কন্যার যশোহর জেলার অন্তর্গত বানা নিবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের সহিত এবং ২য় কন্যার কোটালিপাড়া নিবাসী রামসুন্দর ভট্টাচার্যের সহিত বিবাহ হয়। প্রথম কন্যার পুত্র নীলকণ্ঠ সার্বভৌম উলপুরের কালীমাতার সেবাপূজায় নিযুক্ত থাকেন, এবং দ্বিতীয় কন্যার সন্তানগণ উজিরপুরবাসী হইয়া উজিরপুর ও কয়রার কালীমন্দিরের সেবাপূজায় নিযুক্ত থাকেন। তাহাদের বংশধরগণ যথাক্রমে ঐ ঐ কার্যে নিযুক্ত আছেন।

উলপুরে নবাগত বসুচৌধুরিগণ ব্রহ্মচারীর আগমন ও কালীমাতার ঘটস্থাপন শুভ লক্ষণ মনে করিয়া ঐ পূজা যাহাতে নিত্য নিয়মিতরূপে চলিতে পারে তাহার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ব্রহ্মোত্তর জমি দান করিলেন, প্রতি অমাবস্যায় বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করিলেন এবং বসু বংশের কল্যাণে প্রতিদিন কালীবাড়িতে 'একরূপ' চণ্ডীপাঠেব ব্যবস্থা করিলেন। ইহা ছাড়া পরগণার প্রত্যেক গৃহস্থবাড়ি হইতে এক সের চাউল ও উলপুরের হাট হইতে তোলার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং দক্ষিণাস্বরূপ প্রতি মূল হিস্যা হইতে বার্ষিক নগদ টাকা দেওয়ার নিয়মও করিলেন। ক্রমে জমিদারগণের উদ্যোগে এই মন্দিরে মৃন্ময়ী কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মৃন্ময়ীমূর্তি বিবর্ণ হইয়া গেলে নূতন মূর্তি নির্মিত হয়। বর্তমান মূর্তি ৫ম মৃন্ময়ী মূর্তি।

১ম মৃন্ময়ী মূর্তির প্রস্তুতকারকের নাম অজ্ঞাত।

২য় মূর্তির প্রস্তুতকারক ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মল্লিকপুর নিবাসী মৃত্যুঞ্জয় দেউড়িদার।

৩য় মূর্তির প্রস্তুতকারক ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হাকিমপুর নিবাসী হারাণচন্দ্র দেউড়িদার।

৪র্থ মূর্তির প্রস্তুতকারক বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাউকাঠি নিবাসী দীননাথ গুণরাজ ওরফে দীনকুমার (১৩০০ সাল)।

এই মূর্তির দুইবার অঙ্গরাগ করা হয় ; অর্থাৎ রং মলিন হওয়াতে পুনরায় রং দেওয়া হয়।

৫ম মূর্তির প্রস্তুতকারক কৃষ্ণনগর নিবাসী আশুতোষ ভাস্কর (১৩৩৪—১৩৩৫ সাল)।

কালী মন্দির : প্রথমে খড়ের ঘরে কালীমন্দির ছিল। অনুমান ১২৭০ সালে রঘুনন্দন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রূপরাম রায়ের পৌত্র কীর্তিচন্দ্র রায়ের কন্যা, টাকির সুপ্রসিদ্ধ কালীনাথ মুন্সির পত্নী দয়াময়ী কালীবাড়িতে ইষ্টক নির্মিত মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। কিন্তু ২৫/৩০ বৎসর পরেই ঐ মন্দিরের জীর্ণ অবস্থা হইতে থাকে। তদ্দর্শনে সন ১৩১২ সালে উক্ত

রূপরামের বৃদ্ধপ্রপৌত্র যোগেন্দ্রনাথ রায় নিজ ব্যয়ে কালীবাড়ির জন্য ইষ্টকময় মন্দির পুনঃ নির্মাণ করিয়া দেন। ১৩১২ সালের ৩০শে চৈত্র তারিখে মহাসমারোহে ঐ নবনির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ষোড়শোপচারে কালীমাতার পূজা হইয়াছিল। ঐ দিন যোগেন্দ্রনাথ রায় নিজ ব্যয়ে কালীবাড়িতে গ্রাম্য সমস্ত ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতি কুটুম্বকে ভোজন করাইয়াছিলেন ; এবং এই গ্রামেরও অন্যান্য গ্রামের অনেকে কালীমাতাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়াছিলেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় তাহার কয়েকমাস পরে কালীমন্দিরে চোর প্রবেশ করিয়া সেই সকল অলঙ্কার চুরি করিয়া লইয়া যায়।

এই কালীবাড়ি অতি প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মচারী কর্তৃক ঘটস্থাপনাবধি এযাবতকাল এখানে নিয়মিতরূপে পূজা হইয়া আসিতেছে। বহুদূর হইতে অনেক লোক এখানে পূজা দিতে আসে। প্রতি পর্বোপলক্ষে স্থানীয় অধিবাসীগণ জগন্মাতার দর্শনে গমন করে এবং ভক্তিভরে নির্মাল্য গ্রহণ করে। প্রত্যহ বৈকালে দেবীর আরতি হয়। অনেকেই দেবীর পূজা ও ভোগের উপকরণাদি পাঠাইয়া থাকে। বিজয়া দশমীর দিন বিলে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন করিয়া সকলে প্রথমে এইখানে আসিয়া দেবীকে প্রণাম ও নির্মাল্য গ্রহণ করিয়া গৃহে গমন করেন।

৪৮। নবাব সরকার হইতে তলব

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে ১৭০১ খ্রিঃ অঃ (১১০৮ সালে) মুর্শিদকুলি খাঁ বঙ্গের দেওয়ান নিযুক্ত হন। তিনি রাজস্ব আদায়ের জন্য খুব কড়াকড়ি করিতে লাগিলেন। কোন জমিদার নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব প্রদান না করিলে তাহাকে মুর্শিদাবাদে ধরাইয়া নিয়া নজরবন্দি, বা কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইত এবং নানা প্রকারে নির্যাতন করা হইত। সৈয়দ রজিখাঁকে তিনি নায়েব (ডেপুটি) দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কথিত আছে জমিদারদিগকে পীড়ন করার জন্য রজি খাঁ মুর্শিদাবাদের একাংশ আবর্জনা দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহার নাম বৈকুণ্ঠ রাখিয়াছিলেন এবং কখন কখন রাজস্ব প্রদানে অশক্ত জমিদারকে ঐ বৈকুণ্ঠে আবদ্ধ রাখিতেন। তখন রেল স্টিমার বা সংবাদপত্র হয় নাই। যত উৎপীড়ন প্রকৃত প্রস্তাবে হইত মফঃস্বলে তাহার দশগুণ অত্যাচারের কথা প্রচারিত হইত। সুতরাং জমিদারগণ মুর্শিদাবাদ হইতে তলব হইলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেন। বসু চৌধুরিগণ উলপুরে আসিবার পরে জমিদারি নিয়মিত শাসনে আনিতে কয়েক বৎসর লাগিল। জমি অনুর্বর ও বিলময়, প্রজার সংখ্যাও কম। অনেক জমিই পতিত থাকিত। ইহা ছাড়া সীতারাম রায়ের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ১১১৯ সালে ভূষণার জমিদারি প্রবল প্রতাপশালী নাটোরের জমিদার রামজীবনের হস্তগত হয়। তাহার লোকজন তাহাদের সীমানাস্থিত সাহাপুর পরগণার অনেক জমি জোরপূর্বক বেদখল করে। তাহাতে অনেক বিবাদ বিসম্বাদ হয়। এই সব কারণে জমিদারি হইতে অল্প আয় হইত। নবাব সরকার হইতেও বছর বছর তেমন তাগিদ আসিত না। সে কারণে ১০/১২ বৎসর সাহাপুরের জমিদারগণ মোটেই রাজস্ব প্রদান করিতে পারেন নাই। উক্ত বাকি রাজস্ব এককালীন পরিশোধ করিবার সাধ্য জমিদারগণের ছিল না।

অনুমান সন ১১২২ সালে বাকি রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে সাহাপুরের জমিদারকে মুর্শিদাবাদে ধরিয়া নিবার জন্য নবাব সরকারের রাজস্ব আদায়কারী পদাতিক আহম্মদ কয়েকজন সিপাহি ও বরকন্দাজসহ উলপুরে উপস্থিত হয়। তাহাদের আগমনে ভীত হইয়া জমিদার পক্ষের কেহই প্রথমত তাহাদের নিকট যায় নাই। উলপুরে উপনিবিষ্ট ভ্রাতাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রমাবল্লভ সকলের স্বার্থ রক্ষার জন্য এইরূপ বিপজ্জনক কার্যে হাত দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং কৃষ্ণরাম বিষম চিন্তায় পতিত হইলেন। বসুবংশীয় সকলেই বুঝিলেন যতই বিপজ্জনক হউক জমিদার বংশের অন্ততপক্ষে একজনকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইতেই হইবে ; আর

মুর্শিদাবাদে যিনি যাইবেন তাহাকে নিশ্চিত নিতান্ত লাঞ্ছিত হইতে হইবে ; হয়ত তাহার প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিবার সাধ্যও হইবে না। ধার্মিক কৃষ্ণরাম বুঝিলেন নিজের তিনপুত্র বর্তমান থাকিতে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রদিগকে, কিম্বা কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণকে মুর্শিদাবাদে যাইতে বলা নিতান্ত স্বার্থপরতার কার্য। কৃষ্ণরামের জ্যেষ্ঠপুত্র রামরাম তাহারই মত ধর্মপরায়ণ ও শান্তিপ্রিয় ছিলেন। মধ্যম নন্দরামের বয়স তখন ১৭/১৮ বৎসর হইলেও, সেই অল্প বয়সেই নন্দরাম বুদ্ধিমত্তা, সাহস ও কার্যকুশলতার অনেক পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি পিতার চিন্তার কারণ বুঝিতে পারিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মুর্শিদাবাদে যাইতে চাহিলেন। কৃষ্ণরাম অগত্যা নন্দরামকেই মুর্শিদাবাদে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন এবং নবাবের প্রেরিত পদাতিক ও সিপাহিদিগকে উত্তম আহার্য ও অর্থাদির দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া জমিদারিব দুরবস্থার কথা বুঝাইয়া দিলেন। তাহারাও স্বচক্ষে দেশের অবস্থা দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহাদিগকে বুঝাইতে বিশেষ কষ্ট হইল না। কৃষ্ণবাম নবাবের পদাতিক আহম্মদের হাতে বালক নন্দরামকে দিয়া যাহাতে তাহার প্রতি পথিমধ্যে কিংবা মুর্শিদাবাদে কোন অত্যাচার না হয় তজ্জন্য তাহাকে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত করাইলেন।

নন্দরামকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইবার সময়ে বিশ্বস্ত মুসলমান প্রজা পশ্চিম নিজরা নিবাসী আছানুল্লা নাগার্চীকে (বাজাদার) তাহার সঙ্গে দেওয়া হয়। বহুদিন নানারূপ কষ্ট সহ্য করিয়া তাহারা পদব্রজে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। সেখানে উপস্থিত হইবা মাত্র তাহার অল্পবয়সদর্শনে অন্যরূপ অত্যাচারের আদেশ না হইয়া তাহার প্রতি নজরবন্দিভাবে থাকিবার আদেশ হইল, অর্থাৎ যে গৃহে তাহার বাসা হইল তাহার চতুঃসীমার মধ্যে তিনি আবদ্ধ থাকিলেন। বহুদিন এইভাবে গত হইল, কিন্তু নবাবসকাশে নন্দরামের ডাক হয় না; এদিকে আবশ্যকীয় খরচপত্রের অভাব হইয়া উঠিল। বালক নন্দরামও ঐভাবে দীর্ঘকাল বিদেশে থাকায় স্বীয় আত্মীয়-স্বজন সন্দর্শনের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এই অবস্থায় অনুচর আছানুল্লা একটি অসমসাহসিক কার্য করিয়া বসিল। নবাব গাড়ি চড়িয়া প্রত্যহ অপরাহ্নে বেড়াইতে বাহির হইতেন। আছানুল্লা একদিন ঐ গাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, কিছুতে পথ ছাড়িয়া দিল না। কোচম্যান নবাবকে এই কথা জানাইলে গাড়ির মধ্যে হইতে নবাব উক্ত ব্যক্তিকে চাবুকাঘাতে দূর করিতে আদেশ করিলেন। কোচম্যান বারংবার সজোরে কশাঘাত করিলে আছানুল্লা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। তখন কোচম্যান নবাবকে বলিল যে লোকটি মরিয়া গিয়াছে। নবাব গাড়ি হইতে বাহির হইয়া তাহার মাথায় ও মুখে জল দিতে বলিলেন। এইরূপ চেষ্টায় অল্পক্ষণ পরেই তাহার জ্ঞান হইলে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তাহাকে ঐরূপ অন্যায় কার্য করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে আনুপূর্বিক সমস্ত নিবেদন করিল এবং বলিল যে তাহার জমিদারেব বিচার অবিলম্বে না হইলে তাহারা দুইজনেই অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তখন নবাব নন্দরামকে তৎপরদিন দরবারে হাজির হইবার জন্য আদেশ দিলেন।

পরদিন নন্দরাম নবাব দরবারে হাজির হইলেন। অত অল্পবয়স্ক জমিদার দেখিয়া নবাবের মনও কিছু নরম হইল, বিশেষত বিগত সন্ধ্যার করুণ দৃশ্য তখনও তাহার অন্তরে অঙ্কিত ছিল। তিনি নন্দরামকে রাজস্ব অনাদায়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, নন্দরাম অতি নম্রভাবে জমিদারির দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিলেন, পার্শ্ববর্তী প্রবল নাটোরের জমিদারের লোকেরা সীমানা লইয়া অনবরত যেরূপ বিবাদ করিতেছিল তাহাও জানাইলেন, এবং দেশের অবস্থা সম্বন্ধে নবাবের বিশ্বস্ত পদাতিক আহম্মদকে সাক্ষী মানিলেন। আহম্মদ নবাবের নিকট সাহাপুর পরগণার দুরবস্থার সম্বন্ধে সমস্ত সত্য কথা প্রকাশ করিল। সমুদয় শুনিয়া নবাব বাকি রাজস্ব মাপ করিয়া নন্দরামকে সরকারি খরচে বাড়ি পাঠাইবার আদেশ দিলেন এবং ভবিষ্যতে নিয়মিতরূপে রাজস্ব দিতে বলিয়া দিলেন। নাটোরের জমিদার রামজীবনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা

নাটোর রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, তৎকালীন প্রধান কানুনগোর দেওয়ান, রঘুনন্দন নবাবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাহার লোকেরা যাহাতে সাহাপুরের সীমানা লইয়া বিবাদ না করে এবং যে জমি অন্যায়রূপে বেদখল করিয়াছে তাহা ছাড়িয়া দেয় তজ্জন্য নবাব তাহাকে বলিয়া দিলেন। অতঃপর নবাবের লোক সরকাবি খরচে নন্দরাম ও আছানুল্লাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিল।

নন্দরাম মুর্শিদাবাদ হইতে বাড়ি পৌঁছিলে তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতাগণ এবং স্থানীয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের আনন্দের পরিসীমা রহিল না; অনেকে বালক নন্দরামকে ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তৎপরদিন কৃষ্ণরাম নিজ বাটির দেবমন্দিরে ও কালী-বাড়িতে মহাসমারোহে পূজা অর্চনা করাইলেন। আছানুল্লা নাগার্চীর কৃতকার্যের পুরস্কার স্বরূপ কৃষ্ণরাম তাহাকে উপযুক্ত ভূমিদান করিলেন।

৪৯। কৃষ্ণরামের গুরুপ্রাপ্তি

এই ঘটনার সঙ্গে আর একটি বিস্ময়কর ঘটনার সম্পর্ক আছে। নন্দরাম মুর্শিদাবাদে রওনা হইবার কয়েকদিন পরে কোন কার্যোপলক্ষে প্রসিদ্ধ সিদ্ধপুরুষ সর্বানন্দ ঠাকুরেব বংশধর সেনহাটি নিবাসী সাধকপ্রবর রাঘবেন্দ্র কবিশেখর উলপুরের পথে অন্যত্র যাইতেছিলেন। তিনি উলপুরে বিশ্রাম করিতে মনন করিয়া কালীবাড়িতে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণরাম ঐ সংবাদ পাইয়া তাহাকে ভক্তি সহকাবে নিজগৃহে আনয়ন করিয়া তাহার যথোপযুক্ত সেবার ব্যবস্থা করিলেন। আহার ও বিশ্রামের পর তিনি সাধুকে নিজ বিপদের কথা জানাইলেন এবং নন্দরাম যাহাতে নিরাপদে বাড়ি ফিরিয়া আসিতে পারেন তজ্জন্য স্বস্ত্যয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। সাধু স্বীকৃত হইয়া স্বস্ত্যয়ন করিলেন। কৃষ্ণরাম সাধুর নিকট এই প্রতিশ্রুতি করিলেন যে যদি নন্দরাম নির্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তবে কৃষ্ণরাম তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। নন্দরামের প্রত্যাগমনের পর কৃষ্ণরাম লোক দ্বারা সাধুকে বাড়িতে আনয়ন করিয়া তাহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও পূর্ণাভিষিক্ত হন। তদবধি কৃষ্ণরামের বংশধরগণ সেনহাটি নিবাসী সর্ববিদ্যাবংশীয় ভট্টাচার্য মহাশয়ের শিষ্য।

৫০। নগর পত্তন

বসুচৌধুবিগণ যখন প্রথম উলপুরে বাস করিতে আরম্ভ কবেন তখন এই গামে মাত্র কয়েক ঘর নিম্নশ্রেণির লোকের বাস ছিল। ব্রাহ্মণ কায়স্থ মোটেই ছিল না, এবং ধোপা নাপিত প্রভৃতিরও বাস বিরল ছিল। নবাগত জমিদারগণ ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মোত্তর ও ভোগোত্তর জমি দান করিয়া কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ স্থাপিত করিলেন, প্রয়োজনানুরূপ রজক ও ক্ষৌরকার প্রভৃতি আনাইয়া তাহাদিগকে ভরণপোষণের জন্য চাকরাণ জমিদান করিলেন, এবং কয়েকঘর দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রেণির কায়স্থ আনিয়া তাহাদিগকে জমিজমা প্রদান করিলেন। এই পরগণায় সাধারণত নমঃশূদ্রগণই কৃষিজীবী ছিল। উলপুরে পূর্বে বেশি নমঃশূদ্রের বাস ছিল না; চৌধুরিগণ আসিয়া জমিজমা প্রদানে কয়েকঘর নমঃশূদ্র প্রজাকেও উলপুরে আনয়ন করিলেন। গ্রামের মধ্যে কোন মুসলমান প্রজা বসাইলেন না ; তবে আবশ্যকীয় কার্যের জন্য একঘর দাই আনিয়া বসাইলেন। তাহারা মুসলমান হইলেও অনেক বিষয়ে হিন্দুর আচাব ব্যবহার প্রতিপালন করিয়া থাকে। পার্শ্ববর্তী পশ্চিম নিজরা গ্রামে যে সকল মুসলমান প্রজা ছিল তাহাদের মধ্যে নাগার্চি শ্রেণির লোকেরা বাদ্যকর। তাহারা পূজা পার্বণ ও বিবাহাদি উপলক্ষে জমিদাব বাড়িতে বাজাইয়া থাকে ; তজ্জন্য তাহারা চাকরাণ জমি ভোগ করে। উলপুরে বাস আরম্ভ করিয়া জমিদারগণ গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে হাট বসাইলেন। এই হাটের কথা ১ম অধ্যায়, ১২শ প্রকরণে লিখিত হইয়াছে।

এই গ্রামের সন্নিকটে অন্য কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থের সমাজ নাই। ইত্না বাস কালে ইত্না,

মল্লিকপুর, লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া প্রভৃতি অঞ্চলের বহু কুলীন ও শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ রঘুনন্দনের ক্রিয়াকর্মে উপস্থিত থাকিতেন। তাহার সন্তানগণ উলপুর আসিয়া সেইসব স্থানে বহু ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছেন। তাহারা উলপুরের সামাজিক ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। উলপুরের জমিদারগণের যে কোন ক্রিয়াতে নিমন্ত্রিত হইলেই তাহারা আসিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত কোটালিপাড়ার বৈদিক শ্রেণির অনেক ব্রাহ্মণকেও ব্রহ্মোত্তর দেওয়া হয়।

৫১। বসুবংশীয়গণের গুরুবংশ

কৃষ্ণরাম যে ভাবে সিদ্ধ মহাপুরুষ সর্বানন্দ ঠাকুরের বংশধর রাঘবেন্দ্র কবিশেখরকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হন তাহা ৪৯শ প্রকরণে লিখিত হইয়াছে। রামদেবের বংশধরগণের গুরু যাদবপুর রেলস্টেশনেব নিকট কেরলগতি নিবাসী ভট্টাচার্যগণ। অপব তিন ভ্রাতার বংশধরগণের গুরু ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোড়কদি নিবাসী বারেন্দ্রশ্রেণির ভট্টাচার্যগণ।

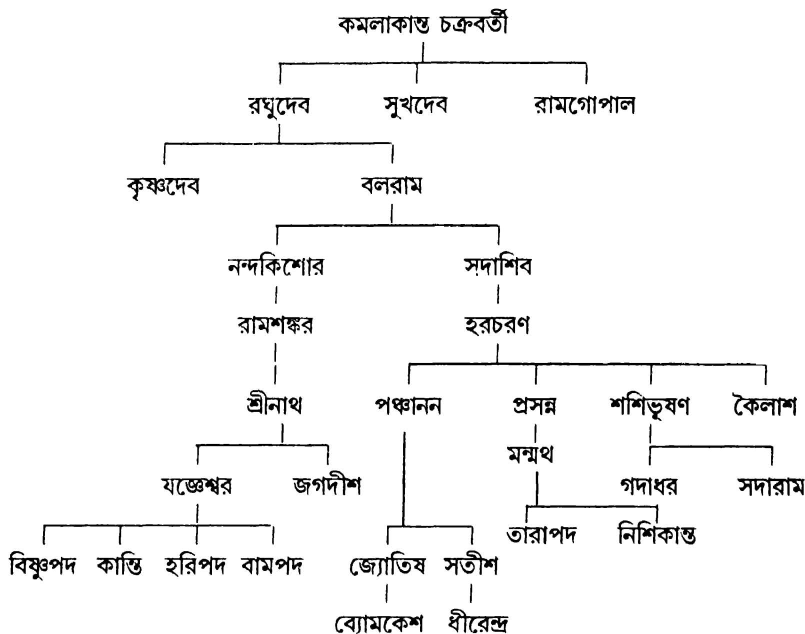
বসু চৌধুরিগণ যখন চন্দ্রদ্বীপ সমাজে বাস করিতেন তখন সেখানে তাহাদের গুরু ও পুরোহিত ছিল। যশোহর আগমনের সময়ে গোপাল বসু ঠাকুরের প্রৌঢ়াবস্থা ; তাহার যেরূপ ধর্মনিষ্ঠা ছিল তাহাতে মনে হয় তিনি যশোহরে আগমনের পূর্বেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবত তৎপুত্র রাজবল্লভ যশোহব সমাজে নতুন গুরু পুরোহিত প্রবর্তন করেন। যাদবেন্দ্র যশোহর সমাজ ছাড়িয়া ইত্‌নায় আসিবার পূর্বে দীক্ষা লইয়াছিলেন এরূপ সম্ভব কম। তখন যশোহর সমাজস্থ গুরুঠাকুরের ইত্‌নায় যাতায়াত করিতে ৫/৬ দিন লাগিত। পথে দস্যু তস্করেরও বিশেষ উপদ্রব ছিল। তদুপরি দেশে তখন অরাজকতা, এরূপ অবস্থায় এই দূরবর্তী দেশের গুরুঠাকুরের মধ্যে মধ্যে ইত্‌নায় আগমন আশা করা যাইত না। সুতরাং রঘুনন্দন ইত্‌নার মাতুল বংশের কুলগুরু কোড়কদির ভট্টাচার্য মহাশয়গণকে উপগুরুপদে বরণ করেন। রামদেব যশোহর সমাজস্থ কেরলগতির ভট্টাচার্য বংশীয় গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তদবধি তাহার বংশধরগণ সেই বংশীয় ভট্টাচার্যগণের নিকটই দীক্ষিত হইয়া আসিতেছেন।

কোড়কদির ভট্টাচার্যগণ ময়ূবভট্টের সন্তান। ইহাদের পূর্বপুরুষ রামচন্দ্র ভট্টাচার্য মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত সাঁইকুল গ্রাম হইতে আসিয়া কোড়কদি গ্রামে বাস করিতে থাকেন। কোড়কদির ভট্টাচার্যগণ সিদ্ধপুরুষের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত। রামধন তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা সিদ্ধপুরুষের বংশধর এবং সাধনায় এবং পাণ্ডিত্যেও অগ্রণী ছিলেন। ইহাদের ক্রিয়াকলাপ ও আচার ব্যবহারের গুণে রঘুনন্দনের অপর তিন পুত্রের বংশধরগণ এই ভট্টাচার্যগণের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তদবধি উলপুরের জমিদাবগণের এই তিন বিভিন্ন গুরুবংশ প্রচলিত হইয়াছে।

৫২। পুরোহিত

হিন্দুর গৃহে পুরোহিতের কার্য প্রায়ই আছে। চন্দ্রদ্বীপ বা যশোহর সমাজস্থ পুরোহিত দ্বারা ইত্‌নায় কোন ক্রিয়াকর্ম চলিতে পারে না ইহা উপলব্ধি করিয়া রঘুনন্দন মাতুলবংশের পুরোহিত সিদ্ধশ্রোত্রিয় কাশ্যপগোত্রীয় ইত্‌নার চক্রবর্তীগণকে পুরোহিত পদে বরণ করেন। তাহার সন্তানগণ উলপুরে বাস স্থাপন করিলে ইত্‌নার চক্রবর্তীগণ এখানে বাসা করিয়া থাকিয়া বসুবংশের যাবতীয় পৌরোহিত্য কার্য করিতে সম্মত হওয়ায় তাহারাই তাহাদের পুরোহিত থাকেন। জমিদারগণ তাহাদিগকে উপযুক্ত ব্রহ্মোত্তর দান করেন। প্রথমাবধি তাহারা উলপুরে বাসা করিয়া থাকিয়া যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। যে কারণে কিছুদিন পরে রমাবল্লভ রায়েব পুরোহিত পৃথক হয় তাহা ৫৪শ প্রকরণে লিখিত হইয়াছে। তাহার বংশধরগণের বর্তমান পুরোহিত কোটালিপাড়ার বৈদিক শ্রেণির ব্রাহ্মণ। অপর চারি বাড়ির

পুরোহিত ইত্‌নার চক্রবর্তীগণ। রঘুনন্দন রায়ের পুরোহিত রঘুদেব চক্রবর্তীর বংশবল্লী নিম্নে প্রদত্ত হইল।



৫৩। জমিদারি বিভাগ

নন্দরামের মুর্শিদাবাদ প্রত্যাগমনের পর সকল শরিকগণই জমিদারি রীতিমত বিভাগের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। প্রথমত শরিকগণের অংশ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে কিছু কিছু জ্যেষ্ঠোত্তর দিবার ব্যবস্থা হইয়া নিম্নলিখিতরূপে অংশ স্থির হয় :

জ্যেষ্ঠ রামদেবের পুত্রগণ	—	সাড়ে তিন আনা
মধ্যম রমাবল্লভ	—	সওয়া তিন আনা
তৃতীয় কৃষ্ণরাম	—	সওয়া তিন আনা
চতুর্থ রামজীবন	—	তিন আনা
পঞ্চম রূপরাম	—	তিন আনা

তদবধি এই পাঁচ হিস্যা যথাক্রমে সাড়ে তিন আনী, বড় সওয়া তিন আনী, ছোট সওয়া তিন আনী, বড় তিন আনী ও ছোট তিন আনী হিস্যা নামে প্রসিদ্ধ।

তৎপর পরগণার জমি এই পাঁচ হিস্যার অংশ অনুসারে বিভাগের ভার নন্দরামের উপর অর্পিত হইল। নন্দরামের বয়স তখন বেশি না হইলেও সকলেই তাহার বিষয়বুদ্ধি, কষ্টসহিষ্ণুতা ও সুবিবেচনার পরিচয় পাইয়াছিলেন। তখন এই বিলময় পরগণা রীতিমত জরিপ করিয়া জমির ভালমন্দ বিবেচনায় শরিকগণের অংশানুযায়ী বিভাগ করা সহজ সাধ্য ছিল না। সকলের আগ্রহ দেখিয়া নন্দরাম এই শ্রমসাধ্য কার্যের ভার গ্রহণ করিলেন। আমিনের সাহায্যে

পরগণায় সমস্ত গ্রামের জমি জরিপপূর্বক বাটোয়ারা করিতে অনেক পরিশ্রম ও কালবিলম্ব হইয়াছিল। ১১২৩ সালে জরিপ আরম্ভ হইয়া ১১২৯ সালে শেষ চিঠা প্রস্তুত হয়। ১১২৩ সাল হইতে ১১২৫ সাল পর্যন্ত শুধু জরিপের কার্য চলে ; তৎপর ১১২৬ হইতে ১১২৯ সালের মধ্যে সমস্ত গ্রামের জমি বাটোয়ারা হইয়া প্রত্যেক গ্রামের চিঠা প্রস্তুত হয়। তাহাকে ষোল আনার চিঠা বলে। উলপুর মৌজার চিঠা সর্বশেষ ১১২৯ সালে প্রস্তুত হয় এবং নিজরা মৌজার চিঠা ১১২৬ সালে ও অন্যান্য মৌজার চিঠা ইহার মধ্যে প্রস্তুত হয়। পরগণার সর্ব পূর্ব-উত্তর প্রান্তে ডোমরাসুর, কলাকোপা, মাঝকান্দি, ডুমুরিয়া, তেলিভিটা, পাইটখালবাড়ি প্রভৃতি কয়েকটি মৌজা একেবারেই জলমগ্ন থাকিত। বৎসরে ২/১ মাস বিলের প্রান্তভাগে কিছু কিছু জমি উঠিত ; তাহাও কোন নির্দিষ্ট প্রজাতে আবাদ করিত না। ঐ সব স্থান উলপুর হইতে প্রায় এক প্রহরের পথ। উহা বিভাগ করা অসুবিধাজনক বিধায় তাহা তখন বিভাগ করা হয় না ; বাকি সমস্ত মৌজার জমি বাটোয়ারা হইয়া চিঠা প্রস্তুত হইল। এই বিভাগ কালে বয়োজ্যেষ্ঠ ও পরাক্রমশালী রমাবল্লভ নিজ ইচ্ছামত জমি নিজ ভাগে বাছিয়া নেন। ১ম অধ্যায়ের ১২শ প্রকরণে উক্ত হইয়াছে উলপুরের গ্রামে কেবল ৪টি স্থান এজমালি থাকে। করপাড়ার হাটের স্থানও এজমালি রাখা হয়।

ষোল আনার চিটা হইবার অল্পকাল পরে প্রত্যেক মূল হিস্যার শরিকগণের মধ্যে সে হিস্যার অংশগত জমি বাটোয়ারা হয়। ঐ বাটোয়ারার চিঠাকে প্রত্যেক মূল হিস্যার নিজের চিঠা বলে। কৃষ্ণরামের ৩ পুত্র, রামরাম, নন্দরাম ও হরিরাম। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে জমিদারি বণ্টন সময়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে জ্যেষ্ঠোত্তর স্বরূপে দুই কড়া অংশ বেশি দেওয়া হয়, এবং তিন ভ্রাতার অংশ নিম্নলিখিতরূপে নির্দিষ্ট হয় : রাম রাম/২, নন্দরাম/১৷৷ ও হরিরাম/১৷৷ মোট সওয়া তিন আনা। মূল ৫ হিস্যার অন্য কোন হিস্যার শরিকগণ মধ্যে জমিদারি বণ্টন সময়ে কোন জ্যেষ্ঠোত্তর দেওয়া হয় নাই। তৎকালীন নিয়ম ও বিশ্বাস অনুসারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মানার্থে তাহাকে কিয়দংশ জ্যেষ্ঠোত্তর হিসাবে বেশি দেওয়ার প্রথা ছিল। কৃষ্ণরাম রায়ের বাড়িতে সেই প্রথা রক্ষিত হইয়াছিল।

৫৪। পৌনে তের আনি মহল

জমিদারি বণ্টন সম্পর্কে রমাবল্লভ রায় তাহার অংশে নিজের ইচ্ছামত অপেক্ষাকৃত ভাল ভাল স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া তিনি অন্য উপায়ে কিছু অতিরিক্ত সম্পত্তি অধিকাব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ঢাকার মিরজা হায়দার নামে একজন মুসলমান জমিদার তালিবাবাদ পরগণার মালিক ছিলেন। তাহার সেরেস্তায় রমাবল্লভের দৌহিত্র উলপুর নিবাসী শম্ভুচন্দ্র গুহ চাকুরি করিতেন। তালিবাবাদ পরগণা সাহাপুর পরগণার সংলগ্ন নহে। তথাপি দৌহিত্রের সহায়তায় রমাবল্লভ উক্ত মিরজা হায়দারের নিকট হইতে পূর্ববর্ণিত সাহাপুর পরগণার অবিভক্ত বিলময় ডোমরাসুর প্রভৃতি মৌজা সমূহ তালিবাবাদ পরগণার সামিল উল্লেখে তামার পাতে পাট্টা লইয়া আসেন। তৎপর রমাবল্লভ একক ঐ সমগ্র বিল প্রদেশ দখল করিবার চেষ্টা করিলেন, এবং অন্যান্য শরিকগণকে বেদখল করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণরামও বৃদ্ধ হইয়াছেন ; তাহার পুত্রেরা সকলে উপযুক্ত ; রামদেবের পুত্রেরা ভাল ভাল স্থান না পাইয়া প্রথম হইতেই মনে মনে রমাবল্লভের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন ; রামজীবন ও রূপরাম তাহাদের জীবননাশের জন্য রমাবল্লভের চেষ্টার কথা স্মরণ করিয়া তাহার প্রতি নিতান্ত অপ্রিয়ভাব পোষণ করিতেন। এখন রমাবল্লভের বৃদ্ধ বয়সে তাহার এই অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া অপর সকল শরিক তাহার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তাহারা সকলে একতাবদ্ধ হইয়া স্থির করিলেন যে রমাবল্লভকে কিছুতেই তাহার অসদভিপ্রায় পূর্ণ

করিতে দিবেন না। ফলে একদিকে রমাবল্লভ ও অপরদিকে অপর চারি হিস্যার মালিকগণ, এই উভয় পক্ষে বিষম শত্রুতা, বিবাদ ও দাঙ্গা আরম্ভ হইল। কিছুদিন পরে রমাবল্লভ উক্ত বিল মহল হইতে সম্পূর্ণরূপে বেদখল হইলেন ; অপর চারি শরিক তাহার অন্যায়াচরণের প্রতিফলস্বরূপ তাহাকে ঐ মহলে কোন অংশই দিতে রাজি হইলেন না। সুতরাং বিবাদ ঘনীভূত হইয়া উলপুর গ্রামেই মারামারি দাঙ্গা প্রভৃতি হইতে লাগিল। চারি শরিক রমাবল্লভের চলাফেরার রাস্তাঘাট প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিলেন ; ষোল আনার পুরোহিতকে তাহার যাজনিক কার্য করিতে দিলেন না এবং তাহার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক বন্ধ করিলেন। তদবধি এই বিল মহল বড় সওয়া তিন পাই ভিন্ন অন্য চারি হিস্যার (পৌনে ১৩ আনির) মালিকগণের অধিকারে রহিল, এবং পৌনে তের আনি মহাল বলিয়া পরিচিত হইল। রমাবল্লভ পৃথক পুরোহিত বরণ করিলেন এবং অপর শরিকগণের দ্বারা পর্যুদস্ত হইয়াও নিজের দার্ঢ্য ত্যাগ করিলেন না। তিনি ঐ মহালের অংশ প্রাপ্তির জন্য আদালতে মামলা মোকদ্দমা করিলেন। কিন্তু তাহাতে ফল পাইলেন না। তখন রমাবল্লভকে অগত্যা নিরস্ত হইতে হইল। বিগত ১৩২১ সালে কালেক্টর কর্তৃক জমিদারি বাটোয়ারার সময় ঐ মহালও সকল শরিকের মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় পূর্বোক্ত ইতর বিশেষ দূর হইয়াছে।

৫৫। রমাবল্লভের অন্যান্য কার্য ও চরিত্র

রমাবল্লভের চরিত্রে অনেক সদ্ গুণ ছিল। তিনি তেজস্বী, স্থিরবুদ্ধি, দৃঢ়সঙ্কল্প, সদ্ব্যয়ী, দানশীল ও আশ্রিতবৎসল ছিলেন। তিনি জমিদারি কার্যে বিচক্ষণ ছিলেন, এবং তৎকালীন জমিদারি শাসনের উপযুক্ত জমিদার ছিলেন। যদি সাহাপুর পরগণা তাহার একার জমিদারি হইত তবে খুব সম্ভবত তিনি অনেক কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহার অত্যাধিক আত্মপ্রেম ও বিত্তলোভ তাহাকে সেইরূপ কীর্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। তিনি স্বধর্মে আস্থাবান ছিলেন, এবং নিজ বাড়িতে শালগ্রাম ও অন্যান্য বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া তাহার নিত্য সেবাপূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি মহাসমারোহে প্রতি বৎসর জন্মাষ্টমী, দোল, দেউল, দুর্গাপূজা প্রভৃতি করিতেন। তাহার বংশধরগণ সেইসব পূজা অর্চনা রক্ষা করিয়াছেন।

রমাবল্লভের এক পুত্র রামনারায়ণ ও এক কন্যা ছিল। রমাবল্লভ টাকীর নিকটস্থ মালঙ্গপাড়া নিবাসী কুলীন রামদেব গুহের নিকট উক্ত কন্যা সম্প্রদান করিয়া কন্যা ও জামাতাকে নিজ বাটির দক্ষিণে একখানি বসত বাটি এবং তেঁতুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে অনেক জমি মহাত্রাণ দিয়া উলপুরে স্থাপিত করেন। উক্ত রামদেব গুহের বংশধরগণ বর্তমানে সেই বাটিতেই বাস করিতেছেন।

৫৬। রামদেবের পুত্রগণ

রামদেব বসু ঠাকুরের জীবনী ও চরিত্র সম্বন্ধে পূর্বে লিখিত হইয়াছে। তাহারা সাত পুত্র. — (১) রামচন্দ্র, (২) রামগোপাল, (৩) শ্যামসুন্দর, (৪) জয়দেব, (৫) বিষ্ণুরাম, (৬) রাজেন্দ্র ও (৭) বিনোদরাম। ইহারা সকলেই পিতার অনেক গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। বিনয়, ধর্মনিষ্ঠা, তেজস্বিতা, সৎকার্যপরায়ণতা প্রভৃতি নানাগুণে ইহারা ভূষিত ছিলেন। পিতা রামদেব উলপুরে আসেন নাই ; খুল্লতাত কৃষ্ণরাম ইহাদিগকে যত্ন করিয়া উলপুরে আনিয়াছিলেন। এজন্য ইহারা কৃষ্ণরামকে যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। ইহারাও নিজ বাটিতে দেবালয় স্থাপন করিয়া তাহাতে শালগ্রাম ও অন্যান্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার নিত্য সেবা পূজার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং সমারোহের সঙ্গে জন্মাষ্টমী, দোল, দেউল, দুর্গোৎসব ও কালীপূজা প্রভৃতি করিতেন। ইহাদের বংশধরগণ এই সমস্ত পূজা অর্চনা ও দেবসেবা নিয়মিতরূপে চালাইতেছেন।

৫৭। রামজীবন ও রূপরাম

ইহারা বাল্যে পিতৃহীন হন। কৃষ্ণরাম এই দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনি অনেকদিন ইহাদিগকে নিজ গৃহে একান্তে রাখিয়া সযত্নে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি ইহাদিগকে নিজ সন্নিকটে রাখিতেন। রামজীবন ও রূপরাম কৃষ্ণরামের প্রতি কৃতজ্ঞ ও ভক্তিমান ছিলেন। রামজীবন বড় হইয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কৃষ্ণরামের পুত্রগণকে খাটিয়াগড় গ্রামের নিজ অংশে প্রাপ্ত জমি হইতে প্রায় ২৫ বিঘা জমি নাম মাত্র কর লিখিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে নিষ্কর তালুক প্রদান করেন। কনিষ্ঠ রূপরামকে প্রবল শরিকগণ কোন জমি হইতে বেদখল করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে কৃষ্ণরামের উপদেশ অনুসারে আপোষ বাটোয়ারার সময়ে রূপরামের অংশগত জমিসমূহ কৃষ্ণরামের প্রাপ্ত জমির পাশে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। রূপরাম কৃষ্ণরামের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার চিহ্ন স্বরূপ তাহার অংশগত দেউলপূজার মাঠে কৃষ্ণরামের দেউল পূজার স্থান দেন এবং কৃষ্ণরামের পাট ঐ দেউল খোলায় আসিলে পর রূপরামের পাট খোলায় আসিবার নিয়ম করে। তদবধি অদ্য পর্যন্ত এই নিয়মে ছোট ৩ আনীর পাটখোলার স্থান ছোট সওয়া ৩ আনীর পাট খোলা বর্তমান আছে ; এবং অগ্রে ছোট সওয়া ৩ আনী পাট খোলায় গেলে তৎপর ছোট ৩ আনীর পাট খোলায় যায়।

রামজীবন ধর্মকর্মে ও সামাজিক নানা সৎকার্যে উৎসাহী ছিলেন। তিনি অনেক কুলক্রিয়া করিয়াছেন ; এবং উলপুরে স্থাপিত ঘোষ বংশীয়দিগকে অনেক জমি মহাত্রাণ দিয়াছেন।

রূপরাম তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাহার ধর্ম-কর্মে বিশেষ আগ্রহ ছিল ; এবং সামাজিক কাজেও তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন। তিনিও উলপুরে স্থাপিত কুলীনগণকে অনেক জমি মহাত্রাণ দিয়াছিলেন।

রামজীবন ও রূপরাম উভয়েই জ্যেষ্ঠদিগের মত নিজ নিজ বাড়িতে দেবালয় স্থাপন কবিয়া তাহাতে শালগ্রাম ও অন্যান্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য সেবা পূজার ব্যবস্থা করেন ; এবং মহাসমারোহে জন্মাষ্টমী, দোল, দেউল, দুর্গোৎসব ও কালীপূজা প্রভৃতি করিতেন। তাহাদের বংশধরগণ সেই সব ধর্ম কর্ম ও পূজা অর্চনা রক্ষা করিয়াছেন। সম্প্রতি রূপরামের সুযোগ্য বংশধর নিশিকান্ত রায়চৌধুরি নিজ ব্যয়ে নতুন বাড়ির গোসাঞিঘর ইষ্টক নির্মিত করিয়া দিয়াছেন। রামজীবনের দুই পুত্র · রামপ্রসাদ ও রামভদ্র। রূপরামের চারিপুত্র : রামশঙ্কর, শিবনারায়ণ. রুদ্রনারায়ণ ও গঙ্গানারায়ণ।

৫৮। কৃষ্ণরাম রায়

কৃষ্ণরাম গোপাল বসু ঠাকুরের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। তিনি সেই সর্বজনবন্দনীয় পূর্বপুরুষের প্রগাঢ় ধর্মনিষ্ঠা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহস্থ জীবনে, বিশেষত বিষয়ী পক্ষে, এরূপ নিরবচ্ছিন্ন ধর্মপথে থাকিয়া ধর্মের সহিত কর্মের সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবন যাপন করা অত্যন্ত কঠিন। তিনি বুদ্ধিমান ও বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন ; কিন্তু বিষয়বুদ্ধি কিংবা স্বার্থসিদ্ধির প্রবৃত্তি তাহাকে একদিনের জন্যও ধর্মপথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। কৃষ্ণরাম একটু উদাসীন থাকিলে বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ পিতৃসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইত ; ঐ অপকর্মের দোষ সমস্তই রমাবল্লভের স্কন্ধে পতিত হইত ; অথচ বৈষয়িক হিসাবে লাভ রমাবল্লভের ও তাহার সমানই হইত ; কিন্তু অধর্মের সংস্রবে থাকিয়া ঐরূপ লাভবান হওয়া কৃষ্ণরাম নিতান্ত হেয় ও অপকর্ম মনে করিতেন। তৎপরিবর্তে তিনি উৎপীড়িত দুর্বল বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণকে রক্ষা করা ও সস্নেহে প্রতিপালিত করিয়া তাহাদের পিতৃসম্পত্তি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া আজীবন তাহাদের তত্ত্বাবধান ও সহায়তা করা পরম কর্তব্য জ্ঞান করিয়াছিলেন।

তাহার দ্বিতীয় পরীক্ষা অতি স্নেহের পুত্র বালক নন্দরামকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করা। জমিদারিতে সকল শরিকেরই সমান স্বার্থ। হিন্দু পরিবারের নিয়ম অনুসারে তিনি কর্তা ছিলেন না। যাহা জ্যেষ্ঠের কর্তব্য তাহা তিনি ন্যায় ও ধর্মের অনুরোধে নিজের স্কন্ধে নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কার্যগতিকে উলপুরের জমিদারগণের নেতৃত্ব তাহার উপর পড়িয়াছিল। তিনি সেই কর্তব্য পালন করিতে নিজের বালক পুত্রকে তৎকালীন যমপুরীতুল্য মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম পালন করিয়াছিলেন। তাই ধর্ম তাহাকে এই মহাবিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন।

জমিদারি আপোষ বণ্টনকালে রমাবল্লভ নিজের পছন্দমত স্থান সমূহ বাছিয়া নিয়াছিলেন। অন্য সমস্ত শরিকগণ কৃষ্ণরামের উপরই নির্ভব করিয়াছিলেন ; তাহারই পুত্র নন্দরামের দ্বারা জমিদারি বণ্টন হইয়াছিল। কৃষ্ণরামের হৃদয়ে স্বার্থপরতা কিংবা অধর্মভাব থাকিলে তিনি অতি সহজেই নিজ অংশে অধিক জমি নিতে পারিতেন। ঐরূপ কোন প্রবৃত্তি কখনও তাহার মনে উদয় হয় নাই। কালেক্টরী কর্তৃক বাটোয়ারা কালেও দেখা গিয়াছে তাহার বংশধরগণের অংশে কোন অতিরিক্ত জমির দখল ছিল না।

তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি সম্মান ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের প্রতি স্নেহ ও যত্ন অতুলনীয় ; দুই শতাধিক বর্ষ পরেও তাহার চরিত্রের কোমলতা ও হৃদয়ের প্রশস্ততা স্মরণ করিয়া চিত্ত পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠে।

উলপুরে নিজের বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া তিনি বাটিতে শালগ্রামশিলা, সুদর্শন চক্র ও অন্যান্য বহু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নিজে আজীবন খড়ের ঘরে বাস করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তিনি নিজ দেবমন্দির ইষ্টক নির্মিত করেন। তাহার নির্মিত গোসাঞিদালান এখনও বর্তমান আছে। এই দালানই উলপুর গ্রামের প্রথম ইষ্টকালয়, তজ্জন্য তাহার বাটি কোঠাবাড়ি নামে পরিচিত। তাহার এই ধর্মনিষ্ঠার কথা শ্রবণ করিয়া তাহার মাতুল শ্বশুর সুপ্রসিদ্ধ লালা কীর্তিনারায়ণ বসু অষ্টধাতু নির্মিত লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ এবং বহুদূর দেশ হইতে আহরিত কয়েকখানি শালগ্রাম শিলা তাহাকে উপহার দেন ; কৃষ্ণরাম ঐ সমস্ত বিগ্রহ যথারীতি অভিষেক করিয়া নিজ দেব মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন ও প্রতিষ্ঠিত সমস্ত বিগ্রহের পৃথক পৃথক নিত্য সেবা ও পূজার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। তিনি তজ্জন্য পূজারিকে উপযুক্ত পরিমাণে জমি প্রদান করেন ও বিগ্রহগণের সেবাপূজা নির্বাহের জন্য বার্ষিক অন্যূন চারিশত টাকা আয়ের সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া রাখেন। এতদ্ব্যতীত তিনি জন্মাষ্টমী, দোল, দেউল, দুর্গোৎসব, কালীপূজা, মনসা পূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন। তাহার ব্যবস্থা অনুযায়ী সমস্ত দেব-কার্য অদ্যাপি পরিচালিত হইতেছে।

সেই সময়ে উলপুর এবং পার্শ্ববর্তী বহুগ্রামে কোন চিকিৎসক ছিল না। কৃষ্ণরাম একজন অভিজ্ঞ কবিরাজকে বিদেশ হইতে আনিয়া অনেক জমি দিয়া গৃহচিকিৎসকরূপে উলপুরে স্থাপিত করেন। তাহার সেই ব্যবস্থা এখনও চলিয়া আসিতেছে।

তিনি তাহার মধ্যম পুত্রের এক কন্যাকে প্রসিদ্ধ কুলীন পুঁড়াগ্রাম নিবাসী রাজবল্লভ গুহের পৌত্র পঞ্চানন গুহের সঙ্গে বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে বসতবাড়ি ও বৌলতলী প্রভৃতি স্থানে বহু মহাত্রাণ জমিদান করিয়া স্থাপিত করেন। তাহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি সেই বাটিতে বাস করিতেছেন।

কৃষ্ণরাম ইত্না্র সম্পর্ক বিস্মৃত হন নাই। ইত্নার রাহা রায় বংশ কুলীন না হইলেও তিনি পিতা ও পিতামহের ঋণ স্মরণ করিয়া পিতার মামাত ভ্রাতা পুত্র রামদেব রাহা রায়কে ইত্না হইতে উলপুরে আনিয়া পূর্বোক্ত পঞ্চানন গুহের বাড়ির পূর্বাংশে স্থাপিত করেন এবং

তাহাকেও যথোপযুক্ত জমি মহাত্রাণ দেন। তাহার বংশীয় ক্ষীরোদনাথ রায় গোপালগঞ্জে মোক্তার ছিলেন। তাহার এক পুত্র জীবিত আছে।

রঘুনন্দন সাহাপুর পরগণা বাকলা সরকারের অন্তর্গত করিয়া নবাব সেরেস্তায় লেখাইয়া এই স্থানকে বাকলা (চন্দ্রদ্বীপ) সমাজভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এযাবত উলপুরে যত কুলীন স্থাপিত হইল সমস্তই যশোহর সমাজ হইতে আনীত এবং বিবাহাদি সমস্তই যশোহর সমাজে হইতেছিল। চন্দ্রদ্বীপ সমাজের সহিত কোনরূপ সম্পর্কই স্থাপিত হইল না। ইহা দেখিয়া পিতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য কৃষ্ণরাম চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় রাজা জগদানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র রাজবল্লভের এক প্রপৌত্রকে আনিয়া নিজ অংশে প্রাপ্তস্থানে বাসস্থান দিয়া উলপুরে স্থাপিত করেন। রাজবংশধর বলিয়া তাহারাও রাজোপাধি ব্যবহার করিতেন। সেই হেতু তাহারা যে বাড়িতে বাস করিতেন তাহাকে এখনও 'রাজাবাড়ি' বলে। ২/৩ পুরুষ পরে তাহার বংশধরগণ বৈবাহিক সূত্রে উলপুর ছাড়িয়া ইত্না গ্রামে বাস করেন। উলপুরে এই বংশের স্থাপনের পর হইতে চন্দ্রদ্বীপ সমাজের কুলীনগণের সহিত উলপুরের বসু চৌধুরিগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ আরম্ভ হয়।

বিভিন্ন শরিকগণ উলপুরে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহারা সকলেই বারেন্দ্র শ্রেণির ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণরাম বহুদূর হইতে শ্রোত্রীয় সদাচারী সমাজদার বংশীয় একঘর এবং বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় চক্রবর্তী উপাধিধারী আর এক ঘর রাঢ়ীর শ্রেণির ব্রাহ্মণ আনিয়া উলপুরে স্থাপিত করিয়া তাহাদের বাসের জন্য বাড়ি, ও উপজীবিকার জন্য ব্রহ্মোত্তর জমি প্রদান করেন।

কৃষ্ণরাম সামাজিক, বিনয়ী, স্বজনবৎসল, পরোপকারী, সদাশয় ও নিরহঙ্কার ছিলেন। গ্রামের ও প্রজাপুঞ্জের অভাব অভিযোগের প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, প্রজাও অন্যান্য সকলের প্রতি তিনি সতত মধুর ব্যবহার করিতেন। উলপুরের প্রান্তস্থিত শ্মশানক্ষেত্রে কালীমন্দির স্থাপিত হওয়ায় অনেক লোকের শবদাহের অসুবিধা হইল। এদেশে তখন শীত ও গ্রীষ্মকালে দারুণ জলকষ্ট হইত। এই সকল লক্ষ্য করিয়া কালীবাড়ির পশ্চিমে নিজ অংশে প্রাপ্ত স্থানে তিনি এক সুগভীর দীর্ঘিকা খনন করেন। তাহা এখনও কৃষ্ণরাম রায়ের দিঘি নামে পরিচিত। তিনি দিঘির মৃত্তিকা সমস্তই প্রায় পশ্চিম পাড়ে ফেলিয়া ঐ পাড় এত উচ্চ করিলেন যে বড় বরষার সময়েও তাহা জলমগ্ন হইত না। সেই সময় হইতে উলপুর ও নিকটবর্তী স্থানের লোকের শবদাহের স্থানের অভাব দূর হইল। তাহারা বর্ষাকালে দিঘির ঐ উচ্চ পাড়ের প্রান্তে শবদাহ করিত। দুঃখের বিষয় তাহার উত্তরপুরুষগণ নিজ নিজ বাটি বান্ধিবার জন্য ঐ পাড় হইতে মাটি কাটিয়া নিয়া কৃষ্ণরামের ঐ কীর্তি প্রায় লোপ করিয়াছেন; এখন যে সামান্য উচ্চ স্থান আছে তাহা রক্ষা করা তাহাদের অবশ্য কর্তব্য পুণ্য কর্ম বলিয়া মনে করা উচিত।

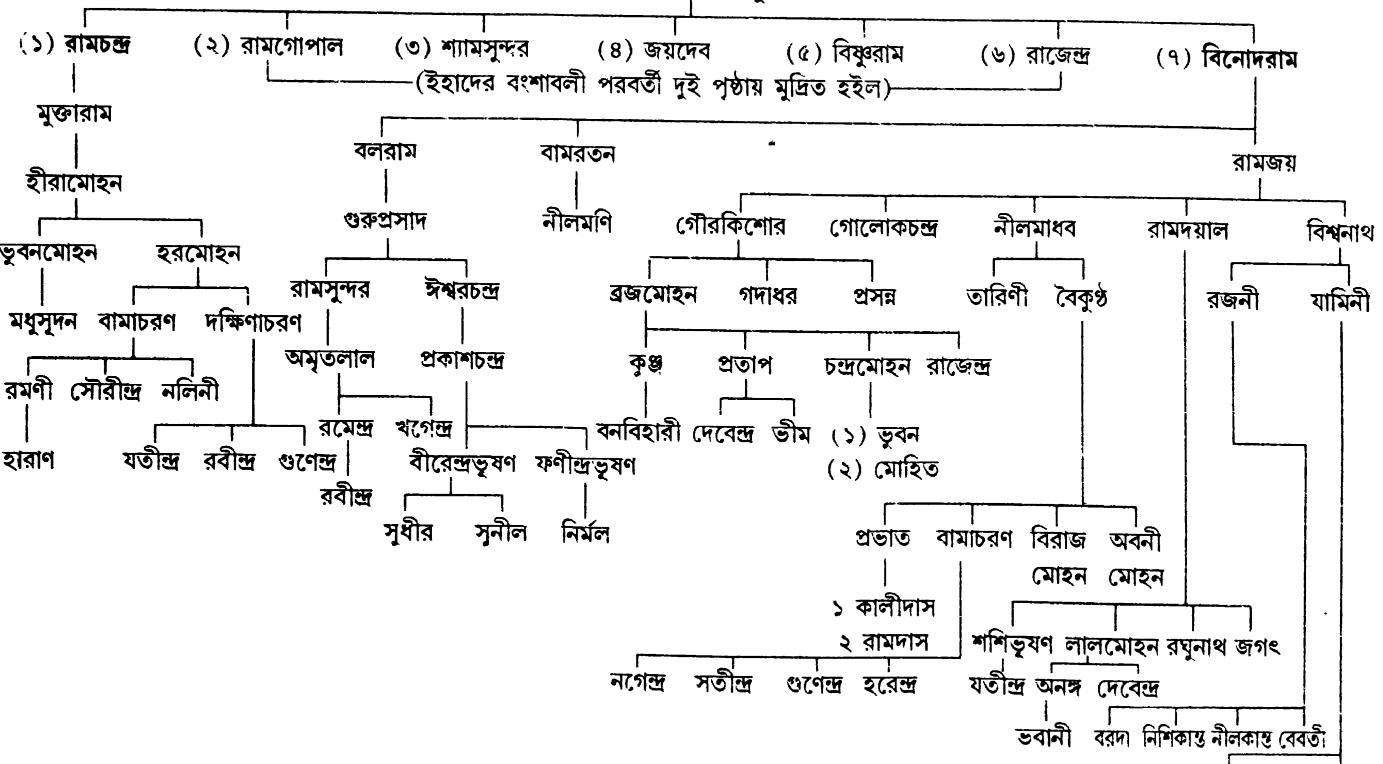
নিজ বাটিতে বিগ্রহ স্থাপনের পর কৃষ্ণরাম সকাল, সন্ধ্যায় সেখানে থাকিয়াই ভগবানের আরাধনা করিতেন। পরে সিদ্ধ পুরুষ রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিনি কাশী, গয়া, পুষ্কর, প্রভাস প্রভৃতি নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন। সেইসব স্থানে তিনি যে কোন সুলক্ষণযুক্ত শালগ্রাম বা বিগ্রহ পাইয়াছেন তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া নিজ দেবালয়ে স্থাপন করিয়াছেন। তাহার দেবগৃহে তিনি অনেক রকমের বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন।

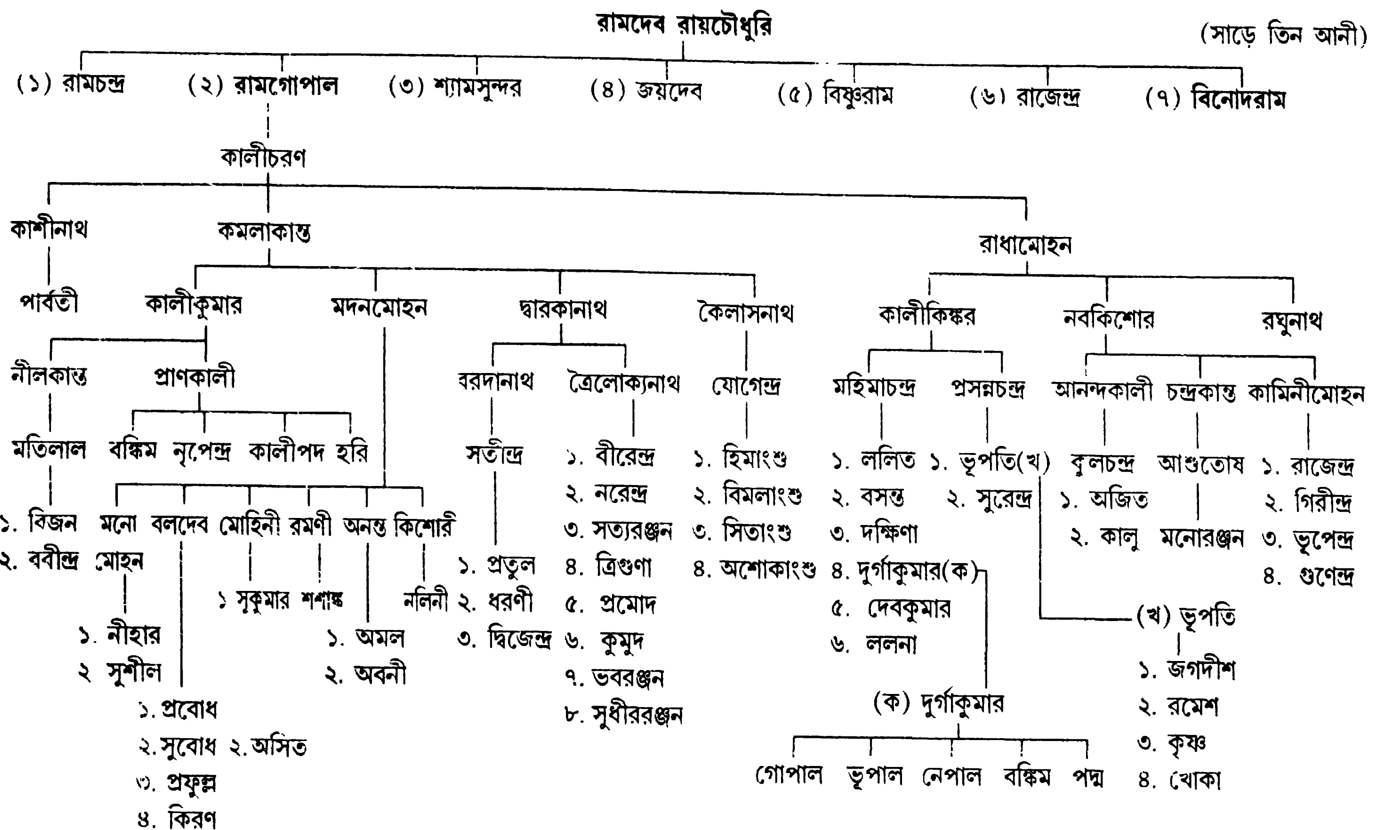
কথিত আছে কৃষ্ণরাম শতাধিক বৎসর পরমায়ু পাইয়াছিলেন। ১১৬৮/৬৯ সালে নিজ গৃহদেবতার প্রাঙ্গণে পুত্রপৌত্রাদি স্বজন সম্মুখে তারকব্রহ্ম রামনাম, হরিরাম শ্রবণ করিতে করিতে কৃষ্ণরাম মরদেহ ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত শান্তিময় দিব্যধামে গমন করেন।

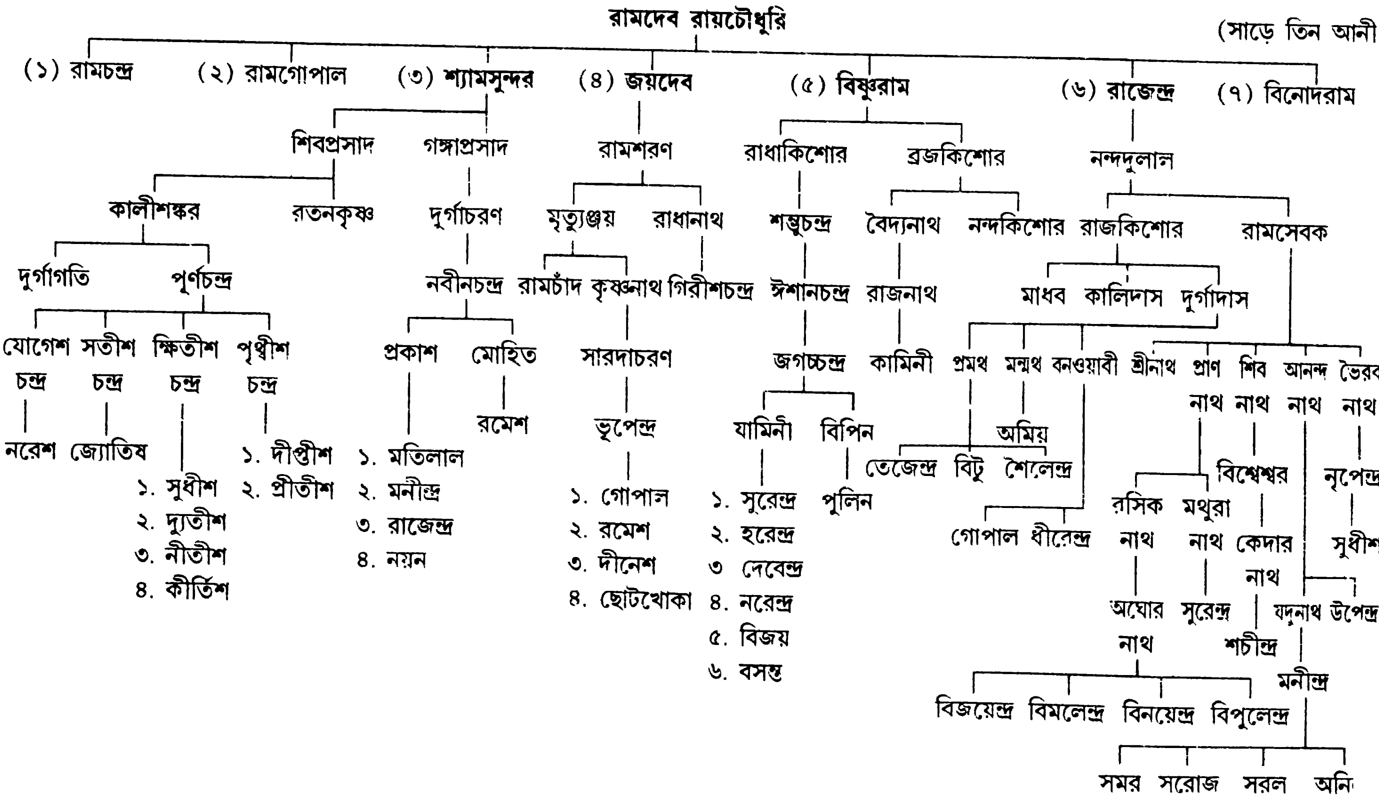
কৃষ্ণরাম কীর্তিকথা অমৃত মধুর।
শ্রবণে পাতক খণ্ডে, দুঃখ হয় দূর ॥

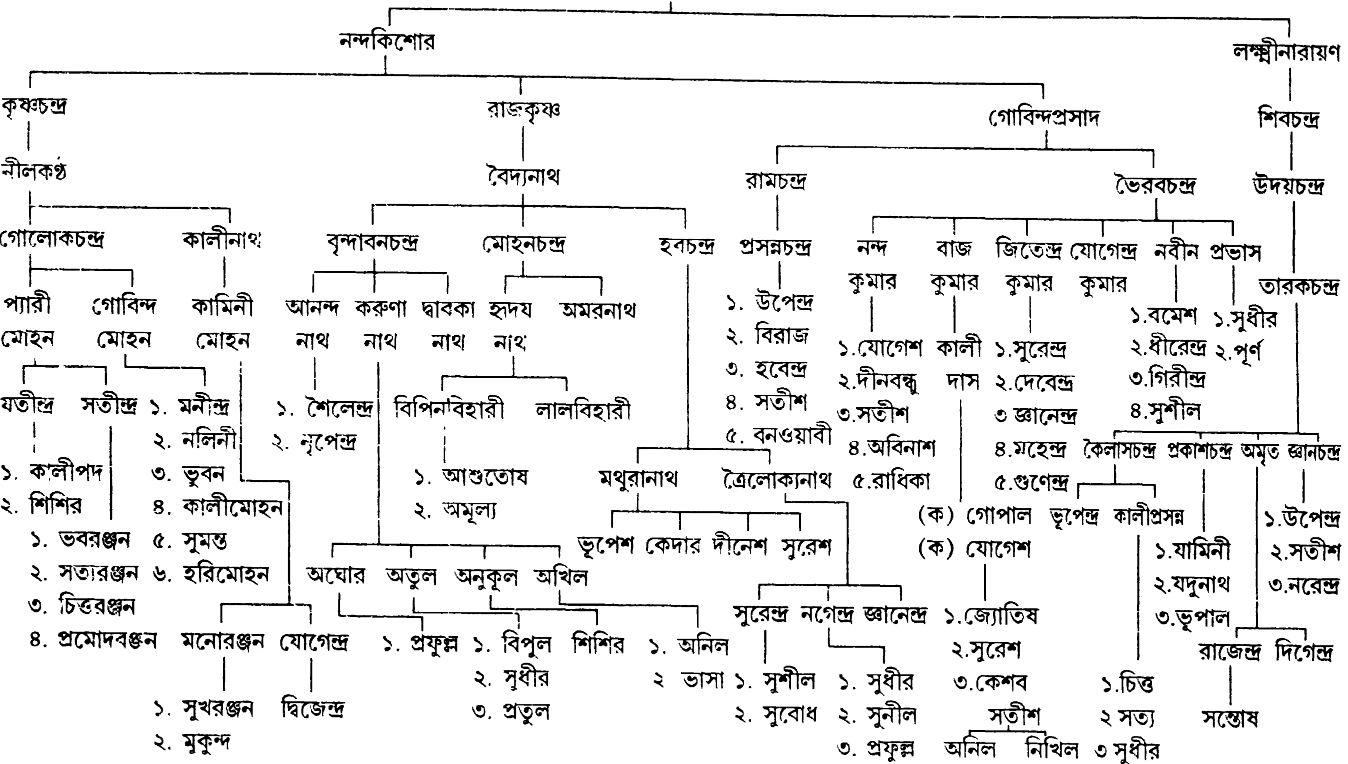
---

১. "In the centre of the district the marshes of Mukshudpur and Nagarkanda were apparently colonised in Mughal times by the efforts of Hindu Bhadraloke belonging to the district of Jessore who settled upon the banks of streams, raised lands sufficiently for village site and brought servants or tenants to bring the surrounding country under cultivation In most cases they appear to have settled upon the land as squatters and subsequently to have attempted to secure a jaigir of it from the Mughal government" *Jack's Final Report on the survey and settlement operations in the Faridpur District, p 21, para 48.*


উলপুরের রায়চৌধুরিগণের বংশবল্লী
(সাড়ে তিন আনী)
রামদেব রায়চৌধুরি
(১) রামচন্দ্র
(২) রামগোপাল
(৩) শ্যামসুন্দর
(৪) জয়দেব
(৫) বিষ্ণুরাম
(৬) রাজেন্দ্র
(৭) বিনোদরাম
(ইহাদের বংশাবলী পরবর্তী দুই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল)
মুক্তারাম
হীরামোহন
ভুবনমোহন
হরমোহন
মধুসূদন
বামাচরণ
দক্ষিণাচরণ
রমণী
সৌরীন্দ্র
নলিনী
হারাণ
যতীন্দ্র
রবীন্দ্র
গুণেন্দ্র
বলরাম
বামরতন
নীলমণি
গুরুপ্রসাদ
রামসুন্দর
ঈশ্বরচন্দ্র
অমৃতলাল
প্রকাশচন্দ্র
রমেন্দ্র
খগেন্দ্র
রবীন্দ্র
বীরেন্দ্রভূষণ
ফণীন্দ্রভূষণ
সুধীর
সুনীল
নির্মল
রামজয়
গৌরকিশোর
গোলোকচন্দ্র
নীলমাধব
রামদয়াল
বিশ্বনাথ
ব্রজমোহন
গদাধর
প্রসন্ন
তারিণী
বৈকুণ্ঠ
রজনী
যামিনী
কুঞ্জ
প্রতাপ
চন্দ্রমোহন
রাজেন্দ্র
বনবিহারী
দেবেন্দ্র
ভীম
(১) ভুবন
(২) মোহিত
প্রভাত
বামাচরণ
বিরাজ মোহন
অবনী মোহন
১ কালীদাস
২ রামদাস
নগেন্দ্র
সতীন্দ্র
গুণেন্দ্র
হরেন্দ্র
শশিভূষণ
লালমোহন
রঘুনাথ
জগৎ
যতীন্দ্র
অনঙ্গ
দেবেন্দ্র
ভবানী
বরদা
নিশিকান্ত
নীলকান্ত
বেবর্তী
চিন্তাহরণ
মনোহরণ


রামদেব রায়চৌধুরি
(সাড়ে তিন আনী)
(১) রামচন্দ্র
(২) রামগোপাল
(৩) শ্যামসুন্দর
(৪) জয়দেব
(৫) বিষ্ণুরাম
(৬) রাজেন্দ্র
(৭) বিনোদরাম
কালীচরণ
কাশীনাথ
কমলাকান্ত
রাধামোহন
পার্বতী
কালীকুমার
মদনমোহন
দ্বারকানাথ
কৈলাসনাথ
কালীকিঙ্কর
নবকিশোর
রঘুনাথ
নীলকান্ত
প্রাণকালী
বরদানাথ
ত্রৈলোক্যনাথ
যোগেন্দ্র
মহিমাচন্দ্র
প্রসন্নচন্দ্র
আনন্দকালী
চন্দ্রকান্ত
কামিনীমোহন
মতিলাল
বঙ্কিম
নৃপেন্দ্র
কালীপদ
হরি
সতীন্দ্র
১. বীরেন্দ্র
২. নরেন্দ্র
৩. সত্যরঞ্জন
৪. ত্রিগুণা
৫. প্রমোদ
৬. কুমুদ
৭. ভবরঞ্জন
৮. সুধীররঞ্জন
১. হিমাংশু
২. বিমলাংশু
৩. সিতাংশু
৪. অশোকাংশু
১. ললিত
২. বসন্ত
৩. দক্ষিণা
৪. দুর্গাকুমার(ক)
৫. দেবকুমার
৬. ললনা
১. ভূপতি(খ)
২. সুরেন্দ্র
কুলচন্দ্র
১. অজিত
২. কালু
আশুতোষ
মনোরঞ্জন
১. রাজেন্দ্র
২. গিরীন্দ্র
৩. ভূপেন্দ্র
৪. গুণেন্দ্র
১. বিজন
২. ববীন্দ্র
মনো
বলদেব
মোহিনী
রমণী
অনন্ত
কিশোরী
মোহন
১. নীহার
২ সুশীল
১ সুকুমার
শশাঙ্ক
১. অমল
২. অবনী
নলিনী
১. প্রতুল
২. ধরণী
৩. দ্বিজেন্দ্র
১. প্রবোধ
২. সুবোধ
২. অসিত
৩. প্রফুল্ল
৪. কিরণ
(ক) দুর্গাকুমার
গোপাল
ভূপাল
নেপাল
বঙ্কিম
পদ্ম
(খ) ভূপতি
১. জগদীশ
২. রমেশ
৩. কৃষ্ণ
৪. খোকা

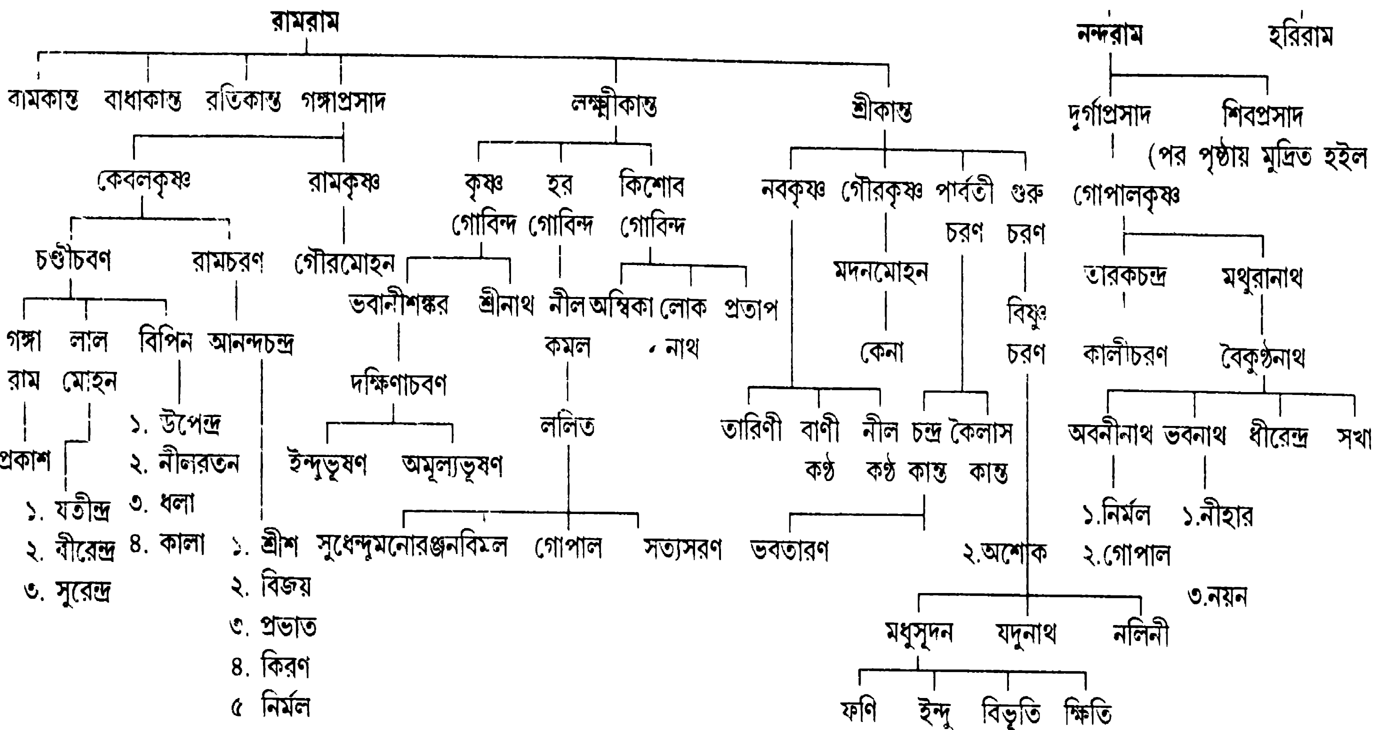

রামদেব রায়চৌধুরি
(সাড়ে তিন আনী
(১) রামচন্দ্র
(২) রামগোপাল
(৩) শ্যামসুন্দর
(৪) জয়দেব
(৫) বিষ্ণুরাম
(৬) রাজেন্দ্র
(৭) বিনোদরাম
শিবপ্রসাদ
গঙ্গাপ্রসাদ
রামশরণ
রাধাকিশোর
ব্রজকিশোর
নন্দদুলাল
কালীশঙ্কর
রতনকৃষ্ণ
দুর্গাচরণ
মৃত্যুঞ্জয়
রাধানাথ
শম্ভুচন্দ্র
বৈদ্যনাথ
নন্দকিশোর
রাজকিশোর
রামসেবক
দুর্গাগতি
পূর্ণচন্দ্র
নবীনচন্দ্র
রামচাঁদ
কৃষ্ণনাথ
গিরীশচন্দ্র
ঈশানচন্দ্র
রাজনাথ
মাধব
কালিদাস
দুর্গাদাস
যোগেশ চন্দ্র
সতীশ চন্দ্র
ক্ষিতীশ চন্দ্র
পৃথ্বীশ চন্দ্র
প্রকাশ
মোহিত
সারদাচরণ
জগচ্চন্দ্র
কামিনী
প্রমথ
মন্মথ
বনওয়াবী
শ্রীনাথ
প্রাণ নাথ
শিব নাথ
আনন্দ নাথ
ভৈরব নাথ
নরেশ
জ্যোতিষ
রমেশ
ভূপেন্দ্র
যামিনী
বিপিন
অমিয়
১. দীপ্তীশ
২. প্রীতীশ
১. মতিলাল
২. মনীন্দ্র
৩. রাজেন্দ্র
৪. নয়ন
তেজেন্দ্র
বিটু
শৈলেন্দ্র
বিশ্বেশ্বর
নৃপেন্দ্র
১. সুধীশ
২. দ্যুতীশ
৩. নীতীশ
৪. কীর্তিশ
১. গোপাল
২. রমেশ
৩. দীনেশ
৪. ছোটখোকা
১. সুরেন্দ্র
২. হরেন্দ্র
৩ দেবেন্দ্র
৪. নরেন্দ্র
৫. বিজয়
৬. বসন্ত
পুলিন
গোপাল
ধীরেন্দ্র
রসিক নাথ
মথুরা নাথ
কেদার নাথ
সুধীশ
অঘোর নাথ
সুরেন্দ্র
শচীন্দ্র
যদুনাথ
উপেন্দ্র
মনীন্দ্র
বিজয়েন্দ্র
বিমলেন্দ্র
বিনয়েন্দ্র
বিপুলেন্দ্র
সমর
সরোজ
সরল
অনি

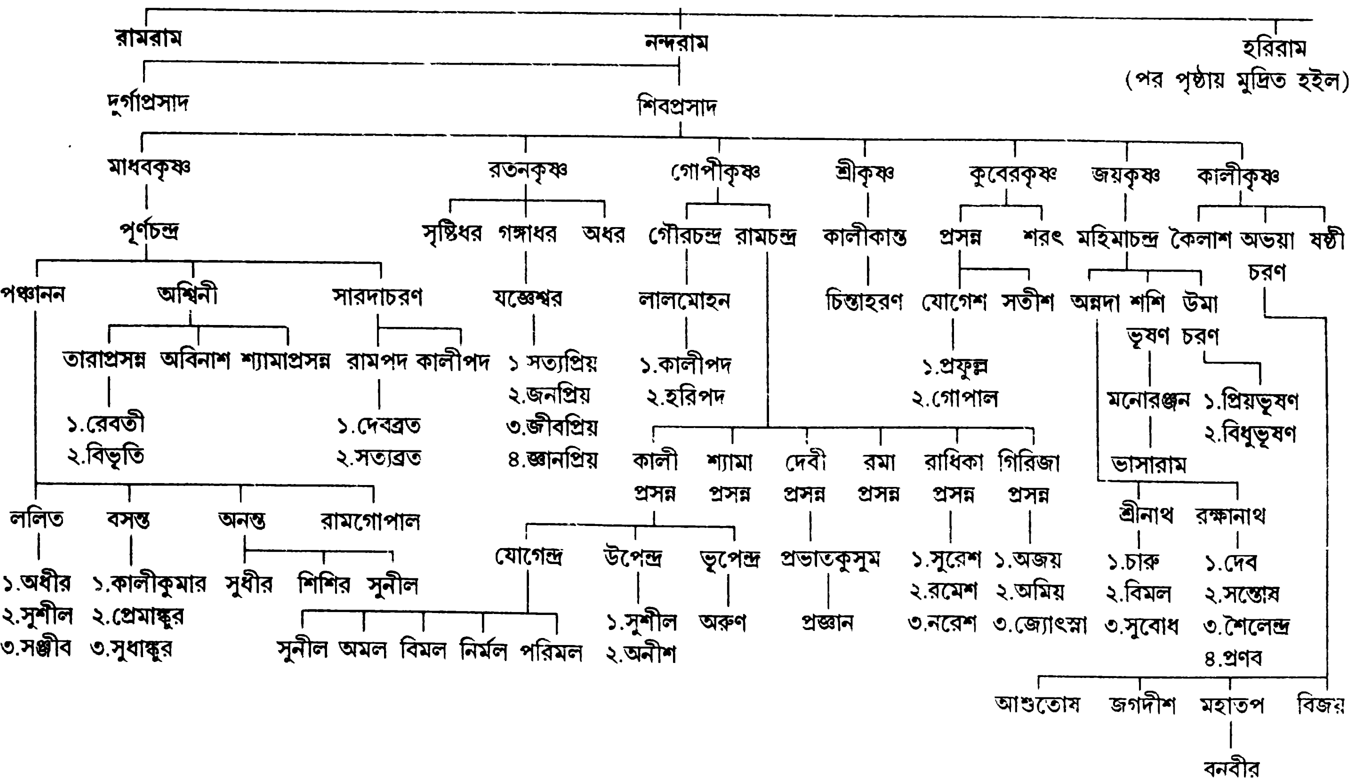

রমাবল্লভ রায়চৌধুরি
(বড় সোয়া তিন আনী)
রামনারায়ণ
নন্দকিশোর
লক্ষ্মীনারায়ণ
কৃষ্ণচন্দ্র
রাজকৃষ্ণ
গোবিন্দপ্রসাদ
শিবচন্দ্র
নীলকণ্ঠ
বৈদ্যনাথ
রামচন্দ্র
ভৈরবচন্দ্র
উদয়চন্দ্র
গোলোকচন্দ্র
কালীনাথ
বৃন্দাবনচন্দ্র
মোহনচন্দ্র
হরচন্দ্র
প্রসন্নচন্দ্র
নন্দ কুমার
বাজ কুমার
জিতেন্দ্র কুমার
যোগেন্দ্র কুমার
নবীন
প্রভাস
তারকচন্দ্র
প্যারী মোহন
গোবিন্দ মোহন
কামিনী মোহন
আনন্দ নাথ
করুণা নাথ
দ্বারকা নাথ
হৃদয় নাথ
অমরনাথ
১. উপেন্দ্র
২. বিরাজ
৩. হরেন্দ্র
৪. সতীশ
৫. বনওয়ারী
১.যোগেশ
২.দীনবন্ধু
৩.সতীশ
৪.অবিনাশ
৫.রাধিকা
কালী দাস
১.সুরেন্দ্র
২.দেবেন্দ্র
৩ জ্ঞানেন্দ্র
৪.মহেন্দ্র
৫.গুণেন্দ্র
১.রমেশ
২.ধীরেন্দ্র
৩.গিরীন্দ্র
৪.সুশীল
১.সুধীর
২.পূর্ণ
যতীন্দ্র
সতীন্দ্র
১. মনীন্দ্র
২. নলিনী
৩. ভুবন
৪. কালীমোহন
৫. সুমন্ত
৬. হরিমোহন
১. শৈলেন্দ্র
২. নৃপেন্দ্র
বিপিনবিহারী
লালবিহারী
১. আশুতোষ
২. অমূল্য
১. কালীপদ
২. শিশির
১. ভবরঞ্জন
২. সত্যরঞ্জন
৩. চিত্তরঞ্জন
৪. প্রমোদরঞ্জন
মথুরানাথ
ত্রৈলোক্যনাথ
কৈলাসচন্দ্র
প্রকাশচন্দ্র
অমৃত
জ্ঞানচন্দ্র
ভূপেশ
কেদার
দীনেশ
সুরেশ
(ক) গোপাল
(ক) যোগেশ
ভূপেন্দ্র
কালীপ্রসন্ন
১.যামিনী
২.যদুনাথ
৩.ভূপাল
১.উপেন্দ্র
২.সতীশ
৩.নরেন্দ্র
অঘোর
অতুল
অনুকূল
অখিল
মনোরঞ্জন
যোগেন্দ্র
১. সুখরঞ্জন
২. মুকুন্দ
দ্বিজেন্দ্র
১. প্রফুল্ল
১. বিপুল
২. সুধীর
৩. প্রতুল
শিশির
১. অনিল
২ ভাসা
সুরেন্দ্র
নগেন্দ্র
জ্ঞানেন্দ্র
১. সুশীল
২. সুবোধ
১. সুধীর
২. সুনীল
৩. প্রফুল্ল
১.জ্যোতিষ
২.সুরেশ
৩.কেশব
সতীশ
অনিল
নিখিল
১.চিত্ত
২ সত্য
৩ সুধীর
রাজেন্দ্র
দিগেন্দ্র
সন্তোষ

কৃষ্ণরাম রায়চৌধুরি (ছোট সোয়া তিন আনী)

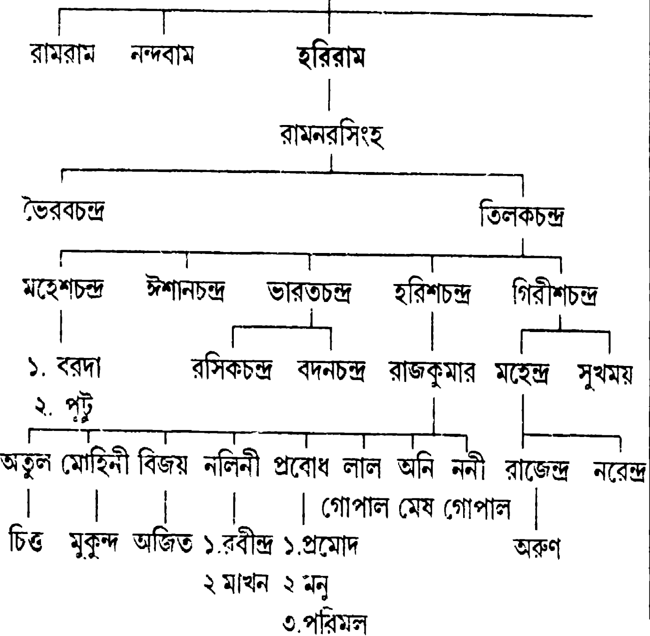
- রামরাম
  - রামকান্ত
    - রামমাণিক্য
      - গৌরী শঙ্কর
      - দেবী শঙ্কর
        - কুলচন্দ্র
          - ১.সুধীর
          - ২.কচি
        - সতীশচন্দ্র
          - ১.ব্রজ গোপাল
          - ২.তপো গোপাল
          - ৩.শান্তিগোপাল
        - শ্রীশচন্দ্র
          - ১.নিখিল
          - ২.সুশীল
          - ৩.সুনীল
      - উমা শঙ্কর
    - কৃষ্ণচন্দ্র
      - জগৎ চন্দ্র
        - অনুকূল
          - ১.যতীন্দ্র
          - ২.প্রফুল্ল
          - ৩.পবিত্র
          - ৪.মাখন
      - নবীন চন্দ্র
        - বিরাজ
        - নলিনী
        - রমণী
          - প্রমোদ
    - গোলোকচন্দ্র
      - হরচরণ
        - ভবেশ
          - ১.ষোড়শী
          - ২.শিশিব
          - ৩.কেশব
          - ৪.অসিতা
          - ৫.সুখরঞ্জন
          - ৬.শান্তিরঞ্জন
          - ৭.সুনীল
        - উপেন্দ্র
          - ১.নেত্ররঞ্জন
          - ২.জীবন
          - ৩.করুণা
          - ৪.বংশী
        - গিরীন্দ্র
        - বঙ্কিম
        - সুবেশ
      - গোবিন্দ
        - সুবোধ
  - রাধাকান্ত
    - শম্ভুচন্দ্র
      - কৃষ্ণনাথ
        - গুরুদাস
          - ঈশ্বরচন্দ্র
            - রমণী
              - নরেশ
            - মনোমোহন
              - দেবেন্দ্র
              - নৃপেন্দ্র
    - কাশীচন্দ্র
      - দুর্গাচরণ
    - কৃষ্ণকিঙ্কর
      - দীননাথ
      - দ্বাবকানাথ
        - কেশব
  - রতিকান্ত
    - রামপ্রাণ
      - দীনবন্ধু
        - সতীন্দ্র
        - মণীন্দ্র
          - অমলেন্দু
          - শ্যামলেন্দু
          - নির্মলেন্দু
        - জ্ঞানেন্দ্র
          - কমলেন্দু
      - যজ্ঞেশ্বর
        - বিনয়
        - অখিল
        - অঞ্চল
  - গঙ্গাপ্রসাদ
  - লক্ষ্মীকান্ত
  - শ্রীকান্ত

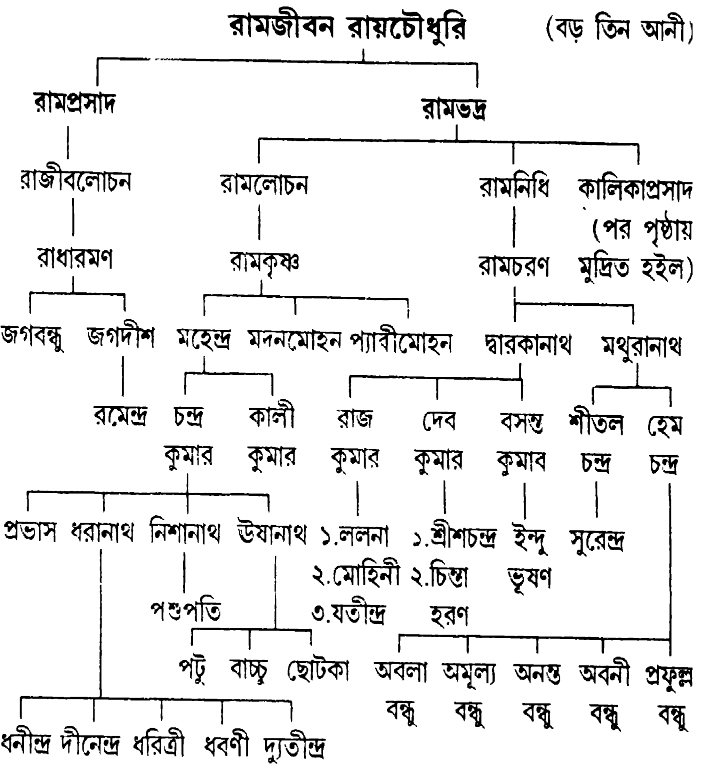
  (পর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল)
- নন্দরাম
- হরিরাম


কৃষ্ণরাম রায়চৌধুরি
তিন
রামরাম
নন্দরাম
হরিরাম
বামকান্ত
বাধাকান্ত
রতিকান্ত
গঙ্গাপ্রসাদ
লক্ষ্মীকান্ত
শ্রীকান্ত
দুর্গাপ্রসাদ
শিবপ্রসাদ
(পর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল
কেবলকৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ
কৃষ্ণ গোবিন্দ
হর গোবিন্দ
কিশোব গোবিন্দ
নবকৃষ্ণ
গৌরকৃষ্ণ
পার্বতী চরণ
গুরু চরণ
গোপালকৃষ্ণ
চণ্ডীচবণ
রামচরণ
গৌরমোহন
ভবানীশঙ্কর
শ্রীনাথ
নীল
অম্বিকা
লোক
, নাথ
প্রতাপ
মদনমোহন
বিষ্ণু চরণ
তারকচন্দ্র
মথুরানাথ
গঙ্গা রাম
লাল মোহন
বিপিন
আনন্দচন্দ্র
কমল
কেনা
কালীচরণ
বৈকুণ্ঠনাথ
দক্ষিণাচবণ
প্রকাশ
১. উপেন্দ্র
২. নীলরতন
৩. ধলা
৪. কালা
ইন্দুভূষণ
অমূল্যভূষণ
ললিত
তারিণী
বাণী কণ্ঠ
নীল কণ্ঠ
চন্দ্র কান্ত
কৈলাস কান্ত
অবনীনাথ
ভবনাথ
ধীরেন্দ্র
সখা
১. যতীন্দ্র
২. বীরেন্দ্র
৩. সুরেন্দ্র
১. শ্রীশ
২. বিজয়
৩. প্রভাত
৪. কিরণ
৫ নির্মল
সুধেন্দুমনোরঞ্জনবিমল
গোপাল
সত্যসরণ
ভবতারণ
২.অশোক
১.নির্মল
২.গোপাল
১.নীহার
৩.নয়ন
মধুসূদন
যদুনাথ
নলিনী
ফণি
ইন্দু
বিভূতি
ক্ষিতি



কৃষ্ণরাম রায়চৌধুরি
(ছোট সোয়া তিন আনী)
রামরাম
নন্দরাম
হরিরাম
(পর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল)
দুর্গাপ্রসাদ
শিবপ্রসাদ
মাধবকৃষ্ণ
রতনকৃষ্ণ
গোপীকৃষ্ণ
শ্রীকৃষ্ণ
কুবেরকৃষ্ণ
জয়কৃষ্ণ
কালীকৃষ্ণ
পূর্ণচন্দ্র
সৃষ্টিধর গঙ্গাধর অধর
গৌরচন্দ্র রামচন্দ্র
কালীকান্ত
প্রসন্ন শরৎ
মহিমাচন্দ্র
কৈলাশ অভয়া ষষ্ঠী
চরণ
পঞ্চানন অশ্বিনী সারদাচরণ
যজ্ঞেশ্বর
লালমোহন
চিন্তাহরণ
যোগেশ সতীশ
অন্নদা শশি উমা
ভূষণ চরণ
তারাপ্রসন্ন অবিনাশ শ্যামাপ্রসন্ন রামপদ কালীপদ
১ সত্যপ্রিয় ২.জনপ্রিয় ৩.জীবপ্রিয় ৪.জ্ঞানপ্রিয়
১.কালীপদ ২.হরিপদ
১.প্রফুল্ল ২.গোপাল
মনোরঞ্জন
১.প্রিয়ভূষণ ২.বিধুভূষণ
১.রেবতী ২.বিভূতি
১.দেবব্রত ২.সত্যব্রত
কালী প্রসন্ন
শ্যামা প্রসন্ন
দেবী প্রসন্ন
রমা প্রসন্ন
রাধিকা প্রসন্ন
গিরিজা প্রসন্ন
ভাসারাম
শ্রীনাথ রক্ষানাথ
ললিত বসন্ত অনন্ত রামগোপাল
যোগেন্দ্র উপেন্দ্র ভূপেন্দ্র
প্রভাতকুসুম
১.সুরেশ ২.রমেশ ৩.নরেশ
১.অজয় ২.অমিয় ৩.জ্যোৎস্না
১.চারু ২.বিমল ৩.সুবোধ
১.দেব ২.সন্তোষ ৩.শৈলেন্দ্র ৪.প্রণব
১.অধীর ২.সুশীল ৩.সঞ্জীব
১.কালীকুমার ২.প্রেমাঙ্কুর ৩.সুধাঙ্কুর
সুধীর শিশির সুনীল
সুনীল অমল বিমল নির্মল পরিমল
১.সুশীল ২.অনীশ
অরুণ
প্রজ্ঞান
আশুতোষ জগদীশ মহাতপ বিজয়
বনবীর

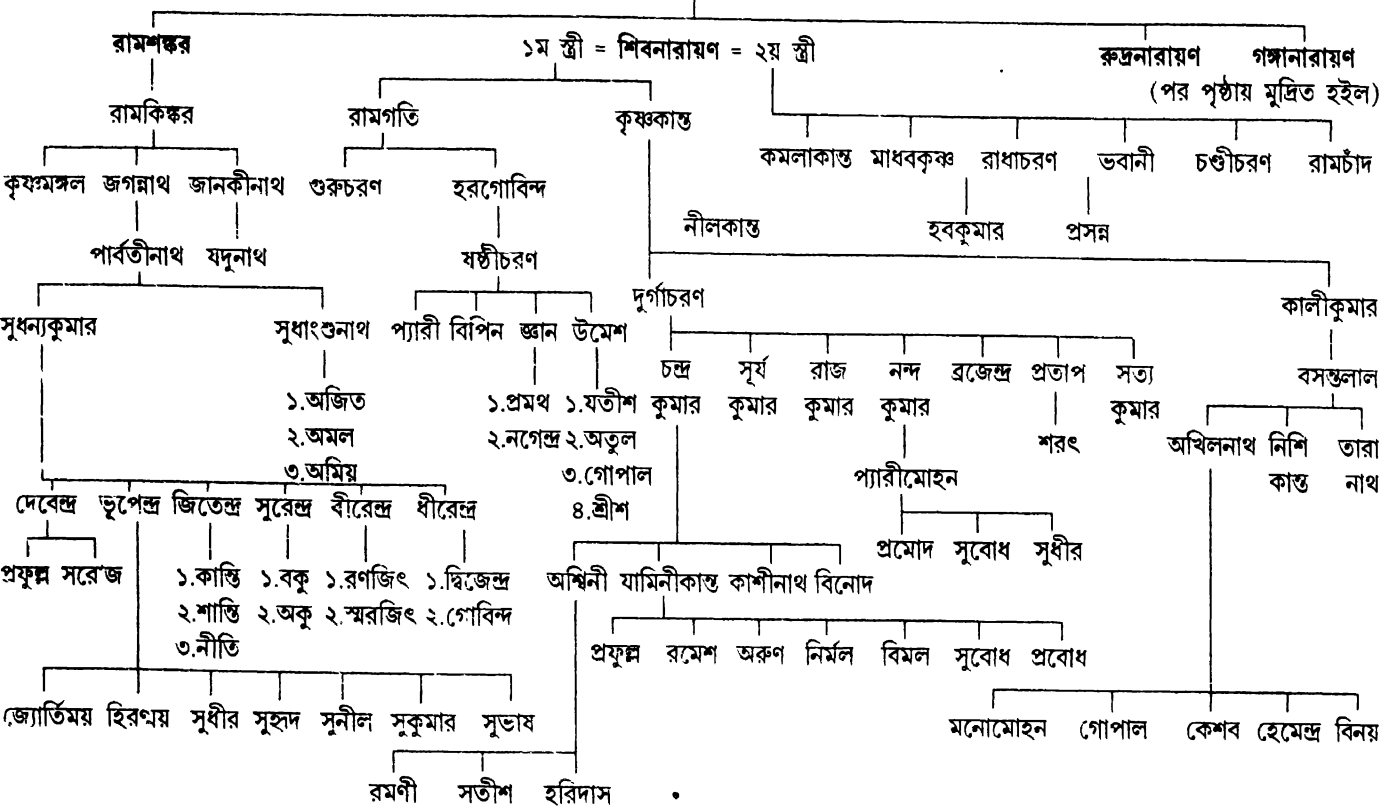

কৃষ্ণরাম রায়চৌধুরি (সোয়া তিন আনী)
রামরাম
নন্দরাম
হরিরাম
রামনরসিংহ
ভৈরবচন্দ্র
তিলকচন্দ্র
মহেশচন্দ্র
ঈশানচন্দ্র
ভারতচন্দ্র
হরিশচন্দ্র
গিরীশচন্দ্র
১. বরদা
২. পটু
রসিকচন্দ্র
বদনচন্দ্র
রাজকুমার
মহেন্দ্র
সুখময়
অতুল
মোহিনী
বিজয়
নলিনী
প্রবোধ
লাল গোপাল
অনি মেষ
ননী গোপাল
রাজেন্দ্র
নরেন্দ্র
চিত্ত
মুকুন্দ
অজিত
১.রবীন্দ্র
২ মাখন
১.প্রমোদ
২ মনু
৩.পরিমল
অরুণ

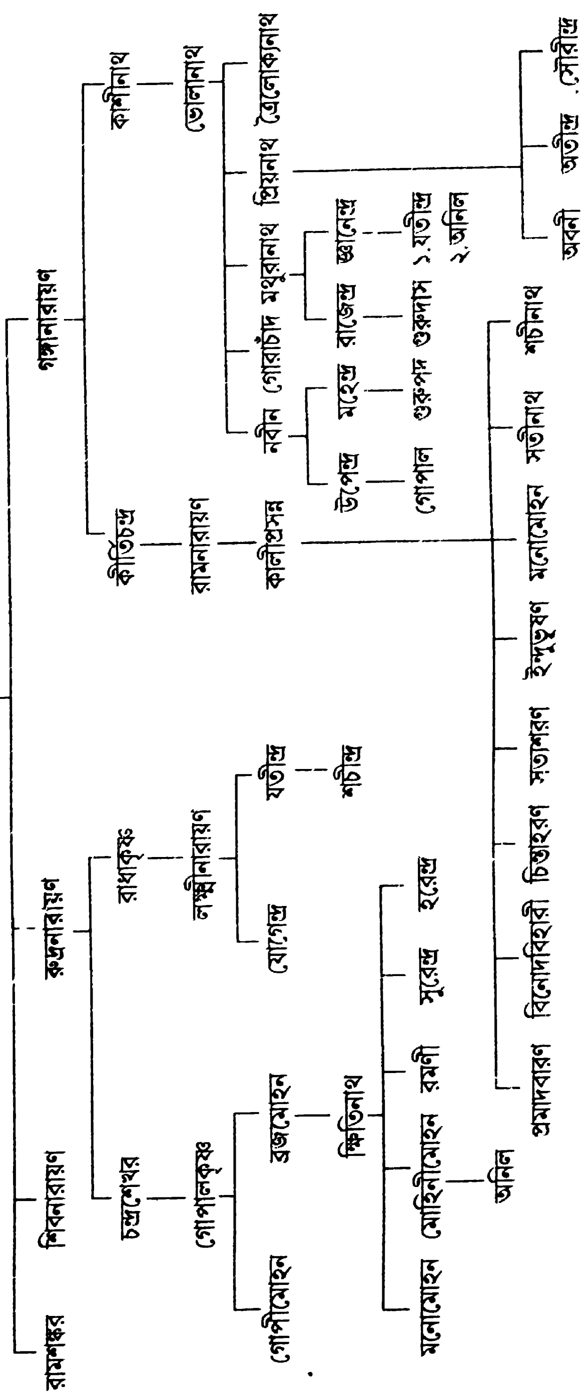

রামজীবন রায়চৌধুরি (বড় তিন আনী)
রামপ্রসাদ
রামভদ্র
রাজীবলোচন
রামলোচন
রামনিধি
কালিকাপ্রসাদ (পর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল)
রাধারমণ
রামকৃষ্ণ
রামচরণ
জগবন্ধু
জগদীশ
মহেন্দ্র
মদনমোহন
প্যারীমোহন
দ্বারকানাথ
মথুরানাথ
রমেন্দ্র
চন্দ্র কুমার
কালী কুমার
রাজ কুমার
দেব কুমার
বসন্ত কুমার
শীতল চন্দ্র
হেম চন্দ্র
প্রভাস
ধরানাথ
নিশানাথ
উষানাথ
১.ললনা
২.মোহিনী
৩.যতীন্দ্র
১.শ্রীশচন্দ্র
২.চিন্তা হরণ
ইন্দু ভূষণ
সুরেন্দ্র
পশুপতি
পটু
বাচ্চু
ছোটকা
অবলা বন্ধু
অমূল্য বন্ধু
অনন্ত বন্ধু
অবনী বন্ধু
প্রফুল্ল বন্ধু
ধনীন্দ্র
দীনেন্দ্র
ধরিত্রী
ধবণী
দ্যুতীন্দ্র

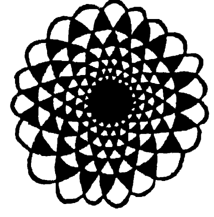
রামজীবন রায়চৌধুরি

(বড় তিন আনী)

- রামপ্রসাদ
- রামভদ্র
  - রামলোচন
  - রামনিধি
  - কালিকাপ্রসাদ
    - রঘুনাথ
      - বিপিনবিহারী
        - তারাপ্রসাদ
          - হেমেন্দ্র
        - রমাপ্রসাদ
          - ১.কৃষ্ণদাস
          - ২.বামদাস
        - নগেন্দ্রপ্রসাদ
        - দেবেন্দ্রপ্রসাদ
          - কমলাকান্ত
        - সতীন্দ্রপ্রসাদ
          - ১.হীরেন্দ্র
          - ২.চিত্ত
        - গুণেন্দ্রপ্রসাদ
          - ১ দ্বিজেন্দ্র
          - ২.শৈলেন্দ্র
          - ৩.রণজিৎ
        - রাজেন্দ্রপ্রসাদ
          - ১.কালীনাথ
          - ২.মনু
      - রাসবিহারী
        - ১.নকুলেশ্বর
        - ২ কেদারেশ্বর
        - ৩ কাশীশ্বর
        - ৪.অনুকূলেশ্বর
        - ৫ সর্বেশ্বর
        - ৬.যজ্ঞেশ্বর
        - ৭.ভুবনেশ্বর
        - ৮.বিশ্বেশ্বর
        - ৯.ত্রিগুণেশ্বর
      - কৈলাসবিহারী
        - ১.অবিনাশ
        - ২.অক্ষয়
        - ৩.অতুল
        - ৪.অনাদি
    - শ্রীনাথ
    - গৌরীনাথ
      - যামিনী
      - দিগিন্দ্রকান্ত
        - কুমুদ
        - অজিত
        - অসিত
    - হরিনাথ
      - প্রমদামোহন
      - চন্দ্রমোহন
        - ১. আশুতোষ
        - ২. সন্তোষ
        - ৩. প্রাণকুমার
        - ৪. সুধীরঞ্জন
        - ৫ হৃদিরঞ্জন
        - ৬. সত্যরঞ্জন
        - ৭. জ্ঞানরঞ্জন
      - আনন্দমোহন
        - সুরেন্দ্র
          - ১. নীহার
          - ২. অমল
          - ৩ অনিল
        - হরেন্দ্র
    - ব্রজনাথ
      - অনঙ্গ মোহন
        - ১. শরৎ
        - ২. পূর্ণ
      - কলিঙ্গ মোহন
        - ১. মনোমোহন
        - ২. সুধীরঞ্জন
        - ৩. প্রেমরঞ্জন
      - বিরাজ মোহন
        - মুকুন্দ
        - শচীন্দ্র
        - নরেন্দ্র
      - যতীন্দ্র মোহন
        - মাখনলাল
        - ননীলাল
        - রবীন্দ্র
        - রণেন্দ্র
    - চন্দ্রনাথ


রূপরাম রায়চৌধুরি
(ছোট তিন আনী)
রামশঙ্কর
১ম স্ত্রী = শিবনারায়ণ = ২য় স্ত্রী
রুদ্রনারায়ণ
গঙ্গানারায়ণ
(পর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল)
রামকিঙ্কর
রামগতি
কৃষ্ণকান্ত
কমলাকান্ত
মাধবকৃষ্ণ
রাধাচরণ
ভবানী
চণ্ডীচরণ
রামচাঁদ
কৃষ্ণমঙ্গল
জগন্নাথ
জানকীনাথ
গুরুচরণ
হরগোবিন্দ
নীলকান্ত
হরকুমার
প্রসন্ন
পার্বতীনাথ
যদুনাথ
ষষ্ঠীচরণ
দুর্গাচরণ
কালীকুমার
সুধন্যকুমার
সুধাংশুনাথ
প্যারী বিপিন জ্ঞান উমেশ
চন্দ্র কুমার
সূর্য কুমার
রাজ কুমার
নন্দ কুমার
ব্রজেন্দ্র
প্রতাপ
সত্য কুমার
বসন্তলাল
১.অজিত
২.অমল
৩.অমিয়
১.প্রমথ
২.নগেন্দ্র
১.যতীশ
২.অতুল
৩.গোপাল
৪.শ্রীশ
শরৎ
অখিলনাথ
নিশি কান্ত
তারা নাথ
প্যারীমোহন
দেবেন্দ্র
ভূপেন্দ্র
জিতেন্দ্র
সুরেন্দ্র
বীরেন্দ্র
ধীরেন্দ্র
প্রমোদ
সুবোধ
সুধীর
প্রফুল্ল
সরোজ
১.কান্তি
২.শান্তি
৩.নীতি
১.বকু
২.অকু
১.রণজিৎ
২.স্মরজিৎ
১.দ্বিজেন্দ্র
২.গোবিন্দ
অশ্বিনী
যামিনীকান্ত
কাশীনাথ
বিনোদ
প্রফুল্ল
রমেশ
অরুণ
নির্মল
বিমল
সুবোধ
প্রবোধ
জ্যোর্তিময়
হিরণ্ময়
সুধীর
সুহৃদ
সুনীল
সুকুমার
সুভাষ
মনোমোহন
গোপাল
কেশব
হেমেন্দ্র
বিনয়
রমণী
সতীশ
হরিদাস


(ছোট তিন আনী)
রূপরাম রায়চৌধুরি
গঙ্গানারায়ণ
রুদ্রনারায়ণ
শিবনারায়ণ
রামশঙ্কর
কাশীনাথ
ভোলানাথ
ত্রৈলোক্যনাথ
প্রিয়নাথ
মথুরানাথ
গোরাচাঁদ
নবীন
জ্ঞানেন্দ্র
রাজেন্দ্র
মহেন্দ্র
উপেন্দ্র
১.যতীন্দ্র
২.অনিল
গুরুদাস
গুরুপদ
গোপাল
সৌরীন্দ্র
অতীন্দ্র
অবনী
কীর্তিচন্দ্র
রামনারায়ণ
কালীপ্রসন্ন
শচীনাথ
সতীনাথ
মনোমোহন
ইন্দুভূষণ
সত্যশরণ
চিন্তাহরণ
বিনোদবিহারী
প্রমাদবারণ
রাধাকৃষ্ণ
লক্ষ্মীনারায়ণ
যতীন্দ্র
শচীন্দ্র
যোগেন্দ্র
চন্দ্রশেখর
গোপালকৃষ্ণ
ব্রজমোহন
গোপীমোহন
ক্ষিতিনাথ
হরেন্দ্র
সুরেন্দ্র
রমণী
মোহিনীমোহন
মনোমোহন
অনিল



পঞ্চম অধ্যায়

পরবর্তী ইতিহাস

৫৯। বসু চৌধুরিগণের বংশবিস্তার

ক্রমে উলপুরস্থ বসুচৌধুরিগণের বংশের বিস্তার হইতে লাগিল। রামদেব, রমাবল্লভ, কৃষ্ণরাম, রামজীবন ও রূপরামের বংশবল্লী পূর্বঅধ্যায়ে মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রথম আমলের বসু বংশীয়গণের মধ্যে রামদেবের দ্বিতীয় পুত্র রামগোপাল রায়ের পুত্র কালীচরণ, রমাবল্লভের পুত্র রাম নারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ, কৃষ্ণরামের দ্বিতীয় পুত্র নন্দরাম, ও তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামরামের পুত্রগণের মধ্যে রমাকান্ত ও রতিকান্ত, রামজীবন রায়ের দ্বিতীয় পুত্র রামভদ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কালিকাপ্রসাদ ও রূপরাম রায়ের দ্বিতীয় পুত্র শিবনারায়ণ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। তাহারা জমিদারি ও সমাজ সম্বন্ধীয় জটিল বিষয়সমূহের মীমাংসায় নিপুণ ছিলেন ও বসুবংশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অতিশয় যত্নবান ছিলেন। প্রজা ও আশ্রিত ব্যক্তিগণের প্রতি তাহারা কোনরূপ ন্যায় বিগর্হিত ব্যবহার করিতেন না এবং অপরকেও করিতে দিতেন না। পূর্বপুরুষগণের সম্মান ও কীর্তি রক্ষায় তাহাদের আন্তরিক আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাদের সময় পর্যন্ত উলপুরের সুবর্ণযুগ বলা যায়। তখন উলপুরের জমিদারগণের সুনাম ও মান প্রতিপত্তি দূর দূরান্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল , এবং সমাজে তাহারা গোপাল বসু ঠাকুরের উপযুক্ত বংশধর বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের প্রধান প্রধান বংশের ব্যক্তিগণ ইহাদিগের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তখন উলপুরে মোটা ভাত, মোট কাপড ও পুষ্টিকর নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য ও লোকজন ও দাস-দাসীর অভাব ছিল না। সকলের বাড়িতে লক্ষ্মীশ্রী ও পূর্ণতা বিদ্যমান ছিল।

৬০। নন্দরাম রায়

পূর্ব প্রকরণে উল্লিখিত মহাত্মাগণের মধ্যে কৃষ্ণরামের মধ্যম পুত্র নন্দরাম অন্যতম। পূর্ব অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে কয়েকবার তাহার উল্লেখ করিতে হইয়াছে। ষোল আনার জমিদারি বাটোয়ারা হইবার পর সর্বজ্যেষ্ঠ রামদেব বসু চৌধুরির ৭ পুত্র মধ্যে তাহাদের অংশে প্রাপ্ত জমিদারি বণ্টনকার্যও নন্দরামের দ্বারাই হইয়াছিল। রামজীবন রায়ের ২ পুত্রের মধ্যে কেবল উলপুর মৌজার জমি ভাগ হইয়াছিল। অন্যান্য মৌজার জমি এজমালি ছিল। রূপরাম রায়ের ৪ পুত্রের মধ্যে পবগণার সমস্ত জমিই বাটোয়ারা হইয়াছিল। এই সকল বণ্টন কার্যেও নন্দরাম রায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে তাহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সাহাপুর জমিদারির শাসন সংরক্ষণ কার্যে বিশেষ পরিশ্রম কবিতেন। সকল হিস্যার শরিকগণই তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এই সকল জরিপ ও বাটোয়ার উপলক্ষে এবং জমিদারগণের মান সম্ভ্রম বৃদ্ধির প্রয়াসে এবং সাধারণত জমিদারি শাসন সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্যে তাহার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। তাহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। এক কন্যার বিবাহের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অপব কন্যা পরমেশ্বরীর বিবাহ যশোহর সমাজে গুহবংশীয় ধনবান পাত্রের সহিত হইয়াছিল। কিন্তু

দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি অল্প বয়সেই বিধবা হন। নন্দরামের মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রী তাহার চিতায় সহমরণে যান। তাহাদের সমাধিস্থানে কন্যা পরমেশ্বরী দুইটি মঠ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। পরমেশ্বরী ভ্রাতাগণের বসতবাড়ির বাহিরখণ্ডে একটি ইষ্টকালয় নির্মাণ করিয়া দেন এবং গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে, কালীবাড়ির ঈষৎ দক্ষিণ পূর্বদিকে একটি সুগভীর পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহা সর্বসাধারণের ব্যবহারার্থ যথাশাস্ত্র উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাহার নির্মিত ইষ্টকালয় চণ্ডীমণ্ডপরূপে ব্যবহৃত হয়।

নন্দরামের কনিষ্ঠ পুত্র শিবপ্রসাদের ৬ষ্ঠ পুত্র জয়কৃষ্ণ রায় অল্প বয়সে পরলোক গমন করিলে তাহার সপ্তদশ বর্ষীয়া পত্নী স্বামীর চিতায় সহমরণে যান। জনশ্রুতি এইরূপ যে সহমরণ যাইবার পূর্বে উক্তসাধ্বী তাহার পূর্ব তিন জন্মের সংবাদ বলিয়াছিলেন এবং তিনি স্বামীর চিতায় আরোহণ করিলে অগ্নিকুণ্ড মধ্য হইতে ৭ বার উলুধ্বনি হইয়াছিল। সেই সময়ে তাহার পুত্র মহিমা চন্দ্র রায় ছয় মাসের শিশু ছিল।

৬১। সওয়া শত বৎসরের খতিয়ান

১০৯০-১০৯৫ সালের মধ্যে বসুচৌধুবিগণ উলপুরে স্থায়ীভাবে বাস আরম্ভ করেন; সুতরাং প্রায় আড়াইশত বৎসর কাল তাহারা উলপুরে বাস করিতেছেন। ইহার মাঝামাঝি সময়ে একটি বাটোয়ারার মোকদ্দমা হইয়াছিল। সেই মোকদ্দমার কাগজে তৎসময়ে জীবিত এই বংশের উর্ধ্বতন পর্যায়ের অনেক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়।

কৃষ্ণরাম রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র হরিরামের পুত্র রামনরসিংহ রায় কৃষ্ণরামের অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণের বিরুদ্ধে ঐ বাটোয়ারা মোকদ্দমা এই মর্মে করেন যে তাহার শরিকগণের মধ্যে কেবল উলপুরের খানাবাড়ি ; এবং রাউতখামার, মোল্লাকান্দি ও করপাড়ার জমি আপোষে বণ্টন হইয়াছে ; কিন্তু অপরাপর মৌজা যথা উলপুর, তেঁতুলিয়া, রাউতপাড়া, বারখাদিয়া, সুরগাঁও, কলপুর, বৌলতলী, হাটবাড়িয়া, আড়ুয়াকংসুর, কংসুর, নিজরা, বলাকড়, তারগাঁও, কৃষ্ণপুর, ঠুটামান্দ্রা, গান্দিয়াসুর, ডেমাকড়ি, পুইসুর, পনসি, ডোমরাসুর, কড়িগাঁও, বনগাঁও, খাটিয়াগড় ও পানাইল প্রভৃতি বিভাগ হয় নাই, এবং অন্য শরিকগণ আপোষে ঐ ঐ মৌজায় তাহার ন্যায্য অংশ দখল করিতে দেয় নাই। প্রথমত বাকরগঞ্জের জজ আদালতে ঐ বাটোয়ারা মোকদ্দমা হইয়া ১২১৮ সালের বৈশাখ মাসে (১৫ এপ্রিল ১৮১১ খ্রিঃ অঃ) ডিক্রি হয়। তখনও সাহাপুর ঢাকা কালেক্টরীর অধীন ছিল (৪২ খ্রিঃ)। সুতরাং ঐ ডিক্রি অনুসারে বাটোয়ারার জন্য রামনরসিংহ রায় ঢাকা জালালপুরের কালেক্টরের নিকট ১২২১ সালের ৭ আশ্বিন তারিখে দরখাস্ত দাখিল করেন। তাহাতে কৃষ্ণরাম রায়ের তৎকালীন জীবিত ওয়ারিশগণকে পক্ষ করা হয়। তাহাদের নাম ও রঘুনন্দন হইতে পর্যায় নিম্নে লিখিত হইল : —কৃষ্ণরামের জ্যেষ্ঠপুত্র রামরামের ৫ম পুত্র লক্ষ্মীকান্ত (৪) ও ষষ্ঠ পুত্র শ্রীকান্ত (৪), জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র রামমাণিক্য (৫), ২য় পুত্রের পুত্র শম্ভুচন্দ্র (৫), ৩য় পুত্রের পুত্র রামপ্রাণ (৫) ও চতুর্থ পুত্রের পুত্র কেবলকৃষ্ণ (৫) এবং কৃষ্ণরামের দ্বিতীয় পুত্র নন্দরামের ২য় পুত্র শিবপ্রসাদ (৪) ও প্রথম পুত্রের পুত্র গোপালকৃষ্ণ (৫)। সুতরাং দেখা যায় ১২২১ সালের পূর্বে রামরাম, নন্দরাম ও হরিরাম তিন ভ্রাতাই পরলোকগমন করিয়াছিলেন; এবং রামরামের প্রথম চারিপুত্র ও নন্দরামের প্রথম পুত্রও পরলোকগমন করিয়াছিলেন। রঘুনন্দনের প্রপৌত্রগণের মধ্যে ছোট সওয়া ৩ আনীর বড় হিস্যায় লক্ষ্মীকান্ত ও শ্রীকান্ত, মধ্যম হিস্যায় শিবপ্রসাদ এবং ছোট হিস্যায় রামনরসিংহ জীবিত ছিলেন।

ঐ মোকদ্দমা নোটিশ জারি হইলে রমাবল্লভ রায়ের তৎকালীন জীবিত ওয়ারিশগণ পক্ষভুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ জমিদারি বাটোয়ারা হইবার জন্য দরখাস্ত করেন (২২ পৌষ ১২২১ সালে)। তাহাদের নাম ও রঘুনন্দন হইতে পর্যায় লিখিত হইল, রাজকৃষ্ণ (৫), নীলকণ্ঠ (৬),

উদয়চন্দ্র (৬) ও রামচন্দ্র (৬)। তাহাতে দেখা যায় সেই সময়ের পূর্বে রমাবল্লভের পুত্র রামনারায়ণ এবং তাহার উভয়পুত্র নন্দকিশোর ও লক্ষ্মীনারায়ণ,—এবং লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র শিবচন্দ্র ও নন্দকিশোরের ১ম পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও ৩য় পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ পরলোক গমন করিয়াছিলেন। বড় সওয়া ৩ আনীর বাড়িতে তখন রঘুনন্দনের প্রপৌত্র কেহই জীবিত ছিলেন না।

রামজীবন রায়ের যে সকল ওয়ারিশ তৎকালে জীবিত ছিলেন তাহারা সকলে ঐরূপ দরখাস্ত করিয়াছিলেন (১৬ অগ্রহায়ণ, ১২২১ সাল)। তাহাদের নাম ও রঘুনন্দন হইতে পর্যায় নিম্নে লিখিত হইল : রাজীবলোচন (৪), রামনিধি (৪) কালিকাপ্রসাদ (৪) ও রামকৃষ্ণ (৫)।

রামদেব রায়ের ওয়ারিশগণের মধ্যে বিষ্ণুরামের পৌত্র শম্ভুচন্দ্র (৫) ও রামগোপালের প্রপৌত্র নবকৃষ্ণ (৬) ঐরূপ দরখাস্ত করিয়াছিলেন। ঐ মোকদ্দমায় ছোট ৩ আনীর শরিকগণ পক্ষভুক্ত হইবার দরখাস্ত করেন নাই। আমিন ভবানীশঙ্কর রাহা তদন্তের কার্যে নিযুক্ত হইলে তাহারা কাগজপত্র দাখিল না করায় ১২২২ সালের ৫ জ্যৈষ্ঠ তারিখে কাগজপত্র দাখিল করিবার জন্য কালেক্টর কর্তৃক তাহাদের উপর নোটিশ হয়। তাহাদের নাম ও রঘুনন্দন হইতে পর্যায় নিম্নে লিখিত হইল : — রামকিঙ্কর (৪), কৃষ্ণকান্ত (৪), হরগোবিন্দ (৫), কমলাকান্ত (৪), মাধবকৃষ্ণ (৪), গোপালকৃষ্ণ (৫), ভবানীচরণ (৪), চণ্ডীচরণ (৪), রাধাকৃষ্ণ (৪), রামচাঁদ (৪), গুরুচরণ (৫), কীর্তিচন্দ্র (৪), কাশীনাথ (৪)। উপরোক্ত কাগজ হইতে দেখা যায় যে ১২২১ সালেও কড়িগাঁও এবং পন্‌সী পৃথক মৌজারূপে বর্তমান ছিল। কবে ইহাদের পৃথক সত্তা লোপ হইয়াছে তাহা জানিবার উপায় নাই।

১২১৬ সালে জমিদারপক্ষ হইতে কালেক্টরীতে যে ইসিম্‌নবিসী দাখিল হয় (৩ পৃঃ) তাহাতে উলপুরের জমিদারগণের পাঁচ হিস্যার ৫ জন গোমস্তার নাম দেখা যায়। তাহাদের অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। নাম কয়টি নিম্নে প্রদত্ত হইল, তাহাদের ওয়ারীশ কেহ জীবিত থাকিলে চিনিতে পারিবেন।

রাধাকৃষ্ণ দাস, রামনাথ বিশ্বাস, রামচন্দ্র পাল, গদাই বিশ্বাস ও রামজয় দাস।

৬২। উপনিবেশের মধ্যযুগ

বসু বংশীয়গণের উলপুরে বাস আরম্ভ হইতে ১২০০ সাল পর্যন্ত উপনিবেশের প্রথম যুগ ও ১২০০ হইতে ১৩০০ সাল পর্যন্ত মধ্যযুগ বলা যাইতে পারে। বসুবংশের যে বংশবল্লী এতৎসহ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে মধ্যযুগে ইহাদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে গ্রামের মধ্যে ঘর করিয়া থাকিবার স্থান সঙ্কুলান হইত না। অনেকে ক্রমে পৃথক বাড়ি করিতে লাগিলেন। তাহাতেও পরে স্থানাভাব হইল।

বংশবৃদ্ধির ফলে পার্শ্ববর্তী বসুচৌধুরিগণের প্রতাপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে অন্যান্য পরগণার প্রজাগণও তাহাদিগকে নিজের জমিদারের মত সম্মান করিতে লাগিল। সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে বসুচৌধুরিগণের মধ্যে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; তাহাদের বুদ্ধিকৌশলে অনেক জটিল বিষয় সহজসাধ্য হইয়াছিল।

বংশবৃদ্ধির কুফলের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত---প্রসিদ্ধ যদুবংশ। উলপুরেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বংশবৃদ্ধির প্রধান এবং অব্যহিত ফল দরিদ্রতা পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়াছিল। সেকালে পাঠশালার শিক্ষাই সকলের চূড়ান্ত বিদ্যা ছিল। দুরদেশে গিয়া বিদ্যার্জনের প্রবৃত্তি অল্পেরই ছিল; নিজ গ্রামে অর্জিত সামান্য বিদ্যায় বিদেশে গিয়া কোন ভাল চাকুরি পাইবার সম্ভাবনা ছিল না ; এবং জমিদারবংশীয়গণের মধ্যে চাকুরি করিবার জন্য বিদেশে যাইবার আগ্রহও কম ছিল। অথচ জমিদারি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইল ; অনেকের জমিদারির আয়ের দ্বারা কোনরূপেই গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ হইত না। দারিদ্র্যের ফলে তাহাদের আচার ব্যবহারের অনেক হীনতা হইতে

লাগিল। পূর্বে সকলেই কুলক্রিয়া করিত, কিন্তু অভাববশত ক্রমে অনেক গৃহে অপসম্বন্ধ হইতে লাগিল। সংখ্যার আধিক্য ও অবস্থার হীনতার জন্য তাহাদের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের মধ্যে বহু বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হইল। সামাজিক সাধারণ ক্রিয়াকর্ম স্ব স্ব দলের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিল। জমিদারির আদায় তহশীল কার্যে সামান্য সময় ব্যয়িত হইত; অবশিষ্ট সমস্ত সময়ে অনেকেরই কোন কাজ ছিল না ; সেকারণে নানাবিধি ব্যসন বহু পরিমাণে দেখা দিল। বলবান লোক কথায় কথায় দুর্বলের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল, এবং দুর্বল শরিকের জমি বলপূর্বক বেদখল করিয়া নিজ দখলে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এজন্য পরস্পরের মধ্যে অনেক দাঙ্গা হাঙ্গামা হইত।

তখন অতি সস্তায় মদ্য বিক্রয় হইত। ফলে উলপুরে সুরাপান অবাধে চলিতে লাগিল। শিক্ষার অভাবের সঙ্গে এইরূপ সুরাপানের অবাধ প্রচলনে অনেকের চরিত্রের এত অধোগতি হইল যে শান্তপ্রকৃতি নিরীহ লোকের রজনীতে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল।

সেই সময়ে অন্যায় কার্যের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক অনেক লোক জুটিয়া যাইত। তজ্জন্য অনেক সময়ে ন্যায্য পক্ষের লোকদিগেরই হার মানিতে হইত। কথায় কথায় ছলে ছুতায় লোকে শত্রুতাসাধনের জন্য বিবাদ করিত। সাম্য ও স্বাতন্ত্র্যের এমন বিকৃতভাব লোকের মধ্যে প্রবল হইয়াছিল যে প্রত্যেকেই নিজেকে অন্যের সমান মনে করিত ; বয়োবৃদ্ধ বা জ্ঞানবৃদ্ধ বলিয়া কাহারও মত বা উপদেশ গ্রাহ্য করিতে অনেকেই প্রস্তুত ছিল না। এই সময়ে কোনও সামান্য সামাজিক বা জমিদারি সংক্রান্ত তর্ক উপস্থিত হইলেও তাহার মীমাংসা করা দুঃসাধ্য হইত! বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই সকল উৎপাত সহ্য করিয়াও কোনরূপে বিবদমান দলসমূহকে থামাইয়া রাখিয়া সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিতেন।

খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী ও স্বদেশসেবক স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরি এই যুগে এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি উলপুরের যেরূপ অবস্থা ও আচার ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস তাহার মুরলা নামক সত্যঘটনা মূলক উপন্যাসের (১২৯৯ সালে প্রথম প্রকাশিত) ২য় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে প্রদান করিয়াছেন। তাহার কিয়ংদশ এখানে উদ্ধৃত হইল। এই পুস্তকে তিনি উলপুরকে 'আরামপুর' নামে অভিহিত করিয়াছেন :—

'আরামপুরের বাবুরা জমিদার। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় অনেকেই দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন। দারিদ্র্যের জন্য লেখাপড়া শিক্ষার প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য অবশিষ্ট লোক বিবাহাদির পণের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকেন। যাহারা লেখাপড়ায় বিমুখ তাহাদের ২/৪টি ছেলে মেয়ে হইলে তাহাদের বিবাহের পণের দ্বারা চলিবে এরূপ আশা অনেকে করিয়া থাকেন। আরামপুরের এজন্য নিন্দা নাই। আরামপুরে ছেলে-মেয়ের বিবাহ দিতে বহুদূরের লোকেরা উৎসুক। ***

গ্রামে এত লোকের বসতি যে গৃহস্থ ব্যক্তি ঘর করিতে স্থান পায় না। চৌধুরি বাবুরা কিন্তু বার মাস গৃহাবাসের কষ্ট সহ্য করিয়াও দেশান্তরে যান না। পুরুষ পরম্পরার প্রথা দেশান্তরিত হইতে নিষেধ করে। আরামপুর গ্রামটি ছোট, কিন্তু খুব জনাকীর্ণ।'

ইহার পর গ্রন্থকার উলপুরের দুইটি যুবকের কথোপকথনের অবতারণা করিয়াছেন। তাহাতে উলপুরে তৎকালে প্রচলিত অবাধ মদ্যপান ও নানাবিধ দুর্নীতির উল্লেখ করিয়াছেন।

১২৮২ সালে রামজীবন রায়ের বংশীয় প্রসিদ্ধ চন্দ্রকুমার রায়ের প্রথম পুত্র প্রভাসচন্দ্র রায় প্রথম যৌবনে কয়েকটি মাতাল কর্তৃক শোচনীয়ভাবে নিহত হয়। কয়জন সুরাপায়ী উত্তরের ঘোষের বাড়ির বহির্বাটীতে বসিয়া মদ্যপান করিতেছিল। সেই সময়ে যুবক প্রভাসচন্দ্র স্নানার্থে

ঐ বাড়ির পার্শ্ব দিয়া নিকটবর্তী পুষ্করিণীতে যাইতেছিল। মাতালগণ তাহাকে জোরপূর্বক সুরাপান করাইয়া তৎপর তাহার নেশা ছুটাইবার ছলে তাহাকে ঐ পুষ্করিণীর জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলে।

এই শোচনীয় ঘটনাতেও লোকের চৈতন্য হইল না, সুরাপান কমিল না। শেষে নব্যসম্প্রদায়ের অনেকের চেষ্টায় উলপুরের খোলাভাটি উঠিয়া গেল ; যাহারা বেঝাড়া মদ বিক্রয় করিত তাহারাও দণ্ডিত হইল ; ক্রমে মদের দামও বাড়িয়া গেল। এই সমস্ত কারণে এবং শিক্ষার বিস্তারের ফলে ও দারিদ্র্যের পীড়নে ক্রমে ক্রমে সুরাপান কমিয়া গিয়াছে।

এই যুগে পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির এবং সৎসাহসের অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল। কয়েকবার কলেরা মহামারীর ভীষণ আক্রমণে বহুলোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু প্রতিবেশীর দ্বারা কলেরা রোগী কোন সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই। শুনা গিয়াছে যে কোন ঘরে কলেরার আক্রমণ হইলে সেই বাড়ির অপরাপর ঘরের লোকেরা সন্ধ্যার সময়েই ভয়ে দরজা বন্ধ করিত। মদ্যপগণের মধ্যে কেহ কেহ দল বাঁধিয়া আসিয়া রোগীর এক একবার খোঁজ করিয়া যাইত। প্রকৃত প্রস্তাবে চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার কোন ব্যবস্থা হইত না।

বিধাতার অনুগ্রহে এখন লোকের মতিগতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। এখন সাধারণত লোকে ব্যারাম পীড়া ও আপদ-বিপদে পরস্পরের যথেষ্ট সহানুভূতি ও সাহায্য করিয়া থাকে।

৬৩। জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধ

বসু চৌধুরিগণের জমিদারির প্রথম অবস্থায় এ দেশে লোকসংখ্যা খুব কম ছিল, জমিও অনেক স্থানেই বিলময় থাকায় বহু জমি পতিত ছিল। নতুন প্রজা আনিয়া স্থাপিত না করিলে সমস্ত জমি আবাদ করানো সম্ভব ছিল না। কাজেই প্রথম সময়ের ভূস্বামীগণ অন্য স্থান হইতে লোক আনাইয়া, বাসের জন্যে ভিটা দিয়া জমি পত্তন করিয়া দিতে লাগিলেন এবং প্রথম প্রথম তাহাদিগের থাকিবার ও চাষাবাদের কার্যের সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাহাদের খাদ্যের অভাব হইলে নিজেদের গোলা হইতে ধান্য দিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়া রাখিয়াছেন, এবং অর্থের অভাব হইলে টাকা ধার দিয়াছেন। তখন জমিদারগণের সংখ্যা কম সুতরাং তাহাদের যাহা আয় হইত তাহাতেই সচ্ছল ভাবে চলিত। সেইজন্য খাজনা আদায় সম্পর্কেও প্রজাগণের উপর বিশেষ উৎপীড়ন ছিল না ; তাহাদিগের সুযোগ সুবিধামত নগদে ও ধানে খাজনা আদায় হইত। প্রজাগণের কোনরূপ অভাব বা আপদ বিপদ উপস্থিত হইলেও জমিদারগণের নিকটে আশ্রয় পাইত। এইভাবে জমিদারির কার্য চলাতে প্রথম শতাধিক বৎসর প্রজাগণ খুব শান্তিতে ছিল। জমিদার তাহাদের বাড়ির নিকটে থাকাতে অনুক্ষণ জমিদার ও প্রজার দেখা সাক্ষাৎ হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে বিশেষ আত্মীয়তার ভাব জন্মিয়া উঠিল, তাহার ফলে প্রজাগণ জমিদারগণকে পিতৃবৎ ভক্তি ও মান্য করিত, জমিদারও প্রজাদিগকে নিজ পরিবারভুক্ত লোকের ন্যায় দেখিতেন। ক্রমে প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেও মোটের উপর প্রজা মনিবে বেশ সদ্ভাবই ছিল। প্রজাগণের দরকার মত জমিদারগণের নিকট হইতেই ঋণ গ্রহণ করিত; অন্য কেহ তাহাদিগকে টাকা কর্জ দিতে সাহস পাইত না। তাহাদের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ বিসম্বাদ হইলেও জমিদার কর্তৃকই তাহার মীমাংসা হইত।[১]

৬৪। প্রজাবিদ্রোহ বা 'জোট' (১২৬৭-১২৭০ সাল)

প্রজা ও জমিদারের মধ্যে এইরূপ সদ্ভাব ও ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে মাঝে মাঝে কোন কোন প্রজার সঙ্গে জমিদারবংশীয়গণের বিরোধ হইয়াছে ; তাহা মিটিয়া গেলেও সেই সেই প্রজার মনে অসন্তোষবহ্নি প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়া গিয়াছে। দেশের অনেক জমি ভালরূপ উঠিত না ; তদুপরি শস্যেরও নানাবিধ শত্রু ; একারণে অনেক প্রজা নিয়মমত খাজনা

দিতে পারিত না। ক্রমে জমিদারের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় অনেকের আয় কম হইতে লাগিল ; সুতরাং তাহারা খাজনার জন্য পীড়াপীড়ি না করিয়া পারিতেন না। তখনকার আইন অনুসারে কোন কোন জমিদার প্রজাকে বাড়িতে আটক রাখিয়া, কিংবা নিজের লোকের দ্বারা প্রজার জমির ধান ক্রোক দিয়া খাজনা আদায় করিতেন। তাহা প্রজাগণের ভাল লাগিত না। এই সকল কারণে অনেক প্রজা কোন কোন জমিদারের প্রতি অসন্তোষভাব পোষণ কবিতে লাগিল। এদিকে প্রজার উপর যাহাতে জমিদারগণ কোন অত্যাচার করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে গবর্নমেন্ট ১৮৫৯ খ্রিঃ অব্দের ১০ আইন, ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসে পাশ করেন। তাহার সংবাদ বঙ্গের সমস্ত পল্লীগ্রামে প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে জমির ফসল ক্রোক করিয়া খাজনা আদায় করা প্রভৃতি জমিদারের যে সকল অধিকার ছিল তাহা রহিত হইল। মফঃস্বলে প্রচারিত হইল যে বিনা মোকদ্দমায় জমিদার জোরপূর্বক প্রজার নিকট হইতে কিছুই আদায় করিতে পারিবে না। ১২৬৪ সালে ও ১২৬৫ সালে বঙ্গদেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থানে সিপাহী বিদ্রোহের জন্য স্বয়ং ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট বিচলিত হইয়াছিলেন। মফঃস্বলে তাহার বিবরণ বহুগুণ বর্ধিত আকারে প্রচারিত হইয়াছিল। বিদ্রোহ সংক্রামক ব্যাধি। অনেক প্রজা মনে করিল তাহারা বিদ্রোহী হইলে জমিদার কিছুই করিতে পারিবে না। এইরূপ নানাকারণে জমিদারের প্রতি অসন্তুষ্ট অনেক মাতব্বর প্রজার মনে ধারণা হইল যে তাহারা জোটবদ্ধ হইয়া খাজনা বন্ধ করিলে জমিদারগণ কোনরূপেই খাজনা আদায় করিতে পারিবে না। ইহা ছাড়া জনশ্রুতি এই যে পূর্বাবধি স্ববংশীয়গণের প্রতি বিদ্বিষ্ট কোন কোন জমিদার প্রজাগণকে এই বিদ্রোহের কার্যে প্ররোচিত ও উত্তেজিত করিয়াছিল। পরে যখন প্রতিবেশীর গৃহে প্রদত্ত অগ্নি আসিয়া তাহাদের নিজ বাসগৃহও দগ্ধ করিল তখন তাহারা স্বকৃত দুষ্কার্যের বিষময় ফল উপলব্ধি করিয়াছিল।

১২৬৬ সালে এই জোটের সূত্রপাত। প্রথমত কোন কোন মাতব্বর প্রজার মনে জমিদারের খাজনা বন্ধ করিয়া প্রজামহলে পৌরুষ দেখাইবার ও খ্যাতি অর্জন করিবার উচ্চাভিলাষ জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই পরগণার সাধাবণ প্রজাগণ নির্বিরোধী শান্ত প্রকৃতির লোক। তাহাদের জোট করিবার প্রবৃত্তি ছিল না ; কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহাদেরও বাধ্য হইয়া জোটে যোগদান করিতে হইয়াছিল। এই জোটের কারণ যাহাই হউক, ইহার ফলে অনেকের সর্বনাশ হইয়াছিল, এবং প্রজা ও জমিদার সকলেরই কয়েক বৎসর ভীষণ কষ্ট ও অপরিসীম অনিষ্ট হইয়াছিল।

উলপুরের উত্তর ও পূর্ব জোয়ারের মাতব্বর প্রজাগণ স্থানে স্থানে সমবেত হইয়া প্রথমত গোপনে ও পরে প্রকাশ্যে জমিদারগণের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হইবার জন্য মন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। ষড়যন্ত্রকারিগণ সাহাপুর পরগণার উত্তর সীমানাস্থিত কলপুর গ্রামে জোটের কেন্দ্র স্থাপিত কবিয়া সেই গ্রামের আনু উকিলকে (ডাক নাম নানু মিএগ্র) জোটের নেতৃত্বে বরণ করিল এবং সরিতুল্লা, সর্দার, ভগীরথ বালা, কালীচরণ মণ্ডল, রামতনু মণ্ডল প্রভৃতি কয়েকজন মুসলমান ও নমঃশূদ্র মাতব্বরকে জোট কমিটির মেম্বার নিযুক্ত করিল। এই সকল মেম্বারগণের কর্তব্য জমিদারগণের অনুগত ও স্বপক্ষীয় প্রজাগণকে ছলে বলে জোটে যোগদান করান, পরগণার সমস্ত প্রজাগণের উপর জোটের খরচ নির্বাহের জন্য চাঁদা বা হার আদায় করা, এবং তদ্দ্বারা তাহাদের আবশ্যকীয় লাঠিয়াল প্রভৃতি রাখা। এই সমস্ত চাঁদা টাকা নানু মিএগ্রর কথামত ব্যয়িত হইত, এবং জোটের কার্যাদি মুখ্যত তাহারই আদেশ মত পরিচালিত হইত।

প্রথমত বিদ্রোহী প্রজাগণ জমিদারের প্রাপ্য খাজনা ও কর্জা টাকা বন্ধ করে। পরে যখন পরগণায় অধিকাংশ প্রজা ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় তাহাদের দলভুক্ত হইল তখন তাহাদের সাহস বাড়িয়া গেল। সেকালে অনেক জমিদারের বিশ্বাসী-প্রজা-বাড়িতে ধানের গোলা ছিল। বিদ্রোহী প্রজাগণের চেষ্টায় প্রকারান্তরে জমিদারের ধানের গোলাগুলি তাহাদের হস্তগত হইল।

যদিও তাহারা ধানের গোলায় জমিদারগণের স্বত্বাধিকার অস্বীকার করিল না, তথাপি ঐ সকল ধান তাহাদের অভাববশত খরচ করিয়াছে এইরূপ মিথ্যা উক্তি করিয়া জমিদারগণকে ঐ ধান হইতে বঞ্চিত করিতে লাগিল।

উলপুর গ্রামের অধিবাসী কোন লোক জোটে যোগ দেয় নাই। পরগণার মধ্যে রাউতখামার, মোল্লাকান্দি ও তেঁতুলিয়া উলপুরের সংলগ্ন এবং পরগণার অন্যান্য গ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন ও জোটের কেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থিত। এইসব গ্রামের প্রজাগণ পরগণার অন্যান্য প্রজাগণ অপেক্ষা শিষ্টাচারী এবং জমিদারগণের সহিত তাহাদের খুব সদ্ভাব ছিল। তাহারা জোটে যোগদান করে নাই, জমিদারগণের প্রাপ্য খাজনাদি নিয়মিতরূপে আদায় করিয়াছে এবং সাধ্যমত অন্যান্য উপায়ে জমিদারগণের সাহায্য করিয়াছে। পশ্চিম নিজরা ও কাঁঠালবাড়িও উলপুরের সংলগ্ন ; কিন্তু জোটের গ্রামসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। তাহারা দুইদিকেই রহিয়াছে। সেইসব গ্রামের প্রজাগণ জমিদারকেও কতক কতক খাজনা আদায় করিয়াছে আবার জোটের চাঁদাও দিয়াছে। বিদ্রোহী প্রজাগণের ভয়ে তাহারা দিনে উলপুরে না আসিয়া রাত্রিতে স্ব স্ব জমিদার বাড়িতে ধান্য, চাউল ও টাকা দিয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরগণার অন্যান্য সমস্ত গ্রামের প্রজা সম্পূর্ণ বিদ্রোহী হইয়া খাজনা ও কর্জাটাকা দেওয়া একেবারেই বন্ধ করিয়াছিল। গোমস্তা ও তহশীলদারগণ মফঃস্বলে খাজনা আদায় করিতে গেলে বিদ্রোহীগণ বলিত যে তাহারা জমিদারির মালিক নানু মিঞাকে খাজনা দেয়। গোমস্তা প্রভৃতির প্রতি তাহারা ক্রমে উদ্ধত ব্যবহার করিতে লাগিল এবং অপমানের ভয় দেখাইতে লাগিল। ১২৬৭ ও ১২৬৮ সালে এইরূপ চলিল।

অল্প কয়েকখানি গ্রামের প্রজার নিকট প্রাপ্ত খাজনা হইতে জমিদারগণের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহ হওয়া সম্ভবপর ছিল না। ইহার উপর আত্মরক্ষার জন্য জমিদার পক্ষে ২ বৎসর কাল রীতিমত মাহিয়ানা ও আহার্য দিয়া ২/৩ দল লাঠিয়াল রাখিতে হইল। জমিদারগণ অতি কষ্টে এই ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলেন।

জমিদার পক্ষে যে সমস্ত লাঠিয়াল ও সিপাহি রাখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে হরিনারায়ণ মিশ্র নামে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহাকে লোক মিশ্রী ঠাকুর বলিয়া ডাকিত। মিশ্রী ঠাকুর পূর্বে গবর্নমেন্টের পল্টনে সিপাহির কার্য করিতেন। বটকৃষ্ণ মিশ্র নামে আর একজন হিন্দুস্থানীও এই কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল যাবৎ এই সকল দেশওয়ালী ও অন্যান্য লাঠিয়ালদিগকে অনর্থক ঘরে বসাইয়া বেতন ও আহার্য দেওয়া হইতেছে দেখিয়া ১২৬৯ সালের বর্ষাকালে সাহসী মিশ্রী ঠাকুর কয়েকজন লাঠিয়াল সহ মফঃস্বলে কাছারী করিয়া প্রজা তলব দিয়া খাজনা আদায় করিতে আরম্ভ করে। কোন কোন প্রজা খাজনা দিল এবং অপর অনেকে জোটের সর্দারগণের ষড়যন্ত্র-অনুযায়ী বলিল যে তাহারা এবং আরও অনেকে পরবর্তী করপাড়ার হাটের দিন ঐ হাটে বসিয়া খাজানা দিবে। জমিদার পক্ষের লোকেরা তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া পরবর্তী করপাড়ার হাটের দিনে মিশ্রী ঠাকুর, বটকৃষ্ণ মিশ্র ও অপর কয়েকজন লাঠিয়াল সহ করপাড়ার হাটে খাজনা আদায় করিতে উপস্থিত হইল।

তখন শ্রাবণ মাস,—পূর্ণ বর্ষাকাল,—পরগণার সকল স্থানে জল থই থই করিতেছিল। করপাড়ার হাট একটি উচ্চ ভিটার উপর বসিত ; সেখানে কোন স্থায়ী দোকানঘর ছিল না। ঐ সময়ে ঐ হাটের চারিদিকে গভীর জল। জমিদার পক্ষের লোকেরা অস্ত্রশস্ত্রসহ কয়েকখানা ছোট নৌকায় ঐ হাটে গেল। এদিকে ষড়যন্ত্রকারী প্রজাগণ পূর্ব পরামর্শানুযায়ী বহু নৌকায় লাঠি, শড়কী, এড়া, জুতি প্রভৃতি প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া হাটে উপস্থিত হইল। দুই এক কথার পরে তাহারা মিশ্রী ঠাকুরের দলকে একযোগে আক্রমণ করিল। মিশ্রী ঠাকুর প্রভৃতি আত্মরক্ষা

করিতে করিতে নিজ নিজ নৌকার কাছে আসিলেন। প্রজাপক্ষের লাঠিয়ালগণ চতুর্দিক হইতে তাহাদের প্রতি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল ; তাহারা ঢাল শড়কীর সাহায্যে অনেকক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। মিশ্রী ঠাকুরের অদ্ভুত সমরকৌশল দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। বটকৃষ্ণ মিশ্র গুরুতররূপে আহত হইলেন। মিশ্রীঠাকুর অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিপক্ষগণের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু নিজ নৌকায় উঠিবার সময়ে বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত এড়া তাহার পৃষ্ঠদেশের নিম্নে মেরুদণ্ডের নিকটে সজোরে প্রবিষ্ট হওয়ায় বিদ্রোহীগণ ঐ এড়াসহ তাহাকে টানিয়া নিয়া যৎপরোনাস্তি যাতনা দিতে লাগিল।

বিদ্রোহীগণ আহত মিশ্রীঠাকুর ও বটকৃষ্ণ মিশ্রকে ও অন্যান্য জখমীগণকে হত্যা করিয়া লাশ গোপন করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে লইয়া জোটের নায়ক নানু মিঞার বাড়িতে গেল। সেইখানে যখন ঐসব লোককে হত্যা করিয়া তাহাদের দেহ গোপন করিবার পরামর্শ হইতেছিল, তখন নানু মিঞার ভগিনীকে মিশ্রীঠাকুর মাতৃসম্বোধন করিয়া প্রাণ ভিক্ষা চাহেন। তাহার ঐরূপ শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টে ও করুণ অনুনয় শ্রবণে নানু মিঞার ভগিনীর মনে দয়া ও ধর্মভাবের উদয় হইল। নানুর ভগিনী দয়াপরবশ হইয়া নানু মিঞাকে ও জোটের অন্যান্য সর্দারগণকে ঐ গর্হিত কার্য হইতে বিরত হইবার জন্য বহু অনুরোধ করায় তাহারা অবশেষে মিশ্রীঠাকুর ও বটকৃষ্ণ মিশ্র ও অন্যান্য জখমী লোকদিগকে হত্যা না করিয়া উলপুর গ্রামের উত্তর প্রান্তে একটি ছাড়া ভিটায় গভীর রাত্রিতে ফেলিয়া গেল। এই ঘটনা ১২৬৯ সালের শ্রাবণ মাসে সংঘটিত হয়।

৬৫। জোটের অবসান

করপাড়ার হাটে স্বপক্ষীয়গণের বিপদের সংবাদ সন্ধ্যার মধ্যেই লোকমুখে উলপুরে পৌঁছিল। এই সংবাদে জমিদারগণ প্রমাদ গণিলেন ; কারণ তাহাদের পক্ষের বাছা বাছা লোক করপাড়ার হাটে গিয়াছিল। এদিকে গুজব রটিল বিজয়ী বিদ্রোহীগণ উলপুর আক্রমণ করিয়া জমিদারি বাড়ি লুঠ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। জমিদারগণ নিশাযোগে আত্মরক্ষার জন্য সাধ্যমত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন ; নিকটস্থ বাধ্য গ্রাম সমূহ হইতে বলবান্ ব্যক্তিদিগকে উলপুরে আনাইয়া রাখিলেন এবং বেতনভোগী যে সব লাঠিয়াল উলপুরে ছিল তাহাদিগকে নৌকায় নৌকায় উলপুর গ্রামের পূর্ব ও উত্তর ভাগে প্রহরীর কার্যে প্রেরণ করিলেন। বাস্তবিক পক্ষে বিদ্রোহীগণ জমিদার বাড়ি আক্রমণ করিবার কল্পনা করে নাই। পাহারার কার্যে নিযুক্ত এক নৌকার লোক যে ভিটায় মিশ্রীঠাকুর প্রভৃতিকে বিদ্রোহীগণ ফেলিয়া গিয়াছিল সেই ভিটার নিকট দিয়া যাইবার সময়ে সেখানে তাহাদিগকে মৃতবৎ দেখিতে পাইয়া, নৌকায় তুলিয়া তৎক্ষণাৎ জমিদার বাড়িতে লইয়া আসিল। তাহাদের মুখে জমিদারগণ করপাড়ার হাটের ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ জ্ঞাত হইয়া ক্ষোভ ও ক্রোধে অধীর হইলেন। তখন জমিদারগণের বৈঠক হইয়া সেই রাত্রিতেই ৪/৫ খানি নৌকায় বহুলোকসহ জখমীগণকে বরিশাল পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেইসব লোক কোটালিপাড়া থানায় এই ঘটনার এজাহার করিয়া বরিশাল চলিয়া গেল। সেখানে তখন উলপুরের প্রসিদ্ধ নবীনচন্দ্র রায় ওকালতি কার্যে নিযুক্ত ছিলেন ; তিনি উদ্যোগ করিয়া সেখানে জখমীগণকে সিভিল সার্জন কর্তৃক পরীক্ষা করাইয়া তাহাদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং যাহাতে বিদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মোকদ্দমা উপযুক্তভাবে পরিচালিত হয় তৎপক্ষে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন। বটকৃষ্ণ মিশ্র জখমের ফলে বরিশালে প্রাণত্যাগ করেন। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করিতে আসিবার পূর্বেই জোটের প্রধান নায়ক নানু মিঞা ও ভগীরথ বালা প্রভৃতি দেশ ছাড়িয়া পলাতক হইয়াছিল। পুলিশ আসিয়া জোটের অন্যান্য নায়ক ও দাঙ্গাকারী অনেক প্রজাকে আসামী

শ্রেণিভুক্ত করিয়া চালান দেয়। বাকরগঞ্জে সেশন জজ বকল সাহেবের (Mr. W. B. Buckle) বিচারে সরিতুল্লা সর্দার প্রভৃতি ১৭ জন আসামীর দীর্ঘকালের জন্য সপরিশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল এবং বাকী আসামীগণের বিচারের জন্য তলব হইল। বহু প্রজা ভয়ে পরিবার পরিজন সহ ভিটা ছাড়িয়া দূরবর্তী অন্যান্য পরগণায় চলিয়া গেল। জোট ভাঙিয়া গেল। যে কয়েক ঘর প্রজা থাকিল তাহারা জমিদারগণের নিকট কাঁদাকাটি করিয়া কিছু কিছু দণ্ড গ্রহণ করিয়া রহিয়া গেল। এই ভাবে ১২৭০ সালে জোটের অবসান হইল।

এই ঘটনা উপলক্ষে যে সকল ছড়া রচিত হইয়াছিল তাহার একটির দুই ছত্র এইরূপ—

সরিতুল্লা ম্যাদে গেল, টের পাইল না নানু।
আখার উপব ডাল চড়াইয়া পলাইল রামতনু ॥

৬৬। জোটের পরের অবস্থা

১২৬৬ সালে জোটের সূত্রপাত হয়, ১২৬৭ সাল হইতে ১২৬৯ সালের কয়েক মাস পর্যন্ত পূর্ণ উদ্যমে জোট চলে, ১২৭০ সালে জোটের অবসান হয়। এই সময়ে জমিদারগণের ভীষণ অর্থাভাব ও অবর্ণনীয় কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু জোটের অবসানেই তাহাদের দুঃখের অবসান হইল না। সেই সময়ে লোকের মধ্যে শিক্ষা ও সাধারণ জ্ঞানের নিতান্তই অভাব ছিল। একটি লাল পাগড়ী দেখিলে এক গ্রামের সমস্ত লোক ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করিত। এই অবস্থায় দায়রা জজের বিচারে ১৭ জন আসামীব গুরুতর শাস্তি হওয়ায় এবং বাকী আসামী ধরা উপলক্ষে পুলিশের লোক ঘন ঘন আসা যাওয়া করায়, প্রাণ ভয়ে পরগণার বহু প্রজা ভিটা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কথিত আছে যে এসময়ে জোটের গ্রাম সমূহ প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। তাহার ফলে জোটের সময়ে জমিদারগণের যেরূপ অভাব ছিল, জোট অন্তেও সেইরূপ রহিল ; কারণ জমিচাষ করিবার লোক না থাকিলে খাজনা কে দিবে? যে সব প্রজা ভিটা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল তাহারা শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে সাহসী হইল না ; অন্যান্য পরগণা হইতে দুই এক ঘর প্রজা বেশি জমি পাইবার লোভে আসিল সত্য, কিন্তু বহু জমি অনাবাদী পড়িয়া থাকিল। পরে জমিদারগণ তাহাদের পূর্ব প্রজাদিগকে অভয় দিয়া ফিরিয়া আসিবার জন্য লোক দ্বারা সংবাদ দিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ২/১ জন করিয়া আসিতে লাগিল। ১২৭৩ সালে দুই এক ঘর প্রজা ফিরিয়া আসিতে লাগিল ; তাহার দুই তিন বৎসরের মধ্যে আরও অনেক প্রজা ফিরিয়া আসিল; জোটের অন্যতম নেতা ভগীরথ বালা ফিরিয়া আসিয়াছিল। ফৌজদারি কোর্টের আদেশ অনুযায়ী তাহার ও অন্য কয়েকজন ফেরারী আসামীর তলব হইয়া বিচার হইয়াছিল। কিন্তু জমিদারগণ তাহাদিগকে ভরসা দিয়া ফিরাইয়া আনিয়া ছিলেন, সুতরাং তাহারা উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণ না দেওয়ায় ভগীরথ বালা প্রভৃতি পরবর্তী বিচারের আসামীগণ মুক্তি পাইল।

এই জোটের ফলে বহু প্রজার গুরুতর অনিষ্ট হইয়াছিল। যাহারা ভিটা ছাড়িয়া গিয়াছিল তাহাদের সকলেব খোঁজ পাওয়া যায় নাই ; সেইসব লোক তাহাদের বাস্তু ও জমি হইতে বঞ্চিত হইল। অনেক প্রজা জমিদারগণেব নিকট হইতে টাকা কর্জ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিত; জোটের সময়ে কর্জা টাকার অভাবে তাহাদের ব্যবসা বন্ধ হইল। অনেক প্রজা জমিদার বাড়িতে কার্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত; জোটের সময়ে তাহাদের অন্নাভাব হইল। তাহা ছাড়া এই বিপ্লব ও দাঙ্গা হাঙ্গামাব ব্যাপাবে পরগণার লোকদিগের মধ্যে ভয়ঙ্কর অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। এই অবস্থা দূর হইয়া দেশ পূর্ববৎ শান্তভাব ধারণ করিতে ৭/৮ বৎসব লাগিল।

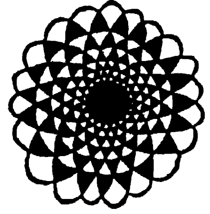
৬৭। ব্যষ্টি ও সমষ্টি

এই অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে উলপুরের বসুবংশীয়গণের মধ্যে অতীতকালে যেরূপ অনৈক্য ও পরস্পরের বিরোধের ভাব প্রকট হইয়াছিল তাহার আভাষ দেওয়া হইয়াছে। দুঃখের বিষয় জাতীয় শক্তির ধ্বংসকর অনৈক্য ও বিরোধ এখনও তাহাদের মধ্যে বলবৎ আছে। ক্ষুদ্র পল্লীসমাজে এরূপ অনৈক্য যে নিতান্ত অনিষ্টকর তাহা বুঝিয়াও লোক তাহা পরিহার করিতে প্রয়াসী হয় না। এই অনৈক্যের ফলে পূর্বপুরুষের অর্জিত মান প্রতিপত্তি নানারূপে ক্ষুণ্ণ হইতেছে দেখিয়াও লোকের মোহ দূর হইতেছে না। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিবার অনেক সুবিধা আছে দেখিয়া ব্যক্তিগত সুখ ও স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে খর্ব করিয়াও লোকে নানা বিধি-নিষেধ মানিয়া লইয়া সমাজে বাস করে। সামাজিক বিধিসমূহ কোন রাজশক্তির দ্বারা প্রচারিত না হইলেও সর্বসাধারণের সম্মতি ও ঐকমত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহার শক্তি রাজশক্তি অপেক্ষা কম নহে। ঐক্য সামাজিক নিয়ম সমূহের দৃঢ় ভিত্তি, ঐক্যই সমাজের শক্তি এবং সামাজিক ও জাতীয় উন্নতির মূল কারণ। কিন্তু আমরা সামান্য ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রতিপত্তির প্রলোভনে অন্ধ হইয়া পরস্পরের মধ্যে সামাজিক উন্নতির ভীষণ অন্তরায় অনৈক্যের বিষ বিস্তার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করি না। ব্যক্তিগত হীন স্বার্থান্ধতা সমস্ত দলাদলি ও কলহ বিবাদের মূল। ইহাকে দূর করিতে না পারিলে ব্যষ্টি কিংবা সমষ্টি কাহারই মঙ্গল নাই। হিংসাদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, দলাদলি প্রভৃতি দোষে আমাদের পল্লীসমাজ বহুকাল হইতে জর্জরিত, তাহার বিষময় ফল আবাল বৃদ্ধবণিতার অগোচর নাই। তথাপি এই সমস্ত ব্যাধির প্রতিকার করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের শোণিত-প্রবাহের সঙ্গে যেন অনৈক্যের বীজাণু মিশ্রিত আছে ; হিংসা দ্বেষ যেন আমাদের মেরুদণ্ডের মধ্যে মজ্জাস্বরূপ রহিয়াছে। মানব সমাজের এই সকল ঘোর শত্রুকে দূর করিয়া সকলের মধ্যে একতার ভাব প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে আমাদের সামাজিক কিংবা জাতীয় উন্নতি সম্ভব নহে। অনৈক্য অশেষ দুর্গতির মূল। জ্ঞানী ও চরিত্রবান ব্যক্তিগণের উপদেশ ও অবলম্বিত পথ অনুসরণ করিয়া সমাজের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য স্থায়ী করিবার জন্য সকলের উদ্যোগী হওয়া একান্ত কর্তব্য ; কারণ প্রকৃত ঐক্য ব্যতীত সমাজে মানসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিবার কিংবা মানুষের মত জীবন-যাপন করিবার অন্য পথ নাই।

---

১. ফরিদপুর জেলায় সাধারণত প্রজা-মনিবে সদ্ভাব ছিল। তৎসম্বন্ধে সেটলমেন্ট রিপোর্টে নিম্নলিখিতরূপ উল্লেখ আছে :

Legislation on the Subject of the relation between landlord tenant was not, it appears, made necessary by anything in the condition of Faridpur. As far as can be ascertained the relations between the landlords and tenants in this district have usually been very amicable Enhancement of rent which has been so common elsewhere has taken place very rarely in this district while arbitrary evictions and arbitrary exactions have never been a feature of agricultural life. Several causes appear to account for this. In the marshes the compatition has always been for tenants, and not for lands, and this must have made the treatment of tenants very mild *Jack's Final Report on the Survey and Settlement operations in the Faridpur District, P 50 para 108.*



ষষ্ঠ অধ্যায়
পল্লীবাসীর কথা

৬৮। মধ্যযুগের কতিপয় ব্যক্তি

লোকে নাটক নভেল পড়িয়া ও যাত্রা থিয়েটার, টকি, বায়োস্কোপ দেখিয়া মুগ্ধ হয় ; কিন্তু অনেকেই ভাবিয়া দেখে না যে আমাদের আশে-পাশে গৃহে গৃহে নিত্য নতুন নাটকের অভিনয় হইতেছে; নিত্য নতুন উপন্যাসের উপাদান সঞ্চিত হইতেছে। অনেকের জীবন উপন্যাস অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক, নাটক অপেক্ষা বৈচিত্র্যময়, অথচ সত্য ঘটনায় পূর্ণ। দেশে দেশে, পল্লীতে পল্লীতে এমন অনেক অখ্যাতনামা নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যাহাদের জীবন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বীর, কর্মী, কবি, সাহিত্যিক, ধার্মিক ও রাজনৈতিক নেতাগণের জীবনের সহিত অনেকাংশে তুলনীয় হইতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র ও সুযোগের অভাবে তাহাদের প্রতিভাপ্রসূন পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারে নাই ; জগতের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা লাভ তাহাদের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না ; তাহাদের জীবন কাহিনী বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

লোকলোচনের অগোচরে, ভদ্রসমাজ ও আত্মীয়-স্বজন হইতে দূরে অবস্থিত বিল ও জঙ্গলময় উলপুরেও অনেক মনস্বী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে তাহারা প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। অশিক্ষা ও দুর্গতির কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন, প্রভুত্ব ও আভিজাত্য গৌরবে গর্বিত, বিভিন্ন মতাবলম্বী, পরস্পর বিরোধী অগণিত জ্ঞাতিগণের মধ্যে ঐক্য স্থাপন ও বিবাদভঞ্জনের প্রয়াসে এবং পার্শ্ববর্তী প্রবল জমিদারগণের আক্রমণ হইতে পৈতৃক জমিদারি রক্ষার চেষ্টায় তাহাদের অনেকের সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা ব্যয়িত হইয়াছে। স্ববংশীয়গণের জাতীয় জীবন ও সমাজ সৌধের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য তাহারা বহু চেষ্টা করিয়াছেন। এখনও স্মৃতি তাহাদের কাহারও কাহারও সদ্‌গুণ ও প্রতিভার সৌরভ বহন করিয়া উত্তর পুরুষগণের চিত্ত আমোদিত করিতেছে সত্য, কিন্তু অনেকের নাম পর্যন্ত বিস্মৃতিসাগরে বিলীন হইয়াছে। সকলের কথা জানিবার উপায় নাই ; সামান্য যাহা কিছু পরম্পরাক্রমে ও অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে তাহাই এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল। জমিদার বংশীয় যাহারা উলপুরে থাকিয়া দেশের ও সমাজের কার্যনির্বাহ করিয়াছে তাহাদের কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সাড়ে তিন আনী হিস্যা — কৃষ্ণনাথ রায়, গৌরকিশোর রায়, কালীকিঙ্কর রায়, দুর্গাদাস রায় ; পরবর্তীকালে আনন্দকালী রায়, বামাচরণ রায়, প্রমথনাথ রায়, বলদেব রায়।

বড় সওয়া তিন আনী হিস্যা—বৈদ্যনাথ রায়, তারকচন্দ্র রায়, হরচন্দ্র রায় ; শেষ আমলে ত্রৈলোক্যনাথ রায় ও শ্রীঅঘোরনাথ রায়।

ছোট সওয়া তিন আনী হিস্যা—রামমাণিক্য রায়, মাধবকৃষ্ণ রায়, মহেশচন্দ্র রায়, কৃষ্ণগোবিন্দ রায়, রামপ্রাণ রায়, শেষ আমলে মদনমোহন রায়, মহিমাচন্দ্র বায়, দেবীশঙ্কর রায়, হরচরণ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র রায়, মহেন্দ্র নারায়ণ রায়, দক্ষিণাচরণ রায় ও অতুলচন্দ্র রায়।

বড় তিন আনী হিস্যা—রঘুনাথ রায়, রামচরণ রায়, চন্দ্রকুমাব রায় ; শেষ আমলে অনঙ্গ মোহন রায়, দিগিন্দ্রকান্ত রায়, ধরানাথ রায়, রমাপ্রসাদ রায়।

ছোট তিন আনী হিস্যা—জানকীনাথ রায়, গোপালকৃষ্ণ রায়, কাশীনাথ গোসাঞি, রামনারায়ণ রায়, দুর্গাচরণ রায়; শেষ আমলে যামিনীকান্ত রায়, সুধন্যকুমার রায়, অখিলনাথ রায় ও সুধাংশুনাথ রায়।

ইহারা এবং অন্যান্য অনেকে জমিদারগণের ষোল আনার বৈঠকে জমিদারি ও সমাজ সংক্রান্ত বহুবিধ জটিল বিষয়ের সমাধানে নিযুক্ত ছিলেন। সাহাপুর পরগণার সীমানা লইয়া বিভিন্ন সময়ে পার্শ্ববর্তী জমিদারগণের মধ্যে উলপুরের নানাবিধ বিবাদ বিসংবাদ ও মামলা মোকদ্দমা হইয়াছে। উলপুরের পক্ষে উপরোক্ত ষোল আনার কর্তাগণের মধ্যে অনেকে এই সমস্ত কার্য করিয়াছেন। তাহারা ঐকান্তিক চেষ্টা না করিলে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত উলপুরের জমিদারগণের স্বার্থরক্ষা করা সম্ভবপর হইত না।

৬৯। **কালীকিঙ্কর রায়** (সাড়ে তিন আনী)

ইনি একজন বিচক্ষণ লোক ছিলেন। জমিদার ও প্রজা উভয় শ্রেণির লোকের মধ্যেই ইহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। প্রজা বিদ্রোহ অর্থাৎ জোটের সময়ে মহেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি অন্যান্য নেতাগণের সহযোগে কালীকিঙ্কর জমিদার পক্ষে কর্তৃত্ব করিয়াছেন। মূল সাড়ে তিন আনীর বাড়ি হইতে উঠিয়া আসিয়া ১২৬৪/৬৫ সালে ইনি অর্জুন দাসের ভিটা নামক বেতবাগানপূর্ণ ভিটাতে নতুন বাড়ি স্থাপন করেন। তৎপর তাহার অপর শরিকগণ ঐ বাড়িতে উঠিয়া আসেন। উহাই বাগানবাড়ি নামে পরিচিত। ১২৭৫/৭৬ সালে কালীকিঙ্কর পরলোক গমন করেন।

কালীকিঙ্করের দুই পুত্র মহিমাচন্দ্র ও প্রসন্নচন্দ্র। মহিমাচন্দ্রের ৬ পুত্র ললিত, বসন্ত, দক্ষিণা, দুর্গাকুমার, দেবকুমার ও ললনা। ললিত সবল ও সুপুরুষ ছিলেন। ইংরেজি ভাষায় তাহার বেশ দখল ছিল। তিনি কিছুদিন ফরিদপুরে চাকরি করিয়াছিলেন। বসন্তকুমার পোস্টমাস্টারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। শেষ বয়সে পেনশন লইয়া বাড়িতে ছিলেন। দক্ষিণাকুমার জমিদারি সংক্রান্ত কাজে সুদক্ষ ছিলেন। দুর্গাকুমার বিষয় কার্যে অভিজ্ঞ, অমায়িক ও সদালাপী ছিলেন। দেবকুমার দীর্ঘকাল সাব-রেজিস্ট্রারের কাজে নিযুক্ত থাকিয়া পেনশন লইয়া বাড়িতে আছেন। ললনা কুমার সুশিক্ষিতা ছিলেন; তিনি বহুকাল বাতে শয্যাশায়ী থাকিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রসন্নচন্দ্রের দুই পুত্র, ভূপতিমোহন ও সুরেন্দ্রমোহন। ভূপতি মোহন স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘজীবী। তিনি পূর্বে নানা স্থানে ব্যবসাদি করিয়া এখন বাড়িতেই আছেন। সাধারণের হিতকর কার্যে তাঁহার খুব উৎসাহ। তিনি পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী ও উচিত বক্তা। সুরেন্দ্রমোহন রেলওয়ের অধীন চাকুরি করিতেছেন।

৭০। **মহেশচন্দ্র রায়,** (ছোট সওয়া তিন আনী)

এই যুগে যে সকল ব্যক্তি উলপুরে কর্তৃত্ব করিয়াছেন তন্মধ্যে মহেশচন্দ্র রায় বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি বিষয়কার্যে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান, মিষ্টভাষী ও সামাজিক ছিলেন। নানা কার্য উপলক্ষে সর্বদাই তাহার নিকট লোক সমাগম হইত। তাহার অমায়িক ব্যবহারে ষোল আনার সকলেই তাহার বৈঠকখানায় সমবেত হইতে ভাল বাসিতেন। তাহার সময়ে জমিদারগণের সমস্ত বৈঠক ও মজলিস তাহার বৈঠকখানাতে হইত। তিনি তাহার জন্য বসিবার উপযুক্ত আসন ও পান তামাক ও আলো প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত নিজ ব্যয়ে করিতেন। তজ্জন্য তাহার মৃত্যুর পরও বহুকাল পর্যন্ত ষোল আনার বৈঠক ছোট সওয়া তিন আনীর বাড়ি ছোট হিস্যার বৈঠক খানাতেই হইত। তাহার সংসারে বহু লোক ছিল এবং বহু অন্ন ব্যয় হইত। ১২৮৩ সালে উলপুরে যে ভীষণ ওলাওঠা মহামারীর আক্রমণ হয় তাহাতে তাহার দুই পুত্র

ও পরিবারস্থ বহুলোক প্রাণ ত্যাগ করে। পুত্র ও পরিজনের অকাল মৃত্যুর দুই বৎসর পরে ১২৮৫ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

৭১। কাশীনাথ রায়, (ছোট তিন আনী)

রূপরাম রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গানারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র কাশীনাথ রায়। ইনি দীর্ঘকায় ও বলশালী ছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি পূজা অর্চনা ও সাধন ভজনে কাটাইতেন। এইজন্য লোকে তাহাকে কাশীনাথ গোসাঞি বলিয়া ডাকিত। তিনি সর্বদা একটি প্রকাণ্ড ত্রিশূল হাতে করিয়া চলিতেন। কথিত আছে তিনি বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন। তাহার পুত্র সন্তান না থাকায় তাহার স্ত্রী তাহার মৃত্যুর পর দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৭২। রামনারায়ণ রায়, (ছোট তিন আনী)

রূপরাম রায়ের বংশধরগণের মধ্যে কাশীনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র রামনারায়ণ রায় খ্যাতিমান লোক ছিলেন। তাহার সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল। তিনি পৃথক বাড়ি করিয়া তাহাতে শালগ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং দুর্গোৎসব ও অন্যান্য পূজা নিয়মিতরূপে নির্বাহ করিতেন। তিনি পরোপকারী ও উদার প্রকৃতির ছিলেন। জমিদারি ও সমাজ সংক্রান্ত কার্যে রামনারায়ণ বিচক্ষণ ছিলেন। তজ্জন্য জ্ঞাতি ও প্রজাবর্গের মধ্যে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ইহার ভাগিনী দয়াময়ী উলপুরের কালীবাড়ি ইষ্টক নির্মিত করাইবার ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। ঐ মন্দির নির্মাণের কার্য রামনারায়ণের কর্তৃত্বেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

৭৩। দুর্গাদাস রায়, (সাড়ে তিন আনী)

এই যুগের শেষ দিকে দুর্গাদাস রায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ১২২৯ সালের আশ্বিন মাসে তাহার জন্ম হয়। ষোল আনার প্রতাপশালী নেতা বলিয়া অদ্যাপি তাহার খ্যাতি আছে। তাহার বুদ্ধি ও প্রতিভার জন্য অনেকেই তাহার মতের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইত না। তেঁতুলিয়ার দক্ষিণে মালেঙ্গার ডাঙা লইয়া খড়ড়িয়ার জমিদারগণের সঙ্গে যে মোকদ্দমা হয় তাহা প্রধানত দুর্গাদাস রায়ের চেষ্টা ও তদ্বিরেই পরিচালিত হইয়াছিল। ১৩০১ সালের ২৩ মাঘ তাহারা মৃত্যু হয়।

তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র **প্রমথনাথ রায়** পিতৃতুল্য প্রতিপত্তি করিতে না পারিলেও তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। জমিদারি কার্যে তাহার সমধিক অভিজ্ঞতা ও নিপুণতা ছিল। তিনি ষোল আনার সম্মান ও স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। উলপুরে শ্রীপঞ্চমীর সময়ে মেলা স্থাপন এবং তাহার সফলতার জন্য তিনি প্রথম হইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন। গান বাজনায় তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। উলপুরে সর্বপ্রথম যে সখের থিয়েটার হয় তিনি তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৩২৯ সালের আশ্বিন মাসে ক্যান্সার রোগে তাহার মৃত্যু হয়।

দুর্গাদাস রায়ের মধ্যম পুত্র **মন্মথনাথ** বরাকরে চাকুরি করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। উলপুরে সাধারণ পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি পরিণত বয়সে উপযুক্ত পুত্র অমিয়নাথ রায়কে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

দুর্গাদাস রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র **বনওয়ারীলাল** কলিকাতায় ডাক্তারি ব্যবসা করিতেন। যখন কলিকাতায় প্রথম প্লেগ রোগের আক্রমণ হয় তখন হইতে তিনি ঐ রোগের চিকিৎসায় সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

৭৪। বামাচরণ রায়, (সাড়ে তিন আনী)

রামদেব রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের শাখায় হরমোহন রায় একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। তিনি

পৃথক বাড়ি করিয়া মূল বাড়ির মত সমস্ত দেবার্চনা কার্য সমারোহের সঙ্গে করিতেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বামাচরণ রায় সর্ববিষয়ে সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। বাংলা ভাষায় তাহার বেশ অধিকার ছিল ; ইংরাজি ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি গীত বাদ্যে বিশেষ অনুরাগী এবং কালোয়াতী বাজনায় সুদক্ষ ছিলেন। তাহার বৈঠকখানায় গান বাজনার অনেক মজলিস হইত এবং বিদেশীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক উলপুরে আসিলে অনেক সময় তাহার বাড়িতেই অভ্যর্থিত হইতেন। তিনি ষোল আনার অন্যতম নেতা ছিলেন। তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনার জন্য তিনি রাজকর্মচারিগণের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি ১৮৯২ খ্রিঃ অব্দ হইতে প্রায় ২০ বৎসর গোপালগঞ্জের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং গবর্নমেন্ট তাহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া তিন মাসের জন্য তাহাকে মাদারিপুরের একটি সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বহুকাল লোকাল বোর্ড ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার ছিলেন। তাহার সময়ে তিনি যেরূপ প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রমণীমোহন তাহার জীবনকালেই পরলোক গমন করেন। রমণীমোহন অতিশয় সচ্চরিত্র ও অমায়িক লোক ছিলেন। মিষ্ট ব্যবহারের জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় হইয়াছিলেন। বামাচরণ ১৩২৭ সালে পরলোক গমন করেন।

৭৫। দক্ষিণাচরণ রায় (সাড়ে তিন আনী)

তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দক্ষিণাচরণ রায় জমিদারি শাসন কার্যে সুদক্ষ ছিলেন। তিনিও বিশেষ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন এবং অনেক পরিশ্রম করিয়া সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি মিষ্টভাষী, অমায়িক ও পরপোকারী ছিলেন। ১৩৩৯ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্রমোহনের সঙ্কটজনক পীড়া হওয়াতে তিনি শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার একমাত্র বাসনা ছিল যে পুত্রকে রোগমুক্ত দেখিয়া তাহার সম্মুখে নিজে চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারেন। ভগবানের আশ্চর্য বিধানে তাহাই হইল। বহু চিকিৎসায় এবং তাহার বিশেষ যত্নে যতীন্দ্রমোহনের ব্যাধির শান্তি হইল, কিন্তু তিনি রোগের কবলে পতিত হইয়া ১৩৩৯ সালের ভাদ্র মাসে পরলোক গমন করেন।

৭৬। তারকচন্দ্র রায় (বড় সওয়া তিন আনী)

রমাবল্লভ রায়ের পুত্র রামনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্রের প্রপৌত্র তারকচন্দ্র রায় জমিদারির অংশ হিসাবে তৎসমকালীন সমস্ত শরিকগণের অপেক্ষা বড় ছিলেন। তিনি একা সাহাপুর পরগণার ষষ্ঠ অংশের মালিক ছিলেন। সুতরাং তাহার অবস্থা সচ্ছল ছিল। তিনি শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন ; প্রজাগণ তাহার বিশেষ অনুরক্ত ছিল। তৎসত্বেও ঈর্ষান্বিত শরিকগণের বিরোধিতার ফলে তিনি তাহার সম্পত্তি নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে পারিতেন না। প্রজা বিদ্রোহের সময়ে তাহার সমধিক ক্ষতি হইয়াছিল। তাহার পুত্রগণও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। মধ্যম প্রকাশচন্দ্রের পুত্র যদুনাথ বর্তমান সময়ে ষোল আনার অন্যতম নেতা। তাহার তৃতীয় পুত্র অমৃতচন্দ্র কয়েক বৎসর গোপালগঞ্জের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল উলপুর স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন। রাজেন্দ্রের পুত্র সন্তোষ মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তারকচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র জ্ঞানচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রচন্দ্র বহুকাল উলপুরে 'নারায়ণ' পাঠশালা চালাইয়া আসিতেছেন ; উহার বালিকা বিভাগ 'নবীনচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ে'র সহিত মিলিত হইয়াছে। উপেন্দ্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজিতেন্দ্র এম. বি গোপালগঞ্জের যশস্বী ডাক্তার।

৭৭। হরচন্দ্র রায় (বড় সওয়া তিন আনী)

রমাবল্লভ রায়ের উত্তরপুরুষগণের মধ্যে হরচন্দ্র রায় প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও জমিদারি কার্যে সুদক্ষ ছিলেন। ষোল আনায় এবং নিজ বাড়িতে তাহার বিশেষ

প্রতিপত্তি ছিল। জমিদারি সংক্রান্ত ব্যাপার ও সামাজিক বিষয়ে তাহার মতামত সকলেরই নিকট আদরণীয় হইত।

৭৮। মথুরানাথ রায়

হরচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মথুরানাথ রায় শান্ত প্রকৃতি, সচ্চরিত্র এবং নির্ব্বিবাদী লোক ছিলেন। তিনি বরিশালে চাকুরি করিতেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূপেশচন্দ্র জমিদারি সেরেস্তায় এবং ২য় পুত্র কেদারনাথ আলীপুর কালেক্টরীতে নায়েব নাজিরের কার্য করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার তৃতীয় পুত্র **দীনেশচন্দ্র রায়** বি, এল বর্তমানে ২৪ পরগণা জেলার সুযোগ্য অফিসিযাল রিসিভার। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া বহু সম্পত্তি এবং দেশে ও কলিকাতায় অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছেন। যোল আনার কার্যে এবং দেশের হিতে তাহার যথেষ্ট উৎসাহ আছে। মথুরানাথ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র সুরেশচন্দ্র বি. এস. সি., এম. এম. এফ. কলিকাতায় ডাক্তারি করিতেছেন।

৭৯। ত্রৈলোক্যনাথ রায় (বড় সওয়া তিন আনী)

হরচন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ রায় পিতার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি যোল আনার কার্যে উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করিতেন। তিনি দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্যবান ও পরিশ্রমী ছিলেন। নিজ বুদ্ধি ও পরিশ্রম বলে তিনি বহু অর্থ ও সম্পত্তি অর্জন করিয়া গিয়াছেন এবং গ্রামের দক্ষিণভাগে সুবৃহৎ পৃথক বাড়ি নির্মাণ করিয়াছেন। তিনি পুত্র পৌত্রাদি বহু পরিবারে পরিবৃত্ত হইয়া সচ্ছল ভাবে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। উলপুরের বাহিরে রঘুনাথপুর, ঝনঝনিয়া ও কাজুলিয়া প্রভৃতি স্থানে তিনি মূল্যবান সম্পত্তি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। ১৩৪০ সালে পুত্র পৌত্রাদির সম্মুখে পরিণত বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল উলপুর স্কুলে শিক্ষকতার কার্য করিতেছেন। সুশিক্ষক বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে। ত্রৈলোক্যনাথের কনিষ্ঠ পুত্র জ্ঞানেন্দ্র নাথ বি. এল. গোপালগঞ্জের উকিল।

৮০। রঘুনাথ রায় ও তাহার পুত্রগণ (বড় তিন আনী)

কালিকাপ্রসাদ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ মানী ও প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। তাহার তিন পুত্র বিপিনবিহারী, রাসবিহারী ও কৈলাসবিহারী সচ্চরিত্র, ধর্মনিষ্ঠ, মিষ্টভাষী ও সামাজিক এবং যোল আনার কার্যে উৎসাহী ছিলেন। কনিষ্ঠ কৈলাসবিহারী বঙ্গভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন এবং অনেকদিন উলপুরের মাইনর স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন। বিপিনবিহারী রায়ের পুত্রগণের মধ্যে সতীন্দ্রপ্রসাদ, গুণেন্দ্রপ্রসাদ ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ এম. এ. বি. এল জীবিত আছেন। শেষোক্ত দুইজন উকিল। রাসবিহারী রায়ের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ নকুলেশ্বর পিতার অনেক গুণের অধিকারী। যজ্ঞেশ্বর, ভুবনেশ্বর ও ত্রিগুণেশ্বর উকিল। অন্য ভ্রাতাগণ চাকুরি করেন। কৈলাসবিহারী বর্তমান জ্যেষ্ঠ পুত্র অক্ষয়কুমার গবর্নমেন্টের খাসমহলে কানুনগো ও কনিষ্ঠ অনাদি ডায়মন্ডহারবার সিবিল কোর্টের নাজির, মধ্যম অতুলচন্দ্র দেশের কার্য-কর্মে ব্যাপৃত।

রমাপ্রসাদ রায় : বিপিনবিহারী রায়ের ২য় পুত্র রমাপ্রসাদ শেষ আমলে যোল আনার নেতাগণের অন্যতম ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাহার বেশ অধিকার এবং অনুরাগ ছিল। তিনি অধ্যাত্মরামায়ণ প্রভৃতি ৩/৪ খানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, এবং শেষ জীবনে উলপুরের ইতিহাস রচনা করিবার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল স্থানীয় স্কুলের সেক্রেটারি, গোপালগঞ্জের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক বোর্ডের ও লোকাল বোর্ডের মেম্বার ও উলপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। গবর্নমেন্ট হইতে তিনি Certificate of Honour পাইয়াছিলেন।

৮১। ব্রজনাথ রায় ও তাহার পুত্রগণ (বড় তিন আনী)

রামজীবন রায়ের পৌত্র প্রসিদ্ধ কালিকাপ্রসাদের ৫ম পুত্র ব্রজনাথ ধর্মনিষ্ঠ ও বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তাহার ৪ পুত্র, অনঙ্গমোহন, কালিঙ্গমোহন, বিরাজমোহন ও যতীন্দ্রমোহন। মহাজনী দ্বারা ইহাদের অবস্থা পূর্বাবধি সচ্ছল ছিল।

অনঙ্গমোহন : সদাচারী, ধর্মনিষ্ঠ, সৎপ্রকৃতি ও অমায়িক লোক ছিলেন। ইনি সকল লোকের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। প্রজা ও খাতকগণ ইহাকে বিশেষ ভক্তি ও বিশ্বাস করিত। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎচন্দ্রের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র বৈষয়িক ও সামাজিক ব্যাপারে অভিজ্ঞ।

কলিঙ্গমোহন : তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিষয়কার্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। তাহার পুত্র মনোমোহন, সুধীরঞ্জন ও প্রেমরঞ্জন তিনজনই এম. এ., বি. এল.। সুধীরঞ্জন মুন্সেফ, অপর দুইজন হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। ইহারা পিতার স্মরণার্থে উলপুরের স্কুলের ১ম শ্রেণির ১ম ছাত্রকে বার্ষিক ৪৮ টাকার বৃত্তি দিয়া আসিতেছেন।

বিরাজমোহন : আবগারী বিভাগে কার্য করিতেন। তিনি শান্ত স্বভাব ও মিষ্টভাষী ছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুন্দ লাল এম. এ বি. এল. রেলওয়ে বিভাগে এবং অপর দুই পুত্র শচীন্দ্র ও নরেন্দ্র গবর্নমেন্ট অফিসে চাকুরি করেন। সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিকারী।

যতীন্দ্রমোহন : দেশে থাকিয়া বৈষয়িক কার্যাদি পরিচালনা করিতেন। বিষয় কার্যে তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল।

৮২। দ্বারকানাথ রায় (সাড়ে তিন আনী)

বাগানবাড়ির দ্বারকানাথ রায়ের বিশেষ মান প্রতিপত্তি ছিল। তিনি বিষয়কার্যে বিচক্ষণ, সামাজিক ও উদার প্রকৃতি ছিলেন। উলপুরের জমিদারিতে পৈতৃক অংশ ছাড়া তাহার যশোহর জেলায় এবং শ্রীহট্টে মূল্যবান ভূসম্পত্তি ছিল। তিনি বিশেষ সম্মানের সহিত জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বরদানাথ বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী ছিলেন। তাহার কনিষ্ঠ পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি কিছুদিন গোপালগঞ্জের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বরদানাথের একমাত্র পুত্র সতীন্দ্রনাথ উলপুরের একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। ত্রৈলোক্যনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল Indian World, Begalce Servant, Forward প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দৈনিক সংবাদপত্রের সহ-সম্পাদকের কার্য করিয়াছেন ; ২য় নরেন্দ্রনাথ জলপাইগুড়িতে চাকুরি করেন, ৩য় সত্যরঞ্জন যৌবনে পরলোক গমন করিয়াছেন, ৪র্থ ত্রিগুণারঞ্জন গবর্নমেন্ট অফিসে চাকুরি করেন ; ৫ম প্রমোদরঞ্জন জমিদারি সেরেস্তায় কার্য করেন ; ৬ষ্ঠ কুমুদরঞ্জন কুমিল্লায় ওকালতি করেন ; ৭ম ভবরঞ্জন যশস্বী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ; ৮ম সুধীরঞ্জন সম্প্রতি কোন কার্যে নিযুক্ত নাই।

৮৩। প্যারীমোহন রায় (বড় সওয়া তিন আনী)

রামদেব রায়ের বংশধরগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শাখায় গোলোকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্যারীমোহন অতিশয় সৌখীন পুরুষ ছিলেন। তাহার সময়ে উলপুরে "বাবু" বলিতে তাহাকেই বুঝাইত। তিনি সদাশয় ও মিষ্টভাষী ছিলেন। অনেক সময়ে তিনি বিদেশে থাকিতেন। যখন দেশে থাকিতেন তখন তাহার বৈঠকখানায় বহু ভদ্রলোকের সমাগম হইত। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্রমোহন ইদানীং পূর্ণিয়াতে থাকেন। তাহার কনিষ্ঠ পুত্র সতীন্দ্রমোহন সুশিক্ষিত, সদালাপী ও সামাজিক। তিনি দীর্ঘকাল উলপুর স্কুলে শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত আছেন। কয়েক বৎসর তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

প্যারীমোহনের কনিষ্ঠ সহোদর গোবিন্দমোহন কালোয়াতী বাজনায় সুনিপুণ ছিলেন। কোন গানে মজলিসে তিনি উপস্থিত থাকিলে অন্য কেহ বাদ্য যন্ত্রে হাত দিতে সাহস পাইত না। তিনি সরলচিত্ত ও আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন।

৮৪। **মহিমাচন্দ্র রায়** (ছোট সওয়া তিন আনী)

কোঠাবাড়ির মধ্যম হিস্যার মহিমাচন্দ্র রায়েব কথা পূর্বে উল্লিখিত হইযাছে। ইনি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। জমিদারগণেব মধ্যে মহিমাচন্দ্রের খুব প্রতিপত্তি ছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অন্নদাচরণ পিতাব গুণেব অধিকাবী হইয়াছিলেন এবং ষোল আনার একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। তাহাব জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথ সবল, সুস্থদেহ ও সচ্চরিত্র, বহুদিন ভাগ্যকুলের জমিদার সরকারে কলিকাতায় কার্য করিতেছেন। তাহার তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ চারুচন্দ্র বি এল শিয়ালদহের উকিল, মধ্যম বিমল বি এ ডায়মন্ডহাববারে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে কার্যে নিযুক্ত। কনিষ্ঠ সুবোধ বি এ ক্লাশেব ছাত্র। অন্নদাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র রক্ষানাথের পুত্রগণও কৃতবিদ্য। মহিমাচন্দ্রের মধ্যম পুত্র শশিভূষণ মোক্তাবী ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন, কনিষ্ঠ পুত্র উমাচরণ শিক্ষকতা করিতেন। উমাচরণের দুই পুত্র, প্রিযভূষণ ও বিধুভূষণ ইস্ট ইন্ডিযান রেলে চাকুরি করেন।

৮৫। **মদনমোহন রায়** (ছোট সওয়া তিন আনী)

কৃষ্ণরাম রায়েব কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকান্তেব দ্বিতীয় পুত্র গৌবকৃষ্ণ রায়ের পুত্র মদনমোহন। জমিদাবি ও সামাজিক কাজকর্মে তাহার বিজ্ঞতা এবং বিচক্ষণতা ছিল। তাহার বুদ্ধি-কৌশল ও সদ্ব্যবহাবে অনেকেই তাহাকে মান্য করিত এবং তাহার মতানুযায়ী চলিত। তিনি বিধবা পত্নী, দুই কন্যা ও একটি শিশু পুত্র বাখিয়া পরলোকগমন করেন। তাহার কন্যাদ্বয জীবিত আছেন। তাহার মৃত্যুব পবে তাহাব অল্পবয়স্ক পুত্র (ডাক নাম কেনা) নবীনচন্দ্র রায়ের বাড়িব পুষ্করিণীতে স্নান কবিতে গিয়া পুষ্করিণীর জলেই প্রাণত্যাগ করে। মদনমোহনের বিধবা স্ত্রী অলকমণি এই আকস্মিক বিপদে বহুকাল যাবৎ ঘর হইতে বাহির হন নাই। পবে তাহার জ্যেষ্ঠ কন্যার জ্যেষ্ঠ পুত্র লালমোহন দাসকে নিজ গৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করেন। ১৩১৪ সালে কার্যবশত কলিকাতায় আসিয়া লালমোহন বসন্ত বোগে আক্রান্ত হয। মাতামহী দীর্ঘকাল তাহার চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা কবেন। কিন্তু অবশেষে কয়েকটি ঘা হইতে নালি হইয়া লালমোহন প্রাণত্যাগ করে। অলকমণি তাহার পবও প্রায় ১০/১২ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই কন্যাদের বাড়িতে থাকিতে পাবিতেন, কিন্তু যতদিন চলৎশক্তি ছিল তিনি শ্বশুর ও স্বামীর ভিটাতেই বাস করিযা তাহাদের দশকর্ম বক্ষা করিয়াছেন। আজকাল এই আদর্শ বিরল হইয়া উঠিতেছে।

৮৬। **রঘুনাথ রায়** (সাড়ে তিন আনী)

বামদেবের দ্বিতীয় পুত্রের শাখায় বঘুনাথ রায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সবল, সুস্থদেহ ও দীর্ঘজীবী ছিলেন। তিনি বহু পরিশ্রম কবিয়া সঙ্গীত শাস্ত্র শিক্ষা কবিয়াছিলেন। কালোয়াতী গানে তাহাব তুল্য লোক উলপুরে ছিল না। অথচ গান গাইতে তাহার কোন অভিমান ছিল না। তাহাকে সামান্য অনুরোধ করিলেই তিনি গান করিতেন। বাদক বা বাদ্যযন্ত্রের অভাব বশত তিনি গান করিতে কখনও অস্বীকৃত হন নাই। রামপ্রসাদ, দাশরথি রায়, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধক ও কবির বহু গান তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেন। তাহাব কোন পুত্র সন্তান নাই।

৮৭। **আনন্দকালী রায়** (সাড়ে তিন আনী)

রামদেব রায়ের দ্বিতীয় পুত্রের শাখায় নবকৃষ্ণ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দকালী রায় বুদ্ধিমান

ও বিচক্ষণ ছিলেন। তাহার কুল ক্রিয়ার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি স্বাধীনচেতা ও উচিতবাদী ছিলেন। তাহার একমাত্র পুত্র **কুলচন্দ্র** বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন ও শ্রমশীল। কুলচন্দ্র দীর্ঘকাল স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার আছেন। সাধারণের সমস্ত কার্যের সহিত তাহার যোগ আছে।

৮৮। **কামিনীমোহন রায়** (সাড়ে তিন আনী)

আনন্দকালী রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কামিনীমোহন রায় চরিত্রবান ও সৎপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠের ন্যায় নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। জমিদারি সংক্রান্ত বা সামাজিক বৈঠকে তাহার সমাদর ছিল। তাহার ৪ পুত্র সকলেই উপযুক্ত ও খ্যাতিমান—জ্যেষ্ঠ রাজেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজার থাকিয়া এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, মধ্যম গিরীন্দ্রনাথ মাদারীপুরের সুপ্রসিদ্ধ মোক্তার, গবর্নমেন্ট হইতে রায় উপাধি পাইয়াছিলেন; তৃতীয় ভূপেন্দ্রনাথ এম এ বি এল হাইকোর্টের এডভোকেট , কনিষ্ঠ গুণেন্দ্রনাথ এম এ আবগারী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট।

৮৯। **দেবীশঙ্কর রায়** (ছোট সওয়া তিন আনী)

কৃষ্ণরাম রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকান্ত রায়। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামমাণিক্য রায় বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। স্ববংশীয়দের মধ্যে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। রামমাণিক্য রায়ের দ্বিতীয় পুত্র দেবীশঙ্কর রায়। তিনি প্রথম বয়সে মুনসেফ কোর্টের ওকালতি পাশ করিয়া কিছুদিন ওকালতি করিয়াছিলেন। পরে তিনি বিষয়কর্ম ও মহাজনী প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওকালতি পরিত্যাগ করিয়া বাড়িতে আসেন। ধনী বলিয়া প্রসিদ্ধি না থাকিলেও তাহার অবস্থা সচ্ছল ছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র **কুলচন্দ্র রায়** ইংরেজি সাহিত্যে এম এ পাশ করিয়া অনেক বড় বড় স্কুলে হেডমাস্টারের কার্য করিয়াছিলেন; শেষ কালে কলিকাতা সিটি কলেজিয়েট স্কুলে হেডমাস্টারী করিয়া শারীরিক অসুস্থতার জন্য অবসর গ্রহণ করেন। দেবীশঙ্করের মধ্যম পুত্র **সতীশচন্দ্র** বাড়িতেই থাকিতেন ; এবং কনিষ্ঠ পুত্র **শ্রীশচন্দ্র** কিছুদিন সবরেজিস্ট্রি অফিসে কেরানির কার্য করিয়াছিলেন ; পরে বাড়িতে মহাজনি করিতেন। শেষ জীবনে তিনি গোপালগঞ্জে বাড়ি করিয়া সেইখানেই থাকিতেন। ষোল আনার বৈঠকে দেবীশঙ্কর রায়ের উচিত বক্তা বলিয়া খ্যাতি ছিল। তিনি ১৩০৩ সালে পরলোকগমন করেন।

৯০। **হরচরণ রায়** (ছোট সওয়া তিন আনী)

রামকান্ত রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র গোলোকচন্দ্র রায়ের পুত্র হরচরণ রায় বুদ্ধিমান, সামাজিক ও কৌশলী ছিলেন। জমিদারির অংশ সামান্য হইলেও বুদ্ধি ও ব্যবহারের গুণে তিনি শরিকগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিলেন। ষোল আনার নেতাগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তিনি ইংরেজি ভাষা ভাল জানিতেন না, কিন্তু বাংলায় তাহার বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি কয়েক বৎসর গোপালগঞ্জের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করিয়াছিলেন। গান বাজনা পূজা পার্বণ প্রভৃতি কার্যে তাহার খুব উৎসাহ ছিল। শেষ জীবনে তিনি গ্রামের সর্ব পশ্চিম প্রান্তে বাড়ি নির্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিতেন। কিন্তু যতদিন তিনি হাঁটিতে চলিতে পারিতেন, মূল বাড়ির দেবার্চনা প্রভৃতি কার্যে উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করিতেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবেশচন্দ্র মিষ্টভাষী ও অমায়িক। তাহার ২য় পুত্র উপেন্দ্রচন্দ্র মাদারিপুরের খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। ভবেশচন্দ্রের পুত্রগণ উপার্জনক্ষম ও পিতামাতার প্রতি ভক্তিমান। উপেন্দ্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র নেত্ররঞ্জন বিহার গবর্নমেন্টের অধীন এবং তাহার ভ্রাতা জীবনরঞ্জন কলিকাতায় চাকুরি করিতেছেন।

৯১। মহেন্দ্রনারায়ণ রায় (ছোট সওয়া তিন আনী)

মহেশচন্দ্র রায়ের ভ্রাতা গিরীশচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ রায় বুদ্ধিমান ও তেজস্বী লোক ছিলেন। জমিদারি কার্যে তাহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। প্রজাগণ তাহাকে ভয় ও সম্মান করিত। তিনি অনুমান ৩৯/৪০ বৎসর বয়সে ১৩০১ সালের চৈত্রমাসে পরলোকগমন করেন। তাহার উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রনাথ বি এ ১৩০৫ সালের চৈত্রমাসে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া অতি অল্পবয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

৯২। অভয়াচরণ রায় (ছোট সওয়া তিন আনী)

প্রসিদ্ধ নন্দরাম রায়ের দ্বিতীয় পুত্র শিবপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র জয়কৃষ্ণের পুত্র অভয়াচরণ নিজ পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সাধুতার বলে সকলের সহিত সদ্ভাবে চলিয়া মহাজনী দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। বেশভূষা ও চালচলনে তাহার কোনরূপ ব্যয় বাহুল্য ছিল না। শারীরিক ক্লেশ তিনি সর্বদা তুচ্ছ করিয়াছেন। তিনি অতিশয় নির্বিরোধী ও শান্তস্বভাব ছিলেন। জ্ঞাতি, কুটুম্ব, প্রজা, সকলেই তাহাকে সৎলোক বলিয়া জানিত। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুতোষ পিতার অনেক গুণের অধিকারী ; পিতার ন্যায় সদ্ভাবে মহাজনী করিয়া তিনি পিতৃসমৃদ্ধি বর্ধিত করিযাছেন। কোন লোকের সঙ্গে তাহাব বিবাদ বিসম্বাদ নাই। তিনি পরোপকারী ও সদ্ব্যয়ী। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নূতন বাড়ি করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি উলপুর ইউনিয়ন বোর্ডের অন্যতম সদস্য।

৯৩। দিগিন্দ্রকান্ত রায় (বড় তিন আনী)

বাংলা ভাষায় ইহার বেশ জ্ঞান ছিল; সেকালেব ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। রাজনৈতিক ও দেশ বিদেশের সংবাদ জানিবার জন্য দিগিন্দ্রকান্তের বিশেষ আগ্রহ ছিল। ইনি মিষ্টভাষী, কৌশলী, সামাজিক ও আশ্রিতবৎসল ছিলেন। মিষ্টভাষায় উচিত কথা বলিবার শক্তি ইহার মত অতি অল্প লোকেরই দেখা যায়। গান বাজনা ও সর্ববিধ আমোদ উৎসবে ইহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইনিও কয়েক বৎসর গোপালগঞ্জের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করিয়াছিলেন। নিজে পরিশ্রম কবিয়া বাংলা ভাষায় ফৌজদারি আইন শিখিয়াছিলেন। ইদানীং ষোল আনার বৈঠকে তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। অনেক দুরূহ ব্যাপারে তিনি ষোল আনার কর্তৃত্ব করিয়াছেন। সন ১৩৩৮ সালে ৭২ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।

৯৪। সারদাচরণ রায় (ছোট সওয়া তিন আনী)

কৃষ্ণরামের মধ্যম পুত্রের পৌত্র মাধবকৃষ্ণ; তাহাব কনিষ্ঠ পৌত্র সারদাচবণ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চিকন্দিচৌকীর মুনসেফ কোর্টে নকলনবীসের কার্য করিতেন। তাহার হস্তাক্ষর খুব ভাল ছিল। তিনি সামাজিক, সদালাপী, গুণগ্রাহী ও স্বধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। চিকন্দীর কার্য ছাড়িবার পর বহুদিন তিনি জীবিত ছিলেন। কাহাবও সঙ্গে কলহ বিবাদ করা তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। তিনি ১৩২৭ সালে পরলোকগমন করেন। তাহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ বামপদ ই বি রেলওয়েতে স্টেশন মাস্টারের পদে নিযুক্ত আছেন। কনিষ্ঠ কালীপদ বি এস সি, এম বি বদরগঞ্জে ডাক্তারী ব্যবসা করিতেছেন। চিকিৎসা ব্যবসায়ে কালীপদ বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

৯৫। প্রকাশচন্দ্র রায় (সাড়ে তিন আনী)

রামদেবের কনিষ্ঠ পুত্র বিনোদরামের পৌত্র গুরুপ্রসাদ; তাহার কনিষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র প্রকাশচন্দ্র বলবান, সুস্থদেহ ও দীর্ঘায়ু ছিলেন। তিনি সরল প্রকৃতি এবং উৎসবপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি কাহারও সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত হইতেন না। জমিদারি ও মহাজনীর আয়

হইতে তাহার সংসার সচ্ছলভাবে চলিত। তিনি ১৩৩০ সালে ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাহার দুই পুত্র, বীরেন্দ্রভূষণ ও ফণীভূষণ। জ্যেষ্ঠ সাধারণত দেশেই থাকেন ; কিছুদিন স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীরচন্দ্র এম এ, বি টি প্রথমত আশুতোষ কলেজে অধ্যাপকের কার্য করিয়া এখন সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন ; তাহার অপর পুত্র সুনীল গোয়ালন্দে রেল অফিসে কার্য করেন।

প্রকাশচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র ফণীন্দ্রভূষণ ত্রিপুরা স্বাধীন রাজ্যে ওকালতি, পরে স্কুল ইনস্পেক্টরের কার্য করিতেন ; এখন অবসর লইয়া দেশেই আছেন। তিনি তিন বৎসর উলপুর হাইস্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন, এখন ঐ স্কুলের কমিটির মেম্বার ও ভাইসপ্রেসিডেন্ট, এবং বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি আছেন। দেশের হিতকর কার্যে তাহার খুব উৎসাহ আছে। গত বৎসব তিনি উলপুরের ইতিহাস নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন।

৯৬। **প্রভাতচন্দ্র রায়** (সাড়ে তিন আনী)

রামদেবের কনিষ্ঠ পুত্রের শাখায়—বৈকুণ্ঠনাথ রায়ের চারি পুত্র প্রভাত, রামাচরণ, বিরাজমোহন ও অবনীমোহন। মহাজনী ব্যবসায়ে সকলেরই অবস্থা সচ্ছল ছিল ও আছে। প্রভাতচন্দ্র ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত, স্বাধীনচেতা ও গুণগ্রাহী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার দুই পুত্র কালিদাস ও রামদাস। জ্যেষ্ঠ হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, কনিষ্ঠ রামদাস এম এ, বি এল ফরিদপুরের উকিল।

৯৭। **যামিনীকান্ত রায়** (সাড়ে তিন আনী)

রামদেবের ৫ম পুত্র বিষ্ণুরামের শাখায় জগচ্চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র যামিনীকান্ত সরলচিত্ত, গীতবাদ্যপ্রিয় ও সামাজিক লোক ছিলেন; বিষয় কার্যে ঔদাসীন্যের জন্য নানাবিধ অভাব ও অসুবিধার মধ্যে জীবন কাটাইতে হইলেও তাহাব মুখে সর্বদাই হাসি লাগিয়া ছিল। পবের বাড়ির আমোদ উৎসবে তিনি মন খুলিয়া যোগদান করিতেন। প্রথম আমলের সখের থিয়েটারের তিনি একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্র অকালে পরলোক গমন করেন। দ্বিতীয় হরেন্দ্র সুদক্ষ ওভারসিয়ার, এখন দেশে আছেন ; সামাজিক ব্যাপারে নেতৃত্ব করিয়া থাকেন। তাহার অপব পুত্রগণ চাকুরি করিতেছেন।

৯৮। **শীতলচন্দ্র রায় ও হেমচন্দ্র রায়** (বড় তিন আনী)

রামজীবন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রামভদ্রের মধ্যম পুত্র রামনিধি। তাহার পৌত্র মথুরানাথেব দুই পুত্র শীতলচন্দ্র ও হেমচন্দ্র। শীতলচন্দ্র সরল, সদাশয়, পরিশ্রমী ও জমিদারি কার্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বরিশাল জেলায় গবর্নমেন্টের খাসমহলে নায়েবের কার্য করিতেন। দুঃখের বিষয় অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাহার ও তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তাহার একমাত্র পুত্র সুবেন্দ্রনাথ বিলাত হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া দিল্লিতে চাকুরি কবিতেছেন।

হেমচন্দ্র অতিশয় সরলচিত্ত, নিরীহ ও ধীরপ্রকৃতি ছিলেন। কখনও কোনরূপ বিবাদ বিসম্বাদ বা অন্যেব অনিষ্টকর কার্যে তিনি যোগ দিতেন না। তিনি বিষয়কার্যে নিপুণভাবে দৃষ্টি দিতে পারিতেন না বলিয়া কিছুদিন তাহার সংসার কষ্টে চলিয়াছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অবলাবন্ধু কলিয়ারীর ম্যানেজারের কার্য করিয়া পিতার অভাব মোচন করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অবলাবন্ধু অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। তাহার অনুজ অনন্তবন্ধু বি এস সি, এম বি দিল্লির খ্যাতনামা ডাক্তার ; দেশের হিতকর কার্যে তাহার বিশেষ উৎসাহ আছে ; তৃতীয় অবনীবন্ধু দিল্লিতে চাকুরি করেন ; কনিষ্ঠ প্রফুল্লবন্ধু দেশে থাকিয়া নানাবিধ কার্যে নিযুক্ত আছেন। সর্বসাধারণের হিতকর সমস্ত কার্যে তাহার আন্তরিক আগ্রহ আছে।

৯৯। সুধন্যকুমার রায় (ছোট তিন আনী)

রূপরাম রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের মধ্যম পৌত্র জগন্নাথের পুত্র পার্বতীনাথ। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধন্যকুমার। সুধন্যকুমার প্রথম জীবনে বরিশালে কার্য করিতেন। পরে দেশে আসিয়া বাস করেন। তাহার সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। তিনি বৈষয়িক কার্যে বিচক্ষণ ছিলেন। ষোল আনার জমিদারি সংক্রান্ত কাজকর্মে তিনি অনেক সময়েই যোগদান করিতেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ তাহার জীবনকালে পরলোকগমন করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর ৫/৬ বৎসর পরে ১৩১৬ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। তাহার মধ্যম পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ গোপালগঞ্জের প্রবীণ উকিল ; ও ৪র্থ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ গোপালগঞ্জের মোক্তার।

১০০। অখিলনাথ রায় (ছোট তিন আনী)

রূপরাম রায়ের ২য় পুত্র শিবনারায়ণের পৌত্র কালীকুমার। তাহার পুত্র বসন্তলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র অখিলনাথ। বসন্তলালের অবস্থা ভাল ছিল, কিন্তু পরে অসচ্ছল হইয়া পড়ে। অখিলনাথ দীর্ঘকাল অল্প আয়ে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার মনের প্রফুল্লতা সর্বদাই বিদ্যমান ছিল। তিনি জমিদারি ও সামাজিক কার্যে বিচক্ষণ, অমায়িক ও মিষ্টভাষী ছিলেন। উৎসব আমোদে তাহার খুব উৎসাহ ছিল। তিনি কয়েক বৎসর ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর ও ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মেম্বর ছিলেন। শেষ জীবন তাহার সুখে কাটিয়াছে। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোমোহন রায় এম এস সি, ডি এস সি বসু বংশের উজ্জ্বল রত্ন ; ধন, মান ও বিদ্যা সমস্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। তাহার ৪র্থ পুত্র হেমেন্দ্র ব্যাঙ্কের উচ্চ কর্মচারী। অখিলনাথের মধ্যম ভ্রাতা নিশিকান্ত দিনাজপুরে কণ্ট্রাক্টর এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা তারানাথ বি এস সি, এম বি ঠাকুরগাঁও শহরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার।

১০১। বলদেব রায় (সাড়ে তিন আনী)

বাগানবাড়ির বলদেব রায় জমিদারি ও সামাজিক সমস্ত কার্যে উৎসাহী ছিলেন। বর্তমান হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার পর তাহার স্থায়িত্ব বিধানের জন্য ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার না হইয়াও বলদেব রায় বহু পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়াছেন। ইনি খুব শক্তিশালী লোক ছিলেন। ইহার সদ্ব্যবহারে বহুলোক ইহার বাধ্য ছিল। তাহার ভ্রাতাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মনোমোহন ডাক বিভাগে কার্য করিতেন ; মোহিনীমোহন বহুকাল জমিদারি এস্টেটে দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, রমণীমোহন কণ্ট্রাক্টরি করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, অনন্তমোহন অনেক দিন শিক্ষকতা কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন ; তাহাতে তাহার সুনামও ছিল ; উলপুরে প্রথম ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইলে ইনি তাহার মেম্বার ছিলেন। অনন্তমোহন সুশিক্ষিত, মার্জিতরুচি, সামাজিক ও সদালাপী। কনিষ্ঠ কিশোরীমোহন জমিদারি এস্টেটে নায়েবের কার্য করিতেছেন।

১০২। ঈশ্বরচন্দ্র রায় (ছোট সওয়া তিন আনী)

রামরাম রায়ের ২য় পুত্র রাধাকান্তের প্রথম পুত্র শম্ভুচন্দ্র অল্প বয়সে ৬ বৎসরের শিশু পুত্র কৃষ্ণনাথকে রাখিয়া পরলোকগমন করেন। তাহার সাধ্বী স্ত্রী দুর্গাসুন্দরী স্বামীর চিতায় সহমরণে যান। কৃষ্ণনাথের পুত্র গুরুদাস পিতার জীবনকালেই ইহলোক ত্যাগ করেন। তাহার পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। কৃষ্ণনাথ সবল প্রকৃতি ও ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন ; সন্ধ্যাপূজাদিতে দিবসের অনেক সময় কাটাইতেন। তিনি বালক পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে সযত্নে প্রতিপালন করেন। মেধাবী ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষা রাজকিশোর চৌধুরি গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতেই শেষ হইয়াছিল। অতি কষ্টে সামান্য জমিদারির আয়ের দ্বারা ইনি সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিষয়কার্যে সুদক্ষ, নির্ভীক ও উচিত বক্তা ছিলেন। তিনি কাব্যরসামোদী ও গুণগ্রাহী ছিলেন। ভারতচন্দ্র, দাশরথি রায় ও

রামপ্রসাদের রচিত কাব্য, পাঁচালী ও সঙ্গীতাদির অনেকাংশ তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। ১৩১৬ সালের পৌষ মাসে তিনি সজ্ঞানে পরলোক গমন করেন। তাহার দুই পুত্র রমণীমোহন ও মনোমোহন কার্যদক্ষ, পরিশ্রমী ও পরোপকারী। উভয়েরই বাংলা সাহিত্যে সুন্দর অধিকার আছে। মনোমোহন ৭/৮ বৎসর উলপুর ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার ও কয়েক বৎসর উহার কোর্টের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। রমণীমোহন সুকবি, কবিতা, নাটক ও সঙ্গীত রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত। তাহার রচিত একটি হোলি সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত হইল।

কোন্ যুগে কোন্ বৃন্দাবনে, বেজেছিল শ্যামের বাঁশী।
আজিও তাঁর সুরের ঝঙ্কার, সবার প্রাণে আছে মিশি।।
দোল লীলার এই হোলিখেলায়, স্বপন স্মৃতির মধুরতায়
আমার মরণমুখো হৃদয় কুঞ্জে, উঠল ফুটি কুসুম রাশি।।
হায় কোথা সে বৃন্দানারী, কোথা সেই রাই কিশোরী,
কাহার সাথে খেলবো হোলি, কোথা বা শ্যাম গোকুল-শশী।।

১০৩। ধরানাথ রায় (বড় তিন আনী)

বড় তিন আনীর প্রসিদ্ধ চন্দ্রকুমার রায়ের পুত্র ধরানাথ রায় তেজস্বী, বিচক্ষণ ও কার্যদক্ষ ছিলেন। তাহার শরীরে বেশ শক্তি ছিল। তিনি নানাবিধ কার্যে নিপুণ এবং জমিদারি ও সামাজিক ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি সুলেখক, সুকবি, সঙ্গীতপ্রিয় এবং অভিনয় কার্যে সুদক্ষ ছিলেন। উলপুরের পূর্বতন সখের থিয়েটারে তিনি একজন প্রধান অভিনেতা ছিলেন। উলপুরে হাইস্কুল প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি স্কুলের সাহায্যকল্পে বিনা বেতনের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে পরলোকগমন করেন।

তাহার অনুজ **নিশানাথ রায়** ক্ষমতাবান গুণী, সুশিক্ষিত ও সুবক্তা ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কীয় অনেক কার্যে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর চাকুরি করিবার পর সাধু রামানন্দ স্বামীর নিকট দীক্ষিত হইয়া বালানন্দ ভারতী নামে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন ; অনেক বৎসর পরে সংসারে ফিরিয়া আসিয়া নানা স্থানে ভাল চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন।

১০৪। নন্দকুমার, জিতেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্রকুমার রায় (বড় সওয়া তিন আনী)

দক্ষিণ বাড়ির ভৈরবচন্দ্র রায়ের পুত্র নন্দকুমার, রাজকুমার, জিতেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্রকুমার সৎপ্রকৃতি ও অর্থশালী মহাজন বলিয়া পরিচিত ছিলেন। নন্দকুমারের ৩য় পুত্র সতীশচন্দ্র দার্জিলিঙে ওভারসিয়ারের কার্য করেন। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেশচন্দ্রের পুত্র সুরেশ ও কেশব কলিকাতায় পুলিশে চাকুরি করেন। জিতেন্দ্রকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ দেশে থাকেন, ২য় দেবেন্দ্র বি এল উকিল, তৃতীয় জ্ঞানেন্দ্র গবর্নমেন্ট মিলিটারি একাউন্টস অফিসে কার্য করেন, অপর দুই পুত্র মহেন্দ্র ও গুণেন্দ্র চাকুরি করেন।

ভৈরবচন্দ্রের ৪র্থ পুত্র যোগেন্দ্রকুমার ধর্মভীরু, শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন ; কোনরূপ কলহ বিবাদ বা দলাদলির মধ্যে তিনি কখনও থাকিতেন না ; যৌবনে পত্নী বিয়োগ হওয়ার পর আর বিবাহ করেন নাই। ইনি নিষ্ঠাবান ও ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন। একমাত্র কন্যা সরযূবালাকে তিনি গাভার হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সহিত বিবাহ দেন ; তাহার ৪র্থ পুত্র বর্তমান। যোগেন্দ্রকুমার অনেক ধর্ম সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহার ধর্মভাব ও কবিত্ব শক্তির উদাহরণ স্বরূপ তাহার রচিত একটি শ্যামাসঙ্গীত পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল—

ডাক না মন তারে, শ্যামা মায়েরে, যার নাম সুধাভরা।
মা আমার সাকারা নিরাকারা।।
যার নাম নিয়ে, শ্মশানে মশানে, থাকে যোগী জন যারা,
সাধনের ধন, সে রাঙ্গাচরণ, সদাই পূজে তারা।
জেনে সারাৎসার, ভোলা মহেশ্বর, তিলেক না রহে ছাড়া।।
জন্মে' এ সংসারে, মায়ের নাম পাশরে' কেন থাকিস মন ঘোর অন্ধকারে,
সার ভেবে সুত দারা।
যখন সমন এসে দিবে নাড়া, তখন ত্রাসিত অন্তরে, মায়ের নাম অন্তরে
কেমনে বলিবি তারা।।
যোগেন্দ্রের বাঞ্ছা পূরাও দয়া করে, শমন দমন কর দিয়ে চরণ শিরে,
এই বাসনা শম্ভুদারা।
যেন নয়ন মুদে, দেখি মনেব সাধে, অন্তরে থেক মা তারা।
তোমার কৃপায়, শমন দূরে যায়, যে দেয় কালী নামের বেড়া।।

১০৫। **ললিতচন্দ্র রায়** (ছোট সওয়া তিন আনী)

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ললিতচন্দ্র রায়ের কথা ১ম অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি দীর্ঘকাল সুযশের সহিত উলপুরে ডাক্তারী করিয়া এখন অবসর লইয়াছেন। ইনি দীর্ঘজীবী এবং স্বাস্থ্যবান। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধেন্দুরঞ্জন ই বি রেলে কার্য করেন। মধ্যম মনোরঞ্জন এম এ বি এল আলিপুরের উকিল, তৃতীয় বিমলরঞ্জন বি এ শিক্ষক, এবং কনিষ্ঠ হেমরঞ্জন বি এ, হাইকোর্টে অফিসিয়াল রিসিভারের অফিসে কার্যে নিযুক্ত। ললিতচন্দ্র বহুকাল পূর্বে মূল বাড়ি ত্যাগ করিয়া গ্রামের পশ্চিমদিকে পৃথক বাড়ি নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে তিনি প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা করিয়া থাকেন।

১০৬। **অতুলচন্দ্র রায়** (ছোট সওয়া তিন আনী)

প্রসিদ্ধ মহেশচন্দ্র রায়ের অনুজ হরিশ্চন্দ্রেব পুত্র সরলস্বভাব ও প্রফুল্লচিত্ত রাজকুমার রায় সুস্থ শবীরে দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অতুলচন্দ্র মুনসেফ রসিকচন্দ্রের বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিলেন। মহেন্দ্রনারায়ণ রায়ের মৃত্যুব পর ছোট সওয়া তিন আনীর ছোট হিস্যার কর্তৃত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাব উপরই ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনি জমিদারি কার্যে অভিজ্ঞ, সুবক্তা ও সামাজিক ছিলেন। কয়েক বৎসর তিনি উলপুর হাইস্কুল কমিটির মেম্বার ছিলেন। জ্ঞাতি ও প্রজাবর্গের মধ্যে তাহার বেশ প্রতিপত্তি ছিল।

১০৭। **দক্ষিণাচরণ রায়** (ছোট সওয়া তিন আনী)

বামরাম রায়ের ৫ম পুত্র লক্ষ্মীকান্তের পৌত্র ভবানীশঙ্করের পুত্র দক্ষিণাচবণ নিজ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে অবস্থার সমধিক উন্নতি করিয়াছিলেন। ইনি কার্যক্ষম ও বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। সরকারি কার্য এবং গান বাজনা ও আমোদ উৎসবে তাহার খুব আগ্রহ ছিল। দক্ষিণাচরণের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দুভূষণ অবস্থার আরও উন্নতি করিয়াছিলেন। ইন্দুভূষণ নিজ বুদ্ধি ও ব্যবহারের গুণে অল্প বয়সেই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। কারবাঙ্কল রোগে অকালে তাহাব মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র সন্তান নাই। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমূল্যভূষণ সাধারণের সমস্ত কার্যে উৎসাহী, অমায়িক ও সামাজিক।

১০৮। **অঘোরনাথ রায়** (বড় সওয়া তিন আনী)

রমাবল্লভ রায়ের জ্যেষ্ঠ পৌত্রের মধ্যম পুত্র রামকৃষ্ণ রায়ের শাখায় করুণানাথের জ্যেষ্ঠ

পুত্র অঘোরনাথ বয়োজ্যেষ্ঠ এবং জমিদারি ও সামাজিক কার্যে নেতৃস্থানীয়। তিনি সাধারণের সমস্ত কার্যে উৎসাহী। বর্তমান কালের ষোল আনার নেতাগণেব মধ্যে তিনি অগ্রণী।

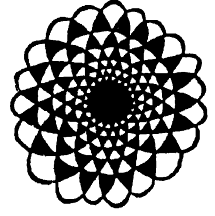
১০৯। সুধাংশুনাথ রায় (ছোট তিন আনী)

রূপরাম রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রপৌত্র পার্বতীনাথের কনিষ্ঠ পুত্র সুধাংশুনাথ বর্তমানে ষোল আনার অন্যতম নেতা। তিনি স্বধর্মে নিষ্ঠাবান ও সদাচারী। বহুকাল তিনি উলপুর স্কুলের কমিটির সভ্য ছিলেন। ইনি সাধারণের হিতকব কার্যে উৎসাহী ও যত্নবান।

১১০। সুখরঞ্জন রায় (বড় সওয়া তিন আনী)

দক্ষিণবাড়ির কামিনীমোহন রায়ের পুত্র মনোরঞ্জন বরিশাল জেলার কলসকাঠিব বিশ্বেশ্বরবাবুর জমিদারিতে নায়েবের কার্য করিতেন। ১৩১৬ সালে অকালে তিনি পরলোকগমন করেন। তখন তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুখরঞ্জনের বয়স ১৬ বৎসর। সেই সময়েই সংসারের ভার তাহার স্কন্ধে পড়ায় আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ তাহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। ১৩২৩ সালে তাহার মাতার মৃত্যু হয়। তৎপর কিছুদিন কলিকাতায় চাকুরি করিয়া পরে বরিশাল জেলার পল্লীগ্রামের স্কুলে শিক্ষকতার কার্য করিয়া সুখরঞ্জন ১৩২৮ সালে দেশে আসিয়া উলপুর ইউনিয়ন বোর্ডের কেরানির কার্য গ্রহণ করে। ১৩৩৪ সালে ৩৪ বৎসর বয়সে কলেরা রোগে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার চিতাগ্নি নির্বাপিত হইবার পূর্বেই তাহার স্ত্রী ঐ ব্যাধিতে তাহার সহগামিনী হয়। স্বামীর চিতাতেই তাহাকে সৎকার করা হয়। প্রথম যৌবন হইতেই সুখরঞ্জনের সঙ্গীত রচনার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি বিকশিত হয়। সুখরঞ্জন ১৩১৩ সালে "রঞ্জন গীতাবলী" নামে অনেকগুলি সঙ্গীত এবং ১৩১৯ সালের মধ্যে আরও অনেক সঙ্গীত রচনা করে। দোলের সময়ে এবং আমোদ উৎসবে বা শোক সভায় তাহার রচিত অনেক সঙ্গীত গীত হইত। রঞ্জন গীতাবলী ছাড়া সুখবঞ্জনের লিখিত চিত্রাশ্ব (নাটক), দক্ষযজ্ঞ (কাব্য), সান্ত্বনা (কবিতা পুস্তক) ও রমেশচন্দ্র (উপন্যাস) প্রভৃতি গ্রন্থ আছে। তাহার রচিত একটি কীর্তন গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

আর কত কাল, হে দীনদয়াল
রইব ভবের হাটে।
আমার দিন দিন দিন, হল তনু ক্ষীণ,
বৃথা কাজে দিন কাটে।।
হরি, হাটেতে এবার, সুসার হল না আমার,
আমার ছয় বেটা চোর, কেটে ঘরের দোর
নিয়েছে সকল লুটে।।
এসে ভবের হাটে, গেলাম মজুর খেটে,
এবে দাও পদাশ্রয়, ওহে দয়াময়,
এ দীন রঞ্জন রটে।।



সপ্তম অধ্যায়

প্রবাসীর কথা

১১১। নবীনচন্দ্র রায় (ছোট সওয়া তিন আনী)

উলপুরে উপনিবেশের মধ্য যুগে অনেকে বিদেশে গমন করিয়া ধন, মান ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন যুগে উলপুরের আকাশে যুগপৎ দুই চন্দ্রের উদয় হইয়াছিল। তাহাদের কীর্তি কৌমুদী বসু বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া বহু দূর দেশে প্রসারিত হইয়াছিল। সেই কীর্তিমান পুরুষদ্বয়ের নাম, নবীনচন্দ্র রায় ও পূর্ণচন্দ্র রায়।

১২৩২ সালের মাঘ মাসে উলপুর গ্রামে নবীনচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। রামকান্ত রায়ের ২য় পুত্র কৃষ্ণচরণ রায়ের দুই পুত্র, জগচ্চন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। ইহাদের মাতা বরিশাল জেলার বাটাজোরের সুপ্রসিদ্ধ ব্রজমোহন দত্তের পিতৃস্বসা ছিলেন।

নবীনচন্দ্রের বাল্যকালে তাহাদের পারিবারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। তাহার পিতা স্বীয় ভ্রাতাগণের সহিত একান্নভুক্ত থাকিয়া কোনরূপে সংসাবযাত্রা নির্বাহ করিতেন। বারেন্দ্রশ্রেণির ব্রাহ্মণ ত্রিলোচন চক্রবর্তীর পাঠশালায় নবীনচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ। তিনি তৎপর স্থানীয় কালীবাড়ির ঠাকুর মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে বাংলা ভাষাতেও তাহার বেশ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। উর্দু ও ফারসি তিনি কিয়ৎপরিমাণ শিক্ষা করিয়াছিলেন। পারিবারিক অসচ্ছলতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৬/১৭ বৎসর বয়সে বাটিব বাহির হইতে অভিলাষী হইলেন। তখন তাহার পিতা জীবিত ছিলেন না। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অভাবনিবন্ধন তাহাকে বিদেশে যাইবার খরচ দিতে পারিলেন না। গত্যন্তর না দেখিয়া নবীনচন্দ্র গোবিন্দ বৈরাগী নামক জনৈক খাতকের নিকট কর্জ টাকার বাবদ পাওনা ২০৲ কুড়ি টাকা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অজ্ঞাতে আদায় করিয়া তাহাই সম্বল করিয়া কাহাকেও না জানাইয়া বরিশালে চলিয়া গেলেন। সেখানে স্বশ্রেণীর কায়স্থ গাভানিবাসী কৃষ্ণহরি ঘোষ দস্তিদার তখন মুনসেফি আদালতের পেস্কার ছিলেন। নবীনচন্দ্র তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মপরিচয় দিলে তিনি নিজ বাসায় তাহাকে থাকিবার অনুমতি দেন। তাহার বাসায় সেই সময় আরও অনেক লোক থাকিয়া লেখাপড়া ও চাকুরির চেষ্টা করিত। তাহার বাসায় পাচক ছিল না ; যাহারা তাহার বাসায় থাকিত তাহাদেরই পালা কবিয়া রাঁধিতে হইত। সুতরাং নবীনচন্দ্রেরও পালামত রন্ধন কার্য করিতে হইত। কিছুদিন পরে কৃষ্ণহরি ঘোষের সাহায্যে নবীনচন্দ্র বরিশালের মুনসেফ কোর্টের তাইদনবিসী (এপ্রেনটিস্ মোহরের) কার্যে নিযুক্ত হইলেন। এই কার্যে যাহা কিছু পাইতেন তদ্দারা তাহার আবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহ হইত। তাহার সুন্দর হাতের লেখা দর্শনে মুনসেফ বাবুর দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হয়।

তৎকালে বিক্রমপুরের জৈনসার গ্রামনিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ অভয়াকুমাব দত্ত বরিশালের সদর মুনসেফ ছিলেন। তখন প্রত্যেক জেলার সদরে একজন প্রিন্সিপাল সদর আমিন, একজন সদর আমিন ও একজন সদর মুনসেফ থাকিতেন ; ও প্রত্যেক থানার মধ্যে সাধারণত একজন মুনসেফ থাকিতেন। ৩০০ টাকা পর্যন্ত দাবির মোকদ্দমা মুনসেফ কোর্টে, ১০০০৲ টাকা পর্যন্ত

সদর আমিনের কোর্টে এবং ৫০০০্ টাকা পর্যন্ত প্রিন্সিপাল সদর আমিনের কোর্টে বিচার হইত। জেলার জজ সর্বপ্রকার দাবির মোকদ্দমা এবং ৫০০০্ টাকা পর্যন্ত দাবির আপিলের বিচার করিতে পারিতেন। তাহার ডিক্রির বিরুদ্ধে সদর দেওয়ানি আদালতে আপিল হইত। জেলা জজ প্রয়োজনানুরূপ আপিল, এবং ৫০০০্ টাকার অধিক দাবির মূল মোকদ্দমার বিচারের ভার প্রিন্সিপাল সদর আমিনের উপর দিতে পারিতেন। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হইয়া সদর আমিনের পদ উঠিয়া যায়, মুনসেফগণের উপর ১০০০্ টাকা পর্যন্ত দাবির মোকদ্দমা বিচারের অধিকার প্রদত্ত হয় এবং প্রিন্সিপাল সদর আমিনের উপাধি সবর্ডিনেট জজ হয়।

তখন সাক্ষীর জবানবন্দি ও অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় লিখিবার ভার আমলাদিগের উপর ছিল, এবং লেখার কার্য এত বেশি ছিল যে কোর্টের একজন আমলার অধীন ১৫/২০ জন তাইদনবিস বা এপ্রেনটিস মোহর রাখিতে হইত। তাহারা লেখার পরিমাণ অনুসারে পারিশ্রমিক পাইত।

সদর মুনসেফ বাবু অভয়াকুমার দত্ত সুযোগমত নবীনচন্দ্রকে আদালতের আমলার পদে ও পেস্কারের পদে তাহাদের অনুপস্থিতিকালে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিতেন। তিনি নবীনচন্দ্রের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দর্শনে তাহাকে ওকালতি পরীক্ষা দিবার পরামর্শ দিলেন এবং নিজে তাহাকে কয়েকখানি আইনের পুস্তক দিলেন। তখন আইন পড়িবার কোন স্কুল কলেজ ছিল না, কিংবা কোন ব্যাখ্যা পুস্তক বা নজীরের বই ছিল না। ইংরেজ গবর্নমেন্টের প্রচারিত আইন ব্যতীত তখন হিন্দু ও মুসলমানী আইনের মূল গ্রন্থ পরীক্ষার্থীগণের আয়ত্ব করিতে হইত। নবীনচন্দ্র বহু আয়াসে আইন অধ্যয়ন করিয়া ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১২৫৫ সালের ১৩ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮ খ্রিঃ অঃ) বরিশাল জজ আদালতের উকিল হইলেন। ঐ একই দিনে গাভার সুপ্রসিদ্ধ নন্দকুমার ঘোষ ওকালতি আরম্ভ করেন।

উলপুর এই সময়ে বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত থাকায় উলপুরের জমিদারগণের বরিশালের কালীবাড়ি মহল্লায় একটি সরকারি বাসা ছিল। নবীনচন্দ্র ঐ বাসায় ঘর উঠাইয়া চাকর ও মুহুরী রাখিয়া ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাহার ওকালতি কার্যে পসার হইতে লাগিল। তৎকালে উকিলের সেরেস্তায় লেখার অনেক কার্য ছিল। আরজি বর্ণনা ২০/২৫ হাত দীর্ঘ কুষ্ঠির মত কাগজ জোড়া দিয়া তদুপরি লিখিত হইত। ইহার ছাড়া জবাবের জবাব, তাহার জবাব (জবাবউল জবাব, রজ্জ জবাব) প্রভৃতি নানাবিধ বাদ প্রতিবাদ ঐরূপ সুদীর্ঘ কাগজে লিপিবদ্ধ হইয়া দাখিল হইত। সুতরাং প্রত্যেক উকিল সেরেস্তায় ৫/৬ জন বা ততোধিক মুহুরী থাকিত। নবীনচন্দ্র জ্ঞাতি ও কুটুম্বের মধ্যে অনেককে নিজ সেরেস্তায় মুহুরীর কার্যে নিযুক্ত রাখিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন।

ক্রমে তিনি বরিশালের উকিলগণের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিলেন। ঢাকার নবাব গণিমিঞার (খাজা আবদুল গণি) পিতা খাজা আলিমুল্লা তাহাকে বরিশাল জেলায় অবস্থিত স্বীয় এস্টেটের মামলা মোকদ্দমা চালাইবার জন্য আমমোক্তার ও উকিল নিযুক্ত করেন। নড়াইলের জমিদার বাবু রামরতন রায়ও তাহাকে নিজেদের এস্টেটের উকিল নিযুক্ত করেন।

নবীনচন্দ্রের ওকালতির প্রথম সময়ে (১২৬০ সাল পর্যন্ত) মহম্মদ কলিম খাঁ বরিশালের প্রিন্সিপাল সদর আমিন ছিলেন। নবীনচন্দ্র তাহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাহার আদালতে যে সমস্ত বড় বড় মোকদ্দমা হইত তাহার একপক্ষ প্রায়ই নবীনচন্দ্রকে উকিল নিযুক্ত করিত।

ওকালতি ব্যবসায়ে নবীনচন্দ্র প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন এবং বরিশালে বহু মূল্যবান ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নিজ দেশেও

তিনি সম্পত্তি বাড়াইয়াছিলেন। দেশের পৈতৃক বাড়িতে তাহার অংশ অতি সামান্য থাকায় তিনি ১২৬৩ সালে পৈতৃক বাড়ির পশ্চিম দিকে একটি ভিটা জমা লইয়া তাহাতে সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহাতে পাকা ঘাটলা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময়ে বাড়ি আসিয়া মহাসমারোহে দুর্গাপূজা করিতেন। বরিশাল জেলার মাছরঙ্গের প্রসিদ্ধ ঢুলি প্রসন্ন নট্টের দল প্রতি বৎসর পূজার সময়ে তাহার বাড়িতে বাজাইত। তিনি পূজার তিন দিন কবি গান দিতেন ; লক্ষ্মী পূজায় অনেক বৎসর এবং দুর্গাপূজায় কোন কোন বৎসর যাত্রা গান দিয়াছেন।

তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন. কিন্তু সদ্ব্যয়ে কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাহার উন্নতির অবস্থায় তিনি অনেক লোককে নিজ বাসায় আহার ও বাসস্থান দিয়া বিদ্যাশিক্ষার ও চাকুরি প্রভৃতির সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার এই অন্নদানের জন্য এখনও তাহার নাম ঘরে ঘরে প্রবাদের মত শ্রুত হইয়া থাকে।

ঢাকার নবাবের আমমোক্তাবস্বরূপ নবীনচন্দ্র অনেকদিন সপরিবারে বরিশালস্থ ঢাকার নবাবের বাসাবাড়িতে বাস করিয়া ওকালতি করিয়াছিলেন। তৎপর নিজ বাসাবাড়িতে অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহাতে বাস করিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র তাহার সময়ের অনেক বড় বড় মোকদ্দমায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ঢাকার গণিমিঞার আমলে তাহার জমিদারি তরফ আয়লা ও ফুলঝুড়ি সুন্দরবনের অন্তর্গত বলিয়া গবর্নমেন্ট বাজেয়াপ্ত করিলে তাহার পক্ষে হাইকোর্ট পর্যন্ত গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা হয় তাহাতে নবীনচন্দ্র যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ঐ মোকদ্দমায় হাইকোর্টের বিচারে গণিমিঞা জয় লাভ করেন।

নড়াইলের জমিদার রতনবাবুর (রামরতন রায়ের) ভ্রাতা হরনাথ রায়ের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর ফৌজদারি মোকদ্দমা হইয়াছিল। তাহাতেও নবীনচন্দ্র বিশেষ পরিশ্রম করিয়া আসামীকে খালাস করিয়াছিলেন।

বরিশালের অন্যতম প্রসিদ্ধ জমিদার ব্রাউন সাহেবের (Mr. Brown) বিরুদ্ধে সেসন কোর্টে একটি ফৌজদারি মোকদ্দমা হইয়াছিল। নবীনচন্দ্র এই মোকদ্দমা পরিচালনে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়া জেলার সর্বত্র প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

প্রথম উন্নতির সময়ে নবীনচন্দ্র তাহার প্রথম কন্যার বিবাহ বরিশাল জেলার কাঁচাবালিয়া নিবাসী সনাতন গুহ বিশ্বাসের পুত্র **অশ্বিনীকুমার** গুহ বিশ্বাসের সঙ্গে মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন। অশ্বিনীবাবু উলপুরের সাড়ে তিন আনীর বাড়ির প্রসিদ্ধ দুর্গাদাস রায়ের ভাগিনেয় ছিলেন। এই বিবাহে নবীনচন্দ্র যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। অশ্বিনীবাবুর পিতা সাধারণত উলপুরে থাকিতেন। কন্যার বিবাহের পর নবীনচন্দ্র জামাতাকে নিজ ব্যয়ে কলেজে পড়াইয়া বি. এল পাশ করাইলেন। অশ্বিনীবাবু ১২৭৯ সালে হাইকোর্টের উকিলের সনদ পান। তিনি প্রথমত শ্বশুরের বাসায় থাকিয়া তাহার সঙ্গে বরিশালে ওকালতি আরম্ভ করেন। ওকালতিতে উন্নতি করা বহুসময়সাপেক্ষ, এদিকে নিজের সাংসারিক অবস্থা ভাল নহে, ইহা বিবেচনা করিয়া অশ্বিনীবাবু মুনসেফি পদের অভিলাষী হইয়া শ্বশুরের নিকট নিজ অভিপ্রায় জানাইলেন। এই সময়ে সদরল্যাণ্ড সাহেব বরিশালের ডিস্ট্রিক্ট জজ ছিলেন ; নবীনচন্দ্রের অনুরোধে তিনি অশ্বিনীবাবুকে মুনসেফ পদে নিযুক্ত করেন। অশ্বিনীবাবু মুনসেফ হইতে ক্রমে সাবজজ হইয়া বিভিন্ন জেলায় কার্য করিয়া প্রথম শ্রেণির সাবজজ হইয়া রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করিবার পরও তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। উলপুরের প্রতি ও উলপুরের বসুবংশীয়গণের প্রতি তাহার আন্তরিক টান ছিল। তিনি অবসর গ্রহণ করিবার পর জীবনের

শেষ ভাগে একবার উলপুরে গিয়া পূর্ব পরিচিত সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া মিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তাহার চারি পুত্র—জ্যেষ্ঠ রায় বাহাদুর **সুরেন্দ্রনাথ গুহ** হাইকোর্টে প্রথমত গবর্নমেন্ট উকিলের কাজ করেন ; পরে হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন। বঙ্গজ কুলীন কায়স্থগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন। ২য় জ্ঞানেন্দ্র সবরেজিস্ট্রার ছিলেন। তৃতীয় নৃপেন্দ্রনাথ সাবজজ ও ডিস্ট্রিক্ট জজের কার্য করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ রাজেন্দ্রনাথ কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি কালেক্টর।

পারিবারিক জীবনে নবীনচন্দ্র অনেক অসুবিধা ও ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমবার বানরিপাড়া নিবাসী কালীপ্রসাদ ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাহার প্রথম স্ত্রী অন্ধ হইয়া অনেক দিন জীবিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সহোদর জগচ্চন্দ্র বাতব্যাধিতে হতজ্ঞান ও অচলাঙ্গ হইয়া বহুকাল বরিশালে থাকিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। প্রথম স্ত্রী অন্ধ হওয়ায় নবীনচন্দ্র দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। তাহার গর্ভে বিরাজমোহন, নলিনীমোহন ও রমণীমোহন নামক তিন পুত্র এবং দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রকন্যাগণের বিবাহে, দৌহিত্রগণের অন্নপ্রাশনে এবং দৌহিত্রীর বিবাহে নবীনচন্দ্র বহু অর্থব্যয় ও সমারোহ করিয়াছিলেন।

১২৮৯ সালের পৌষমাসে পৃষ্ঠাঘাত রোগে নবীনচন্দ্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি বার্ষিক দশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি এবং নগদ টাকা ও কোম্পানি কাগজে প্রায় লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র উইল করিয়া তাহার সম্পত্তির দুই আনা অংশ ভ্রাতুষ্পুত্র অনুকূলচন্দ্রকে দিবার বিধান করিয়া গিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্রের দ্বারা উলপুরের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। তাহার বুদ্ধি সর্বতোমুখী ছিল ; মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্য, উপচিকীর্ষা ও উদারতা তাহার চরিত্রকে মহনীয় করিয়াছিল। কেহ সহসা তাহার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইত না। উলপুরের বহুলোক তাহার নিকট উপকৃত ছিল। পূজার সময়ে তাহার আগমনে উলপুরের সমস্ত গ্রামবাসীর ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসিগণের অপার আনন্দের উদয় হইত।

তাহার মৃত্যুর পর ১২/১৪ বৎসর পর্যন্ত তাহার পুত্রগণ পূজার সময়ে উলপুরে আসিয়া দুর্গাপূজায় কবি গান দিয়া তাহার কীর্তি রক্ষা করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে গানবাদ্য উঠিয়া গিয়াছিল কেবলমাত্র পূজা হইত। এখন উলপুরের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে। বিরাজমোহনের স্ত্রী মন্দাকিনী শ্বশুরের স্মৃতিরক্ষার্থ উলপুরস্থ ভদ্রাসন বাটিতে বিরাজমোহনের যে অংশ ছিল তাহা নবীনচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়কে অর্পণ করিয়াছেন।

১১২। পূর্ণচন্দ্র রায় (সাড়ে তিন আনী)

রামদেব রায়ের ৩য় পুত্র শ্যামসুন্দরের পৌত্র কালীশঙ্কর। কালীশঙ্করের দুই পুত্র দুর্গাগতি ও পূর্ণচন্দ্র। ১২৩৩ সালে (১৮২৬ খ্রিঃ অব্দে) উলপুরগ্রামে পূর্ণচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। ইহার মাতা ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরের অন্তর্গত কেন্দুয়াগ্রামের দত্তবংশের কন্যা ছিলেন।

প্রথমত পূর্ণচন্দ্র গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষা লাভ করেন। তৎপর কিছুদিন তিনি নিষ্কর্মা জীবন যাপন করেন ; দুই একবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে প্রজার নিকট খাজনা আদায়ের জন্য মফঃস্বলেও গিয়াছিলেন। এইভাবে ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কাটিয়া গেল। ১৭/১৮ বৎসর বয়সের সময়ে বিক্রমপুরের বয়রাগাছি গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ প্রিন্সিপাল সদর আমিন রামলোচন ঘোষের দৌহিত্রী, বরিশাল জেলার বানরিপাড়া নিবাসী রাধাকিশোর গুহ ঠাকুরতার কন্যার সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রের বিবাহ হয়। রামলোচন ঘোষ তখন কৃষ্ণনগরের প্রিন্সিপ্যাল সদর আমিন ছিলেন ; তিনি দৌহিত্রীর বিবাহের সমুদয় ব্যয় বহন করেন। এই সময়ে রামলোচন ঘোষের প্রথম পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ (১২৫০ সালের ১লা চৈত্র) জন্মগ্রহণ করেন। এই

বিবাহের অল্পদিনের পরে রামলোচন পূর্ণচন্দ্রকে কৃষ্ণনগরে নিজ আবাসে আনয়ন করেন ও আদালতের আমলার কার্যে নিযুক্ত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করেন। পূর্ণচন্দ্র ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সঙ্গে বাড়িতে বসিয়া গবর্নমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত আইনের পুস্তকাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১২৫৮ সালের পৌষ মাসে (জানুয়ারি, ১৮৫২ খ্রিঃ অঃ) সদর দেওয়ানি আদালতের উকিলের সনদ প্রাপ্ত হন।

ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ণচন্দ্র কিছুদিন কৃষ্ণনগরে থাকিয়া ওকালতি কার্য আরম্ভ করেন। প্রথমত তিনি ভবানীপুরে বলরাম বসুর ঘাটের নিকটে ভাড়াটিয়া বাড়িতে থাকিয়া ওকালতি করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই ওকালতিতে তাহার বেশ উপার্জন হইতে লাগিল। কলিকাতায় থাকাকালে তিনি জ্ঞাতি ও কুটুম্ব অনেককে আহার ও বাসস্থান দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। সদর দেওয়ানি আদালতের উকিলগণ বাংলা কিংবা উর্দু ভাষাতে সওয়াল জবাব কবিতেন এবং আদালতের কাগজপত্র বাংলা ভাষায় বা উর্দু ভাষায় লিখিত হইত।

১৮৬২ খ্রিঃ অব্দে সদর দেওয়ানি আদালত উঠিয়া গিয়া হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে তাহার সমস্ত কার্য ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত হইবার ব্যবস্থা হয়। এই সময়ে ময়মনসিংহের সরকারি উকিলের পদ খালি হওয়ায় পূর্ণচন্দ্র চেষ্টা করিয়া ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া ময়মনসিংহে চলিয়া যান। তদবধি শেষ পর্যন্ত তিনি সম্মান ও যশের সঙ্গে ময়মনসিংহের গবর্নমেন্ট উকিলের কার্য করিয়াছিলেন। তথায় অল্পদিনের মধ্যে তাহার যশঃসৌরভ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং তিনি ঐ জেলার সর্বপ্রধান উকিল বলিয়া গণ্য হইলেন। ময়মনসিংহের বাসাতেও তিনি অনেক আত্মীয়স্বজনকে আশ্রয় দিতেন। তাহার সদাশয়তা ও বদান্যতার জন্য তিনি সর্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। কলিকাতায় ওকালতি করিবার সময়ে তিনি উলপুরের ভদ্রাসন বাটিতে অট্টালিকা বাড়ি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

পূর্ণচন্দ্র অতিশয় উদারস্বভাব ও দয়ালু ছিলেন। তাহার নিকট কেহ কোন বিষয় যাঞ্ঞা করিলে তিনি সাধ্যসত্তে তাহাকে বিমুখ করিতেন না। তিনি গান বাজনা, উৎসব আমোদ ভাল বাসিতেন। তিনি বাড়িতে পৃথক দুর্গাপূজা করিতেন এবং তদুপলক্ষে প্রতি বৎসর যাত্রা অথবা ঢপ গান দিতেন। বহুদূরবর্তী গ্রাম হইতে অনেক লোক এই সকল গান শুনিতে তাহার বাড়িতে সমাগত হইত। শ্রোতাগণ তাহার বাডির যাত্রাগান শুনিয়া আবার নবীনচন্দ্রের বাড়ির কবিগান শুনিতে যাইত। এই দুই বাড়িব গান বাজনার সমারোহে পূজার তিন দিন গ্রামে বহুলোকের সমাগম হইত।

তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাগতি রায়ের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি পূর্ণচন্দ্রের প্রতি অতিশয় স্নেহশীল ছিলেন। সন ১২৯২ সালে পূর্ণচন্দ্র গুরুতর রোগগ্রস্ত হইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসেন। দুর্গাগতি রায়ের নিকট এই সংবাদ গেলে তিনি অবিলম্বে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। সেখানে দুই ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইলে উভয়ের নয়ন হইতে অশ্রু বিসর্জন হইতে লাগিল। আশ্চর্যের বিষয় কিছুদিন পবে সুস্থদেহ দুর্গাগতি পীড়িত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে কনিষ্ঠের সম্মুখে দেহত্যাগ কবিলেন। তাহার কিছু দিন পরে পূর্ণচন্দ্র পূর্বোক্ত ব্যারামে প্রাণ ত্যাগ করেন।

১৩০৪ সালের ৩০ জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৭ খ্রিঃ অব্দের ১২ জুন) অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময়ে বঙ্গদেশে ও আসামে যে প্রবল ভূমিকম্প হয় তাহাতে ময়মনসিংহ শহরের অনেক ইষ্টকালয় ভূমিসাৎ হইয়াছিল। পূর্ণচন্দ্র রায়ের স্ত্রী ঐ ভূমিকম্পের কালে গৃহের বাহিরে আসিবার সময়ে গুরুতর আঘাতের ফলে প্রাণত্যাগ করেন।

পূর্ণচন্দ্র কলিকাতায় থাকাকালীন খুলনা জেলার হোগলা পরগণার গাঙনি গুয়াখোলা মৌজার গাতি রাখিয়াছিলেন। উলপুরের জমিদারিও কতক অংশ তিনি শরিকগণের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি ঢাকা জেলার শঙ্কটের ভুঁইয়াগণের বাকরগঞ্জ জেলার অধীন মাঠিভাঙা পরগণার কতক অংশ খরিদ করিয়াছিলেন ; এবং বাকরগঞ্জ জেলার পটুয়াখালি সাবডিভিসনের অধীন আবাদ কচুপাতরা খরিদ করিয়াছিলেন, কিন্তু আবাদে অনেক ব্যয় এবং কোন লভ্য না হওয়াতে তিনি পরে উহা ছাড়িয়া দেন।

পূর্ণচন্দ্র বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছলেন এবং বহু সদ্ব্যয় করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পুত্রকে উপযুক্তরূপ লেখাপড়া শিখাইতে তাহার যথেষ্ট ব্যয় হইয়াছে। পুত্র কন্যাদির বিবাহাদির কার্যে এবং অন্যান্য নানা সৎকার্যে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তাহার পুত্রগণ প্রত্যেকেই রত্ন বিশেষ। উপযুক্ত চারিপুত্র এবং অক্ষয় যশ পশ্চাতে রাখিয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

১১৩। যোগেশচন্দ্র রায় (সাড়ে তিন আনী)

পূর্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেশচন্দ্র ১২৬১ সালের ১৮ কার্তিক (২ নভেম্বর ১৮৫৪ খ্রিঃ অঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বি এ ও ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে বি এল পাশ করিয়া ঐ বৎসরের ১০ জুলাই তারিখে তিনি হাইকোর্টের উকিল হন। তিনি ৬০ বৎসরের উর্ধ্বকাল কৃতিত্বের সহিত কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন। জীবনে তিনি বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। তাহার বাড়িতে অনেক লোক প্রতিপালিত হইয়াছে। তাহার এবং তাহার স্ত্রীর উলপুরের উপর বিশেষ টান আছে। উলপুরের জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে তিনিই এখন বয়োজ্যেষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তাহার একমাত্র পুত্র নরেশচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার। তাহার পৌত্রগণ উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি দীর্ঘকাল উলপুরের বসুবংশীয়গণের মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন।

১১৪। সতীশচন্দ্র রায় (সাড়ে তিন আনী)

পূর্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র সতীশচন্দ্র অতিশয় মেধাবী ও তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ১২৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ওকালতি পাশ কবিয়া তিনি ময়মনসিংহে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বি এ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া ৪০ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি সুকঠিন ডি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যশস্বী হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েক বৎসর পরে ১২৯৯ সনের ১৮ আশ্বিন তারিখে মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। তাহার একমাত্র পুত্র জ্যোতিশচন্দ্র রেঙ্গুনে ব্যারিস্টারি করিতেছেন। তাহার জামাতা সুরেশচন্দ্র তালুকদার কলিকাতা হাইকোর্টের ফৌজদারি বিভাগের সুপ্রসিদ্ধ এড্‌ভোকেট।

১১৫। ক্ষিতীশচন্দ্র রায় (সাড়ে তিন আনী)

পূর্ণচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বি এল পাশ করিয়া ময়মনসিংহে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। তিনি সাধুতা, প্রতিভা ও বাগ্মিতার বলে ময়মনসিংহের উকিলগণেব মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করেন এবং ময়মনসিংহের বড় বড় জমিদারের বাঁধা উকিল ছিলেন। ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার প্রায় সমস্ত বড় মোকদ্দমায় একপক্ষে ক্ষিতীশচন্দ্র নিযুক্ত হইতেন। তিনি প্রত্যেক মোকদ্দমার কাগজপত্র বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ না করিয়া সওয়াল জবাব করিতেন না। তিনি মিষ্টভাষী ও সুবক্তা ছিলেন। ক্ষিতীশচন্দ্র ১৩৩৬ সালের কার্তিক মাসে (১১ নভেম্বর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) কলিকাতা নগরীতে পরলোক গমন করেন। তাহার চারি পুত্র—জ্যেষ্ঠ সুধীশচন্দ্র এম এ, বি এল ও বিলাতের পি এইচ ডি উপাধিধারী, কলিকাতা হাইকোর্টের কৃতী ব্যারিস্টার। সুধীশচন্দ্র মেধাবী ও প্রতিভাশালী ; পিতা

পিতামহের উপযুক্ত বংশধর। ক্ষিতীশচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র দ্যুতীশচন্দ্র এম এ, বি এল ময়মনসিংহে ওকালতি করিতেছেন। অল্পদিনের মধ্যে তাহারও ওকালতিতে সুনাম হইয়াছে। তৃতীয় পুত্র নীতীশচন্দ্র এম এ, এম এস সি; চতুর্থ কীর্তিশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। ক্ষিতীশচন্দ্রের জামাতা রাজেন্দ্রনাথ গুহ এম এ, এম এল কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এডভোকেট।

১১৬। পৃথ্বীশচন্দ্র রায় (সাড়ে তিন আনী)

পূর্ণচন্দ্রের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পৃথ্বীশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধিধারী ছিলেন না ; কিন্তু জ্ঞানে, মানে ও কৃতিত্বে তিনি কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। তাহার প্রবল বিদ্যানুরাগ ও রাজনৈতিক বিষয়ের অনুশীলনে ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। তিনি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসভার এবং ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন। ইংরেজি ভাষায় তিনি অনেক সুচিন্তিত ও সুলিখিত পুস্তক এবং প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে, দিনশাওয়াচা প্রভৃতি ভিন্ন প্রদেশের নেতাগণ কলিকাতায় আসিলে পৃথ্বীশচন্দ্রের সঙ্গে অবশ্য সাক্ষাৎ করিতেন এবং কেহ কেহ তাহার আবাসে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। তিনি মুখ্যত রাজনৈতিক বিষয় আলোচনার জন্য ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড (Indian World) নামে ইংরেজি ভাষায় একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। অল্পকালের মধ্যেই ঐ পত্রিকা যুব সমাজের নিকট আদৃত হইয়াছিল ; পরে তিনি উহাকে সাপ্তাহিক পত্রিকায় পরিণত করেন। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত তাহার প্রবন্ধ ও মন্তব্যাদি বহুলোকে আগ্রহের সহিত পাঠ করিত। পরে তিনি কয়েক বৎসর দক্ষতার সহিত সুপ্রসিদ্ধ বেঙ্গলী নামক দৈনিক পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহার ইংরেজি ভাষায় লিখিত পুস্তকের মধ্যে ভারতের দারিদ্র্যসমস্যা, ভারতের দুর্ভিক্ষ, ভারতের মানচিত্র, আমাদের স্বরাজের দাবি এবং সি. আর. দাসের জীবনী ও সময় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল পুস্তক চিন্তাশীল সমালোচক ও শিক্ষিত মহলে সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার যে সুবৃহৎ লাইব্রেরী ছিল তাহাতে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের বহু মূল্যবান গ্রন্থ ছিল। তিনি দীর্ঘকাল ফরিদপুর সেবাসমিতির সভাপতির কার্য বিশেষ যত্নের সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

উলপুরে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় হইতে ৯ বৎসর (১৩০৬-১৩১৫ সন) পৃথ্বীশচন্দ্র ঐ স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। তাহার চেষ্টায় অতি সহজেই ঐ স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েশন প্রাপ্ত হয়। ঐ স্কুলের উন্নতির জন্য তাহার বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন ছিল। ১৩১৫ সালে তিনি সেক্রেটাবি পদ ত্যাগ করেন, পরে আবার ১৩২৭ সাল হইতে ১৩৩৪ সাল পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্টের কার্য করিয়াছিলেন। উলপুর পূর্ণচন্দ্র স্কুলের যে সকল ছাত্র এন্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিত তিনি তাহাদের খোঁজ খবর লইতেন এবং মাঝে মাঝে তাহাদিগকে নিজ আলয়ে সমবেত করিতেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। উলপুরের ইতিহাস লিখিতে আমাদিগকে উদ্যোগী জানিয়া তিনি অনেকবার সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন ; তাহার মৃত্যুতে আমরা তাহার মূল্যবান সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। পৃথ্বীশচন্দ্রের অনেক গুণ ছিল। নিজের চেষ্টায় তিনি যেরূপ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অল্প লোকের অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে। তাহার অন্তঃকরণ উদার ও প্রশস্ত ছিল। তাহার দুই পুত্র—দীপ্তীশচন্দ্র ও প্রীতীশচন্দ্র, উভয়ই এম এ, বি এল ; তিন কন্যা নীহার, লীনা ও বীণা, সকলেই সুশিক্ষিত।

১১৭। কৈলাসনাথ রায় (বাগানবাড়ি সাড়ে তিন আনী)

রামদেব রায়ের ২য় পুত্র রামগোপালের পৌত্র কমলাকান্তে কনিষ্ঠ পুত্র কৈলাসনাথ ১২৪০

সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমত যশোহরের সদর আমিনের আদালতে, পরে জজ আদালতে ওকালতি করেন ; তৎপর কয়েক বৎসর হাইকোর্টে মোক্তারের কার্য করেন ; পরে প্রসিদ্ধ জমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের এস্টেটে কার্য করেন ; শেষ জীবনে বৃন্দাবনে পাইকপাড়া এস্টেটের সদর নায়েবের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ৮ ও ১০ আইন বিধিবদ্ধ হইলে ইনি ঐ আইন বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন ; এবং তৎকালীন সদর দেওয়ানি আদালতের ও রেভিনিউ বোর্ডের সার্কুলারাদি সংগ্রহ করিয়া "রাজনিয়ম" নামক গ্রন্থ এবং "জমিদারি কার্যের নিয়মাবলী" নামে পুস্তক প্রণয়ন করেন। বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব বিষয়ক আইন পাশ হইবার পর তিনি তাহার পূর্ব প্রকাশিত খাজনার আইন সম্বন্ধীয় পুস্তকের নূতন সংস্করণ (১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে) প্রকাশিত করেন। ১৩০২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে কৈলাসনাথ পরলোক গমন করেন। তাহার কন্যার সহিত মাণিকদহের জমিদার বিপিনবিহারী রায়ের বিবাহ হইয়াছিল। তাহার পুত্র যোগেন্দ্রনাথ পরে বিপিনবাবুর এস্টেটের ম্যানেজার হইয়া বহুকাল দক্ষতার সহিত ঐ কার্য করিয়াছিলেন।

১১৮। চন্দ্রকান্ত রায় (সাড়ে তিন আনী)

রামদেবের ২য় পুত্রের শাখার নবকৃষ্ণের ২য় পুত্র চন্দ্রকান্ত। ইনি ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই গ্রামের অধিবাসীগণের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি কিছুদিন ভাঙাচৌকিতে ওকালতি করিয়াছিলেন। পরে বিক্রমপুরের অন্তর্গত কোলাগ্রামে শিক্ষকতা করিতেন। তাহার পৌত্র মনোরঞ্জন উলপুর স্কুলের গণিতের প্রধান শিক্ষক।

১১৯। কালীকান্ত রায় (ছোট সওয়া তিন আনী)

কৃষ্ণরামের ২য় পুত্র নন্দরামের কনিষ্ঠ পুত্র শিবপ্রসাদের চতুর্থ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায়ের পুত্র কালীকান্ত। কালীকান্ত স্ববংশীয়দের মধ্যে প্রথম জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি সে আমলের লোকের মধ্যে বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন। তিনি চরিত্রবান সামাজিক ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাহার পুত্র চিন্তাহরণ অপুত্রক পরলোকগমন করেন।

১২০। শ্রীনাথ ও লোকনাথ রায় (ছোট সওয়া তিন আনী)

রামরাম রায়ের পঞ্চম পুত্র লক্ষ্মীকান্ত রায়ের পুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ, হরগোবিন্দ ও কিশোরগোবিন্দ। কৃষ্ণগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথ এবং কিশোরগোবিন্দের মধ্যম পুত্র লোকনাথ। ইহারা দুই জনই মুনসেফ কোর্টে ওকালতি করিতেন। ইহাদের কাহারও পুত্র সন্তান নাই। লোকনাথ রায়ের স্ত্রী ললিতা চৌধুরানী (ডাক নাম বিন্দুর মা) গুণবতী, সুগায়িকা, উৎসব-আমোদপ্রিয় এবং প্রফুল্লানন ছিলেন। বাড়ির যে কোন ঘরে উৎসব উপস্থিত হইলেই তিনি আপন গৃহজ্ঞানে তাহাতে সানন্দে যোগদান করিতেন। অতি বাল্যকালে তাহাকে দেখিয়াছি, কিন্তু এখনও তাহার হাস্যময় মুখ ছবির মত চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। তাহার পুত্র না থাকায় তিনি একসঙ্গে দীর্ঘকাল উলপুরে থাকিতেন না। কখনও উলপুরে, কখনও পিত্রালয়ে থাকিতেন। শেষদিকে তাহাকে আর উলপুরে বেশি দেখা যায় নাই। তাহার মত অমায়িক ও মধুর প্রকৃতির স্ত্রীলোক অল্পই দেখা যায়।

১২১। চন্দ্রকান্ত রায় (ছোট সওয়া তিন আনী)

রামরামের কনিষ্ঠ পুত্রের ৩য় পুত্র পার্বতীচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রকান্ত রায় ১২৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অবস্থার অস্বচ্ছলতার জন্য তিনি বিদেশে বাহির হইয়া স্কুল কলেজের বিদ্যা উপার্জন করিতে পারেন নাই, কিন্তু বাংলা ভাষায় তাহার বেশ অধিকার ছিল, এবং তিনি

মিষ্টভাষী ও সুবক্তা ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল বরিশাল জেলায় কলসকাঠির জমিদার বরদাকান্ত রায়ের সুবৃহৎ মরিচবুনিয়া মহালে নায়েবের কার্য করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। তাহার বহু দান ও সদ্ব্যয় ছিল। কন্যাদির বিবাহ ও দৌহিত্র দৌহিত্রীর অন্নপ্রাশনে তিনি অনেকবার উলপুরের সমস্ত জ্ঞাতি কুটুম্ব ভোজন করাইয়াছিলেন। তিনি উদার প্রকৃতি, সদাশয়, দয়াবান ও আত্মীয় প্রতিপালক ছিলেন। বৈষয়িক ও সামাজিক কার্যে তাহার অশেষ বিজ্ঞতা ছিল। তাহার সমসাময়িক লোকের নিকট তিনি বিশেষ সম্মানভাজন ছিলেন। ১৩১৭ সালের ২৭ কার্তিক ৭৫ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যশরণ রায় বুদ্ধিমান, সুবক্তা এবং বৈষয়িক ও সামাজিক ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ।

১২৩। দ্বারকানাথ রায় (ছোট সওয়া তিন আনী)

নবীনচন্দ্রের নিজ বাড়ির নিজ হিস্যার দ্বারকানাথ রায় অনুমান ১২৪৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমত নবীনচন্দ্রের মুহুরীর কার্য করিয়া পরে ওকালতি পরীক্ষা দিয়া ১২৭১ সালের ২১ মাঘ বরিশালের জজকোর্টের উকিল হন। ঐ তারিখ গাভার চন্দ্রকিশোর ঘোষ, চাঁদসির অম্বিকাচরণ গুহ, কাঁচাবালিয়ার বৈকুণ্ঠচন্দ্র বসু ও রামচন্দ্রপুরের স্বরূপ চন্দ্র গুহও উকিল হন। ওকালতিতে দ্বারকানাথের অধিক পসার না থাকিলেও ওকালতি ও মহাজনীর দ্বারা তিনি অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। তিনি বরিশালে ফকির বাড়ি মহল্লায় একখানি মূল্যবান বাড়ি নির্মাণ করিয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত সপরিবারে সেখানে বাস করিয়াছেন। তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন ; কিন্তু কন্যাদির বিবাহে এবং মাতৃশ্রাদ্ধে ও অন্যান্য পারিবারিক উৎসবাদিতে অনেক ব্যয় করিয়াছিলেন এবং বরিশালে ও নিজ গ্রামে বহু লোকজনকে অনেকবার পরিতোষ পূর্বক ভোজন করাইয়াছেন। শেষ বয়সে তাহার জ্যেষ্ঠতাত কাশীচন্দ্র রায়ের পুত্রবধূ প্যারীমণির মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি লইয়া তাহার অন্য জ্যেষ্ঠতাত শম্ভুচন্দ্র রায়ের প্রপৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের সহিত মোকদ্দমায় তাহার বহু অর্থ ক্ষয় হইয়াছিল। তিনি ১৩১৫ সালে পরলোকগমন করেন। তাহার জ্যেষ্ঠ কন্যা জ্ঞানদাসুন্দরী ঘোষ সুন্দর চিত্র করিতে পারিতেন।

পূর্বোল্লিখিত প্যারীমণি অতিশয় বুদ্ধিমতী ও সাধু প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। তিনি বালবিধবা, তাহার নিকট আত্মীয় কেহ ছিল না। কিন্তু তাহার বুদ্ধি ও ব্যবহারের গুণে কোঠাবাড়ির বড় হিস্যার সকলেই তাহার আপন হইয়াছিল। এজমালী পূজা প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মে লোকজনের পালা ও ভাগ্যযোগ প্রভৃতি তাহার নির্দেশ মতই হইত। কোন গৃহে কোন ক্রিয়া উপস্থিত হইলে তিনিই কর্তৃত্ব করিতেন। তাহার কথা স্ত্রী-পুরুষ সকলেই মান্য করিত।

১২০। দীনবন্ধু রায় (ছোট সওয়া তিন আনী)

রামরাম রায়ের ৩য় পুত্র রতিকান্তের পুত্র রামপ্রাণ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র দীনবন্ধু রায় ১২৫৭ সালের আশ্বিন মাসে সপ্তমী পূজার দিন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এই পুস্তকের মূল গ্রন্থকার। ইনি অল্পবয়সে মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাগেরহাটে মোক্তারী আরম্ভ করেন। পরে ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরিশালে ওকালতি করেন। কিন্তু শারীরিক অপটুতার জন্য তিনি মধ্য বয়সে ওকালতি ত্যাগ করিয়া উলপুরে আসিয়া বাস করেন। ১৩২৪ সালের ৭ অগ্রহায়ণ শুক্রবার জগদ্ধাত্রী পূজার দিন সূর্যাস্তের সময়ে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাহার সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে।

১২৪। যজ্ঞেশ্বর রায় (ছোট সওয়া তিন আনী)

দীনবন্ধু রায়ের কনিষ্ঠ সহোদর যজ্ঞেশ্বর রায় ১২৫৯ সালের ফাল্গুন মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার কনিষ্ঠ ভগিনীর শ্বশুর মুর্শিদাবাদের নবাবের মোক্তার ইত্না নিবাসী প্রাণনাথ ঘোষের বাসায় থাকিয়া তিনি কয়েক বৎসর মুর্শিদাবাদে নিজামত স্কুলে পড়িয়াছিলেন। তৎপর তিনি

আলিপুর মিটিওরলজিক্যাল অফিসে কেরানির কার্যে নিযুক্ত হন। সেই চাকুরিতে ছুটি অতি অল্প থাকায় তিনি দেশের বাড়িতে বেশি যাইতে পারিতেন না, কালীঘাটে বাসা করিয়া স্ত্রীপুত্রাদিসহ বাস করিতেন। সেকালে কলিকাতায় উলপুরের বেশি লোক ছিল না, সুতরাং তীর্থযাত্রা ও চিকিৎসা প্রভৃতি উপলক্ষে অনেক আত্মীয় তাহার গৃহে সমাগত হইত। তাহার স্ত্রী অতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন। একক তাহার সমস্ত গৃহকর্ম করিতে হইত, অতি প্রত্যুষে উঠিয়া স্বামীর জন্য আহার্যাদি প্রস্তুত করিতে হইত এবং পুত্র কন্যাগণের যাবতীয় অভাব পূরণ করিতে হইত। তাহারা পতি পত্নী উভয়ই পরিশ্রমী ছিলেন বলিয়া অল্প আয়ে বৃহৎ পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করিয়া অতিথি অভ্যাগতদেব সমুচিত সেবা করিতে পারিতেন। ১৩২৬ সালে চতুর্থ জামাতা খানখানাপুর নিবাসী সতীশচন্দ্র দত্ত বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলে যজ্ঞেশ্বর প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া বহু যত্নে তাহার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সতীশচন্দ্র ঐ ব্যারামে প্রাণত্যাগ করেন , সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও ঐ সংক্রামক ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত হইযা ৭/৮ দিন ভুগিয়া পরলোকগমন করেন। তাহার দ্বিতীয় পুত্র অখিলভূষণ বি এ পাশ করিয়া নানাবিধ ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে অকালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার দুইটি নাবালক পুত্র বর্তমান। যজ্ঞেশ্বরে অপর পুত্র বিনযভূষণ ও অঞ্চলভূষণ সচ্চরিত্র ও শান্তস্বভাব।

১২৫। প্রতাপচন্দ্র রায় (সাড়ে তিন আনী)

রামদেব রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র বিনোদরাম রায়ের শাখায় ব্রজমোহনের ৪ পুত্র—কুঞ্জমোহন, প্রতাপচন্দ্র, চন্দ্রমোহন ও রাজেন্দ্র। কুঞ্জমোহনেব পুত্র বনবিহারী ডাক বিভাগে কার্য করেন। প্রতাপচন্দ্র সুশিক্ষিত ও সুলেখক ছিলেন। উলপুরে বাসকালীন তিনি "চিত্রকর" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। লেখার গুণে তাহার সমাদর হইয়াছিল। পরে তিনি "নৃপবর" নামে আর একখানি পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন ফরিদপুর কালেক্টরীতে চাকুরি করিয়াছিলেন। তৎপর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মুনসেফ কোর্টেব সেরেস্তাদারেব কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সেই কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্বে ৫৭ বৎসর বয়সে ১৩১১ সালে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ উলপুরে দীর্ঘকাল কৃতিত্বের সহিত ডাক্তারী করিতেছেন। চন্দ্রমোহন সুস্থদেহ ও দীর্ঘজীবী। তিনি ঢাকার সিভিল কোর্টে বহুকাল চাকুরি করিয়া অবসর গ্রহণ করিযাছেন।

১২৬। রসিকচন্দ্র রায় (ছোট সওযা তিন আনী)

সুপ্রসিদ্ধ মহেশচন্দ্র রায়ের অনুজ ভারতচন্দ্রের পুত্র রসিকচন্দ্র উলপুরের বসু বংশেব একটি উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুদিন ওকালতি করেন। তৎপর (১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ ১৭ জুলাই) তিনি মুলফতগঞ্জের (ফরিদপুর) অতিবিক্ত মুন্সেফের পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। এক বৎসর পরেই তিনি স্থায়ী মুন্সেফ হন। উলপুরেব বসু বংশের মধ্যে তিনিই প্রথম মুন্সেফ। তিনি বিচারকার্যে প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণিব মুন্সেফ পদে উন্নীত হন; কিন্তু দুঃখের বিষয় বেশি দিন ঐ কার্য করিতে পারেন নাই। ১২৯৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি বাঁকুড়ায় সদর মুন্সেফ পদে নিযুক্ত হন। সেখানে এক বৎসর কার্য করিবার পর ১২৯৮ সালের ২৫ আষাঢ় তারিখে রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে রসিকচন্দ্র অকালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তখন তাহার বয়স ৩৮/৩৯ বৎসর হইয়াছিল। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি মূল বাড়ি হইতে অল্প দূরে পশ্চিম দক্ষিণ দিকে একটি প্রজার বাড়ি খাস করিয়া সেখানে একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন। তাহার খুল্লতাতপুত্র অতুলচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে ঐ বাড়ি নির্মিত হয়। অট্টালিকা নির্মাণ সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই রসিকচন্দ্র

পরলোকগমন করেন। তাহার ৭ কন্যা ও একটি শিশু পুত্র ছিল। পুত্রটি তাহার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই পরলোকগমন করে। তাহার সকল কন্যাই কুলীনে বিবাহিত হইয়াছিল। নিজ বংশমর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তাহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি তেজস্বী, সাহসী এবং সৎকার্যে উৎসাহী ছিলেন। নিজ নূতন বাড়িতে তিনি প্রতি বৎসর পৃথক দুর্গাপূজা ও কালীপূজা করিতেন। ১৩২৭ সালে তাহার স্ত্রী সূর্যমুখী মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেই সমস্ত দেবার্চনা নিয়মিতরূপে নির্বাহিত হইয়াছিল।

১২৭। কালীপ্রসন্ন রায় (ছোট সওয়া তিন আনী)

নন্দরাম রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শিবপ্রসাদের তৃতীয় পুত্র গোপীকৃষ্ণ রায়েব দুই পুত্র গৌরচন্দ্র ও বামচন্দ্র। রামচন্দ্র সুস্থদেহ ও বলশালী লোক ছিলেন। তিনি ধর্মপবায়ণ, সরল ও সাহসী ছিলেন। ১২৭৭ সালে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীপ্রসন্ন ১২৫৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। রামচন্দ্র রায়েব অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। কালীপ্রসন্ন বরিশাল জেলার অন্তর্গত কাশীপুর গ্রামে মাতুলালয়ে থাকিয়া বহু কষ্টে লেখাপড়া শিক্ষা করেন। কাশীপুর হইতে ববিশাল হাটিয়া আসিয়া স্কুলে পড়িতে হইত। তিনি এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইযা ১২৭৭ সালে উকিল হন। কয়েক বৎসর ওকালতি কবিবার পর ১২৮৪ সালের মাঘ মাসে তিনি অস্থায়ী মুন্সেফী পদ প্রাপ্ত হন ও ২ বৎসর পরে স্থায়ী মুন্সেফ হন। ১৩০৭ সালেব বৈশাখ মাসে তিনি শ্রীহট্টের সাবজজ পদে নিযুক্ত হন। ঐ কার্যে নিযুক্ত থাকা কালে ১৩১০ সালের ৪ঠা মাঘ তারিখে তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন ; এবং ১২ দিন ভুগিয়া ১৬ মাঘ পরলোকগমন করেন। তিনি উলপুরে অনেক সম্পত্তি ক্রয় করিযাছিলেন ও কলিকাতা ভবানীপুবে একখানি মূল্যবান বাড়ি করিযাছিলেন এবং মৃত্যুকালে নগদ টাকা ও কোম্পানির কাগজ বাখিযা গিয়াছিলেন। তাহার তিন পুত্র যোগেন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রকুমার ও ভূপেন্দ্রকুমার। যোগেন্দ্রকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুনীলচন্দ্র ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে ভাল চাকুরি করেন। উপেন্দ্রকুমারের পুত্রদ্বয় সুশীলচন্দ্র ও অনিলচন্দ্র উভয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ উপাধিধারী, তাহারা সমস্ত পরীক্ষায় পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অনিলচন্দ্র প্রবেশিকা পবীক্ষায গবর্নমেন্ট বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ভূপেন্দ্রকুমার গ্রাজুযেট। তাহার পুত্র অরুণচন্দ্র বি এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। রামচন্দ্রের ৫ম পুত্র রাধিকাপ্রসন্ন আলীপুব সিভিল কোর্টে চাকুরি করিতেন। তাহার পুত্র রমেশচন্দ্র ভবানীপুবে ডাক্তারী করেন। অভিনয় কার্যে তাহার বিশেষ দক্ষতা আছে। রামচন্দ্রের ২য় পুত্র শ্যামাপ্রসন্ন আলিপুবের মোক্তার ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান পরলোকগমন করিয়াছেন।

১২৮। দেবীপ্রসন্ন রায় (ছোট সওয়া তিন আনী)

বামচন্দ্র রায়ের তৃতীয় পুত্র দেবীপ্রসন্ন ১২৬০ সালের ২৩ পৌষ মাতুলালয় কাশীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। ১২৭৪ সালের পৌষ মাসে উলপুরে যে ভীষণ ওলাউঠা মহামারীর আক্রমণ হয় তাহাতে রামচন্দ্রের স্ত্রী চন্দ্রকলা এবং তাহার চতুর্থ পুত্র বালক রমাপ্রসন্ন প্রাণ ত্যাগ করে। ইহার কিছুদিন পরে বানরিপাড়া নিবাসী বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষের কন্যা কমলকামিনীর সহিত দেবীপ্রসন্নের বিবাহ হয়। চেতলায় দুর্গাদাস সরকারের বাসায় তিনি লণ্ডন মিশনারী স্কুল হইতে ১২৭৯ সালে (১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ) এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। সেখানে চারি বৎসর অধ্যয়ন করিয়া চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণি হইতেই ডাক্তারী পড়া ছাড়িয়া দেন। এই সময়ে তিনি পটলডাঙ্গা ছাত্রাবাসে থাকিতেন।

চেতলায় থাকা কালেই তিনি মেছুয়াবাজার ব্রাহ্ম মন্দিরে কেশববাবুর উপাসনায় আগ্রহের সহিত যোগ দিতেন। পরে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সভ্য

ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করায় তৎকালে তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণের এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের বিশেষ বিরাগভাজন হন এবং সর্বপ্রকার সাহায্য এবং সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হন। তাহার ধর্মানুরাগ ও স্বদেশ প্রীতি প্রবল ছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে দেবীপ্রসন্ন একজন অগ্রণী ছিলেন। কয়েক বৎসর পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণের ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া তিনি ঐ সমাজের উপাসনা মন্দিরে বেশি যাইতেন না। কিন্তু মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ব্রাহ্মধর্ম অনুসরণ করিয়াছেন ; পারিবারিক সমস্ত অনুষ্ঠান তিনি ঐ ধর্মের পদ্ধতি অনুসারে চালাইয়াছেন। পরে তাহার হিন্দু সমাজস্থ আত্মীয়স্বজন তাহার চরিত্রের মহত্ত্ব, উদারতা ও উপচিকীর্ষা উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রতি পূর্ব বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

স্বদেশের হিতসাধনে উদ্যোগী হইয়া দেবীপ্রসন্ন ১২৮৭ সালের বৈশাখ মাসে ফরিদপুর সুহৃদ সভার প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তদবধি (২ বৎসর ব্যতীত) ১৩২৭ সালে তাহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ঐ সভার সম্পাদক ছিলেন। ঐ সভাদ্বারা প্রধানত তাহার প্রযত্নে সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর কাল ফরিদপুরের অজ্ঞাত ও দুর্গম পল্লীগ্রামসমূহে স্ত্রীশিক্ষা ও ব্যায়ামশিক্ষা বিস্তার, নৈশবিদ্যালয়, অনাথা বিধবাদিগের সাহায্য, মহামারী সময়ে ঔষধ বিতরণ, দুর্ভিক্ষে অন্নদান প্রভৃতি নানাকার্যে ফরিদপুরবাসিগণের বহু উপকার সাধিত হইয়াছে। ১৩০৪ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা প্রথম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। সেই সময়ে ফরিদপুর সুহৃদসভার পক্ষে দেবীপ্রসন্ন কোটালিপাড়া অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের মধ্যে চাউল ও কাপড় বিতরণ করিয়াছিলেন। স্কুল সমূহের সাব-ইনস্পেক্টর গোবিন্দচন্দ্র দত্ত তাহার এই কার্যে সহযোগী ছিলেন।

নিজ গ্রাম উলপুরে ১৩০৯ সালে পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় তাহার অক্ষয়কীর্তি। তিনি তাহার কলিকাতার বাসগৃহের নাম আনন্দ আশ্রম রাখিয়াছিলেন। তিনি মিতব্যয়ী হইলেও অন্নদানে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাহার আনন্দ আশ্রমে কোন অতিথি আসিয়া অভুক্ত ফিরিয়া গিয়াছে, এরূপ শুনা যায় নাই।

তিনি যৌবনেই বঙ্গ সাহিত্যের চর্চায় রত হন। মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময় তাহার প্রথম উপন্যাস শরচ্চন্দ্র প্রকাশিত হয়। তিনি শরচ্চন্দ্র, বিরাজমোহন, সন্ন্যাসী, ভিখারী, যোগজীবন, নবলীলা, অপরাজিতা, মুরলা, পুণ্যপ্রভা প্রভৃতি উপন্যাস ও সোপান, বিবেকবাণী, জ্যোতিকণা, প্রসাদ, ভ্রমণবৃত্তান্ত, বিবাহসংস্কার, সান্ত্বনা ও দ্যুতি প্রভৃতি প্রবন্ধ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ১২৯০ সালে তিনি নব্যভারত নামক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি তাহা দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পরে তাহার পুত্রবধূ ফুল্লনলিনী ঐ পত্রিকা কিছুদিন বাহির করিয়াছিলেন। নব্যভারতের বিশেষত্ব এই ছিল যে তাহাতে কোন গল্প বা উপন্যাস প্রকাশিত হইত না। এইরূপ পত্রিকা সাধারণ পাঠকের প্রিয় হইবার সম্ভব ছিল না। তথাপি সুধীসমাজে নব্যভারতের বিশেষ সমাদর ছিল এবং বহু কৃতী লেখক ও কবি ইহাতে নিয়মিতরূপে লিখিতেন।

তাহার একমাত্র পুত্র প্রভাতকুসুম বানরিপাড়া মাতুলালয়ে ১২৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩০৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভাতকুসুম বিলাত হইতে ব্যারিস্টার হইয়া এদেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি উলপুরের প্রথম ব্যারিস্টার। দেশের এবং ব্রাহ্মসমাজের কাজে প্রভাতকুসুমের যথেষ্ট উৎসাহ ছিল।

দেবীপ্রসন্নের স্ত্রী কমলকামিনী সরল স্বভাব, উদার প্রকৃতি ও সদাশয়া ছিলেন। লোকজনকে খাওয়াইতে তাহার পরম আনন্দ ছিল। তিনি ১৩২০ সালের ৩০ কার্তিক পুরীধামে পরলোকগমন করেন। তাহার পূর্বে প্রভাতকুসুমের ২য় পুত্র প্রণব শৈশবে প্রাণত্যাগ করে। এই সমস্ত ও অন্যান্য কারণে জীবনের শেষ ভাগে দেবীপ্রসন্ন নানাপ্রকার অশান্তি ভোগ

করিয়াছিলেন। ১৩২৭ সালের আশ্বিন মাসে তিনি বৈদ্যনাথে নিজ বাড়িতে বিশ্রামের জন্য গিয়াছিলেন। কেহ মনে করে নাই যে তাহাই চিরবিশ্রাম হইবে। সেখানে ১৮ আশ্বিন তারিখে সন্ন্যাস রোগে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। দুঃখের বিষয় তাহার মৃত্যুর ২ বৎসরের মধ্যে প্রভাতকুসুমের মৃত্যু হয়। তাহার অল্প কয়েক বৎসর পরে প্রভাতকুসুমের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসূনের অকাল মৃত্যু হয়। কিছুদিন পূর্বে প্রভাতকুসুমের স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। এখন তাহার কনিষ্ঠ পুত্র প্রজ্ঞান ও দুই কন্যা জীবিত আছে। কিন্তু আনন্দ আশ্রমে তাহারা কেহ থাকে না। দেবীবাবুর মৃত্যুর পর এত অল্পদিনের মধ্যেই যে তাহার সাধের আনন্দ আশ্রম এরূপ নিরানন্দ নিকেতনে পরিণত হইবে তাহা পূর্বে কল্পনাও করিতে পারি নাই। বহু সুকৃতি বলে এই সব শোচনীয় ঘটনার পূর্বেই তিনি মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। তাহার বাড়ির অবস্থা দেখিয়া তাহার গৃহে শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে বহু সময়ে শ্রুত তাহার একটি প্রিয় সঙ্গীত বার বার মনে পড়ে—

জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।
হোক তব ইচ্ছা পূর্ণ দুঃখ সুখের ভিতরে।।
বিচ্ছেদে মিলনে, জীবনে মরণে, তোমার ইচ্ছার জয় হেরি নয়নে ;
কর নিত্য নববেশে খেলা (দীন) দাসের অন্তরে।।
সম্পদে বিপদে, বিষাদে আনন্দে, রোগে শোকে চিরদিন আছি ওপদে,
হাসি কাঁদি তোমার লীলা দেখে, যোগানন্দ ভরে।।

১২৯। গিরি প্রসন্ন রায় (ছোট সওয়া তিন আনী)

রামচন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র গিরিজাপ্রসন্ন ১২৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার চারিমাস বয়সের সময়ে মাতৃবিয়োগ হয় এবং ৩ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। নানা দুঃখ কষ্টে ইহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। গিরিজাপ্রসন্ন ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বি এল পাশ করিয়া প্রথমত কয়েক বৎসর আলিপুর জজ কোর্টে ওকালতি করেন ; ৫ বৎসর পরে হাইকোর্টের উকিল হন, তদবধি মৃত্যুকাল পর্যন্ত ৩৫ বৎসর তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করেন। অগ্রজ দেবীপ্রসন্নের অনুবর্তী হইয়া তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন। তিনি চরিত্রবান, পরিশ্রমী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ওকালতি কার্যে তাহার যথেষ্ট পসার হইয়াছিল। মক্কেলের কাজ তিনি নিজের কাজ বিবেচনা করিয়া বিশেষ পরিশ্রম ও দক্ষতার সহিত করিতেন। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হইলেও তিনি প্রাচীন হিন্দু সমাজের আত্মীয়স্বজনের সহিত আত্মীয়োচিত ব্যবহার করিতেন। তিনি তাহার সমস্ত পুত্র কন্যাগণকে উচ্চ শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তাহার কন্যা শ্রীমতী সুধা রায় এদেশে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বিলাতে যাইয়া বি. এডুকেশন (B. Ed) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। রক্তের চাপ বৃদ্ধি রোগে তিনি ১৩৪২ সালের ২৪ জ্যৈষ্ঠ পুত্র কন্যাগণের সমক্ষে পরলোকগমন করেন। ধর্মে তাহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। আমাদিগকে তিনি বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাহার মধুর ব্যবহারে তাহার পরিচিত সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। বর্তমান যুগে ঐরূপ উচ্চ আদর্শের লোক বিরল।

১৩০। যজ্ঞেশ্বর রায় (ছোট সওয়া তিন আনী)

গঙ্গাধর রায়ের পুত্র আলিপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল যজ্ঞেশ্বর রায় সকল শ্রেণির লোকের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইনি ১২৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবন অসাচ্ছল অবস্থার মধ্যে কাটাইয়া নিজ সাধুতা ও শ্রমশীলতার বলে তিনি সমব্যবসায়িগণের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি মান ও প্রতিষ্ঠায় স্ববংশীয়গণের শীর্ষস্থানে থাকিয়াও এবং প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়াও কাহারও প্রতি কোনরূপ অহঙ্কার কিংবা ঘৃণার ভাব প্রকাশ করেন

নাই। তাহার চরিত্র নির্মল, আদর্শ মহৎ এবং ব্যবহার বিনয় ও অমায়িকতায় পূর্ণ ছিল। পুত্র পৌত্রাদি আত্মীয়স্বজনে পরিবৃত থাকিয়া তিনি পরম শান্তিতে জীবন যাপন করিয়াছেন। তাহার সাধ্বী পত্নী দীনতারিণী পতি ও পুত্র কন্যাগণের সম্মুখে ১৩২০ সালের ১৬ ফাল্গুন পরলোকগমন করেন। তাহার ১২ বৎসর পরে ১৩৩২ সালের ১৩ শ্রাবণ তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। তাহার ৩য় পুত্র জীবপ্রিয় তাহার সঙ্গে আলিপুরে ওকালতি কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিযাছিলেন। ১৩৪৩ সালের ১০ ফাল্গুন রক্তের চাপ বৃদ্ধিতে তিনি অকালে পরলোক গমন করেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানপ্রিয় কলিকাতা ছোট আদালতের উকিল। যজ্ঞেশ্বরের পুত্রগণ সকলেই চরিত্রবান ও অমায়িক। তাহার জামাতা কাঁচাবালিয়া নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ গুহ আলিপুর জজ কোর্টের যশস্বী উকিল।

১৩১। যামিনীকান্ত রায় (ছোট তিন আনী)

নূতন বাড়ির চন্দ্রকুমার রায়ের ২য় পুত্র যামিনীকান্ত রায় উলপুরের চৌধুরি বংশের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি মাদারীপুরের মুন্সেফ কোর্টে ওকালতি করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। মাদারিপুর এবং নিজ দেশের সর্বশ্রেণির লোক তাহাকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত। মাদারীপুরে থাকিয়াও তিনি উলপুরের জমিদারি ও সামাজিক বিষয়ে নেতৃত্ব করিতেন। তিনি জীবনে বহু সৎকার্য করিযাছেন। পিতৃশ্রাদ্ধে তিনি পরগণার সমস্ত লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া পারিতোষের সহিত ভোজন করাইয়াছিলেন। সুস্থদেহে দীর্ঘকাল ওকালতি করিযা প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে ১৩৩৪ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রফুল্ল যৌবনে পরলোকগমন করিয়াছে। ২য় পুত্র রমেশচন্দ্র ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়াছে। অন্যান্য পুত্রগণও সুশিক্ষিত। তাহার অনুজ কাশীনাথ ও বিনোদকুমার জীবিত আছেন। তাহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ অশ্বিনীকুমারের পুত্র রমণীমোহন গোপালগঞ্জে ওকালতি করিতেন।

১৩২। আনন্দচন্দ্র রায় (ছোট সওয়া তিন আনী)

রামরামের চতুর্থ পুত্রের শাখায় আনন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বহু কষ্টে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন। আনন্দচন্দ্র সৎপ্রকৃতি ও চরিত্রবান ছিলেন। তিনি বিদেশেই বাস করিতেন। বড় হইয়া উলপুরে কখনও বাস করেন নাই। তাহার শ্বশুরবাড়ি মোচনাতে শ্বশুরের সম্পত্তি ও বাড়ি তাহার স্ত্রী প্রাপ্ত হওয়াতে অবসর সময়ে তাহার পরিবার সেখানেই থাকিত। সম্প্রতি তাহার পুত্রগণ গোপালগঞ্জে একখানি বাড়ি করিয়াছেন।

১৩৩। সুরেন্দ্রনাথ রায় (সাড়ে তিন আনী)

রামদেবের শাখায় মথুরানাথ ভাঙার মুন্সেফ কোর্টে নাজিরের কার্য করিতেন। তাহার পুত্র সুরেন্দ্রনাথ রায় এম এ, বি এল, ফরিদপুরের ফৌজদারি উকিলগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। তিনি সুবক্তা ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। ফরিদপুর শহরে তাহার যথেষ্ট মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তাহার পুত্র সন্তান নাই।

১৩৪। অমৃতলাল রায় (সাড়ে তিন আনী)

রামদেবের কনিষ্ঠ পুত্রের শাখায় রামসুন্দরের পুত্র অমৃতলাল রায় ফরিদপুরে কার্য করিতেন। তিনি ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত আর্যকায়স্থ প্রতিভা নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় সুলেখক ও কবি ছিলেন। কায়স্থ সমাজের উন্নতির জন্য অনেক কার্যে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কালীপ্রসন্ন সরকারের সহায়তা করিয়াছেন। তিনি "দয়মন্তীবিলাপ", "কবিতাকুসুম", "বর্ণকুসুম" প্রভৃতি কবিতা গ্রন্থের প্রণেতা।

১৩৫। মথুরানাথ রায় (ছোট তিন আনী)

নূতন বাড়ির মথুরানাথ রায় মাদারীপুরে ওকালতি করিতেন। আরজি, বর্ণনা এবং অন্যান্য দলিলপত্রের মুশাবিদা কার্যে তাহার খুব দক্ষতা ছিল। বহু দূরের মক্কেলও তাহার নিকট হইতে মুশাবিদা করিয়া নিতে আসিত।

১৩৬। অতুলচন্দ্র রায় (বড় সওয়া তিন আনী)

রমাবল্লভের উত্তর পুরুষগণেব মধ্যে অতুলচন্দ্র প্রথম গ্রাজুয়েট এবং প্রথম উকিল। তিনি বি এল পাশ করিয়া কয়েক বৎসর বরিশালে ওকালতি করেন, তৎপরে মাদারীপুরে এবং পরে গোপালগঞ্জে ওকালতি করিতেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে প্রায় ৩ বৎসর উলপুর স্কুলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিপুলচন্দ্র বরিশালের উকিল।

১৩৭। উপেন্দ্রনাথ রায় (সাড়ে তিন আনী)

জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা জেলা কোর্টে ওকালতি করিতেছেন তন্মধ্যে উপেন্দ্রনাথ প্রাচীন। ইনি দীর্ঘকাল নোয়াখালি জজ কোর্টে ওকালতি করিয়া খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। ইনি নোয়াখালির উকিল সভার সভাপতি। উপেন্দ্রনাথ পরিশ্রমী, সৎপ্রকৃতি ও সামাজিক।

১৩৮। চন্দ্রমোহন রায় (বড় তিন আনী)

নূতন মধ্যেব বাড়ির কালিকাপ্রসাদ রায়ের চতুর্থ পুত্র হরিনাথ। তাহার তিন পুত্র প্রমদামোহন, চন্দ্রমোহন ও আনন্দমোহন। চন্দ্রমোহন প্রথম বয়সে সাবরেজেস্ট্রি কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শেষ জীবনে বহু বৎসর তিনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাটের সাবরেজিস্ট্রার ছিলেন। তিনি সেখানেই বাড়ি নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন। চন্দ্রমোহনের সন্তান সন্ততিগণ বসিরহাটেই বাস করিতেছেন।

১৩৯। সুরেন্দ্রনাথ রায় (বড় তিন আনী)

চন্দ্রমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দমোহনের দুই পুত্র, সুরেন্দ্রনাথ ও হরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথ বি এল পাশ করিয়া ব্রহ্মদেশে ওকালতি করিতে যান। সেখানে কৃতিত্বের সহিত ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন কবিয়া কয়েক বৎসর পূর্বে এদেশে ফিবিয়া আসিযাছেন। তিনি এখন কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট। তিনি কলিকাতায় ও দেশে সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ এবং দেশে জমিদারি অর্জন করিয়াছেন। সাধারণের হিতকর কার্যে তাহার আন্তরিক আগ্রহ আছে। উলপুর স্টেশনে তিনি নিজ ব্যয়ে একখানি বিশ্রাম গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

১৪০। মতিলাল রায় (বাগানবাড়ি সাড়ে তিন আনী)

রামদেবের ২য় পুত্র রামগোপালের পুত্র কালীচরণের পুত্র কালীকুমার। কালীকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলকান্ত, তাহার পুত্র মতিলাল ১২৭৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে উলপুর মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া পরে কলিকাতায় হাইকোর্টেব উকিল যোগেশচন্দ্র রায়ের বাসায় থাকিয়া সাউথ সুবার্বান স্কুলে কিছুদিন পড়েন। মতিলাল কুমিল্লা জেলা স্কুল হইতে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে এন্ট্রান্স পাশ করিয়া চট্টগ্রাম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং গবর্নমেন্ট বৃত্তি ও সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। ইনি বি এল পাশ করিয়া ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে উকিল হন এবং ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে মুন্সেফ হন ; ক্রমে সাবজজ, এডিঃ জজ ও ডিস্ট্রিক্ট জজের কার্য করিয়া তিনি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া নিজ গ্রামে বাস করিতেছেন। উলপুরের সর্ববিধ উন্নতির জন্য ইনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন। তিনি ৩ বৎসর উলপুর স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মতিলাল "নবীনচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের" প্রাণস্বরূপ। বর্তমানে তিনি স্থানীয় ইউনিযন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।

১৪১। অবনীনাথ রায় (ছোট সওয়া তিন আনী)

কোটাবাড়ির বৈকুণ্ঠনাথ রায় জমিদারিতে একজন বড় অংশী ছিলেন। কিন্তু তাহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র কালীচরণের অকাল মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা স্ত্রীর দ্বারা তাহার শ্বশুর স্থানীয় কয়েকজন লোকের সহায়তায় মামলা মোকদ্দমা করায় তিনি অভাবে পড়েন। জমিদারি শাসনেও তিনি একটু উদাসীন ছিলেন। ফলে তাহার সংসার কিছুদিন অসচ্ছল ভাবে চলিয়াছে। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অবনীনাথ পিতার এই কষ্ট মোচন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। তিনি আলিপুরের প্রসিদ্ধ উকিল যজ্ঞেশ্বর রায়ের বাসায় থাকিয়া এফ এ ও প্লিডারসিপ পড়েন। অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে একবারেই তিনি ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন হইতে তিনি মাদারীপুরে ওকালতি করিতেছেন। অল্পদিনের মধ্যে ওকালতিতে তাহার বিশেষ পসার হয়। স্বীয় বুদ্ধি ও ব্যবহার গুণে তিনি অল্পবয়সেই উলপুরের নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠেন। ইনি ৪ বৎসর উলপুর স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। তাহার সময়ে ঐ স্কুলের গৃহে একতলা দালান নির্মিত হয়। মাদারীপুরেও তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি। তথায় তিনি উকিল সভার প্রেসিডেন্ট এবং সমস্ত জনহিতকর কার্যের সহিত সংসৃষ্ট আছেন।

১৪২। প্রমথনাথ ও নগেন্দ্রনাথ রায় (ছোট তিন আনী)

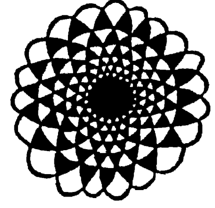
রূপরামের দ্বিতীয় পুত্র শিবনারায়ণের শাখায় জ্ঞানচন্দ্র রায়ের দুই পুত্র প্রমথনাথ ও নগেন্দ্রনাথ। প্রমথনাথ ওকালতি পাশ করিয়া ভাঙায় ওকালতি করিতেছেন। প্রমথনাথ সপরিবারে ভাঙা ও আলগীতে বাস করেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আলিপুরে ওকালতি করিতেছেন। নগেন্দ্রনাথ বিদ্যায় ও নানা সদগুণে উলপুরের বসুবংশীয়গণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি গণিত শাস্ত্রে ১ম বিভাগে এম এ পাশ করিয়া কোচবিহার কলেজে অধ্যাপকের কার্য করিতেছেন।

১৪৩। কালীপদ রায় (বাগানবাড়ি)

মতিলাল রায়ের খুল্লতাত প্রাণকালী রায় বলবান পুরুষ ছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বয়সে শারীরিক বলের জন্য খ্যাত ছিলেন। কিন্তু আকার ও শক্তিতে তাহার ৩য় পুত্র কালীপদ (মনু রায়) সকলকে অতিক্রম করিয়াছিল। অপরিমিত শারীরিক বলের অধিকারী হইয়াও কালীপদ কখনও তাহার অপব্যবহার করে নাই। কিছুদিন বেরি বেরি রোগে ভুগিয়া ১৩৪৩ সালের ভাদ্র মাসে ৪৫ বৎসর বয়সে কালীপদ পরলোকগমন করে। নিজ গুণে কালীপদ সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিল।

উলপুরের ঘোষ বংশবল্লী

- (১৭) রামগোবিন্দ ঘোষ
  - (১৮) মুকুন্দরাম
    - (১৯) রামনারায়ণ
      - (২০) ভবানীপ্রসাদ
        - (২১) রাজকিশোর
          - (২২) কাশীনাথ
            - অবিনাশ
              - অমূল্যচন্দ্র
                - অনিমেষ
              - সুধাংশুচন্দ্র
            - দুর্গানাথ
          - চন্দ্রনাথ
        - কৃষ্ণকিশোর
        - যুগলকিশোর
          - তাবক
            - রমেশ
            - অরুণ
            - বিপিন
      - কালীপ্রসাদ
      - শিবপ্রসাদ
      - দেবীপ্রসাদ
      - রামকৃষ্ণ
      - লক্ষ্মীকান্ত
        - নবকৃষ্ণ
          - কালীনাথ
            - হেমনাথ
              - রবীন্দ্র
            - সুরেন্দ্র
              - ইন্দ্র
              - ধীরেন্দ্র
            - সত্যেন্দ্র
            - যতীন্দ্র
          - বৈকুণ্ঠনাথ
            - আশুতোষ
              - রমণী
              - শতধর
              - কালীদাস
              - বিমল
          - মথুরানাথ
    - হরিনারায়ণ
    - দর্পনারায়ণ (রায়েসবরে বাস)
  - (১৮) নন্দরাম
    - (১৯) শ্যামসুন্দর
      - (২০) কুঞ্জমোহন
        - রামপ্রাণ
          - উমেশ
            - সুরেশ
            - উল্লাস
          - পতাকী
            - অনিল
            - গোপাল
        - হরগোবিন্দ
          - অভয়াচরণ
            - অমূল্য
              - ল
            - প্রফুল্ল
              - বিমল
          - হরিশ
            - সতীশ
          - যোগেশ
          - ভূপেশ
            - রমেশ
            - পরেশ
            - গুণেশ
        - গৌরমোহন
          - প্রকাশ
            - জ্যোতিষ
              - ক্ষিতীশ
              - দীনেশ
              - ফণীন্দ্র
              - মণীন্দ্র
            - বীরেশ
              - ব্যোমকেশ
    - রামমোহন
      - (২০) বৈদ্যনাথ
        - গোলকনাথ
          - বিশ্বম্ভর
            - ভগবতীচরণ
            - লক্ষ্মীচরণ
          - পূর্ণচন্দ্র
            - সুরেন্দ্র
            - কালীপদ
            - মুকুন্দ
        - রঘুনাথ
          - কামিনী
      - জগমোহন
    - আনন্দমোহন
  - মুনিরাম



অষ্টম অধ্যায়

বসু বংশের স্থাপিত কুলীন ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন

১৪৪। ঘোষ বংশ

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে যশোহর সমাজস্থ বেওকাঠি নিবাসী রামগোবিন্দ ঘোষের সহিত রঘুনন্দন রায়ের কন্যার বিবাহ হয়। রঘুনন্দন রায়ের পুত্র ও পৌত্রগণ উলপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজ স্থাপন মানসে আত্মীয় স্বজন আনিযা উলপুরে স্থাপিত করিবার অভিলাষী হন। স্বভাবত তাহাদের প্রথম দৃষ্টি রঘুনন্দনের কন্যা জামাতার প্রতি পতিত হয়, তাহারা আগ্রহ প্রকাশ করায় রামগোবিন্দ ঘোষ স্ত্রীপুত্র সহ বেওকাঠি ত্যাগ করিয়া উলপুরে বাস স্থাপন করিলেন। তাহার উত্তরপুরুষগণ দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া এখন দুইটি পৃথক বাড়িতে বাস করিতেছেন। উভয় শাখাই রায়চৌধুরিগণের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণ ভূমি মহাত্রাণ স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত রামগোবিন্দ ঘোষের বংশতালিকা পূর্বপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

এই ঘোষ বংশীয়গণের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ ও কৃতী ব্যক্তি ছিলেন। সামাজিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে যুগলকিশোর ঘোষ, গোলোকচন্দ্র ঘোষ ও কাশীনাথ ঘোষ বিচক্ষণ লোক ছিলেন। বসুচৌধুরিগণ জমিদারি শাসন সংক্রান্ত অনেক ব্যাপারে ইহাদের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ইহাদের বিচক্ষণতা ও কার্যদক্ষতা উলপুর জমিদারির অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং জমিদারির বেবন্দোবস্তী স্থান সমূহের নূতন জরিপ জমাবন্দি ও চিঠা প্রস্তুত হইয়াছিল। ১২৬৬ সালের জোট বা প্রজাবিদ্রোহের পরে ইহারা জমিদারির অন্তর্গত মহাল সমুদায়ের সুশাসন ও পুনর্বন্দোবস্তের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। বসুবংশীয়গণের সকলেই ইহাদিগকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন।

এই বংশের **অবিনাশচন্দ্র ঘোষ** কালেক্টরির সেরেস্তাদারের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমূল্যচন্দ্র ঘোষ বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র এবং অমায়িক লোক ছিলেন। নিজের চেষ্টায় তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং চরিত্রের মধুরতায় সর্বসাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও অল্প বয়সে এপেণ্ডিসাইটিস রোগে পরলোক গমন করেন। তাহার পুত্র অনিমেষ এম এস সি শ্রেণির ছাত্র। অবিনাশচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র সুধাংশুচন্দ্র ঘোষ এম এ, বি এল, মুনসেফী কার্যে নিযুক্ত আছেন। বিচারকার্যে তিনি সর্বত্র সুযশ অর্জন করিয়াছেন।

কালীনাথ ঘোষ মোক্তার ছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র **হেমনাথ ঘোষ** আলিপুর জজ কোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ; কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ দীর্ঘকাল স্থানীয় শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র ঘোষের পুত্রগণ রেল অফিসে চাকুরি করেন। তাহারা সাধারণত নৈহাটীতে বাস করেন। প্রকাশচন্দ্র ঘোষ দৈহিক বলের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র **জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ** সুপুরুষ, সচ্চরিত্র, সামাজিক ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে পরলোকগমন করেন তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ পোস্ট মাস্টারের কার্য করিতেন। এখন অবসর লইয়া মুর্শিদাবাদ জেলার সৈদাবাদে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন। **অভয়াচরণ** ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র অমূল্যচরণ ঘোষ অল্প বয়সে পরলোকগমন করেন। তাহার কনিষ্ঠ পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র হোমিওপ্যাথিক

ডাক্তার, কলিকাতায় চিকিৎসা কার্যে নিযুক্ত আছেন। বিশ্বম্ভর ঘোষের পুত্রদ্বয় সচ্চরিত্র ও শান্তপ্রকৃতি। **পূর্ণচন্দ্র ঘোষ** বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রমোহন ব্রহ্মদেশে ব্যবসায় কার্যে নিযুক্ত আছেন। **হরিশচন্দ্র ঘোষ** জমিদারি সংক্রান্ত কার্যে অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ ছিলেন এবং বসুচৌধুরিগণের জমিদারি শাসন সংক্রান্ত কার্যে আজীবন সহায়তা করিতেন। **আশুতোষ ঘোষ**ও জমিদারি কার্যে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। **ভূপেশচন্দ্র ঘোষ** মুর্শিদাবাদে থাকিয়া সঙ্গীত বিদ্যায় শিক্ষা লাভ কবিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় সুগায়ক ও অভিনেতা উলপুরে কিংবা নিকটবর্তী প্রদেশে বিরল ছিল। তিনি বিনয়ী, সচ্চরিত্র ও সামাজিক ছিলেন। তাহার দুই পুত্র বর্তমান আছে, তাহারা উভয়েই চাকুরিতে নিযুক্ত।

কাশীনাথ ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র **দুর্গানাথ ঘোষ** যৌবন হইতেই সংসারবিরাগী। তিনি রেল বিভাগে কার্য করিতেন। বহুদিন পর্যন্ত গৃহসংসার করিবেন না বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন। পরে উলপুরের বাগানবাড়ির প্রাণকালী রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন ; তাহার গর্ভে তাহার একটি পুত্র সন্তান হয়, কিন্তু ঐ পুত্র অতি অল্পবয়সে পরলোকগমন করে। তৎপর তাহার স্ত্রীও ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি আর দার পরিগ্রহ করেন নাই। চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতী। তিনি (১) উপাসিকা চরিত (২) স্বামী রামানন্দ (৩) A Few Problems Solved (৪) Sri-Gouranga The Man এবং (৫) The Teachings of Sri-Gouranga প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও মৃত পুত্রের স্মরণার্থ প্রতি বৎসর দুইটি পারিতোষিক দিবার জন্য তিনি উলপুর হাই স্কুলে উপযুক্ত পরিমাণ কোম্পানির কাগজ অর্পণ করিয়াছেন।

১৪৫। (দক্ষিণের) গুহবংশ

রমাবল্লভ রায় ঢাকার নিকটবর্তী মালঙ্গপাড়া নিবাসী রামদেব গুহের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া কন্যাজামাতাকে নিজ বসত বাটির অদূরে দক্ষিণ দিকে একটি বাড়ি ও তেঁতুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে অনেক জমি মহাত্রাণ প্রদান করিয়া উলপুরে স্থাপিত করেন। তদবধি রামদেব গুহ ও তাহার বংশধরগণ সেই বাটিতে বাস করিতেছেন। রামদেব গুহের বংশ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১৯) রামদেব গুহ
- শম্ভুচন্দ্র
  - অনাথ
  - অতুল
- শ্যামসুন্দর
  - (২১) সদানন্দ
    - গোপীচন্দ্র
      - (২৩) পার্বতীচরণ
        - সতীশ
          - (২৫) সুকুমার
        - বিলাস
        - প্রফুল্ল
  - কৃষ্ণানন্দ
    - জয়চন্দ্র
      - রামনারায়ণ
        - (২৪) উমাচরণ
          - (২৫) শ্রীশ
          - সতীন্দ্র
          - শরৎ
          - কিরণ
          - (বরিশালের নিকটবর্তী রায়পাশা গ্রামে বাস)
        - প্রসন্ন
          - হরেন্দ্র
          - উপেন্দ্র
        - যোগেশ
          - শিবরতন (খুলনা জেলায় রামভদ্রপুরে বাস
  - রামানন্দ
    - গৌরীশঙ্কর
      - তারিণী
  - পরমানন্দ
- ব্রজকিশোর
  - (২১) গোবিন্দ
    - গোপাল
      - (২৩) অমরচন্দ্র
        - ললিত
          - (২৫) কালীপদ
          - হারাণ

অনুমৃতার ভিটা—রামদেব গুহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুচন্দ্র গুহ গাভানিবাসী চন্দ্রনাথ ঘোষের কন্যা তারাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। তারাসুন্দরী অত্যন্ত সাধ্বী ও পতিপরায়ণা ছিলেন। ইহাদের দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। শম্ভুচন্দ্র ঢাকা জেলাবাসী জমিদার মির্জা হায়দরের তহশীলদারের মুহুরীর কার্য করিতেন। তিনি শেষবার যখন ঐ কার্যে যোগদান করিতে ঢাকা যান তখন তাহার সঙ্গে উলপুর নিবাসী হরিবর্ধন নামে একজন ভৃত্য ছিল। সেবার কার্যস্থলে পৌঁছিবার ৫/৭ দিনের মধ্যেই দারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া শম্ভুচন্দ্র পরলোকগমন করেন। যেদিন তাহার সুদূর কার্যস্থলে মৃত্যু হয় সেইদিনই তাহার সাধ্বী পত্নী উলপুরে নিজগৃহে অত্যন্ত মানসিক দুশ্চিন্তায় পতিত হইলেন ; তাহার মনে হইল যেন তাহার পতির মৃত্যু হইয়াছে। এই ধারণার বশবর্তিনী হইয়া তিনি অনশনে দেহত্যাগ করিতে মনন করিয়া সেই সময় হইতে অন্নজল ত্যাগ করিলেন। আত্মীয়স্বজন সকলেই তাহার দুশ্চিন্তা অমূলক বলিয়া বুঝাইয়া তাহার কঠোর সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল যে তাহার স্বামী ইহলোকে নাই, সুতরাং তিনি কিছুতেই স্বীয় সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। ২/৩ দিন মধ্যে ভৃত্য হরিবর্ধন শম্ভুচন্দ্রের আসবাবপত্রাদি সহ উলপুরে আসিয়া রমাবল্লভ রায়ের বাটিতে শম্ভুচন্দ্রের পরলোকগমনের সংবাদ দিল। অচিরে সেই সংবাদ তারাসুন্দরীকে জানান হইল। তিনি তাহার অল্পক্ষণ পরেই দেহত্যাগ করেন। আত্মীয়স্বজনেরা পরম ভক্তি সহকারে উচ্চৈঃস্বরে রামনাম হরিনাম করিতে করিতে গুহদের বাড়ির পূর্ব দক্ষিণ দিকে একটি ভিটার উপর এই সাধ্বী রমণীব শবদেহ দাহ করেন। তিনি এইভাবে মৃতপতির অনুগমন করায় তদবধি সেই ভিটাকে লোকে "অনুমৃতার ভিটা" বলে।

এই গুহ পরিবারের প্রায় সকল ব্যক্তিই সচ্চরিত্র, নিরহঙ্কার, সামাজিক ও সাদালাপী। পার্বতীচরণ গুহ মহাজনী ব্যবসা করিয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দ্র নাটোরের মহারাজের এস্টেটে ওভারশিয়ারের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার মধ্যম পুত্র বিলাসচন্দ্র গুহ বগুড়ায় মোক্তারী করিতেছেন। তাহার কনিষ্ঠ পুত্র প্রফুল্লকুসুম কলিকাতা ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল হইতে ডাক্তারি পাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি উক্ত ব্যবসা আরম্ভ করিবাব পূর্বেই অকালে ইহলীলা সংবরণ করেন।

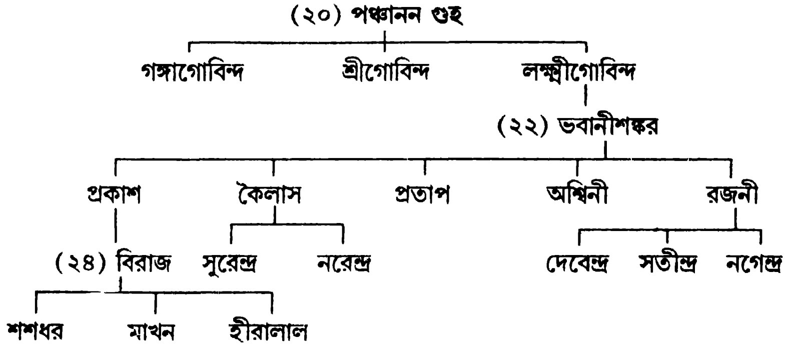
উমাচরণ গুহের পুত্রগণ ৩৫/৪০ বৎসর পূর্বে উলপুরের বাস ত্যাগ করিয়া বরিশাল শহরের নিকটবর্তী রায়পাশা গ্রামে বাস করিতেছেন। সেখানে তাহাদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। যোগেশ গুহ খুলনা জেলার বাগেরহাট সবডিভিসনের অন্তর্গত রামভদ্রপুরে বাস করিতেছেন।

প্রসন্নচন্দ্র গুহ বড় সওয়া তিন আনীর রাজকুমার রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি সরল, মিষ্টভাষী ও শান্ত স্বভাব ছিলেন। পুত্র পৌত্রাদি রাখিয়া তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন। তাহার দুই পুত্র হরেন্দ্র ও উপেন্দ্র তাহার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

ললিতচন্দ্র গুহের জ্যেষ্ঠপুত্র কালীপদ স্কুলে পড়িবার সময়ে অতি অল্প বয়সে পরলোকগমন করে। তাহার কনিষ্ঠ পুত্র হারাণ পিতৃপুরুষের ভিটায় বাস করিতেছে।

১৪৬। (উত্তরের) গুহ বংশ

কৃষ্ণরাম রায় তাহার মধ্যম পুত্র নন্দরামের কন্যাকে টাকী সমাজস্থ পুঁড়া নিবাসী রাজবল্লভ গুহের পৌত্র পঞ্চানন গুহের সঙ্গে বিবাহ দেন। উক্ত পঞ্চানন গুহের পিতা নরেন্দ্রনাথ গুহ পুঁড়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া ইদিলপুরের অন্তর্গত রূপছত্র নামক একটি গ্রামে বাস করিতেছিলেন। কিছুদিন পরে ঐ রূপছত্র গ্রাম মেঘনা নদীর অঙ্কশায়ী হয়। তখন কৃষ্ণরাম তাহার পুত্রের কন্যা ও জামাতাকে উলপুরের উত্তরাংশে একটি বসতবাটি ও বৌলতলী প্রভৃতি গ্রামে মহাত্রাণ জমি দান করিয়া স্থাপিত করেন। তদবধি পঞ্চানন গুহ ও তাহার বংশধরগণ উলপুরে বাস করিতেছেন। তাহার বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল।

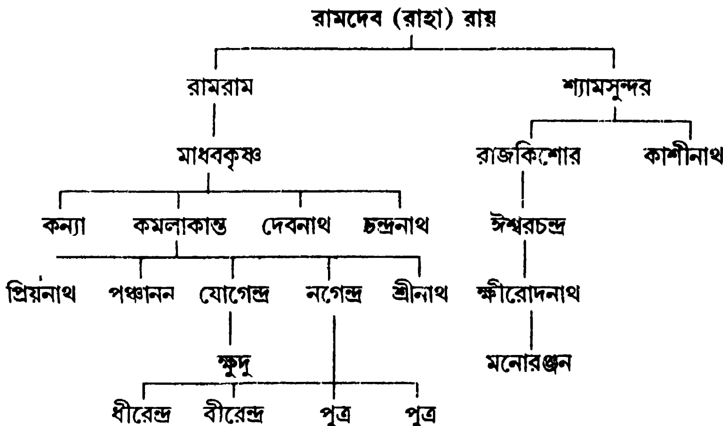


পঞ্চানন গুহের জ্যেষ্ঠ পুত্র **গঙ্গাগোবিন্দ গুহ** মাতামহ বাড়ির সমস্ত কার্যকর্মে সহায়তা করিতেন। তিনি জমিদারি ও সামাজিক কার্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। **ভবানীশঙ্কর গুহ** বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার জন্য খ্যাত ছিলেন। **রজনীকান্ত গুহ** ডাক্তারী পাশ করিয়া বহুদিন সরকারি চাকুরি করিয়া অবসর গ্রহণের পর শেষকাল পর্যন্ত উলপুরে বাস করিয়াছেন। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিহার প্রদেশে ডেপুটি জেলরের কার্য করিতেন ; সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়া ময়ূরভঞ্জ স্টেটে কার্য গ্রহণ করিয়াছেন। ২য় পুত্র সতীন্দ্রনাথ গুহ বি এ, কলিকাতায় শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত আছেন। **কৈলাসনাথ গুহ** বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও সামাজিক ছিলেন। তাহার কনিষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্র হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকুরি করেন।

১৪৭। রাহা রায় বংশ

কৃষ্ণরাম রায় ইত্না হইতে মহাপাত্র রাহা বংশীয় রামদেব রায়কে উলপুরে আনিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি তাহার বাসস্থানের জন্য পঞ্চানন গুহকে যে বাটিতে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব অংশ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং কাঁঠালবাড়ি প্রভৃতি গ্রামে মহাত্রাণ জমি দান করিয়াছিলেন। উলপুরে স্থাপিত রায় বংশের বংশতালিকা প্রদত্ত হইল।

মাধবকৃষ্ণের কন্যার ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ির সমীপবর্তী লক্ষ্মীকুলের গুহ বংশীয় রাজা সূর্যকুমারের সঙ্গে বিবাহ হয়। সূর্যকুমার শ্যালকপুত্রগণকে বিশেষ স্নেহ করিতেন; তাহারা অনেক সময়ে সেখানে থাকিতেন।



নগেন্দ্রনাথ রায়ের পুত্রগণ রাজা সূর্যকুমারের নিকট হইতে বাড়ি ও সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মীকুলে বাস করিতেছেন। যোগেন্দ্রনাথ রায় উলপুরের ডাক্তার ললিতচন্দ্র রায়ের ভগিনী যোগাদ্যা সুন্দরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহাদের একমাত্র পুত্র ক্ষুদু অল্প বয়সে মৃগী রোগের ফলে জলে পড়িয়া মারা যায়। ক্ষীরোদনাথ রায় গোপালগঞ্জে মোক্তারি করিতেন। সেখানে একখানি বাড়ি রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার একমাত্র পুত্র সেই বাড়িতে বাস করিতেছে। কোঠাবাড়ির বড় হিস্যার গৌরমোহন রায়ের সঙ্গে তাহার ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বুদ্ধিমতী ও ধর্মশীলা ছিলেন। বড় হিস্যার বর্তমান চণ্ডীমণ্ডপ তিনি নিজ ব্যয়ে নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

১৪৮। অন্যান্য আত্মীয়স্বজন

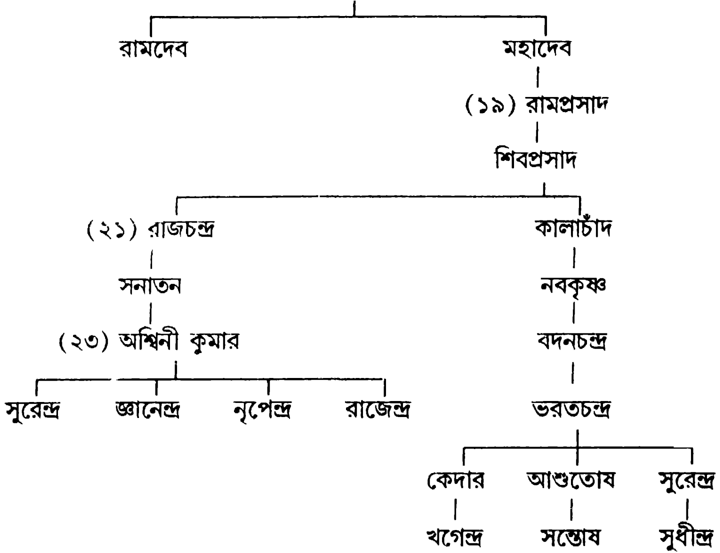
বসু চৌধুরিগণ উলপুরে আসিবার পর দুই পুরুষ পর্যন্ত তাহাদের বৈবাহিক ক্রিয়াকর্ম প্রায় সমস্তই টাকি সমাজে হইত। ক্রমে চন্দ্রদ্বীপ সমাজের সহিত ক্রিয়া আরম্ভ হয়। চন্দ্রদ্বীপের রাজা পরমানন্দের কৃত সমীকরণ অনুযায়ী চলিতে বানরিপাড়ার গুহ, নরোত্তমপুরের ঘোষ, ভাতশালার ঘোষ প্রভৃতি কুলীনগণ অসম্মত হওয়াতে পূর্বে তাহাদের সঙ্গে উলপুরের বসু চৌধুরিগণের কোন বৈবাহিক সম্বন্ধ হইত না। কেবলমাত্র গাভা, লক্ষণকাঠি, কাশীপুর প্রভৃতি স্থানের ঘোষ, ও কাঁচাবালিয়া, হানুয়া, বিকনা ও কাশীপুর প্রভৃতি স্থানের গুহ বংশীয়গণের সহিত বিবাহাদি চলিত। তন্মধ্যে গাভার ঘোষ বংশীয়গণ সংখ্যায় অধিক বলিয়া তাহাদের সঙ্গেই অধিক সম্বন্ধ হইত; যদিও এখন গাভার সঙ্গে উলপুরের ক্রিয়াকর্ম কমিয়া গিয়াছে তথাপি উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার ভাব বিদ্যমান আছে। গাভার ন্যায় ইদিলপুরের রায়চৌধুরি উপাধিধারী ঘোষ বংশের সহিতও উলপুরের বসুবংশের ঘরে ঘরে কুটুম্বিতা এবং খুব ঘনিষ্ঠতা ও সদ্ভাব আছে। অন্যান্য স্থানের মধ্যে কাঁচাবালিয়ার গুহ বংশীয়গণের সঙ্গে উলপুরের সম্পর্ক এক সময়ে খুব ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। এই বংশের সনাতন গুহ বিশ্বাস ও তাহার পুত্র পৌত্রগণের কথা পূর্বে লিখিত হইয়াছে।

কাঁচাবালিয়ার ভরতচন্দ্র গুহ বড় তিন আনী বাড়ির চন্দ্রকুমার রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কেদারনাথ গুহ বড় সওয়া তিন আনী বাড়ির প্রকাশচন্দ্র রায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি উলপুরকে জন্মভূমির মত ভালবাসিতেন। তাহার মধ্যম ভ্রাতা আশুতোষ গুহ মাদারীপুরে উকিল ছিলেন, কনিষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ বি এল, আলিপুরের উকিল।

কাঁচাবালিয়ার শ্যামাচরণ গুহ উলপুরের প্রসিদ্ধ বামাচরণ রায়ের ভগিনীকে বিবাহ করেন। তিনি অনেক সময়েই উলপুরে থাকিতেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীন্দ্রনাথ গুহ বি এল, প্রথম বয়সে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। পরে মুন্সেফ, সাবজজ ও ডিস্ট্রিক্ট জজ হইয়া সুবিচারক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সরকারি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কোচবিহার রাজ্যের প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বালিগঞ্জে সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। তিনি সদাশয় অমায়িক, নিরহঙ্কার ও সদালাপী। উলপুরের প্রতি তাহার আন্তরিক অনুরাগ আছে এবং উলপুরের লোকদিগকে তিনি আত্মীয় জ্ঞান করেন।

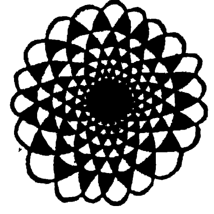
বানরিপাড়ার গুহ বংশের সহিত পূর্বে উলপুরের কোন ক্রিয়া হইত না, কিন্তু তথাকার অল্পসংখ্যক ঘোষ বংশীয়গণের সহিত উলপুরের বহু ক্রিয়া ছিল। এতদ্ব্যতীত ইত্‌নার রায়, ঘোষ ও গুহ বংশের সহিত প্রথম হইতেই উলপুরের এত ঘনিষ্ঠতা যে একটু দূরে অবস্থিত হইলেও ব্যবহারে উলপুরে ও ইত্‌না পাশাপাশ গ্রাম বলিয়া মনে হয়। উভয় সমাজের লোকের মধ্যে এরূপ আত্মীয়তা ও সদ্ভাব আছে যে তাহাদিগকে একই সমাজ বলা যায়।

কাঁচাবালিয়ার গুহ বংশের এক শাখার বংশতালিকা পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল —



১৪৯। ভাব ও অভাব

রঘুনন্দন রায়ের পৌত্রগণ উলপুরে যে সমস্ত আত্মীয় স্বজন স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, সম্মান ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তাহাদিগকে উলপুরে স্থাপিত করিয়া তাহাবা গৌরব অনুভব করিতেন। বিশেষত সেইসব আত্মীয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। উলপুরের সামাজিক কাজকর্মে এই সমস্ত আত্মীয়স্বজনের কাহাকেও বাদ দিলে ঐ কাজের অঙ্গহানি হইত এবং এখনও হইয়া থাকে। সামাজিক ষোল আনার তাহারাও একটি প্রধান অঙ্গ। কোন একটি বংশ দ্বারা একটি সমাজ হয় না ; বিভিন্ন বংশের লোকের সমন্বয়ে সমাজ গঠিত। উলপুরের নিকটে অন্য কোন গ্রামে বঙ্গজ কায়স্থের বাস নাই। উলপুরে স্থাপিত কুলীনগণ না থাকিলে উলপুর সমাজের কোন মান থাকিত না। বসু বংশের পূর্ববর্তী নায়কগণ একথা সবিশেষ বুঝিতেন। তাই তাহারা উলপুরে স্থাপিত আত্মীয়স্বজনগণের সমাদর করিতেন; কখনও অবহেলা করিতেন না। বসু বংশের প্রত্যেক বাড়িতেই তাহারা আত্মীয়ভাবে সমাদৃত হইতেন। তাহারাও বসু বংশীয়গণের সহিত সদ্ভাব ও প্রীতি রক্ষা করিয়া চলিতেন। বহু সময়ে সামাজিক কাজকর্মে তাহাদের উপদেশ বসু বংশীয়গণ মূল্যবান মনে করিতেন। বিপদে সম্পদে পরস্পর পরস্পরের সহায় ছিলেন। কালক্রমে ভাবের কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে। বসু বংশীয়গণের উচিত তাহাদের পূর্বপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলা। তাহাবা দূরদেশ হইতে যে সকল আত্মীয় স্বজন আনিয়া সমাদরে উলপুরে স্থাপন করিয়া বাড়ি ও জমি দান করা সম্মানের কার্য মনে করিয়াছিলেন, তাহাদিগের সমুচিত সমাদর না করিলে সেই সকল প্রাতঃস্মরণীয় পূর্বপুরুষের অমর্যাদা করা হয়। বর্তমান কালে এক বিঘা ভূমি কিংবা একটি ভিটা দান করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই ; পূর্বপুরুষগণেব কীর্তি ও পুণ্যস্মৃতিই আমাদের একমাত্র গৌরবের স্থল। সেই কীর্তি ও সেই স্মৃতি লোপ করা কুলাঙ্গারের কাজ। মনে রাখা উচিত আত্মপ্রসাদ দানে, গ্রহণে নহে, প্রকৃত সম্মান অপরকে সম্মান ও সমাদর প্রদর্শনে, নিজে নিজের মান বৃদ্ধির চেষ্টায় নহে। পূর্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় স্বজনগণ যাহাতে আমাদের ব্যবহারে কোনরূপ ব্যথিত না হইতে পারেন সে বিষয়ে রঘুনন্দনের বংশের প্রত্যেকের চেষ্টা করা কর্তব্য।



নবম অধ্যায়

অন্যান্য সম্প্রদায়

১৫০। ব্রাহ্মণ

বসুচৌধুরিগণ যখন প্রথম উলপুরে বাস আরম্ভ করেন তখন সেখানে কোন ব্রাহ্মণের বাস ছিল না। তাহারা দূরবর্তী স্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া বাসস্থান ও ভূমি দিয়া উলপুরে স্থাপিত করেন।

বারেন্দ্র শ্রেণির ব্রাহ্মণ : উলপুরে এখন যে সকল বারেন্দ্র শ্রেণির ব্রাহ্মণ আছেন তাহাদের পূর্ব বাসস্থানের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। বসুবংশের মূল ৫ হিস্যার প্রত্যেক হিস্যায় স্থাপিত পৃথক পৃথক (বারেন্দ্র) ব্রাহ্মণ সেই সেই হিস্যার প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর ও ভোগোত্তর জমি বৃত্তি স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্বে ইহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ছিল না। কোনরূপে নিজ কার্যোপযোগী জ্ঞান হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন। ইদানীং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

ত্রিলোচন চক্রবর্তী পাঠশালার প্রসিদ্ধ শিক্ষক ছিলেন ; হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াকর্মেও তাহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল ; তাহার পুত্র রাজকুমার চক্রবর্তী ধর্মকার্যে নিপুণ, বুদ্ধিমান এবং সর্বশ্রেণির লোকের শ্রদ্ধার পাত্র! কালাচাঁদ চক্রবর্তীর পুত্র শীতলচন্দ্র চক্রবর্তীরও সর্ববিধ শাস্ত্রীয় ক্রিয়াতে দক্ষতা আছে। যদুনাথ চক্রবর্তী বহুকাল পাবনা জেলায় জমিদারি এস্টেটের নায়েবের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। অমরচন্দ্র চক্রবর্তী বৈষয়িক কার্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাহার পুত্র নন্দলাল উলপুরের বাস ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতেছেন। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র কেশব প্রভৃতিও উলপুরের বাস ত্যাগ করিয়াছেন। হরনাথ চক্রবর্তী জমিদারি কার্যে দক্ষ এবং সামাজিক লোক ছিলেন। যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী মাদারিপুর সিভিল কোর্টে কার্য করিতেন। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র অবনীকান্ত চক্রবর্তী ঢাকা গবর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের অধ্যাপক ; তাহার এক ভ্রাতা ওভারসিয়ার ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরকান্ত ঢাকা মিটফোর্ড স্কুলের কৃতী ছাত্র। ভারতচন্দ্র চক্রবর্তীর পুত্র আশুতোষ স্টিমার অফিসে কার্য করিতেছেন।

পরমানন্দ ও জগদানন্দ চক্রবর্তী বুদ্ধি ও ব্যবহারগুণে সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। পরমানন্দ চক্রবর্তীর পুত্র অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী আলিপুর জজকোর্টে ওকালতি করেন। কুঞ্জবিহারী আচার্যের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র কলিকাতায় চাকুরি করেন, তৃতীয় পুত্র ওভারশিয়ার, চতুর্থ পুত্র কলেজের ছাত্র।

শীতলচন্দ্র আচার্য বারেন্দ্র শ্রেণির ব্রাহ্মণের মধ্যে খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ইন্সপেক্টিং পণ্ডিতের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি গোপালগঞ্জে একটি বাড়ি করিয়া গিয়াছেন, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরীন্দ্রনাথ শিক্ষকতা উপলক্ষে সপরিবারে গোপালগঞ্জের বাড়িতে বাস করেন।

রাঢ়ীয় শ্রেণির ব্রাহ্মণ : কৃষ্ণরাম রায় দুই ঘর শ্রোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ উলপুরে স্থাপিত করেন। এখন জনতা বাড়িয়া সেই দুই ঘর হইতে ৬/৭টি পৃথক পরিবার হইয়াছে। সমাজদারগণের আদি নিবাস নাকান্দায় ছিল। তথা হইতে এক শাখা ইত্নার নিকট রাধানগর দৌলতপুরে ও আর এক শাখা কোলা দিঘলিয়াতে উঠিয়া যায়। উলপুরের সমাজদারগণ

রাধানগর দৌলতপুর হইতে উলপুরে আসেন। তাহারা সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এই বংশের গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন উলপুরের একমাত্র সংস্কৃতাধ্যাপক ছিলেন। তিনি স্মৃতি ও ব্যাকরণের চতুষ্পাঠী করিয়াছিলেন, কিন্তু ছাত্রের অভাবে তাহা চলে নাই। তিনি সদাচারী ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নারায়ণদাস পিতার আচার ও নিষ্ঠার অনুবর্তন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহার দ্বিতীয় পুত্র হরিদাস জামসেদপুরে চাকুরি করেন। তাহার খুল্লতাত মহেশচন্দ্র ধর্মনিষ্ঠ ও সদাচারী ছিলেন, তিনি ১০৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। আনন্দচন্দ্র সমাজদার অনেকদিন উলপুরে এবং পরে চেতলায় পাঠশালা করিয়াছিলেন, শেষ জীবনে কৃষ্ণরাম রায়ের দেবোত্তর মহালের দেওয়ানের কার্য করিতেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা উমাচরণ সমাজদারের মধ্যম পুত্র রাজেন্দ্রনাথ ঐ কার্য করিতেছেন। রাজেন্দ্রনাথ কার্যদক্ষ, বিশ্বাসী ও পরিশ্রমী। তাহার অনুজ দেবেন্দ্রনাথ সাজাইল স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন। প্রায় শত বৎসর পূর্বে সমাজদার বাড়িতে ধূমধামে কবির গানের সহিত দুর্গোৎসব হইত।

রাঢ়ীয় শ্রেণির চক্রবর্তী বংশীয়গণ ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত। দুর্গাচরণ চক্রবর্তী উলপুরে ডাক্তারি ব্যবসা করিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান, সদালাপী, বিনয়ী ও সামাজিক ছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া জমিদারি এস্টেটে চাকুরি করিয়া সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার অপর পুত্র নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম. এ., অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত আছেন। অম্বিকাচরণ চক্রবর্তী শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্মে অভিজ্ঞ। রসিকচন্দ্র চক্রবর্তী পূর্বে দারোগা ছিলেন ; জমিদারির অংশ কিনিয়া উলপুরেই বাস করিতেছেন। পঞ্চানন চক্রবর্তীর পুত্রদ্বয় জিতেন্দ্র ও শচীন্দ্র কলিকাতায় চাকুরি করেন। অন্নদা চক্রবর্তীর পুত্র সুরেন্দ্র সুখতলে বাস করেন।

ইহা ছাড়া ডাক্তারি ব্যবসা উপলক্ষে অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় এখানে দীর্ঘকাল সপরিবারে বাস করিতেছেন। তাহাকে উলপুরের স্থায়ী অধিবাসীর মধ্যে ধরা যাইতে পারে।

বৈদিক ব্রাহ্মণ : উলপুরের অধিবাসীগণের মধ্যে বৈদিক ব্রাহ্মণ নাই। তবে কালীবাড়ির ঠাকুর মহাশয়গণ স্থায়ীভাবেই এখানে বাস কবিয়া থাকেন। তাহাদিগকে সকলেই শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বড় সওয়া তিন হিস্যার পুরোহিত বৈদিক ব্রাহ্মণ ; তিনি কোটালিপাড়ার অধিবাসী হইলেও বৎসরের অধিকাংশ সময়ই এখানে বাস করেন।

১৫১। বৈদ্য

পূর্বে উলপুরে বৈদ্য সম্প্রদায়ের লোকের বাস ছিল না। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে বরিশাল জেলার বানরিপাড়া নিবাসী বনমালী দাশগুপ্ত উলপুরে আসিয়া কবিরাজী ব্যবসা আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে ঐ ব্যবসায়ে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি হয়। ঔষধের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন। তিনি সচ্চরিত্র, সত্যবাদী ও স্পষ্টভাষী ছিলেন। উলপুরের বহু পরিবারে তাহার এমন মান ও প্রতিপত্তি ছিল যে তাহাদের সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতেও কবিরাজ মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারেই কার্য হইত। সামাজিক ও বৈষয়িক কার্যে তাহার বিশেষ বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতা ছিল। বিদেশিয় এবং ভিন্ন জাতীয় হইয়াও তিনি যেরূপ পসার প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন সেরূপ অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটে। তিনি দীর্ঘ পরমায়ু পাইয়াছিলেন। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় উলপুরে বাস করিতেছেন।

চিকিৎসা ব্যবসা উপলক্ষে আরও ৩ জন বৈদ্য কবিবাজ উলপুরে বাস করিতেছেন, — (১) সুরেন্দ্রলাল রায়, (২) বিজয়রত্ন সেন ও (৩) মুকুন্দলাল সেন। ইহারা সকলেই চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সুচিকিৎসক ও জনপ্রিয়। বিলাসচন্দ্র মজুমদার বি. এ., দীর্ঘকাল যশের সহিত স্থানীয় স্কুলে হেডমাস্টারি করিতেছেন। তিনিও বৈদ্য।

১৫২। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ

উলপুরে প্রায় ৬০ ঘর দক্ষিণ রাঢ়ীয় শ্রেণির কায়স্থের বাস। তাহাদের প্রত্যেকেরই অল্পবিস্তর জমিজমা আছে। অনেকে নানারূপ ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকুরি করিয়া থাকে। ইদানীং ইংরেজি শিক্ষার প্রতিও অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

বেচারাম দাস : প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা বেচারাম দাসের অসাধারণ কবিত্ব শক্তি ছিল। এখনও বহু দূরদেশে 'কবির গুরু' বেচারাম বলিয়া তাহার নাম স্মৃত হইয়া থাকে। ১২০১ সালে উলপুর গ্রামে বেচারামের জন্ম হয়। অল্প বয়সেই তাহার কবিত্বশক্তির প্রকাশ পায়। সে সময়ে এদেশে কবিগানের খুব চল ছিল। যৌবনে কবির দল বাঁধিয়া দেশ বিদেশে গান করিয়া বেচারামের সর্বত্র খ্যাতিলাভ হইয়াছিল। সখীসংবাদ, ভোর, গোষ্ঠ প্রভৃতি গান এবং টপ্পাতে বেচারামের মত ওস্তাদ দুর্লভ, কিন্তু ছড়াতে (পাঁচালী) বেচারামের তেমন নৈপুণ্য না থাকায় তাহার দলে ছড়াদার (সরকার) অন্য লোক থাকিত। শেষদিকে উলপুরের কৈলাস পরামাণিক তাহার দলের সরকার ছিল। তাহার নিকট অনেকে কবিগান শিক্ষা করিয়াছে ; তাহার মধ্যে দুর্গাপুর নিবাসী মৃত আনন্দচন্দ্র সরকার সর্বপ্রধান। গুরুদাস মালী, তারক কাড়াল, গোবিন্দ তাঁতি প্রভৃতি বিখ্যাত কবিওয়ালার সঙ্গে বেচারামের অনেক পাল্লা হইয়াছে। একবার বরিশাল জেলার কবি গাইতে গেলে সেইখানেই বেচারামের মাতৃবিয়োগের সংবাদ পৌঁছায়। তাহার দল নৌকাযোগে বাড়ি ফিরিবার পথে রাত্রি হওয়ায় বানরিপাড়ার বাজারে নৌকা বাঁধিয়া আহারাদির আয়োজন করিতেছিল। সেই রাত্রিতে সেইখানে কবিগান হইতেছিল। একপক্ষে গুরুদাস মালী, অপর পক্ষে তদপেক্ষা একটি নিকৃষ্ট দল ছিল। সেই দল কিছুতেই গুরুদাস মালীর সহিত পারিয়া উঠিতে ছিল না। ঐ দলের সরকার কোনরূপে বেচারামের উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া বেচারামকে কিছু প্রণামী দিয়া তাহার দ্বারা গান বাঁধিয়া পাল্লা করিতে লাগিল। সেই সব গানের জবাব দিতে মালীর দল অশক্ত হওয়ায় তাহার পরাজয় হইল। সেই উপলক্ষে বেচারামের বাঁধা প্রথম গানের নিম্নলিখিত কয়েকটি পদ এখনও অনেকের মুখে শোনা যায় ;

মেলেনী ও মেলেনী তলব তোর মহারাজের হুজুরে।
বর্ধমান রাজার বাড়ি, বিদ্যার মহলে চুরি, হায় হায় লজ্জাতে মরি,
শুনি সিঁদেল চোরের বাসা নাকি মেলেনীলো তোর ঘরে ॥
(হায় হায়) মালীর মেয়ে, কুটনি হয়ে, চোরকে বাসা দিয়ে ঘটালি জঞ্জাল।
হ'য়ে রাজা খাপ্পা, তোমার দফা সেরে দেবে এইবারে ॥

বেচারামের প্রধান শিষ্য আনন্দ সরকার কবির দল করিয়া খ্যাতিমান্ হইয়াছিল। শেষদিকে বেচারামের সঙ্গে আনন্দের অনেক পাল্লা হইত। নিজের শিষ্য মনে করিয়া আনন্দের প্রতি অনেক সময়ে বেচারাম পাল্লার বিষয়ের বহির্ভূত নানারূপ অসঙ্গত ব্যক্তিগত আক্রমণ করিত। আনন্দ প্রথম প্রথম রামায়ণ গান করিত। কবিওয়ালার পক্ষে রামায়ণ গান করা প্রশংসার বিষয় নহে। বেচারামের নিম্নলিখিত গানে তদ্বিষয়ক শ্লেষ আছে :

দিয়ে মায়ের বিয়ে নাম রটাল বাবু দুর্গামোহন বাহাদুর,
খালের গুণে সবাই চেনে গ্রাম হরিদাসপুর।
কীর্তি আছে কীর্তিপাশা বিষ খাওয়াল কিশোর সেন।
বিষে যায় রাজকুমারের প্রাণ, বাবু প্রতাপচাঁদ কেঁদে বেড়ান,
রাজা হয় পরাণবাবু বর্ধমান।
রেল গাড়ির গুণে সবাই চিনে ধন্যমান্য কোম্পানি,
ছড়া, টপ্পা, কবি, রামায়ণ আনন্দ চারপদে গুণী ;

এমন নরবরে দয়া করে কেন লেজ দেন নাই ভগবান।

কবি গানের পাল্লায় গুরু শিষ্য কেহ কাহাকে ছাড়িয়া দিত না, কিন্তু সারা জীবন আনন্দ বেচারামকে গুরুবৎ সম্মান করিত এবং সর্বত্র তাহাকে নিজ গুরু বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরব অনুভব করিত। ১২৮০ সালের ২৪ অগ্রহায়ণ ৮০ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে বেচারামের পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাহার মৃত্যুর অল্পদিন পরে উলপুরে কবি গাহিতে আসিয়া বেচারামের মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া আনন্দ সরকার নিম্নলিখিত গান রচনা করিয়াছিল :

হায় হায় সন বারশ আশি, ওস্তাদের বয়ঃক্রম আশি,
সুখেতে করে' কাল যাপন, সোমবার ২৪শে অগ্রহায়ণ,
কল্লেন কবির গুরু বেচারাম সজ্ঞানে স্বর্গ আরোহণ।
যেমন দ্রোণগুরু রণে পলে, শোকেতে কান্দে কুরু পাণ্ডবগণ
তেমনি বেচারাম বিহনে আনন্দের নিরানন্দ মন।
কান্দে সব দোহারগণে, ওস্তাদের গুণ পড়ে মনে,
কামিনী কেন্দে বেড়ায় রজনী দিনে ;
বহে গুণীর গুণে অশ্রু ধারা, আজ আমার জ্যান্তে মরা দোহারগণ ॥

কামিনী বেচারামের একমাত্র পুত্র। বেচারামের মৃত্যুর পর কিছুদিন কামিনী তাহার কবির দল চালাইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর কামিনী বেশিদিন জীবিত ছিল না। কামিনীর দুই পুত্র, কুশীলব ও দুর্যোধন। কুশীলব কিছুদিন কবির দল চালাইয়াছিল। তাহার বেশ রচনাশক্তি ছিল। অল্প বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। বেচারামের মৃত্যুর কিছুদিন পরে আনন্দ সরকারের দলের সঙ্গে কামিনীর দলের পাল্লা হইয়াছিল। তাহাতেও বেচারামের মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আনন্দ নিম্নলিখিত গান বাঁধিয়াছিল :

হেরে' নিশিভোরে কুঞ্জদ্বারে বৃন্দে কয় গোবিন্দেরে
ওহে কালাচাঁদ, কোথায় ছিলে গত রাত্তিরে?
তোমার দশা যেমন গুরুদশার লোক,
বুঝি নন্দ কি যশোদা মায়ের হয়েছে পরলোক ;
তোমার চক্ষের ধারা বক্ষে বহে, মুখ দেখে বুক বিদরে ॥

বহুদিন পূর্বে বেচারামের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তাহার অপূর্ব কবিত্ব তাহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

* * * * * *

উলপুরের মহিমাচন্দ্র সিংহ সর্বপ্রথম বরিশালে আদালতের পিয়নের চাকুরি প্রাপ্ত হন। তৎপর প্রতাপচন্দ্র দাস ও কালীনাথ দে বরিশালে আদালতের পিয়নের কার্যে নিযুক্ত ছিল। সে আমলে সেই চাকুরিরও মূল্য ছিল। প্রতাপচন্দ্র দাসের জ্যেষ্ঠপুত্র দিনাজপুরের সুপ্রসিদ্ধ মোক্তার জীবিতনাথ দাস কৃতী ও স্বনামধন্য পুরুষ, পরোপকারী ও বহু আত্মীয়ের প্রতিপালক। তাহার পুত্র বিলাত প্রত্যাগত ব্যারিস্টার। জীবিতনাথের উলপুরের বাড়ি দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত হইয়াছে, এখন পার্শ্ববর্তী খাগাইল গ্রামে সুবৃহৎ ইষ্টকনির্মিত বাড়িতে তাহার স্থায়ী আবাস। তাহার খুল্লতাতপুত্র রমানাথ দাসের পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র দাস ঢাকা মিডফোর্ড স্কুল হইতে ডাক্তারি পাশ করিয়া চাকুরিতে নিযুক্ত আছে।

চন্দ্রকান্ত সরকার বেচারামের নিকট কবিগান শিক্ষা করে। চন্দ্রকান্ত সে আমলের একজন

ভাল ওস্তাদ ছিল, কিন্তু কোন দিন কবির দল বাঁধিতে পারে নাই। তাহার সমসাময়িক অনেকের মুখে তাহার কবিত্ব শক্তির সুখ্যাতি শুনা গিয়াছে। পরিণত বয়সে চন্দ্র সরকারের মৃত্যু হইয়াছে।

যখন উলপুরে মুদি দোকানের নিতান্ত অভাব ছিল তখন উত্তরপাড়ায় যাদব দে একটি ভাল মুদি দোকান প্রতিষ্ঠা করিয়া অনেকদিন ভালভাবে চালাইয়াছিল। সততা ও সদ্ব্যবহারের জন্য সেই দোকানের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। তাহার পুত্র গঙ্গাচরণ দে বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র এবং নিজ সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী।

উলপুরের পশ্চিমপাড়ার অক্রুরচন্দ্র সমাদ্দারের জ্যেষ্ঠপুত্র কেদারনাথ সমাদ্দার দীর্ঘকাল ব্রহ্মদেশে ওভারশিয়ারের কার্য করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিল। বিখ্যাত মিঠাই প্রস্তুতকারক হরচরণ দাস বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র ও অমায়িক লোক ছিল। স্বসমাজে তাহার বেশ প্রতিপত্তি ছিল। ১৩৩৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সন্ন্যাসরোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র (রাখাল) বিজয়ও একজন সুদক্ষ মিঠাই প্রস্তুতকারক। যামিনী দাস গোপালগঞ্জে মিঠাইর ব্যবসা করিয়া অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। যামিনী স্বসমাজের অন্যতম নেতা। উত্তরপাড়ার শ্রীনাথ দাস দূরদেশে চাকুরি করিয়া ভাল আয় করিতেছিল, কিন্তু অকালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। দক্ষিণ পাড়ার জন্মেজয় দত্ত উলপুর পোস্ট অফিসে দীর্ঘকাল পিয়নের কার্যে নিযুক্ত ছিল। তাহার ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। উলপুরের প্রতি পরিবারে তাহার অবাধ গতি ছিল। ১৩০৫ সালের অগ্নিদাহের সময়ে কোন এক গৃহের অগ্নি নিবাইতে গিয়া জন্মেজয় প্রায় আধপোড়া হইয়া গিয়াছিল। পশ্চিমপাড়ার রসিকচন্দ্র দে ও গোপালচন্দ্র সিকদারের গান বাজনায় খুব উৎসাহ। প্রধানত তাহাদের চেষ্টায় প্রতি বৎসর পূজার সময়ে সখের যাত্রাগান হইয়া থাকে। তাহারা সেই দলের প্রাণ স্বরূপ। উত্তর পাড়ার রমণীকান্ত বিশ্বাস ডাঃ অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকিয়া ডাক্তারি শিখিয়া উলপুরে চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। কিশোরীমোহন দত্তের পূর্ব নিবাস ইত্নায় ছিল। উলপুরে বিবাহ করিয়া তাহার সারাজীবন উলপুরেই কাটিয়াছে। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র ইন্দুভূষণ ও মধ্যম পুত্র শশীভূষণ কলিকাতায় চাকুরিতে নিযুক্ত। অপর পুত্র বেণীভূষণ কলিকাতায় কবিরাজী শিখিয়া কবিরাজী করিতেছে। চিকিৎসা ব্যবসায়ে তাহার খ্যাতি লাভ হইয়াছে।

উলপুরের দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের আরও অনেকে এখন বিদেশে বাহির হইয়া চাকুরি ও নানাবিধ ব্যবসার দ্বারা অর্থ উপার্জন করিতেছে।

অন্যান্য গ্রামের দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ :

উলপুরের স্থায়ী অধিবাসী দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে কুলীন নাই। তারিণী সিকদারের দৌহিত্রগণ কুলীন বসু বংশীয়, তাহারা সাধারণত উলপুরে থাকে। পরগণার অন্যান্য গ্রামের মধ্যে কাঁঠালবাড়ি, রাউতপাড়া, শূরগ্রাম, নারিকেলবাড়ি, করপাড়া, হাটবাড়িয়া ও কংশুর গ্রামে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের বাস আছে। হাটবাড়িয়া, করপাড়া ও রাউতপাড়ায় ঘোষ, বসু ও মিত্র তিন শ্রেণির কুলীনেরই বাস আছে। করপাড়ার দীননাথ ঘোষ, হরিচরণ বসু প্রভৃতির এবং মিত্র বংশীয় অনেকের বেশ মান ও প্রতিপত্তি ছিল। শূরগ্রামে কুলীনের সংখ্যা কম। সেখানকার পালবংশীয় মৌলিক কায়স্থগণের ক্রিয়াকর্ম ভাল এবং তাহারা বহুদিনের অধিবাসী। সেজন্য তাহাদের বেশ মান ও প্রতিষ্ঠা আছে। এই বংশের হেমেন্দ্রনাথ পাল নিজ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের বলে অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিয়াছে। কংশুরে কায়স্থগণের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। কাঁঠালবাড়ি ও নারিকেল বাড়িতে অতি অল্প সংখ্যক কায়স্থের বাস। এই সকল কায়স্থের প্রত্যেকেরই অল্পবিস্তর জমি-জমা আছে। তাহারা কেহ কেহ জমিদার সরকারের তহশীলে কার্য করে। অনেকে বিদেশে চাকুরি ও কারবার করে। স্থানীয় জমিদারগণের সহিত দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণের চিরকাল সদ্ভাব চলিয়া আসিতেছে। কাঁঠালবাড়ির কৈলাশচন্দ্র বিশ্বাসের

জমিদারগণের নিকট যথেষ্ট সমাদর ছিল ; তাহার বাড়িতে প্রতি বৎসর কালীপূজা হইত ; তাহার পুত্রগণ সেই পূজা চালাইতেছে।

১৫৩। পরামাণিক

উলপুরে ২১/২২ ঘর পরমাণিকের বাস। প্রায় সকলেই জমিদারগণের প্রদত্ত চাকরাণ জমি ভোগ করিয়া থাকে ; এবং তাহাদের পরিবারভুক্ত লোকের মত সম্পদ ও বিপদের সঙ্গী। ইহারা নির্বিরোধী লোক ; কিন্তু ইহাদের নিজেদের সমাজে অনেক সময়ে এরূপ কঠিন সামাজিক তর্ক উপস্থিত হয় যে তাহা দীর্ঘকালেও মীমাংসা হইয়া উঠে না।

উলপুরের পরমাণিকগণের মধ্যে কৈলাস পরামাণিক প্রকৃত গুণী লোক ছিল; বেচারামের সময় হইতে কবির দলের সরকারের কার্য করিত। শেষ জীবনে কৈলাশ পরিষ্কার ছড়া বলিতে পারিত। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফলে অনেক বড় কবির দলের সরকারও কৈলাসকে মনে মনে ভয় করিত। কৈলাস দীর্ঘজীবী, সুস্থদেহ ও প্রফুল্লচিত্ত ছিল। বয়সে ও জ্ঞানে প্রবীণ হইলেও কৈলাসের বিন্দুমাত্র অহঙ্কার ছিল না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের সহিত কৈলাস অমায়িকভাবে কথাবার্তা বলিত ; কখনও কেহ তাহার নিকট উদ্ধত ব্যবহার পায় নাই।

চিরঞ্জীব পরামাণিক প্রসিদ্ধ রামায়ণ-গায়ক ছিল। উলপুরে এবং নিকটবর্তী বহু গ্রামে বহু সময়ে তাহার রামায়ণ গানে শ্রোতাগণ পরম প্রীতি লাভ করিয়াছে। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র তাহার রামায়ণের দল চালাইতেছে।

উলপুর ব্যতীত কাঁঠালবাড়ি, নারিকেলবাড়ি, কংশুর ও হাটবাড়িয়া গ্রামে কয়েক ঘর পরামাণিক আছে। কাঁঠালবাড়ির কমল পরামাণিক প্রসিদ্ধ লোক ছিল। তাহার বাতের তৈল বাতব্যাধির বিখ্যাত ঔষধ ছিল। তাহা ছাড়া তাহার অন্যান্য নানা উপকারী ঔষধ ছিল। লোকে তাহাকে কমল ডাক্তার বলিয়া ডাকিত। কমল নিঃসন্তান। তাহার কনিষ্ঠ সহোদর নিবাবণের কনিষ্ঠ পুত্র কুঞ্জ এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র বিপিনের দুই পুত্র জীবিত আছে। এখন তাহাদের অবস্থার অনেক অবনতি হইয়াছে।

১৫৪। রজক

উলপুরে ২৫/২৬ ঘর রজকের বাস। ইহাদেরও প্রায় সকলেই জমিদারগণের প্রদত্ত চাকরাণ ভোগী, এবং সম্পদে বিপদে তাহাদের সঙ্গী। ইহাদের মধ্যে রজনী সর্বপ্রথম রাজের কার্য আরম্ভ করে ; তাহার পুত্র বলরাম ও রসিক সুদক্ষ রাজমিস্ত্রী। ফেলু, ষষ্ঠি, হীরালাল ও গুণেন্দ্র রাজমিস্ত্রীর কার্যে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে। উলপুরেব পরামাণিক ও রজকগণ ধর্মভীরু। তাহারা সংকীর্তন গানের বড়ই অনুরাগী। প্রায়ই সন্ধ্যার পর তাহাদের অনেকের বাড়িতে হরিসংকীর্তন হইয়া থাকে। মৃত ফটিক ধুপী ভাল গৃহস্থ ছিল। তাহার পত্নী অতিশয় পুণ্যবতী ছিল। বহু সন্তানের জননী হইয়াও ফটিকের স্ত্রী পতি ও সমস্ত সন্তানের সম্মুখে ইহলোক ত্যাগ করে ; তাহার সেই সৌভাগ্যের কথা বহুকাল লোকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিত।

১৫৫। নমঃশূদ্র

সাহাপুর পরগণায় অনেক নমঃশূদ্রের বাস। কৃষি এবং ব্যবসা ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। এ প্রদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রায় বার আনী অংশ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের হাতে। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছে। তাহার ফলে এই সমাজের অনেকে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ওকালতি, ডাক্তারি, শিক্ষকতা ও গবর্নমেন্টের অধীনে চাকুরি করিতেছে।

উলপুরের নমঃশূদ্র অধিবাসীগণের মধ্যে নিবারণ রায়ের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। তাহার কবির

দল ছিল, নামী কবিওয়ালা না হইলেও কবির সরকার মহলে তাহার সমাদর ছিল। তাহার ধুয়া, ছড়া ও সুর মিষ্ট ছিল। স্বসমাজে তাহার বেশ প্রতিপত্তি ছিল ; লোকের সঙ্গে তাহার ব্যবহারও ভাল ছিল। তাহার পুত্র নীলমণিরও কবিত্বশক্তি আছে। নীলমণি পিতার মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর কবির দল চালাইয়াছিল।

বর্তমান কালে উলপুরের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে উমেশচন্দ্র বিশ্বাসের খুব মান ও প্রতিপত্তি। উমেশচন্দ্র অবস্থাপন্ন, বুদ্ধিমান ও কৌশলী। তাহার ব্যবহার ও বুদ্ধির প্রভাবে সকল সমাজেই তাহার আদর আছে। বিচরণ রায় শ্রেষ্ঠ রাজমিস্ত্রি ছিল। তাহার পুত্র মনোহরও ঐ কার্যে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে।

অন্যান্য গ্রামের নমঃশূদ্রগণের মধ্যে রাউতখামারের মোড়লদিগের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সামাজিক মর্যাদায়, শিষ্টাচার ও ব্যবহারে নমঃশূদ্র সমাজে ইহাদের স্থান খুব উচ্চ। এই বংশের রামলোচন বিশ্বাসের মত (ডাক নাম লোচন বিশ্বাস) ধার্মিক ও ক্রিয়ান্বিত লোক এই সমাজে আর হয় নাই বলা চলে। বস্তুত তাহার সদ্‌গুণাবলীর জন্যই এই বংশ এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। কিন্তু বৈষ্ণবোচিত হরিভক্তি, শুদ্ধাচার ও নামে রতি সকল সমাজের লোকের মধ্যেই দুর্লভ। প্রাচীনগণের মুখে রামলোচনের শুদ্ধাচার, হরিভক্তি ও প্রকৃত ধর্মানুরাগের বহু প্রশংসা শুনা গিয়াছে। হরিনামের শক্তিতে তাহার অচল ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। তাহার মূল মন্ত্র ছিল :

"গো কোটি দানে গ্রহণে চ কাশী,
মাঘে প্রয়াগে কোটি কল্পবাসী,
সুমেরু তুল্য হিরণ্য দানে
নহি তুল্য নহি তুল্য গোবিন্দ নামে।'

রাধাগোবিন্দ নাম ধ্যান ও নাম কীর্তনে তাহার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইত। বৈষ্ণব তীর্থ দর্শন ও মহোৎসবে তাহার খুব উৎসাহ ছিল। রামলোচন কর্তৃক নিজ বাটিতে বৈষ্ণবভাবে বার্ষিক দুর্গাপূজা ও চৈত্র মাসে দেউলপূজা প্রবর্তিত হইয়াছিল। তাহার ভাবী ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছু জমি নির্দিষ্ট করা আছে। ঐ দেউল পূজা ও দুর্গোৎসব তাহার বংশধরগণকর্তৃক যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হইতেছে। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র দীননাথ বিশ্বাস ধর্মানুরাগী, শিষ্ঠাচারী ও শান্তস্বভাব ছিল। তাহার পুত্র হরেকৃষ্ণ পিতার সদ্‌গুণের অধিকারী, বিনয়ী এবং জনপ্রিয়, স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের ও ঋণশালিসী বোর্ডের সভ্য।

রাউত খামারেব অধিবাসীগণ দীর্ঘকাল যাবত নানাবিধ ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত আছে। এই গ্রামের রাইচরণ বিশ্বাস ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছিল। তাহার পুত্র যোগেশ তাহা আরও বাড়াইয়াছে। বর্তমানে রাউতখামারের যদুনাথ বালা একজন বিশিষ্ট মাতব্বর। এই গ্রামের রসিকলাল মল্লিক গোপালগঞ্জের কৃতী মোক্তার। বিশ্বেশ্বর বি. এল. গোপালগঞ্জের খ্যাতনামা উকিল, দেশহিতকর কার্যে বিশেষ উৎসাহী। প্রসন্ন ঢালি (ডাক নাম পোদ্দার) তেঁতুলিয়ার হাটে সোনা রূপার গহনা নির্মাণের কার্য করিত। প্রথম হইতেই গান বাদ্যে ইহার খুব অনুরাগ ছিল। প্রসন্ন পোদ্দার বহুদিন একটি যাত্রার দল চালাইয়াছিল। এই গ্রামের যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস রামায়ণ গান করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ বালা সুশিক্ষিত, গোপীনাথপুর স্কুলের শিক্ষক।

মোল্লাকান্দির প্রাচীন কালের লোকের মধ্যে প্রসিদ্ধ রামায়ণ গায়ক গোলোক কীর্তনীয়ার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামায়ণ গানে খ্যাতি লাভ করায় তাহার কীর্তনীয়া উপাধি হয়। তদবধি এই বংশের সকলেই কীর্তনীয়া উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহার পুত্র গিরি

কীর্তনীয়ারও রামায়ণ গানে খ্যাতি ছিল। ধ্রুব কীর্তনীয়া ধর্মনিষ্ঠ লোক ছিল ; তেঁতুলিয়ার হাটে দোকান করিয়া ধ্রুব কীর্তনীয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়াছিল। নানাবিধ ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া এই গ্রামের গোপালচন্দ্র রায়, গোপালচন্দ্র বিশ্বাস, অধরচন্দ্র বিশ্বাস, রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রভৃতি সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। কুঞ্জবিহারী বিশ্বাসের এক সময়ে খুব নাম ও প্রতিপত্তি ছিল। মোল্লাকান্দির বিষ্ণুচরণ অধিকারী গোপালগঞ্জের বিখ্যাত উকিল। এই গ্রামের রাধিকাপ্রসন্ন বিশ্বাস বি. এল. ও ক্ষীরোদবিহারী বিশ্বাস বি. এল গোপালগঞ্জের উকিল এবং হরবিলাস কীর্তনীয়া ও মুকুন্দবিহারী বিশ্বাস মোক্তার। কৃষ্ণচরণ গাইন রামায়ণ গান করিত, বৃদ্ধ বয়সে গান করা ছাড়িয়া দিয়াছে।

পশ্চিম নিজরার উদ্ধব বাওয়ালি ধার্মিক ও অবস্থাপন্ন লোক ছিল। ঐ গ্রামের ভৌমিক বংশে বহু লোক আছে। পদ্মবিলার প্রসিদ্ধ স্বরূপদাস বিশ্বাসের বংশধরগণ ঠাকুর আখ্যায় পরিচিত। নিজ সমাজে এই বংশের বিশেষ সম্মান আছে। ওড়াকান্দির বিখ্যাত সাধু হরিঠাকুর ইহাদের জ্ঞাতি। এই বংশের বিজয়কুমাব ঠাকুর বি. এ. বৌলতলী স্কুলে হেড মাস্টার। পদ্মবিলার বালা বংশ জনতায়, মানে ও প্রতিপত্তিতে একটি শ্রেষ্ঠ বংশ। এই বংশের কুটীশ্বর বালা দীর্ঘকাল স্বসমাজের নেতৃত্ব করিয়াছে ; গৌরচন্দ্র বালা বর্তমান কালে নেতৃস্থানীয় এবং ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার। বৌলতলীর আনন্দ বণিক ব্যবসা করিয়া যথেষ্ট অর্থ ও সম্পত্তি অর্জন করিয়াছিল। তাহার উপযুক্ত পুত্রগণ তাহার বিষয় সম্পত্তি ও ব্যবসা বাণিজ্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বৌলতলীর বিষ্ণুচরণ প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী এবং প্রতিপত্তিশালী লোক। করপাড়ার ক্ষুদিরাম বিশ্বাসের পুত্র কালীচরণ বুদ্ধিমান ও কার্যদক্ষ। ঐ গ্রামের গৌরীচরণ বালা সৎলোক বলিয়া পরিচিত ছিল ; তাহার পুত্র কেনারাম বালা মনসা মঙ্গলের দল করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। কৃষ্ণপুরের বাড়ই বংশ জনতায় এবং মর্যাদায় একটি শ্রেষ্ঠ পরিবার। এই বংশের হরমোহন বাড়ই ও তাহার পুত্র রাজকুমারের বুদ্ধি, বিনয় ও সততার জন্য খ্যাতি ছিল। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বংশের ভজন বাড়ইর পুত্র উপেন্দ্র বর্তমান কালে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

কৃষ্ণপুরের মধ্যে ডাঃ তারিণীচরণ বালার প্রভূত ঐশ্বর্য ছিল এবং বহু সদ্ব্যয় ও সৎকার্য ছিল। তাহার পুত্র এড্‌ভোকেট রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র বঙ্গীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ভূতপূর্ব সভ্য, এবং ডিস্ট্রিক বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডের মেম্বার ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। ঠুটামান্দ্রার শ্রীনাথ হীরা বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তি। হাটবাড়িয়ার চন্দ্রকুমার রায় স্বীয় অধ্যবসায় বলে অবস্থার খুব উন্নতি করিয়া গিয়াছে, গত বৎসব তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পুত্র রতিকান্ত বুদ্ধিমান এবং বিনয়ী, বর্তমানে বৌলতলী হাই স্কুলের সেক্রেটারি। ডোমরাসুরের কালাচাঁদ বাড়ইর বহু সম্পত্তি ও নাম ছিল। বনগ্রামের বালা পরিবারও নমঃশূদ্র সমাজের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ পরিবার বলিয়া গণ্য ছিল ; এখন তাহারা ডেমাকড়িতে বাস কবিতেছে।

রাজমোহন বিশ্বাস, চৈতন্য ও বৈদ্যনাথ বিশ্বাস নারিকেলবাড়ির প্রধান ব্যক্তি ছিল। বর্তমানে প্রসন্ন বিশ্বাস, রাজেন্দ্র বিশ্বাস ও পূর্ণ ডাক্তার ঐ গ্রামের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের নেতা। নিজরার শিরোমণি মাঝির বেশ মান প্রতিপত্তি ছিল। তাহার পুত্র গোপালগঞ্জের ডাক্তার রাইচরণের পুত্র হরবিলাস মজুমদার এম. এ. গবর্নমেন্টের আবগারী বিভাগে ইন্সপেক্টর।

নিজরার নিধুবালা এবং তাহার পুত্র নাগরবালা তাহাদের সময়ের বিখ্যাত লোক ছিল। তাহারা বহুকাল দুর্গাপূজা করিত। ক্রিয়াকর্ম ও সদ্ব্যবহারের জন্য নিজ সমাজে এবং জমিদারগণের নিকট তাহাদের খুব সুনাম ছিল। নাগরবালার ভ্রাতা গুরুচরণ কয়েক বৎসর ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার ছিল।

নিজবার বিখ্যাত কবিওয়ালা রজনী সরকারের অকালমৃত্যু গভীর দুঃখের বিষয়। বর্তমান কালের কবির দলে ঐরূপ গুণবান সরকার খুব কমই ছিল।

নিজরার কর্মকারগণ ধনে, মানে ও প্রতিপত্তিতে একটি প্রধান বংশ। তাহারাও বহুকাল হইতে দুর্গাপূজা করিয়া আসিতেছে। এখন নানা শরিক হওয়াতে তাহাদের পূর্বের অবস্থা নাই।

তেঁতুলিয়ার রঙ্গপরিবারের এক সময়ে খুব জাঁকজমক ছিল। কৃষ্ণ রঙ্গ বহু ব্যয় করিয়া 'বাইচের' নৌকা বাহির করিত।

সাহাপুর পরগণায় যদিও নমঃশূদ্রের বাস, তাহাদের পূর্ব ইতিহাসের উপকরণের বড়ই অভাব। প্রাচীন লোক অতি অল্পই জীবিত আছে। তাহারাও বেশি সংবাদ রাখে না। বিশেষত ১২৭০ সালে জোটের পর অনেক পরিবার এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। পরে কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়াছিল সত্য কিন্তু এখনকার অধিবাসীগণেব পূর্বের ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। সে কারণে ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের অনেকের সম্বন্ধে কিছু লেখা গেল না।

১৫৬। নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণ

উলপুরে ১২/১৪ ঘর নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণ আছে। ইহারা উলপুর এবং নিকটবর্তী অনেক গ্রামের নমঃশূদ্রের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রতাপ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উলপুরের অধিবাসীগণের মধ্যে প্রতাপ ঠাকুরই প্রথম রামায়ণের দল করে। তাহার ধর্মে মতি ছিল এবং ধর্ম-কর্মে বিশেষ উৎসাহ ছিল। সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহিত তাহার সদ্ভাব ছিল। রাউতখামারেও কয়েকঘর নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণের বাস আছে। তথাকার কুলচন্দ্র ঠাকুর প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে দেউল পূজা করিত। বরদাকান্ত ঠাকুর রাউতখামার ত্যাগ করিয়া মধুপুরের চরে বাস করিতেছে।

১৫৭। রাজবংশী

পূর্বে লিখিত হইয়াছে একমাত্র তেঁতুলিয়া গ্রামে রাজবংশীগণের বাস। ইহাদের প্রায় প্রত্যেকের জমিজমা আছে। জমির আয় ছাড়া জাতীয় ব্যবসায়ে সকলেই ভালরূপ আয় করিয়া থাকে। অধুনা কেহ কেহ উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া চাকুরি ও ব্যবসাদি কার্য করিতেছে। তেঁতুলিয়া রাজবংশীগণের একটি বড় সমাজ। রাজবংশীগণ সাধারণত মাঝি আখ্যায় পরিচিত। অনেকেব বিশ্বাস আখ্যাও আছে।

নবকৃষ্ণ (মাঝি) বিশ্বাস বিশেষ বুদ্ধিমান লোক ছিল। অর্থ সম্পত্তিতে বড় না হইলেও সমাজে সকলেই তাহাকে সম্মান করিত এবং সম্পদে বিপদে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিত। নীলকমল (মাঝি) ভৌমিক সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান্ ও পরোপকারী ছিল। জমিদার ও প্রজা সকলেরই নিকট তাহার যথেষ্ট সমাদর ছিল। তাহার ভ্রাতা মহিমাচরণও নিজ সমাজে গণ্যমান্য লোক ছিল।

চন্দ্রকান্ত (মাঝি) বিশ্বাস বুদ্ধিমান, সুচতুর ও বিচক্ষণ লোক ছিল। নিজ বুদ্ধি ও পরিশ্রম বলে চন্দ্রকান্ত বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছিল এবং অনেক বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিল। জমিদারগণের নিকট তাহার খুব প্রতিপত্তি ছিল। চন্দ্রকান্ত প্রতাপশালী ও একরোখা লোক ছিল, সেজন্য অনেকের সঙ্গে ইহার মামলা মোকদ্দমা হইত। নিজে লেখাপড়া না জানিলেও শিক্ষিত লোক অপেক্ষা বিষয় জ্ঞান তাহার কম ছিল না। মামলা মোকদ্দমায় তাহার অনেক অর্থ নষ্ট হইয়াছিল, এবং তাহার পশ্চাতে সাহায্যকারী কেহ ছিল না, একারণে তাহার শেষ জীবন নানাবিধ কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছে। ১৩৪১ সালে প্রায় ১০০ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার তুল্য ক্ষমতাবান ব্যক্তি তেঁতুলিয়ার রাজবংশী সমাজে বিরল। তাহার পুত্রসন্তান জীবিত নাই। প্রতি বৎসর কালীপূজার সময়ে চন্দ্রকান্ত মহাসমারোহে লক্ষ্মীপূজা করিত এবং তাহাতে কবিগান দিত ; চন্দ্রকান্ত কবিগানের বিশেষ প্রিয় ছিল।

আনন্দচন্দ্র (মাঝি) সরকারের তুল্য নাম ও প্রতিপত্তি রাজবংশীগণের মধ্যে কেহ পায়

নাই। নিজ সমাজের একজন প্রধান নেতারূপে আনন্দচন্দ্র দীর্ঘকাল সকলের নিকট পরিচিত ছিল। বহু লোক তাহার দান ও সদ্ব্যবহারে বাধ্য ছিল। অধ্যবসায় ও বুদ্ধিবলে আনন্দ বহু অর্থ ও সম্পত্তি অর্জন করিয়াছিল। জমিদারগণের নিকট এবং অন্যান্য সমাজের লোকের নিকটও তাহার সমধিক আদর ছিল। তাহার 'বাইচের' নৌকা বাহির করিবার সখ ছিল। প্রতি বৎসর তাহাতে তাহার প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, বিশ্বকর্মা পূজা প্রভৃতির আরঙ্গে তাহার নৌকা নানাস্থানে বাইচ দিতে যাইয়া প্রায় জয়ী হইয়া আসিত। এই বাইচের নৌকার উৎসব তাহার সমাজের বহু লোকেই উপভোগ করিত। আনন্দ বহুদিন নিজ বাড়িতে দুর্গাপূজা করিয়াছিল। সেই উৎসবের সময়ে তাহার গ্রামের বহু দরিদ্র লোক তাহার দ্বারা উপকৃত হইত। এই সমস্ত কার্যের জন্য বহু দূরদেশে তাহার খ্যাতি হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল ব্যয় বাহুল্যের জন্য শেষ জীবনে তাহাকে অর্থ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৩৪২ সালের ভাদ্র মাসে প্রায় ১০০ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাসবিহারী বুদ্ধিমান ও বিবেচক লোক ছিল। সমাজে তাহার বেশ সম্মান হইয়াছিল। স্বসমাজের উন্নতির প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ৪৭/৪৮ বৎসর বয়সে ১৩৪২ সালের ভাদ্র মাসে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

উমাচরণ হালদার (ডাক নাম সর্দার) সাহসী ও বলবান লোক ছিল। বহু স্থানে বিবাদ বিসম্বাদ ও দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্যে নিজের সাহস ও বলের পরিচয় দিয়া উমাচরণ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। পরীক্ষিৎ রায় বুদ্ধিমান ও প্রতিপত্তিশালী লোক ছিল। তাহার বাড়িতে প্রতি বৎসর নীলপূজা হইত। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিরাজমোহন এখনও সেই পূজা বহাল রাখিয়াছে। মনুরাম ভদ্র (মাঝি) বুদ্ধিমান সামাজিক ও সুরসিক ছিল।

রাধানাথ রায় (রায় মহাশয়) শিষ্টাচারী, লোকহিতৈষী ও সামাজিক ছিল। ইদানীং গ্রামের সমস্ত লোক তাহাকে সম্মান ও ভক্তি করিত ; এবং তাহার নির্দেশ মত সামাজিক সমস্ত কার্য নির্বাহিত হইত। নিজ সমাজের উন্নতিকল্পে তাহার বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা ছিল। জমিদার মহলে তাহার খুব সমাদর ছিল। রাধানাথ দীর্ঘকাল স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার ছিল। ১৩৪২ সালে ৬০/৬১ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার একমাত্র পুত্র অটলচন্দ্র ধনুষ্টঙ্কার রোগে রাধানাথের জীবনকালে ১৭/১৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করে। অল্পদিন পূর্বে রাধানাথ তাহার মাতার চিতার উপর একটি মঠ এবং বাড়িতে একটি দালান নির্মাণ করিয়াছিল। রাধানাথ মাতৃশ্রাদ্ধে বহু টাকা ব্যয় করিয়াছিল এবং উলপুরের জমিদারদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল।

বনমালী বিশ্বাস তেঁতুলিয়ায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম। বুদ্ধি এবং ব্যবহারের জন্য সকলে তাহার আদর করিত। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র শীতলচন্দ্র বংশের সুযোগ্য সন্তান, বুদ্ধিমান, সামাজিক ও সমাজহিতৈষী ছিল। গ্রামের এমন কোন সৎকর্ম ছিল না যাহাতে তাহার যোগ ছিল না। যাহাতে গ্রামের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয় তজ্জন্য শীতল কায়মনে চেষ্টা করিত এবং যুবকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিত। শীতলচন্দ্র বুদ্ধিবলে নিজের অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল। ১৩৩৮ সালের মাঘ মাসে ৩৭/৩৮ বৎসর বয়সে নিউমোনিয়া রোগে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুতে গ্রামেব বহু লোকে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিল। তাহার পুত্রসন্তান নাই, একটি মেয়ে মাত্র জীবিত আছে।

সৃষ্টিধর বিশ্বাস (ডাক নাম ইজার্দার) আমোদপ্রিয় ও সমাজহিতৈষী লোক ছিল। নিজের চেষ্টা ও পরিশ্রমে সৃষ্টিধর তাহার অবস্থার উন্নতি করিয়াছিল। তাহার একখানা 'বাইচের' নৌকা ছিল। এই নৌকাখানা খুব দ্রুত বেগে চলিত এবং প্রায় সকল স্থানেই জয়ী হইয়া আসিত। বৈদ্যনাথ (ডাক নাম চৌকিদার) বুদ্ধিমান ও সামাজিক লোক ছিল।

জীবিত লোকের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস ও বীরেশ্বর ভৌমিক বুদ্ধিমান ও সমাজের

নেতৃস্থানীয় লোক। পূর্ণচন্দ্রের সচ্চরিত্রতার প্রশংসা আছে। রাধানাথের মৃত্যুর পর পূর্ণচন্দ্র ইউনিয়ন বোর্ডের ও ঋণশালিসী বোর্ডের মেম্বার হইয়াছে। শশীভূষণ বিশ্বাস কার্যক্ষম, সামাজিক ও ভাগ্যবান্ লোক। বুদ্ধি ও পরিশ্রমে অবস্থার উন্নতি করিয়া নিজ সমাজে শশীভূষণ বেশ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি শশীভূষণ নিজ বাড়িতে দালান নির্মাণ করিয়াছে। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলিবার চেষ্টা তাহার সর্বদাই ছিল।

উমাচরণ সরকার বুদ্ধিমান এবং সামাজিক। তাহার মত দীর্ঘজীবী লোক তেঁতুলিয়া গ্রামে বিরল ছিল। বৃদ্ধ বয়সেও উমাচরণ চলাফেরা করিয়া বেড়াইতে পারিত। বৈদ্যনাথ বিশ্বাস (মণ্ডল) জ্ঞানী ও সমাজহিতৈষী। বৈদ্যনাথ গ্রামের ছেলেদিগকে খেলাধূলা এবং লেখা পড়াতে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকে। নকুল হালদার ও বিপিন রায় সমাজের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্নবান।

১৫৮। দাই

উলপুরে মুসলমান সম্প্রদায়ের কয়েক ঘর বাদ্যকর আছে। ইহারা দাইর কর্মও করে। ইহাদের নাম এবং অনেক আচার ব্যবহার হিন্দুদিগের অনুরূপ। ঢাক, ঢোল, সানাই, বাঁশী, সেতার, এস্রাজ প্রভৃতি বাজনায় ইহাদের অসাধারণ নৈপুণ্য। সানাই, বাঁশী, সেতার ও এস্রাজে শীতল ও রসিক সুবিখ্যাত, ঢোলে পবনের মত বাদ্যকর দুর্লভ, উমেশেরও ঢোল বাজনায় বিশেষ নৈপুণ্য আছে। সম্প্রতি কলিকাতায় যাইয়া পবন ও রসিক অনেক স্থানে সমাদর পাইতেছে ; রেডিও ও গ্রামোফোনে এবং অনেক বড় মজলিসে তাহাদের বাজনা আদৃত হইয়াছে।

১৫৯। মুসলমান

এই পরগণার মুসলমান অধিবাসীগণের প্রায় সকলের জমিজমা আছে ; তাহা ছাড়া অনেকে নানারূপ ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া থাকে।

কলপুরে অনেক ধর্মানুরাগী মুসলমানের বাস। কলপুরের রমজানউল্লা মোল্লা বিখ্যাত লোক ছিল ; তাহার পৌত্র নাদের মোল্লা প্রতিপত্তিশালী লোক। কলপুরের উকিল বংশেরও যথেষ্ট মান প্রতিপত্তি ছিল। বনগাঁও, বলাকড়ি, খাটিয়াগর, কংশুর ও হাটবাড়িয়ায় অনেক মুসলমানের বাস ; তাহাদের অনেকের ভাল অবস্থা। বর্তমান কালে মেহের মোল্লা পূর্ব জোয়ারের মুসলমানগণের নেতা। বলাকড়ির যছিমদ্দি মোল্লা ধনে ও মানে শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহার পুত্র মঙ্গল তাহার মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। মঙ্গল ও মস্তাজদ্দি ফকির প্রভৃতি আজকাল ঐ গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। হাটবাড়িয়ার দাড়িয়া বংশের যথেষ্ট মান প্রতিপত্তি আছে ; ঐ বংশের সুজারদ্দি দাড়িয়া বিখ্যাত লোক ছিল। পশ্চিম নিজরার কহিলদ্দি সর্দারের যথেষ্ট সম্পদ ছিল ; তাহার ধর্মভীরুতা ও ন্যায়নিষ্ঠা অতুলনীয় ছিল। পশ্চিম নিজরার মৃত মেহের মোল্লা স্বনামধন্য পুরুষ ; ধনে মানে ও সদ্ব্যবহারে তাহার প্রতিযোগী লোক অতি অল্পই ছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এয়াকুব মুর্শিদ বা ধর্মগুরুর কার্যে ব্যাপৃত, মধ্য ইউনুস নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তিশালী নেতা, ইউনিয়ন বোর্ড ঋণশালিসী বোর্ডের মেম্বার, কনিষ্ঠ আমজেদ গোপালগঞ্জের মোক্তার।

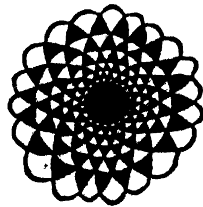
পশ্চিম নিজরার নাগার্চী আখ্যাধারী এক সম্প্রদায় মুসলমান আছে। তাহারা পুরুষানুক্রমে বাদ্যকরের ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। তাহারা নিরীহ ও নির্বিরোধী লোক। ৪র্থ অধ্যায়ে আছানুল্লা নাগার্চীর উল্লেখ করা হইয়াছে ; আছানুল্লার পুত্র নীলমণি, তাহার ৬ পুত্র, ৫ম পুত্র ও ৬ষ্ঠ সৃষ্টি ও বিষ্ণু ঢাক ঢোল বাজনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বিষ্ণুর পুত্র শীতল জীবিত আছে। তাহার দুই পুত্র, কণ্ঠি ও মাণিক। মাণিক ঢাক বাজনায় সিদ্ধহস্ত। পশ্চিম নিজরার আবদুর রহমান দারোগার কার্যে নিযুক্ত ; এখন তাহার বাড়ি উলপুর গ্রামে। আড়ুয়া কংশুর ও করপাড়ায়

কারিগর উপাধিধারী অনেক মুসলমান আছে। ইহাদের জমিজমা আছে, তদুপরি পূর্বাপর ইহারা তন্তুবায়ের কার্যে নিযুক্ত আছে। ইহাদের মধ্যে মৃত পেয়ারমামুদ মোল্লার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। পেয়ার মামুদ সুপুরুষ, ভদ্র, বিনয়ী ও ন্যায়পরায়ণ ছিল। তাহার ভ্রাতা এয়ার মামুদ তাহার ন্যায় গুণবান, সদালাপী ও বুদ্ধিমান। এয়ার মামুদ সুরূপ, সবল ও দীর্ঘকায়। বর্তমানকালে কারিকরগণের মধ্যে জমিরদ্দির বুদ্ধি ও ব্যবহারগুণে বিশেষ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

১৬০। যুগ পরিবর্তন

বর্তমানে আমরা একটি যুগ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত। অতীতের শিক্ষা, সভ্যতা ও আদর্শের পরিবর্তে, নতুন শিক্ষা, আদর্শ ও আচার ব্যবহার মাথা জাগাইয়া উঠিতেছে। মূলে সমাজের আদর্শ উন্নত এবং হিতকর থাকিলেও কালক্রমে তাহার অবনতি হয়। সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনশীল ; সকল মানুষ আদর্শ অনুসারে চলিতে পারে না ; সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে ক্রমে স্বার্থপরতা, আত্মাভিমান, অনুদারতা প্রভৃতি দেখা যায়। এইরূপ নানা কারণে সমাজে বহুবিধ দোষ ও ব্যাধির আবির্ভাব হইলে সমাজের সংস্কার ও রীতিনীতির পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়া উঠে। অতএব পরিবর্তনের কথা শুনিয়াই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবার কারণ নাই। পরিবর্তন মাত্রই অনিষ্টকর নহে। সৃষ্টির পর হইতে অতীতকালে বহু যুগ-পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু সেই পরিবর্তনের ফলে মানব সমাজ ধ্বংস হয় নাই। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্ব স্ব উন্নতির আকাঙক্ষা করে, বিশেষত অনাদৃত এবং উপেক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে স্বীয় অবস্থার উন্নতি বিধান ও আধিপত্য লাভের প্রয়াস স্বাভাবিক ; তাহাকে অবৈধ ও অসঙ্গত উপায়ে দমিত করিবার চেষ্টা নিন্দনীয় এবং সর্বদা পরিত্যজ্য। সমাজ কোন ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণিবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে, সকল শ্রেণির লোকের মঙ্গল ও সুখের জন্য সমাজ সৃষ্টি। সকল সম্প্রদায়ের সুখ, সুবিধা, স্বাতন্ত্র্য ও উন্নতির জন্য প্রত্যেক সামাজিক নেতার আগ্রহ ও যত্ন করা কর্তব্য। কিন্তু সংস্কারের নামে সমাজের সংহার করিবার উদ্যম, অথবা এক শ্রেণির সঙ্গত স্বার্থ ধ্বংস করিয়া আর এক শ্রেণির উন্নতি বিধানের চেষ্টা অন্যায় এবং নিন্দনীয়। অত্যাচার দ্বারা অত্যাচারের, কিংবা অন্যায়ের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার হয় না ; ন্যায় ও ধর্মের দ্বারাই অন্যায় ও অধর্ম পরাজিত হয়।

মানুষে মানুষে বহু পার্থক্য সত্ত্বেও এত অধিক বিষয়ে ঐক্য আছে যে সকলে মিলিয়া মিশিয়া সমাজে বাস করা দুঃসাধ্য নহে। একের প্রতি অন্যের প্রেম ও প্রীতির অভাবই সমস্ত সামাজিক বিরোধের মূল। সকলের হিতের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সমাজ চালাইবার বা সমাজের সংস্কার করিবার চেষ্টা সুফলপ্রদ হইতে পারে না। প্রাচীন, নবীন সকলেরই মনে রাখা উচিত ধনী, দরিদ্র, প্রজা, জমিদার, অভিজাত, অনভিজাত, উন্নত, অনুন্নত সকলের স্বার্থ পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত, সকলেই এক বৃক্ষের শাখা, এক বৃন্তের ফুল, একই পরমাত্মার প্রকাশ ; একের হিতে অন্যের হিত, একের অনিষ্টে অন্যের অমঙ্গল। এই সার সত্য হৃদয়ে ধরিয়া চলিতে পারিলে জগদ্ব্যাপী মহাপরিবর্তন সময়ে আমাদের পরম মঙ্গল হইবে, নতুবা 'মহতী বিনষ্টি'!



দশম অধ্যায়

পল্লী প্রসঙ্গ

১৬১। সেকাল ও একাল

ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতা প্রচলনের পর হইতে এদেশের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতিতে ধীরে ধীরে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। শেষদিকে পরিবর্তন দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে সংঘটিত হইয়াছে। উলপুর ও তাহার পার্শ্ববর্তী বিল প্রদেশে ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতা অনেক বিলম্বে প্রবেশ করায় সেখানকার ধর্ম ও সমাজে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিবর্তন হইয়াছে। এখনও এইসব পল্লীগ্রামে সাবেক ধর্মভাব মোটের উপর অক্ষুণ্ণই আছে, সাধারণ লোকে এখনও দেব, দ্বিজ ও ধর্মকর্মে আস্থাবান। ধর্মে সংশয়, অবহেলা ও বিপর্যয় উচ্চবর্ণের লোকের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। প্রাচীন শ্রেণির অনেকের ধারণা যে পূর্বের সমস্তই ভাল, আধুনিক সমস্তই মন্দ ও অনিষ্টকর। তাহার কারণ এই যে অতীতে যে সব-দুঃখ, কষ্ট, অভাব ও অসুবিধা ছিল তাহার স্মৃতি ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়াছে, সেকালে যে সব সুখ সুবিধা ছিল তাহার পরিবর্ধিত স্মৃতি অনেকের মনে জাগিতেছে। সুতরাং তাহার তুলনায় এখনকার সমস্ত অবস্থাই দুঃখময় মনে হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ ধারণা অমূলক। শান্তচিত্তে, নিরপেক্ষভাবে অতীত ও বর্তমানের অবস্থার তুলনা করিলে তাহা প্রতীয়মান হইবে।

সেকালের লোকেরা অতি সামান্য পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত। ভদ্রলোকের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভাল শীতবস্ত্র চক্ষেও দেখিত না, তখনকার প্রচলিত ছাপা সুতি দোলাই, কিংবা পরিধেয় বস্ত্র ভাঁজ করিয়া গলায় বাঁধিয়া ছেলেমেয়েরা শীতকালে রোদ পোয়াইত। সার্টের বড় প্রচলন ছিল না, সুতি কোট অনেকে ব্যবহার করিত। ক্রমে ক্রমে গেঞ্জি, সার্ট ও নানাবিধ কোটের চল হইয়াছে। এখন বালক-বালিকাদিগকে খালি গায়ে বাহির হইতে প্রায় দেখা যায় না। প্রথমত জোলার মোটা কাপড় সকলেই ব্যবহার করিত, তারপর বিলাতী কলের কাপড়ের আমদানি হওয়ায় অনেকে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে আরম্ভ করে। সেই সময়ে রেলির সাড়ে ৫ নম্বরী ধুতি ও ২২২২ ও ৪৭ নম্বরী থান সর্বোৎকৃষ্ট কাপড় বলিয়া আদৃত হইত। ১৯০৫ খ্রিঃ অব্দে স্বদেশি আন্দোলনের ফলে লোকে পুনরায় দেশী তাঁতের ও মিলের মোটা কাপড় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে।

সেকালে ধান চাউল সস্তা ছিল ; কিন্তু চাউল অত্যন্ত মোটা ও দুষ্পাচ্য ছিল। এখন উৎকৃষ্ট শ্রেণির বীজ আমদানি হওয়াতে জমিতে উৎকৃষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয়। পূর্বের তুলনায় এখনকার চাউল অনেক ভাল। পূর্বে এদেশে মটর কলাই ভিন্ন অন্য ডালই পাওয়া যাইত না, তরিতরকারিরও খুব অভাব ছিল। বর্ষাকালের প্রথম ভাগে মৎস্যেরও খুব অভাব হইত, সুতরাং খাওয়ার বিশেষ কষ্ট হইত। এখন ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হওয়ায় কোন ঋতুতেই আহার্যের অভাব হয় না।

পূর্বে উলপুরে খাবারের কোন দোকান ছিল না। লোকে বহু চেষ্টা করিলেও ইচ্ছামত সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্ট সামগ্রী জোগাড় করিতে পারিত না। শ্রীপঞ্চমীর মেলায় বহু মিঠাইর দোকান আসিত ; সেই সময়ে লোকে প্রচুর পরিমাণে মিষ্ট সামগ্রী ক্রয় করিত। পূর্বে

'চা'র নাম পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। এখন রীতিমত চায়ের দোকান চলিতেছে এবং খাবারের দোকানও প্রায় বারমাসই চলে। সেকালে কোন অতিথি বা কুটুম্ব বাড়িতে আসিলে লোকে দুধের, ক্ষীরের ও নারিকেলের নানাবিধ গৃহনির্মিত মিষ্টদ্রব্য দ্বারা তাহাকে আপ্যায়িত করিত। গৃহের স্ত্রীলোকেরা এই সমস্ত পিষ্টকাদি নির্মাণে বিশেষ নিপুণ ছিল. সেকালে রুটি ও লুচির চল মোটেই ছিল না ; নিমন্ত্রণে চিড়া, দই, ভাত, পোলাও মাংস প্রভৃতির চল ছিল। এখন শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে নিমন্ত্রণে সাধারণত লুচিরই প্রচলন হইয়াছে। সেকালে খেলার মধ্যে হাডুডুডু ও গোলাছুট প্রভৃতি খেলার খুব চল ছিল। তৎপর কিছুদিন গৃহনির্মিত ব্যাট ও ন্যাকড়ার বল দ্বারা বাড়ি বাড়িতে ক্রিকেট খেলার চল হইয়াছিল; ক্রমে ফুটবল আসিয়া সমস্ত খেলার স্থান অধিকার করিয়াছে। এক সময়ে কড়ির সাহায্যে নানাবিধ খেলা ও মার্বল খেলার খুব চল ছিল। পূর্বে দুর্গাপূজার সময়ে মহিষবলি ও পৌষ সংক্রান্তির সময়ে ষাঁড়ের লড়াই দেখিতে বহু লোকের আগ্রহ ছিল, এখন ষাঁড়ের লড়াই একেবারে উঠিয়া গিয়াছে ; মহিষ বলিও খুব কমিয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র এক বাড়িতে হয়। ৪০/৪৫ বৎসর পূর্বে এদেশে তাস খেলার বড়ই প্রচলন হইয়াছিল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাস খেলিত, প্রতি গৃহে ২/৩ জোড়া তাস পাওয়া যাইত। পাশা ও দাবারও চল ছিল, কিন্তু তাসের মত বেশি নহে। ক্রমে তাস খেলা কমিয়া গিয়াছে।

সেকালে বয়োবৃদ্ধের সম্মান সকলেই রাখিত। বৃদ্ধেরা পরের ছেলেমেয়েদিগকে কোন আদেশ করিতে ইতস্তত করিত না, এবং তাহারাও তাহা পালন করিত। কিন্তু তামাকের এত বেশি চল ছিল যে বৃদ্ধ যুবা একসঙ্গে তামাক খাইতে সঙ্কোচ বোধ করিত না। তখন দেশে অনেক নিষ্কর্মা লোক ছিল। তাহারা বাহির হইয়া কার্যের চেষ্টা করিলে পাইতে পারিত, কিন্তু বাড়ির বাহির হইতে চাহিত না। এখনও অনেক নিষ্কর্মা লোক আছে, কিন্তু তাহা বিপরীত কারণে ; এখন লোকে চেষ্টা করিলেও সহজে কাজ পায় না, কাজেই অনেককে বেকার বসিয়া থাকিতে হয়।

সেকালে ইতর ভদ্র, জমিদার, প্রজা সকলের মধ্যে বেশ আত্মীয়তার ভাব বর্তমান ছিল। অনেক গরিব প্রতিবেশীর সঙ্গে অনেক জমিদার পরিবারের ধর্ম সম্পর্ক ছিল ; উভয়পক্ষই এই ধর্মসম্পর্ক মানিয়া চলিত। তাহা ছাড়া ভদ্র ঘরের অল্পবয়স্ক লোকে বয়োজ্যেষ্ঠ ভৃত্য, প্রজা ও প্রতিবেশীকে খুড়া, জ্যেঠা ও দাদা প্রভৃতি সম্বোধন করিত এবং আলাপ ব্যবহারে আত্মীয়তার ভাব প্রকাশ করিত। অনেক চাকর ও প্রজা মনিবের গৃহের বয়ঃকনিষ্ঠদিগকে 'তুমি' সম্বোধন করিত। তাহাতে কেহ অপমান বোধ করিত না। এখন পরস্পরের মধ্যে এই আপনাআপনি ভাব ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।

সেকালে ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকদের মধ্যে অবরোধ প্রথা খুব প্রচলিত ছিল। বৌ'রা দীর্ঘ ঘোমটা না দিয়া ঘরের বাহির হইতে পারিত না ; বয়োজ্যেষ্ঠ নিকটসম্পর্কীয় পুরুষ বা ভদ্রলোকের সঙ্গেও কথা বলিবার প্রথা ছিল না। কিন্তু বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষে দল বাঁধিয়া স্ত্রীলোকেরা গান করিত। যে সকল বধূ ভাল গান করিতে পারিত তাহাদের প্রশংসা এবং আদর ছিল। বাড়ির যে কোন গৃহে কোন পারিবারিক মঙ্গল উৎসব উপস্থিত হইলে সকল ঘরের স্ত্রীলোকেরা সমবেত হইত এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা গান করিতে পারিত তাহাদের গান করিতে হইত। একের উৎসবে সকলে সানন্দে যোগদান করিত। বিবাহাদি কার্যে পিঁড়ি, সরা ও কুলা প্রভৃতি চিত্রের কার্য স্ত্রীলোকেরাই করিত। অনেকে সুন্দর চিত্রাঙ্কণ করিতে পারিত। তাহাদের আদর ছিল। সেকালের শাশুড়িরা সাধারণত বৌদের উপর খুব প্রভুত্ব খাটাইত। বৌ'রা দিনের বেলায় স্বামীর সঙ্গে কথা বলিতে পারিত না, বলিলে তাহা অপরাধের মধ্যে

গণ্য হইত। সেকালে পূজা, অর্চনা, শান্তি স্বস্ত্যয়নাদিতে স্ত্রীলোকদিগের প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং উৎসাহ ছিল। সেই সব ধর্ম কার্যের সকল আয়োজন স্ত্রীলোকেই করিত। এমন কি দুর্গাপূজার মত বৃহৎ ব্যাপারেও অনেক কার্যের ব্যবস্থা বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকেরা করিত। তখন সাধারণ নিমন্ত্রণের রান্না স্ত্রীলোকেরা করিত। যে কোন ঘরে নিমন্ত্রণ উপস্থিত হইলে অন্য ঘরের রন্ধননিপুণা স্ত্রীলোক আসিয়া রন্ধন করিত। অনেক স্ত্রীলোকের রন্ধন কার্যে বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লেখাপড়ার সামান্য চল ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাংলা ভাষায় ভালরূপ শিক্ষিত ছিল। অনেকেরই গান বাজনায় খুব অনুরাগ ছিল। অবরোধ প্রথা সত্ত্বেও নিমন্ত্রণ উপলক্ষে এ পাড়ায় ও পাড়ায় যাইতে, কিংবা পূজা প্রভৃতি দিবার জন্য কালীবাড়ি যাইতে বা বিবাহাদি উৎসবের সময়ে জল লইতে যাইতে স্ত্রীলোকদিগের কোন বাধা ছিল না। সেকালে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কড়ির দ্বারা দশ পঁচিশ খেলা এবং তাস খেলার খুব চল ছিল।

পূর্বকালে এ দেশে অনেক বৈষ্ণব ভিখারি ভিক্ষা করিতে আসিত। পূজার সময়ে ঘাটে ঘাটে বৈরাগীর নৌকা দেখা যাইত। অনেকেই 'জাত' বৈষ্ণব অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের নাম লইয়া ভিক্ষা করাই তাহাদের ব্যবসা ছিল। তাহাদের অনেকের মধ্যে খুব ধর্মভাব ছিল। আবার অনেকে ভণ্ড ছিল। অনেক বৈরাগী ভাল গান গাইতে পারিত। তাহারা অনেক অজ্ঞাত কবির ও সাধকের রচিত ধর্ম সঙ্গীত ও দেহতত্ত্বের গান গাইত। লোকে আদর করিয়া বসাইয়া সেই সকল গান শুনিত। এখন সেই শ্রেণির বৈষ্ণব ভিখারীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে; ভিখারীর মুখে 'জয়রাধে গোবিন্দ' নাম আর বড় শোনা যায় না। পূর্বে সংবাদপত্রের মধ্যে একমাত্র 'বঙ্গবাসী' দুই এক বাড়িতে দেখা যাইত। এখন ইংরেজি ও বাংলা বহু দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা অনেকের হাতে দেখা যায়। পূর্বে কোন কোন বাড়িতে রাত্রিকালে প্রাচীন লোকেরা একস্থানে বসিয়া কাশীরাম দাসের মহাভারত কিংবা কৃত্তিবাসী রামায়ণ শ্রবণ করিত। কেহ সুর করিয়া ঐ সব গ্রন্থ পড়িত। কখনও শ্রাবণ মাসে মনসামঙ্গল শ্রবণ করিত। এখন এই সব পুস্তকের পাঠ উঠিয়া গিয়াছে। তৎপরিবর্তে আধুনিক উপন্যাস, নাটক ও পত্রিকাদি অনেকে পড়িয়া থাকে।

১৬২। ঋতু পরিচয় ও পূজাপার্বণ প্রভৃতি

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই কতকগুলি ধর্মানুষ্ঠান ও উৎসব ঋতুপরিবর্তন উপলক্ষে প্রচলিত আছে। সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর ভ্রমণের ফলে ঋতুপরিবর্তন হয়। চলিত ভাষায় এই গতিকে পৃথিবীর গতি না বলিয়া সূর্যের গতি বলা যায়। সূর্যের গমনীয় পথ অর্থাৎ ক্রান্তি বা অয়নমণ্ডল (ecliptic) আকাশমণ্ডলস্থ কল্পিত বিষুবরেখাকে যে দুই বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে তাহাকে সম্পাত বা ক্রান্তিপাত (equinox) বলে। 'বিষু' অর্থ (দিবারাত্রির) সাম্য, 'বা' ধাতুর অর্থ গতি অর্থাৎ যেস্থানে সূর্য গমন করিলে দিবারাত্রি সমান হয় তাহারই নাম বিষুবরেখা। বৎসরের মধ্যে দুইদিন সূর্য বিষুবরেখার উপর আসে, সেই দুইদিন দিবারাত্রি সমান হয়। চৈত্র মাসের শেষ দিন সূর্য মেষ রাশিতে সংক্রমণ করে এবং আশ্বিনের শেষদিন তুলা রাশিতে সংক্রমণ করে। বহু শতাব্দী পূর্বে চৈত্রমাসের শেষদিনে সূর্য একটি ক্রান্তিপাতে এবং আশ্বিন মাসের শেষদিনে অপর সংযোগ স্থলে ছিল। এই দুইটি সংক্রান্তি যথাক্রমে মহাবিষুব ও জলবিষুব সংক্রান্তি নামে অভিহিত। সূর্যদেবের বিশেষ সংক্রমণের জন্য এই দুই সংক্রান্তি পুণ্যদিন বলিয়া বিবেচিত হয় এবং এদেশে নানাবিধ ধর্মানুষ্ঠান হয়। ক্রান্তিপাতের প্রতি বৎসর সামান্য অগ্রগতি আছে, তাহাকে অয়নগতি (precession of the equinoxes) বলে। অয়নগতির জন্য মেষের আদি বিন্দু হইতে ক্রান্তিপাতের যে ব্যবধান হয় তাহাকে অয়নাংশ বলে। এখন

ক্রান্তিপাত মেষরাশি হইতে এতটা সরিয়া আসিয়াছে যে ৩০ চৈত্রের পরিবর্তে ৯ চৈত্র এবং ৩০ আশ্বিনের পরিবর্তে ৯ আশ্বিন সূর্য ক্রান্তিপাতে আসে, এবং ঐ দুই দিবস দিন রাত্রি সমান হয়।

আরও দুইটি সংক্রান্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অয়নগতি বাদ দিলে বলা যায় যে চৈত্রমাসের শেষদিনে সূর্য বিষুবরেখার উপর আসে, তারপর তিন মাস তাহার গতি উত্তরদিকে; আষাঢ় মাসের শেষদিনে সূর্য তাহার গমন পথের সর্বোত্তর স্থানে আগমন করে, তৎপর হইতে সূর্য দক্ষিণাভিমুখে গমন করে। মোটামুটি এই হিসাবে সূর্যের অয়ন গণনা করা হয় বলিয়া আষাঢ়ের শেষদিনকে দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি বলে ; হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে এই সংক্রান্তি পুণ্য দিন। কিন্তু এই সময়ে কোন উৎসবানুষ্ঠান প্রচলিত নাই। ছয়মাস পরে সূর্য তাহার পথের সর্ব দক্ষিণ স্থানে উপস্থিত হয় বলিয়া পৌষ মাসের শেষদিনকে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বলে; এইদিন হইতে সূর্য পুনরায় উত্তর মুখে গমন করিতে থাকে। ভারতবর্ষে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি মহাপুণ্য দিন বলিয়া বিবেচিত হয়। এই দিনে এদেশের সর্বত্র নানাবিধ উৎসব হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাস হইতে পৌষ মাসকে দক্ষিণায়ন বলে এবং মাঘ মাস হইতে আষাঢ় মাসকে উত্তরায়ণ বলে। হিন্দু শাস্ত্র মতে উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিন এবং দক্ষিণায়ন তাহাদের রাত্রি বা নিদ্রার সময়। সুতরাং দক্ষিণায়নে দেবপূজা প্রশস্ত নহে। ভীষ্ম দক্ষিণায়নে শরশয্যায় পতিত হইয়াও দুই মাস অপেক্ষা করিয়া পুণ্যময় উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে দেহত্যাগ করেন।

হিন্দু শাস্ত্রে বৎসরকে ছয় ঋতুতে বিভক্ত করা হয়। সাধারণ গণনায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাস গ্রীষ্ম ঋতু, আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাস বর্ষা ঋতু ইত্যাদি। পঞ্জিকাদিতেও এইরূপ লেখা আছে। কিন্তু শাস্ত্রমতে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন কার্তিক শরৎ, অগ্রহায়ণ পৌষ হেমন্ত, মাঘ ফাল্গুন শীত এবং মধু (চৈত্র) ও মাধব (বৈশাখ) দুই মাস বসন্ত ঋতু। স্মৃতির মতে মাত্র তিনটি ঋতুর গণনা হয় যথা : কার্তিক হইতে মাঘ শীত ঋতু, ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্ম ও আষাঢ় হইতে আশ্বিন বর্ষা ঋতু। বহু বৎসর পূর্বে এই ঋতু বিভাগ হইয়াছিল ; ক্রান্তিপাতের অগ্রগতি এবং নৈসর্গিক নানাবিধ পরিবর্তনের জন্য ঋতুসমূহের বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে। প্রকৃতির অবস্থা অনুসারে আমাদের দেশে এখন নিম্নলিখিতরূপে ঋতুর পরিস্থিতি বলা যাইতে পারে—চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্মকাল, আষাঢ় হইতে ভাদ্র বর্ষাকাল, আশ্বিন শরৎকাল, কার্তিক হেমন্ত, অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ শীত ও ফাল্গুন মাস বসন্তকাল। এক হিসাবে এদেশে আষাঢ় হইতে কার্তিক ৫ মাসই বর্ষাকাল বলা চলে, কারণ এ কয়মাস এদেশ সম্পূর্ণ জলে ডুবিয়া থাকে। নির্মেঘ আকাশ ও স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত রজনী আশ্বিন মাসকে এখনও শরৎকাল বলিয়া চিনাইয়া দেয়। কার্তিক মাসে এখনও হেমন্তকালের অনেক লক্ষণ আছে। হিম (শীত) ইহার অন্তে আসে বলিয়া ইহার নাম হেমন্ত। শিশিরের প্রথম অভিযান এই কার্তিক মাসেই হয়। ফাল্গুন মাসে শীতের অপগমে ও সুখপ্রদ মলয়ানিলে বসন্তের আভাস পাওয়া যায় ; কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যাদিতে বসন্তের যেরূপ মনোহর বর্ণনা আছে তাহার অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ঋতুতে এ প্রদেশে যে সমস্ত পূজা পার্বণ ও উৎসবাদি হয় তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১৬৩। আশ্বিন সংক্রান্তি

প্রতি মাসের শেষ দিন প্রকৃত প্রস্তাবে পরবর্তী মাসের সংক্রান্তি, কিন্তু চলতি ভাষায় তাহাকে পূর্ববর্তী মাসেরই সংক্রান্তি বলা হয়। এই হিসাবে আশ্বিন মাসের শেষ দিনকে আশ্বিন সংক্রান্তি বলে। আশ্বিন সংক্রান্তিতে এদেশের সমস্ত হিন্দু গৃহে ধর্মানুষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহাকে "গার্‌সী" বলে। এই দিন প্রকৃত পক্ষে প্রীতিপ্রদ শরৎ ঋতুর অবসান এবং হেমন্তের প্রারম্ভ।

হিন্দু জ্যোতিষের মতে বৎসর গণনা হইবার সময়ে এই দিন দিবারাত্রি সমান ছিল। কার্তিক মাসে শিশিরপাত আরম্ভ হয়, এই ঋতু পরিবর্তন নানাবিধ রোগের আকর। কার্তিকের মত অস্বাস্থ্যকর মাস আর নাই। লোকে কার্তিক মাসকে "যমের দক্ষিণ দুয়ার" বলিয়া থাকে। এই ভীষণ কালের নানাবিধ অনিষ্টকর ফল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আশ্বিন সংক্রান্তির রাত্রিতে প্রতি গৃহে ভগবানের নাম কীর্তন হয়। এদেশের অনেক গ্রামে গৃহে গৃহে নরনারীগণ হরিনাম করিয়া সম্পূর্ণ রাত্রি জাগরণ করে ; নানা গৃহে মহাসঙ্কীর্তনাদি হয় ; অনেকে নিকটবর্তী কোন ধর্মস্থানে সমবেত হইয়া কীর্তনাদিতে রাত্রি কাটাইয়া দেয়। পর দিন প্রত্যুষে মশা, মাছি প্রভৃতি দূর করিবার উপলক্ষে বালকগণ লাঠির দ্বারা গৃহের বেড়া পেটায় , পাট কাঠির ধূম পান করে এবং সিদ্ধ কাঁচা তেঁতুল অধরে লেপন করে। কার্তিক মাসে প্রতিদিন গৃহে গৃহে আকাশ প্রদীপ এবং দেব মন্দিরে দীপ দানের প্রথা আছে।

১৬৪। নবান্ন

বহু পূর্বকালে ভারতবর্ষে অগ্রহায়ণ মাসে বৎসর আরম্ভ হইত। বৎসরের প্রথম মাস বলিয়া অন্যান্য মাসের অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। হেমন্তের অপগম, নতুন ধান্যের আগম, ও নানাবিধ সুখাদ্যের প্রাচুর্যের জন্যও অগ্রহায়ণ বৎসরের মধ্যে একটি ভাল মাস। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে এদেশে নবান্ন উৎসব হয়। ইহা পারিবারিক উৎসব। এই উৎসবে লোকে পিতৃপুরুষগণের পার্বণ করিয়া নতুন চাউল ব্যবহার আরম্ভ করে। নতুন ধান্যের স্তবক হইতে ছেলে-মেয়েরা উৎসাহের সঙ্গে ধান্য ছাড়াইয়া থাকে। সেই ধানের চাউল গুঁড়া করিয়া মিষ্টাদির সহযোগে নবান্ন প্রস্তুত হয়। তদুপরি প্রতি গৃহে অবস্থানুযায়ী নানাবিধ সুখাদ্যের আয়োজন হয়। সকলের পক্ষে, বিশেষত বালক-বালিকাগণের পক্ষে নবান্ন বিশেষ আনন্দের উৎসব।

১৬৫। পৌষ সংক্রান্তি

আর একটি ঋতুউৎসব পৌষ মাসের শেষ দিন, অর্থাৎ মকর সংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন। ইহা হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিশেষ পুণ্যের দিন। প্রকৃতিও এসময়ে লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। প্রতি গৃহে নতুন ধান্য সঞ্চিত হয়। বৎসরের মধ্যে এই সময়ই লোকের স্বচ্ছল অবস্থা। সুতরাং পৌষ সংক্রান্তির উৎসব ধনী দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ সকলেই আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করিয়া থাকে। অনেক গৃহে বাস্তু পূজা হয়। গৃহে গৃহে নানাবিধ পিষ্টক ও পায়সান্ন প্রস্তুত হয়। এই উৎসবে বালক-বালিকাদিগের আনন্দের সীমা থাকে না। এদেশে পৌষসংক্রান্তির ৭/৮ দিন পূর্ব হইতে বিভিন্ন পাড়ার কৃষক বালকগণ দল বাঁধিয়া প্রতি রাত্রিতে সখের ভিক্ষায় বাহির হয়। তাহারা গৃহে গৃহে 'বাস্তুদেবের' গান গাহিয়া চাউল ও পয়সা মাগিয়া লয়। ইহাকে 'আলই' গান বলে। এই সব গানের বিশেষ কোন অর্থ নাই ; কখনও অতীতের কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে সাধারণ ভাষায় কোন গান রচিত হয়, কোন গান বা শুধু ভিক্ষা চাহিবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়। ইহাতে বিশেষ কবিত্ব না থাকিলেও গ্রাম্য সঙ্গীত হিসাবে ইহাদের কিছু আদর আছে মনে করিয়া বাল্যে শ্রুত একটি 'আলই' গান এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

আইলাম রে হরণে,
লক্ষ্মী দেবীর স্মরণে।
লক্ষ্মী দেবী দিলেন বর,
ধানে চাউলে গোলা ভর।
ধান না দিয়ে যে দেয় কড়ি,
তার দুয়ারে সোনার নড়ি।

সোনার নড়ি আর রূপার ফাল,
গাই বলদে চষে হাল।
হাল থোও, ফাল থোও,
হাইলা নড়িটা বাতায় থোও,
বাহির বাড়ি গিয়া পাও ধোও।

গান গাইয়া তাহারা 'আলই আলই বাস্তের বর' এই কথা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা চায়। কেহ চাউল, কেহ বা পয়সা দেয়। ৭/৮ দিন এইরূপ গান করিয়া যাহা সংগৃহীত হয় তাহার দ্বারা ঐ সব বালকেরা নিজেদের মত পৃথক করিয়া বাস্তু পূজা করিয়া খাওয়া দাওয়া ও আমোদ প্রমোদ করে।

১৬৬। শ্রীপঞ্চমী

শীতের অপগমকালে প্রথম উৎসব বাসন্তী পঞ্চমী। বসন্তের আগমে প্রফুল্লচিত্তে সকলেই উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করে। এই দিন প্রতি বাড়িতে সরস্বতী পূজা হয় ; পূর্বাহ্নে কোন গৃহে ভাত রান্না হয় না, সকলে চিড়া, দই, খই ও অন্যান্য মিষ্ট দ্রব্য আহার করে ; স্কুল সমূহে ছাত্রগণ লুচি ও নিরামিষ খাদ্যের আয়োজন করে। কখন কখন যাত্রা, রামায়ণ বা কথকতা হয়। পূর্বে শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে উলপুরে মাসাবধি মেলা হইত, তাহার বিষয় প্রথম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। এ দেশের প্রথা অনুসারে বিজয়া দশমীর পর হইতে শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব পর্যন্ত ইলিশ মাছ খাওয়া নিষেধ। অনেকে শ্রীপঞ্চমীর দিন ইলিশ মাছ ঘরে নেয়।

১৬৭। দোলযাত্রা

এ দেশে ফাল্গুনী পূর্ণিমা ও প্রতিপদের সন্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উৎসব হয়। তৎপূর্ব দিন বহ্ন্যুৎসবই অধিক আনন্দের বিষয়। ৫/৬ দিন পূর্ব হইতে তাহারা রাশীকৃত খড় ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থ সংগ্রহ করিতে থাকে। প্রাচীনেরা অগ্নিকাণ্ডের ভয়ে তাহাদিগকে অল্পস্বল্প বহ্ন্যুৎসব করিতে বলিলেও তাহারা শোনে না। দোলের দিন রাধাগোবিন্দের দোলার সঙ্গে হোলিগান গাহিতে গাহিতে শোভাযাত্রা করিবার প্রথা। পূর্বে উলপুরের মূল প্রত্যেক বাড়ি হইতে এইরূপ শোভাযাত্রার ব্যবস্থা খুব উৎসাহের সঙ্গে হইত। নূতন নূতন গান বাঁধিয়া ৫/৬ দিন পূর্ব হইতে মহড়া দেওয়া হইত। শোভাযাত্রাকালে বহুপরিমাণ আবির ছড়ান হইত। শোভাযাত্রা শেষ হইলে রাধাগোবিন্দের অর্চনান্তে সকলে পরিতোষপূর্বক প্রসাদ পাইত। এখন শোভাযাত্রা বা হোলির গানে তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। সমগ্র উলপুর গ্রামে একটি মাত্র হোলির দল বাহির হয়; কিন্তু সে দল কোন বাড়ির দোলার অনুগমন করে না। প্রসাদেরও আর তেমন প্রাচুর্য নাই। আজকাল আবির ও রং প্রভৃতির একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছে; প্রভাত হইতে আবির, নানাবিধ রং, কালী, এমন কি কাদারও ছড়াছড়ি হইতে থাকে; কিন্তু যে রাধাকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে এই অনুষ্ঠান তাহাদের প্রতি ভক্তির কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এখন দোলের দিন তেঁতুলিয়া গ্রামে মেলা হইয়া থাকে।

১৬৮। চৈত্র সংক্রান্তি

চড়ক পূজা উপলক্ষে চৈত্র মাসের শেষ কয়দিন যে ধর্মানুষ্ঠান হয় তাহা এ দেশের সর্বসাধারণের একটি বড় উৎসব। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার পৌরোহিত্যে ব্রাহ্মণ ছাড়াও প্রায় সর্বসম্প্রদায়ের লোকেরই হাত আছে। ইহাদিগকে 'সন্ন্যাসী' বা চলিত ভাষায় 'সাঙ্গ' বলে। প্রধান 'সাঙ্গ' বালাগণ নমঃশূদ্র শ্রেণির; ইহারা পাট পূজার যাবতীয় বাংলা মন্ত্র সুর করিয়া গান করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করে, এই নৃত্যকে বালাদিগের খাটুনী বলে। যে ৬/৭ দিন পাট

পূজা চলে, তাহার কয়েকদিন বিভিন্ন গৃহে পাট যায় এবং সেই সব গৃহে পূজা হয়। শেষের পূর্বদিন পাড়ায় পাড়ায় পাট নিয়া যাওয়া হয়, তাহাকে পাড়া সন্ন্যাস বলে। প্রতিদিন বালারা কয়েকটি বিষয়ের শ্লোক বা মন্ত্র গাহিতে বাধ্য, যথা—শিবদুর্গার নিদ্রাভঙ্গ, মুদ্রাগ্রহণ বা চক্র, জয়দেব কৃত দশাবতার শ্লোক ও তাহার বাংলা পদ্যে অনুবাদ ও নবদুর্গার স্তব। ইহা ছাড়া কোন কোন দিন কায়াশুদ্ধি ও পাট আনয়ন, পাটস্নান, পথে মড়া জিয়ান, অগ্নিশুদ্ধি, ধূপশুদ্ধি, চৌসারের বেতশুদ্ধি, লৌহশুদ্ধি, ঢাকঢোল শুদ্ধি, ঢাকের কাঠিশুদ্ধি, শঙ্খ, পুষ্প, ফল, আসন ও ভূতশুদ্ধি, ধূপ চালান, আগুন ভাঙা শ্লোক, বাঁশ নিমন্ত্রণ, হাজরার ভোগ নিবেদন প্রভৃতি মন্ত্র গাইতে হয়। বালাখাটার নানাবিধ তাল আছে। কিন্তু মুদ্রাধারণ বা চক্র গানের সঙ্গে যে নৃত্য করে তাহাই সর্বাপেক্ষা মনোরম। চক্রের শ্লোক নিম্নরূপ :

প্রভু নাবায়ণ নাম ধর, গরুড় বাহনে চড়, খগপতি করি আরোহণ ॥
দক্ষিণে আবর্তনকারী, ডাইন হস্তে শঙ্খ ধরি, যে শঙ্খের শব্দেতে তুষ্ট সর্ব দেবগণ,

হেন শঙ্খ তুলে নিলে করে।
শ্রীজয়দেবে কয়, তুমি হরি দয়াময়, হরি হে এইবার উদ্ধার কর মোরে ॥
প্রভু চক্র লইয়া করে, ত্রিভুবন কাঁপে ডরে, বাসুকীর কাঁপিল পরাণ।
নরসিংহ অবতারে, বধিলেন দৈত্যেশ্বরে, নখাঘাতে নির্জিয়ে পরাণ!

তখন চক্র তুলে নিলে করে!
শ্রীজয়দেবে কয়, তুমি হরি দয়াময়, হরিহে এইবার উদ্ধার কর মোরে ॥
প্রভু গদা লইয়ে করে, ত্রিভুবন কাঁপে ডরে, খগপতির উড়িল পরাণ।
বামন অবতারে, বলিরে ছলিতে হেলে, ত্রিপদ ভূমি নিলে দান ;

তবে গদা তুলে নিলে করে।
শ্রীজয়দেবে কয়, তুমি হরি দয়াময়, হরিহে এইবার উদ্ধার কর মোরে ॥
পদ্মপুরাণে গোসাঞি, পদ্ম সৃজিলে হে, অলঙ্ঘ্য সাগবে সেতু বন্ধ।

রামচন্দ্র অবতারে, রাবণ বধিলে করে, করেতে লইয়া কোদণ্ড।
আরো শ্রীকৃষ্ণ অবতারে, ঝাঁপ দিলে কালিন্দী নীরে,

কালবরণ হরি, কালীয় দমন করি, তবে কমল তুলে নিলে করে।
শ্রীজয়দেবে কয়, তুমি হরি দয়াময়, হরিহে এইবার উদ্ধার কর মোরে।

কায়া বা দেহশুদ্ধি শ্লোক শিক্ষাপ্রদ :

প্রথম মাসের কালে পড়ে গেল নীর।
দ্বিতীয় মাসের কালে একাম শরীর ॥
তৃতীয় মাসের কালে রুধিরের গোলা।
চতুর্থ মাসের কালে হাড় মাংস জালা ॥
পঞ্চম মাসের কালে পঞ্চ ফুল ফোটে।
ছয় মাসের কালেতে প্রাণ আসি জোটে ॥

সপ্তম মাসের কালে সাতেশ্বরী কায়।
অষ্টম মাসের কালে মন পবন জোয়ায় ॥
দশম মাসের কালে নবঘন স্থিতি।
দশমাস দশদিনে ভবে পেলাম স্থিতি ॥
জয় জয়কার দিয়ে মা তুলে নিলেন কোলে।
কান্দিয়া আকুল হ'লাম কোথা এলাম বলে ॥ **

পূজার শ্লোক ছাড়া বালাগণ আরও নানাবিধ গান গাহিয়া থাকে। তাহা সাধারণত শিবদুর্গার অথবা রাধাকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধীয় নানাবিধ চিত্তাকর্ষক কাহিনীর পদ্যছন্দে বর্ণন। তাহাই নানাবিধ সুরে বালাগণ গাহিয়া লোকের মনে আনন্দ দান করে। তাহার কয়েকটি উপাখ্যান সর্বপরিচিতি যথা, ভগবতীর জন্ম, শিবের বিবাহ, শঙ্খপড়ান, দুর্গা ও গঙ্গার ঝগড়া, দক্ষযজ্ঞ, গোষ্ঠলীলা, রাই কুটিলার দ্বন্দ্ব, কলঙ্ক ভঞ্জন, মান ভঞ্জন, নৌকা বিলাস প্রভৃতি।

সংক্রান্তির দিন ও তৎপরদিন নানা লোক নানাবিধ সং সাজিয়া বাড়ি বাড়ি নৃত্যগীত করে। এই চড়ক পূজা এদেশের সর্বশ্রেণির লোকের বিশেষ আনন্দের উৎসব। বালকগণ ইহাতে এরূপ আকৃষ্ট হয় যে সংক্রান্তির পরও অনেকদিন তাহারা পাটপূজার অভিনয় করিয়া থাকে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন বৈশাখের প্রথমদিনে উলপুরে মেলা হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগে বিভিন্ন দিনে অন্যান্য অনেক গ্রামেও মেলা হয়।

১৬৯। শারদীয় উৎসব

শারদীয় দুর্গোৎসব বঙ্গদেশের সর্বপ্রধান উৎসব। এইরূপ আনন্দদায়ক ব্যাপক উৎসব ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই, ইহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। প্রায় একমাস পূর্ব হইতে ইহার আয়োজন আরম্ভ হয়। কুম্ভকারগণ যখন প্রথম প্রতিমা গড়িতে আসে তখন হইতে সকলেই দুর্গাপূজার দিন গণিতে থাকে। বালক-বালিকাগণ দুর্গোৎসবের আগমন অনির্বচনীয় আহ্লাদ ও আনন্দের সহিত অপেক্ষা করিতে থাকে। উলপুরে এখন ২০ খানি দুর্গাপূজা হয় ; পরগণার অন্যান্য গ্রামেও ৬/৭ খানা পূজা হয়। এত অধিক পূজা উপযুক্তরূপ ব্যয় বাহুল্য করিয়া সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন করা সম্ভব নহে। লোকেরা স্ব স্ব অবস্থা অনুসারে পূজার আয়োজন করে। তাহাতেই দেশটি পূজার কয়দিন আনন্দে মাতিয়া থাকে। এখন আর পূজার সময়ে গান বাজনার বিশেষ আয়োজন হয় না। বিজয়ার দিন সকল বাড়ির প্রতিমা মোল্লার বিলে নিয়া বিসর্জন দেওয়া হয়। সেখানে অন্যান্য স্থানেরও অনেক প্রতিমা আসে। অনেক বাইচের নৌকাও আসে এবং নৌকায় নৌকায় মেলা মেলে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! বিসর্জনান্তে সকলে কালীবাড়িতে প্রণাম করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। তৎপর পরস্পরের সঙ্গে প্রণাম, অভিবাদন ও আলিঙ্গনাদি হয়। শারদীয় উৎসবের উপসংহারে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। দুর্গোৎসবের মত বৃহৎ আনন্দের ব্যাপারের বিয়োগ সহসা সামলাইতে পারা যাইবে না মনে করিয়াই বোধহয় দুর্গাপূজার অব্যবহিত পরেই লক্ষ্মীপূজার আগমন। ইহা গৃহে গৃহে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

শ্যামাপূজা : সাধারণত যে বাড়িতে দুর্গাপূজা হয় সেই বাড়িতে পরবর্তী অমাবস্যাতে কালীপূজাও হয়। অনেকে দুর্গাপূজা না কবিযা শ্যামাপূজা করে। তাহাদের বাড়িতে শ্যামাপূজার আড়ম্বর বেশি। অমাবস্যার গভীর নিশিথে কালীপূজা হওয়ায় সাধারণত বালক-বালিকাগণ এই পূজার তেমন আনন্দ অনুভব করিতে পারে না। ইহার পূর্বদিনে ভূত চতুর্দশীতে বালকগণ খুব উৎসাহের সহিত দীপমালার ব্যবস্থা করে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া : ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে কোন পূজা নাই। ইহা ভ্রাতা ভগিনীগণের একটি মধুর আনন্দ উৎসব। প্রতি গৃহেই ইহা আনন্দেব সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে।

১৭০। অন্যান্য উৎসব

এদেশে পূর্বোক্ত উৎসবাদি ছাড়াও আরও অনেক ছোটখাট উৎসব আছে। বৈশাখ মাস ভরিয়াই প্রায় গৃহে গৃহে শান্তি স্বস্ত্যয়ন, লক্ষ্মীনারায়ণের অর্চনা ও ভোগ, নারায়ণের সহস্রনাম শ্রবণ প্রভৃতি হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাই ষষ্ঠীতে নতুন বস্ত্র ও বহুবিধ আহার্যের আয়োজন হল। আষাঢ় মাসে নিস্তারিণী একটি পারিবারিক ব্রত ও উৎসব। শ্রাবণ মাসের শেষ দিনে মনসা পূজা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী ও ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন বিশ্বকর্মা পূজা এবং ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রির অনুষ্ঠান হয়। পূর্বে মনসা পূজা ও বিশ্বকর্মা পূজার দিন অনেক বাইচের নৌকা বাহির হইত। বারখাদিয়া গ্রামে বহুকাল হইতে একটি বিশেষ উৎসব চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে ফুলগাছা বলে। চৈত্র মাসের ১৫ তারিখের পর প্রথম শনি বা মঙ্গলবারে ঐ গ্রামের একটি নির্দিষ্ট হিজল গাছের নিচে বহু লোকে মানসিক পূজা দিয়া থাকে। তদুপলক্ষে সেদিন সেখানে মেলা হয় এবং বহু লোকের সমাগম হয়।

১৭১। গীতবাদ্য, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি

এ দেশে সঙ্গীতচর্চা খুব বেশি নাই ; তবে সঙ্গীতপ্রিয়তা নাই একথা বলা চলে না। অভিনয় দর্শনে ও সঙ্গীত শ্রবণে অনেকেরই উৎসাহ আছে।

কীর্তন ও সঙ্কীর্তন : সর্ববিধ গানের মধ্যে সঙ্কীর্তনের এ দেশে খুব চল। সন্ধ্যার পর খোল করতাল লইয়া দশজনে মিলিত হইয়া কীর্তন করা যেমন সহজ ও ব্যয়হীন, তেমনি আনন্দপ্রদ ও ধর্মভাবের সহায়ক। পূর্বকালে সঙ্কীর্তন গানের প্রচলন খুব বেশি ছিল ; প্রতি রাত্রিতেই প্রায় ২/১ বাড়িতে সঙ্কীর্তন হইত। এখনও পল্লীতে পল্লীতে একাধিক সঙ্কীর্তনের দল আছে। এখন সঙ্কীর্তন ও কীর্তনে পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে। কৃষ্ণলীলার কোন অংশ বিশেষ পালার আকারে বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী সহ মনোহরসাহী প্রভৃতি সুরে গান হইলে তাহাকে কীর্তন বা লীলাকীর্তন বলে ; আর সঙ্কীর্তনে শুধু কয়েকটি বাছা গান বিবিধ সুরে উচ্চৈঃস্বরে গীত হইয়া থাকে। ইহাতে সুরের বা গীত নির্বাচনের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। পূর্বোক্ত কীর্তনও এখন দুই রকম হইয়াছে ; এক রকমের পালা পদাবলীতে ও সঙ্গীতে গান হইয়া থাকে, আর দ্বিতীয় প্রকারে যাত্রার ধরনে বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন বালক আসিয়া গান করে। কীর্তনে বহু অবান্তর প্রসঙ্গ থাকে, তাহাতে অনেক সময় ধর্মভাবের ক্রমভঙ্গ ও রসভঙ্গ হয়; কীর্তনের একটি পালা শেষ করিতে অনেক সময় লাগে এবং মূল গায়কের বহু পরিশ্রম হয়। সমস্ত পালাটি একইরকম সুরে গীত হওয়ায় তাহাতে বৈচিত্র্যের আনন্দ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে সঙ্কীর্তনে এসব অসুবিধা নাই, সুনির্বাচিত কয়েকটি ধর্মসঙ্গীত বিভিন্ন সুরে গান হইলে গায়ক কিংবা শ্রোতার কোনরূপ ধৈর্যচ্যুতি বা বৃথা সময়নাশের সম্ভাবনা নাই। কীর্তনের অনেক পালার মধ্যে লৌকিক হিসাবে রুচিবিরুদ্ধ কথাও থাকে, যাহা অনেকের পক্ষেই হিতকর নহে। বিশিষ্ট বৈষ্ণবভক্তগণের মতেও লীলাকীর্তনের প্রকৃত রস ও ভাব গ্রহণ করার মত শিক্ষা এবং প্রস্তুতি অল্প লোকেরই আছে। যাহারা কীর্তনপদাবলীর আধ্যাত্মিক অর্থ ও ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তাহাদের কীর্তন শ্রবণে উপকার হইতে পারে ; কিন্তু অপরের পক্ষে অপকার হইবার আশঙ্কা বেশি।

রামায়ণ : যে কোন মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধের পর তৃতীয় দিনে রামায়ণ গান হইবার প্রথা বহুকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে। বর্ষীয়ান ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার শবের অনুগমনকালেও কখন কখন রামায়ণ গান হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া অন্যান্য উপলক্ষে লোকে

সখ করিয়া রামায়ণ গান দেয়। রামায়ণ গানের মধ্যে কোন গীত নাই। কৃত্তিবাসের পদ্য রচনাই অতি সুমিষ্ট সুরে গীত হয়। পূর্বেকার রামায়ণ গান এই মিষ্ট সুর এবং মনোহর ধূয়ার জন্য সকলেরই ভাল লাগিত। এখন কোন কোন রামায়ণ গায়ক কৃত্তিবাসের রচনার মধ্যে দাশরথি রায়ের পাঁচালী হইতে গীত সন্নিবেশ করিয়া থাকে ; কেহ কেহ কবির ধরনে রামায়ণ গাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতে রামায়ণ গানের মধুরতা বাড়ে নাই, বরং তাহাদের হাতে মূল রামায়ণের মিষ্টত্ব কমিয়াছে।

কবিগান : ব্যয় সাধ্য সঙ্গীতের মধ্যে বহুকাল হইতে কবিগান এদেশের লোকের খুব প্রিয়। বারওয়ারী পূজা কবিগান ব্যতীত হইতে দেখা যায় না। অন্যান্য উপলক্ষেও কবিগান হইয়া থাকে। দুই দলের মধ্যে পরস্পর কথা কাটাকাটি, কবির সরকারদিগের শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও উপস্থিত বক্তৃতাশক্তি লোকের মন আকর্ষণ করে। সাবেক কালের কবিগানে ভোর, গোষ্ঠ, সখীসংবাদ এবং টপ্পাতে পদবিন্যাস এবং শব্দচাতুর্য যথেষ্ট ছিল এবং অনেক গানে ভাবের গভীরতা ছিল; সে জন্য কেবল মাত্র ঢোল ও কাঁসির সাহায্যেও তাহা ভাল লাগিত। দুঃখের বিষয় আধুনিক কবির দলে হারমোনিয়াম, বেহালা প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র প্রচলন হওয়া সত্ত্বেও গানের বাহার নাই। আজ কাল অনেক সরকার ভাল গান রচনায় মনোযোগী নহে। ইহাদের রচনায় পদের মাধুর্য কিংবা প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় বিরল। তাহারা পাঁচালী ও ছড়াতেও কৃতিত্ব দেখাইতে চাহে। সাধারণ শ্রোতার তাহা পছন্দ হইলেও সমঝদার লোকের তাহাতে তৃপ্তি হইতে পারে না। কবির সরকারগণ প্রকৃত কবিত্ব দেখাইবার চেষ্টা করিলে তাহাদের সমধিক আদর হইতে পারে। তাহাদের কবিত্ব শক্তি নাই একথা বলা যায় না, কিন্তু সে বিষয়ে তাহাদের চেষ্টার অভাব। উলপুরে অতীতকালে বহু ভাল ভাল কবির দলের গান হইয়াছে। প্রাচীনগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, গানে গোবিন্দ তাঁতির দলের সমকক্ষ কোন দলই ছিল না। এদেশে আজকাল কংশুরের বরদা সরকারের কবিগানে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমরা তাহার উন্নতি কামনা করি।

জারিগান : জারি মুসলমান গায়কের গান ; কবিগানের অনুরূপ। ইহার দলপতিকে বয়াতি বলে। বয়াতিগণ মুসলমানী শাস্ত্রের উপাখ্যানসমূহ পদ্য ছন্দে গান করে এবং মুসলমানী ও হিন্দু শাস্ত্রের বিষয় লইয়া উভয় পক্ষে পাল্লা করে। ভাল জারিগান হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণিরই প্রিয়। এদেশে যে সব বয়াতির জারিগান হইয়াছে তন্মধ্যে পাগলা কানাই, ইদুবিশ্বাস ও হাকিম চাঁদ শ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে হাকিমচাঁদ সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল, তাহার কবিত্ব শক্তি, সুরের মিষ্টত্ব এবং বচন-চাতুর্য যথেষ্ট ছিল। হিন্দুশাস্ত্রেও তাহার বেশ জ্ঞান ছিল। যশোহর জেলার নবগঙ্গার তীরে তাহার নিবাস ছিল। তাহার নিম্নলিখিত ভগবতী বন্দনা পড়িলে মনে হয় না যে ইহা ভক্ত হিন্দুর রচনা নহে —

ওগো মা গিরিসুতা, শিববনিতা, ভবরানী, ভবানী,
দাসে করে' দয়া মহামায়া, দেহ চরণ তরণি।
আমি শুনেছি মা বেদাগমে, চতুর্মুখে চতুরাননে, পঞ্চমুখে তব স্বামী,
তারা পূজে চরণ দিবা রজনী, আমি সাধন ভজন কিছুই না জানি,
এবার যা কর নিজ গুণে তার মা জগত্তারিণী।

যাত্রা ও থিয়েটার : যাত্রা ও থিয়েটার, গীত বাদ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানের দাবিদার। প্রথম স্থান অধিকার করিবার জন্য যাত্রা ও থিয়েটারের মধ্যে দীর্ঘকাল প্রতিযোগিতা চলিতেছে; উচ্চ শিক্ষিতগণের টান থিয়েটারের প্রতি, কিন্তু আপামর সাধারণ যাত্রার ভক্ত। থিয়েটারের সাজ সজ্জা, রঙ্গমঞ্চ ও দৃশ্যপটাদির পারিপাট্য সত্ত্বেও লোকে যাত্রার প্রতি অনুরক্ত। তাহার প্রধান

কারণ এই যে যাত্রা সঙ্গীতবহুল, থিয়েটারে গীত বাদ্যের অভাব ; এবং সাধারণ লোকে থিয়েটারের অভিনেতাগণের অভিনয় প্রণালীর উৎকর্ষ তেমন উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহা ছাড়া থিয়েটার দেখিবার সুযোগ গ্রাম্য লোকের বেশি ঘটে না, যাত্রাগান তাহারা অনেক শুনিয়া থাকে; যাত্রাগান খাঁটি দেশীয় জিনিস, দেশীয় লোকের মনোবৃত্তির অনুকূল। উলপুরে প্রায় ৪০/৪৫ বৎসর পূর্বে প্রথম একটি সখের থিয়েটার হয়, সে দলের বেশ প্রশংসা হইয়াছিল, কিছুদিন পরে ঐ দল উঠিয়া যায়; তাহার ১০/১২ বৎসর পরে আর একটি সখের থিয়েটার হইয়াছিল, তাহাও ১০/১২ বৎসর বেশ চলিয়াছিল। অধুনা উলপুরে দুইটি সখের থিয়েটারের দল আছে ; তাহারা সাধারণত পূজাবকাশে অভিনয় করিয়া থাকে। এখন প্রধানত উলপুরের দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের উদ্যোগে একটি যাত্রা দল প্রতি বৎসর পূজার সময়ে যাত্রাগান করিয়া থাকে। রাউতখামারের প্রসন্ন ঢালী (পোদ্দার) বহুকাল একটি যাত্রার দল চালাইয়াছিল। পরে রাউতখামারের হরেকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রভৃতির চেষ্টায় আর একটি যাত্রার দল সৃষ্টি হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এদেশে আর কোন যাত্রার দল হয় নাই। কিন্তু শ্রীপঞ্চমীর মেলা, দুর্গাপূজা ও অন্যান্য উপলক্ষে বহু যাত্রাদলের গান উলপুরে হইয়াছে। তাহাদের সকলের বিষয় এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তন্মধ্যে রসিক চক্রবর্তীর দল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। রসিকের দলের গানের মত যাত্রাগান জীবনে আর শুনি নাই; আর শুনিব বলিয়াও আশা নাই। অনেক প্রাচীন লোককেও এই মত প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। ৪০ বৎসর পূর্বে এমন কোন হরিসঙ্কীর্তন বা পারিবারিক উৎসব দেখি নাই যাহাতে রসিকের গান গীত হয় নাই। এখন তাহার রচিত গান বেশি শুনা যায় না, অনেকে তাহার নামও জানে না। কালের এই রূপই গতি! তাহার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা প্রকাশার্থ অবান্তর হইলেও তাহার জীবন কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম ঃ—

রসিকলাল চক্রবর্তীর জন্ম ১২৬৭ সালের ১৭ পৌষ যশোহর জেলার কালীগঞ্জ থানার অধীন রায়গ্রামে। বাল্যে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় রসিক বিশেষ লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। যৌবনে কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করিয়া তিনি সখের পাঁচালীর দল করেন। সেই সময়েই তিনি তবলা ও পাখোয়াজ বাজনা ভালরূপ শিখেন। পরে তৃতীয় ভ্রাতা রামলালের যাত্রার দলে যোগ দেন ; কিছুদিন পরে তাহা উঠিয়া গেল, রসিক কয়েকটি বাছা বাছা সুকণ্ঠ বালক লইয়া 'বালক সঙ্গীতের' দল সৃজন করিলেন। ঐ বালকগণ গৈরিক পোশাক পরিয়া মধুর কীর্তনের সুরে রসিকের রচিত জীবোদ্ধার (নিমাই সন্ন্যাস), ব্রজলীলা ও প্রহ্লাদ চরিত্র প্রভৃতি নানা ছন্দে ও তালে গান করিত। উলপুরে এই বালকসঙ্গীতের গানও হইয়াছে। অল্পদিনের মধ্যেই বালক সঙ্গীত দলের সুখ্যাতি চতুর্দিকে বাহির হওয়ায় রসিক চক্রবর্তী উহাকে পুরাপুরি যাত্রার দলে পরিণত করেন। এই দলে জুড়ীর গান মোটেই ছিল না ; রসিকের অভিনেতা নির্বাচনে এমন নিপুণতা ছিল যে তাহার প্রত্যেক অভিনেতাই স্বীয় ভূমিকার অভিনয় ও গান সুন্দররূপে করিতে পারিত। তাহার দলের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মাতামহী রসিককে পুত্র সম্বোধন করায় সুরেন্দ্র তাহার ধর্ম-ভাগিনেয় হইয়াছিলেন ; রসিক তাহাকে নিজ ভাগিনেয়ের মত জ্ঞান করিতেন। পূর্বোক্ত বালক সঙ্গীতের পালা ছাড়া রসিক চক্রবর্তী নিম্নলিখিত পালা রচনা করিয়াছিলেন—রক্ষেন্দ্র সংহার, মথুরেন্দ্র সংহার (কংসবধ), সীতার পাতালপ্রবেশ, মায়ের ছেলে বা কালকেতু, রুক্মিণী-পরিণয়, মাধবের মধুর লীলা (প্রভাসমিলন), কৃষ্ণলীলা. চৈতন্যলীলা ও বিদেশীবর্জন এবং চণ্ডেপাগল প্রহসন। ১৩০৯ সালে সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের করোনেসন উপলক্ষে এদেশে যে আমোদ উৎসব হইয়াছিল তাহাতে রসিকের বড় দলের ৪ পালা গান হইয়াছিল, শেষ দিন 'মাধবের মধুরলীলা' অভিনয়ে অগণ্য শ্রোতা প্রভাত হইতে ৩ ঘটিয়া পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চল ছিল। তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া নাটোরের

মহারানী তাহাকে রায়গ্রামে ১১৫ বিঘা জমি দান করিয়াছিলেন। রসিক সেখানে সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়া ১৩০৭ সালে ঐ পুষ্করিণীর পারে রাধারানীর মন্দির নির্মাণ করিয়া লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা ও পুষ্করিণী উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

১৩১০ সালে রসিক তাহার বড় দলের সম্পূর্ণ ভার সুরেন্দ্রের উপর দিয়া প্রাথমিক বালক-সঙ্গীতের দলের অনুকরণে 'সাধন সঙ্গীতের' দল গঠন করেন। ইহাতে ৩টি প্রধান ভূমিকা ছিল, গুরু শিষ্য ও ক্ষ্যাপা ; ইহাদের সঙ্গে গেরুয়াধারী ৮জন বালক গান করিত। ১৩১২ সালে প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রসিক তাহার এই ছোট দল লইয়া উলপুরে আসেন। তাহাতে তিনটি পালা গীত হইত, কৃষ্ণলীলা, চৈতন্য লীলা ও বিদেশী বর্জন। ইহাই উলপুরে রসিকের শেষ আনন্দ। ইহার অল্পদিন পরে ১৩১৩ সালের ৭ই বৈশাখ রসিক দেহত্যাগ করেন। রসিকের সঙ্গীত মুক্তাবলী হইতে বাছিয়া দুই একটি ভাল গান পাঠককে উপহার দিবার সাধ্য আমাদের নাই। শেষবার উলপুরে আসিয়া স্থানীয় কালীবাড়িতে দেবীর সম্মুখে তিনি যে গানটি নিজে গাহিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম —

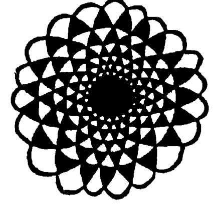
একবার ডাক দেখি মন শ্যামা মাকে মনঃ প্রাণ খুলে।
জয়কালী বলে নেচে নেচে একবার ডাকরে বাহু তুলে ॥
তারে ডাকার মত ডাকতে যে পারে,
কোলে রাখি পালন সদাই করেন মা তারে ;
কালের ভয় তার থাকে না আর, ভাসে না সে অকূলে ॥
কভু পুরুষ, কভু হয় নারী,
বহুরূপী নাই তার মত, যাই বলিহারী,
সাজে কৃষ্ণকালী বৃন্দাবনে, আবার কাত্যায়নী গোকূলে ॥
কখনো তার বিকট আকার,
কখনো মোহিনী সাজে, কভু নিরাকার,
আবার কভুবা শবসাথে ফেরে, কভু বা বিল্বমূলে ॥
তার দীনতারিণী দয়াময়ী নাম,
ওনাম স্মরণে যায় মরণের ভয়, পূরে মনস্কাম :
রসিক, দেবদুর্লভ নাম, ঐ নাম যেন যেয়োনা ভুলে ॥

কথকতা :

কথকতায় সহজে ধর্মকথাশ্রবণ ও পুণ্যলাভের সঙ্গে যথেষ্ট আনন্দপ্রাপ্তি হয়। উলপুরে কথকতা ব্যবসায়ী কোন ব্যক্তি ছিলেন না, এখনও নাই। মৃত পুরোহিত বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী কথকতা শিখিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ ব্যবসা করেন নাই। বহু কথক অনেক বার এখানে কথকতা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কোটালিপাড়ার অন্তর্গত বান্ধল-গ্রাম-নিবাসী রঘুমণি বিদ্যাভূষণ সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে পারদর্শিতা, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় মধুর সঙ্গীত রচনাশক্তি, মিষ্ট ভাষা, সুস্বর প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কথকের সমস্ত গুণ তাহার মধ্যে ছিল। তাহার রচিত গান ও পদাবলী সমূহ এখনও অনেক কথকের মুখে শুনা যায়। তাহার অন্যতম শিষ্য কোটালিপাড়া নিবাসী রাজকুমার চক্রবর্তী প্রসিদ্ধ কথক ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় বহু উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাহার ভ্রাতা বিপিনবিহারীর নামের ভণিতা দিতেন। বাল্যে তাহার কথকতা যেরূপ শুনিয়াছি অদ্যাপি সেরূপ কথকতা আর শুনি নাই। তাহার বহু সঙ্গীত এখনও অনেকেব মনে আছে। তাহার গুরু কথকচূড়ামণি রঘুমণির সর্বপরিচিত শ্রীকৃষ্ণবন্দনা-সঙ্গীতটি

এখানে উদ্ধৃত করিয়া ঐ সঙ্গীতের প্রার্থনাই ভগবৎসকাশে আমাদের প্রার্থনা জানাইয়া এই পুস্তক সমাপ্ত করিলাম :

জয় মুরহর, গিরিবরধর, নবজলধর-কান্তে!
দেহি জনন-মরণ-হরণ-সুখনিধান-পদন্তে ॥
শ্রীরাধাসহিত-নবরসযুত-ললিতগতিরেকান্তে,
বিহর বিহর, নবনটবর, হৃদয় গহনো পান্তে ॥
সদাযুতপাণি-দীন-রঘুমণিরশংত্বয়ি জল্পতিবাণী—
মধম তারণ, বিতর চরণমিহ মম জীবনান্তে ॥



পরিশিষ্ট

(ক) গ্রন্থকারের জীবনী :

দীনবন্ধু রায় চৌধুরি ১৩২৩-২৪ সালে সর্বপ্রথম এই গ্রন্থের জন্য একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। তাহার উপসংহারে তিনি সংক্ষেপে আত্মচরিত লিখিয়া গিয়াছিলেন। তদবলম্বনে তাহার এই জীবন কথা লিখিত হইল।

কৃষ্ণরাম রায়ের প্রপৌত্র রামপ্রাণ বায জ্ঞানবান, ধর্মনিষ্ঠ ও দয়ালু ছিলেন। ধনী না হইলেও তাহার সচ্ছলতার খ্যাতি ছিল, একাধিক প্রজাবাড়িতে ধানের গোলা ছিল এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত দাসদাসী ছিল। তাহার পত্নী অতিশয় সুন্দরী ছিলেন। প্রাচীন বযসেও তাহার এমন রূপ লাবণ্য ছিল যে লোকে তাহাব রূপদর্শনে অবাক হইত। তাহাদের তিন পুত্র ও তিন কন্যা হইয়াছিল। প্রথম কন্যা ; দ্বিতীয় পুত্র শৈশবে মৃত ; তৃতীয় কন্যা , চতুর্থ পুত্র দীনবন্ধু, পঞ্চম পুত্র, যজ্ঞেশ্বর, ষষ্ঠ কন্যা।

১২৫৭ সালের আশ্বিন মাসে সপ্তমী পূজার দিন দীনবন্ধু রায়ের জন্ম হয়। তখন তাহার পিতার বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়াছিল। পিতা ক্রমে ক্রমে সংসারের কার্যে উদাসীন হইয়া ধর্ম-কর্মে মন দেওয়ায় সংসারের যাবতীয় কার্যের ভার তাহার মাতার উপর পতিত হয়। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন ; গোমস্তা ও ভৃত্যাদি তাহার নির্দেশমত কার্য করিত। শৈশবে উলপুরের পাঠশালায় বাংলা পড়া শিখিয়া ১০/১১ বৎসর বয়সে দীনবন্ধু শ্রীপুর গ্রামে জ্যেষ্ঠ ভগিনীর বাড়িতে থাকিয়া শ্রীপুর বঙ্গবিদ্যালয়ে পড়িতে থাকেন। ৩ বৎসর পরে তিনি ঐ স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ৪ টাকা হারে গবর্নমেন্ট বৃত্তি পান। উলপুরের প্রজা-বিদ্রোহে অন্যান্য জমিদারের ন্যায় রামপ্রাণ রায়েরও বিশেষ অর্থ কষ্ট হইয়াছিল। তিনি তখন প্রাচীন হইয়াছিলেন, এজন্য নানা বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি ১২ বৎসর বয়সে দীনবন্ধু রায়ের প্রথম বিবাহ দেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায উত্তীর্ণ হইয়া দীনবন্ধু কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজেব বাংলা বিভাগে ভর্তি হন, কিন্তু শবব্যবচ্ছেদ কার্যে ঘৃণা হওয়ায় উক্ত কলেজ পরিত্যাগ করিয়া, নবীনচন্দ্র রায়ের পরামর্শে, বরিশালে ইংরেজি স্কুলে পাঠ আরম্ভ করেন। কিন্তু পিতাব প্রাচীন অবস্থা এবং সংসারের অভাব দেখিয়া তিনি পড়া ত্যাগ করিয়া কিছুদিন উলপুরের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে হেডপণ্ডিতের কার্য করেন। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি বরিশাল জেলার দেহেরগতি সার্কেল স্কুলের হেডপণ্ডিতের কার্যে নিযুক্ত হন ; কিন্তু এই কার্যে পুনঃ পুনঃ স্থান পরিবর্তন করিতে হয় দেখিয়া কয়েকমাস পরে তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া পুনরায় বরিশালে যাইয়া ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ করিলেন।

১২৭৩ সালে (১৮৬৬ খ্রিঃ অঃ) তিনি মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন বরিশালে ও কিছুদিন বাগেরহাটে মোক্তারি করেন। ইহার ৪ বৎসর পরে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃশ্রাদ্ধের পর তিনি কিছুদিন বাড়িতেই ছিলেন। এই সময়ে রাউতখামারের রামলোচন বিশ্বাস একটি মহোৎসবেব আয়োজন করায় তাহার বাড়িতে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। তাহার শত্রুপক্ষীয় কেহ কেহ ঈর্ষা পরবশ হইয়া এই মহৎ কার্য পণ্ড করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশে এইরূপ সংবাদ জানায় যে রামলোচনের বাড়িতে বে-আইনী জনতা হওয়ায় গুরুতর

শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা ; তাহাতে উৎসবের পূর্বদিন পুলিশ হইতে ঐ জনতা ভঙ্গ করিবার জন্য এবং শান্তি ভঙ্গ না হয় তজ্জন্য মুচলিকা দিবার জন্য আদেশ আসায়, রামলোচন এবং তাহার সহকর্মীগণ নিতান্ত বিপদে পতিত হইয়া অন্য কোন উকিল মোক্তার নিকটে না পাইয়া দীনবন্ধু রায়ের শরণ গ্রহণ করল। ফরিদপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নাকান্দার কুঠিতে বসিয়া এই বিষয়ের বিচার করিবেন বলিয়া আদেশ দিয়াছিলেন। তখন উলপুর হইতে নাকান্দায় যাইতে অনেক জলকাদা পার হইতে হইত। রাউতখামারের ব্যবসায়ীগণ সেইসব স্থানে বড় বড় তক্তা দ্বারা বাঁধাইয়া দেওয়ায় দীনবন্ধু রায় নাকান্দার কুঠীতে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া বলায় আসামীগণ খালাস পায় এবং পরদিন মহোৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। তদবধি মোড়লবংশীয়গণ তাহার বিশেষ অনুরক্ত ছিল। ৪ বৎসর মোক্তারী করিবার পর দীনবন্ধু ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭১ খ্রিঃ অব্দের ২৬ জুলাই তারিখে দ্বিতীয় শ্রেণির উকিলের সনদ পাইয়া বরিশালে ওকালতি আরম্ভ করেন। তাহার ওকালতির প্রথম অবস্থায় বিখ্যাত উকিল উলপুরের নবীনচন্দ্র রায় এবং কাঁচাবালিয়ার বৈকুণ্ঠনাথ বসু তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন ; তিনি কিছুদিন বৈকুণ্ঠবাবুর বাসায় এবং কিছুদিন নবীনবাবুর বাসায় থাকিয়া ওকালতি করিয়াছিলেন, পরে নিজে বাসা করিয়াছিলেন। ইহার ২/৩ বৎসর পর প্রথম স্ত্রীর সন্তানাদি না হওয়াতে তাহার সম্মতিক্রমে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। তাহার প্রথম স্ত্রীর নাম রাজকুমারী এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম প্রমদাসুন্দরী। উকিল হইবার ৭/৮ বৎসর পরে তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। মাতার জীবিতকালে উলপুরের বিষয়সম্পত্তি কিংবা বাড়িঘরের প্রতি তাহার কোনরূপ দৃষ্টি দিতে হয় নাই। কিন্তু মাতার মৃত্যুর পর হইতে তাহার একবার উলপুর, একবার বরিশাল আসা যাওয়া করিতে হইত। তিনি নিজে খুব পরিশ্রমী ছিলেন না এবং শারীরিক অপটুতাও ছিল; এইসব কারণে ক্রমে ক্রমে তাহার ওকালতিতে ঔদাসীন্য হইল। ১০/১২ বৎসর ওকালতি করিবার পর তিনি ওকালতি একরূপ ত্যাগ করিলেন, কোন বৎসর বরিশালে যাইয়া দুইমাস থাকিতেন, কোন বৎসর বা মোটেই যাইতেন না। ১৯০০ খ্রিঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে শেষবার তিনি ওকালতির সনদ গ্রহণ করেন। তাহার বহুপূর্ব হইতে তিনি ওকালতি ব্যবসা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

তাহার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বেশ অধিকার ছিল; ইংরেজি ভাষায় সামান্য জ্ঞান ছিল। তিনি মিষ্টভাষী ও অমায়িক ছিলেন। তাহার প্রথম স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান জন্মে নাই ; দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে প্রথম, কন্যা সরোজবাসিনী. তৎপর তিন পুত্র, সতীন্দ্রনাথ, মণীন্দ্রনাথ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ, তৎপর এক কন্যা, শতদলবাসিনী। তিনি ৩৬/৩৭ বৎসর বয়সে ওকালতি ছাড়িয়া দিয়া শুধু জমিদারির উপর নির্ভর করায় সেই সময়ে তাহার অসচ্ছলভাবে দিনপাত হইয়াছে। তাহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রের নানাবিধ অসুবিধার মধ্যেই লেখাপড়া শিখিতে হইয়াছে। অভাব অভিযোগ সত্ত্বেও তাহার মন সর্বদা প্রফুল্ল ছিল; কাহারও প্রতি তিনি কখন রুষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিতেন না ; সকলের সঙ্গেই মিষ্ট ব্যবহার করিতেন। তাহার ও তাহার পত্নীদ্বয়ের অমায়িক ব্যবহারে তাহারা সকলের প্রীতিভাজন ছিলেন। ধর্মে মতি, সরলতা এবং প্রকৃতির মধুরতার জন্য জ্ঞাতি, প্রতিবেশী ও প্রজা সকলেই তাহাদিগকে ভালবাসিত। গীতবাদ্যে তাহাদের তিনজনেরই খুব উৎসাহ ছিল। তিনি নিজেও গান করিতে পারিতেন ; মধুকানের গান তাহার খুব প্রিয় ছিল ; তাহার দ্বিতীয় স্ত্রীর সুগায়িকা বলিয়া খ্যাতি ছিল।

১৩২৩ সালের ২০ পৌষ বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে স্বামী, পুত্রকন্যা ও ইষ্টদেবের সম্মুখে তাহার দ্বিতীয়া পত্নী প্রমদাসুন্দরী ৫৫ বৎসর বয়সে কলিকাতা নগরীতে গ্রহণীরোগে পরলোকগমন করেন। তিনি জীবনে কোন শোক পান নাই। তাহার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে ১৩২৪ সালের ৫ অগ্রহায়ণ সূর্যাস্তের সময়ে দীনবন্ধু রায় ৬৮ বৎসর বয়সে কলিকাতা

নগরীতে পরলোকগমন করেন। তিনি পত্নীবিয়োগ ভিন্ন অন্য কোন শোক পান নাই। তাহার প্রথমা পত্নী রাজকুমারী তৎপর ৯ বৎসর জীবিত ছিলেন। সপত্নীসন্তানগণের প্রতি তাহার স্নেহ ও সদ্ব্যবহার দেখিলে কেহ মনে করিতে পারিত না যে তাহারা তাহার নিজের সন্তান নহে। তিনি ১৩৩৩ সালের ৬ই আশ্বিন শুক্রবার ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

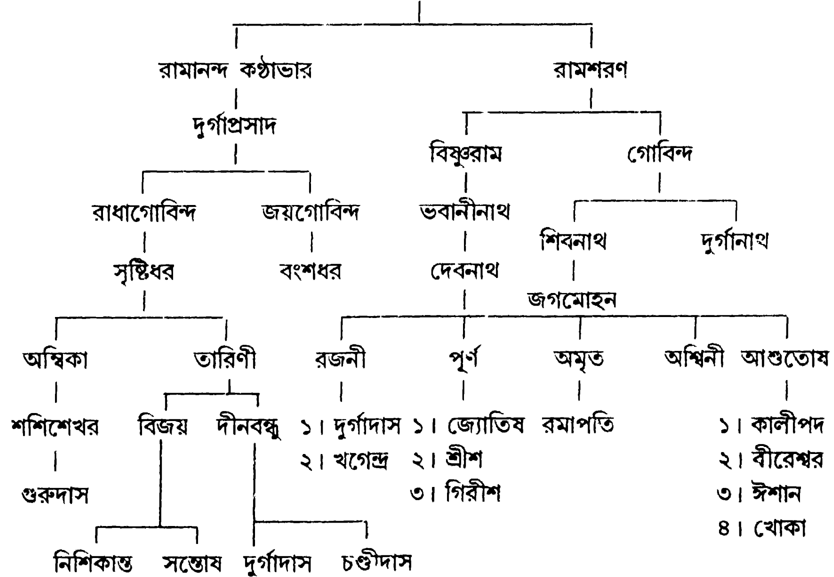
দীনবন্ধু রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীন্দ্রনাথ প্রথমে অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী থাকিয়া, পরে প্রায় ৫ বৎসর আলিপুরে ওকালতি করিয়া ১৯২০ খ্রিঃ অব্দ হইতে হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন। দ্বিতীয় মণীন্দ্রনাথ এম. এ. বি. এল. ২/৩ বৎসর অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া, এক বৎসর ফরিদপুরে ওকালতি করিয়া এখন আলিপুর জজ কোর্টে ওকালতি করিতেছেন। কনিষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বি এ. পর্যন্ত পড়িয়াছেন, সাধারণত বিষয়সম্পত্তি দেখাশুনা করিয়া থাকেন।

খ. সর্ববিদ্যা বংশ

পূর্বস্থলী নিবাসী শ্রোত্রীয় পাকর্ষি বংশীয় বাসুদেব ভট্টাচার্য সিদ্ধিলাভের জন্য কঠোর সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন 'বঙ্গদেশে মেহার গ্রামে জিনবৃক্ষমূলে অর্ধরাত্রিতে শবারোহণ পূর্বক পৌত্ররূপে তুমি আমার দর্শন পাইবে'। বাসুদেব নিজ ভৃত্য পূর্ণানন্দের নিকট স্বপ্নাদেশের কথা ব্যক্ত করিয়া দেহত্যাগ করেন। তাহার পুত্র শম্ভুনাথ, তাহার পুত্র সর্বানন্দ। সর্বানন্দ বাল্যে ও যৌবনে বিদ্যাভাস করেন নাই। তিনি মেহারের দাসবংশীয় রাজার গুরু ছিলেন। একদা উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন অমাবস্যা তিথিতে তিনি রাজসভায় ঐদিন পূর্ণিমা বলায় সকলের উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। গৃহে আগমন করিলে পরিবারস্থ সকলেও তাহাকে এই অজ্ঞতার জন্য ভর্ৎসনা করায় সর্বানন্দ বিদ্যা অর্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তালপত্র সংগ্রহের জন্য একটি তালবৃন্তের উপর ঘসিতে ঘসিতে ছেদন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। নিচে একজন অবধূত সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া সর্বানন্দকে নামিতে বলিলে সর্বানন্দ অবতরণ করিয়া অবধূতকে প্রণাম করিলেন, অবধূতের প্রশ্নের উত্তরে নিজের পূর্ববৃত্তান্ত সমস্ত বিবৃত করিলেন। অবধূত তাহাকে মন্ত্র প্রদান করিয়া তাহার বক্ষে এই কথা লিখিয়া দিলেন যে পৌষ মাসের সংক্রান্তি শুক্রবারে অর্ধরাত্রিতে জিনবৃক্ষমূলে শবারোহণে দেবীব ধ্যানপূর্বক তাহার প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিলে জগন্মাতা প্রসন্ন হইবেন।

পূর্ণানন্দ তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি গৃহে আসিয়া পূর্ণানন্দকে সমস্ত জানাইলেন। পূর্ণানন্দও তাহাকে যথোচিত সাহস প্রদান পূর্বক অর্ধ রাত্রিতে তাহাকে লইয়া পূর্ব নির্দিষ্ট জিনবৃক্ষ মূলে উপস্থিত হইয়া সর্বানন্দকে বলিলেন 'তুমি আমার পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া সন্ন্যাসী প্রদত্ত মূল মন্ত্র জপ করিবে, দেবী যখন তোমাকে বর দিতে চাহিবেন, তুমি বলিবে যে আমার ভৃত্য যে বর চায় তাহাই দিন;' এই কথা বলিয়া পূর্ণানন্দ ভূমিতে শয়ন করিয়া নিজ দেহ আচ্ছাদন পূর্বক যোগবলে দেহ হইতে প্রাণকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অবস্থিত রহিলেন। সর্বানন্দ ঐ শবের পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। গম্ভীর নিশীথে পরম জ্যোতির্ময়ী দেবী মূর্তি তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। সর্বানন্দ তখন শবাসন হইতে উঠিয়া দেবীর স্তব করিলেন। স্তবান্তে সর্বানন্দ বলিলেন এই নিদ্রিত ভৃত্যের ইচ্ছামত বর দিন। দেবী পূর্ণানন্দের মস্তকে পদার্পণ করিয়া তাহাকে জাগ্রত করিয়া বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। তখন পূর্ণানন্দ দেবীর স্তব করিয়া তাহার দশবিধ রূপ দর্শন করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। দেবী তখন তাহাদিগকে একে একে দশমহাবিদ্যারূপ দর্শন করাইলেন। তখন সর্বানন্দ ও পূর্ণানন্দ দশ মহাবিদ্যার প্রত্যেক রূপের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবের শেষে পূর্ণানন্দ বর চাহিলেন যে (১) সর্বানন্দ বংশের ভক্তি যেন দেবী পাদপদ্মে অচলা

থাকে এবং ঐ সিদ্ধমন্ত্র যেন তাহাদের পক্ষে চিরস্থায়ী হয়, (২) সর্বানন্দের যেন সর্ববিদ্যা লাভ হয় এবং সেই রজনীর অবশিষ্টাংশ যেন পূর্ণচন্দ্রেব জ্যোতিতে বিভাসিত হয়। ভগবতী তুষ্ট হইয়া প্রার্থিত বর প্রদানপূর্বক নখচন্দ্র প্রদর্শন করাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। পুরবাসিগণ অমাবস্যা রাত্রির তৃতীয় প্রহরে কলঙ্কহীন চন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইল। সিদ্ধিলাভের কিছুদিন পরে সর্বানন্দ কাশীবাস করিবার জন্য মেহার পরিত্যাগ করেন। ভাগিনেয় ষড়ানন্দ ও ভৃত্য পূর্ণানন্দ তাহার সঙ্গী হইলেন। কাশী যাইবার পথে তিনি খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহাটি গ্রামে কিছুদিন বাস করেন। সেই স্থানের জনৈক ব্রাহ্মণের গৌরী নাম্নী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হয়। সেই স্ত্রীর গর্ভে তাহাব শিবানন্দ নামে একটি পুত্র জন্মে। তৎপর সর্বানন্দ ভাগিনেয় ও ভৃত্য সহ কাশীধামে গমন করেন। কিছুদিন কাশীবাস করিয়া তিনি বদরিকাশ্রমে গমন করেন। কিংবদন্তী আছে যে সর্বানন্দ অদ্যাপি জীবিত আছেন। তাহার প্রথম পক্ষের পুত্র শিবনাথের বংশধরগণ ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও বরিশাল জেলার বিভিন্ন স্থানে বাস করেন। সর্বানন্দের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র শিবানন্দের পুত্র জয়ানন্দ, তাহার পুত্র রতিনাথ। রতিনাথের পুত্র জানকীবল্লভ গুর্বাচার্য সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। জানকীবল্লভের পুত্র রামনাথ গুরুচক্রবর্তী পিতৃবৎ ক্ষমতাশালী সাধক ছিলেন। তাহার চারিপুত্র, — যাদবেন্দ্র তর্কভূষণ, তর্কপঞ্চানন, রাঘবেন্দ্র কবিশেখর ও রঘুদেব বিদ্যাবাগীশ। যাদবেন্দ্র ও মাধবেন্দ্রের বংশধরগণ বেন্দায়, রঘুদেবের বংশধরগণ ঘাটভোগে ও রাঘবেন্দ্রের বংশধরগণ সেনহাটিতে বাস করেন। রাঘবেন্দ্র কবিশেখর পূর্ব পুরুষগণের ন্যায় বিশিষ্ট সাধক ছিলেন। তিনি উলপুরে কৃষ্ণরাম রায়কে দীক্ষা প্রদান করেন। তাহার বংশ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

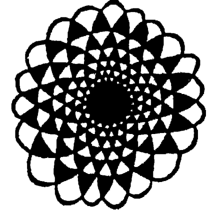


উপরে সর্বানন্দ ঠাকুর সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় লিখিত হইল তাহা সর্বানন্দতরঙ্গিনী হইতে গৃহীত। প্রসিদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রবিদ উডরফ্ সাহেব তাহার শক্তি ও শাক্ত নামক ইংরেজি গ্রন্থে

লিখিয়াছেন যে পৌষ সংক্রান্তিতে শুক্রবার এবং অমাবস্যা তিথি ৬০০ সাল হইতে ১১০০ সালের মধ্যে মাত্র তিনবার সংঘটিত হইয়াছে, ৭৪৮, ৮৩২ ও ৯৫৪ সালে। তাহার মধ্যে ৮৩২ সাল সর্বানন্দের সিদ্ধির বৎসর বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

সর্বানন্দ ঠাকুরের লিখিত সর্বোল্লাস নামক একখানি তন্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তাহার কোন কোন বংশধরের নিকট হস্তলিখিত পুঁথির আকারে আছে বলিয়া শুনা যায়। কথিত আছে তন্ত্রের যাবতীয় বিষয় সর্বানন্দ ঐ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

না না চো খে
ফ রি দ পু র



ফরিদপুর খাট্‌রার বাসুদেব মূর্তি

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

খাট্‌রা ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা মুন্সেফীর অন্তর্গত একটি বিখ্যাত ভদ্র-পল্লী। এই গ্রামের 'বাসুদেব' মূর্তি পূর্ববঙ্গে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি জাগ্রত দেবতা বলিয়া সর্বত্র সুপরিচিত। এই বাসুদেব মূর্তির প্রাচীন ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক এবং বিশেষ আলোচনার যোগ্য, এ প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিতে যাইতেছি।

আমি যেরূপ ভাবে ইহার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাও বাসুদেব ঠাকুরের অনুগ্রহেই বলিতে হইবে। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ বঙ্গবীর কেদাররায়ের জীবন-কাহিনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া তৎসম্পর্কীয় বিবিধ কিংবদন্তী ইত্যাদি সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকায় যখনই কোন পল্লী-বৃদ্ধের সাক্ষাৎ পাইয়াছি তাহার নিকটই কেদাররায় সম্পর্কীয় কোন বিষয় জানিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি, ইহাতে কোন কোন স্থলে সফলকাম হইয়াছি আবার কোন কোন স্থলে, সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াছি। এইরূপভাবে জনৈক কথকতা ব্যবসায়াবলম্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট রায় ভ্রাতৃদ্বয় সম্বন্ধে কিছু জানেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম যে খাট্‌রার বাসুদেব মূর্তি কেদাররায়ের প্রতিষ্ঠিত। এই ক্ষীণ সূত্রাবলম্বনে সংগৃহীত উপাদান হইতেই এ প্রবন্ধ সংকলিত হইল।

এই বাসুদেব মূর্তির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বর্তমান সেবাইতগণ যে দুইটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করেন এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম। তাহারা বলেন "যে (১) মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাসধর্মাবলম্বন করিয়া তাহার মাতুল বিষ্ণুদাস ঠাকুরের সহিত নানা দেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে পূর্বাঞ্চলে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মুগডোবা গ্রামে উপস্থিত হইয়া তথায় জনৈক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ভদ্রলোকের বাড়ি অতিথি হইয়াছিলেন। তথায় রাত্রিতে আহারাদির পরে "মুখশুদ্ধির" জন্য অতিরিক্ত হরিতকি প্রাপ্ত হন। বিষ্ণুদাস ঠাকুর উক্ত হরিতকির কিয়দংশ উত্তরীয়াঞ্চলে সঞ্চিত রাখেন; তদ্দর্শনে গৌরাঙ্গদেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন "মাতুল! আপনার এখনও সঞ্চয়বুদ্ধি দূর হইল না, অতএব আপনি সন্ন্যাসধর্মের অনুপযুক্ত। আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করি না, আপনি এ স্থানেই থাকুন। কিছুকাল পরেই শ্রীবাসুদেব বিগ্রহের বৃত্তান্ত স্বপ্নে অবগত হইয়া উক্ত বিগ্রহ এই স্থানে আনয়ন করিতে পারিবেন। আপনার দুইটি রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে হইবে, ঐশ্বর্যশালী হইয়া, আপনি এ স্থানেই মৃত্যু পর্যন্ত বাস করিবেন। উক্ত বিগ্রহ আনীত হইলে আমি এস্থানে আসিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা কার্য এবং পূজা ও ভোগের নিয়ম নির্ধারণ করিয়া দিব।" গৌরাঙ্গদেব এরূপ বলিয়া মাতুলকে পরিত্যাগপূর্বক চলিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে বিষ্ণুদাস ঠাকুর স্বপ্নে আদিষ্ট হইলেন যে "আমি নবাবের সুবা চাঁদরায় ও কেদাররায়ের দির্ঘিকার মধ্যে অবস্থান করিতেছি, আমাকে শীঘ্র লইয়া যাও।" এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া তৎপর দিবসই বিষ্ণুদাস ঠাকুর বহুলোক সঙ্গে তথায় গমন করতঃ পবিত্র ব্রাহ্মমুহূর্তে দির্ঘিকার এক প্রান্তে অবতরণ করিয়া বাসুদেব মূর্তির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে হস্তদ্বয় প্রসারণ করিবামাত্রই নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে হস্তের উপর বাসুদেবমূর্তি বিরাজমান। চাঁদরায় ও কেদাররায় এই অলৌকিক বিবরণ অবগত হইয়া

উক্ত বিগ্রহের সহিত ঠাকুরকে নিজ বাটীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সপ্তাহকাল আবদ্ধ করিয়া রাখিবার পর রায় ভ্রাতৃদ্বয় স্বপ্নে দেখিলেন যে বাসুদেবঠাকুর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন "আমাকে শীঘ্র মুগডোবা পাঠাও নচেৎ অচিরকাল মধ্যে তোমার বংশনাশ হইবে।" চাঁদরায় ও কেদাররায় স্বপ্নাদেশে ভীত হইয়া বিগ্রহের সহিত বিষ্ণুদাস ঠাকুরকে মুগডোবা পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর বিষ্ণুদাসঠাকুর সপ্তাহকাল মুগডোবায় বাস করিলে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব, পূর্ণানন্দ সরস্বতী ও ব্রহ্মানন্দ গিরি একত্রে উক্ত গ্রামে আসিয়া বাসুদেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার নিয়মাবলী বর্ণন করতঃ উৎকলদেশে প্রস্থান করেন। তদবধি বিষ্ণুদাসঠাকুর যথানিয়মে বিগ্রহের পূজাদি কার্য নির্বাহ করিয়াছেন এবং তাহার বংশধরগণও পূর্ব নিয়মেই পূজাদি কার্য নিষ্পন্ন করিতেছেন।" (২) কিংবদন্তী এই যে এই বাসুদেব বিগ্রহকে ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী 'রামপাল' গ্রাম নিবাসী কেদাররায় ও চাঁদ রায় মহাশয়ের দির্ঘিকাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এখন এই মূর্তিটির ঐতিহাসিক তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করা যাউক। প্রথমোক্ত কিংবদন্তী হইতে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের 'মুগডোবা' আগমনের বিষয় প্রমাণিত হইতেছে। এখন প্রথম জিজ্ঞাসা এই যে চৈতন্যমহাপ্রভু কোন সময়ে পূর্ববঙ্গে আগমন করিয়াছেন? তাহার আবির্ভাব কাল (১৫০২ খ্রিঃ অঃ—১৫৪৬)। অতএব যদি তিনি পূর্বাঞ্চলে আগমন করিয়া থাকেন তাহা হইলে নিশ্চিতই উহা ১৫২৫—৩০ খ্রিঃ অব্দের মধ্যবর্তী সময় বলিতে হইবে। সে সময়ে চাঁদরায় কেদাররায়ের প্রাধান্য ছিল। এরূপ অনুমান করাও বাতুলতা মাত্র। পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীগণের ভ্রমণবিবরণী, আইন-ই-আকবরি, জয়পুর রাজবংশের ইতিহাস ইত্যাদি আলোচনা করিয়া আমরা স্পষ্টই জানিতে পারি যে রায় ভ্রাতৃদ্বয় যোড়শশতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়া সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই কাল-কবলে নিপতিত হন। কেদার রায় মানসিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া ১৬০২ খ্রিঃ অঃ পরলোক গমন করেন। চাঁদরায় তাহার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় চাঁদরায় কেদাররায় বিষ্ণুদাসঠাকুরকে বিগ্রহসহ কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন এরূপ জনপ্রবাদ কোনপ্রকারে ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যে সময়ে মুগডোবা আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে সে সময়ে চাঁদরায় কেদাররায় উভয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে বিপুল সন্দেহ, আর যদি জন্মগ্রহণ করিয়াও থাকেন তাহা হইলে তাহারা যে একান্ত দুগ্ধপোষ্য বালক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আর চাঁদরায় জন্মগ্রহণ করিলেও কেদাররায় যে তখনও ধরণীর আলো দর্শন করেন নাই তাহা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। অতএব মুগডোবার বাসুদেব মূর্তির সহিত চাঁদরায় কেদাররায়ের নাম কালবশে কল্পনা-প্রিয় নরনারীর কর্ণে অনাবশ্যকরূপে সংযোজিত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ইহার মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্যই নিহিত নাই—যাহা আছে তাহা অলীক জন-প্রবাদ মাত্র। এ কিংবদন্তীতে ইহাও প্রকাশ যে কেদারপুর গ্রামের দির্ঘিকা মধ্য হইতে মূর্তিটি পাওয়া গিয়াছিল। এ জন-প্রবাদও আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, কারণ কেদারপুর গ্রামে কেদার রায় যোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাটী নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অদৃষ্ট বৈগুণ্যে তাহার সে বাসনা পূর্ণ হয় নাই। স্তূপীকৃত ইষ্টকরাশি, পরিখা-সংযুক্ত বাটীর চিহ্ন অদ্যাপি সে কাহিনীর ক্ষীণ স্মৃতি বহন করিতেছে। আড়াকুলবাড়িয়া বা শ্রীপুরই তাহাদের প্রাচীন ও প্রকৃত রাজধানী এবং ঐ গ্রামেই তাহাদের পূর্বপুরুষেরা প্রথম আগমন করিয়া বাসবাটী নির্মাণ করিয়া অবস্থান করেন—চাঁদরায় কেদাররায় ও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শ্রীপুরেরই অধিবাসী ছিলেন তাহারা কেদারপুরে কোন দিনই বাস করেন নাই, সবে বাটী নির্মাণ হইতেছিল, অতএব চাঁদরায় কেদাররায় কর্তৃক বিষ্ণুদাসঠাকুরের নিগ্রহ এবং কেদারপুরের দির্ঘিকা হইতে খাট্রার বাসুদেব মূর্তির প্রাপ্তি সংবাদ সম্পূর্ণ অলীক জনপ্রবাদ বলিয়া মনে করি।

দ্বিতীয় কিংবদন্তীর মধ্যেই প্রকৃত সত্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। এই কিংবদন্তী হইতেই প্রকাশ রামপালের দিঘি হইতে মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল অজ্ঞতা-নিবন্ধন রামপালকে কেদাররায় চাঁদরায়ের বাস-পল্লীরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। রামপাল চাঁদরায় কেদাররায়ের রাজধানী নহে, ইহা বল্লালসেন প্রমুখ সেনবংশীয় রাজন্যগণের অধিকৃত সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী। উহা সর্বজনবিদিত, অতএব এই পরস্পর বিদ্বেষী কিংবদন্তী দুইটির আলোচনা দ্বারা স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে যে বিষ্ণুদাসঠাকুরের বংশধবগণ কিরূপ ভাবে কোন সময় এ মূর্তিটি পাওয়া গিয়াছিল তাহার প্রকৃত ইতিহাস জ্ঞাত নহেন, সে জন্যই সামঞ্জস্য বিহীন কিংবদন্তী সমূহের উল্লেখ দ্বারা প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির নয়ন সমক্ষে বিষম প্রমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিষ্ণুমূর্তির পাদপীঠে "ভট্টপুত্র শ্রীপুরন্দর দেবস্য" নামক যে ক্ষুদ্র খোদিত লিপিটি বিদ্যমান আছে, উহা হইতে মূর্তিটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সময় নির্ণয়েব বিশেষ সুবিধা দেখিতে পাইতেছি, এখন তাহারি আলোচনা করিব।

বাসুদেব বিগ্রহ কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত, চতুর্ভুজ, দক্ষিণোর্ধে গদা, দক্ষিণার্ধে পদ্ম, বামোর্ধেঃ চক্র, বামার্ধেঃ শঙ্খ। ইনি লম্বোদব, কটীদেশে কৌপিন, তদুপরি বহির্বাস, কণ্ঠদেশে যজ্ঞোপবীত লম্ববান, শৃগাল-দণ্ডমালা-বনপুষ্প মালা। দক্ষিণে শ্রী---বামে সরস্বতী। চতুর্বিংশতি প্রকার বিষ্ণুমূর্তির পুরাণোক্ত বর্ণনানুযায়ী ইনি ত্রিবিক্রম, উপেন্দ্র এবং বাসুদেব সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। বাসুদেব বিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মান, শতদল-নিম্নে মনুষ্যাকৃতি গরুড় করযোড়ে জানুপাতিয়া উপবিষ্ট। লক্ষ্মী-সরস্বতীব পদ-নিম্নে ভক্ত-যুগল যোড় করে স্তব করিতেছে। প্রত্নতত্ত্বের দিক দিয়াই এই মূর্তিটির প্রধান বিশেষত্ব, কারণ গরুড়ের দক্ষিণে ও বামে একটি খোদিতলিপি দৃষ্ট হয়। গরুড়ের দক্ষিণে "ভট্ট পুত্র শ্রী" পর্যন্ত এবং বাম দিকে 'পু র ন্দ র দেবস্য" এ কয়টি অক্ষর উৎকীর্ণ আছে। এই লিপির দ এবং ব ইহাকে সেনরাজাদিগের সময়ের লিপি বলিয়া ব্যক্ত করিতেছে, কিছু পরবর্তী হওয়াও অসম্ভব নহে। এখন কথা হইতেছে যে এই 'ভট্টপুত্র শ্রীপুরন্দর দেব লোকটি কে? ইনি কি ভাস্কর? না পূজক? কি মূর্তি প্রতিষ্ঠাপয়িতা? এ তিনটির কোনটি? 'দেবস্য' এইরূপ লিখিত থাকায় ভট্টপুত্র শ্রীপুরন্দর দেবকে এ মূর্তির অধিকারী বা প্রতিষ্ঠাপয়িতা রূপে গ্রহণ করিবার সপক্ষেই বিশ্বাস জন্মাইতেছে। অতীতের কুহেলিকাচ্ছন্ন অন্ধকার হইতে কে এই পুণ্ডরীক ঠাকুরের প্রকৃত ইতিহাস আমাদিগকে ব্যক্ত করিবে? পুণ্ডরীক ঠাকুরের প্রকৃত বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিলেই আমাদের সমুদয় সন্দেহ একনিমেষে ভঞ্জন হইতে পারিত। এখন পর্যন্ত আমরা এমন কোন ক্ষীণসূত্রও অবলম্বন করিতে পারি না যাহার সাহায্যে ইহার প্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কৃত হইতে পারে, যে পর্যন্ত না তাহা পাইতেছি সে পর্যন্ত আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই মূক রহিতে হইবে তক্ষণশিল্পের সৌন্দর্যানুভূতিও খোদিত লিপির প্রাচীনত্বের দ্বারা বিচার করিতে গেলে এ মূর্তিটিকে ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দশ শতাব্দীতে অর্থাৎ সেনরাজগণের রাজত্বের শেষ সময়ে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়াই অনুমান হয়। নবম শতাব্দীর পরবর্তীকাল হইতেই ভারতীয় তক্ষণ-শিল্পের ক্রমিক অবনতি পরিলক্ষিত হয়, অতএব কারুকার্য-বিহীন প্রস্তর মূর্তিটিকে কোনরূপেই ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী সময়ের বলিয়া অনুমান করিতে পারি না। কিংবদন্তী ইত্যাদির আলোচনা দ্বারা আমাদের প্রতীতী হইতেছে যে শেযোক্ত জনপ্রবাদটিই ঠিক, রামপালের দির্ঘিকার মধ্যে ইহা প্রাপ্ত হওয়ায় সম্ভাবনা বেশি, পরে কালবশে বিক্রমপুরে প্রাপ্ত বহু প্রাচীন দেবদেবীমূর্তি যেমন নানাস্থানে স্থানান্তরিত হইয়া ক্রমশই বিক্রমপুরের প্রকৃত ইতিহাস সংকলনের প্রধান অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে তদ্রূপ এ বাসুদেব মূর্তিও যে কোন রূপেই হউক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুগডোবা গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়া বিবিধ কিংবদন্তীর সৃষ্টি করিয়া মূল সত্যকে জনশ্রুতি-রাক্ষসীর বিরাট উদরে নিহিত করিয়া ফেলিয়াছে। আমার

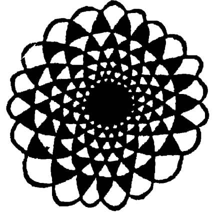
এ মীমাংসা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিবার স্পর্ধা রাখি না, কারণ এ মূর্তি কাহার, কত কালের, ইহার সহিত এদেশের ইতিহাসের কিরূপ সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ের কাল্পনিক আলোচনা দ্বারা ভবিষ্যৎ লেখকগণের সমালোচনা ক্রম বাড়াইয়া তোলা হয় মাত্র, এ নিমিত্ত অধিক বাক্য ব্যয় দ্বারা পাঠকবর্গকে ভারাক্রান্ত করিবার অতি সাহস হইতে সভয়ে দূরে রহিলাম। যদি কোন দিন কোন যোগ্যতর ব্যক্তি এই ক্ষীণ সূত্রটুকু অবলম্বন করিয়া প্রকৃত সত্য আবিষ্কারে সমর্থ হ'ন তদুদ্দেশ্যেই আমার এ প্রবন্ধেব অবতারণা।

বাসুদেবঠাকুর জাগ্রত দেবতা বলিয়া পূর্বাঙ্গে ইহার সর্বত্রখ্যাতি বিদ্যমান। ১২৭৮-৭৯ সনে ভাঙায় বাসুদেবের পালা লইয়া সেবাইতদের মোকদ্দমা হয়। মুগ্‌ডোবা হইতে খাট্‌রার আগত সরিকগণ ওই মোকদ্দমা করেন, এ মোকদ্দমার শেষ মীমাংসা হাইকোর্ট হইতে সম্পাদিত হইয়াছিল।

..

পল্লীর নিভৃত গহনে লোকচক্ষুর অন্তরালে কত ঐতিহাসিক সত্য—কত ঐতিহাসিক উপাদান এমনি করিয়াই আমাদের আলস্যে ও ঔদাসীন্যে চিরলুপ্ত রহিতেছে কে তাহার সন্ধান রাখে?

মানসী ১৩১৮ অগ্রহায়ণ



পূর্ব বাংলার অতীত সম্পদ

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ফরিদপুর জেলার রুদ্রকব একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এ গ্রামের জমিদাররা বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন, এখনও আছেন। মাদারিপুর মহকুমা হইতে রুদ্রকরের দূরত্ব পনের মাইল মাত্র। গ্রামখানি দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল এবং প্রস্থে তিন মাইল। গ্রামের উত্তর দিকে পণ্ডিতপ্রধান ধানুকা, আমতলি, কাগদী প্রভৃতি গ্রাম, পূর্ব সীমা মাক্‌সহর, পশ্চিমে মধ্যপাড়া ও মনোহর রায়ের বাজার এবং দক্ষিণে কালীগঙ্গা নদীর খাত—এক সময়ে এই কালীগঙ্গা নদী ছিল রুদ্রকর পল্লীর প্রান্তবাহিনী। এখন ইহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এ গ্রামে এক সময়ে লোকসংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারের উপর।

রুদ্রকর গ্রামের বিশেষত্ব ছিল অনেক, তন্মধ্যে বহু বড় বড় দিঘি এবং মন্দির ও দেবায়তন ছিল। হাট-বাজারের মধ্যে আঙ্গারিয়ার বাজার এবং মনোহর রায়ের বাজার বেশ নাম-করা। রুদ্রকরেও প্রতিদিন বাজার বসে। গ্রাম-প্রধানেরা স্থানীয় জমিদার চিন্তাহবণ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি উহার প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

ব্রাহ্মণ-সমাজে রুদ্রকরের জমিদারবংশ বিখ্যাত। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল বহুরূপ পণ্ডিত। কথিত আছে, রাজা বল্লালসেন তাহাকে চট্টোপাধ্যায় উপাধি দিয়াছিলেন। রুদ্রকরের জমিদার বংশীয়েরা পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ সমাজের নেতা এবং বিশেষ সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। এ গ্রামের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। বাংলার কুলীন সম্প্রদায়ের ইতিহাসেব সহিত ইহাদের ইতিহাস বিজড়িত রহিয়াছে। বাংলার অন্যতম বারোভূঁইয়া চাঁদ রায় কেদার রায়ের সময় হইতেই ইহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি চলিয়া আসিতেছে। তাহাদের বাড়ি বা অতিথিশালা হইতে কোনদিন কোন অতিথি ফিরিয়া যায় নাই

এক সময়ে ঢাকা বিভাগে চক্রবর্তী পরিবার একান্নবর্তী পরিবার হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন—এক পরিবারভুক্ত ছিলেন ৮৫০ শত জন, পুরুষ ও নারী। সাতটি তরফে বিভক্ত এই পরিবারের প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর উপর বিভিন্ন বিভিন্ন রূপ কাজের ভার অর্পিত ছিল। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তাহাদের বিশেষ উৎসাহ ছিল। তাহাদের প্রতিষ্ঠাপিত চতুষ্পাঠীতে বাংলার নানাস্থান হইতে ছাত্রেরা অধ্যয়ন করিতে আসিত। পরিবারের প্রত্যেক মহিলা, গৃহিণী, বধূ ও কন্যাদের উপর সমুদয় সাংসারিক কার্যভার ন্যস্ত ছিল। এত বড় বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের রন্ধন, পরিবেশন, অতিথি সেবা, ঠাকুর সেবার কার্য, রোগী ও আর্তজনের সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব—বয়স ও কর্মক্ষমতার অনুযায়ী গৃহিণী, বধূ ও কন্যারা সমাপন করিতেন। একজনও পাচক ব্রাহ্মণ ছিল না। প্রত্যেক তরফে ১৫০ জন পুরুষ, নারী ও শিশু হিসাবে সাত তরফে প্রায় ৮৫০ জনের আহারাদির ছিল ব্যবস্থা। পারিবারিক সর্ববিধ কার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সেজন্য পরিবারের একজন কর্মদক্ষ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাধারণ ম্যানেজার বা কর্মকর্তা নিযুক্ত হইতেন। তাহার উপর জমিদারি পরিচালনা, পারিবারিক সমুদয় কর্তব্য, ভরণপোষণ, পূজা-পার্বণ, দান-দক্ষিণা সমুদয়ই নির্বাহের দায়িত্ব থাকিত এবং তাহার পরিচালনাধীনে সম্পন্ন হইত।

প্রথমে যে বহুরূপ চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলিয়াছি তিনি বল্লাল সেনের সভায় একজন

পণ্ডিত এবং কুলীন ছিলেন। বহুরূপ চট্টোপাধ্যায়ের অধস্তন দশম পুরুষ ছিলেন রবিকর চট্টোপাধ্যায়—রবিকর হইতে এই পরিবারের বংশধরেরা 'রবিকার' নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন বিখ্যাত দেবীবর ঘটকের সমসাময়িক। এই দেবীবর ঘটকই ব্রাহ্মণ কুলীন সম্প্রদায়ের মধ্যে মেল বন্ধন করেন। তিনি ৩৬টি মেল-বন্ধন করেন। রুদ্রকর পরিবার সর্বানন্দী মেলের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা সামবেদী এবং রাঢ়ের প্রাচীন অধিবাসী বলিয়া রাঢ়ি শ্রেণির ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে পরিচিত।

রবিকর হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ গোবিন্দপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বারোভুঁইয়ার শ্রেষ্ঠ বীর বিক্রমপুরের চাঁদ রায় কেদার রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন। বৈদিক পণ্ডিতরূপে তাহার খুবই খ্যাতি ছিল। চাঁদ রায় ও কেদার রায় তাহার পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে 'কুলরাজ চক্রবর্তী' উপাধি ভূষণে ভূষিত করেন। এই 'কুলরাজ' চক্রবর্তী উপাধি তদবধি এই বংশে চলিয়া আসিতেছে। বারোভুঁইয়ার চাঁদ রায় ও কেদার রায় গোবিন্দপ্রসাদকে একটি পরগণা উৎসর্গ করেন। তাহার নাম অনুসারে সেই পরগণা, পরগণা গোবিন্দপুর নামে পরিচিত। এই গোবিন্দপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ই রুদ্রকর জমিদার পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি 'অগ্নিহোত্র' যজ্ঞ করিয়া সর্বত্র খ্যাতিমান হইয়াছিলেন। পরগণা গোবিন্দপুরের কালেক্টরীতে কোন তৌজী নম্বর নাই। পরে গোবিন্দপুর পরগণা বহু অংশে বিভক্ত হয় এবং উহার একটি স্বতন্ত্র তৌজী নম্বর হইয়াছিল।

গোবিন্দপ্রসাদ বাংলাদেশে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচলনের জন্য চতুষ্পাঠি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা ও অধ্যযন ও অধ্যাপনার জন্য এত প্রসিদ্ধি লাভ করে যে নানা দেশ-বিদেশ হইতে সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, জ্যোতিষ প্রভৃতি অধ্যয়নানুরাগী ছাত্রেরা রুদ্রকর আসিতেন। সে সময়ে রুদ্রকর পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। এই গোবিন্দপ্রসাদ কুলীন সন্তানের বহুবিবাহ নিবারণের পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার সময়ে কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১০১০ বাংলা সনে (ইংরাজি—১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে) তাহার মৃত্যু হয়। গোবিন্দপ্রসাদ যে চাঁদ রায় কেদার রায়ের সমসাময়িক ছিলেন তাহা তাহার মৃত্যু তারিখ হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

এ বংশের পরবর্তী খ্যাতিমান ব্যক্তিদের মধ্যে নীলমণি কুলরাজ চক্রবর্তী—বাংলা ১১২৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ তখন, দধিরাম পাল নামক একজন দুর্দান্ত ডাকাতের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়াছিলেন, সে সময়ে পর্তুগিজ দস্যু এবং আরাকানি মগদের লুণ্ঠন, নরহত্যায় বিবিধ উৎপীড়নে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। সেই দুর্দিনে নীলমণি কুলরাজ ডাকাত দধিরাম পাল, পর্তুগিজ ফিরিঙ্গি দস্যু, মগ ও চাটগায়ের নিম্নশ্রেণির মুসলমানদের দমন করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। নিজেও তিনি ডাকাত নিধিরামের হস্তে বন্দি হইয়াছিলেন—কিন্তু একসপ্তাহ পবে একজন ভৃত্যের কৌশল ও চতুরতায় মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনি। মুক্তিপ্রাপ্তির পর নীলমণি কয়েকবার ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। কালীগঙ্গা নদীর দশ মাইল দূরে ডাকাত দধিরাম ও তাহার সহচর ফিরিঙ্গি দস্যু, মগ দস্যুর সঙ্গে যুদ্ধে নীলমণি বিজয়ী হইলেন এবং দেশের ডাকাতি নিবারণ করেন। ১২১৫ বাংলা সনে নব্বুই বৎসর বয়সে নীলমণির মৃত্যু হয়, তাহার সাধ্বী স্ত্রী গঙ্গামণি দেবী সহমরণে গিয়াছিলেন।

নীলমণির সমসাময়িক আত্মীয় ছিলেন—রাজদুর্লভ ও মুরহর চক্রবর্তী। একটি বৃহৎ দিঘি এবং দুইটি প্রাচীন মন্দির এই পরিবারের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। রাজদুর্লভের পুত্র কৃষ্ণকান্তের তরুণ বয়সে মৃত্যু হইলে, তাহার পত্নী দীনময়ী দেবীও সহমরণে গিয়াছিলেন।

নীলমণি কুলরাজ চক্রবর্তীর ছয় পুত্র, পিতার মৃত্যুতে দানসাগর শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করেন এবং প্রত্যেক পুত্রই নিজ নিজ নামে দিঘি খনন করাইয়াছিলেন। রাজচন্দ্র, তিলকচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, জয়চন্দ্র প্রভৃতি সকলেই কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন। শম্ভুচন্দ্র ও জয়চন্দ্র 'তুলাপঞ্চাগ্নি' নামক যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করেন। শম্ভুচন্দ্রের চারিপুত্রের মধ্যে কৃষ্ণকান্ত বরিশালের একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন—উমাকান্ত একজন বিখ্যাত সংস্কৃত শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত ছিলেন। জয়চন্দ্রের পুত্রগণও তাহাদের মাতার স্বর্গারোহণের পর-—১৩২০ সালে দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন।

তিলকচন্দ্রের তিনপুত্র গুরুচরণ, শশীভূষণ এবং বৈকুণ্ঠচন্দ্র এবং রাজচন্দ্রের একমাত্র পুত্র অভয়াচরণ সকলেই পূর্বপুরুষের কীর্তি ও গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কেবল যে ধর্মানুষ্ঠান পূজাপার্বণে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তাহা নহে—ইহারা জনসাধারণের কল্যাণের জন্য যাতায়াতের সুযোগ ও সুবিধার্থ পথঘাট নির্মাণ, খাল কাটানো ও উহার সংস্কার, চিকিৎসালয়, ডাকঘর প্রভৃতি স্থাপন করিয়া জনকল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন।

মাতা রাসমণি দেবীর দানসাগর শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। তাহাদের নির্মিত নবরত্ন মন্দির ঐ অঞ্চলের সর্বোচ্চ মঠ ও মন্দির মাতার ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চিতাভস্মের উপর নির্মিত হইয়াছে। ইহাদেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ কাশীমণি দেবীর চিতার উপরও তাহারা একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রায় ত্রিশ হাজার লোককে ভূরিভোজন করান হইয়াছিল। শশীবাবু ও বৈকুণ্ঠবাবু তৎকালে পূর্ববাংলার ব্রাহ্মণ সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

মাদারিপুর অঞ্চল ইংরাজ রাজত্বের সময়েও দুর্দান্ত ডাকাতদের জন্য অতি ভয়াবহ স্থান ছিল—নিম্নশ্রেণির হিন্দু ও মুসলমানদের ব্যবসায়ই ছিল ডাকাতি। ইহারা নির্ভয়ে সর্বত্র ডাকাতি করিয়া বেড়াইত। নির্যাতিত পল্লীর অধিবাসীদের অনুরোধে শশীবাবু ডাকাতদের দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন—অনুরোধ উপরোধে কোন ফলই হইল না দেখিয়া অবশেষে তিনি বলপ্রয়োগে ডাকাতি দমন করেন। একবার বাসপল্লী রুদ্রকর হইতে মাদারিপুর যাইতেছেন—আরিয়ল খাঁ নদীতে প্রবেশ করিলে পর ডাকাতদল তাহার নৌকা আক্রমণ করিল। নিরুপায় শশীবাবু নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নদী সাতরাইয়া পার হইয়া কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে তাহার বিশ্বস্ত ভৃত্য জিনাতুল্লার সাহায্যে ডাকাতদের ধরিতে পরিয়াছিলেন। তাহার অক্লান্ত শ্রম উদ্যোগে বহু ডাকাত ধৃত হইয়া রাজদ্বারে যথোপযুক্ত দণ্ড পাইয়াছিল। এই প্রচেষ্টার পর ঐ অঞ্চল হইতে দস্যুভীতি বিদূরিত হইয়াছিল।

কুলীন কুমারীগণের শোচনীয় দুরবস্থার কথা ছিল ব্রাহ্মণ সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ। কৌলীন্য প্রথার কুৎসিত আচরণে বহু কুলীন কন্যা আজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া 'যমবরণ' নামে অভিহিত হইত। যে বীভৎস পাশবিক অনুষ্ঠানে চল্লিশ পঞ্চাশ জন রমণী একটি বাস্তুভিটা-পরিশূন্য অশীতিপর বৃদ্ধের গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিতে বাধ্য হইত, সে সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। কবি হেমচন্দ্র গাহিয়াছিলেন ঃ

দেখরে নিষ্ঠুর হাতে লয়ে মালা
কুলীন সধবা অনূঢ়া অবলা
আছে পথ চেয়ে পতির উদ্দেশে,
অসংখ্য রমণী পাগলিনী বেশে
কেহবা করিছে বরমাল্য দান
মুমূর্ষুর গলে হয়ে ম্রিয়মান
নয়নে মুছিয়া গলিত বারি।

বিক্রমপুরের এক দীন ব্রাহ্মণ কুলীন-সন্তান রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় সমাজের এই জঘন্য

প্রথা দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি শহরে ও গ্রামে গ্রামে গাহিয়া এই প্রথা নিবারণের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। আমরা এখানে তাহার রচিত একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিলাম, উহা পাঠ করিলেই সে কালের কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন ঃ

বহুদিন পরে এসেছি চিনিনা শ্বশুরবাড়ি।
কোন্ পথে যাইব মাগো বিশ্বনাথ বাড়িটীর বাড়ি।
যারা ছিল ছেলে-পিলে, তাদের হ'ল ছেলে-পিলে,
বিয়ে ক'রে গেলাম ফেলে, বয়ে গেল বছর কুড়ি!
বাড়ি ঘর তার নাহি চিনি, কেবল শ্বশুরের নামটি জানি,
উত্তরেতে বাগানখানি, সুপারি সব সারি সারি।।
দ্বিজ রাসবিহারী বলে, আর ত হাসি রাখতে নারি।
তুমি যারে মা বলিলে সে বটে তোমারি নারি।।

বাংলা ১২৮৩ সনে শশীবাবু প্রভৃতি যখন মাতার দানসাগর শ্রাদ্ধ করেন, সে সময়ে কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড় এবং ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে এবং বাংলার বিখ্যাত পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন—সে সময়ে বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে কুলীন সন্তানগণের বহুবিবাহ-নিবারণ, বরপণ ও কন্যাপণ নিবারণ, মেল পর্যায় ভঙ্গ করিয়া বহু বিবাহ বিলোপ করিবার জন্য সভায় বহু প্রস্তাব গৃহীত এবং পণ্ডিতগণের অভিমত গ্রহণ করা হয়। শশীবাবু ঐ সভার নেতৃত্ব করেন। যদিও সেদিনকার সেই সভায় কোন মীমাংসা হয় নাই—তবে যুগধর্মের প্রভাবে, সমাজ হইতে যে সেই কুপ্রথা সেই সব আন্দোলনের ফলে দূর হইয়াছে, আজ আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

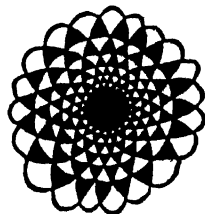
সেকালে বিবাহ-ফেরতদের সমাজ-চ্যুত হইতে হইত, শশীবাবু গোঁড়া হিন্দু হইলেও শিক্ষার উদ্দেশ্যে যাহারা বিলাত গমন করিয়াছে কিংবা ইউরোপের অন্যত্র গিয়াছে, তাহাদিগকে সমাজে সমাদরের সহিত গ্রহণ করা কর্তব্য—এই মত পোষণ করিতেন। অবশ্য শাস্ত্রানুমোদিত প্রায়শ্চিত্ত বিধান দ্বারা। তিনি নমশূদ্রদের মধ্য হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য প্রয়াসী ছিলেন—হিন্দু সমাজ হইতে তাহারা বিচ্যুত হইয়া মুসলমান বা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করিলে সমাজের পক্ষে অকল্যাণজনক, একথা ভাবিয়া তিনি তাহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

পূর্ববঙ্গে—মুমূর্ষু ব্যক্তিদের মৃত্যুকালে ঘর হইতে একরূপ টানিয়া হিঁচড়াইয়া বাহিরে আনার রীতি ছিল, এখনও আছে। একান্ত নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, মুমূর্ষুর সেই ক্লেশদায়ক অবস্থা হইতে নিবৃত্ত করিতে তিনি অনেকটা কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

শশীবাবুর মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠবাবুও আর একবার—জয়কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আগত পণ্ডিত সভায় বহু বিবাহ প্রথা নিবারণ, বরপণ ও কন্যাপণ নিবারণ, বিলাত ফেরতদের সমাজে গ্রহণ প্রভৃতি বিবিধ সমাজ সংস্কার কাজে তিনি নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে ব্রতী হইয়াছিলেন, কোন কোন স্থলে কৃতকার্য হইয়াছেন, কোথাও হন নাই, তাহা পরবর্তীকালে আপনা হইতেই হইতেছে।

একবার হেমন্তের এক রাত্রিতে আমি রুদ্রকর চক্রবর্তীর বাড়ি গিয়াছিলাম, তাহাদের নিকট হইতে—ঐ অঞ্চলের ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিতে। আমি যে সহানুভূতি ও সাদর অভ্যর্থনা পাইয়াছিলাম আজিও আমি তাহা ভুলিতে পারি নাই। এখন এই প্রতিপত্তিশালী রুদ্রকর জমিদার বংশের কর্তৃপক্ষীয়েরা কে কোথায় আছেন তাহাও জানি না। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ইতিকথা, লুপ্ত মঠ, মন্দির ও মূর্তির বিবরণ এখন সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা ঐতিহাসিকদের প্রধানতম কর্তব্য হইতেছে। *ভারতবর্ষ ১৩৬১ আশ্বিন*

নলিয়া ঃ ফরিদপুরের একটি পুরাতন গ্রাম



অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন ও সমৃদ্ধ গ্রামের জীবনধারা থেকে বাংলাদেশের পল্লীজীবন-প্রবাহ বুঝবার উদ্দেশ্যেই ফরিদপুর জেলার বালিয়াকান্দি থানার অন্তর্গত নলিয়া গ্রামটিকে খাড়া করেছি। এ অঞ্চলে রাজা সীতারামের আসবার পূর্বে নলিয়া জঙ্গল ও নলবন দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। উত্তর দিকের রাজত্ব সুদৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে, এই নদীবহুল ছোট গ্রামটি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, যাকে তিনি একটি সমৃদ্ধ নগরে পরিণত করেছিলেন। তাঁর সময়ের কীর্তির মধ্যে কোন মতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে জয়দুর্গা, শ্যামরায়, গোবিন্দরায় ও শিবের মন্দিরটি। মন্দিরগুলির চারিদিকে বেষ্টিত প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত ছবি ও অন্যান্য বহু মন্দির আজ আর নেই, সেখানে শুধু দেখতে পাই বিরাট ভগ্নস্তূপ, তার উপর ছোট বড় বহু বটগাছ। এই সব মন্দিরের কারুকার্য, ইট খোদাই করা মূর্তি, সবই গ্রামের কুমারেরা করেছিল। এখনও এদের বংশধরেরা বেঁচে আছে। রাজা সীতারামের প্রধান কীর্তি জয়দুর্গার মন্দিরকেই 'জোড়া বাংলা' বলা হয়। সামনের রোয়াক দিয়ে প্রবেশপথ অতিক্রম করলেই বারান্দা। এই বারান্দাটাই জোড় বাংলার একটি বাংলা। তারপরেই মন্দিরাভ্যন্তরের প্রবেশদ্বার। দ্বারের উপরের প্রাচীরেও নানা কারুকার্য। মন্দিরের মধ্যে বেদীর উপরে সিংহারূঢ়া মহিষাসুরবধোদ্যতা জয়দুর্গার মূর্তি ও অন্যান্য মূর্তি। এর দক্ষিণেই গোবিন্দরাযের 'খলাট'।

এছাড়া একটি সবচেয়ে উঁচু শিবের মন্দির আছে, কিন্তু তাকে যেভাবে বটগাছে ঢেকে ফেলেছে তাতে তার আর বেশি দিন উঁচু হয়ে থাকতে হবে না। মন্দিরটির গায়ে মহাবীর, দশ অবতার ইত্যাদি বহু খোদাই করা মূর্তি আছে. এ সব বিগ্রহ ও মূর্তি ভিন্ন কাঠের বৈরাগী, বোষ্টমী, মাটির দয়াময়ী ও কাঠের কালাচান্দই সমধিক প্রসিদ্ধ। বৈরাগী জোড়াসন হয়ে মালা জপছে, গলায় মালা; মাথার চুল বেণী করে মাথার উপরে বাঁধা। পাশে লজ্জাজড়িত নয়নে দাঁড়িয়ে আছে তার বোষ্টমী ছোট একটি ছেলে কোলে করে। ছেলেটি এক হাতে মায়ের একটি স্তন ধরে আছে ভয়—পাছে কেউ কেড়ে নেয়। দিঘির দক্ষিণ পারে দয়াময়ীর ঘর। এখানে বসে মেয়েরা গান করে,—

"কালীঘাটের কালা গো মা কৈলাসের ভবানী
বৃন্দাবনের রাধাপ্যাবী, গোকুলের গোপিনী
গো মা বসন পব

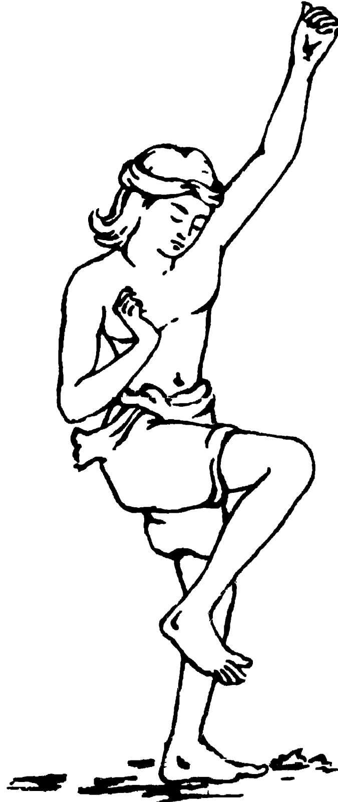
*   *   *   *   *

দক্ষিণে চলিছ মা গো ওমা হইয়া দিগম্বরা
কার মানব জনম সফল ক'রলে গো মা
হয়ে দশভুজা , গো মা বসন পর।

*   *   *   *   *

এমা ঘাটে ঘাটে করি পূজা পুষ্প উজান ধায়
সঙ্কটে পড়েছি মা গো, মোদের রক্ষা করতে হয়
গো মা বসন পর।"

যখন দোল আসত তখন গ্রামের মেয়েরা শ্যামরায়, গোবিন্দরায় ইত্যাদি ঠাকুরদের বরণ করে 'গস্তে' পাঠিয়ে দিতেন। 'গস্তে'র চারখানা পাল্কীর মধ্যে মাত্র একখানা আছে। চৈত্র মাসে নলিয়ায় কালাচাঁদেরই অনুরূপ পাঠ ঠাকুরপূজা হয়। সাধারণ চড়কপূজা থেকে পার্থক্য এই যে এ পূজার আয়োজন সাত দিন পূর্ব থেকেই আরম্ভ হয় ও সে উপলক্ষে প্রচুর পরিমাণে নৃত্যগীত হয়ে থাকে। এক একটি দলে একজন করে কর্তা থাকে, তাকে বলা হয় 'বালা'। এই সাতদিন ধরে নৃত্যগীত করে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন পাঠ পূজা শেষ হয়। লোকনৃত্যের আবিষ্কারক, শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এই "চড়ক গম্ভীরা দল" সিউড়ী এক্‌জিবিশন এবং সম্প্রতি গল্‌ষ্টন পার্কের উৎসবে নিয়ে এসেছিলেন। দত্ত মহাশয় এই নৃত্যের আখ্যা দিয়েছেন ধর্মনৃত্য (Religious Dance and Songs)। 'দশ অবতার', 'জ্বালা ধপ', 'ফুল সন্ন্যাস', 'শ্লোক', 'চালান' এবং 'বায়েল' নৃত্যই এই পূজায় সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রথম দিন একদল জয়দুর্গার মন্দিরে আর একদল গ্রামের উত্তরে 'হরিঠাকুর' বাড়িতে দশ অবতার নৃত্য ক'রে থাকে। 'বালা' এবং তার শিষ্যেরা সার বেঁধে ধুনুচি সামনে রেখে বন্দনা ক'রে নৃত্য করতে থাকে। বালা শ্লোকগুলি বলে ভঙ্গিগুলি দেখিয়ে দেওয়ার পর শিষ্যেরা ঢাকের তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করে। তারপর বালা গান গেয়ে 'দশ অবতারে'র বিভিন্ন দশটি ভঙ্গী নৃত্যে দেখিয়ে দেয়। 'দশ অবতার' বলার পূর্বে ধুনুচি সামনে রেখেই বালা ব'লে ওঠে—



"দশ অবতার নৃত্য"—রাম অবতার

"ভানুরাম কুমোরেরা সাতে পাঁচে ভাই
মাউখানি ছেনিযে করলেন এক ঠাঁই
মাউখানি ছেনিয়ে তুলে দিলেন চাকে
সুবর্ণ ধুপতি হ'ল আড়াইটি পাকে
রবি দিলেন শুকিয়ে ব্রহ্মা দিলেন পুড়িয়ে
গুরু দিলেন বর
আজ এই ধুপতি শুদ্ধ কর ভোলা মহেশ্বর।"

শ্লোকটি ব'লেই বালা ও শিষ্যেরা এই ভাবটি ফুটিয়ে তুলবে নৃত্যের মধ্য দিয়ে। 'কৃষ্ণলীলা' গেয়ে গেয়ে তারা প্রত্যেক গ্রামের বাড়ি থেকে পুরস্কার নিয়ে আসে। এই গানের সঙ্গে যে নৃত্য হয়ে থাকে তাকে বলা হয় "শ্লোক নৃত্য," শ্লোক মানে ছড়া, এর মধ্যে রাইমিলন, নৌকা বিলাস, বংশীহরণ ইত্যাদি ছড়াই প্রসিদ্ধ। এখানে শুধু বংশীহরণ সম্বন্ধে কিছু বলব। অদূরে কানাই মধুর সুরে যমুনার তীরে ব'সে বাঁশী বাজাচ্ছেন, তা শুনে রাধা ও সখীদের 'ধড় ছ্যাইড়া প্রাণ কাইড়্যা লইয়া যায়।' সবাই ঠিক করলেন, কানাইয়ের বাঁশী চুরি করতে হবে। এসব মতলব টের পেয়ে চতুর কানাই "হাতের বাঁশী ছাইড়্যা দিয়ে কালকূট ভুজঙ্গ হইয়ে দংশিলেন শ্রীমতীর গায়।" রাধা যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে ঢুলে পড়লেন, সখীরা তাদের ধরাধরি করে নিয়ে এল। তখন রাধা ঘোষণা করে দিলেন, যে তার অসুখ ভাল করে দিবে, তাকে তার গলার হার পুরস্কার দিবেন। এ কথা শুনে কানাই বৈদ্যরূপে রাধার অসুখ সারিয়ে দিলেন এবং রাধা তাঁর গলার হার দিতে চাইলে।



"দশ অবতার নৃত্যে"—কৃষ্ণ অবতার

"বৈদ্যরাজ বলে রাই, গলার হারের কার্য্য নাই
দিবা মোরে প্রেম-আলিঙ্গন।
যদি দয়া কর রাই, প্রেম-আলিঙ্গন আমি চাই
অন্য ধনের নাহি প্রয়োজন।
তখন রাইরে ঘিরে যত সখীগণে, কি আনন্দ মনে মনে,
দরশনে পূর্ণ হ'ল আশ
দেহ যৌবন সমর্পিয়ে, বৈদ্যরাজ-সম্ভাষিয়ে,
করিলেন প্রেম প্রকাশ

এরাই কিছু দিন পরে বৈশাখ মাসে 'কাল বৈশাখী' পূজা ক'রে থাকে। এর অন্য নাম 'নীলপূজা'। শিষ্যেরা নীল ও অন্যান্য জিনিষ মাথায় করে দাঁড়ায় আর বালা খুব জোরালো মন্ত্র বলে তার সামনে ধূপ দিতে থাকে। একটি মন্ত্র—

"মোচ্ রা শিঙ্গে মোচ্ রা শিঙ্গে মোচর পা'যে চলে,
নযত চলে ধাপবনে নয়ত চলে জলে,
শুনতে যদি চাস্ ওলো মোচ্ রা শিঙ্গের কথা
ভূত প্রেত সঙ্গে ক'রে দেও দেখি দেখা।"

এই ভাবে যখন গ্রামের দক্ষিণ পাড়া ভয়ানক ভাবে শাক্ত হয়ে আসে, ঠিক উত্তর পাড়ায় এই সময় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত এমন একজনকে দেখতে পাই যার জন্য নলিয়া গ্রাম ঐ রসে ডুবে গিয়েছিল। এর নাম ঠাকুর পদ্মলোচন। ঠাকুর বাড়ির প্রসিদ্ধ তমাল গাছের জন্যেই বোধ হয় বিদ্যাপতির গানটি গ্রামের ছেলেমেয়ের মুখে এখনও শুনতে পাওয়া যায়।

"সখিরে, না পোড়াও রাধা অঙ্গ, না ভাসাও জলে
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালেরি ডালে।

এই ভাবে ঠাকুর পদ্মলোচনের সংস্পর্শে এসে নলিয়ার উত্তরপাড়া অত্যন্ত জমকালো হয়ে ওঠে। ঠাকুরবাড়িতে যে কাঠের তৈরি সিংহাসনটি আছে, তা তিন ভাগে ভাগ করা যায়। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবনের কল্পনা নিয়ে মিস্ত্রি সিংহাসনটি গড়েছিল।

ঠাকুরবাড়ির ঠিক পাশেই ন্যায়ভূষণ পণ্ডিত মহাশয় বিরাট টোল খুলেছিলেন ও তার সামনে একটি পুকুর করিয়ে ছিলেন। এখন সে টোলও নেই, পুকুরও নেই, আছে শুধু টোলবাগান ও একটা এঁদো পুকুর।

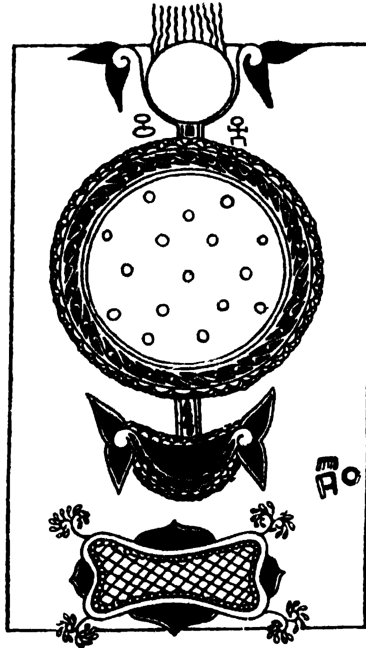
গ্রামের এই আনন্দের মাঝে মেয়েরা তাদের কতটুকু স্থান করে নিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলব। নলিয়া গ্রামের মেয়েরা একরূপ 'ঘাঘর জানি' খেলা করে ছড়া বা কবিতার মধ্য দিয়ে, একজন বলে, 'এতটুকু পানি' সবাই তখন বলে, 'ঘাঘর জানি'। তখনও বলে, 'এই পথ দিয়ে যাবো,' এরা বলে ওঠে 'কোদাল দাও ইত্যাদি ফেলে মারবো'।

বরষার প্রথম দিনে গ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা এক হাতে আঁচল ধরে ঘুরে ঘুরে নেচে বলে থাকে

"ওলো মেঘারাণী
হাত-পা ধুয়ে ফেলাও পানি।
চিনে বনে চিক্ চিকেনী
ধান বনে হাঁটু পানি
কলতলায় গলা জল
গপ্ গপাইয়ে নাইমা পড়।"

এইভাবে গ্রামের মেয়েরা প্রথম দিনের মেঘকে নৃত্যে, কথা ও ভঙ্গীতে পৃথিবীতে আহ্বান করে। তাদের আমের বাঁশী যদি না বাজত অমনি বলে উঠত, 'টিম্ টিম্ টিম্, ভাষ শালিকের

ডিম্, বাঁশী যদি না বাজিস্ ত কচু বনে ফ্যালায়া দিব, গা খাজয়ে, মর্ মর্ মর্।" শীতকালে সমস্ত গ্রামের আঙিনা ব্রত-আলপনায় ভরে উঠত। এই সব আলপনা ও ব্রতকথার মধ্য দিয়ে ছোট মেয়েরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলবার আভাস পেত। গ্রামে সাধারণত দেখি কুমারী মেয়েরাই আলপনা, ব্রতকথায় বিশেষ অগ্রণী। নলিয়া গ্রামে যতগুলি ব্রতকথা ও আলপনা দেখেছি তাতে আমার মনে হয় যে, ব্রতকথার আলপনা সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। এক একটি খণ্ড খণ্ড ছবির মত, ঐগুলিকে ব্রতকাহিনীর চিত্র-প্রসাধন বলা যায়। এই সমস্ত আলপনা প্রায়ই গ্রাম্যজীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে নেওয়া। আলপনায় মানুষ, পাখি, মাছ, গাছ, ঘোড়া হাতি, চন্দ্র, সূর্য, তারা, এমন কি হাট বাজার, রান্নাঘর ইত্যাদি সমস্তই আঁকা হয়। জোড়া পাখি, পুরুষ-স্ত্রী, শিব-দুর্গার যে যুগল চিত্র, তা ঐক্য ও ভালবাসার প্রতীক।



তারার ব্রত

চৈত্রমাসে নলিয়ায় তারার ব্রত একটি দেখবার জিনিস। প্রকাণ্ড আঙিনা ভরে তারার ব্রতের আলপনা, ফুল দিয়ে পূজো করছে কুমারী মেয়েরা—

"ষোল ষোল তারা তোমারে করি সাক্ষী
যেতে দে করি আমরা পঞ্চম গ্রাসী।
স্বর্গ হতে হর জিজ্ঞাসা করেন,
গৌরী, মর্ত্যে কিসের ব্রত হয়?
গৌরী বলেন, তারার ব্রত।
তারার ব্রত করলে কি ফল হয়?

কুবেবেব মত ধন হয
লক্ষ্মী-সরস্বতীর মত কন্যা হয়
কার্তিক-গণেশের মত পুত্র হয়
লক্ষ্মণের মত দেওর হয়
রামের মত পতি পায়
জনকেব মত বাপ পায
দুর্গার মত সোহাগী হয়
কর্ণেব মত দাতা হয়
দশরথের মত শ্বশুব পায়।" ইত্যাদি

গ্রামে যারা কুমারী মেয়ে তাদেব প্রাণে প্রচুর আনন্দ, সর্বত্রই তাদের সাড়া, এদের শিক্ষকতা করতেন গাঁয়ের ঠাকুরমারা। ছোট ছোট মেয়েবা তাদের কাছে আলপনা ব্রতকথা, কাঁথা শেলাই শেখে, আমসত্বের ছাঁচ, পিঠে তৈরি করবার নানারূপ ছাঁচ শেখে, তাদের কাছে এসে পুতুল গড়ে, গল্প শোনে, 'আগডুম বাগডুম', 'ইকরী মিকরী চাম চিকরী' খেলা করে। আমি এই নলিয়ায় একজন বৃদ্ধার কাছে মধুমালার শাস্ত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, তাদের গল্প বলবার ভঙ্গী দেখে। পঁচাত্তর বছরের বুড়ি, এখনও তার গানের গলা অতি চমৎকার আছে। যখন মদনকুমার নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে মধুমালার দেখা পেল তখন বুড়ি

"মদন যায় যায় ফিরে চায়, গলার মালা হাতে দ্যায়, মদন ধীবে যায়।"

বলে যে ভাটিয়াল সুরে গেয়ে উঠেছিলেন তার রেশ এখনও আমার কানে স্পষ্ট বাজে। মদনকুমার চলে গেলে মধুমালা তার মেঘবরণ চুলের একগাছি নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে বলে উঠল,

"কুচববণ কন্যাবে তার মেঘবরণ ক্যাশ
ও নদী কইয়ো তারে মধুমালাব দ্যাশ।"

মধুমালাকে যখন তার সখিরা সান্ত্বনা দিতে লাগল তখন মধুমালা বলে,

"পীবিতি রতন পীরিতি রতন পীবিতি গলার হাব
পীবিতি কইর‍্যা যেজন মরেরে সফল জীবন তার।"

সেদিন আমি ভেবেছিলাম আজকালকার গাঁয়ের মেয়েরা যে বহু দিনের যত্নের এই অমূল্য পদার্থ ঠাকুমাটিকে এক কোণঠাসা করে দিলে, তারা ভাববার সময় পেল না ইনি দেশের ও জাতির কত বড় সম্পদ! আর একদিন আমি গ্রামের উত্তরপাড়ায় ছড়া সংগ্রহের আশায় এক ঠাকুরমা কাছে যাই। দেখি বাড়িতে ঠাকুরমা ভীষণ চীৎকার করছেন এই বলে, "মনুষ্যি জন্মি এ দেহি নাই, কি যে ন্যাদা পড়া শিহে চিঠি নেহ, আমবাও চিঠি নেহিছি, তিনি যহন উত্তরে চাকরী করতে গেছেন দুই চার কথায় বলতাম। অমনি ঠাকুমাটি গুন্ গুন্ করে ধরে দিলেন—

"আঁচলে বাঁধাছে সর্বদায় সে আমার
কেমন করে তাব ভালবাসা পাশবিব।
সে যে রূপের রূপ আমি মনে মনে ভুলে বব।
অন্তরে বাঁধাছে সর্বদায় সে আমার
কেমন কবে তার ভালবাসা পাশরিব।
সে যে মধুর কথা, আমার হৃদয়ে রয়েছে গাখা,
আমি কেমন ক'রে তোমায় ভুলে
না দেখে প্রাণ ধ'রে রব?"

নলিয়ায় মাঘ মাসে কুমারীরা (সব শ্রেণির) 'মাঘমণ্ডলে'র ব্রত করে থাকে। খুব ভোরে বনফুল দিয়ে একটি কুলগাছের চারদিকে পাঁচ-ছয়টি মেয়ে ব্রত গান গেয়ে নেচে বনদুর্গার পূজা অর্থাৎ মাঘমণ্ডলের ব্রত করে থাকে। কুমারী মেয়েব জীবনের ব্যথা-বেদনের আভাস পাওয়া যায় এই ব্রতকথায় ও তাদের নৃত্যের ভঙ্গীতে। সমস্ত ছড়াটি উল্লেখ করা অসম্ভব, তবে যেখানে নৃত্য আছে সেটুকু দিচ্ছি।

"হ্যাচবা ঠাউবোন্‌লো ফ্যাচবা চুল
তাই দিযে শোভে না লো লোহাগডাব ফুল।
লোহাগড়ার ফুল না লো বেড়ার মাটি
বেডাব মাটি না লো, বিযে কবে
পাডা ভবে ছেম্‌বীবা জযজোকাব পাড়ে।"



হ্যাঁচড়া পূজা

এদিকে কনের বাড়িতে কনেকে স্নান করানোর পরই

জয় দেবো না লো জোকার দেব
সোনার ভাইধন কোলে তুলে নেব।

(২)

হ্যাচরা ঠাউরনের পুজো করব
খাটখানি তার কই?
মালিনী লো সহ!

আছে আছে খাটখানি তার বাওনগোর পাড়া
বাওন গোর (কায়স্থ ইত্যাদি) সাত ছেমরী পূজা করে তারা।

কাঁথা শেলাই, সিকা তৈরি, এর আবার সুন্দর সুন্দর নাম আছে,—'গুজরী দোলা', 'কোতর খুপী', ফুলঝুমকো', 'পদ্ম পোগল' 'কালপাশা' ইত্যাদি। এই গ্রামের একশ বছর পূর্বে একটি দশ বছরের মেয়ে রমণীমোহন ঘোষ নামে একটি ছেলেকে ভালোবেসে দু-বছর ধরে একখানা কাঁথা শেলাই করে ছেলেটিকে তার ভালোবাসার নিদর্শন-স্বরূপ উপহার দিয়েছিল। এদের বিয়ে হওয়ার পরেই দু-জনেই মারা যায় এবং তাদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই কাঁথাখানা সযত্নে তুলে রাখা হয়েছে। এই সব ছেঁড়া কাঁথা কত পুরানো স্মৃতি নিয়ে বাংলার এ-গাঁও ও-গাঁওয়ের পানে তাকিয়ে মরে।



হ্যাঁচড়া পূজার প্রণাম

এর পরে নলিয়া গ্রামের বয়স্কা ও কুমারী মেয়েদের চরম বিকাশ দেখতে পাই বিবাহ-অনুষ্ঠানে। সাধারণত পূর্ববঙ্গের বিবাহব্যাপার একটি বিরাট অনুষ্ঠান। এখনও যেখানে একটু প্রাচীন প্রথায় বিবাহ হয় সেখানে প্রচুর পরিমাণে গান ও নাচ হয়ে থাকে। বিবাহের বহু অঙ্গ আছে এবং প্রায় এক হাজার গান বিবাহের সময় গীত হয়ে থাকে ও প্রায় প্রত্যেক বিবাহের অনুষ্ঠানগুলোতেই মেয়েরা নৃত্য করে থাকেন। শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এই নলিয়া গ্রামের বিবাহ-অনুষ্ঠান আদ্যাপান্ত বহু অর্থব্যয়ে চলচ্চিত্র করে রেখেছেন এবং অনেকেই তার পরিচয় বহু পূর্বেই পেয়েছেন। বিবাহের সময় যে সধবা মহিলারা গায়ে হলুদ দেয়, স্নান করান, বরণ করা, গঙ্গা পূজা করা ইত্যাদি বিবাহের এ-সব কার্যাদি সম্পন্ন করেন তাদেরকে এয়ো বলা হয়। আজ গ্রাম থেকে ভদ্রমহিলাদের গান করাটা উঠে গিয়েছে ও যাচ্ছে। প্রাচীনদের মধ্যে যারা আছেন তারা এখনও এক এক সময় গান করে থাকেন, কিন্তু নতুন যারা আসছেন তারা তো এ-সব জানেনও না, করেনও না, শেখেনও না। গ্রামে যে-সব বৃদ্ধা গান ও নাচ জানতেন তারাও একে একে সরে পড়ছেন, নতুন কেউ আগ্রহ করে শেখেও না, কাজেই এ-সব ক্রমেই উঠে যাচ্ছে। গানগুলির সহজ, সরল ধারা অথচ একটি সংযত গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং লীলায়িত সুর ও নৃত্যের ভঙ্গী মনোমুগ্ধকর। সাহিত্য ও সঙ্গীত উভয়ের দিক থেকেই যে এগুলির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। বিবাহের পূর্বে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ উভয়ে পত্র লেখেন, একে বলা হয় 'পত্রলেখা'। তারপর উভয় পক্ষই মেয়ে-ছেলেকে "আশীর্বাদ" করে যান। এই সময় এয়োরা আশীর্বাদের বহু গান করে থাকেন। উভয় পক্ষে 'লগ্নপত্র' ঠিক হয়ে গেলে 'হলুদ কোটা' হয়। এই সময় এয়োরা যে গান করে থাকেন, তাকে বলা হয় 'নাওয়ানোর গান'। উভয় বাড়িতেই 'আনন্দ নাড়ু' তৈরি হয়, তারপর

খুবড়ল পূজা হয়ে থাকে। খুব ভোরে বিবাহের পূর্বের দিন বর 'দধিমঙ্গল' বা 'আঁধিবাসে'র গান করেন। বিয়ের দিন ছেলেকে প্রাতঃকালে পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিতে হয়। একে 'বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ' বলা হয় এবং এতে কি করতে হয় তা এয়োদের 'বৃদ্ধির' গানে স্পষ্ট করে জানা যায়। তারপর ষষ্ঠীপুজো করে তার ব্রত কথা বলা হয়। বিকালে কন্যার বাড়িতে এয়োরা গ্রামের পুকুরে গঙ্গাপূজা করতে যান এবং সেখানে গান গেয়ে গঙ্গা বরণের নৃত্য করে থাকেন।



ব্রত নৃত্য

গঙ্গাবরণের একটি গান ঃ

"সখি দ্যাখ দ্যাখ বেলা হল গগনে
সবি চল যাই গঙ্গা বরণে।
আমি যাইব গঙ্গার কূল
তুলব জবা ফুল
আমি তুলব ফুল, গাঁথব মালা দিব মায়ের চরণে।
আমি তুলব কুসুম ফুল
যাইয়ে মায়ের কূল
আমি ভরব জল করব পূজা
দিব মায়ের চরণে
সখি চল যাই গঙ্গা বরণে।"

পুকুরের এপারের মেয়েরা 'জলকেটে' কলসী পূর্ণ করতে থাকলে, ওপারের মেয়েরা বলে ওঠে 'কি কর তোমরা?'

তখন এপারের 'সোহাগীরা' বলবে 'বর অথবা কনের সোহাগ ভরি।' এই সোহাগভরা জল নিয় বাড়িতে এসে পাত্র অথবা পাত্রীকে স্নান করান হয় এবং 'ছত্র' ধরা হয়। এই সময় মেয়েরা ধূপতি নাচন করে গান গেয়ে থাকেন। তারপর নাপিত বর অথবা কনের হাতে হলুদ সুতার ডোর বেঁধে দেয়, একে 'কোবকাম' বলে। সন্ধ্যার সময় পাত্রেব বাড়িতে 'পাত্র সাজান'র গান এয়োরা এরূপ করেন,—

"সখি চল চল চল অযোধ্যার ঐ ভুবনে।
আমবা সাজাব বাম ঐ গুণধাম
চল যাই সকালে।
আমি আগে যাইয়ে সাজাইব ঐ রাম
বিজয়বসন্তবে।
আমি এই চলিলাম চন্দন আনতে বানেব দোকানে
সখি চল . . বিজয়বসন্তরে।"

এই ভাবে বস্ত্র, বলয়, কাজল. নূপুর, মুকুট ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে গান গাওয়া হয়। তারপব বরের মা তার হাত দুধ দিয়ে ধুয়ে ছেলেকে আশীর্বাদ করে বিয়ে করতে পাঠিয়ে দেন। একে 'কনুই ধোওয়ান' বলে এবং আশীর্বাদের সময় এয়োরা এই গান করে থাকেন,

"আমি যাবো সেই অশোকবনে, জানকীব অন্বেষণে,
ওই জানকীবে আনতে গেলে, মাধন কি কি লাগে গো?
পুরোয় ওই হলুদ লাগে বানিযাব চন্দন লাগে
জানকীরে আনতে গেলে এই সব লাগে গো।
আমি মাগো . লাগে গো।"

এরূপে বেনের চন্দন, দীপের কাজল, তাঁতীর যন্ত্র, শিবেব শঙ্খ, মালীর মুকুট ইত্যাদি লাগে, এই বলে গান করা হয়। বরের সদলবলে পাত্রীর বাটীতে যাওয়ার নাম 'চলন' এবং এই সময় এয়োরা 'চলনের গান' করে থাকেন। এদিকে ক'নের বাড়িতে ক'নেকে স্নান করানোর পরই "মাদল পূজা" ও তার নৃত্য মেয়েরা করে থাকেন। বর যখন কন্যার বাটির দ্বারে উপস্থিত হন তখন তাকে "দৃষ্টি প্রদীপ" দেখান হয়। একে 'পাত্রবশীকরণ'ও বলা হয়। এই সময় এয়োরা কনেকে সাজাতে থাকেন ও 'পাত্রী সাজান'র গান করেন। ববকে 'আঁধার ঘর' দেখানর পব, বিবাহের সময় বরের চারদিকে কনেকে সাত বার প্রদক্ষিণ করার পরই বর ও কনেকে পরস্পব দৃষ্টিবিনিময় করতে হয়, অর্থাৎ দু জনেই উভয়ের মুখ দেখে, একে 'শুভদৃষ্টি' অথবা 'মুখচন্দ্রিকা' বলা হয়। এর পর 'মালা বদল' হলে এয়োরা যে গানটি করে থাকেন তা এই—

"তুমি যে সুন্দব রাম রে, সীতারে করবা বিয়ে,
কি কি গযনা আনিছ বাম বে সীতাব লাগিয়ে?
এনেছি এনেছি গয়না পেটরাটি ভরিয়ে
ধব সীতে পব গযনা পেটরাটি খুলিযে।"

এইরূপে বস্ত্র, শঙ্খ, সিন্দূর ইত্যাদি দিয়ে গানটি করা হয়ে থাকে। পরে 'কুশবন্ধন' হয় এবং এ সময় নাপিত বিবাহ-সভায় 'গৌরবচন' ছড়া আবৃত্তি করে। বিবাহ হয়ে গেলে বাসরঘরে নানারূপ খেলা হয়। একে 'জো'খেলা বলা হয় এবং এয়োরা 'বাসরঘরের' বহু গান কবে থাকেন। প্রাতঃকালে এয়োরা বর ও ক'নে যে ঘরে শুয়ে আছে সেই ঘরে এসে তাদের শয্যা তুলবার জন্য বরের কাছে পুরস্কার চেয়ে থাকেন এবং এই সময় তারা যে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে গান করেন তাকে বলা হয়, 'সেজ তুলনীর গান'। এর পর বাসিবিবাহ হয়। বর ও ক'নের পাশাপাশি দাঁড় করান হয় এবং ক'নেকে সিন্দুর দিয়ে বরের পিঠে একটি ছবি এঁকে

বলতে হয়, "তোমার মনে চিরদিনের জন্যে আঁকা রইলাম।" ববও কনেব পিঠে একটি ছবি এঁকে উপরোক্ত কথাটি বলে থাকে। বরের কোলের কাছে কনেকে দাঁড় কবানোর পর বর কনের নাভিস্থল স্পর্শ করে কনের মাথায় সিন্দুর পরিয়ে দেয়। এই সময়ও এয়োরা 'বাসিবিবাহে'র বহু গান করেন। বাসিবিবাহের রাত্রিকে 'কালরাত্র' বলা হয় এবং এই রাত্রে বর ও কন্যা পৃথক ভাবে শুয়ে থাকে। খুব ভোরে উঠে বর ও কনেকে 'কাকস্নান' করতে হয় এবং রাত্রে 'ফুলশয্যা'র সময় এয়োরা তাদের নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা ও ঠাট্টাবিদ্রূপ করে এই গানটি করেন,

"যাতি, বুতি, কুটরাজ, বেলা, গন্ধরাজ ফুল, কৃষ্ণকলি
নবকলি অর্দ্ধ বিকসিত, তাতে বনমালী হরষিত।
তুমি যাও হে নাগর প্যাবী বিচ্ছেদে হয়ে আছেন ঘুমে কাতব।
আমি এই আসিলাম বানেব চন্দন গৃহেতে থুয়ে।

এখানেও দীপের কাজল, তাঁতীর বস্ত্র, মালীব মালা গৃহেতে রেখে,

"তুমি যাও হে নাগর প্যাবী বিচ্ছেদে হয়ে আছেন ঘুমে কাতর।"



বিবাহ নৃত্যে বিদায়

তার পরেব দিন বিদেয় নিয়ে বর কনেকে নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন, বিদায়ের সময় শুধু নির্বাক নৃত্যের ভঙ্গীতে এয়োরা এদের বিদায় দিয়ে থাকেন। বরের বাড়িতে 'বৌ-পরিচয়' হয়ে যাওয়ার পর 'বৌ-ভাত' হয়। বরেব মা যখন নূতন বধুকে এবং ছেলেকে বরণ করে ঘরে আনেন তখন দু-জনকেই বরণ করার সময় এয়োরা এই গানটি গেয়ে থাকেন,

"রামের মা বরণ করে
হেলকে ঢুলে মাজা পড়ে,
কি বরণ বরে লো ও রামের সোহাগিনী।
রামের মা বরণ করে
হাতের কঙ্কন ঝিকমিক করে
রামর মা বরণ করে
কি বরণ করে গো ও রামের সোহাগিনী।
পায়ের নূপুর খসে পড়ে
কি বরণ করে লো ও রাামেব সোহাগিনী।"

এখন গ্রামে বিবাহের সময়, বহু অঙ্গই তুলে দেওয়া হয়েছে, বিবাহের পরিপূর্ণ অঙ্গটি আমাকে গ্রামের প্রাচীনাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। এ সমস্ত গান ও বিবাহের পূর্ণ অঙ্গগুলি এখনও নলিয়া গ্রামের শ্রীযুক্তা ভুবনমোহিনী দেবী, শ্রীমতী, শ্রীনগেন্দ্রবালা দেবী ও শ্রীমতী মায়া মুখুজ্যে প্রমুখ মহিলারা জানেন এবং করিয়া থাকেন। এখন সে গ্রামে ঠাকুমা পাওয়া দুষ্কর। কুমার, মিস্ত্রী, পটুয়া নেই, গ্রামকে এখন আর বিশেষভাবে কবিগান, যাত্রা, রামায়ণ-গান, সখি-সংবাদ ইত্যাদি মুখরিত করে না। গ্রামে কোন কোন সময়ে বিবাহের পরে দ্বিতীয় বিবাহ হইয়া থাকে। সাধারণত বিবাহের অনির্দিষ্ট কালের পর এই দ্বিতীয় বিবাহ হয়। দ্বিতীয় বিবাহে কোন পূজার্চনা নেই, যদি কেউ রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' দেখে থাকেন তবে বুঝতে পারবেন যে শুধু নৃত্যের ভঙ্গীতে নির্বাক হয়ে এই দ্বিতীয় বিবাহ-উৎসব গ্রামের এয়োরা সম্পন্ন করে থাকেন। নতুন বউ, স্বামী বিদেশে, দ্বিতীয় বিবাহ উপস্থিত, এয়োরা নতুন বউয়ের ব্যথা, আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্বাক নৃত্যের ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তোলেন। দ্বিতীয় বিবাহের প্রথম অঙ্কেই দেখতে পাই যে এয়োরা 'কাদামাটি' নৃত্য করছে। আঙিনায় কাদা করে সমস্ত এয়োরা কনেকে নিয়ে কত 'ধানকাটা' 'মলন' 'হলচালন' 'ধানছিটান' 'ধাননিড়ান' 'চাল বা'র করা নৃত্য করে থাকেন।

এই সময় এয়োরা 'দৈবক ঠাকুর' প্রহসন করে থাকেন। তারপর বহু নৃত্য ও গান করার পর সমস্ত এয়োরা কাদামাটি মেখে কনেকে নিয়ে স্নান করতে যান। পুকুরঘাটে স্নান করার পর কনেকে কলসীতে জল ভরতে হয় ; এই সময় এয়োরা একটু দূর থেকে নিম্নলিখিত গানটি করেন। গানের ভাব এই যে, কৃষ্ণ বাড়িতে এসে রাধাকে জল তুলতে দেখে বলছেন.·—

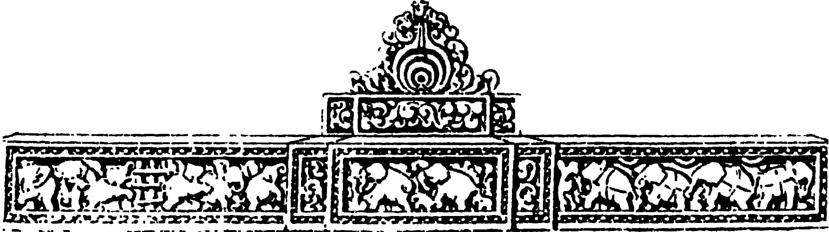
"জল ভর লো বিরহিণী জলে দিয়ে ঢেউ
বদন তুলে কহ কথা ঘাটে নাই আব কেউ।
কেমন তোমার মাতা পিতা কেমন তোমার হিয়ে
একেলা এসেছ ঘাটে কলসী কাঁখে নিয়ে।
হেথা থেকে যাও রে কিষ্ট কে আনল ডাকিয়ে
একলা এসেছি ঘাটে পাষাণ বুকে দিয়ে।
আপনারি ধন ছাপায়ে রেখেছি আপনি
তাইতে কেন হওলো বেজার রাধাবিনোদিনী?
বেজার কেন হ'ব কিষ্ট বেজার কেন হ'ব
তুমি মন্দ হ'লে পরে কোথায় যাইয়া রব?
কড়ার কড়া পানের বিয়ে তাও না দিতে পার
নিকড়ে কদম্বের পুষ্প কোলে ফেলে মার।
নিজধন ভাঙ্গাইয়া কানাই বিয়েই বা কেন কর
কেবল পরের রমণী দেইখা চোখ টাটায়ে মর।

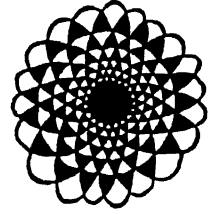
বিয়ে ত করিব রাধে বিয়ে ত করিব
তোমার মত সুন্দরী রাধে কোথায় যাইয়া পাব?
আমার মত সুন্দরী কিষ্ট নাহি যদি পাও
গলেতে কলসী বাঁইধা জলে ডুবে যাও।
কোথায় পাব কলসী বাধে কোথায় পাব দড়ি।
তোমার হার গাছি দাও লোটন ক'রে রাখি।
তুমি আমার গয়া, গঙ্গা, তুমি বারাণসী।
তুমি হও যমুনাব জল
তোমার অঙ্গে দিব সাঁতার কি করিব কলসী।

এইভাবে দুটি জীবনের মিলন-উৎসব শেষ হয়।

এই প্রবন্ধের রেখাচিত্রগুলি শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় গৃহীত আলোকচিত্র হইতে তরুণশিল্পী শ্রীকুলদারঞ্জন চৌধুরি অনুগ্রহ করে এঁকে দিয়েছেন. তার কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী এবং কৃতজ্ঞ রইলাম---লেখক।

প্রবাসী, ১৩৪০ আশ্বিন





কোটালিপাড়া কাহিনি

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য

...ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে চন্দ্রদ্বীপের বর্ণনাপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত স্থানগুলির সহিত কোটালিপাড়ারও উল্লেখ আছে—ব্রহ্মপুর, বারাণসীপুর, সহাশাল, মালিকাসরিৎ, পার্শ্বে কুকুদগ্রাম, কোটালি, কণ্ঠনালী, বেণুবাটি, রণানদীর নিকট ডম্বুর, চেদীরনগর, যাদবপুর, বেত্রগ্রাম, তেলিগ্রাম, ধূরগ্রাম, কাকুলগ্রাম, সুরাগ্রাম, মাধবপার্শ্ব ও পিঙ্গলপত্তন। ইহা হইতেও কোটালিপাড়ার প্রাচীনত্ব সহজেই অনুমিত হয়।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে সেটেলমেন্ট বিবরণ অনুযায়ী কোটালিপাড়ার আয়তন ৯৭,৭৯৪ একর বা ১৫১.৭২ স্কোয়ার মাইল। ঘর্ঘরা নদী উত্তর দিকের বাঘিয়ার বিল হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ দিকে মধুমতী নদীতে মিলিত হইয়াছে। ঘর্ঘরা নদীর নিম্নাংশের নাম শিলদহ।

বিশ্বকোষে কোটালিপাড়া সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে—বাংলা বিভাগের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা। ইহার মধ্যে ৭২টি গ্রাম ও ৭৪টি কিস্মত আছে। দশশালা বন্দোবস্তকালে ইহার সদর জমা ২২০০ টাকা ধার্য হয়। পাশ্চাত্য বৈদিকগণের ১৪টি সমাজের মধ্যে একটি। ইহার মধ্যে ঘর্ঘর নামে একটি নদ প্রবাহিত। ইহার ভূতত্ত্ব পর্যালোচনা করিলে বোধ হয়, পাঁচ-ছয় শত বর্ষ পূর্বে এই স্থান নদীময় ছিল। মনসামঙ্গলে বিজয় গুপ্তের বাটির বর্ণনায় আছে—

"পশ্চিমে ঘর্ঘর নদ পূর্বে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুলশ্রী গ্রাম পণ্ডিতনগর।"

সম্প্রতি কোটালিপাড়ার পশ্চিমাংশে ঘর্ঘর নদের রেখামাত্র আছে। ঘর্ঘর নদের পার হইতে ফুলশ্রী গ্রাম প্রায় সাড়ে চার ক্রোশ পূর্বে। ইহাতে অনুমিত হয়, তৎকালে কোটালিপাড়া ঘর্ঘর নদের গর্ভশায়ী ছিল। মহাবিষুব সংক্রান্তি দিনে ইহার পাড়ে একটি মেলা হয়। অনেক স্ত্রীলোক আসিয়া এখানে স্নান করে। প্রবাদ আছে, এক সন্ন্যাসী বর দিয়াছিলেন যে, "অপুত্রক স্ত্রীলোক মহাবিষুব সংক্রান্তিতে এখানে স্নান ও গঙ্গাপূজা করিলে তাহার সন্তান হইবে।"

"মনীষী জীবনকথা"র লেখক ডঃ সুশীল রায় স্বর্গত মহা-মহোপাধ্যায-ভারতাচার্য-পদ্মভূষণ-মহাকবি হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের জন্মস্থান 'কোটালিপাড়া' সম্বন্ধে বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"এক কথায় বলিতে গেলে ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নৈমিষ্যারণ্য। সারা ভারতের মধ্যে এত ব্রাহ্মণের সমাবেশ আর কোথাও নাই। কেবল ব্রাহ্মণ বংশে জন্মলাভের অধিকারেই ব্রাহ্মণ নন, তপস্যা, শাস্ত্রজ্ঞান এবং ব্রাহ্মণ বংশে যার উৎপত্তি, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। কোটালিপাড়া এইরূপ ব্রাহ্মণেরই সাধনার তপোবন-বিশেষ। পশ্চিমবঙ্গে যেমন ভাটপাড়া ও নবদ্বীপ, পূর্ববঙ্গে তেমনি বিক্রমপুর ও কোটালিপাড়া—এর মধ্যে 'কোটালিপাড়া' সমধিক প্রসিদ্ধ।"

পণ্ডিতপ্রবর সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অদ্বৈত বেদান্তাচার্য মধুসূদন সরস্বতীর জীবনী আলোচনা করিতে গিয়া তাহার "কাশ্যপবংশ-ভাস্কর" গ্রন্থে বলেন—"ইনি অন্যূন চারিশত বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের এক কোণে, বঙ্গদেশের অপরিচিত

প্রান্তে বর্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ও তৎকালীন বাকরগঞ্জ জেলার বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ সমাজের অন্তর্ভুক্ত, চতুর্দিকে সলিলরাশি পরিবেষ্টিত দ্বীপে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ন্যায় কোটালিপাড়া পরগণার উনবিংশতি বা উনশিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।"

স্থানান্তরে কাশ্যপ বংশ-গৌরব পুরন্দরাচার্য সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া শ্রদ্ধেয় উক্ত সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বলেন যে, "এই কোটালিপাড়া বর্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সুপ্রতিষ্ঠিত একটি পরগণা বিশেষ। এইস্থান পূর্বে বর্তমান বরিশাল জেলা বা বাকরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত ও বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের বাজাব অধীন ছিল বলিযা বাক্‌লা সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই স্থানটি চতুর্দিকে সলিলবেষ্টিত দ্বীপের ন্যায়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নানাবিধ গ্রাম্য ফল, পানীয় জল, অনায়াসলভ্য খাদ্যদ্রব্য এবং উৎকৃষ্ট স্বাস্থোব জন্য মহানুভব পুরন্দরাচার্যের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করে। তিনি রুচিকর ও মনোনীত এই দেশের প্রশস্ত ক্ষেত্রে 'উনবিংশতি' বা 'উনশিয়া' নামক গ্রামে বাসভবন নির্মাণ করিয়া পরম সুখে নির্ভয়ে ধর্ম ও শাস্ত্রচর্চার সহিত সম্মানে বাস কবিতে লাগিলেন। তাহার বহু শিষ্য-শাখা ছিল। তিনি ধনসম্পদেও নিতান্ত হীন ছিলেন না। তাহার কীর্তিকলাপ অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। নিষ্ঠাবান ও নানা শাস্ত্রকুশল আচার্য স্থানীয় এই ব্রাহ্মণেরা যে দীর্ঘকাল কঠোব তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাব ফল ক্রমশ পবিপক্ক হইতে লাগিল। ধার্মিক, সদাচারসম্পন্ন, নানা শাস্ত্রবিশারদ মনীষিগণ, তপোভ্রষ্ট ঋষির ন্যায় এই পবিত্র বংশে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন।"

বিভিন্ন কুলপঞ্জী পর্যালোচনা কবিলে ইহা অনুমিত হয় যে, খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দীব প্রারম্ভ হইতেই উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম ভারত হইতে একদল বেদজ্ঞ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ তৎকালীন বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ সমাজের অন্তর্গত কোটালিপাড়া অঞ্চলে বিভিন্ন কারণে আগমন কবেন। ইহারা এবং ইহাদের বংশধবেবা পশ্চিম দিক হইতে অথবা 'পশ্চাৎ' অর্থাৎ পরবর্তী কালে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া "পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ" নামে সুপরিচিত হন। পরবর্তীকালে ইহাদের সন্তান সন্ততিরা সুবিস্তৃত কোটালিপাড়া অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে এবং তৎসন্নিহিত চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়েন। অতি সুদীর্ঘকাল বিদ্যা ও ব্রাহ্মণগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত এই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের অপেক্ষাকৃত সংখ্যাধিক্য, অনন্যনিষ্ঠ শাস্ত্রালোচনা ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য কোটালিপাড়া পরবর্তীকালে "দ্বিতীয় কাশী" রূপে খ্যাতিলাভ কবে। প্রবাদ আছে যে, এস্থানে এক সময় দৈনিক এক লক্ষ শিবপূজা সম্পন্ন হইত এবং বাৎসরিক পাঁচশত দুর্গাপূজা ও দেড়শত বাসন্তীপূজা হইত। একথা স্মরণ বাখা কর্তব্য যে, তৎকালে পশ্চিমবঙ্গে নবদ্বীপ জন্মগ্রহণও করে নাই ; বিক্রমপুর মাতৃগর্ভে অবস্থিত এবং ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধি তো আরও কয়েক শতাব্দী পরবর্তীকালের কথা ; কিন্তু এরকম কয়েক শতাব্দীর বহু পূর্বে কোটালিপাড়া অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, সমৃদ্ধি ও স্বীকৃতি—শুধু স্বীকৃতি কেন—প্রসিদ্ধিও ঐতিহাসিকভাবে অনস্বীকার্য।

ভূ-প্রকৃতির দিক হইতে বাংলাদেশকে চারিটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিভাগে ভাগ কবা যায়। পশ্চিমে বাংলার একটা সুবৃহৎ অংশ পুরাভূমি। পূর্ববাংলা একান্তই নবভূমি এবং এই নবভূমি পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা-মেঘনার সৃষ্টি। এই পূর্ববঙ্গের কিছু অংশ অবশ্য পুরাভূমির অন্তর্ভুক্ত (যেমন—চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ইত্যাদির কতক অঞ্চল)। অবশিষ্টাংশের প্রায় সমস্ত ভূমিই জলীয় সমতল ভূমি বা নবগঠিত ভূমি। এই ভূমি সর্বত্র খালবিল ও সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি দ্বারা আচ্ছন্ন। এই নবগঠিত ভূমির আবার দুইটি বিভাগ সুস্পষ্ট। ইহার মধ্যে ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, সমতল ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের বহুলাংশের গঠন পুরাতন। এই সকল ভূখণ্ডের তুলনায় খুলনা, বাকরগঞ্জ, নোয়াখালি ও সমতল চট্টগ্রাম নূতন।

যতদূর জানা গিয়াছে—খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে ফরিদপুরের কোটালিপাড়া অঞ্চল সৃষ্ট

হইয়াছে। তৎকালে এই জনপদের নাম ছিল—"নব্যাবকাশিকা"। ইহা সেই ভূমি যে ভূমি বা অবকাশ নতুন সৃষ্টি হইয়াছে। এই অঞ্চল পূর্ববঙ্গের পুরাভূমির অন্তর্ভুক্ত নহে, ইহা নবভূমির অন্তর্ভুক্ত।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাহার "বাঙালির ইতিহাস"-এ (আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ১০৪) লিখিয়াছেন, "শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভাগীরথী-পদ্মার বিভিন্ন প্রবাহ-পথের ভাঙাগড়ার ইতিহাস অনুসরণ করিলেই বুঝা যায়, এই দুই নদীর মধ্যবর্তী সমতটীয় ভূভাগে অর্থাৎ নদী দুইটির অসংখ্য খাড়িকাকে লইয়া কি তুমুল বিপ্লবই না চলিয়াছে। যুগের পর যুগ এই দুইটি নদী এবং তাহাদের অগণিত শাখা-প্রশাখাবাহিত সুবিপুল পলিমাটি ভাগীরথী-পদ্মার মধ্যবর্তী খাড়িময় ভূভাগকে বারংবার তছনছ করিয়া তাহার রূপ পরিবর্তন করিয়াছে। পদ্মার খাড়িতে ফরিদপুর অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগীরথীর তীরে ডায়মন্ডহারবারের সাগর সঙ্গম পর্যন্ত বাকরগঞ্জ, খুলনা, ২৪ পরগণার নিম্নভূমি ঐতিহাসিক কালেই কখনও সমৃদ্ধ জনপদ, কখনও গভীর অরণ্য অথবা অনাবাসযোগ্য জলাভূমি, কখনও বা নদীগর্ভে বিলীন। আবার কখনও বা খাড়ি-খাড়িকা অন্তর্হিত হইয়া নূতন স্থলভূমির সৃষ্টি। ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া অঞ্চল ষষ্ঠ শতকের একাধিক তাম্রপট্টোলীতে "নব্যাবকাশিকা" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ষষ্ঠ শতকে "নব্যাবকাশিকা" সমৃদ্ধ জনপদ এবং নৌ-বাণিজ্যের অন্যতম সমৃদ্ধ কেন্দ্র। অথচ আজ এই অঞ্চল নিম্ন জলাভূমি।"

ডঃ রায় তাহার পূর্বোক্ত অমূল্য গ্রন্থে স্থানান্তরে (৪৫২ পৃঃ) লিখিয়াছেন—"ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত পাঁচটি এবং বর্ধমান অঞ্চলে আবিষ্কৃত একটি—এই ছয়টি পট্টোলিতে তিনটি মহারাজাধিরাজের খবর পাওয়া যাইতেছে—গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং নরেন্দ্রাদিত্য সমাচারদেব। ইহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের কি সম্পর্ক, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই, তবে তিনজনে মিলিয়া অন্যূন ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং এই রাজত্বের কাল মোটামুটি ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ হইতে তৃতীয় পাদ পর্যন্ত। লিপিপ্রমাণ হইতে মনে হয়, গোপচন্দ্রই ইহাদের প্রথম ও প্রধানতম এবং ইহাদের রাজ্য বর্ধমান অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—কেন্দ্রস্থল ছিল বোধ হয় ফরিদপুর অথবা ত্রিপুরা অঞ্চলে। রাজ্যের ছিল দুটি বিভাগ। একটি বর্ধমানভুক্তি, অপরটি "নব্যাবকাশিকা" সমৃদ্ধ জনপদ (নূতন অবকাশ) বা বন সৃষ্টিভূমি—ফরিদপুরের কোটালিপাড়া অঞ্চল"

ষষ্ঠ শতকেই 'নব্যাবকাশিকা' সমৃদ্ধ জনপদ এবং নৌ-বাণিজ্যের অন্যতম সমৃদ্ধ কেন্দ্র ছিল। অথচ আজ এই অঞ্চল নিম্ন জলাভূমি। যেমন কোটালিপাড়ার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, ঠিক্ তেমনই কোন্ সময় হইতে 'কোটালিপাড়া' নাম প্রচলিত হইয়াছে এবং 'কোটালিপাড়া' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা সুনিশ্চিতভাবে বলা কঠিন।

'কোটালিপাড়া'য় প্রাপ্ত ষষ্ঠ শতকের একটি লিপিতে 'চন্দ্রবর্মণকোট' বলিয়া একটি দুর্গের উল্লেখ আছে, সামরিক প্রয়োজনে এই দুর্গনগর গড়িয়া উঠিয়াছিল সন্দেহ নাই। এই 'কোট' হইতেই বর্তমান 'কোটালিপাড়া' নামের উৎপত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। (কোট = দুর্গ, আলি = শ্রেণি এবং পাড় বা পাড়া = তৎসংলগ্ন জমিতে বসতি বা লোকালয়)। কেহ কেহ মনে করেন 'কোটাল'—কোতোয়াল শব্দের অপভ্রংশ ; কিন্তু 'কোটালিপাড়া'র প্রথমোক্ত অর্থই সুষ্ঠু এবং অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স—ফরিদপুর (১২২ পৃষ্ঠা) বলেন—"এখানে বিশেষভাবে রক্ষিত একটি দুর্গ আছে। ইহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। এই দুর্গই এই স্থানের প্রধান

আকর্ষণ। ইহার দেওয়ালগুলি ১৫ ফুট হইতে ৩ ফুট পর্যন্ত উচ্চ এবং দুই হইতে আড়াই মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ। ইহার আয়তন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, ইহা আড়াই মাইল দীর্ঘ এবং আড়াই মাইল প্রস্থ। আবার কাহারও মতে ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয়দিকেই দুই মাইল। যাহাই হউক না কেন, ইহা পূর্ববঙ্গের বৃহত্তম দুর্গ। ময়মনসিংহ জেলার সেরপুরের কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত দুই মাইল দৈর্ঘ্য এক বা দেড় মাইল প্রস্থ "গড় জরিপ" নামে যে দুর্গটি আছে—তাহার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। এইরূপ অনুমান করা হয়, 'কোটালিপাড়া'র অর্থ (কোট = দুর্গ; আলি = দুর্গের চারিদিকের দেওয়াল বা দেওয়াল-সংলগ্ন জমি ও পাড়া লোকালয় বা বসতি) দুর্গের দেওয়াল সংলগ্ন জমিতে বসতি বা লোকালয়।"

বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স—ফরিদপুর (১৬ পৃষ্ঠা) বলেন—'কোটালিপাড়া দুর্গের দক্ষিণে তিন-চতুর্থাংশ মাইল দূরে অবস্থিত গুয়াখোলা গ্রামের সোনাকান্দুরি নামক মাঠে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্তের সময়ের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহারা উভয়েই সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করেন। ইহাদের মধ্যে স্কন্দগুপ্ত পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুপ্ত সাম্রাজ্য শাসন করেন। কোটালিপাড়া দুর্গ মাটির দেওয়াল বিশিষ্ট একটি বৃহৎ দুর্গ। ইহার উচ্চতা এখনও ১৫ হইতে ৩০ ফুট পর্যন্ত এবং চারি বর্গমাইল ব্যাপিয়া ইহার অবস্থান। এই দুর্গ নির্মিত হইলে ভারতবর্ষের একটি বিস্ময়কর বস্তুর মধ্যে ইহা অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে।" কোটালিপাড়া বর্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইংরেজ আমলে কোটালিপাড়া কখনও বা পশ্চিমে খুলনা জেলার সহিত, কখনও বা দক্ষিণে বাকরগঞ্জ জেলার সহিত, কখনও বা উত্তরে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। বর্তমানে 'কোটালিপাড়া' গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত।

২

ফরিদপূরে আবিষ্কৃত তাম্রখোদিত পাত্র হইতে জানা যায় যে, ষষ্ঠ শতকের শেষে এই ব-দ্বীপে আর একটি রাজবংশ রাজত্ব করিতেন।

উহাদের দুইটি তাম্রপত্র হইতে জানা যায় যে, ধর্মাদিত্য নরপতির সময়ে ভূমি হস্তান্তরের বিবরণ এবং তৃতীয় গোপচন্দ্র নামক রাজার সময়ের ভূমি হস্তান্তরের দলিল ছিল। ঐ সমস্ত দলিলকে কেবল 'ফরিদপুরের তাম্রপত্র' বলা হয়। Mr. Pargiter উহা ৫৩১ খ্রিস্টাব্দ, ৫৬৭ খ্রিস্টাব্দ এবং ৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের বলিয়া অনুমান করেন।

কোটালিপাড়া দুর্গের নিকট তাম্রপত্রে সম্পাদিত দানপত্র এবং মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় অন্যূন পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে এখানে যে একটি উপনিবেশ ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে কিছুদূরে ঘাঘরাহাটি গ্রামের জনৈক কৃষক "ঘাঘরাহাটি তাম্রপত্র" আবিষ্কার করে। দুর্গের ঐ স্থান হইতে তিন চতুর্থাংশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত গুয়াখোলা গ্রামের মধ্যবর্তী সোনাকান্দুরি মাঠের মধ্যে গুপ্ত সম্রাটদের নামাঙ্কিত সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কোটালিপাড়া হইতে প্রায় এক মাইল পূর্বে ঘাঘর নামে জনৈক অজ্ঞাত রাজার একটি সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া যায় এবং দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত-সংলগ্ন পিঞ্জুরী গ্রামের নিকটবর্তী মদনপাড়া গ্রামের সেনরাজবংশীয় বিশ্বরূপের তাম্রপত্রে সম্পাদিত এক দানপত্র পাওয়া গিয়াছে।

ঘাঘরহাটিতে প্রাপ্ত এবং বর্তমানে ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত তাম্রপত্রে সম্পাদিত দানপত্র দেখিয়া ঢাকা যাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে

সমাচারদেবের রাজত্বকালে প্রদত্ত ঐ দানপত্র সম্পর্কিত জমির সীমানার (চৌহদ্দির) নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা দিয়াছেন—পূর্বে প্রেত অধ্যুষিত পর্কটি বৃক্ষ, দক্ষিণে বিদ্যাধর জ্যোতিকা, পশ্চিমে চন্দ্রবর্মণের দুর্গ এবং উত্তরে গোপেন্দ্রচরক গ্রাম। দুর্গের উত্তরদিকে অবস্থিত স্থানটিকে তিনি স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিয়া উহার বিষয় নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা দিয়াছেন।—

"এই অঞ্চলটি স্থানীয় লোকদের নিকট বুজরুগর বা শিক্ষিত অথবা যাদুকরের স্থান বলিয়া পরিচিত—যেহেতু এখানে কোনও বুজরুগের বাসস্থান ছিল। এই স্থানের দুর্গ-সন্নিহিত জমি চতুর্দিকস্থ মাঠ হইতে পনের ফুট উচ্চ এবং বাহিরের খাল হইতে আরও অধিক উচ্চ দেখায়। ইহাব বিস্তার ১৫০ গজ। ঐ স্থান হইতে প্রায় আধ মাইল পশ্চিমে পরিত্যক্ত বসতবাটি আছে। উহাতে একটি পুষ্করিণী এবং পুষ্করিণীর পাড়ে বড় বড় বৃক্ষ আছে। ঐ বাড়িটিকে 'জটিয়াবাড়ি' বা 'জটিয়ার বাড়ি' বলা হয়। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, ঐ স্থানে বিদ্যাধর নামে জনৈক ব্যক্তি পত্নী জটিয়া বুড়িকে (অর্থাৎ তাহার জটওয়ালা বৃদ্ধাকে) লইয়া বাস করিত। পাশ্ববর্তী গ্রামসমূহের মধ্যে এই গ্রামটিতে অপদেবতার বাসভূমি বলিয়া অখ্যাতি ছিল, জটিয়াবুড়ির পুষ্করিণীর উত্তরপাড়ের দিকে পরস্পর হইতে কয়েকগজ ব্যবধানে দুইটি সমান্তরাল অদ্ভুত রাস্তা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল। গ্রামবাসীদিগকে পরস্পরের এত নিকটবর্তী রাস্তা দুইটির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তাহারা জানাইল যে, একটি রাস্তা রাজা ও তাহার কর্মচারীদের জন্য অপরটি সাধারণ লোকদের জন্য নির্মিত হইয়াছে। এই পাশাপাশি রাস্তা দুইটি নির্মাণের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, ইহা দ্বারা জ্যোতিকা বা দুইটি রাস্তার একত্র স্থাপন বুঝায়। এই স্থান হইতে সামান্য উত্তরে গোবিন্দপুর গ্রামের আরম্ভ এবং ইহাই তাম্রপত্রে বর্ণিত গোপেন্দ্রচরক। গোবিন্দ এবং গোপেন্দ্র—একই অর্থ প্রকাশ করে।"

ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে, দুর্গটি চন্দ্রবর্মণের—এইরূপ উল্লেখটি সমাচারদেবের তাম্রপত্রের সহিত শেষ যোগসূত্র। এই চন্দ্রবর্মণ কে ছিলেন? যিনি কোটালিপাড়া দুর্গের জন্য সমাচারদেবের সময় পর্যন্ত স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন? এই দুর্গটির আয়তন দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে আড়াই মাইল। ইহা বাংলাদেশের বৃহত্তম মৃত্তিকা-নির্মিত দুর্গ বলিয়া পরিচিত। 'মহাস্থান'-এর দুর্গটি আকারে ইহার পরবর্তী স্থান পাইতে পারে। ইহার আয়তন মাত্র ১০০০ × ১৫০০ গজ। এই মহাপরাক্রমশারী চন্দ্রবর্মণ কে ছিলেন—যিনি নিম্নভূমিতে এই বিরাট দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন—যাহার প্রাঙ্গন হইতে গুপ্ত সম্রাটদের মুদ্রাগুলি ক্রমশ আবিষ্কৃত হইতেছে? ইহা আমাদের 'মেহারুল' স্তম্ভে খোদিত চন্দ্রের কথা তৎক্ষণাৎ মনে করাইয়া দেয় যে, চন্দ্র তাহার সম্মিলিত শত্রুর বিরুদ্ধে বঙ্গদেশে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং যাহারা তাহার তরবারি দ্বারা তাহার যশ ঘোষিত করিয়াছিল। এই লিপির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে Fleet জোর দিয়াছেন, অথচ তাহার কোন তারিখ দেন নাই এবং Allan তাহার স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টির সহিত এই চন্দ্রই যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত—এই মতবাদটি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অবশেষে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন যে, সুসুনিয়া পর্বতে খোদিত পুষ্করণ-এর সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মণই এই চন্দ্র—যে চন্দ্রবর্মণকে সমুদ্রগুপ্ত চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের তৃতীয় দশকে বঙ্গদেশ ইহাতে বিতাড়িত করেন। যখন আমরা দেখি যে. প্রাচীন বঙ্গের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এক বিরাট দুর্গের আকারে এক অপরূপ স্মৃতিসৌধ এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতেও চন্দ্রবর্মার নাম হইতে উল্লিখিত হইয়াছে—তখন আমরা সেই বিদ্বান্ ব্যক্তিদের মতবাদ বিশ্বাস করিতে পারি। তাহারা বলিয়াছেন যে, 'মেহারুল' স্তম্ভে নামাঙ্কিত চন্দ্র এবং চন্দ্র একই ব্যক্তি। চন্দ্রবর্মার বঙ্গদেশে আগমন এবং তাহার এই দুর্গের আরম্ভের তারিখ মোটামুটিভাবে ৩১৫ খ্রিস্টাব্দ বলা যায়।

স্বাভাবিকভাবেই মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়—এই নিম্ন এবং জলাভূমিতে এই বিরাট দুর্গ কিরূপে নির্মিত হইল? ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই প্রশ্নটি উপলব্ধি করিয়াছেন এবং

তাহার একটি ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বর্তমানে কোটালিপাড়া বহু মাইল বিস্তৃত জলাভূমি দ্বারা বেষ্টিত ; কিন্তু ইহা চিন্তা করা যায় না যে, একজন স্থির মস্তিষ্ক মানুষ এইরূপ স্থানে রাজপ্রাসাদ নির্মাণের পরিকল্পনা করিবেন ; কিন্তু এই বৃহদাকার দুর্গটি সেখানে রহিয়াছে এবং এই জলাভূমিতে প্রায়ই ইষ্টক-নির্মিত গৃহাদির ধ্বংসাবশেষও পাওয়া যাইতেছে। Pargiter এবং অন্যান্যেরা অনুমান করিতেছেন—এই নিম্ন জলাভূমি ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে। এই ভূমিকম্পের সময় সম্বন্ধে অনুমান করা যায় যে, ধর্মাদিত্যের রাজত্বকালে একটি নূতন শহর গড়িয়া উঠিতেছিল ; কিন্তু ইহা তাহার রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয় না। লেখক এখানে 'ঘাঘরাহাটি' তাম্রপত্রে উল্লিখিত 'নব্যকশিক' অথবা প্রাদেশিক রাজধানীর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি অনুমানে ধর্মাদিত্যের একটি সময় নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, ধর্মাদিত্যের রাজত্বের পঞ্চম বা ষষ্ঠ বর্ষে একটি ভূমিকম্পে বিগত আড়াই শতাব্দীর রাজপরিবারের বাসস্থানের চতুর্দিক জলাভূমিতে পরিণত হইতে লাগিল এবং শাসন দপ্তরের প্রধান বিভাগগুলি অন্যান্য নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইল। কোটালিপাড়া অবশ্য 'ডিস্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টাস' হিসাবেই রহিল ; কিন্তু ইহার জমির মূল্য এইরূপ কমিয়া গেল যে প্রায় সমগ্র গ্রামটি এক ব্রাহ্মণকে দান করা হইল। সমাচারদেবের তাম্রপত্রে এই গ্রাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এই গ্রামে নিম্ন জলাভূমি আছে।

পূর্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা সঙ্গত হইবে যে, খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে কোটালিপাড়ার অস্তিত্ব পাওয়া যায় ; কিন্তু খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত কোটালিপাড়ার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা সম্ভব নহে ; কিন্তু একাদশ শতাব্দী হইতে কোটালিপাড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের কয়েকটি বিশিষ্ট ধারার সন্ধান পাওয়া যায়—যাহা হইতে অনায়াসেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দী হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত (বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত) অন্তত কয়েকটি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবার বংশপরম্পরায় কোটালিপাড়ায় বসবাস করিয়া আসিতেছেন। কালক্রমে এই সকল বংশ বহু বিস্তৃত হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে এই স্থান হইতেই অনেকে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন।

বিভিন্ন কুলপঞ্জিকা দৃষ্টে মনে হয় যে, ১০১৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মামুদ কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলে হিন্দু অধিবাসীদের অনেকে পলায়ন করিয়া স্বধর্ম রক্ষার চেষ্টা করেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়া ঘুরিয়া অতি দুর্গম কোটালিপাড়ায় আসিয়া সেই স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। কাহারও কাহারও মনে—তৎকালে বঙ্গদেশে 'সাগ্নিক' ব্রাহ্মণ না পাওয়ায় কোন বিশেষ যজ্ঞ উপলক্ষ্যে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করা হয় এবং তাহাদের কেহ কেহ কোটালিপাড়ায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন, পরবর্তী কালে কোটালিপাড়ায় যাহারা আগমন করেন, তাহাদের মধ্যে যজুর্বেদীয় কাশ্যপ গোত্রভুক্ত বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশধরদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এই বংশের পূর্বপুরুষ অগ্নিহোত্রী রামমিশ্র রাজা হরিবর্মার নিকট হইতে উনবিংশতি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর পান। অগ্নিহোত্রী রামমিশ্র সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে কোটালিপাড়ায় আগমন করেন। এই উনবিংশতির অপভ্রংশ 'উনশিয়া'[২] নামে পরিচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই 'উনশিয়া' কোটালিপাড়ার অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম। উনশিয়া গ্রামের একটি পাড়া 'কাশ্যপপাড়া' নামে অভিহিত। প্রবাদ ছিল যে, "বারোশত ব্রাহ্মণ তেরোশত আড়া—তাহার নাম কাশ্যপপাড়া।"

এই উনশিয়া গ্রামেই পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-মধুসূদন সরস্বতী প্রায় চারিশত তিরিশ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন।...

কিন্তু আমার পক্ষে একথা লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয় যে, বর্তমানকালের ইতিহাস শব্দটি

যে অর্থে ব্যবহার করা হইয়া থাকে, সেই অর্থে কোটালিপাড়ার গত চার-পাঁচশ বছরের ইতিহাস রচনা করা চলে। শুধু এইটুকুমাত্র বলা সম্ভব যে, গত চার-পাঁচশ বছর ধরিয়া কয়েকটি ব্রাহ্মণবংশের ধারা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। ইহার মধ্যে পাশ্চাত্য বৈদিক কাশ্যপ-বংশ অন্যতম প্রধান। এই বংশের বিবরণীর মাধ্যমেই কোটালিপাড়া-কাহিনির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি।

প্রসঙ্গত ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাহার 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' নামক অমূল্য গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৩০০) পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের বঙ্গে তথা কোটালিপাড়ায় আগমন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি—

"রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র বিভাগ ছাড়া ব্রাহ্মণদের আর একটি শ্রেণি, বৈদিক—বোধ হয় এই যুগেই উদ্ভূত হইয়াছিল।

কুলজী গ্রন্থমালায় এ সম্বন্ধে দুইটি কাহিনি আছে একটি কাহিনির মতে, বাংলাদেশে যথার্থ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ না থাকায় এবং যজ্ঞাগ্নি তথানিয়মে রক্ষিত না হওয়ায় রাজা শ্যামলবর্মা (বোধ হয় সামলবর্মা) কান্যকুব্জ হইতে (কোনও কোনও গ্রন্থ মতে বারাণসী হইতে) ১০০১ শকাব্দে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। অপর কাহিনি মতে ; সরস্বতী নদীতীরস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণেরা যবন আক্রমণের ভয়ে ভীত হইয়া বাংলাদেশে পলাইয়া আসেন এবং বর্মণরাজ হরিবর্মার পোষকতায় ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায় বসবাস আরম্ভ করেন। উত্তর ভারত হইতে আগত এই সব বৈদিক ব্রাহ্মণেরাই পাশ্চাত্য বৈদিক নামে খ্যাত। বৈদিক ব্রাহ্মণদের আর একশাখা আসেন উৎকল ও দ্রাবিড় হইতে ; ইহারা 'দাক্ষিণাত্য বৈদিক' নামে খ্যাত। এই কুলজী কাহিনির মূল্যবোধ হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। এই গ্রন্থ রচনার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া হলায়ুধ বলিতেছেন—রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ করিতেন না এবং সেই হেতু বৈদিক যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের রীতি-পদ্ধতিও জানিতেন না ; যথার্থ বেদজ্ঞান তাহার সময়ে উৎকল ও পাশ্চাত্য দেশেই প্রচলিত ছিল। বাংলার ব্রাহ্মণেরা নিজেদের বেদজ্ঞ বলিয়া দাবি করিলেও যথার্থ বেদচর্চার প্রচলন বোধ হয় সত্যই তাহাদের মধ্যে ছিল না। যেখানে চোর-ডাকাতের ভয় নাই, ত্যাগী ও মনীষী মানবগণের আশ্রয় ভূমি, যে দেশ মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ মর্মরনাথ প্রবাহিত হইতেছে, যে নদকে কোন কোন পণ্ডিত ব্রহ্মপুত্র বলিয়া থাকেন, তাহার পূর্বদিকে অত্যুচ্চ ভূমিতে তাহারা উৎসাহের সহিত নয়খানি পর্ণনির্মিত গৃহনির্মাণ করিলেন। গৃহের চুতর্দিকে ভল্লাতক, আম্রাতক, বিল্ব, বারুণ, প্লক্ষ, ধাত্রী, কদম্ব, হিজ্জল, অশোক আম্র, জম্বু, কিংশুক প্রভৃতি গ্রাম্য বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছিল।

সেই দেশ বর্ষাকালে জলমগ্ন থাকে, গমনাগমনের পথে প্রচুর জল হয়। ইহা দেখিয়া, তাহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার জন্য কদলীবৃক্ষের দ্বারা ছোট ও বড় নানাপ্রকার ভেলা নির্মাণ করিলেন। তাহারা বাঁশ, বেত, মুঞ্জা, কন্দুল ও কাশ দ্বারা অতি দৃঢ় গৃহসকল নির্মাণ করিয়াছিলেন।"

অতি পূর্বকালে বৈদ্যবংশীয় করমজুমদারগণ কোটালিপাড়া পরগণার মালিক ছিলেন। পরে দেনার দায়ে তাহারা স্বনামের পরিবর্তে স্বীয় পুরোহিতের নামে সমস্ত সম্পত্তি বেনামী করেন। জমিদারির কার্য পুরোহিতের নামে চলিতে থাকে। কিছুদিন পরে পুরোহিত বলিলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে করমজুমদারগণ এই পরগণার মালিক নহেন। তিনি অর্থ দ্বারা তাহাদের নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়াছেন। তদবধি, প্রকৃতরূপে পুরোহিতই ইহার জমিদার হন।...

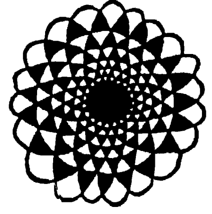
* * *

হলায়ুধের আগে বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট ও তাহার 'পিতৃদয়িতা' গ্রন্থে বাংলাদেশে

বেদচর্চার অবহেলা দেখিয়া দুঃখ করিয়াছেন। যাহা হউক, পাশ্চাত্য বলিতে হলায়ুধ এক্ষেত্রে উত্তর ভারতকেই বুঝাইতেছেন সন্দেহ নাই। বাংলাদেশে উৎকল ও পাশ্চাত্য দেশাগত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তখন বসবাস করিতেছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে হলায়ুধ কিছু বলেন না; তবুও সামলবর্মা ও হরিবর্মার সঙ্গে কুলজি কাহিনির সম্বন্ধ ও তাহাদের মোটামুটি তারিখ, অনিরুদ্ধ ভট্ট ও হলায়ুধ কথিত রাঢ়ে বরেন্দ্রীতে বেদচর্চার অভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎকল ও পশ্চিম দেশসমূহে বেদজ্ঞানের প্রসার পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য—এই দুই শাখায় বৈদিক ব্রাহ্মণদের উদ্ভব দেখা দিয়াছিল।" খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত 'বৈদিক-কুল-পঞ্জিকায়' তৎকালীন কোটালিপাড়া সম্বন্ধে এইরূপ একটি বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়—

"ততঃ প্রয়াতঃ পুরুহূত-পালিতাং দিশঞ্চ তত্তৎ পারচিন্তয়াকুলঃ।
দেশং সুরম্যং বহুশস্যযুক্তং কোটালিপাটস্তবহার বর্জিতম্।।
সন্ন্যাসিমামাশ্রয় দস্যুহীনো বাসায় দেশো রুচয়ে বভূব।।
যদ্দেশমধ্যে স হি ঘর্ঘরো নদো যৎ ব্রহ্মপুত্রেতি চ কেচনাহবদন্।
তস্যেন্দ্রভাগে স্থতিতুঙ্গভূতলে পর্ণালয়ানাং নবচক্রুরুৎসুকাঃ।।
ভল্লাতকাম্রাতক-বিল্ববারুণা ধাত্রীজ্বল-প্লক্ষ-কদম্ব-হিজ্জলাঃ।
অশোক-জম্বাম্রক-বংশ কিংশুকা বিরেজিরে তে যুগদিক্ষু বেশ্মনঃ।।"
"বিলোক্য তস্মাজ্জলমগ্নদেশং বর্ষাগমে বর্ত্মসু ভূরি বারি।
ভেলাং প্রচক্রুঃ কদলীদ্রুমৈশ্চ ক্ষুদ্রাঞ্চ দীর্ঘাং গমনাগমায়।।
ততশ্চ সর্বে স্বগৃহানি চক্রুর্দৃঢানি মুঞ্জা-পরিবেষ্টিতানি।
কন্দুল কার্শোদ্ধসমাচিতানি বংশৈশ্চ বেত্রৈশ্চ নবানি তত্র।।"

ইহার তাৎপর্য এই যে, "তাহারা বাসস্থানের চিন্তায় ব্যাকুলচিত্তে পূর্বদিকে গমন করিয়া কোটালিপাড়ায় উপনীত হইলেন। দেখিলেন, এই স্থানটি অতি রমণীয়, বহুশস্যযুক্ত, ফলভরে অবনত পাদপরাজি বিরাজিত।"... *প্রবাসী ১৩৭৩, শ্রাবণ ও ভাদ্র*



ফরিদপুরের প্রাচীন তাম্রলিপি*

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য

নদীমাতৃক ফরিদপুর জেলায় প্রাচীন কীর্তি খুব বেশি নাই। এই জেলার উত্তর পশ্চিমাংশের ভূমি উন্নত এবং নিকটবর্তী পশ্চিমস্থ জেলাগুলির ভূমির সহিত অনেকটা সম-ভাবাপন্ন, দক্ষিণাংশ—কোটালিপাড়া প্রভৃতি—নিম্নভূমি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন এই নিম্নভূমি হইতে যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, উত্তর পশ্চিম বা মধ্য ফরিদপুর হইতে ততটা হয় নাই ; হয়ত' আবিষ্কারের চেষ্টাও হয় নাই। দক্ষিণ ফরিদপুরে আবিষ্কৃত এই সকল নিদর্শন কেবল ফরিদপুরের নহে সমগ্র বঙ্গদেশের ইতিহাসের সহিত জড়িত। ইহাতে খুব প্রাচীন কালের যে রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র পাওয়া যায় প্রাচীন নিম্নবঙ্গের সেরূপ চিত্র আর কিছুতেই পাওয়া যায় না।

অনেকের মতে কোটালিপাড় বা কোটালিপাড়া চিরকাল এতটা নিম্নভূমি ছিল না। এক সময়ে অবশ্যই সমুদ্রজল-বিধৌত ছিল, কিন্তু উন্নত হওয়ার পর পুনরায় কোন নৈসর্গিক কারণে অবনমিত হইয়া গিয়াছে। ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের মতে পূর্ববঙ্গে সভ্যতাব কেন্দ্র প্রথম কোটালিপাড়া, দ্বিতীয় ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভার, তৃতীয় বিক্রমপুর।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সুপ্রাচীন এবং এক্ষণে বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত ৪খানি তাম্রলিপি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তাম্রলিপি ৪ খানি যে মহারাজাধিরাজদিগের সময়ে প্রদত্ত তাঁহাদের নাম ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচার দেব। ধর্মাদিত্যের সময়ের ২খানি লিপির মধ্যে একখানি ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে, অপরখানি ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত। গোপচন্দ্রের সময়কার তাম্রলিপি ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে এবং সমাচারদেবের আমলের খানি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত। শেষোক্ত তাম্রলিপি খানি কোটালিপাড়ার ঘুঘরাহাটি গ্রামে জনৈক কৃষক মাটির নিচে পায়। সে সময় এ অঞ্চলে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ মৈত্র (যিনি এখন জলজ কচুরির সহিত যুদ্ধ করিতেছেন) অ্যাসিস্ট্যান্ট সেট্‌লমেন্ট অফিসারের পদে ছিলেন, তিনি তাম্রলিপি খানি সংগ্রহ করিয়া তৎকালীন ঢাকা বিভাগের স্কুল-ইন্সপেক্টর মিঃ এইচ, ই, স্টেপল্‌টন সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। ক্রমে ইহা শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে পৌছে এবং তিনিই প্রথম এশিয়াটিক সোসাইটিতে ইহার পরিচয় প্রদান করেন।[১] তাহার পর অনেকেই ইহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন ; তাম্রফলকখানি ঢাকা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। অপর তিনখানিও ফরিদপুর জেলা হইতে ডাক্তার হর্ণলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; কিন্তু কোন গ্রামে যে এগুলি পাওয়া গেল তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। শিলাকুণ্ড ও শিলাকুণ্ডগ্রামের এবং পূর্ব সমুদ্রের উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় এগুলিও কোটালিপাড়া বা তাহার নিকটস্থ কোনও স্থানে ভূমিদান উপলক্ষে প্রস্তুত হইয়াছিল। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি পার্জিটার সাহেব ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে "Indian antiquary" পত্রিকায় এগুলি টীকা টিপ্পনী ও ইংরাজি অনুবাদ সমেত প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনিও সকল কথা পড়িতে পারেন নাই। ৪খানি

** ফরিদপুর সাহিত্য সমিতিতে পঠিত প্রবন্ধ-স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত।*

তাম্রলিপিই ভূমির হস্তান্তরকরণের দলিল, প্রাচীন গুপ্ত অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লেখা। নিম্নে তাম্রলিপিগুলির যথাসাধ্য বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

১। ধর্মাদিত্যের আমলের প্রথম তাম্রলিপি ঃ—

বারকমণ্ডল-বিষয়াধিকরণের মোহর)

ওঁ স্বস্তি। এই পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ধৃতিতে যযাতি ও অম্বরীষের তুল্য, মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্মাদিত্যের রাজ্যে তাহারই অনুগ্রহে লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহারাজ স্থানুদত্তের অধিষ্ঠান-কালে, বারক-মণ্ডলে তাহার নিযুক্ত বিষয়পতি জজাবের[২] কর্তৃত্ব ও শাসন সংরক্ষণ ছিল। ইটিত, কুলচন্দ্র, গরুড়, বৃহচ্চট্ট, আলুক, অনাচার, ভাশৈত্য, শুভদেব, ঘোষচন্দ্র, আনিমিত্র, গুণচন্দ্র, কালসখ, কুলস্বামী, দুর্লভ, সত্যচন্দ্র, অর্জুনবপ্প, কুণ্ডলিপ্ত প্রমুভ বিষয়-মহত্তরগণকে[৩] এবং প্রজাসাধারণকে সাধনিক[৪] বাতভোগ জানাইলেন, আমি "আপনাদিগের নিকট হইতে একখণ্ড ক্ষেত্র ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিতে ইচ্ছা করি, আমার নিকট মূল্য গ্রহণ করতঃ বিষয়ে ভাগ করিয়া দিন।" এই প্রার্থনা শুনিয়া আমরা একমত হইয়া পুস্তপাল[৫] বিনয়সেনের অবধারণ মত স্থির করিলাম এই বিষয়ে পূর্বসমুদ্রকূলে প্রতিকুল্য[৬] বপনোপযোগী ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট মূল্য চারি দীনার[৭]। সেইরূপ বপনোপযোগী ক্ষেত্র দৃষ্টিপূর্বক খণ্ডীকৃত করিয়া তাম্রপট্ট দ্বারা বিক্রয় করাই প্রথা। আর পরম ভট্টারকের[৮] চরণের ষড়্‌ভাগলাভ এখনকার ধর্ম[*]। তখন এই ব্যাপার অবগত হইয়া, নিজের পুণ্যকীর্তি স্থাপনের অভিলাষী ব্যক্তির যেমন সঙ্কল্প তেমন ক্রিয়াদ্বারা, সাধনিক বাতভোগ আমাদের সম্মুখে দ্বাদশ দীনার প্রদান করিলে শিবচন্দ্রের হস্তে ৮ নল ৯ নল পরিমাণ (হিসাবে) (ভূমি) পৃথক করিয়া ধ্রুবিলাটিতে[১০] তাম্রপত্রের নিয়মমত কুল্যাত্রয়-বপনোপযোগী ভূমি বাতভোগের নিকট বিক্রয় করিলাম। পারত্রিক উপকারাকাঙক্ষী এই বাতভোগ চন্দ্রতারকাসূর্যের যতকাল স্থিতি ততকাল ভোগের জন্য, ভরদ্বাজগোত্রীয় বাজসনেয় ষড়ঙ্গাধ্যায়ী চন্দ্রস্বামীকে মাতাপিতার উপকারার্থ আনন্দের সহিত দান করিলেন। অতএব উপরিলিখিত দানপত্রের নিকটস্থ শাস্ত্রজ্ঞ সামন্ত রাজগণ, দত্তভূমির রক্ষা বা ত্যাগে গ্রহীতার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিলেও তাহা এই রাজাদিগের প্রতিপাদনীয়[১১] ইহা ভালরূপ বুঝিয়া, ভূমিদান বিশেষরূপে রক্ষা করিবেন। এবং সীমার চিহ্ন এইরূপ ঃ—পূর্বে হিমসেনের গ্রামাংশ, দক্ষিণে তিনটি ঘাট ও অপর তাম্রলিপির জমি, পশ্চিমে তিনঘাটে যাওয়ার পথ ও শিলাকুণ্ড, উত্তরে নাবাতাক্ষেণী[১২] ও হিম সেনের গ্রামাংশ। এখানে একটি শ্লোক আছে—যে ব্যক্তি স্বদত্ত বা পরদত্ত ভূমি হরণ করে সে বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া পিতৃগণের সহিত পচিতে থাকে। সম্বৎ ও বৈশা দি ৫

২। ধর্মাদিত্যের আমলের দ্বিতীয় তাম্রলিপি ঃ—

(বারকমণ্ডল-বিষয়াধিকরণের মোহর)

স্বস্তি! এই পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ধৃতিতে নৃগ, নহুষ, যযাতি ও অম্বরীষের তুল্য, মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্মাদিত্য ভট্টারকের রাজ্যে তাহার প্রবর্তনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ নব্যাবকাশিকায়[১৩] মহাপ্রতীহারোপরিক[১৪] নাগদেবের অধিষ্ঠানকালে তাঁহা কর্তৃক বারকমণ্ডলবিষয়ে ব্যাপারকারণ্ডয়[১৫] (পদে) গোপালস্বামী অধিনিযুক্ত (আছেন)। ইহার কার্যকালে বাসুদেব স্বামী জ্যেষ্ঠকায়স্থ[১৬] নয়সেন-প্রমুখ অধিকরণ-মহত্তর[১৭] ও সোমঘোষ প্রমুখ বিষয়-মহত্তরদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া সাদরে জানাইলেন—(আমি) "আপনাদের অনুগ্রহে আপনাদিগের নিকট হইতে উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্ষেত্রখণ্ড ক্রয় করতঃ মাতাপিতার ও নিজের পুণ্য অভিবর্ধনের জন্য কাণ্ব বাজসনেয় লৌহিত্যগোত্রীয় গুণবান ব্রাহ্মণ সোমস্বামীকে দান করিতে ইচ্ছা করি। অতএব আমার নিবেদনমত ভূমিখণ্ড পৃথক করিয়া দিন।" এই প্রার্থনানুযায়ী—যেহেতু এই পূর্বাঞ্চলে ক্রয় ব্যাপারে এক কুল্য-বপনোপযোগী ক্ষেত্রের চারি দীনার মূল্য এইরূপ হার নির্দিষ্ট—বসুস্বামীর নিকট দুই দীনার গ্রহণ করিয়া[১৮] ......কুল্যবপনোপযোগী খিল ভূমি ও

তদতিরিক্ত এক[১৯] প্রবর্তবপনোপযোগী ভূমি ..... পুস্তপাল জন্মভূমির অবধারণমত স্থির করতঃ শ্রীমান মহত্তর থোড়ের ক্ষেত্রখণ্ড হইতে ..... বিশ্বাসী ও ধর্মশীল শিবচন্দ্রের হস্তে ৮ ও ৯ নলের (মাপে) বিচ্ছিন্ন কবিয়া বসুদেব ব্রাহ্মণের নিকট বিক্রয় করিলাম, তিনিও ক্রয় করিলেন। এবং সীমার চিহ্ন এইরূপ ঃ—পূর্বদিকে সোগের (?) তাম্রপটের সীমা, (দক্ষিণে) প্রাচীন পট্টুকি ও পর্কটি বৃক্ষের[২০] সীমা, পশ্চিমে গোরথ্য[২১] (?) এবং নৌদণ্ডক[২২] সীমা, উত্তরে গর্গস্বামীর তাম্রপট্টের জমির সীমা। এ বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রের শ্লোক আছে—ভূমিদ ষষ্টিসহস্র বৎসর স্বর্গে আনন্দে থাকেন, আক্ষেপকারী[২৩] ও তাহার অনুমন্তা[২৪] ততকাল নরকে বাস করে। যে স্বদত্ত বা পবদত্ত ভূমি হরণ করে সে বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া পিতৃগণসহ পচিতে থাকে।

৩। গোপচন্দ্রের সময়ের তাম্রলিপি—[২৫]

(বারকমণ্ডলবিষয়াধিকরণের মোহর)

স্বস্তি। এই পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ধৃতিতে যযাতি ও অম্বরীষের তুল্য, মহারাজাধিরাজ শ্রীগোপচন্দ্র ভট্টারকের রাজ্যে (তাহার অনুগ্রহে) লব্ধগৌরব নব্যাবকাশিকায় মহাপ্রতীহার ও বাণিজ্যব্যাপারপরিচালনার প্রধান অমাত্য উপরিক নাগদেবের অধিষ্ঠান-কালে, যখন তিনি কার্য পরিচালনায় ছিলেন, বারুকমণ্ডলবিষয়ব্যাপারে[২৬] বিনিযুক্ত বৎসপালস্বামী জ্যেষ্ঠকায়স্থনয়সেন প্রমুখ অধিকরণমহত্তর ও বিষয়কুণ্ড ..... ঘোষচন্দ্র, অনাচার, রাজ্য ... প্রমুখ বিষয়মহত্তর ও প্রধান ব্যবসায়ীদিগকে (?) ... যথাযথরূপে জানাইলেন "আপনাদিগের অনুগ্রহে ... মহাকোট্টিকনামা .... কুল্যবপনোপযোগী ক্ষেত্র উপযুক্ত মূল্যে মাতাপিতার ও নিজের পুণ্য অভিবর্ধনের জন্য ক্রয় করিয়া গুণবান কাণ্ব (?) বাজসনেয় লৌহিত্য (ভ) ট্ট গোমিদত্তস্বামীকে দান করিতে ইচ্ছা করি। অতএব আপনারা ভরদ্বাজগোত্রীয় আমা হইতে[২৭] মূল্য গ্রহণ করিয়া ভূমিখণ্ড চিহ্নিত করিয়া দিন (?)। এই প্রার্থনানুযায়ী—যেহেতু পূর্বদেশীয় ব্যাপারে প্রবর্তিত নিয়মানুসারে প্রতিকুল্য-বপনোপযোগী ভূমির বিক্রয়-মূল্য চারি দীনার—পুস্তপাল নয়ভূতির তিন স্থলে নির্দেশক্রমে বিষয়াধিকরণ কর্তৃক অধিকরণের লোককে কুলবার[২৮] সাব্যস্ত করিয়া বিশ্বস্ত ও ধর্মশীল শিবচন্দ্রের হস্তে আট ও নয় নল (হিসাবে) বৎসপালস্বামী এক কুল্যবপনোপযোগী ক্ষেত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া বিক্রয় করা হইল। ইনিও ক্রয় করিয়া বিধিপূর্বক ভট্ট গোমিদত্ত স্বামীকে পুত্রপৌত্রক্রমে দান করিলেন—এবং সীমার চিহ্ন এইরূপ ঃ—পূর্বদিকে ধ্রুবিলাটি অগ্রহারের[২৯] সীমা, দক্ষিণে করঙ্ক,[৩০] পশ্চিমে শিলাকুণ্ড গ্রামের সীমা, উত্তরে করঙ্কের সীমা। যে স্বদত্ত বা পরদত্ত ভূমি হরণ করে সে বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া পিতৃগণের সহিত পচিতে থাকে। সম্বৎ ১৯

৪। সমাচারদেবের আমলের তাম্রফলক—

স্বস্তি। এই পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ধৃতিতে নৃগ, নহুষ, যযাতি ও অম্বরীষের তুল্য, মহারাজাধিরাজ শ্রীসমাচারদেবের প্রতাপযুক্ত রাজত্বকালে তাহার চরণকমলযুগল আরাধনা করিয়া নব্যাবকাশিকায় সুবর্ণবীথ্যাধিকারী[৩১] অন্তরঙ্গ উপরিক জীবদত্ত এবং তাহার (জীবদত্তের) অনুমোদনক্রমে বারকমণ্ডলে পবিত্রক বিষয়পতি (ছিলেন)। যেহেতু ইহার কার্যকালে সুপ্রতীক স্বামী জ্যেষ্ঠাধিকরণিক[৩২] দামুক প্রমুখ অধিকরণ এবং বিষয়-মহত্তর বৎসকুণ্ড, মহত্তর শুচিপালিত, মহত্তর বিহিত ঘোষ, শূরদত্ত, মহত্তর প্রিয়দত্ত, মহত্তর জনার্দন কুণ্ড প্রভৃতিকে এবং অন্য অনেক প্রধান ও অন্যান্য ব্যবহারজ্ঞ লোককে এইরূপ জানাইলেন, আমি আপনাদের অনুগ্রহে দীর্ঘকাল অবসন্ন পতিত ভূমিখণ্ড বলিচরুসত্র প্রবর্তনের[৩৩] জন্য ও ব্রাহ্মণের ভোগের জন্য ইচ্ছা করি, আপনারা তাম্রপত্র দ্বারা এই অনুগ্রহ করুন," তজ্জন্য উপরিলিখিত ব্যক্তিগণ ও অন্যান্য ব্যবহারজ্ঞ লোক এই প্রার্থনা শুনিয়া এবং গহ্বরযুক্ত শ্বাপদ-সেবিত ভূমি রাজাব ধর্ম ও অর্থের পক্ষে নিষ্ফল, আর যে ভূমি ভোগ্যীকৃত তাহা রাজার

অর্থ ও ধর্মজনক ইহা স্মরণ করিয়া উহা এই ব্রাহ্মণকে দেওয়া হউক এইরূপ স্থির করতঃ করণিক[৩৪] নয়নাগ প্রভৃতিকে কুলবার সাবাস্থ করিয়া পূর্বে তাম্রপট্টীকৃত তিনকুল্যবপনোপযোগী ক্ষেত্র পৃথক করিয়া ব্যাঘ্রচোরকের অবশিষ্ট চতুঃসীমাব চিহ্ন নির্দেশ করতঃ সুপ্রতীক স্বামীকে তাম্রপট্ট দ্বারা অর্পণ করিলেন এবং ইহার সীমার চিহ্ন এইরূপ ঃ—

পূর্বে পিশাচপর্কটী, দক্ষিণে বিধ্যাধরজোটিকা, পশ্চিমে চন্দ্রবর্মার কোটের কোণ, উত্তরে গোপেন্দ্রচোরক গ্রামের সীমা ইতি। এ বিষয়ে শ্লোক আছে—ভূমিদ ষষ্টি সহস্র বর্ষ স্বর্গে আনন্দে থাকেন, আক্ষেপকারী এবং তাহার অনুমতিদাতা ততকাল নরকে বাস করে ; যে স্বদত্ত বা পরদত্ত ভূমি হরণ করে সে বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া পিতৃগণসহ পচিতে থাকে।। সম্বৎ ১।৪ কার্তি দি ২।।

এই সকল লিপি পুরাবিৎগণ খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীব মনে করেন। রাখালবাবু বলেন এগুলি কূটশাসন অর্থাৎ পরবর্তীকালের জাল কিন্তু সে পরবর্তীকালও প্রাচীন কাল। পার্জিটার সাহেব প্রমুখ অনেকেই কিন্তু এগুলিকে খাঁটি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।[৩৫] রাখালবাবুর বিরুদ্ধ মতের একটি প্রধান যুক্তি বিভিন্ন শতাব্দীব প্রচলিত অক্ষরের একত্র সমাবেশ। পার্জিটাব সাহেব এই যুক্তির অনেকটা খণ্ডন করিয়াছেন, দিনাজপুর জেলার দামোদরপুরে আবিষ্কৃত গুপ্ত আমলের তাম্রলিপি রাখালবাবুর যুক্তিকে আরও দুর্বল করিযা দিয়াছে। দামোদরপুবে যে পাঁচটি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার পাঠোদ্ধারকর্তা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বলেন রাখালবাবুর মত এখন আর কিছুতেই টিকিতে পারে না, পার্জিটার সাহেবকেই মানিয়া লইতে হইবে, ফরিদপুবের তাম্রলিপিগুলি সম্পূর্ণ খাঁটি।[৩৬]

তাম্রলিপিগুলি যে স্থানে স্থানে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য তাহাব জন্য প্রধানত দায়ী কালের ধ্বংসকারী শক্তি। তাহা দ্বারা এগুলি কূটশাসন প্রতিপন্ন হয় না। এগুলি যে রাজদত্ত শাসন নহে তাহাও এগুলিকে জাল প্রতিপন্ন করার পক্ষে অনুকূল প্রমাণ হইতে পাবে না। লোকে জাল করিতে গেলে প্রাচীন প্রথানুযায়ী দলিলের নকল করিয়া থাকে, এগুলি সেবকম নকল নহে। তাম্রলিপিগুলির এমন একটু বিশেষত্ব আছে যাহা দলিলের অকৃত্রিমত্ব দেখাইযা দেয়। আবার কিছুদিন পূর্বে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে সমাচারদের নামে বাস্তবিকই এক প্রাচীন রাজা ছিলেন; তাহার নামাঙ্কিত একটি মুদ্রা যশোহর জেলার মহম্মদপুরেব নিকট অরুণখালি নদীর তীবে পাওয়া গিয়াছে, আরও একটি মুদ্রা অন্যত্র পাওয়া গিয়াছে।[৩৭] রাখালবাবু যে পরবর্তী সময়ের কথা বলেন সে সময়ে দক্ষিণ বঙ্গে সমাচারদেবের নাম ভুলিয়া যাওবার কথা। কোন প্রকৃত অথচ অজ্ঞাতনামা রাজার নাম তাম্রফলকে কেমন করিয়া আসিবে? অক্ষরও দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরকম হইতে পারে। যিনি কোন প্রাচীন দলিলকে জাল বলেন, প্রমাণের ভার তাহার উপর। রাখালবাবু যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াছেন অক্ষর-তত্ত্বজ্ঞ অনেকেই যখন সে প্রমাণ মানিতেছেন না। তখন পার্জিটার সাহেবের মতেরই আমরা অনুসবণ করিতে বাধ্য।

পার্জিটাব সাহেব ডাঃ হর্ণলীর মত গ্রহণ করতঃ মনে করেন তাম্রফলকের 'ধর্মাদিত্য' বঙ্গবিজেতা রাজা যশোধর্মদেবের নামান্তর। যশোধর্মদেবের শাসন বাংলায় ৫২৯—৩০ খ্রিস্টাব্দে বদ্ধমূল হয়। কিন্তু 'ধর্মাদিত্য' যে যশোধর্মদেবের বিরুদ বা উপাধিবিশেষ এমন কোন প্রমাণ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আমরা ধর্মাদিত্যকে যশোধর্মদেব বলিয়া গ্রহণ করিতে অপারগ। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ধর্মাদিত্যকে যশোধর্মদেবের পরবর্তী কোন রাজা বলিয়া গ্রহণ কবিয়াছেন। রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যমহার্ণব মহাশয়ের মতে ধর্মাদিত্য যশোধর্মদেবের সমসাময়িক বা অত্যল্প কাল-পরবর্তী।[৩৮] প্রসিদ্ধ গুপ্তবংশীয় নৃপতিদের অনেকের 'আদিত্য' শব্দযুক্ত নামান্তর ছিল। খুব সম্ভব ধর্মাদিত্যও এই গুপ্তবংশীয় ছিলেন। আলোচ্য তাম্রলিপিগুলি হইতে জানা যায় ইহাব প্রথমখানি তাহার রাজত্বের তৃতীয়

বৎসরে উৎকীর্ণ, দ্বিতীয়খানি কোন বৎসরে তাহার উল্লেখ নাই। পার্জিটার সাহেব অক্ষর ধরিয়া এবং তাম্রলিপিতে উল্লিখিত ব্যক্তিদের নাম ধরিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ধর্মাদিত্যের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ তাম্রলিপি সময়ের হিসাবে প্রথম, তাহার আমলের অপরখানি দ্বিতীয় এবং গোপচন্দ্রের আমলের খানা তৃতীয়। অক্ষর হিসাবে ৩০।৩৫ বৎসরের পৌর্বাপর্য ঠিক করিতে যাওয়া আমি দুঃসাহসিকতা মনে করি। তবে দেখা যাইতেছে শেষোক্ত দুইখানিতেই উপরিক নাগদেব এবং জ্যেষ্ঠকায়স্থ নয়সেন আছেন সুতরাং এই দুইখানির মধ্যবর্তী সময়ে অপরখানি স্থান পাইতে পারে না ; সে খানির স্থান হয় ইহাদের পূর্বে, নয় ত পরে। যাঁহার হস্তে জমির মাপ হইতেছে সেই শিবচন্দ্র তিনখানিতেই আছেন, কিন্তু ধর্মাদিত্যের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে খোদিত তাম্রলিপির সময়ে তিনি শুধুই শিবচন্দ্র, অপর দুইখানির সময়ে 'বিশ্বস্ত' ও 'ধর্মশীল' শিবচন্দ্র। এই গৌরব লাভ করিতে তাহার অবশ্যই সময় লাগিয়াছিল, সুতরাং ধর্মাদিত্যের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের তাম্রলিপিই প্রাচীনতম এবং গোপচন্দ্রের আমলের খানা তৃতীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। এখন কথা হইতেছে সমাচার দেবের সময়ের। পার্জিটার সাহেব ইহাকে তাম্রলিপির অক্ষর বিচারে ধর্মাদিত্য ও গোপচন্দ্রের পরবর্তী রাজা বলিয়া স্থির করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় মুদ্রাতত্ত্বের আলোচনার পর এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন , সুতরাং অন্য বিরুদ্ধ প্রমাণ উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা এই মতই গ্রহণ করিলাম।

ধর্মাদিত্যের রাজ্যকালের পরিমাণ সম্বন্ধেও পার্জিটার সাহেব অনেকটা যুক্তিযুক্ত প্রণালীতে একটি মত দাঁড় করাইয়াছেন। তৃতীয় তাম্রলিপিখানি গোপচন্দ্রের রাজত্বের ঊনবিংশ বৎসরে উৎকীর্ণ। শিবচন্দ্রের যখন প্রথম চাকরি তখন তাহার বয়স ১৮ এবং তৃতীয় তাম্রফলকের সময়ে তাহার বয়স ৭০ ধরিয়া লইলে প্রথম ও তৃতীয় তাম্রলিপির সময়ের ব্যবধান ৫২ বৎসরের অধিক দাঁড়ায় না। প্রথম তাম্রলিপি ধর্মাদিত্যের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে খোদিত সুতরাং ধর্মাদিত্যের রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে গোপচন্দ্রের আমলের তাম্রলিপির ব্যবধান বড় জোর ৫৫ বৎসর,[৩৯] খুব সম্ভবত আরও কম। অনাচার ও ঘোষচন্দ্র নামক দুইজন মহত্তরের নাম আবার প্রথম ও তৃতীয় তাম্রলিপিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগেরও 'মহত্তর' পদবি লাভে অবশ্য কিছু সময় লাগিয়াছিল। যাহা হউক উভয় তাম্রলিপির ব্যবধান ৫২ বৎসর ধরিয়া লইলে এবং তাহা হইতে গোপচন্দ্রের রাজত্বের ১৮ কি ১৯ বৎসর বাদ দিলে আমরা ধর্মাদিত্যের রাজত্বকাল ঊর্ধ্ব সংখ্যা ৩৬ কি ৩৭ বৎসর পাই।[৪০] পার্জিটার সাহেব আরও মনে করেন দ্বিতীয় তাম্রলিপির মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান প্রথম ও দ্বিতীয় তাম্রলিপির মধ্যে ব্যবধান তাহা অপেক্ষা বেশি। তাহার এইরূপ অনুমানের প্রথম কারণ—দ্বিতীয় তাম্রলিপির সময়ে যখন শিবচন্দ্র "বিশ্বস্ত" ও "ধর্মশীল" আখ্যা পাইয়াছেন তখন তাহার চাকরি অবশ্য অনেকদিনের হইয়া গিয়াছে ; দ্বিতীয় কারণ—দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় তাম্রলিপিতেই নয়সেন জ্যেষ্ঠ কায়স্থ অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কায়স্থ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। সর্বপ্রাচীন ব্যক্তি আর কত কালই বা কর্মজগতে থাকিতে পারে? এই মতের সারবত্তা কিন্তু আমি বুঝিতে পারি নাই। প্রথমত 'বিশ্বস্ত' ও 'ধর্মশীল' বিশেষণ অর্জন করিতে অবশ্য কিছু সময় লাগে, কিন্তু এই অর্জনে যতকাল লাগে অর্জনের পর লোকটি যে আরও ততকাল কর্মজগতে থাকিতে পারে না এ কথা স্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয়ত, "জ্যেষ্ঠ কায়স্থ" শব্দ জাতিবাচক বলিয়া আমার মোটেই মনে হয় না। সে সম্বন্ধে পরে বলিতেছি।

পার্জিটার সাহেব ধর্মাদিত্যকে যশোধর্মদেবের সহিত অভিন্ন ধরিয়া লইয়া তাহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষ অর্থাৎ প্রথম তাম্রলিপির সময় ৫৩১ খ্রিস্টাব্দ মনে করিয়াছেন এবং ৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে তাহার রাজত্বের শেষ ও গোপচন্দ্রের রাজত্বের আরম্ভ অনুমান করিয়াছেন। নলিনী বাবু খ্রিঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া ধর্মাদিত্যের সময় ৫৫০—৫৬৫ খ্রিস্টাব্দ (হয়ত

৫৫০ খ্রিস্টাব্দেরও পূর্ববর্তী সময় হইতে) এবং গোপচন্দ্রের সময় ৫৬৫—৫৮৫ খ্রিস্টাব্দ অনুমান করেন। তাহার মতে আমাদের চতুর্থ তাম্রফলকে উল্লিখিত সমাচার দেবের সময় অনুমান ৫৮৫—৬০২ খ্রিস্টাব্দ। পূর্বেই বলা হইয়াছে তিনি দুইটি সুবর্ণমুদ্রায় সমাচারদেবের নাম পড়িতে পারিয়াছেন। ইহাব একটি কোথায় পাওয়া গিয়াছে জানা যায় না—মুদ্রাটিতে রাজার ত্রিভঙ্গমূর্তি, তাহার মস্তকের চারিদিকে জ্যোতিঃ, বামদিকে কোঁকড়ান চুল, তিনি নিজের দক্ষিণদিকে চাহিয়া আছেন, গলায় সুবর্ণের অথবা মুক্তার মালা, বামহস্তে ধনুক, দক্ষিণহস্তে দেবতাকে গন্ধদ্রব্য দিতেছেন, রাজার দক্ষিণদিকে একটি বৃষলাঞ্ছিত পতাকা। মুদ্রার বিপরীত দিকে একটি পদ্মাসনা দেবীমূর্তি, বামদিকে লেখা 'নরেন্দ্র বিনত', লেখাটি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। অপর মুদ্রা অরুণখালি নদীর তীরে অন্যান্য মুদ্রার সহিত প্রাপ্ত ; এই অন্যান্য মুদ্রার মধ্যে একটি শশাঙ্ক রাজার সুবর্ণমুদ্রা, একটি গুপ্তবাজাদের নকল সুবর্ণমুদ্রা, আর কয়েকটি গুপ্তরাজগণের রজতমুদ্রা। সমাচার বাজার নামাঙ্কিত মুদ্রায় রাজা আসনে উপবিষ্ট, বামে ও দক্ষিণে দুইটি স্ত্রীমূর্তি। বিপরীত দিকে পদ্মাসনে সরস্বতীমূর্তি, নিচে, হংস, বামধারে 'নরেন্দ্রবিনত' লেখা। নলিনীবাবু মনে করেন অক্ষর হিসাবে সমাচার দেব কর্ণসুবর্ণপতি বৃষভলাঞ্ছন শশাঙ্কের পূর্ববর্তী। তিনি লিখিয়াছেন ইহা একরূপ নিশ্চয় যে ইহারা একই বংশীয়, সমাচারদেব শশাঙ্কের পিতাও হইতে পারেন। এত সহজে পিতৃত্বের আরোপ আমাদের সাহসে কুলায় না, তবে সমাচারদেব শশাঙ্কের পূর্ববর্তী ও একবংশীয় হইতে পারেন মনে হয়। পার্জিটার সাহেব তাঁহাকে ব্রাহ্মণ রাজা অনুমান করিয়াছেন কিন্তু এই অনুমানের কোন ঐতিহাসিক মুল্য নাই। শশাঙ্কের বহু সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার রাজ্যের আরম্ভকাল খ্রিঃ ৬০২ খ্রিস্টাব্দ ধরিলে তাহার পূর্বেই সমাচারদেবের রাজত্ব ধরিতে হয়। পার্জিটার সাহেব সমাচারদেবের বাজত্বের আরম্ভ ৬০১—৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অনুমান করিয়াছেন কিন্তু নলিনী বাবুর হস্তে সময় বিচারের উপকরণ অধিক ছিল। নলিনীবাবুর মতই এস্থলে অধিক প্রামাণ্য তবে সামান্য উপকরণের উপর ঠিক বৎসরটির হিসাব করা বড় কঠিন, মোটামুটি আমরা তিনটি রাজাকেই খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর ধরিয়া লইতে পারি।

গোপচন্দ্র কোন্ বংশীয় ছিলেন এবং কেমন করিয়া ধর্মাদিত্যের স্থান অধিকার করিলেন তাহা অনুমান করিবারও উপযুক্ত উপকরণ নাই। ডাঃ হর্ণলী অনুমান করেন ইনি ও ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্র অভিন্ন।[৪১] পার্জিটার সাহেব এই মত অনুসরণ করতঃ বলেন যে তাহা হইলে ইনি গুপ্তবংশীয় রাজা হইতে পারেন। কিন্তু এই মত অসার। ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্র যে ত্রিপুরার লালমাই পাহাড়ের চন্দ্রবংশীয় এবং সম্ভবত বহু পরবর্তী রাজা স্থানান্তরে তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।[৪২] রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের দেববংশের উল্লেখ কবিয়া লিখিয়াছেন "আমাদের মনে হয় যে, ধর্মাদিত্য গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব এই তিন জনেই কাণসোণা সমাজস্থ ওইরূপ কোন দেববংশ হইবেন।"[৪৩] ইহা তাহার অনুমান মাত্র, ইতিহাসে এরূপ প্রমাণশূন্য অনুমানের মূল্য নাই।

প্রথম তাম্রলিপির ভূমি ছিল ধ্রুবিলাটি গ্রামে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাম্রলিপিতে কোন গ্রামের উল্লেখ ছিল কি না বলা যায় না, কারণ সকল অংশ পড়া যায় নাই। চতুর্থ তাম্রলিপিতে গ্রামের নাম 'ব্যাঘ্রচোরক'। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ তাম্রলিপিতে দত্ত ভূমির যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে চেষ্টা করিলে বোধ হয় বর্তমানকালেও তাহার স্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে। নলিনীবাবু স্থানীয় অনুসন্ধানের পর চতুর্থ তাম্রলিপির ভূমি নির্দেশ করত ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের Dacca Review পত্রে উহার একখানা মানচিত্র দিয়াছেন। তাম্রলিপিতে যে চন্দ্রবর্মার কোট বা দুর্গের উল্লেখ আছে, তাহা হইতেই স্থানের মোটামুটি পরিচয় খুব সহজ হইয়া পড়িয়াছে, কারণ এই কোট এখনও বর্তমান। কোটালিপাড়ায় এরূপ কোট একটাই আছে। দিল্লির নিকট মেহেরৌলির লৌহস্তম্ভে যে চন্দ্ররাজার কীর্তি লিপিবদ্ধ আছে, এই কোট বা দুর্গ খুব সম্ভবত

তাহার। তাহার কীর্তিস্তম্ভে লিখিত বিবরণ হইতে পাওয়া যায়, তিনি বঙ্গদেশে যুদ্ধকালে সমবেত শত্রুগণকে পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গে অনেক স্থানে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এতটা বিস্তৃত দুর্গের চিহ্ন বাঙ্গালায় আর কোথাও নাই। এই কোট হইতেই "কোটালিপাড়া" নামের উৎপত্তি। 'কোটালিপাড়া' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্বে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিত। 'কোটাল' শব্দ হইতে কেহ ইহার ব্যুৎপত্তি সমাধা করিতেন, কেহ বা সফি খাঁ নামক এক কোটালের নামের সহিত 'কোটালিপাড়া' মিলাইয়া দিতেন। কিন্তু এই তাম্রলিপি হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে নামটি অতি প্রাচীন। যে চন্দ্ররাজার কোট হইতে কোটালিপাড়া নামের উৎপত্তি ধরা হইল, তাহার সময় খ্রিঃ ৪র্থ শতাব্দীর প্রথমভাগ। এই কোটেব পশ্চিম প্রাকাবের উপরিভাগের বিস্তার এখন প্রায় ৫০০ ফিট ; উপরে সমৃদ্ধ গ্রাম, নিচে পরিখার দেহাবশেষ। নলিনী বাবু মনে করেন এই কোটের উত্তর ও পূর্বদিকে সুপ্রতীক স্বামীর ভূমির অবস্থান ছিল। উত্তবে যে গোবেন্দ্রচোরক গ্রামের উল্লেখ আছে তাহার মতে উহা বর্তমান গোবিন্দপুর গ্রাম। গোপেন্দ্র ও গোবিন্দ দুইই শ্রীকৃষ্ণের নাম। উত্তরপূর্ব কোণ হইতে প্রায় আধ মাইল উত্তরপশ্চিমে বিদ্যাধর বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিবিশেষেব ও তাহার স্ত্রী জটিয়াবুড়ীর বাসস্থানের প্রবাদ আছে। ইহার উত্তরদিকে দুইটি সমান্তরাল রাস্তা পূর্ব পশ্চিমদিকে গিয়াছে। একটি রাজাব, অপরটি প্রজাদেব চলিবার জন্য---এইরূপ প্রবাদ। নলিনীবাবুর মতে এই রাস্তা দুইটিই তাম্রলিপিতে উক্ত 'বিদ্যাধর জোটিকা'। পূর্বদিকে যে পিশাচপর্কটী বা ভূতে পাওয়া পাকুড় গাছ ছিল, তাহার অবশ্য সরেজমিন তদন্তে কোন সন্ধান হয় নাই , কিন্তু ইহাবও আনুমানিক স্থান নলিনীবাবুর মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যাইবে। পার্জিটার সাহেব চোবক শব্দেব চর অর্থ কবিয়া, 'ব্যাঘ্রচোরক' ও 'গোবেন্দ্রচোরক' নদী হইতে নূতন উত্থিত স্থান মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্থানীয় তদন্ত করেন নাই। চোরক শব্দের অর্থ যাহাই হউক, চর বলিয়া মনে হয় না। এই স্থানেব অব্যবহিত নিকটে যে কোন বড় নদী ছিল এমন দেখা যায় না।

প্রথম ও তৃতীয় তাম্রফলকে যে ধ্রুবিলাটি গ্রামের উল্লেখ আছে তাহার এ পর্যন্ত কোন সন্ধান হয় নাই,[৮৮] তবে এই দুই তাম্রফলকে পশ্চিম সীমায় যথাক্রমে যে শিলাকুণ্ড ও শিলাকুণ্ড গ্রামের নাম পাওয়া যায়---তাহা যে বর্তমান শৈলদহ নদী ও শৈলদহ গ্রাম তাহা নলিনীবাবু সন্ধান করিয়া বাহির করিযাছেন। শৈলদহ কোটালিপাড়ার দক্ষিণদিকে, এক্ষণে বাকবগঞ্জ জেলাভুক্ত। করঙ্কগ্রাম কোথায় ছিল তাহা স্থির হয় নাই।

প্রথম তাম্রলিপিতে পাওয়া যায় মহাবাজ স্থানুদত্ত মহারাজাধিরাজ ধর্মাদিত্যেব অধীনে এ প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন, কিন্তু তাহাব বসতি কোথায় ছিল, তাহার উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তাম্রফলকে নব্যাবকাশিকায শাসনকর্তার অবস্থানের সংবাদ পাই। এই নব্যাবকাশিকা শাসনকর্তার অধীনস্থ জনপদের নাম কি বাজধানীব নাম তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় না। পার্জিটার সাহেব একসময়ে ডাঃ হর্ণলির মতানুসরণ কবিয়া মনে করিয়াছিলেন নব্যাবকাশিকা কোন স্থানের নাম নহে, মহারাজ স্থানুদত্তের পরে নূতন স্থায়ী শাসনকর্তার আবির্ভাবের পূর্বকার অবস্থা, যে অবস্থায় উপৰিক নাগাদেব প্রভৃতি বাজ্য শাসন করিতেছিলেন। কিন্তু এই অর্থ খাটে না, কাবণ নব্যাবকাশিকার উল্লেখ তিনটি তাম্রফলকে আছে, স্থানুদত্তেব পুত্র নাবালক হইলেও এত দীর্ঘকাল নব্য অস্থায়ী অবস্থার উল্লেখ চলে না। পার্জিটার তাহার মত পরিবর্তন করিয়াছেন। তিনি এবং নলিনী বাবু উভয়েই মনে করেন উহা তাৎকালিক রাজধানীর নাম। নলিনীবাবু আরও মনে করেন ইহা কোটালিপাড় পরিত্যাগের পর যে স্থানে নূতন শাসনকর্তার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহারই নাম এবং সে স্থান ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাভার। কোটালিপাড়া যে বকম বিলখালে পরিপূর্ণ তাহাতে এস্থান যে বাজধানীর উপযুক্ত নহে তাহা সকলেই বোঝে কিন্তু এমন স্থান এত সুরক্ষিত করার বন্দোবস্ত

কেন হইয়াছিল? মনে হয়, স্থানটি তখন এত নিম্ন ছিল না। সেকালে যেখানে দুর্গ নির্মিত হইত সেখানে শাসনেরও একটা কেন্দ্র বসিত। ইহা একরূপ নিশ্চিত যে, কোটালিপাড় কিছুদিন এইরূপ একটি শাসন-কেন্দ্র ছিল। নিম্ন জলাভূমির মধ্য হইতে মধ্যে মধ্যে ইষ্টকনির্মিত স্থান বাহির হইয়া পড়ে শুনিতে পাওয়া যায়। কোটালিপাড়ার কোটের ভগ্নাবশেষের নিকট হইতে বহু প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে গুয়াখোলা গ্রামে প্রাপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের একটি ও স্কন্দগুপ্তের দুইটি খাঁটি সুবর্ণমুদ্রা এবং কায়খাগ্রামে প্রাপ্ত সুবর্ণমুদ্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীব, স্কন্দগুপ্ত পঞ্চম শতাব্দীর সম্রাট। সাভাবের নিকট যে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহা গুপ্ত সম্রাটদিগের নকল ও পববর্তী সময়ের। সাভারে বংশাই নদী হইতে নিঃসৃত ও তাহাতেই পতিত যে একটি খাল আছে তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় টানিয়া আনিয়া অবকাশ বা অবকাশিকা বলা চলে কিন্তু মোটের উপর স্থান বিশেষের সহিত নব্যাবকাশিকাব অভিন্নতা প্রতিপাদনের চেষ্টা বড়ই সূক্ষ্ম সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মাত্র বলা যায় যে নব্যাবকাশিকা রাজধানীর নাম হওয়াই সম্ভব এবং ইহার অবস্থান যেখানেই থাকুক যে বারকমণ্ডলে কোটালিপাডা অবস্থিত ছিল তাহা এই স্থান হইতে শাসিত হইত।

এইবার বারকমণ্ডল। কেহ কেহ ইহাকে বরেন্দ্র মণ্ডলের সহিত অভিন্ন অনুমান করিয়াছেন কিন্তু দক্ষিণ ফরিদপুর এক সময়ে পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত থাকিলেও কোন কালেই "বরেন্দ্র মণ্ডল" বা "বরেন্দ্রীমণ্ডল" এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। "বারকমণ্ডল" এর স্থান নির্দেশ করিতে গেলে ষষ্ঠ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থার একটু আলোচনা আবশ্যক। পদ্মার তখন অস্তিত্ব ছিল কিনা সন্দেহ, থাকিলেও তাহা ক্ষুদ্র নদী। পশ্চিমে ভাগীরথী স্রোত তখন প্রবল, ভৈরব ও মধুমতীও বোধ হয় দুর্বল নহে। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ তখন বর্তমান যমুনা দিয়া বহিত না, ঢাকা জেলার পূর্বদিক দিয়া আসিত। আর উত্তরবঙ্গে করতোয়া তখন ভীষণ নদী। রেনেলের ম্যাপ খুলিলে দেখা যাইবে যেখানে ধলেশ্বরীব প্রবাহ আরম্ভ, সেইখানেই করতোয়া আসিয়া পদ্মায় পড়িতেছে। পণ্ডিতেবা মনে করেন ইহারও পূর্বে করতোয়া স্বাধীনভাবে দক্ষিণ সমুদ্রে আসিয়া পড়িত। কেহ অনুমান করেন মাথাভাঙ্গা নদী ইহার দক্ষিণাংশ, কেহ বলেন ইহার জল হরিণঘাটার মোহানা দিয়া সমুদ্রে আসিত। আর ফরিদপুর ও বাকবগঞ্জ জেলার স্থলভাগ তখনও খুব পুষ্টিলাভ করে নাই। দক্ষিণ ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ তখন দ্বীপমালার সমষ্টি ছিল বলিয়াই মনে হয়। কালিদাসের রঘুবংশে বঙ্গদেশ "গাঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু" বলিয়া বর্ণিত এবং ইহার অধিবাসিগণ 'নৌসাধনোদ্যত' , বাস্তবিক নৌকাই ছিল তাহাদের সকল কার্যে সম্বল। এ অবস্থায় যে স্থলভাগ অথবা জলস্থলে মিশ্রিত ভূভাগ বড় নদীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে অথবা তাহার ধ্বংসকারী শক্তিকে বারণ করিতেছে তাহাকে অনায়াসেই বারকমণ্ডল বলা চলে। আমরা বারকমণ্ডলের পূর্বসীমা ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিমসীমা ভাগীরথীর কোন প্রবলশাখা ধরিয়া লইতে পারি। করতোয়া এই সময়ে পূর্বে বা পশ্চিমে কোন নদীকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রের দিকে আসিয়াছিল অনুমান করা যায়। দক্ষিণ সীমা সম্ভবত বঙ্গোপসাগর, উত্তর সীমা নির্দেশ করা যায় না। সাগর যে তখন আবও নিকটে ছিল এবং এখনকার সুন্দরবনের ন্যায় কতকস্থান জঙ্গলাবৃত ছিল তাহাও নিঃসন্দেহ।

মণ্ডল বড় ছিল কি বিষয় বড় ছিল তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কাহারও মতে কতকগুলি 'বিষয়' লইয়া সেকালে মণ্ডল গঠিত হইত, কেহ বলেন কতকগুলি মণ্ডল লইয়া একটি 'বিষয়' হইত। বর্তমান জেলাগুলি সেকালকার বিষয়ের স্থলাভিষিক্ত। বর্তমান ক্ষেত্রে বিষয় বড় কি মণ্ডল বড় তাহা লইয়া তর্ক নিষ্প্রয়োজন। কারণ সকলগুলি তাম্রলিপির ভাষা মিলাইলে দেখা যাইবে যে সমগ্র বারকমণ্ডলকেই 'বিষয়' বলা হইয়াছে। বারকমণ্ডল ছিল

কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টি আর এই সমষ্টি দ্বারা একটি 'বিষয়' গঠিত হইয়াছিল।

এইবার দেশের শাসন পদ্ধতি ও রাজকর্মচারিদিগের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। প্রথম তাম্রলিপির সময়ে সকলের উপরে ছিলেন মহারাজাধিরাজ ধর্মাদিত্য আর তাহার নিচে প্রাদেশিক শাসনকর্তা মহারাজ স্থানুদত্ত, আবার তাহার নিচে বিষয়পতি জজাব। দ্বিতীয় তাম্রলিপির সময়ে মহারাজাধিরাজ উপাধিযুক্ত ধর্মাদিত্যকে আবার 'ভট্টারক' উপাধিতে ভূষিত দেখিতে পাই। এই সময়ে হয়ত তাহার রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল অথবা প্রতাপ বাড়িয়া গিয়াছিল। মহারাজ স্থানুদত্তের কি হইল তাহা বোঝা যায় না, তাহার পরিবর্তে মহাপ্রতীহারোপরিক নাগদেবের প্রাদেশিক কর্তৃত্ব দেখিতে পাই, তাহার অধীনে আবার বারকমণ্ডলে "ব্যাপারকারণ্ডয়" বা বাণিজ্য ব্যাপারের অধ্যক্ষ পদে গোপালস্বামী নামক এক ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গোপালস্বামীকে বিষয়পতি বলা হয় নাই। বোধ হয় তখন বিষয়পতির পদ শূন্য ছিল, বাণিজ্য ব্যাপারের অধ্যক্ষের উপরই কর্তৃত্ব ছিল অথবা ভূমি ক্রয়বিক্রয় ব্যাপার ব্যাপার-কারণ্ডয়ের কর্তৃত্বাধীন থাকায় বিষয়পতির নামোল্লেখ আবশ্যক বিবেচিত হয় নাই। তৃতীয় তাম্রলিপির সময়ে সম্রাট ছিলেন মহারাজাধিরাজ ও 'ভট্টারক' উপাধিযুক্ত গোপচন্দ্র আর প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন পূর্বোক্ত নাগদেব, কিন্তু এই নাগদেবের পদবী এবার 'মহাপ্রতীহার-ব্যাপারণ্ড্যধৃত-মূল-ক্রিয়ামাত্য উপরিক'। তিনি যে সম্রাটের একজন বড় রকমের মন্ত্রীর পদাভিষিক্ত ছিলেন এই উপাধি তাহারই প্রমাণ। বিষয়পতি বা বাণিজ্যাধ্যক্ষের পদে কে ছিলেন তাহার উল্লেখ নাই তবে ভূমিগ্রহীতা বৎসপালস্বামী বাণিজ্য বিভাগের একজন কর্মচারি ছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। ৪র্থ তাম্রলিপির সময়ে মহারাজাধিরাজ সমাচার দেবের অধীনে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন সুবর্ণবীথ্যাধিকৃতান্তরঙ্গ উপরিক জীবদত্ত, তাহার অধীনে বারকমণ্ডলে পবিত্রুক ছিলেন বিষয়পতি (District officer)। ভূমির ক্রয় বিক্রয় বা হস্তান্তর বিষয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা বিষয়পতি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতেন এমন দেখা যায় না। প্রথম তাম্রলিপিতে যে সাধনিক বাতভোগ ভূমি ক্রয় করিতেছেন তিনিও একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারি বলিয়া মনে হয়। প্রথম তাম্রলিপির সময়ে ভূমিদানে কর্তৃত্ব করিতেছেন বিষয়-মহত্তরগণ ও প্রজাসাধারণ, দ্বিতীয় তাম্রলিপিতে অধিকরণ-মহত্তর ও বিষয়-মহত্তরগণ, তৃতীয় লিপিতে অধিকরণ-মহত্তর, বিষয়-মহত্তর ও প্রধান ব্যবসায়িগণ। ৪র্থ তাম্রলিপিতে অধিকরণ, বিষয়-মহত্তর অন্যান্য প্রধান ও ব্যবহারজ্ঞ লোক সকলেরই কর্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোনটিতেই বিষয়পতির কর্তৃত্ব ধরা পড়ে না। প্রথম তিনটি তাম্রফলকের প্রত্যেকটির বামপার্শ্বে একটি মোহর অঙ্কিত আছে, চতুর্থটির মোহর খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে কিন্তু মোহর যে আঁটা ছিল তাহার চিহ্ন একটি ছিদ্র রহিয়া গিয়াছে। এই মোহর স্থানীয় অধিকরণ বা কার্যপরিচালনসমিতির— "বারকমণ্ডলবিষয়াধিকরণস্য।" প্রথম তাম্রলিপিতে এই মোহরের উপর একটি স্ত্রীমূর্তি, তাহার দুই দিকে দুইটি মূর্তি যেন জানু পাতিয়া আছে, আর উপরিভাগে দুইটি হস্তী যেন রমণীর মাথায় জলধারা দিতেছে। দ্বিতীয় তাম্রলিপির মোহরেও একটি স্ত্রীমূর্তি, তাহার দক্ষিণ দিকে যেন একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ এবং বামে একটি ক্ষুদ্র মূর্তি, দুইদিকে দুইটি হস্তীর মূর্তি। তৃতীয় লিপির মোহরের উপরটা পুছিয়া গিয়াছে তবে বারকমণ্ডলবিষয়াধিকরণস্য পড়া যায়। এগুলি রাজার মোহর নয়, বিষয়পতির মোহরও নয়, বিষয়াধিকরণের মোহর। দেখা যাইতেছে দেশে রাজকার্য যথেচ্ছাচার প্রণালীতে চলিত না, প্রজার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। 'অধিকরণ'কে বর্তমান ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের স্থানীয় মনে করিলে দেখা যাইবে একালকার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অপেক্ষা ইহার ক্ষমতা অনেক অধিক ছিল। অভিধানে অধিকরণ অর্থে সাধারণত বিচারালয় বুঝায় কিন্তু তখন শাসন ও বিচার বিভাগের কার্য পৃথক ছিল না। আমরা অধিকরণের সদস্য বা অধিকরণ-মহত্তরগণকে ভূমি বিক্রয়ে কর্তৃত্ব করিতে দেখিতে পাই। বিষয়ে মহত্তর বা প্রধান ব্যক্তি ছিল

দুই শ্রেণির, অধিকরণ-মহত্তর ও বিষয়-মহত্তর। অধিকরণ-মহত্তর বোধ হয় রাজার বা তাহার স্থানীয় প্রতিনিধির নিযুক্ত বিষয়ের কার্যপরিচালনপরিষদের সদস্য, তাহা না হইলে অধিকরণের মোহর ব্যবহারে অধিকার থাকিবে কেন? আর বিষয়-মহত্তর স্থানীয় স্বাধীনজীবী প্রধান লোক। ভূমি বিক্রয়ে শেষোক্ত শ্রেণিরই স্বার্থ বেশি সুতরাং আমরা বিষয়-মহত্তরদিগের নাম ও কর্তৃত্ব সকল তাম্রফলকেই বিশেষরূপে দেখিতে পাই। প্রথম তাম্রলিপিতে অধিকরণ মহত্তরদিগের উল্লেখ নাই। ভূমি-ক্রেতা সাধনিক বাতভোগ রাজপ্রভাব-যুক্ত বলিয়াই হয়ত অধিকরণের নিকট উপস্থিত হওয়ার আবশ্যকতা হয় নাই অথবা অধিকরণের অনুমতি পূর্বেই পাইয়া থাকিবেন। বিষয়-মহত্তরগণের ও প্রজা সাধারণের নিকট উপস্থিত হইলে তাহারাই মূল্য লইয়া কার্যটি সমাধা করিয়া দিল। এ ক্ষেত্রে ভূমি কাহার ছিল তাহার উল্লেখ নাই, হয়ত গ্রামের সাধারণ ভূমিই দেওয়া হইল এবং সেই জন্যই সাধারণ লোকের উপস্থিতির প্রয়োজন হইয়াছিল। দ্বিতীয় তাম্রলিপির ভূমি থোড় নামক এক মহত্তরের জমি হইতেই বিক্রয় করা হইয়াছিল। অধিকরণমহত্তর ও বিষয়মহত্তরগণ কর্তৃত্ব করিলে জমি যে থোড়েব সম্মতিক্রমেই গৃহীত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। তৃতীয় তাম্রলিপির জমি কাহার নিকট ক্রীত হইল বোঝা যায় না। পার্জিটার সাহেব যে লিখিয়াছেন এই জমি ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের নিকট ক্রীত তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বৎসপালস্বামী জমি চাহিয়াছেন সেই অধিকরণমহত্তর ও বিষয়মহত্তরগণ কি সকলেই ভরদ্বাজগোত্রীয় ছিল? আমার বিশ্বাস এখানে তাম্রলিপির ঠিক পাঠোদ্ধাব হয় নাই। 'Indian antiquary'-তে এইখানে তাম্রফলকের যে প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে তাহা বড়ই অস্পষ্ট। চতুর্থ তাম্রফলকে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে স্থাপন করিবার জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পতিত ভূমি দান। এখানে অধিকরণ-মহত্তর ও বিষয়-মহত্তরগণ অন্যান্য ব্যবহারজ্ঞ লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া ভূমি দান করিতেছেন; ভূমি পূর্বে কাহার ছিল তাহার উল্লেখ নাই। বিষয়পতির অনুমোদনেরও কোন কথা নাই। পার্জিটার সাহেব বলেন গ্রামে নূতন লোকের আমদানি হইলে গ্রামবাসী সকলেই তাহাতে সংসৃষ্ট হইয়া পড়ে সুতরাং ভূমি-বিক্রয়ে সকলেরই স্বার্থ জড়িত, তাই প্রধান লোকদিগেব মধ্যস্থতায় বিক্রয়-কার্য চলিত। একথার যুক্তিবত্তা অস্বীকার করিবার যো নাই। ১ম তাম্রলিপিতে সামন্ত রাজগণের উল্লেখ আছে। ইহাবাও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন সন্দেহ নাই কিন্তু শাসনকর্তা ও তাহার কর্মচারিদিগের সহিত ইহাদের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা পরিস্ফুট হয় নাই।

বিক্রয়-কার্যও নিতান্ত অসভ্য জাতির প্রথায় সম্পাদিত হইত না; পুস্তপাল ছিল, পরিমাপক ছিল। ভূমিসংক্রান্ত কাগজপত্রাদি ঠিক রাখাই পুস্তপালের কার্য ছিল, তাঁহাকে Record keeper বলা যাইতে পারে; আর পরিমাপক ছিলেন বর্তমানকালের আমিন। চারিদিকে জল, রাজার আয়ের পক্ষে ও লোকের সমৃদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় বাণিজ্যব্যাপারের খুবই সুবিধা। বাণিজ্যবিভাগ তত্ত্বাবধানের জন্য যে বিশেষ বিশেষ কর্মচারি ছিল তাম্রলিপিতে তাহার ভাল প্রমাণই পাওয়া যায়। তখনকার নিম্নবঙ্গের বড় নদী খুব বড় হইবারই কথা, মোহানার কাছে বোধ হয় উপসাগরের ন্যায় দেখাইত। সাধারণ নৌকায় সর্বত্র যাতায়াত সম্ভবত নিরাপদ ছিল না, সমুদ্রপোতের ব্যবহার নিশ্চয়ই ছিল। নাবাতাক্ষেণী (পোত নির্মাণের বন্দর, পার্জিটার সাহেবের ভাষায় shipbuilding harbour) এবং নৌদণ্ডক (জাহাজের মাস্তুল—পার্জিটার সাহেবের ভাষায় ship's mast) যে সীমানার চিহ্ন ছিল তাহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে নৌবিদ্যার অনুশীলন ভালরূপই হইত। ভূমির মূল্য যে দীনারে নির্দিষ্ট হইত তাহা হইতেও বাণিজ্য ব্যাপারে শ্রীবৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এশিয়া ও ইউরোপের বহুস্থানে দীনার নামে পরিচিত মুদ্রার প্রচলন ছিল (লাটিন denarius)। প্রাচীন তাম্রশাসনে ও সংস্কৃতগ্রন্থে ইহাব বহু উল্লেখ আছে কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্য হইতেই শব্দটির এতটা প্রচলন

সম্ভব। ভিন্নদেশীয় বণিকদিগের সহিত ভারতের নানা স্থানে বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল।

পার্জিটার সাহেব মনে করেন পুস্তপাল গ্রাম্য কর্মচারি ছিল কারণ তাহাকে মহত্তরদিগের কথামত কাজ করিতে দেখা যায়। মহত্তরদিগকে যখন অধিকরণমহত্তর ও বিষয়মহত্তর বলা হইয়াছে তখন পার্জিটার সাহেবের এ যুক্তি খাটে না, তবে ভিন্ন ভিন্ন তাম্রফলকে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তপালের উল্লেখ তাহার মত কতকটা সমর্থন করে। পুস্তপালের কার্যক্ষেত্র সমস্ত 'বিষয়' ব্যাপী হইলে পুনঃ পুনঃ নাম পরিবর্তনের কারণ দেখা যায় না। শিবচন্দ্রকে বিষয়ের সর্বত্রই পরিমাপ-কার্য করিতে দেখা যায়।

প্রতিকুল্যবপনোপযোগী ভূমির মূল্য ৪ দীনার এই হিসাবে কৃষ্টভূমির মূল্য নির্দিষ্ট হইত। এক 'কুল্যবাপ' কতটা জমি এবং 'দীনার' শব্দে ঠিক কিরূপ মুদ্রার পরিমাণ বুঝাইত তাহা এখনও গবেষণার বিষয়। আরবি স্বর্ণমুদ্রা দীনারের ওজন ছিল ৬৫ গ্রেণ, এদেশে ৩২ রতি ওজনের ও অন্যান্য প্রকার দীনারের উল্লেখ পাওয়া যায়। রোমান অরিয়াস ১২৪ গ্রেণে হইত। খাঁটি দীনার দেশে বেশি প্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহ, থাকিলে উহা এখনও অনেকস্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িত। শব্দটি হয়ত কেবল মূল্যের পরিমাণজ্ঞাপক, অন্য মুদ্রায় ঐ হিসাবে বিনিময়কার্য চলিত বলিয়া মনে হয়। পার্জিটার সাহেব 'কুল্য' শব্দের কুলা অর্থ করিয়া মনে করেন এক কুলায় পরিমাণ ধান আঁটে তাহা হইতে যে চারা উৎপন্ন করা যায় সেই চারা যতটা জমিতে রোপণ করা যাইতে পারে তাহার মূল্য ছিল ৪ দীনার। কিন্তু 'কুল্যবাপ' বোধ হয় নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিকে বুঝাইত, কুলার বা বীজধান্যের স্থানীয় প্রয়োগ আবশ্যক হইত না। 'কুল্য' শব্দের কুলা ছাড়া আরও প্রচলিত অর্থ অভিধানে পাওয়া যায়, ৮ দ্রোণে এক 'কুল'। দ্রোণের পরিমাণও সর্বত্র একরকম ছিল না। ৩২ সেরে এক দ্রোণ ধরিলে এক কুল্যে অনেক ধান হইয়া পড়ে। পার্জিটার সাহেব বলেন জোয়ার ভাঁটার দেশে রোয়া ধানের প্রচলন বহুকাল হইতে আছে এবং কালিদাসের রঘুবংশ হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোটালিপাড়া অঞ্চলে কিন্তু এখন সাধারণত বোনা ধানেরই প্রচলন। যদি ৩২ সেরী দ্রোণের ৮ দ্রোণে এক কুল্য ধরা যায়, তাহা হইলে ছিটে বা বোনা ধানের হিসাবেও জমির পরিমাণ ১২।১৩ বিঘা দাঁড়ায়। এই পরিমাণ জমির মূল্য ৪ দীনারই সেকালকার পক্ষে যুক্তিযুক্ত মনে হয়। ৮×৯ নলে মাপ চলিত কিন্তু নল কত বড় ছিল লেখা নাই। ১৬ হাতি নল ধরিলে ৮×৯ নলে বর্তমানকালের ৩ বিঘার কিছু বেশি জমি হয়। পার্জিটার সাহেব এই পরিমাণ জমিকেই 'কুল্যবাপ' মনে করেন কিন্তু ইহাই যে 'কুল্যবাপ' তাম্রলিপিতে তাহারও স্পষ্ট উল্লেখ নাই। এ হিসাবে মূল্য ৩১।৩২ টাকা সে সময়ের পক্ষে অতিরিক্ত।

প্রথম তাম্রলিপিতে পাওয়া যায় বিক্রয়মূল্যের ষষ্ঠভাগ রাজার প্রাপ্য। রাজা বিক্রয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না, মূল্যের ষষ্ঠভাগ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। এক্ষণে প্রজাস্বত্ব আইনে জমিদারকে বিক্রয়মূল্যের উপর শতকরা ২৫ দেওয়ার কথা হইতেছে, তাহাতেও অনেক জমিদার অসন্তুষ্ট। তাঁহাদের একবার হিন্দু আমলের কথা ভাবিয়া দেখা উচিত।

তাম্রলিপিতে অনেক লোকের নাম আছে, নামগুলি প্রায়ই সংস্কৃতশব্দজ। তখনও জগতে মুসলমানের আবির্ভাব হয় নাই। লোকের নাম হইতে পূর্ববঙ্গে আর্যসভ্যতার বিস্তৃতি বেশ বোঝা যায়, কিন্তু এই সকল লোকের জাতি ছিল কি? "সেন" দেখিয়াই বৈদ্য অথবা 'ঘোষ', 'দত্ত' দেখিয়াই কায়স্থ মনে করা নিরাপদ নহে। 'জ্যেষ্ঠকায়স্থ' শব্দের অর্থ প্রধান লেখক বা প্রধান সভাসদ। জাতিবাচক 'কায়স্থ' শব্দের তখনও প্রচলিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাম্রলিপির 'জ্যেষ্ঠকায়স্থ' শব্দ এবং চতুর্থ তাম্রলিপির 'জ্যেষ্ঠাধিকরণিক' শব্দ একার্থবোধক। চতুর্থ তাম্রশাসনের 'করণিক' শব্দও 'কায়স্থ' অর্থবোধক মনে হয়। তাম্রফলকোক্ত হিন্দু মহারাজাধিরাজদিগের অথবা প্রাদেশিক শাসনকর্তা স্থানুদত্তের জাতি কি ছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। স্থানুদত্তের 'দত্ত' শব্দ নামেরই একাংশ। 'দেবদত্ত' ব্রাহ্মণ

হইতে পারিলে স্থানুদত্তও কায়স্থ না হইয়া ব্রাহ্মণ বা অপর কোন জাতীয় হইতে পারেন। কুলস্বামী, চন্দ্রস্বামী, বসুদেবস্বামী, গোপালস্বামী, সোমস্বামী, বৎসপালস্বামী, গর্গস্বামী, গোমিদত্তস্বামী ও সুপ্রতীকস্বামী যে ব্রাহ্মণ ছিলেন সে বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না। অন্য যাহাদের নামোল্লেখ আছে তাহাদের কেহ কেহ ব্রাহ্মণও হইতে পারেন কিন্তু অধিকাংশই সম্ভবত ব্রাহ্মণ ছিলেন না। দেব, চন্দ্র, মিত্র, সেন, ঘোষ, দত্ত, পালিত, নাগ প্রভৃতি শব্দ নামেরই একাংশ বলিয়া মনে হয়। বাতভোগ, কালসখ প্রভৃতি নামের সহিত তুলনা করিলেই তাহা বোঝা যাইবে। পার্জিটার সাহেব ও রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু এগুলিকে কায়স্থদের উপাধি ধরিয়া লইয়াছেন, রাখালবাবু পার্জিটার সাহেবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এগুলি কায়স্থজাতিবাচক না হইলেও লেখক সম্প্রদায়ের নামের শেষাংশ এইরূপ থাকিতে থাকিতে কালে কায়স্থজাতির উপাধিতে পরিণত হইয়া থাকিতে পারে।

সে সময়ের কথা বলা হইতেছে সেটা আদিশূর ও শামলবর্মা রাজার পূর্ববর্তী সময়। এই সকল তাম্রলিপিতে বর্তমান রাঢ়ী, বারেন্দ্র বা বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের পূর্বপুরুষ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ব্রাহ্মণদিগের ভরদ্বাজগোত্র ও কাণ্বগোত্রের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে এবং দুইটি ব্রাহ্মণকে লৌহিত্য বলা হইয়াছে। 'লৌহিত্য' ব্রহ্মপুত্রের নামান্তর। এই ব্রাহ্মণদিগকে কামরূপী ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হয়। সুপ্রতীক স্বামীকে ভূমিদানের সময়ে বলি চরু ও সত্র প্রবর্তনের কথা আছে। ইহা হইতে ব্রাহ্মণের গার্হস্থ্য জীবনে মনুসংহিতায় উক্ত পঞ্চযজ্ঞের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সকল তাম্রলিপিতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে নিম্নবঙ্গের যে চিত্র পাওয়া যাইতেছে সেটা সভ্যদেশের চিত্র। রাজা, বিবিধ রাজকর্মচারি, প্রজাদের অধিকার, বাণিজ্য ব্যাপারের সুবন্দোবস্ত, ভূমির স্বত্বনিরূপণে ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক মুদ্রা, ব্রাহ্মণাদিবর্ণের বসতি, ধর্মের জন্য দান প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে। তাহার বহু পূর্বে যে কোটালিপাড়ায় দুর্গ ও রাজকর্মচারির অবস্থান ছিল তাহাও পাওয়া যাইতেছে। আর পাওয়া যাইতেছে—দূরবর্তী নৃপতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বঙ্গের পারিবারিক জীবনে বেশি সংসৃষ্ট থাকিতেন না। সময়ে সময়ে কোন প্রবল প্রবল সম্রাট বিস্তীর্ণ জনপদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শাসন করিতেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু সে শাসন প্রজার নিত্য নৈমিত্তিক কার্যে বেশি প্রসারিত ছিল না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় বিভাগগুলি অল্প বা অধিক স্বাতন্ত্র্যের উপর আপন আপন দৈনন্দিন কার্য চালাইত।

এই তাম্রফলকোক্ত রাজাদিগের সময় ইংলন্ডে একরূপ অরাজকতা। ব্রিটেন দ্বীপ এঙ্গলোস্যাক্সন জাতি কর্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত, খ্রিস্টান ধর্ম তখনও এ জাতির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে নাই। সেকালে আমাদের প্রভুদের দেশ অপেক্ষা আমাদের দেশেই লোক বেশি সুখে বাস করিতেছিল।

বঙ্গবাণী ১৩৩১—৩২ মাঘ

১. Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1910
২. বিষয়পতি—সেকালকার 'বিষয়' বর্তমানকালের জেলার তুল্য।
৩ বিষয়-মহত্তব—বিষয়ের প্রধান লোক।
৪ সাধনিক—কর্মকর্তা, সেকালকার কোন রাজকর্মচারীর উপাধি হইতে পারে।
৫ পুস্তপাল—কাগজপত্রের রক্ষক, বর্তমান কালের মহাফেজস্থানীয়।
৬ কুল্য—পরিমাণ বিশেষ, পরবর্তী অংশে আলোচনা দ্রষ্টব্য।
৭. দীনার—মুদ্রাবিশেষ।
৮ পরমভট্টারকের—সম্রাটের।
৯ ধর্ম—আইন বা নিয়ম, (মূল্যের ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য)।
১০. ধ্রুবিলাটি—গ্রামবিশেষ।
১১. প্রতিপাদনীয়—স্থির রাখিতে হইবে।

১২. নাবাতাক্ষেণী—নৌনির্মাণেব বন্দব।

১৩. নব্যাবকাশিকা—স্থানবিশেষ, পরবর্তী অংশে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৪. মহাপ্রতীহার—পার্জিটার সাহেব ইহার অর্থ Chief warder of the gate করিয়াছেন, রাখাল বাবু বলেন মহাপ্রতীহার আরও বড়দরের কর্মচাবি ছিলেন, অনুবাদ "Chief of Prefect of the guards" হওয়া উচিত (J. A. S B. vol X) , বোধ হয ইহাব অর্থ সীমান্তরক্ষীদের প্রধান। উপরিক—উপরিস্থ কর্মচারি, শাসনকর্তা।

১৫. ব্যাপারকারণ্ডয়—পার্জিটার সাহেব ইহাব অর্থ Customs officer কবিযাছেন, বাণিজ্য বিভাগের অধ্যক্ষ বলাই অধিকতর সঙ্গত।

১৬. জ্যেষ্ঠকায়স্থ—প্রবন্ধের শেষাংশে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৭. অধিকরণ-মহত্তব—বাজকার্যপবিচালন-সমিতির সভাসদ।

১৮. স্থানে স্থানে তাম্রলিপিব পাঠোদ্ধার করিতে পারা যায় নাই, এই সকল স্থানে .... দেওয়া গেল।

১৯. প্রবর্ত্ত—কথাটা ঠিক পড়া গিযাছে কি না সন্দেহ, জমির পরিমাণ বিশেষ।

২০. পট্টকি—সম্ভবত সুপারিগাছ, পর্কটি—পাকুড় গাছ।

২১. গোরথ্য—ইহাব পরবর্তী অংশ তাম্রফলকে অস্পষ্ট, গোপথ বা গোগাড়ীর পথ উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়।

২২ নৌদণ্ডক—নৌকার বা জাহাজের মাস্তুল। সম্ভবত কোন মাস্তুল মাটিতে পোতা ছিল।

২৩. আক্ষেপ্তা বা আক্ষেপকাবী—হরণকারী।

২৪ অনুমন্তা—অনুমতিদাতা।

২৫. এই তাম্রলিপিতে লিপিকর-প্রমাদ অনেক।

২৬. বিষয়ব্যাপারে—বিষয়ের বাণিজ্য-বিভাগে।

২৭. পার্জিটার সাহেব বলেন "ভরদ্বাজ গোত্রীয় আপনারা"। তিনি যেরূপ পড়িয়াছেন তাহাতে ঐরূপ অর্থই হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ যাহাদিগকে সম্বোধন করিতেছেন তাহারা সকলেই ভরদ্বাজগোত্রীয় একথাটাও কেমন কেমন লাগে। তাহাদিগের গোত্রেব পরিচয় অপেক্ষা ভূমিদাতা ব্রাহ্মণের গোত্রের পরিচয় বোধ হয় অধিক প্রাসঙ্গিক। তাম্রলিপির অবোধ্যতাই বার্জিটার সাহেবের ঐরূপ পাঠোদ্ধারের কারণ বলিয়া মনে হয়।

২৮ কুলবার—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে "Chief men of the Public" পার্জিটার সাহেবের মতে arbitratry বা referee, রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু 'কুলীন' অর্থ করিয়াছেন ; মূল অর্থ যাহাই হউক ইহারা সালিস বা মধ্যস্থের ন্যায় কাজ করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়।

২৯. অগ্রহার—রাজদত্ত ব্রহ্মত্র ভূমি।

৩০ করঙ্ক—স্থান বিশেষ।

৩১ সুবর্ণবীথ্যাধিকারী—সোনারূপার বাজারে অধ্যক্ষ (কোষাধ্যক্ষও হইতে পাবে)।

৩২. জ্যেষ্ঠাধিকরণিক—রাজ-কার্যপরিচালন সমিতির প্রধান সভাসদ।

৩৩. বলিচরুসত্র প্রবর্তন—গার্হস্থ্যজীবন পরিচালন।

৩৪. করণিক—লেখক বা পাত্র।

৩৫. ১৯১০, ১৯১১, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের এশিয়াটিক সোসাইটিব জার্নালে বাদ প্রতিবাদ দ্রষ্টব্য।

৩৬. Epig. Indica, vol XV.

৩৭. Dacca Review 1920 3 J. A. S. B. 1923

৩৮. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য কাণ্ড ৪০ পৃঃ।

৩৯. পার্জিটার সাহেব শিবচন্দ্রের বয়স এই দুই লিপির সময়ে যথাক্রমে ১৮ ও ৭০ ধরিয়া পরে কেমন করিয়া দুই তাম্রলিপির সময়ের ব্যবধান ৫৫ বৎসর করিলেন তাহা বোঝা যায় না।

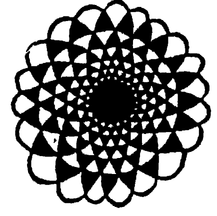
৪০. পার্জিটার সাহেব হিসাবের ভুলে ৪০ বৎসর ধরিয়াছেন।

৪১. Indian Antiquary 1910, P. 208.

৪২. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত "গোপীচন্দ্র" গ্রন্থের ভূমিকা।

৪৩. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য কাণ্ড।

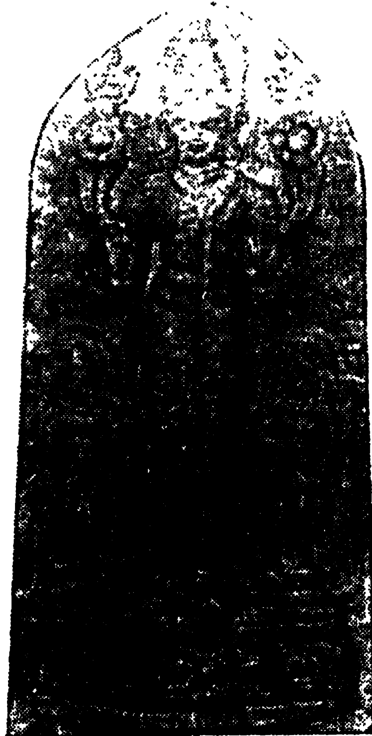
৪৪. পার্জিটার সাহেব মানচিত্র খুঁজিয়া ধূলটগ্রাম বাহির করিয়াছেন এবং ধ্রুবিলাটের অপভ্রংশে ধূলত হইতে পারে লিখিয়াছেন। কিন্তু ধূলট দক্ষিণ ফরিদপুরের ধারে কাছেও নয়। তাম্রলিপির ধ্রুবিলাটি বর্তমান ধূলট হইতে পারে না।



একখানি নবাবিষ্কৃত সূর্যমূর্তি

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী

গত বৎসর শ্রাবণের মাঝামাঝি ফরিদপুর বরহমগঞ্জ ডাকঘরের কর্মচারী শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ রায়ের নিকট তাহাদের গ্রামে একখানি বিষ্ণুর শিলা-প্রতিমার কথা শুনিতে পাই। কিন্তু বিষ্ণুর পায়ের তলায় নাকি গরুড় না থাকিয়া কয়েকটি ঘোড়া আছে! সহজেই বুঝা গেল যে, উহা সূর্যমূর্তি। অনতিবিলম্বে কল্যাণীয় শ্রীমান সলিল রায় এবং সতীন্দ্রবাবুর সাহায্যে তাহা সংগ্রহ করি। মূর্তিখানি বর্তমানে রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সম্পত্তি। উহার একখানি ফটো গত পৌষ মাসে হায়দ্রাবাদ প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মিলনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূর্তির প্রাপ্তিস্থান ঢাকা জেলার সিরাজদীঘা থানায় বীরতারা গ্রাম, সতীন্দ্রবাবু পূর্বতন মূর্তির যে কাহিনি বলিয়াছিলেন একান্ত অর্বাচীন বলিয়া তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।



নবাবিষ্কৃত সূর্যমূর্তি

মূর্তিখানি কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত এবং উচ্চতায় সোয়া দুই ফুট। কোনও অনাবশ্যক ভাস্কর্য-অলঙ্কারে ইহার সৌন্দর্য ভারাক্রান্ত নহে। কোণশীর্ষে কীর্তিমুখ বা ছত্রচিহ্ন নাই। শুধু দুই পাশে দুইটি বিদ্যাধর, তাহার নীচে শরনিক্ষেপকারিণী দুইটি স্ত্রীমূর্তি, বোধ হয় ঊষা ও প্রত্যূষা—অর্ধ উপবিষ্ট। সূর্যের দক্ষিণে শ্মশ্রুল পিঙ্গল দোয়াত কলম লইয়া লোকের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি লিখিতেছেন। বামে দণ্ডী, তাহার ডান হাত দণ্ডের উপর এবং বাম হাত অর্ধ-অবনমিতভাবে রক্ষিত। সমস্ত মূর্তিই বুটজুতা পরিহিত। সাধারণ দণ্ডী ও পিঙ্গল এবং সূর্যমূর্তির মাঝে সূর্যের দুই পত্নীকে দেখা যায়। কিন্তু এ প্রতিমায় শিল্পী তাহা উৎকীর্ণ করেন নাই। ইহাই মূর্তিখানির প্রধান বৈশিষ্ট্য। কারুকার্যের স্বল্পতাও লক্ষ্যণীয়। নীচে একচক্র এবং সপ্তাশ্ব একান্ত স্পষ্টভাবে উৎকীর্ণ।

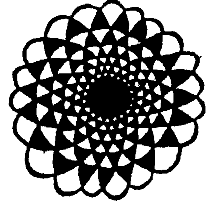
সূর্যের স্ত্রীমূর্তিহীন শিলা-প্রতিমা একান্ত বিরল না হইলেও প্রচুর নহে। বাঁকুড়ার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট একখানি রথারূঢ় সূর্যমূর্তি আছে; তাহাতে পত্নীর মূর্তি উৎকীর্ণ নাই। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গৃহ রক্ষিত অপর দুইখানি প্রতিমাও এরূপ আছে। অন্য কোথাও এরূপ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

সূর্য পুরুষ বৈদিক ঋষিদের কল্পনা নহে। উহা পরবর্তী কালে বোধ হয় শকদ্বীপ হইতে এদেশে আসে। বেদে সূর্যের কোন রূপময় বিকাশ দেখি না। আনুমানিক খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতকে বরাহ-মিহির বৃহৎসংহিতা রচনা করেন। সাধারণভাবে বলিতে মৎস্যপুরাণ তাহার পরবর্তীকালে রচিত। ভবিষ্য পুরাণও আধুনিক। বেদ ও পুরাণের মতে সূর্য দ্বাদশ আদিত্যের একজন। বিবস্বতের দুই পত্নীর নাম আছে—ছায়া এবং শরণ্যু। মৎস্যপুরাণে তাহার চারি পত্নীর উল্লেখ আছে—সংজ্ঞা, রাজ্ঞী, প্রভা ও ছায়া। বরাহ-মিহির সূর্যের কোন পত্নীর উল্লেখ করেন নাই। ভবিষ্য পুরাণে সব জড়াইয়া গিয়াছে। সেই নূতন কাহিনিতে দেখা যায়—সূর্যের দুই পত্নী শরণ্যু ও নিক্ষুভা। প্রত্যেকেরই আবার অনেক নাম আছে। শরণ্যুর বিভিন্ন নাম—সুরেণু, রাজ্ঞী, দ্রৌ, সংজ্ঞা, প্রভা, সুবর্চসা। নিক্ষুভারও নাম পাওয়া যায়—ছায়া, সবর্ণা, পৃথ্বী। বৈদিক ঋষি বা পুরাণকার কেহই ঊষাকে সূর্যের পত্নী বলেন নাই। বিভিন্ন শিলা-প্রতিমার অরুণ ও সূর্যের মাঝে ঊষার মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। উহা বৈদিক কাহিনির সমর্থক, কিন্তু ঊষা যে সূর্যের পত্নী ইহা আধুনিকতম প্রক্ষেপ।

এসব বিচার করিলে মনে হয় খ্রিস্টিয় পঞ্চমশতক পর্যন্ত সূর্যের পত্নী কল্পনা করা হইত না। তারা পরবর্তীকালের অবতারণা। নবাবিষ্কৃত মূর্তিখানি পঞ্চম শতকের পরবর্তী নহে; অর্থাৎ অন্তত প্রায় দেড়হাজার বৎসরের পুরাতন।

ভারতবর্ষ, ১৩৪৯ বৈশাখ

রাজা গোবিন্দচন্দ্রের নবাবিষ্কৃত দ্বিতীয় লিপি



নলিনীকান্ত ভট্টশালী

...প্রায় দেড় বছর আগে ঢাকা মিউজিয়মের অবৈতনিক সংগ্রাহক পরমস্নেহভাজন শ্রীমান গণেশচন্দ্র চক্রবর্তী ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর পরগণাস্থ কুলকুড়ি গ্রামের গুহ পরিবারে রক্ষিত একখানা মূর্তির সংবাদ আমাকে প্রদান করে। অনতিবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব জন্য হাতের লেখা পুথি সংগ্রাহক শ্রীমান মুকুন্দবিহারী দাস পুথি খোঁজা উপলক্ষে কুলকুড়ি যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঐ মূর্তিখানি পরীক্ষা করিয়া ১৯৪১ সনের ২ মে তাবিখের (১৯ বৈশাখ—১৩৪৮) পত্রসহ ঐ মূর্তির পাদপীঠস্থ লিপির দুইখানি ছাপ আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। অস্পষ্ট ছাপ হইতেও অনায়াসেই পড়িতে পারিলাম যে লিপিখানি গোবিন্দচন্দ্রের দ্বাদশ সম্বৎসরের। বঙ্গালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের নিজ রাজ্য সীমানার অভ্যন্তরে আবিষ্কৃত এই লিপিতে তাহার নাম পাইয়া পরম পুলকিত হইয়া ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারকে কলিকাতায় এই আবিষ্কারবার্তা লিখিয়া জানাইলাম এবং একখানি ছাপ তাহাকে পাঠাইয়া দিলাম। উত্তরে ডক্টর মজুমদার আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাকে জানাইলেন যে বিক্রমপুরে অনতিকাল পূর্বে আর একখানা বিষ্ণুমূর্তির পাদপীঠে গোবিন্দচন্দ্রের ত্রয়োবিংশতি সম্বৎসরের লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে,—এই সম্বন্ধে প্রবন্ধ জ্যৈষ্ঠের ভারতবর্ষে বাহির হইতেছে। জ্যৈষ্ঠের ভারতবর্ষ হস্তগত হইলে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে এই লিপির আবিষ্কর্তা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং প্রবন্ধের লেখক পরম স্নেহ ও শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার।

কুলকুড়ির মূর্তিখানি সম্প্রতি কুলকুড়ির উদারহৃদয় গুহভ্রাতৃচতুষ্টয় শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন গুহ, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র গুহ এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র গুহ ঢাকা মিউজিয়মে দান করিয়াছেন। জাতীয় ইতিহাসের অমূল্য উপাদান-লিপিসম্বলিত এই মূর্তিখানি সর্বসাধারণের অধিগম্য এক চিত্রশালায় দান করিয়া গুহভ্রাতৃচতুষ্টয় সমগ্র বাঙালি জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। প্রত্নবিধাতা তাহাদের কল্যাণ করুন। পূর্ববঙ্গ হইতে প্রায় একই সময়ে গোবিন্দচন্দ্রের দুইখানি লিপির আবিষ্কার ডক্টর মজুমদার মরুভূমির আকাশের মুষলধারে বর্ষণের সহিত উপমিত করিয়াছিলেন। কান্তকবির ভাব ও ভাষায় সর্বদাই মনে হয়, বাংলা দেশের সমস্ত প্রত্ন সম্পদই হয়ত কৃপণ বিধাতা একদিন বাহির করিয়া দিতে বাধ্য হইবেন, কিন্তু আমরা সারা জীবন আঁকুপাঁকু করিয়াই গেলাম—অনেক সমস্যারই সমাধান মিলিল না। বিধাতাকে আর একটু অকৃপণ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা—আশা করি স্বার্থপরতা বলিয়া বিবেচিতা হইবে না।

কুলকুড়ির মূর্তিখানি নাতিবৃহৎ, উচ্চতায় ফুট তিনেক মাত্র। মূর্তিখানি সাধারণ সূর্যমূর্তি, উপরে কৃত্তিমুখ এবং ফোণশীর্ষ। মূল মূর্তির দুই ধারে লতাবৃত্তের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্রাকৃতিতে একাদশ আদিত্য উৎকীর্ণ। দ্বাদশ বৃত্তটির অভ্যন্তরে, দক্ষিণ হস্তে সনাল পদ্মধারী একটি দণ্ডায়মান শ্মশ্রুল পুরুষ মূর্তি। সূর্য মূর্তির দক্ষিণে সূর্যরথে থাকিয়া লোকের সুকৃতি-দুষ্কৃতি লিখনে রত দোয়াত-কলম হস্তে শ্মশ্রুল পিঙ্গল মূর্তি দাঁড়াইয়া ; বামে দণ্ড ও খড়গধারী দণ্ডী। দণ্ডীও পিঙ্গল মূর্তি এবং মূল সূর্য মূর্তির মধ্যে ক্ষুদ্রাকৃতি দুই স্ত্রী মূর্তি—সূর্যের দুই স্ত্রী সুরেসু

বা দ্যৌ এবং ছায়া—দ্যাবা-পৃথিবী অর্থাৎ আকাশ ও মৃত্তিকার প্রতীক। পাদপীঠের একেবারে প্রান্তে উষা ও প্রত্যুষা আকর্ণ গুণপূরিত ধনু দ্বারা সূর্যকিরণরূপী বাণসমূহ দিগদিগন্তে নিক্ষেপ করিতেছে। দণ্ডী ও পিঙ্গলের মস্তকসংলগ্ন দুই অশ্বারোহিণী স্ত্রী-মূর্তি উষা ও প্রত্যুষার মতই শর নিক্ষেপে রত। এই অশ্বারোহিণী স্ত্রী মূর্তি দুইটি এই মূর্তির নূতন অঙ্গ, অন্য কোন সূর্য মূর্তিতে এই অশ্বরোহিণী শরনিক্ষেপরতা স্ত্রী মূর্তি লক্ষ্য করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সূর্যের পদ্মাসনের নিচে অর্ধশরীরী অরুণ নাগবজ্জু-সংযত সপ্তাশ্ব পরিচালনা করিতেছেন, সর্ব নিম্নে সূর্যরথের এক চক্রস্পষ্টভাবে উৎকীর্ণ।



গোবিন্দচন্দ্রের দ্বাদশ সম্বৎসরের লিপিযুক্ত কুলকুড়ির সূর্য-মূর্তি

রাজেন্দ্র চোল ১০১২ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার নবম রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ লিপিতে তাহার বঙ্গবিজয়ের পরিচয় পাওয়া যায় না। ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে এই বিবরণ পাওয়া যায়। কাজেই দ্বাদশ রাজ্যাঙ্কে এই অভিযান সঙঘটিত হইয়াছিল, ইহা সঙ্গতরূপেই ধরা যায়। ১০২৩ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি হইতে ১০২৪ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত রাজেন্দ্র চোলের দ্বাদশ রাজ্যাঙ্ক। সমরাভিযানগুলি সাধারণত বিজয়াদশমীর পরে আরব্ধ হইয়া সারা শীতকাল ধরিয়া চলিত। বঙ্গাল দেশে ঝড়বৃষ্টির উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, পৌষ-মাসের বৃষ্টি রাজেন্দ্র চোল সম্ভবত বঙ্গাল দেশে আসিয়া পাইয়াছিলেন। যাহা হউক গোবিন্দচন্দ্র ও রাজেন্দ্র চোলের সংঘর্ষ ১০২৩ খ্রিস্টাব্দের শেষে অথবা ১০২৪ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে ঘটিয়া থাকিবে। এই ১০২৩-২৪-এর দুই ধারে

গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকাল বিস্তৃত এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই এই বর্তমান ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে মূর্তিখানির বয়স প্রায় ৯১৮ বৎসর হইয়াছে। বঙ্গের ভাস্কর্যের ইতিহাসে এই মূর্তিখানি নানা সমস্যা উত্থাপন করিবে সন্দেহ নাই। সেই সমস্যা মীমাংসার স্থান ইহা নহে।

ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার সম্পাদিত লিপিখানি গোবিন্দ্রচন্দ্রের ২২ কি ২৩ সম্বৎসরের। এককের অঙ্কটি স্পষ্ট নহে। মূর্তিখানি বিক্রমপুরেই আছে, কিন্তু আমি অদ্যাবধি স্বয়ং যাইয়া দেখিয়া আসিবার অবসর করিতে পারি নাই। অধ্যাপক সরকারের মূল্যবান প্রবন্ধটি যৌবনোচিত উৎসাহ ও বাগ্‌বাহুল্যে পরিপূর্ণ। বয়সের সহিত এই সমুজ্জ্বল-সম্ভাবনা ভবিষ্য উৎসাহী যুবকের বাক্‌সংযম এবং হুঁসিয়ার হইয়া কথা বলার অভ্যাস আপনি আসিবে, তজ্জন্য বন্ধুবর হরেকৃষ্ণবাবু অনর্থক অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তব্য বিষয় সম্যক আয়ত্ত না করিয়া অনেক কথা বলিতে গেলে যে অনেক ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে, এই সত্য প্রত্যেকেরই ঠেকিয়া শিখিতে হয়, হিতৈষীরও সমালোচনা এই ক্ষেত্রে বিদ্বিষ্ট বলিয়া ভুল হইতে পারে।

আমরা লিপিখানি সম্পাদন মাত্র করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

লিপিটি সূর্য মূর্তির পাদপীঠের চারিটি স্থানে একটি মাত্র ছত্রে অঙ্কিত। ব্লকের সুবিধার জন্য চারিটি অংশ নিচে নিচে সাজান হইল। মূর্তির প্রতিকৃতিতে বিভিন্ন অংশগুলির অবস্থান দৃষ্ট হইবে।

লিপি

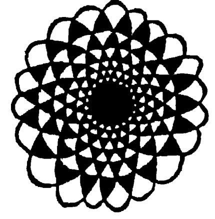
শ্রীতক্ষি[১] দিন কারীন্[২] ভট্টারক [ঃ]
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেব পা
দীয় সম্বত্ ১২ ফাল্গুন
দিনে ১৯

ভারতবর্ষ ১৩৪৮ ফাল্গুন

---

১. তক্ষি শব্দটি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং বিস্ময়াবহ। দ্বিতীয় অক্ষরটি সুলিখিত নহে। মনে হয় খনৎকার প্রথমে ত খুঁড়িয়াছিল ; তাহার পরে সংশোধন করিয়া ক্ষ করিয়াছে। এই শব্দটি সাধারণ অভিধানে প্রাপ্তব্য নহে। মনিয়ার-উইলিয়াম্‌সের বৃহৎকার সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানে তক্মন্ শব্দটির অর্থ লিখিয়াছে— Name of a disease, accompanied by Skin eruption.—একরকম রোগ, যাহার সহিত চর্মরোগ বর্তমান থাকে। অথর্ব বেদে ১ম, ৪র্থ—৬ষ্ঠ, ৯ম, ১১শ, ১৯শ খণ্ডে এই তক্মন্ হইতে রক্ষা পাইবার মন্ত্র লিখিত আছে। সূর্য কুষ্ঠরোগ নাশন বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। চর্মরোগযুক্ত তক্ম অনুরূপ কোন রোগই হইবে। সম্ভবত সেই রোগনাশন মূর্তিকেই "তক্ষি" বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে।

২ দিনকারিন পঠিতব্য।



ফরিদপুরের বিবরণ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

আমরা গত ২রা পৌষ শনিবার প্রাতে পাবনা ছাড়িয়া নৌকা চালনা করিলাম, তদবধি এ পর্যন্ত কোন ভয়ঙ্কর চরেব করে পতিত হই নাই, যত আসিতেছি ততই পদ্মাকে প্রবলা দেখিতেছি। রবিবার দিবসে পূর্বাহ্ণ বেলা নয় ঘটিকা সময়ে "বাইশ কোদালের" মোহনার পারে তেমহনীতে "যমুনুর" নমুনাদৃষ্টে চক্ষুস্থির করিতে হইল, এবং ভাবিলাম এই যমুনা যথার্থই যমের ভগিনী বটেন, কতস্থানে ইহার কত প্রকার ভাবভঙ্গি ও মূর্তি দেখিলাম, তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারি না। প্রয়াগে যুক্তবেণী, ত্রিবেণীতে মুক্তবেণী, বাদাবনে ইচ্ছামতীর মাথার বেণী, জাফরগঞ্জে পদ্মার সহচরী রাক্ষসীরূপিণী, এখানে এপার ওপার দৃষ্ট হয় না, অত্যন্ত প্রবলা, কত গ্রাম কত গঞ্জ উদরস্থ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার সংখ্যা হয় না, যমুনার জল অতি নির্মল ও কল্যাণকর, ইহার জলে স্নান ও এই জল পান করত প্রণিপাত করিয়া পুনর্বার পদ্মাতে প্রবেশপূর্বক ফরিদপুবাভিমুখ যাত্রা করিলাম। এই শীতকালে এখানকার পদ্মার যে প্রকার আকার দেখিলাম ইহাতে বর্ষাকালে কিরূপ হয়, তাহা চিন্তা করিতে হইলে ভয়েই হৃৎকম্প হইতে থাকে। ঐ দিবস যামিনী যামার্দ্ধ সময়ে পদ্মার পশ্চিম পার ফরিদপুরের সম্মুখে "টেঁপাখোলার" ঘাটে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। এই টেঁপাখোলা ফরিদপুর জেলার সদর ঘাট, পূর্বে এ গ্রাম অতি বৃহৎ ছিল অনেক ব্যবসায়ী ও ভদ্রলোক বাস করিতেন, পদ্মার অত্যাচারে সমুদয় উচ্ছন্ন গিয়াছে, অধুনা টেঁপাখোলার কেবল খোলা সার হইয়াছে, সে গ্রাম নাই, সে হাটবাজার নাই, সে বসতি নাই, সে শোভা নাই, শুদ্ধ এক নামমাত্র রহিয়াছে।

টেঁপাখোলার ঘাট হইতে ফরিদপুরের কাছারি ও স্কুল ঘর অর্ধ ক্রোশের কিঞ্চিৎ অধিক হইবে, বাজার এক ক্রোশের ন্যূন নহে, পদ্মাব ক্রোড়ে চবেব সঞ্চার হওয়াতে শীতকালে বাজারের ঘাটে নৌকা যায় না। ইহাতেই সংপ্রতি পদব্রজে গমনাগমনে কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু রাজপথ অতি উৎকৃষ্ট, দোসারি বড় বড় বৃক্ষ সকল ছায়া বিস্তারপূর্বক পথিকপুঞ্জের পথশ্রান্তি নিবারণ করিতেছে। বর্ষা সময়ে বণিকবৃন্দের বাণিজ্য পক্ষে অত্যন্ত সুযোগ হয়। কারণ বাজারের ঘাটে অনায়াসেই নৌকা গিয়া থাকে, ইহাতে ব্যয় বাহুল্য হয় না। অধুনা শকটের আশ্রয় লওয়াতে অতিশয় ক্লেশ ও ব্যয়ের আধিক্য হইতেছে, এজন্য এ সময়ে বড় বড় মহাজনেরা বড় বড় নৌকার আমদানি রপ্তানি প্রায় রহিত করিয়াছেন।

এই ফরিদপুর বাণিজ্যপক্ষে অতি বিখ্যাত ও প্রধান স্থল, কত দেশের কত মহাজন কত দ্রব্য ফরিদপুবে খরিদ করিয়া কত স্থানে বিক্রয় করিতেছেন, এখানে বহু প্রকার শস্য, নীল, ইক্ষু, ইক্ষুর গুড় ও তাহার চিনি, খেজুরে গুড় ও খেজুরে চিনি যথেষ্ট জন্মে। খেজুর গাছ এত অধিক কুত্রাপিই নাই। এইখানকার গুড় চিনি সর্বত্রই রপ্তানি হইতেছে।

মৎস্যের কথা কি কহিব, এক আনার মাছ কলিকাতায় এক টাকার হইবে। মাছ এত শস্তা দেখিয়া তাহার বিষয়ে ঘৃণা জন্মিয়াছে। দুগ্ধ, দধি, ঘৃত প্রভৃতি অল্প মূল্যে অধিক পাওয়া যায়। তরি-তরকারি প্রায় সকলি মিলে, বাঙালির খাদ্য সুখের পক্ষে এই স্থান প্রধান বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

ফরিদপুরের কাছারির নিকট হইতে "ঢোল সমুদ্র" দর্শন করিলে মন মহানন্দে মুগ্ধ হইতে থাকে, তাহার শোভা অতি সুন্দর।

ফরিদপুরের বাজার পাকা নহে, দোকান সকল চকবন্দি নহে, সমস্তই খড়ুয়া ঘর, দেখিতে উত্তম নহে, কিন্তু তথায় প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য প্রায় সকলি প্রাপ্ত হওযা যায়। প্রতি রবিবার ও বুধবারে হাট হইয়া থাকে। সেই হাটে অনেক দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হয়।

এখানকার জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সাহেব অতি সুজন, অপক্ষপাতি, কিন্তু বঙ্গভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন নাই। বাংলায় কিছু নিপুণ হইলে প্রজাব পক্ষে আরো অধিক সুখের বিষয় হইত।

সাহেব এক্ষণে সরকুটে ভ্রমণ করিতেছেন, তিনি গত দিবস প্রাতে আসিয়া নিয়মিত সময়ে কাছারি করেন, এবং নড়ালের সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারি বাবু রামরত্ন রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করত স্বয়ং বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বাবুকে অতিশয় সন্তোষিত করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে পুর্নবার ভ্রমণে যাত্রা করিলেন, রাত্রিতে রায় বাবুর সহিত আমারদিগের সাক্ষাৎ হইয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত সদালাপ হইল। উক্ত মহাশয় মঙ্গলবার দিবসে স্নান ভোজন কবিয়া স্বধামে গমন করিবেন, এরূপ শুনিলাম: মাজিষ্ট্রেট সাহেব রায়বাবুর নিকটে ফরিদপুরের স্কুলের জন্য বাটি নির্মাণ ও পুস্তকালয় স্থাপন বিষয়ের প্রস্তাব করাতে তিনি তদ্ব্যাপারে যথাযোগ্য আনুকূল্য করণে অঙ্গীকৃত হইলেন। বোধ করি বিদ্যোৎসাহী মাত্রেই এই সুসংবাদ শ্রবণে অপর্যাপ্ত আহ্লাদ প্রাপ্ত হইবেন।

বৈকালে এখানকার সুবিজ্ঞ গুণজ্ঞ ডাক্তার অস্মদবন্ধু বাবু কালাচাঁদ দে মহোদয় নৌকায় আসিয়া সাক্ষাৎ করাতে তাঁহার নিকট বিপুল বাধ্যতা স্বীকার করিলাম, অপর কতিপয় সম্ভ্রান্ত কর্মচারি ঐরূপে নৌকায় দেখা কবিযা সদালাপে বিশেষ বাধিত করিলেন, ঐ সময়ে মুন্সেফ বাবু এবং কেরাণি বাবু পাল্কি পাঠাইয়া দিলেন, আমি তাহাতে আরোহণ করত সন্ধ্যার সময় কেরাণি বাবুর বাসায় সমাগত হইলাম, ইহার নাম বাবু চাঁদমোহন মৈত্র, ইনি অতি মান্য বংশ, কৃতবিদ্যা ও সর্বগুণে ভূষিত, মুন্সেফ বাবু পীড়িত থাকাতে তাহার সহিত দেখা হইল না। ইহার খ্যাতি সৌরভে ফরিদপুব আমোদিত করিয়াছে। কেরাণি বাবুব বাসায় স্কুলের শিক্ষক বাবুরা ও অন্যান্য মান্য মহাশয়েরা আগমনপূর্ব্বব বিবিধ প্রকারে আমাকে সদগুণের গুণে বদ্ধ করিলেন।

অদ্য প্রাতে আমরা ঢাকায় যাত্রা কবিলাম। *সংবাদ প্রভাকব ২৩ পৌষ ১২৬১*

ঢাকা, বরিশাল ও যশোহর, এই তিন জেলার কিছু কিছু অধিকার লইয়া ফরিদপুর স্থাপিত হয়। প্রথমে এই জেলা সম্পূর্ণ জেলা ছিল, একজন সিবিল কালেক্টর ও মাজিস্ট্রেটের কর্ম করিতেন, আর একজন জজের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল এখানকার জজের পদ রহিত হইয়াছে, এইক্ষণে কেবল জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের "মহকুমা" মাত্র আছে।

ফরিদপুরেব ফৌজদারি সংক্রান্ত সমুদয় বিচারের কার্য ঢাকার সেশন জজেরদ্বারা নিষ্পাদিত হয়। এবং ইহার কালেক্টরি সর্বতোভাবেই ঢাকা ডিবিসনের কমিশনার সাহেবের অধীন।

যে যে জেলার সহিত দেওয়ানি বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, সেই সেই জেলায় দেওয়ানি মোকর্দমার আপিলের বিচার সমাধা হয়, কিন্তু মূল বিচার এইখানেই হইয়া থাকে, কারণ সদর আমিনের কাছারি স্থাপিত আছে।

জেলার সীমা ঃ

পূর্ব সীমা। ১ এক ক্রোশ, পদ্মা নদীব তীর, টেঁপাখোলার ঘাট। এই ঘাট ফরিদপুরের সদর ঘাট।

দক্ষিণ সীমা। বারাসিয়া ও এলনখালি নদী। ১১ এগারো ক্রোশ পথ।

উত্তর সীমা। পদ্মা নদী। ১২ বার ক্রোশ পথ।

পশ্চিম সীমা। চন্দনা নদী। ১১ ক্রোশ পথ। কিন্তু জেলার পূর্ব দক্ষিণ কোণ অন্যূন ২৪ ক্রোশ পথ।

পশ্চিম উত্তর কোণ ১৮ ক্রোশ পথ। এবং পশ্চিম দক্ষিণ কোণ ১৯ ক্রোশ পথ।

এই জেলার উৎপন্ন অতি অল্প, ভূমির কর, আফকারি, ষ্টাম্প, ডাক, গুদরা ও জেলখানার লভ্য লইয়া সবশুদ্ধ আয় ১০০০০০ টাকা।

গুদরার উৎপন্ন ১৮০০ টাকার অধিক নহে। কিন্তু এই টাকা কোন হিতকর কর্মে প্রায় ব্যয় হয় না। কারণ পথঘাটের অবস্থা অতিশয় কদর্য দেখিলাম।

গত বৎসর জেলখানার বন্দিদিগের পরিশ্রম দ্বারা ১৭০০ টাকা লাভ হইয়াছিল।

এখানকার কয়েদিরা বস্ত্র, কাগজ, মোড়া, থোলে, ইষ্টক, চেটাই, তালপত্রের ছাতি ও টোকা, বাঁশের ঝুড়ি, কাষ্ঠের চৌকি, তক্তাপোষ প্রভৃতি এবং টিকে গুল পর্যন্ত প্রস্তুত করে। অপর কোন জেলার জেলখানায় টিকে গুল প্রস্তুত হইতেছে এমত দেখা যায় নাই, শুদ্ধ এই বিষয় এই স্থানে নূতন দেখিলাম। ফরিদপুরের কারাবাসিগণ অন্য জেলার বন্দিদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুখ সম্ভোগ করিতেছে।

অধুনা এইচ্. সি. রেক্স সাহেব এখানকার জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদে অভিষিক্ত আছেন। সিবিলের মধ্যে ইনি একাকী মাত্র। এই সাহেব অতি সজ্জন ও নিরপেক্ষ, যদিও বয়স অল্প, কিন্তু বিলক্ষণ প্রবীণতা আছে। এই মহাশয় নীলকরদিগের অনুরোধের বশ্য নহেন, সবল অবল সকলেরই প্রতি সমান নেত্রে দৃষ্টি করেন। ইহার শাসন ভয়ে নীলকরেরা প্রবল হইয়া প্রজা পীড়নে স্পষ্টরূপে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, সুতরাং রেক্স স্বজাতির প্রতি পক্ষপাত পুরিত প্রীতি প্রচার না করাতে প্রজাপুঞ্জের প্রেমাস্পদ ও পরম প্রিয়পাত্র হইয়াছেন।

বিশেষত ইনি বিদ্যা বিষয়ে বিলক্ষণ উৎসাহ ও অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা তাহার আন্তরিক, মৌখিক ব্যাপার নহে, কারণ বিদ্যালয়ের নিমিত্ত উত্তম একটি গৃহ নির্মিত এবং একটা "লাইব্রেরী" অর্থাৎ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্য যথেষ্ট যত্ন করিতেছেন। এই সৎকর্ম সাধন নিমিত্ত জমিদারদিগ্যে বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। তাহার এই অনুরোধকে এক প্রকার উপাসনা বলিলেও বলা যাইতে পারে। সাহেবটি সর্বাংশেই শ্রেষ্ঠ, কেবল বঙ্গভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন নাই। এই প্রযুক্ত আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি। কেননা তিনি যে প্রকার বহু গুণে ভূষিত, সেই প্রকার প্রজাদিগের জাতীয় ভাষায় নৈপুণ্য লাভ করিলে সর্বতোভাবে যশস্বী হইতে পারিতেন। বাদি প্রতিবাদি ও সাক্ষিদিগের কথা ও অভিপ্রায় এবং বিষয়ের মর্ম সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিতেন, কাহারো মুখাপেক্ষা করিতে হইত না।

ইহার নিকট নালিসি মোকদ্দমা অতি অল্প অর্পিত হইতেছে, যেহেতু ইনি কোন কোন বিষয়ে বাদির আর্দ্দাস অগ্রাহ্য করেন, বরং তাহার অর্থ দণ্ড করিয়া প্রতিবাদিকে নিষ্কৃতি দেন, সুতরাং এই কারণে অনেকেই নালিস করিতে ভীত হয়েন. সাহেব কি অভিপ্রায়ে এরূপ করেন তাহা বলিতে পারিলাম না, বোধ করি মনে একখানা কিছু বিবেচনা করিয়া থাকিবেন, তাহার মনে এমত প্রতীতি জন্মিয়া থাকিবে যে, ফরিদপুরের লোকেরা মিথ্যা রূপেই অনেক নালিস উপস্থিত করে, যাহা হউক. আমারদিগের বোধে তিনি প্রজার ভাষায় সুযোগ্য হইলে কখনই এমত করিতেন না, কারণ আবেদনপত্র শ্রবণ করিয়া আশু তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাদ্দারা অনায়াসেই সত্য মিথ্যা বোধ হইতে পারিত, তিনি যদি এখনো এ বিষয়ে বিহিত মনোযোগ করেন তবে অতিশয় সুখের বিষয় হয়। *সংবাদ প্রভাকর, ২৯ পৌষ ১২৬১*

এখানকার প্রধান সদর আমিন মেং সি, মেকি সাহেব। মেং মেকি নিতান্ত মেকি নহেন,

নামের গুণ না ধরিলেই প্রশংসিত হইবেন। ইহার বিচার বিষয়ে বুদ্ধি ভাল, বিষয় বোধ বিলক্ষণ আছে।

সদর মুন্সেফ বাবু রাসবিহারী বসু, ইনি কৃষ্ণনগরের কালেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র। অতি সুবিচারক এবং সূক্ষ্মদর্শী, জেলার তাবতেই ইহার অনুরাগ ব্যক্ত করেন, ইনি দেশ হিতকর ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নশীল।

সংপ্রতি এ জেলায় ২ জন অচিহ্নিত ডেপুটি কালেক্টর আছেন, তন্মধ্যে প্রধান গণিত, বাবু রামগতি মিত্র। ইহার বয়স প্রায় ৯০ বৎসর হইবে। এই প্রাচীনাবস্থায় যুবা পুরুষের ন্যায় বিলক্ষণ সবল আছেন, যথাযোগ্য পরিশ্রম করিয়া যথারীতি ক্রমে সুখ্যাতির সহিত স্বকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ইনি বয়সে প্রবীণ, কার্যে প্রবীণ, বুদ্ধিতে প্রবীণ, কিন্তু পরিশ্রমে নবীন।

দ্বিতীয় ডেপুটি কালেক্টর বাবু নীলকমল শীল, এই শীল শিল নহেন, সুশীল এবং সুজন।

এখানকার সব-আসিস্টান্ট সারজন বাবু কালাচাঁদ দে, যিনি বহু দিবস ভবানীপুরের ডিস্পেন্সরিতে থাকিয়া সমুহ সুখ্যাতি সঞ্চয় করিয়াছেন। সেই মহাশয় ফরিদপুরে আসিয়া ততোধিক গৌরবান্বিত হইয়াছেন। ইহার সাধু ব্যবহারে ও সুচিকিৎসায় সকলেই সন্তুষ্ট। আমরা দুঃখিত হইলাম জজ সাহেব ইহার প্রতি রেজিস্টরি কার্যের ভারার্পণ করেন নাই, ঐ কর্ম মাজিস্ট্রেট সাহেবকে অর্পণ করিয়াছেন। যখন পাবনায় সব-আসিস্টান্ট সারজন রেজিস্টরি পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ইনি কেন সে বিষয়ে বঞ্চিত হয়েন। বিচার ও যুক্তি মতে অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে পারেন। অতএব কালাচাঁদ বাবুকে রেজিস্টরি কর্মে নিযুক্ত করা কর্তৃপক্ষের বিশেষ কর্তব্য হইয়াছে।

সংবাদ প্রভাকর, ৩ মাঘ ১২৬১

এই জেলার সদর মুন্সেফ ভিন্ন অপর দুই জন মুন্সেফ আছেন। যথা—ভাঙা। মুন্সেফ ১। মুখসুদপুর। মুন্সেফ ১। এই দুই স্থানের মুন্সেফ কিরূপ উপযুক্ত ও বিচার-তৎপর আমরা তাহা জ্ঞাত হইতে পারি নাই। বোধ করি উত্তম হইবেন, কারণ অধম হইলে অবশ্যই দুর্গন্ধ নির্গত হইত।

ফরিদপুরে থানা সাতটা এবং ফাঁড়ি দুইটা। যথা —

থানা	নিজ ফরিদপুর কোতয়ালি	১
ঐ	বেলগাছি	২
ঐ	ভূষণা	৩
ঐ	বাট্‌কে	৪
ঐ	তালমা	৫
ঐ	মুখসুদপুর	৬
ঐ	শিবচর	৭
ফাঁড়ি	সদরপুর	১
ঐ	গোপীনাথপুর	২

জেলার রেবিনিউ অর্থাৎ কালেক্টরি সংক্রান্ত মাসিক ব্যয় সবশুদ্ধ কোং ১৩৫০ টাকা।

জুডিসিয়েল অর্থাৎ ফৌজদারি ও দেওয়ানি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে মাসিক ব্যয় সাহেব সহিত সর্বশুদ্ধ কোং ৫০০০ টাকা।

জেলাভুক্ত পরগণা ও তাহার অধিকারিদিগের নাম বিশেষরূপে লিখিত হইল।

যথা—	জমা—
পরগণা	জমিদার
হ্যাবিলি	বাবু হরকুমার ঠাকুর
পাটপসার	বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি

নসিবসাহী	বাবু নিমাইচাঁদ সান্যাল প্রভৃতি
তেলিহাটি	বাবু রামরত্ন রায়
ধুলদি	ঐ
বেলগাছি	বাবু ঐ রকম ৮০, করমবক্স চৌধুরি।০
সাঁতোর	বাবু শ্রীগোপাল পাল চৌধুরি প্রভৃতি
মকিমপুর	রাণী রাসমণি দাসী
তপ্যে বিনোদপুর	বাবু গুরুদাস রায়
রুপাপাত	বাবু ঐ
মহিমসাহী কিয়দংশ	পত্তনিদার রবার্ট সাহেব, নীলকর
নলদি	রাণী কাত্যায়নী

নীলকুটির কান্সরণের বিশেষ নাম।

কান্সরণ মীরগঞ্জ। অধ্যক্ষ, মেং মেকেথর সাহেব। ইনি জমিদার, পত্তনিদার ও ইজারদার হওয়াতে প্রজারা সুখি নহে। কারণ তাহারদিগের প্রতি অত্যাচার হইয়া থাকে।

কান্সরণ পাঁচুড়ে। অধ্যক্ষ মেং রেমি সাহেব। অতি ভদ্র।

কান্সরণ মদনধারি। অধ্যক্ষ মেং বেল সাহেব। প্রজাপ্রিয় নহেন।

কান্সরণ কাসিমপুর। অধ্যক্ষ মেং ডনলপ সাহেব। অতি ভদ্র।

কান্সরণ গাঁড়াখোলা। অধ্যক্ষ মেং রবর্ট সাহেব। প্রজাপ্রিয় নহেন।

কান্সরণ সহবদপুর। অধ্যক্ষ মেং ষ্টেফেন সাহেব। দুরন্ত নহেন।

এই সমস্ত কান্সরণের অধীনে অনেক কুটি, তদ্ভিন্ন জমিদারদিগের বিস্তর কুটি আছে। নীল এখানে উত্তম জন্মে।

এই জেলাবাসি লোকের মধ্যে কানাইপুরের সিক্‌দারেরা প্রধান ধনাঢ্য, ইহারা শুণ্ডী। সৈযদপুরের রায়েরা বিখ্যাত ধনি, ইহারাও শুণ্ডী।

জেলার ভদ্রগ্রাম

বেনেবৌ—এই গ্রামে অনেক বৈদ্য আছেন, তাহারাই প্রধান।

পাঁচচর—এই গ্রামে অনেক বৈদ্য আছেন, তাহারাই প্রধান।

খাদারপুর—এই গ্রামে অনেক বৈদ্য আছেন, তাহারাই প্রধান।

মহিষালা—এ গ্রামে ব্রাহ্মণ অধিক, তাহারাই প্রধান।

মদনদিয়া—এ গ্রামে ব্রাহ্মণ অধিক, তাহারাই প্রধান।

পেয়ারপুর—এ গ্রামে ব্রাহ্মণ অধিক, তাহারাই প্রধান।

পশড়া—এ গ্রামে ব্রাহ্মণ অধিক, তাহারাই প্রধান।

লক্ষ্মীপুর—এ গ্রামে কায়স্থ অনেক, তাহারাই সম্ভ্রান্ত।

কাঁচিআইল—এ গ্রামে কায়স্থ অনেক, তাহারাই সম্ভ্রান্ত।

জালগি—এ গ্রামে কাযস্থ অনেক, তাহারাই সম্ভ্রান্ত।

মোচড়া—এ গ্রামে কায়স্থ অনেক, তাহারাই সম্ভ্রান্ত।

ভাজন ডাঙা—বৈদ্য ও কায়স্থ।

কাফরা—বৈদ্য ও কায়স্থ।

নিজ ফরিদপুরে ইতর লোকের সংখ্যাই অধিক. ভদ্রলোক অতি অল্প।

সংবাদ প্রভাকর ৪ মাঘ ১২৬১

এই জেলায যত প্রজা আছে তন্মধ্যে মুসলমান ।৷৵০ দশ আনা, হিন্দু ।৵০ ছয় আনা।

এই অল্প ভাগ হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ ৷৷০ আনা, বৈদ্য /০ এক আনা, কায়স্থ ৵০ দুই আনা, অপর সকল জাতিতে ৷/০ পাঁচ আনা হইবে।

ভদ্র কায়স্থ অত্যল্প, আর সমুদায় ইতর। কায়েতে দাঁড় বহে, মোট বহে, খানসামাগিরি করে, খেজুর গাছ কাটে। লেটেলি করে, না করে এমন কর্মই নাই। ইহারা কিঞ্চিৎ সঙ্গতি করিতে পারিলে ধন বলে আবার বড় কায়েৎ হইয়া বসে। ফরিদপুরের কয়েক জন ইতর কায়স্থ অর্থ প্রভাবে কলিকাতায় গণ্য ও মান্যরূপে চলিত হইয়াছে।

এখানে নবসাক প্রায় নাই, তাহারদের সংখ্যা গণনার মধ্যেই নহেন।

এই স্থানে "কুশলনাথ" নামে এক অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, জেলাবাসি প্রজা মাত্রেই দেবতা বলিয়া অতি ভক্তি ও বিশ্বাসপূর্বক সেই বৃক্ষের পূজা করিয়া থাকে। প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার দিবসে তাহার তলে সমারোহ ঘটিত মেলা হইয়া থাকে। তাবতেই চিনি দুগ্ধ দিয়া পূজা দেয়। ছাগ মেষ বলিদান করে। শুভ প্রার্থনায় পূজা মানে, ধন্না পাড়ে।

সংবাদ প্রভাকর, ৫ মাঘ ১২৬১

ঢোল সমুদ্র ঃ

মাজিষ্ট্রেট সাহিবের কাছারি বাটির লাগাও দক্ষিণে "ঢোল সমুদ্র"। এই ঢোল সমুদ্রকে সমুদ্রবৎ বলিলেই হয়। চতুর্দিকেই সমান, ইহাব প্রত্যেক ভাগের পরিমাণ দুই ক্রোশের ন্যূন নহে। ইহার জল অতি মিষ্ট ও উপকারক। ইহাতে নানা জাতীয় মৎস্য যথেষ্টই পাওয়া যায়। জেলে মালারা সর্বদাই নৌকা লইয়া মৎস্য ধরিতেছে। ঢোল সমুদ্র দেখিতে অতি সুন্দর, তাহার জলে বিবিধ প্রকার জলচর পক্ষিও চরে, চরচর পক্ষি চরিতেছে—ক্ষুধা হরিতেছে—মধুর স্বরে সুধা ক্ষরিতেছে, গান ধরিতেছে, ভাবুক মনুষ্যের কর্ণে পীযূষ ভরিতেছে। মোহিত করিতেছে। বর্ষাকালে যখন পদ্মার সহিত ইহার সংযোগ হয় তখন আরো অধিক শোভা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই সময়ে যাহারা নৌকাপথে ভ্রমণ করেন, তাহারা পরমানন্দে পূর্ণ হইতে থাকেন।

বাণিজ্য ঃ

ফরিদপুর বাণিজ্য কার্যের প্রসিদ্ধ স্থান। সমুদয় নদনদীর মধ্য দিয়া নিয়ত নানাবিধ দ্রব্য পূরিত কত নৌকা যাতায়াত করিতেছে তাহার সংখ্যা হয় না। এই জেলার অন্তঃপাতি সৈয়দপুর নামক স্থান ব্যবসায়ের প্রধান স্থান। বঙ্গদেশের আর কুত্রাপি এত অধিক চিনি ও গুড়ের ক্রয় বিক্রয় হয় না। এখানে কি খেজুরে গুড় ও খেজুরে চিনি, কি আকের গুড় ও আকের চিনি, সকলি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কলিকাতার হৌস ওয়ালাদিগের নিয়োজিত কর্মকারকেরা সর্বদাই তথায় বাস কবতঃ চিনি গুড় ক্রয় করিয়া থাকেন। উক্ত সৈয়দপুর হইতে প্রতি দিবসেই কলিকাতা নগবে নৌকা রপ্তানি হইতেছে।

এই জেলার সাঁতোর পবগণায় যেমন উৎকৃষ্ট শীতলপাটি প্রস্তুত হয় সেরূপ আর কোনখানেই হয় না। ঐ স্থান হইতে কয়েকটা অতি পরিপাটি শীতলপাটি প্রস্তুত হইয়া বিলাতের মহামেলায় প্রেরিত হইয়াছিল।

শস্য ঃ

তণ্ডুল উত্তম হয়, কিন্তু প্রচুর রূপে জন্মে না, যে পরিমাণে জন্মে তাহাতে জেলার লোকেরি নির্বাহ হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে, সুতরাং অন্যত্র প্রেরিত হইতে পারে না।

ছোলা মটর, অড়হর ও মুসারি অধিক জন্মে, একারণ অন্যত্র রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানকার অড়হর অতি উপাদেয়, এক ভাবেই দ্রব হইয়া যায়।

স্বোণামুগ হয় না, হারিমুগ, কলাই ও খেঁসারি অল্প জন্মে।

পাট, সোণ, তিসি, সর্ষা প্রভৃতি যে পরিমাণে হয় তাহা ধর্তব্যের মধ্যে নহে।

খেজুরগাছ এখানকার প্রধান সম্পত্তি। খেজুরগুড়ের ব্যবসা করিয়া অধিক লোক প্রতিপালিত হয়।

আখের চাষ অল্প নহে, কিন্তু খেজুরের অপেক্ষা ন্যূন বটে।

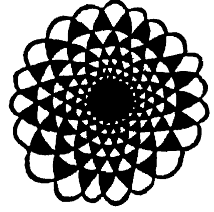
আম্র ভাল জন্মে না, যাহা হয় তাহা পোকায় পরিপূরিত। তাল বৃক্ষ প্রায় নাই, নারিকেল ও সুপারি বৃক্ষ বিস্তর আছে।

এখানে গোল আলুর চাষ নাই। কিন্তু লাউ, কুমুড়া, শিম, বেগুন, পটল, উচ্ছা, চুপড়ি আলু, থোড়, মোচা, কলা প্রভৃতি কয়েক প্রকার তরকারির অভাব নাই, পরিমিতরূপে উৎপন্ন হয়।

দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও মৎস্যের কথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র, এই কয়েক দ্রব্য অতি সুলভ ও সুস্বাদু।

এখানকার অধিকাংশ প্রজাই অত্যন্ত দুঃখী ও শঠ, তাহারা প্রায় তাবতেই ইতরবৃত্তি দ্বারা উপজীবিকা নির্বাহ করে।

সংবাদ প্রভাকর। ৬ মাঘ ১২৬১



বঙ্গভঙ্গ সমকালে ফরিদপুর

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী

[ফরিদপুর জেলা সমিতির প্রথম অধিবেশনে সভাপতির বক্তৃতা]
৬ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩১৪

আমার জননী এবং ভগিনিগণ, জন্মভূমির সমদুঃখী বন্ধুগণ এবং ভলন্টিয়ারগণ,—

আজকাল, একটি প্রশ্ন সর্বদাই আমার প্রাণকে তোলপাড় করিতেছে, যে সর্বাপেক্ষা হীন এবং নিচ, কর্তব্যের তাড়নায় অস্থির এবং ম্রিয়মান, সেবায় অপটু এবং অক্ষম, তাহাকে সম্মানিত করিতে বন্ধুরা এত লালায়িত কেন? এই বঙ্গে কত কত লোক আছেন, যাহারা জ্ঞানে প্রবীণ এবং ভাবে নবীন, চিন্তায় অতুলনীয় এবং সাধনায় অজেয়, সেবায় দুর্ধর্ষ এবং কর্তব্যে অটল, তাহাদিগকে না ডাকিয়া দুঃখী কাঙালকে আহ্বান করা কেন? আমার নয়নে জলধারা বহিয়াছে, কিন্তু এ প্রশ্নের সদুত্তর পাই নাই! লোকসঙ্ঘের কি অমার্জ্জনীয় ভ্রান্তি!!

আমি বাল্যকাল হইতেই গোপনে থাকিতে ভালবাসি। এই জন্য পুস্তক প্রণযন করিয়া প্রথমে, তাহাতে নাম প্রকাশ করিতাম না ; যদিও প্রতারণা নিবারণের জন্য শেষে পুস্তক সকলে নাম দিয়াছি বটে, কিন্তু প্রকাশ্য সভা সমিতিতে ধরা দেই নাই। দিবই বা কেন? আমি যে সামান্য হইতেও সামান্য, অতি সামান্য, অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ। কাজ করিতে বড় সাধ ছিল ; কিন্তু তাহা কিছুতেই সাধন করিতে পারি নাই :—মানুষকে ভালবাসিতে বাসনা ছিল, কিন্তু অসংযত আমি কিছুতেই সেই ব্রত প্রতিপালন করিয়া উঠিতে পারি নাই। বাল্যকালে প্রতিজ্ঞা ছিল, নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবা করিয়া মানুষে প্রাণ দিতে পারে, আমি তাহাও পারি নাই। তবে আমার ন্যায় সামান্যের মস্তকে অসামান্য সম্মান-মুকুট কেন বন্ধুগণ পরাইয়া দিলেন? কি মহা ভ্রান্তি!

তবে একটা কথা আছে, তাহা এই, বন্ধুদিগের দয়ার পরিসীমা নাই। আমি যখন ফরিদপুরের গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিবার সময়, অগণিত স্থানে পিতৃমাতৃ স্নেহ পাইয়া আত্মহারা হইয়া চক্ষের জলে ভাসিতাম, তখন কত সময় ভাবিতাম, মানুষের হৃদয়ে কত দয়া, কত প্রেম, কত ভালবাসা! বলিতে কি, মানুষের দয়া দেখিয়া আমি কত সময়ে ভাবিয়াছি, বিধাতা যেন পিতৃ-মাতৃ-সখা রূপ ধারণ করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছেন। আমি সকল সময়ে সকলের চরণ-ধূলি মস্তকে লইবার অবসর না পাইয়া থাকিলেও, প্রাণে সকলের সদ্ভাব-রেণু বরণ করিয়া লইয়াছি। আমি এইরূপ অযাচিত সদ্ভাব-রেণু ধারণ করিয়াই বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত হইয়াছি, আমার সম্পত্তি কেবল অগণ্য নরনারীর পূত সদ্ভাব এবং স্নেহ—আমি সকলের চরণের দাস ;—এবং সকলে মায়ের প্রসাদ লইয়া আমাকে আশীর্বাদ করিতে দণ্ডায়মান। নিত্যই কত, কত কত আশীর্বাদ বর্ষিত হইতেছে, আজও তাই, আপনারা এত সদ্ভাব-আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিতেছেন। আমি আর কি বলিব, আপনারা দেবদূত, আমার মায়ের অপূর্ব প্রকটলীলা, অপনাদিগকে আজ ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি।

আর একটা কথা আছে,—আমার নিজের নিজস্ব, স্বামীত্ব বা কৃতিত্ব আমি একদিনও

অনুভব করি নাই ;—আমি বরাবর বন্ধুদিগের হাতের ক্রীড়নক রূপে চলিয়াছি,—অথবা আমি যেন সমবেত ইচ্ছা শক্তি সাগরের একটি তরঙ্গ মাত্র, প্রজ্বলিত ইচ্ছা—দাবানলের একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র। কোন কাজ করিবার সময় দেখিয়াছি, সমস্ত ফরিদপুরের শুভ ইচ্ছা আমাকে গ্রাস করিয়াছে, আমার ক্ষীণতা, দুর্বলতা, ক্ষুদ্রতা বিনাশ করিয়াছে, আমি অনাহূত স্বর্গীয় বলে ১৩০০ সালে কোটালিপাড়ের দুর্ভিক্ষের প্রাক্কালে আমি মদনপাড়ের এক সভায় বলিয়াছিলাম, ফরিদপুরে আমি আর কিছু দেখিতে চাই না,—দেখিতে চাই কেবল শুভ ইচ্ছার তরঙ্গ,—যাহাতে পরিশ্রম বা অর্থ লাগে না, কোন কাঠোব সাধনার প্রয়োজন হয় না, আমি দেখিতে চাই, ফরিদপুরের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্যন্ত কেবল সেই শুভ ইচ্ছার তরঙ্গ। সেই শুভ ইচ্ছা আমাকে ছাইয়া ও গিলিয়া ফেলিয়াছে। আমার ব্যক্তিত্ব দেশ-যজ্ঞে অনেকদিন হইল ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

ফরিদপুর আমার বাল্যের স্বপ্ন যৌবনের মত্ততা, প্রৌঢ়ের ক্রীড়া, বার্ধক্যের সুখ। আমি কখনও বালক বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছি, কখনও পাগল বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছি, কখনও স্বার্থ-প্রণোদিত বলিয়া নিন্দিত হইয়াছি এবং কখনও আশা প্রমুগ্ধ বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছি! ফরিদপুব আমার উন্নতির সোপান, ফরিদপুর আমার বিনাশের কারণ, ফরিদপুর লইয়াই বাঁচিয়াছি, আমার প্রাণের গভীব বাসনা এই, ফরিদপুর লইয়াই যেন মরিতে পারি। হায়, ফরিদপুরের জন্য খাটিতে খাটিতে যদি মরিতে পারিতাম ; সকল সাধ পূর্ণ হইত। ফরিদপুর আমার গৃহ পরিবার, শরীর মন, পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র আমার সর্বস্ব। ফরিদপুর যেন আমার সকল সাধ-পূরণের বিধাতা-নির্দিষ্ট একমাত্র উপায়। ফরিদপুর আমার ধর্ম কর্ম, সাধন-ভজন, পূজা অর্চনা। ফরিদপুরের উন্নতিতে আমি উৎফুল্ল, অবনতিতে ম্রিয়মান। ফরিদপুর আর আমি, একাত্মক। অথবা আমি কে? আমার সর্বশরীরের অণুতে অণুতে কেবল ফরিদপুর অঙ্কিত। আমি বক্ষ বিদীর্ণ কবিয়া হনুমানের ন্যায় দেখাইতে পারি, এই বক্ষে ফরিদপুর-রামচন্দ্র-মূর্তি ভিন্ন আর কিছুই অঙ্কিত নাই। ফরিদপুরেব জন্য সর্বস্ব দিলেও আমার সাধ মিটে না। ফরিদপুর কি অপূর্ব মূর্তিতে আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে ; ভাবিলেও চক্ষে জল আসে।

কিন্তু আমি অক্ষম, আমি দুর্বল, আমি কিছুই করিতে পারি নাই। আমি নিন্দা এবং উপেক্ষারই যোগ্য। যাহাকে ভালবাসিয়াছি, তাহার জন্য কি করিতে পারিয়াছি? প্রতিদিনই বিশ্বপিতা আমাকে লজ্জা দিয়া বলেন—'তুই কিছুই করিতে পারিস নাই।' প্রতিদিনই কত বন্ধু কত রূপে বলেন—"কিছুই হয় নাই, কিছুই হয় নাই।" এই কথায় আমি লজ্জায় মরিয়া রহিয়াছি। বুঝিয়াছি, বাস্তবিক আমি কিছুই করিতে পারি নাই! কই আমার সেই ভালবাসা যাহাতে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের পদরেণুতে, সমভাবে, আত্মবিলুণ্ঠিত করা যায় ; কই আমার সেই পুণ্য, যাহাতে সকলকে প্রমত্ত করিয়া তোলা যায়! কার্যক্ষেত্র কত বিস্মৃত এবং আমি কত অক্ষম ; কত দরিদ্র কত দুর্বল! আমি লজ্জায় মরিয়া রহিয়াছি! মৃত ব্যক্তিকে জাগাইবার জন্য আপনাদের এ কি সুকৌশল! আমাকে উদ্বুদ্ধ করিবার কি অমোঘ লীলা! আমি আপনাদের মোহিনী-শক্তিতে আজ, সত্যই অবাক হইয়া গিয়াছি। আজ আপনাদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

আজ আমি দেখিতেছি ; আপনারা কি এক স্বর্গীয় মন্ত্রেপূত হইয়া ফরিদপুরকে তুলিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। সুদীর্ঘকাল পরে এই দাসের সমস্ত প্রার্থনা বিশ্বপতি শুনিয়াছেন। ফরিদপুরের ইতিহাস আশ্চর্য প্রহেলিকাময়। রাজা রাজবল্লভ এবং সীতারাম রায়ের প্রোথিত যশোরাশিতে উজ্জ্বল শোভায় ভূষিত করিতে আপনারা কত চেষ্টা করিতেছেন। এমন সুদিন আর কখনও হয় নাই। আপনাদের মনস্কামনা পূর্ণ হউক।

একদিনে কোন দেশের উন্নতির সূত্রপাত হয় না। বঙ্গদেশে যে স্বর্গীয় যুগের অবতারণা

হইয়াছে, পৃথিবীর যে কোন উন্নত দেশের নবযুগের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। কিন্তু দুই একদিনে এ যুগের অবতারণা হয় নাই, কিঞ্চিদধিক অর্ধ শতাব্দী এই কার্যে লাগিয়াছে। রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত বঙ্গে যে সকল মহাত্মা আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহারা যে কোন দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন। মহাজনেরা বলেন, ভাষার উন্নতি ভিন্ন দেশের উত্থান অসম্ভব। বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য মহাত্মা রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, মাইকেল, প্যারীচাঁদ, রাজনারায়ণ, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, ভূদেব প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সুফল ফলিয়াছে, বঙ্গসাহিত্যে এক অভূতপূর্ব নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে গ্রাহ্য করিতেছেন। সামাজিক উন্নতির জন্য মহাত্মা রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যে অদম্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সুফল আজকাল চতুর্দিকে ফলিতেছে। রাজনীতি সংস্কারের জন্য মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, রামগোপাল ঘোষ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলে বঙ্গে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। বুঝি বা সমস্ত আয়োজন পূর্বেই হইয়াছিল, পার্টিসন কেবল উপলক্ষ মাত্র।

পুণ্যবানদিগের অশেষ পুণ্যের জোরে আনন্দমোহন এবং সুরেন্দ্রনাথের, তৎপর মতিলাল, নরেন্দ্রনাথ এবং বিপিনচন্দ্রের, চন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের, গৌরগোবিন্দ এবং শিবনাথের অভ্যুদয় হইয়াছে। কিরূপে ধারাবাহিক রূপে উন্নতির স্রোত চলিয়া আসিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা অসম্ভব। তাহার সহিত অদ্যকার আলোচ্য বিষয় সমূহের বিশেষ কোন সম্বন্ধও নাই। সাগরে যখন বান ডাকে, তখন নদী সকলে তাহার তরঙ্গাভিঘাত হয়। বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা মহাসমুদ্রে যে বান ডাকিয়াছিল, অল্পাধিক পরিমাণে তাহার তরঙ্গ নিকটবর্তী জেলা সমূহে আঘাত করিয়াছে। ফরিদপুরে সেই আঘাত অল্প পরিমাণে লাগে নাই। শুনিয়াছি, বঙ্গের সুসন্তান সুরেন্দ্রনাথ এবং নগেন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষগণ ফরিদপুরে বাস করিতেন। দেশবিখ্যাত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচুড়ামণির বাড়ি এই জেলায়। নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, বিপিনবিহারী রায়, মুন্সি কফিলদ্দিন চৌধুরি, মৌলবী আবদুল রহিম চৌধুরি, কালীপ্রসন্ন দত্ত, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, প্যারীলাল রায়, গোরাচাঁদ দাস, রেঃ মথুরানাথ বসু, গিরীশচন্দ্র বসু, রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহিমচন্দ্র রায় প্রভৃতিব অভ্যুদয়ে ফরিদপুরের উন্নতি অজড়িত নহে। এই সকল মহাত্মাদের স্বর্গারোহণে আমাদের প্রাণ অবসন্ন। কত মহাত্মা আজও জীবিত থাকিয়া ফরিদপুরের উন্নতি সাধন করিতেছেন। কিন্তু ইহাদের সকল চেষ্টা এবং উদ্যম একস্থলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। তিনি জীবিত থাকিয়া এখনও ফরিদপুরের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। পুণ্যশ্লোক অম্বিকাচরণের উৎসাহ, উদ্যমের কথা যখন ভাবি, সত্যই তখন আমার ন্যায় মৃত প্রাণেও নবজীবনের সঞ্চার হয় আপনারা হয়ত তাহার দোষ ত্রুটি স্মরণে ভ্রুকুঞ্চিত করিতেছেন। দোষ ত্রুটি কাহার নাই,—দেবতাদেরও ছিল। আমি আজ এই পুণ্যময় দিনে কাহারও দোষ ত্রুটি স্মরণ করিব না। অম্বিকাচরণের দ্বারা ফরিদপুর এবং বঙ্গদেশ আজ গৌরবান্বিত, একথা কে অস্বীকার করিবেন? আমি ফরিদপুরের অগণ্য বন্ধুবিচ্ছেদে যখন শোকান্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া দিশাহারা হই, কিম্বা কার্যক্ষেত্রে যখন নিরাশ হই, তখন চাহিয়া দেখি, অম্বিকাচরণ আমার সম্মুখে ধ্রুবতারার ন্যায় পথ প্রদর্শন করিতে উপস্থিত। দেখি, ভাবি এবং মোহিত হই। এক সময়ে আমি এবং বন্ধু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ফরিদপুরের নানা স্থানে সভা-সমিতি স্থাপনের জন্য ভ্রমণ করিয়াছিলাম। তাহারই ফলে যে অসংখ্য সভা স্থাপিত

হইয়াছিল, তন্মধ্যে অতি গৌরবের ফরিদপুর-জনসাধারণ সভা অন্যতম। মাইনর স্কুলের সামান্য ঘরে যখন জনসাধারণ সভার প্রথম অধিবেশন হইতেছিল ; তখন আমি সাধু-অম্বিকাচরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম। দেখিয়াছিলাম, তিনি যেন দেবদূত রূপে আমার সমক্ষে উপস্থিত। আমি মনে মনে সেইদিন তাহাকে প্রণাম করিয়াছিলাম। সেই হইতে আজ পর্যন্ত, তাহাকে গুরু এবং নেতারূপে অন্তরে পূজা করিয়া আসিতেছি। তিনি ফরিদপুরের উন্নতির ইতিহাসের এঁক অত্যাশ্চার্য উপকরণ। আমার মনে হয় যেন,—ফরিদপুরের সকল মহাজনের সকল মহত্ত্ব সেখানে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। তিনি জীবিত আছেন বলিয়া তাহার সম্বন্ধে অধিক কথা বলা সঙ্গত নয়, এজন্য আমি নিরস্ত হইতেছি। কিন্তু একথা বলিবই বলিব যে ফরিদপুর এহেন রত্ন পাইয়া গৌরবান্বিত এবং ধন্য হইয়াছে।

আপনারা জানেন, আপনাদের এই অধম ভৃত্য প্রায় ত্রিংশ বৎসর এই ফরিদপুরের সেবা করিবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিয়াছে, ফরিদপুরের এমন কোন ভদ্র পল্লী নাই, যেখানে আমি যাই নাই। গিয়াছিলাম কেবল এই কথা প্রচার করিতে—'স্বদেশের উন্নতি ভিন্ন আমাদের আর গতি মুক্তি নাই।"

একদিন আমি কলিকাতার মেথডিস্ট গির্জায় পুণ্যশ্লোক অমিত-শক্তিশালী জেনেরেল বুথের বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। বক্তৃতা শুনিতে নয়—ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উত্তাপ হৃদয়ে সংগ্রহ করিবার জন্য গিয়াছিলাম। দেখিয়াছিলাম—সামান্য ও অসামান্য, সীমা এবং অসীমা। সান্ত এবং অনন্ত সেখানে সম্মিলিত হইয়া কি এক মহা-সাগরের তরঙ্গ সমুত্থিত করিতেছে সান্ত এব অনন্তের লীলা প্রতি জীবে এবং প্রতি বস্তুতে প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত, কিন্তু তাহার পরিচয় কে লয়, কে পায়? মহাজনের মহত্ত্বেই তাহা ফুটিয়া বাহির হয়। বুথ বলিয়াছিলেন—"আমার সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত তন্ত্র কেবল ৪টি অক্ষরে নিবদ্ধ তাহা এই —'Love', এই কথা বলিবার সময় তাহার নয়ন হইতে জলধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, আমার পাষাণ চক্ষু হইতেও অশ্রু বিগলিত হইয়াছিল। কি শোভা যে দেখিয়াছিলাম, তাহা ব্যাখ্যা করিবার শক্তি আমার নাই। সেইদিন আমি তাহার "প্রেম" মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম। ইহারও পূর্বে, বাল্যে, প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম, ইতালির দেবতা, ম্যাটসিনির নিকটে। আমি যখন এন্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতাম, তখনও ম্যাটসিনি জীবিত ছিলেন। ম্যাটসিনি যে প্রেমমন্ত্রে ইতালির উদ্ধারসাধন করিয়া গিয়াছেন এবং যে প্রেম-মন্ত্রে বুথ অসাধ্য সাধিত করিতেছেন ঐ প্রেমমন্ত্র ভিন্ন এদেশের রক্ষার আর উপায় নাই। আমি ত্রিংশ বৎসর ফরিদপুরের গ্রামে গ্রামে কেবল এই এক কথা প্রচার করিয়া আসিয়াছি। প্রেমমন্ত্র প্রচারের সময় ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ ভেদ গণনা করি নাই। যাহাকে পাইয়াছি, তাহারই চরণে প্রণত হইয়াছি এবং বলিয়াছি "তুমি যে আমার মায়ের সন্তান, তুমি যে আমার প্রাণের ভাই।" কাহারও কষ্টের কথা শুনিলে ঠিক থাকিতে পারি নাই—অযোগ্য হইয়াও সচেষ্ট হইয়াছি, ওলাউঠায় লোক মরিতেছে সংবাদ পাইলে ছুটিয়াছি, অনাহারে লোক মরিতেছে শুনিলেও ধাবিত হইয়াছি। কিন্তু আজীবন সেবা করিয়াও আমার সাধ মিটে নাই, বুঝি বা আজও "প্রেম-মন্ত্র" আমার হৃদয় ঘরে জাগিয়া উঠে নাই। এই দুঃখে আমি সদা-ম্রিয়মান, অবসন্ন এবং অস্থির আমি।

দেশকে যদি আমরা প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারিতাম, এদেশের কেহ কি আমাদের পর থাকিতে পারিতেন? আমরা তাহা হইলে সকলের সহিত একাত্মক হইয়া যাইতে পারিতাম। চতুর্দিকে কত দরিদ্র অনাহারে ও ম্যালেরিয়ায় মরিতেছে, আমরা নিশ্চিন্ত থাকিয়া সুখে কিরূপে নিদ্রা যাই? কত লোক রোগের সময় এক বিন্দু ঔষধ পায় না ; ক্ষুধার সময় অন্ন পায় না। কত লোক অশিক্ষার ঘোরান্ধকারে নিমজ্জিত, আমরা সুখে এবং উল্লাসে দিন কাটাই। হায়, ভাবিলে প্রাণ অস্থির হয়।

দারিদ্র্য-সমস্যা ভারতের, বঙ্গের এবং ফরিদপুরের প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার পূরণ না হইলে এদেশের মঙ্গল নাই। দরিদ্রগণ যদি দারিদ্র্য—নিষ্পেষণে মরিয়াই গেল, তবে কে দেশকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবে? আমাদের দেশের অসংখ্য লোক ঘোরতর দারিদ্র্যে নিপীড়িত—তাহাদিগকে রক্ষা করার উপায় কেবল কৃষি ব্যাঙ্ক সংস্থাপন। এতকাল পরে যদি নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছে, দরিদ্র রক্ষার জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হউন।

অনেকের মনে এই উত্তর আছে, আমি জানি,—প্রজারক্ষা করিবেন রাজা, আমরা তাহার কি ধার ধারি? রাজার কর্তব্য যদি রাজা না করেন, তবে আমরা কি করিব, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব কি? রাজা, প্রজার সম্বন্ধ লইয়া ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে বড়ই গোলযোগ চলিয়াছে। 'স্বরাজ' প্রশ্ন চতুর্দিকে শোনা যাইতেছে। 'স্বরাজের' অর্থ আমি বুঝি, নিজের কাজ নিজেরা, গবর্নমেন্ট নিরপেক্ষ হইয়া করিয়া যাওয়া। গবর্নমেন্ট অনেক করিয়াছেন, কি কম করিয়াছেন, সে বিচারের বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে কি না, বুঝি না, বুঝি কেবল এই, বিধাতা আমাকে যত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র করিয়াই সৃজন করিয়া থাকুক না কেন, দেশের প্রতি আমারও কিছু কতর্ব্য আছে। জল বায়ু অণু দিয়া আমাকে রক্ষা করিতেছেন, তাহার প্রদর্শিত কার্য সাধনের জন্য আমার কর্তব্য যদি আমি না করি, অন্যকে কর্তব্য পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করিবার বা কর্তব্য অবহেলার জন্য ভর্ৎসনা করিবার আমার কোনই অধিকার নাই। সব সময়ে ভাবিতে হইবে, আমাদের কাজ আমরা করিতেছি কিনা। নিজকে রক্ষা করা, পরিবার প্রতিপালন করা যেমন আমার কর্তব্য, দেশের সেবা পরিচর্যা করাও তেমনি আমার কর্তব্য। আমরা নিজেরা যদি কিছু না করি, তবে অন্যকে বলিবার আমাদের কোনই অধিকার নাই। এই জন্য আমি আবেদন-নিবেদনের চিরবিরোধী, আমি বাল্যকালে ভাবিতাম, আমি সামান্য ব্যক্তি, কিন্তু কাহারও পা ধোয়াইয়া দিতেও কি পারবি না? আমি সামান্য ব্যক্তি সামান্য লইয়াই থাকিতে ভালবাসি। সামান্য কাজই আমার লক্ষ্য। আমাদের এই যে জেলা সমিতি—ইহা সামান্য কার্য আরম্ভ করিয়া অসামান্যের পথ দেখাইবে। সান্তে আরম্ভ অনন্তে পরিণতি। আমাদিগকে কিছু সাধন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। আমি ১৩১৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা নব্যভারতে 'বার্ষিকী' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম - 'এখন এমন দিন আসিয়াছে, যখন বঙ্গের মূর্খ ও জ্ঞানী, চাষা ও বনিক প্রজা ও রাজাকে এক ব্রতে ব্রতী হইতে হইব। এ দল সে দল সকল দলকে এক হইতে হইবে। এবার বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির পরিণাম যাহা হইল, তাহা দেখিয়া এত অপমানের পর আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের আদরের প্রাদেশিক সমিতি, প্রধান নেতৃসমাজরূপে দণ্ডায়মান হউন। প্রতি জেলায় তাহার শাখা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হউক। প্রতি সবডিবিসন ও প্রতি থানায় তাহার উপশাখা সভা গঠিত হউক। সর্বশ্রেণীর লোক-নিরীশ্বর বাদী ও সেশ্বরবাদী, নিরক্ষর ও সাক্ষর, সকলে এই সকল সভায় যোগ দিবেন। প্রতি গ্রামের প্রধানগণ উপশাখা সভার সভ্য হইবেন, প্রতি উপশাখা সভার নেতাগণ শাখা সভার সভ্য হইবেন এবং শাখা সভার নেতাগণ প্রাদেশিক সমিতির সভ্য হইবেন। এইরূপে প্রধান সভার প্রধান ব্যক্তি উপশাখা সভার সর্ব নিম্নব্যক্তির সহিত এক যোগে এক সূত্রে গ্রন্থিত হইবেন। এক ডাকে সকলে আহূত হইবেন। একমন্ত্রে সকলে মিলিত হইবেন—সে মন্ত্র 'স্বদেশের হিত কামনা'। যে উপায়ে যেরূপে দেশের হিত হইতে পারে সকলকে কায়মনোবাক্যে কেবল সেই চেষ্টা করিতে হইবে। মতের ঝগড়া সর্বদা পরিহার করিয়া কেবল কাজ লইয়া সকলে আত্মহারা হইবেন। দারিদ্র সমস্যা, রোগ সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা, মকর্দ্দমা সমস্যা, সকল সমস্যার পূরণ এই সকল সমিতি করিবেন।"

বড়ই সুখের বিষয়, এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই বরিশালে প্রথম জেলা সমিতি গঠিত হয়। তৎপর কলিকাতার কংগ্রেস (১৯০৬ ডিসেম্বর) ও বহরমপুর প্রাদেশিক

সমিতি এইরূপ জেলা সমিতি গঠনে বদ্ধপরিকর হন। প্রকৃত কাজ করিবার সময় কাহারও সহিত অসদ্ভাব হয় কি? আমি একথা চিরকাল অস্বীকার করিয়া আসিয়াছি। অর্থের অভাবে কাজ হয় না, একথাও অস্বীকার করিয়াছি। ইচ্ছা থাকিলেই কাজ আইসে,—প্রকৃত কাজ আসিলে সকল বাধা বিঘ্ন, সূর্যোদয়ে কুজ্ঝটিকা অপসরণের ন্যায়, অপসৃত হইয়া যায়। আমরা চাই কেবল, কাজ আর কাজ। তবেই আমাদের জীবন সার্থক হইবে, দেশের অশেষ অভাব দূর হইবে।

গবর্নমেন্ট যতই বিরোধী হউন না কেন, প্রকৃত কাজের সময় তত বিরোধী হন না। দুর্ভিক্ষের সেবা কর, দাতব্য ঔষধালয় সংস্থাপন কর, ব্যাঙ্ক স্থাপিত কর, শিক্ষালয় সংস্থাপন কর, সালিশীপ্রথা প্রবর্তিত কর, সমাজ-সংস্কার কর,—গবর্নমেন্ট বিরোধী হইবেন না,—কোথাও বিরোধী হন নাই। স্বদেশি গ্রহণ ব্রতেরও প্রকাশ্যে খুব বিরোধী হন নাই। এদেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি গবর্নমেন্ট যত গ্রহণ করিতেছেন এত আর কেহ গ্রহণ করে না। কালী বল, কাগজ বল, ছুরি বল, কাচি বল,—গবর্নমেন্ট স্বদেশোৎপন্ন সকল দ্রব্য গ্রহণ করিতেছেন। আমরা যদি গবর্নমেন্টের ন্যায় স্বদেশি দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে পারিতাম, তবে এদেশ ধন্য হইয়া যাইত। সমস্ত কাজ যদি ক্রমে ক্রমে আমরা আমাদের নিজ হাতে আনিতে পারি, তবে 'স্বরাজ' কি আর দূরে থাকিতে পারে? গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে "প্রতিষ্ঠিত" সভা সকল "স্বরাজ" ভূখণ্ড ভূষিত হইবে। গবর্নমেন্ট থাকিলেও মৃত-বৎ পরিলক্ষিত হইবেন

গবর্নমেন্টের যে বিভাগ-নীতি এদেশের উন্নতির নব-যুগ (?) আনয়ন করিয়াছে, সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা কখনও সেই বিভাগনীতির পোষকতা করিব না। এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতি, এক চরিত্র, এক নীতি, এক দেশ এবং এক সমাজ—আমরা ইহাই চাই। একতাই আমাদের লক্ষ্য। একতা সাধনের পথ—কার্যকরী বিভাগ। কর্মব্রত ধরিয়া আমরা একতার রাজ্যে চলিয়া যাইব। আমাদের লক্ষ্য—একতা-মূলক 'স্বরাজ'। 'একতা' ভিন্ন স্বরাজের আর কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা নাই। আমাদের রাজা—'সমবেত শক্তি', এবং দুর্ধর্ষ 'জাতীয় একতা'।

তাহারা আমাদিগকে ছলে বলে কৌশলে অনাত্মীয়তার পথে চালিত করিতে চাহেন। "Utkal for the Oriyas, Behar for the Beharis, Assam for the Assamese."—এই মোহকর কথা প্রচার করিয়া ও ভাষা বিভাগ করিয়া তাহারা কত অনিষ্ট করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গকে বিভাগ করিয়া কত অনিষ্টের সূত্রপাত করিয়াছেন! ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে বিবাদ তুলিয়া কত অনাত্মীয়তা জাগাইয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছেন। সে সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে,—এখন হিন্দু ও মুসলমানকে এবং নিম্নশ্রেণি ও উচ্চশ্রেণিকে অনাত্মীয়তার পথে চালিত করিবার আয়োজন করিতেছেন। কেবল তাহা নয়—আমাদের স্বদেশের সকল হিতৈষীকে আবার দুই দলে বিভক্ত করিবার চেষ্টায় আছেন। আমরা না বুঝিয়া কতরূপে সম্মোহিত হই! এই অনাত্মীয়তা রূপ মহাশত্রু ভিন্ন আমাদের 'স্বরাজ' সাধনের আর অন্তরায় নাই। সত্যই বলিতেছি, ইংরাজ আমাদের অন্তরায় নয়,—অন্তরায় কেবল 'অনাত্মীয়তা'। আমরা এই মহাশত্রুকে বিনাশ করিবার জন্য সর্ব প্রযত্নে আসুন চেষ্টায় নিযুক্ত হই।

এই ফরিদপুরে নমঃশূদ্রের সংখ্যা ৩২৪১,৩৫। ইহাদিগকে বিপক্ষে চালিত করিবার যে আয়োজন হইতেছে, সর্বপ্রযত্নে তাহার গতিরোধ করিতে হইবে। তাহারা আমাদের ভাই,—তাহাদিগকে আমাদিগের সহিত সংযুক্ত না করিলে কিছুতেই আমাদের মঙ্গল নাই। আমাদের দেশে কেরামত আলীর দল দুর্ধর্ষ,—তাহাদিগকে আমাদের সহিত সংযুক্ত রাখিতে হইবে। দুর্ভিক্ষের সময় দেখিয়াছি,—অগণ্য হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই হইয়া গিয়াছি, আর এই স্বদেশের সর্বপ্রকার উন্নতিতে এক হইতে পারিব না? আমরা দেখাইব, অন্য দেশে যাহা

অসম্ভব, এই ফরিদপুরে তাহা সম্ভব। এখানে আমরা 'ভাই ভাই এক ঠাঁই' হইয়া হাড়ে হাড়ে মিলিত হইয়া যাইব। পরাধীন জাতির রাজনীতি আর কি? আমাদের একমাত্র নীতি এই— "আমরা সকল ভাই এক ঠাঁই।" ভারতবর্ষে যে দলাদলি চলিতেছে আমরা সামান্য ফরিদপুরবাসী যে দলাদলি হইতে সর্বপ্রযত্নে দূরে থাকিয়া কেবল একতা সাধন করিতে থাকিব। মনে জপমালার ন্যায় জপিব—পূর্ববর্তী নেতাগণ যেমন আমাদের, আধুনিক নেতাগণও তেমনি আমাদের। আমাদের সুরেন্দ্রনাথ, আমাদের কৃষ্ণকুমার, আমাদের অশ্বিনীকুমার, আমাদের বিপিনচন্দ্র, আমাদের তিলক, আমাদের লাজপত রায়—সকলেই আমাদের নেতা ; কর্মবীর, সহায় এবং আশ্রয়। পরিত্যাগের শাস্ত্র, পর-তন্ত্র আমরা সর্বদা বর্জন করিব। আমাদের ফরিদপুর জেলা সমিতির মূল মন্ত্র হউক—মহাত্মা বুথের 'Love' বাস্তবিক এক অঙ্গের কোন প্রত্যঙ্গকে বর্জন করা যায়? সকলেরই আপন আপন কার্য সাধনের জন্য অত্যাবশ্যক। তোমার কাজ আমার দ্বারা হয় না, আমার কাজও তোমার দ্বারা হয় না। বিধাতার বৈচিত্র্যের এক মহাশিক্ষা এই—এ জগতের সকলেরই প্রয়োজন আছে। ধনী দরিদ্র, মূর্খ জ্ঞানী, সকলেরই প্রয়োজন আছে। রাজা রাজকার্য সাধনের জন্য বড়, প্রজা কৃষিকার্য সাধনের জন্য বড় ;—আপন আপন বিশেষত্বে সকলেই বড়,—স্ব স্ব প্রধান। একজনকে পরিত্যাগ করিলেও বিধাতার বিধানকে অস্বীকার করা হয়। বড় ছোট আমরা সকলে ভাই ভাই ;—এক মায়ের সন্তান। ভ্রাতৃত্ব সাধনই মাতৃত্ব সাধনের মূল মন্ত্র। 'বন্দেমাতরম্ মন্ত্র' ততদিন আমাদের রক্ত মাংসের সহিত জড়িত হইবে না, যতদিন আমরা ভাই ভাই পর-পর থাকিব। অতএব সকলে ভ্রাতৃত্ব সাধনে অগ্রে বদ্ধপরিকর হউন। মাতা ও সন্তান যখন একস্থানে মিলিত মাতা পুত্র যখন একাকার—তখনই জাতীয় একতা অথবা 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠিত। অন্য যে স্বরাজের কথা, তাহা এ যুগের অযোগ্য জল্পনা এবং কল্পনা মাত্র।

আমি বলিয়াছি, একতা সাধনের উপায়—কর্তব্য সাধন। কার্যক্ষেত্র ভিন্ন একতা সাধনের দ্বিতীয় উপায় নাই। প্রকৃত সেবক যে, সে-ই অন্য সেবকের মহত্ব বুঝে। সেবাক্ষেত্রে বড় ছোট, জ্ঞানী মূর্খ, হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ নাই। সেতুবন্ধনের সময় অতি সামান্য কাঠবিড়ালের সাহায্যও উপেক্ষিত হয় নাই। বাড়িতে আগুন লাগিলে সকলে নিজ নিজ বিশেষত্ব ভুলিয়া প্রাণপণে অগ্নি নির্বাণ করিতে ধাবিত হয়। যে দাবাগ্নি এই দেশে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, ইহা নির্বাপিত না হইলে অচিরে দেশ মহাভস্মে পরিণত হইবে। এখন যাহার যে শক্তি থাকে এই কাজে তাহা নিয়োগ করিতে হইবে। দেশ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, ভাই, তুমি ভেদাভেদের তর্ক তুলিয়া তাহা ভুলিয়া যাইতেছ? ছি, আর সময় নাই—সতর্ক হও। আপন কাজে মনোনিবেশ কর। কত কত ভাই জেলে নিগৃহীত হইতেছেন।[১] স্মরণ কর ; কত কত ভাই স্বদেশের জন্য কত নির্যাতন মস্তক পাতিয়া লইতেছেন, স্মরণ কর। কত ভাই স্বদেশের জন্য প্রাণ দিয়াছেন স্মরণ কর। স্মরণ কর—কাব্য বিশারদের কথা, উপাধ্যায়ের কথা, রমাকান্তের কথা, সর্বোপরি আনন্দমোহনের কথা। এহেন শোকের দিনেও আমরা প্রেম-মন্ত্র জপ করিতে শিখিব না? এহেন দুর্দিনেও বৃথা আমোদে প্রমত্ত হইব?

এই ফরিদপুরের অভাব—ভারতের অগণ্য পল্লীর অভাবের কেন্দ্রস্বরূপ। ভাগীরথীর ন্যায়, ফরিদপুরের নদী সকল শুষ্ক লইয়া যাইতেছে, কুমার গিয়াছে, চন্দনা গিয়াছে, গড়ে নদী যায় যায় হইয়াছে—কত চেষ্টা করিয়াও এ সকলকে বহমান রাখা যায় নাই।[২] অগণ্য খাল বিল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এই সকলের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া আসিয়া এদেশকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। জলাভাবের কষ্টে এদেশের নর-নারী বৎসরের মধ্যে ৪/৫ মাস হাহাকার করে। ম্যালেরিয়ার অন্য কারণ পাটের চাষ। আমি বর্ষার প্রাক্কালে ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি—ফরিদপুরের ধানের ক্ষেত্র সকল দিন দিন পাটের ক্ষেতে পরিণত হইতেছে। খাল,

বিল, খানা ডোবার জলে শ্রাবণ ভাদ্র মাসে পাট পচাইয়া, সেই জল উদরসাৎ করিয়া, অসংখ্য লোক ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিভূত হয়। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বিগত কয়েক বৎসর কিরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, দশ বৎসরের নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা দেখুন—কেবল জ্বররোগে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু হয় ১৬০২৪।

১৮৮৮	—	২০,০২৬
১৮৮৯	—	২২,২৮৭
১৮৯০	—	২৫,২২০
১৮৯১	—	৩১,৩৬৮
১৮৯২	—	৪১,৭৯০
১৮৯৩	—	৪০,৫৫৮
১৮৯৪	—	৩৭,৬৩৮
১৮৯৫	—	৪৩,১৪৪
১৮৯৬	—	৪৮,০৫৬
১৮৯৭	—	৬৮,০৬৩
১৮৯৮	—	৫৮,৩৬৮
মোট মৃত্যু ১৮৯৮	—	৬৬,৯১৯
মোট মৃত্যু ১৮৯৯	—	৪২,৮৭৭
মোট জনসংখ্যা ১৮৯৪	—	১৮,২৩,৫৪৩

গত বৎসর খুব প্লাবন হইয়াছিল, (১৯০৭, ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত) মোট মৃত্যু সংখ্যা ৫১,০৯৫। অর্থাৎ হাজার করা ২৬৩০। জ্বররোগে মোট মৃত্যু সংখ্যা ৩৬,৫৩৬, অর্থাৎ হাজার করা ১৮.৯। গত দশ বৎসর মধ্যে ১৯০৭ অব্দেই মৃত্যু সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম।

জ্বরের তালিকা দিলাম, থানা অনুসারে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ওলাওঠার মৃত্যু তালিকা দেখুন—

থানা	জনসংখ্যা	ওলাওঠায় মৃত্যু	গড় ১০০০ প্রতি
ফরিদপুর টাউন	১০৭৭৪	২৯	২.৬০
মাদারিপুর টাউন	১৩৭৭২	১৭৪	১২.৬৩
ফরিদপুর থানা	৮৬২১১	২৫০	২.৮৯
ভূষণা	১০১৮২	১৬৯	১.৭৩
আইনপুর	১০২৯৪৮	১৭৯	৩.৮৬
মুকসুদপুর	১৭৬৪১৮	৭০০	৬.৫০
ভাঙা	১৮৭৮৮৯	১২২২	৮.০৮
মাদারিপুর থানা	১৭৯৭৭৬	১৪৫৩	১৩.৯৬
পালং	২৭৯০৮৪	৩৮৯৭	৩.০৬
গোপালগঞ্জ	৯৬৮৩৪	২৯৭	৯.৪২
কোটালিপাড়া	৭৯১২৯	৫৯১	৭.৪৬
শিবচর	১৩১৮৫২	১২৪৩	৯.৪২
গোয়ালন্দ	১২৬০৩৮	৬৭৭	৫.২৪
পাংসা	১২৬৬১৫	২৫৪	২.০০
বালিয়াকান্দি	৯৭৭৯৯	২৫০	২.০০

মোট মৃত্যু সংখ্যা ১১৩৮৫।

অন্যান্য মাস বাদে আগস্ট ৩৭৫, সেপ্টেম্বর ১৮৬০ ও অক্টোবরে মৃত্যু সংখ্যা ৩৫৪৬। ইহাতেই বুঝা যায়—ভাদ্র মাস হইতে কি ভয়ানক অবস্থা হয়। পাটপচা জলই যে ইহার কারণ একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

ম্যালেরিয়া ও ওলাওঠার মৃত্যু হ্রাস করিতে হইলে জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে এবং পানীয় জলাশয় সংরক্ষিত করিতে এবং পাটের চাষ কমাইতে হইবে। পাটের চাষ দিন দিন যেরূপ বিস্তৃত হইতেছে, এরূপ চলিলে ফরিদপুরের নিত্য দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে।

১৩০০ সালে কোটালিপাড়, আইনপুর ও মুকসুদপুরের দুর্ভিক্ষে আমরা সুহৃদ সভা হইতে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলাম। ১৩০২ সালে ফরিদপুর, কোতোয়ালি, ভূষণা ও বালিয়াকান্দি সাহায্য প্রদান করিয়াছিলাম। ১৩১৩ সালে কোটালিপাড়, গোপালগঞ্জ, মুকসুদপুর ও মাদারিপুরের কোন কোন স্থলে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলাম। এই শেষবার অনেক সভা সমিতি এবং ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষ ফন্ড হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ১৩১৩ সালে আমাদের নেতা শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সমস্ত ফরিদপুরের সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। বিগত ১৩ বৎসরের মধ্যে ৩ বার ফরিদপুরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা যাইবে, দেশের কি শোচনীয় অবস্থা। এক বৎসর যদি ধান না জন্মে তবেই হাহাকাব উপস্থিত হয়। পাট বেচা টাকা নানা বিলাসিতায়, মহাজনের সুদে ও জমিদারের খাজনা ও আবওয়াবে শেষ হইয়া যায়, কিছুতেই অন্ন কষ্টদুর করিতে পারে না। দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া ও ওলাওঠা নিবারণের জন্য পাটের চাষ না হ্রাস করিতে পারিলে আর উপায় নাই।

পাটের চাষ বঙ্গে যেরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, বঙ্গের অন্যান্য স্থান হইতে ধানের আমদানিও অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছে।

ফরিদপুরের মোট আবাদী-ভূমি ৯৭,০০০০০ একর, ১৯০৬ সনে পাট চাষ হয় ১১৭০০০ একর জমিতে, ১৯৭০ সনে ১২৫০০০ একর জমিতে। ১৩১৩ সালে সমস্ত জেলা সমূহে পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ২৫৮৫২৪ একর জমিতে বেশি পাট চাষ হইয়াছে।

সর্বাপেক্ষা কষ্ট হইতেছে—ফবিদপুরের মধ্যবর্তী শ্রেণির। মধ্যবর্তী শ্রেণির অবস্থা স্মরণ করিলে কিছুতেই চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না। বিগত সেন্সাস রিপোর্টের কয়েকটি জেলার বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, মধ্যবর্তী শ্রেণির সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে যথা—

জেলা	১৮৭২	১৮৮১
বর্ধমান	১৬০৮২৬	১০৭৬৮৪
২৪ পরগণা	১২০১০২	১১৪৯১১
নদীয়া	৬০০২৪	৫৯৮৯৪
যশোহর	৫১৯৯৯	৩৭৭৫২

এইরূপ সকল দেশের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। সংখ্যা হ্রাসের কারণ কি? জাতীয় বিলোপের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায়, দুঃখ দারিদ্র ও পরাধীনতাই প্রধান কারণ। দুঃখ দারিদ্র মানুষের জনন শক্তি হ্রাস করিতেছে। তদুপরি, ম্যালেরিয়া, ওলাওঠা আছে। অনাহারে হায়, দেশের সর্বনাশ সাধন করিতেছে। ইহার উপর মামলা মোকর্দমায় সকলে জেরবার হইয়াছেন। ঘরে ঘরে আর্তনাদ ঘরে ঘরে হাহাকার।

দারিদ্রের প্রধান কারণ অজন্মা ; রপ্তানি এবং পাটের চাষ বৃদ্ধি। আমাদিগকে আমদানি এবং রপ্তানি দুইই আপাতত বন্ধ করিতে হইবে। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ধার কর্জ নাই, এমন লোক কুত্রাপি পাওয়া যায়। অতিমাত্রায় সুদে বঙ্গ জর্জরিত। ইহাব হস্ত হইতে রক্ষার উপায় কি? ফরিদপুরের লোন আফিস একথা প্রতিপন্ন

করিয়াছে যে, কৃষিব্যাঙ্কের দ্বারা এদেশের প্রভূত উপকার হইতে পারে। গ্রামে গ্রামে থানায় থানায় অচিরে কৃষি ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হওয়া উচিত। ইহাতে আয়ও যথেষ্ট হইবে এবং দরিদ্র শ্রেণিও সুরক্ষিত হইবে।

আর একটি কথার ইঙ্গিত পূর্বেই করিয়াছি—নিম্নশ্রেণিকে জাতীয় দলে গ্রহণ করা। নিম্নশ্রেণিই দেশের আশা ভরসা। নিম্নশ্রেণিকে বাদ দিয়া কখনও কোন দেশেব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় নাই। বঙ্গে ব্রাহ্মণ যাজিত হিন্দু সংখ্যা— ৫৬ লক্ষ।

এই সকল হিন্দুর জলবাহী ২৬ লক্ষ।

যাজন ও স্পর্শের অযোগ্য ১২০ লক্ষ।

একুন হিন্দু সংখ্যা ২০২ লক্ষ।

মুসলমান সংখ্যা ২২৫ লক্ষ।

রাজবংশী ; নমঃশূদ্র ও বাগদী প্রভৃতি ৭৫ লক্ষ।

ফবিদপুরে নমঃশূদ্র সংখ্যা ৩২৪১৩৫।

সমগ্র হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষা মুসলমান সংখ্যা কত অধিক, দেখিলেন, উচ্চশ্রেণির অবহেলায় নিম্নশ্রেণির হিন্দুগণ ক্রমে ক্রমে মুসলমান হইতেছেন। এই মুসলমানদিগকে বাদ দিযা আমরা কিছুতেই দেশেব শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিব না। ইহাদিগকে শিক্ষা দীক্ষায় ও চরিত্রে আমাদের প্রাণের জিনিস করিয়া লইতে হইবে। জল অচলের সংখ্যা ১২০ লক্ষ। ইহাদিগকে পরিত্যাগ কবিলে চলিবে না। বাকী অনাচরণীয় হিন্দু সংখ্যা যদি মুসলমানের সহিত সংযুক্ত হয়, এবং আমরা যদি মুসলমানদিগকে পরিহার করি, তবে আমাদের দল কত দুর্বল হইয়া পড়ে। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ একবাব ভাবিয়া দেখুন। জাতিভেদের বন্ধন শিথিল না হইলে এক্ষেত্রে আমাদের আর রক্ষা নাই। উদার, উদার—কত উদাব হইয়া চলিতে হইবে, আজ একবার চিন্তা করুন। কার্যক্ষেত্রে অতি উদার হইয়া ভাই ভাই সম্মিলিত হইতে হইবে।

ভারতের মাড়োয়ারী এবং পার্শি জাতি আমাদের দারিদ্র-নিবারণ ক্ষেত্রে আদর্শ স্থানীয়। শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ভিন্ন আমাদিগের আর গত্যন্তর নাই। শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য আমাদিগকে সর্ব প্রযত্নে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। ভাবতকে গোলমিতে, চাকুরিতে নিমগ্ন করিতে ইংরাজের ইচ্ছা, আমরা চাকুরির মায়া পরিত্যাগ করিয়া যদি স্ব অধীন হইয়া ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্পেব শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারি, তবে আর আমাদের পতন নাই। আমরা সোনার ভারতেব সব ধনরত্ন বিদেশে পাঠাইয়া, বিলাসিতার উপকরণ সকল বিদেশ হইতে গ্রহণ করিয়া দিন দিন দুর্বল হইতে দুর্বলতব হইয়া পড়িতেছি। ২৫ বৎসর হইল, জোলা তাঁতির কাপড়ের কারবার মাটি হইয়াছে। ২০ বৎসর হইল, লবণের কারবার মাটি হইয়াছে ; ১৫ বৎসর হইল, চিনির কারবার মাটি হইয়াছে। কৃষকেরা খর্জুর বৃক্ষ কর্তন করিয়া এখন পাটের চাষ করে। আমাদেব এই বেলগাছির চিনির কারবার সেদিন মাটি হইয়াছে। কেশবপুর, কোটচাঁদপুর, গোবরডাঙ্গার চিনির কারবার সেদিন মাটি হইয়াছে। আমরা শিখিতেছি, কেবল চাকুরি আর চাকুরি। এখন আমাদিগকে ফিরিতে হইবে। ফিরিতে হইবে বলিয়াই এই স্বদেশি আন্দোলনকে বিধাতা প্রেরণ করিয়াছেন। বিধাতার বিধান স্পষ্টরূপ বুঝিতে চেষ্টা কর। এই স্বদেশি আন্দোলন এদেশবাসীকে পর প্রত্যাশীর আকর্ষণ ভুলাইয়া 'নিজত্বে' আবার যদি দীক্ষিত করিতে পারে এবং স্বদেশেব শিল্প বাণিজ্যে যদি অনুরক্ত করিতে পারে তবে এদেশের মহাকল্যাণ সাধিত হইবে। শিল্প বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য অসংখ্য ব্যাঙ্ক স্থাপন করা একান্ত কর্তব্য। আমরা বঙ্গ বিভাগের প্রতিবাদ করিয়াছি এবং স্বদেশি মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমরা অশেষ নির্যাতন সহ্য করিতেছি ; কিন্তু ইহা ভিন্ন আর আমাদের মঙ্গলের পথ নাই। বিভাগ নীতি আত্মীয়তার বিরোধী ;—আমরা চাই আত্মীয়তা, সুতরাং

আমরা প্রতিবাদ না করিয়া পারি না। আমরা দারিদ্র্য-সমস্যা পূরণের জন্য চাই "স্বদেশি-মন্ত্র";—"স্বদেশি" মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেই "বয়কট" আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। কান টানিলেই যেমন মাথা আইসে, "স্বদেশি" টানিলেই তেমনি "বয়কট" উপস্থিত হয়। বিদেশি দ্রব্যাদি চলিলে, স্বদেশি দ্রব্যাদি কখনও চলিতে পারে না। হিংসার বশবর্তী হইয়া আমরা এ নীতি অবলম্বন করি নাই ; স্বদেশ রক্ষা করিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই বলিয়া, শেষ উপায় "বয়কট" ধরিয়াছি। ইংলন্ডকে রক্ষা করিবার জন্য চেম্বারলেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ অবাধ বাণিজ্যের গতি প্রতিরোধ করিতে যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, আমরাও দেশকে রক্ষা করিবার জন্য "বয়কট", সেইরূপ, গ্রহণ করিয়াছি। পরিবার পরিপোষণ যেমন প্রত্যেকের কর্তব্য, স্বদেশের সংরক্ষণও তেমনি প্রত্যেকের কর্তব্য। এই মন্ত্র সাধনে যে দণ্ড পাইতে হয়, তজ্জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।

কিন্তু বড় দুঃখ হয়, আমরা খাঁটি "স্বদেশি" আজও হই নাই, তাহা হইলে স্বদেশের সকল বস্তু এবং লোক আমার নিজস্ব হইয়া যাইত ; যদি তাহা হইত, ধর্মের অঙ্গ স্বরূপ যদি "স্বদেশি" গ্রহণ করিতে পারিতাম, এই এক ক্ষেত্রে আমরা "ভাই ভাই এক ঠাঁই" হইয়া যাইতে পারিতাম। এতদিন না পারিয়া থাকিলেও, আমাদিগকে ইহারই জন্য কঠোর সাধনা করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন আর উপায় নাই।

মোট কথা, এতদিন পর আমরা বুঝিয়াছি, গবর্নমেন্ট নিরপেক্ষ হইয়া আমাদিগকে কিছু করিতে হইবে। গবর্নমেন্ট যে উপকার করেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞ থাকিব, কিন্তু আমাদের কর্তব্য কখনও বিস্মৃত হইব না। নিজের পায়ের উপর নিজেদের দাঁড়াইতে হইবে। গবর্নমেন্ট দোহনের জন্যই এদেশে আসিয়াছেন, সর্বদা একথা স্মরণ রাখিতে হইবে এবং উঠিতে বসিতে, শুইতে, "গোলামির" মায়ায় প্রমুগ্ধ না হইয়া, একটু একটু নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবার জন্য খাটিতে শিখিতে হইবে। খাটিতে শিখিতে হইলে প্রণালীগত শিক্ষা চাই। এজন্য জাতীয় শিক্ষাকে সময়ানুসারিণী করিয়া তুলিতে হইবে। গবর্নমেন্টের শিক্ষা 'গোলামি-গিরি' শিক্ষার পন্থা বিশেষ ছিল। ইংরেজ যশোকীর্তন, মুসলমানের দোষ কীর্তন, চাকুরির আকর্ষণ প্রভৃতিই ঐ শিক্ষার মূল ছিল। এখন শিল্প বিজ্ঞান, ব্যবহারিক শিক্ষা প্রভৃতিতে যাহাতে সকলের মনাকৃষ্ট হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। আমাদের ভাবী বংশীয়েরা যাহাতে গোলামি শিক্ষার পথে অগ্রসর না হইয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবার বৃত্তি শিক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে। অসংখ্য নর-নারীকে "স্বদেশি" মন্ত্রে প্রবুদ্ধ করিতে হইলে, তদনুরূপ শিক্ষাভিন্ন আর উপায় নাই। আমরা আসুন, কায়মনোবাক্যে সে জন্য বদ্ধপরিকর হই। আমরা যেন কদাপি না ভুলি যে, ভিক্ষায় কোনই ইষ্ট সাধিত হয় না।

আত্মানুশীলন, সকল শিক্ষার সার শিক্ষা। আত্মানুশীলনে যাহাতে আমাদের পুত্র কন্যাগণের রুচি হয় ; চরিত্রোন্নতির দিকে দৃষ্টি পড়ে ; আমাদের জাতীয়শিক্ষাকে তদনুরূপ প্রণালীতে চালিত করিতে হইবে।

আমি জীবনে সার সত্য বুঝিয়াছি—"খাটিতে এসেছি, খাটিয়া মরিব ; পরপদতলে কভু না লুটাব।"—বাল্যকাল হইতে এই প্রতিজ্ঞা ছিল কেবল খাটিব ; নিজের জন্য পরিবারের জন্য দেশের জন্য। আকর্ষণ কি, মায়া কি, লক্ষ্য কি? আকর্ষণ, মায়া এবং লক্ষ্য—কেবল "প্রেমসাধন" ; বুঝিয়াছি, খাটুনি ভিন্ন প্রেমসাধন হয় না। তাই, চিরকাল কেবল খাটিয়া আসিয়াছি। গবর্নমেন্ট নিরপেক্ষ হইয়া সকল সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া কেবল খাটিতে শিখিয়াছি। খাটুনিতে আমার ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই, ভ্রান্তি নাই, অবসাদ নাই—কিছুই নাই। বিশ্বপতি যেরূপ অবিরত খাটিতেছেন আমরা সেই অনুকরণে দিবানিশি কেবল খাটিব। কার্যের অবিরাম স্রোতে পড়িয়া সকল ভাই মহা মিলনে মিলিয়া যাইব ; ইহাই প্রাণের বাসনা। কে

পর কে দূরে?—খাটুনির সুমহান রাজ্যে সকলকেই চাই—একজনকে পরিত্যাগ করিলেও চলিবে না। এস, সকল ভাই, খাটুনির মহারাজ্যে মিলিয়া যাই।

আমি স্থানান্তরে "বয়কটের" কথা বলিয়াছি; যদি বয়কট করিতে হয়, সর্বাগ্রে ব্রিটিশ-কোর্টকে "বয়কট" করা উচিত। রাজা ও প্রজা সম্বন্ধ, পিতা ও সন্তানের সহিত তুলিত। পিতার নিকট সন্তান দুঃখ মর্মবেদনার কথা বলিবে, তাহাতে "কর" না দিলে রয় না; ইহা কি সর্বনাশের কথা! গবর্নমেন্টের আয়-কর, লবণ-কর, পথকর, ডাককর, চৌকীদারি-কর, তুলার-কর, লাইসেন্স-কর, দ্রব্যাদির শুল্ক, মিউনিসিপাল-কর, কুত, আবকারী-কর, সকল ভুলিতে পারি, কিন্তু স্ট্যাম্প কর কিছুতেই ভুলিতে পারি না। ইহাতে সর্বশ্রেণির লোক সর্বস্বান্ত হইতেছেন,—হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতার রাজস্ব বিস্তৃত হইতেছে, ভাই, ভাইকে দূর করিয়া দিতেছে—রাজা পথের ভিখারী হইতেছেন, দরিদ্র জেরবার হইতেছে, মামলা মোকর্দমায় দেশ উচ্ছিন্ন যাইতে বসিয়াছে। যদি দেশকে রক্ষা করিতে হয়, তবে অচিরে চতুর্দিকে "সালিশী-মণ্ডপ" প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। সহৃদয় ব্যক্তিগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

এদেশের নূতন একটি উপসর্গ উপস্থিত হইয়াছে; তাহা অল্প পরিমাণে রক্ত শোষণ করিতেছে না। ভারতের টাকা লুণ্ঠনের আর এক নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কর্জন, ঘরে ঘরে যাহাতে চা-পান বিস্তৃত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ইউল কোম্পানি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া, চীনের ন্যায়, এদেশের আপামর সাধারণকে চায়ের মাদকতায় ডুবাইয়া বিভোর করিতেছেন।ᶜ চা শীত প্রধান দেশে উপকারী হইলেও আমাদের দেশের পক্ষে উপকারী নয়। Dr. H. C. Wood বলেন— "Tea contains about three percent of theine, or more than fourteen grains to the ounce. Every pound of tea contains enough of this poison to kill fifteen hundred frogs or more than forty cats. One case is on record in which a fine horse belonging to an English army officer was killed by eating accidentally a small quantity of tea."

আফিং তীক্ষ্ণ বিষ, কিন্তু ক্রমাগত সেবনে এই বিষেও মানুষ অভ্যস্ত হইয়া যায়। ক্রমাগত অভ্যাস করিতে করিতে চা-পানেও লোক অভ্যস্ত হইয়া যাইতেছে; কিন্তু ইহাতে শরীরের যে অপকার হয়, তাহা বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি ঘোষণা করিয়াছেন। সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী ন্যানসেন এবং মহাবীর স্যান্ডো ইহার অপকারিতার বিশেষরূপ সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। শরীর যদি খারাপ নাও হয়, তবু এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, ইংরাজের লুণ্ঠনের ইহা একটি প্রশস্ত উপায়। অনাবশ্যকীয় চা-পানে বিরত থাকা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

আমাদের প্রধান ভরসা ভলন্টিয়ারগণ। আমি যখন গত বৎসর কোটালিপাড়ে ৬ মাস দরিদ্রের সেবার জন্য ছিলাম; তখন এই ভলন্টিয়রগণের জীবন্ত পরিচর্যার দৃষ্টান্ত দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। এমন কোন ক্লেশকর কার্য কল্পনা করা যায় না, যাহা তাহারা সুসাধিত করেন নাই। এবার কলিকাতার অর্ধোদয় যোগের সময় ভলন্টিয়ারগণ যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। নিজের প্রশংসা বিনাশের কারণ, তাহা জানি, কিন্তু একথা না বলিলে সত্যের অপলাপ হয় যে, এদেশের ভলন্টিয়ারগণ বিধাতার এক অপূর্ব সৃষ্টি।

অল্প সময়ের মধ্যে ইহারা এমন শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন যে, এই শক্তিকে প্রণাম না করিয়া থাকা যায় না। আমি বঙ্গের ভলন্টিয়ার শক্তিকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি। এই ভলন্টিয়ার শক্তিই এদেশের অশেষ অত্যাচার দমন করিবে, কুসংস্কার বিনাশ করিবে এবং চরিত্র ও ধর্মের রাজ্য সংস্থাপন করিবে। আমি আশা করি, আমি আজ যে সকল কথা

বলিলাম, আমার সমদুঃখী ভলন্টিয়ারগণের নিকট তাহা কখনও উপেক্ষিত হইবে না। তাহারা বিধাতার কৃপায় ফরিদপুরের অসাধ্য সাধন করিবেন। তাহারাই আমাদের আশার উজ্জ্বল আলোক। বিধাতা এই শক্তিকে আশীর্বাদ করুন।

আপনাদিগের বহুমূল্য সময়ের আমি অনেকটা অপহরণ করিলাম, তজ্জন্য বিনীত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনারা আমার জন্মভূমির সমদুঃখী ভাই বলিয়া কত কত ধৃষ্টতা করিলাম। আশা করি, আপনারা আমাকে মার্জনা করিবেন এবং আমাকে আপনাদের ভৃত্য বলিয়া আশীর্বাদ করিবেন। আপনাদের সদ্ভাব ও শুভ ইচ্ছানুপ্রাণিত হইয়াই আমি জীবন-পথে অগ্রসর হইতেছি;—আমাকে আপনারা আশীর্বাদ করুন। মহাত্মা হারকোর্ট মহাত্মা গ্লাডোস্টোনের অশীতি জন্মোৎসব উপলক্ষে বলিয়াছিলেন—"এই গ্লাডোস্টোন শক্তি যতদিন জীবিত আছেন, ততদিন ইহার অনুসরণ করিব এবং যখন ইনি থাকিবেন না, তখন ইহার পদানুসরণ করিয়া অগ্রসর হইব।" আমারও শেষ কথা এই—আমাদের দেশের অপূর্বগৌরব অশ্বিকাচরণের অনুকরণ করিয়া যেন আমরা চলিতে পারি এবং যখন তিনি থাকিবেন না, তখন যেন তাহার পদানুসরণ করিয়া চলিতে পারি। আমরা ভাই ভাই একঠাই হইয়া প্রাণে প্রাণে মিলিয়া, দেশের সেবাব্রত পালন করিয়া কৃতার্থ হইব। আজ সকল ভাই প্রাণ ভরিয়া বল—বন্দে মাতরম। অনেক দুঃখ দারিদ্র্য হিংসা বিদ্বেষ, জ্বালা, যন্ত্রণা, অভাব দুর্নীতি আছে। সব আমরা "ভ্রাতৃত্ব" সাধন বলে পরাজয় করিব ;—এবং স্বদেশকে উন্নতির সিংহাসনে সমুত্থিত করিব। জেলা সমিতি দুর্ধর্ষ জাতীয় নবশক্তিতে জাগরিত হউক, তৎসহ মৃত ফরিদপুর আবার পূব গৌরবে ভূষিত হউক ;—ফরিদপুর অপূর্ব জয়শ্রী মস্তকে ধারণ করিয়া ভারতের আদরের বস্তু হউক, জয় মা আনন্দময়ীর জয়, জয় জাতীয় একতার জয়, জয় "স্বরাজের" জয়।

নব্যভারত ১৩১৪ চৈত্র

---

১ ফরিদপুরে যাহারা নিগৃহীত হইয়াছেন, শুধু তাহাদের নাম এস্থলে তুলিয়া দিলাম।

(১)

কটেল (Cattell) নামক এক সাহেব অনন্তমোহন দাস নামক মাদারিপুর ইংরেজি স্কুলের ৫ম শ্রেণির ছাত্রের নামে নালিশ করে যে, তাহাকে মারিয়াছে, ১৪৭ ধারা অনুসারে তাহার ৬ সপ্তাহের কঠিন পরিশ্রম সহিত জেল হয়। সাং চরমুগরিয়া, মাদারিপুর।

(২)

এক মুসলমান—রাজকুমার দে এবং কুমুদিনীকান্ত দে নামক ২টি ভদ্রলোকের নামে বিলাতি কাপড় কাড়িয়া নেওয়া ও তাহা পোড়ানোর নালিশ করে। ৩৭৯ ধারার বিধান মতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার দের ১ মাস ও কুমুদিনীকান্ত দের ১৫ দিনের সপরিশ্রম জেলের হুকুম হয়। আদালতে হুকুম বহাল থাকে। উভয়ের বাড়ি সাজনপুর। থানা পালং।

(৩)

ব্রজবাসী কাপুড়িয়া নামক এক কাপড় বিক্রেতা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মুখটির নামে নালিশ করে যে, সে তাহার বিলাতি কাপড় লইয়া গিয়াছে। ৩৭৯ ধারার বিধান অনুযায়ী ৩ মাস সপরিশ্রম জেল ও ৫০ টাকা জরিমানা হয়। আপিলে জরিমানা বহাল ও যে ৪ দিন জেল খাটিয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া খালাস পায়।

(৪)

শ্রীযুক্ত যদুনাথ পাল, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মুখটি, শ্রীযুক্ত মুনসী মজাফের হোসেন, বিলাতী কাপড় ও বিলাতী লবণ বিক্রয় বাধা দেওয়ায়—১০৭ ধারার বিধান মতে শ্রীযুক্ত যদুনাথের ৫০০ টাকার জামিন ও ৫০০ টাকার মুচলিকা, শ্রীযুত মহেন্দ্রবাবুর ৩০০ টাকার জামিন ৩০০ টাকার মুচলিকা, মুনসী মজাফর হোসেনের ২০০ টাকার জামিন ও ২০০ টাকার মুচলিকা হয়। প্রত্যেকেরই জামিন ও

মুচলিকা ৬ মাসের জন্য হয়। সকলের নিবাস পালং।

(৫)

শ্রীযুত মহেন্দ্র চন্দ্র মুখটিব উক্ত জামিনের ৬ মাস অতীত হওয়া মাত্র পুনরায় তাহাকে বিলাতি লবণ বিক্রয় হইতে বাধা দেওয়ার অপরাধে ১০৭ ধারা অনুযায়ী পুলিশ চালান দেয়—৫০০ টাকার জামিন ও ৫০০ টাকার মুচলিকার আদেশ হইয়াছে। (১ বৎসরের জন্য)

ঐ মোকর্দমার মহেন্দ্রবাবুর সহিত মৈজদ্দিন নামক পালংহাটের ইজারাদারকেও চালান দেওয়া হয়। তাহারও ২০০ টাকার জামিন ও ২০০ টাকাব মুচলিকা আদেশ হইযাছে। সকলের নিবাস পালং।

(৬)

শ্রীযুক্ত যদুনাথ দে ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে হাটুবিয়ার বাজারে বিলাতি লবণ বিক্রয় করিতে বাধা দেওয়ায় ২০৭ ধারা মতে প্রত্যেকের ১০০ টাকার জামিন ও ১০০ টাকার মুচলিকার আদেশ হইয়াছে। নিবাস পাঁচকাটি, পোঃ হাটুরিযা।

(৭)

বাজিতপুর স্বদেশি মোকদ্দমা।

উমেশচন্দ্র বাগচি নামক এক ব্যক্তির নালিশে—

(১) শ্রীযুক্ত বসিকচন্দ্র বাগচি (বি এ পর্যন্ত পড়িয়াছেন) বাজিতপুব ইংরেজি স্কুলের সুপারিনটেন্ডেন্টেব ৩ মাস সপরিশ্রম কাবাগার ১০০ টাকা জরিমানা এবং উক্ত স্কুলের ১ম শ্রেণির অপর ৩টি ছাত্র।

(২) শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ ২ মাস সপরিশ্রম ৫০ টাকা জরিমানা।

(৩) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরি ১ মাস সপরিশ্রম ও ৫০ টাকা জরিমানা।

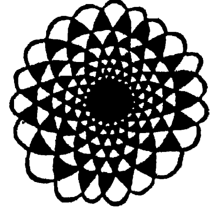
(৪) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২ মাস সপবিশ্রম ৫০ টাকা জরিমানা।

অভিযোগ ঃ কলেজ হইতে শ্রীযুক্ত রসিকবাবুব আদেশে উমেশ বাগচিব দোকান হইতে বিলাতি চিনির প্রস্তুতীয় সোয়া পাঁচসের বাতাসা মূল্য অনুমান ১ টাকা জোর করিয়া লইযা গিয়াছে এবং তাহাকে মারিয়াছে।

১৪৭ ও ৩৭৯ ধাবা মতে সাজা হয়। জরিমানার টাকা হইতে ১ টাকার বাতাসা নষ্ট করার জন্য বাদীকে ৩০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বসিকবাবু আজ ৩/৪ দিন হয় জেল হইতে মুক্ত হইয়াছেন—বালকগণ পূর্বেই মুক্ত হইয়াছে।

২ ইবিগেশন খালেব জন্য সকল নদী শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। এ বিষয়ে বিশেষ আন্দোলনেব প্রযোজন।

৩ Lord Curzon's efforts to create of taste for tea drinking among the natives of India and encourage home manufacture seems likely to prove successful. A tea distributing agency has been formed, and Messrs. Andrew Yule and Co have undertaken the work of distribution for three years without any payment except out of pocket expences Once a fashion is created, however, the immense population of India would ensure an enormous return. St James Gagette



সীতারাম

যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি।।

কবি বলিয়াছেন ধন, জীবন, যৌবন সবই অস্থায়ী ; কেবলমাত্র কীর্তিমান পুরুষের কীর্তির চিহ্নই চিরস্থায়ী। সেই জন্য কীর্তিমান পুরুষ দেহত্যাগ করিলেও তাঁহাকে জীবিত বলিয়া জ্ঞান করা হয়। কথাগুলি অতি সত্য। সীতারামের জীবনেও আমরা এই কথাগুলির জ্বলন্ত প্রমাণ দেখিতে পাই। সীতারাম জীবিত নাই, তাঁহার নশ্বর দেহ দুই শত বৎসর পূর্বে[১] বিনষ্ট হইয়াছে। তাঁহার যে মস্তকের জন্য একদিন পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল, সে মস্তক কোন ভূতে বিলীন হইয়াছে তাহারও কোন প্রমাণ পাইবার সম্ভাবনা নাই ; কিন্তু তথাপি সীতারাম জীবিত, কেননা তাঁহার কীর্তিসমূহ এখনও দেদীপ্যমান। সীতারামের সাধের, যশোহরবাসীর আদরের. সমগ্র বাঙালি জাতির গৌরবের মহম্মদপুর আছে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয় আজ বিদ্যমান, দেবকীর্তিগুলি এখনও তাঁহার কীর্তিধ্বজা উড্ডীন করিয়া আজও মবিয়া জাগিয়া রহিয়াছে। তাঁহার জোড়বাংলা, লক্ষ্মীমন্দির, দশভুজালয়, তাঁহার পবিত্র নামকে কালের করাল কবলে চিরদিনের জন্য বিলীন হইতে দেয় নাই। তাঁহার সুস্বাদুক্ষীবনীরপূর্ণ 'রামসাগর', স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ বারিপূর্ণ 'কৃষ্ণসাগর', এখনও তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে— জলদান করাই হিন্দুর মহাপুণ্য এই সত্য প্রচার করিবার জন্যই যেন আজ শুষ্ক হয় নাই। অর্ধমাইল প্রস্থ ও ততোধিক দীর্ঘ বৃহৎ রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ তাঁহার অতুল কীর্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। ভগ্নদুর্গ প্রাকাবাদি, ভীরু বাঙালি যে চিরকালই "ভেতো বাঙালি" পদবাচ্য নয় তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ও প্রমাণ প্রদান করিতেছে।

সীতারাম বীরপুরুষ ; সীতারাম যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; অরাজক দেশকে শান্তিদানে চেষ্টা করিয়াছিলেন—এসব কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।[২] তাঁহার ইতিহাস দূর অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হইলেও, তাঁহার পুণ্য-স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল। পিতৃপুরুষের পুণ্যস্মৃতিতে যিনি বা যে জাতি গৌরব অনুভব না করেন, তাঁহার বা সে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী। তাই পূজ্যপাদ লেখক বলিয়াছেন "পিতৃগৌরবই প্রতিষ্ঠার মূল কারণ।"[৩] পিতৃগৌরব বিস্মৃত হইলে, জাতি যে অধঃপতনের পথে অগ্রসর হয়—তাহা ধ্রুব সত্য! তাই মহাপুরুষ সীতারামের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া সীতারাম উৎসব সমিতি ১৩১১ সনে সীতারামের ভক্তবৃন্দকে নিম্নলিখিত পত্রদ্বারা উৎসবে যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রী দুর্গাসহায়

মাগুরা
যশোহর, ১৯০৫

মহাশয়,

মহম্মদপুরের স্বাধীন রাজা সীতারাম রায় বাঙালির গৌরব। অত্যাচার নিবারণ, সতীর সতীত্ব রক্ষা, দেবালয় সংস্থাপন, প্রজার জলকষ্ট নিবারণ, অভেদনীতিতে রাজ্যপালন,

শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে একাগ্রতা, প্রজাবৎসলতা, দানশীলতা এবং দেশের অন্যান্য হিতসাধন **প্রভৃতি অশেষ গুণে** তিনি ভূষিত ছিলেন। এদেশে তাঁহার দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর ভোগ করেন না, এমন লোক নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সীতারামের নাম ও কীর্তিরক্ষার জন্য মহম্মদপুরে, তাঁহার ভগ্নাবশেষ রাজবাটীতে আগামী ফাল্গুন মাসের শেষভাগে একটি উৎসব ও মেলা হইবে। আশা করি, মহাশয় ওই সময়ে উৎসবে যোগদান ও যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া বাধিত করিবেন। উৎসব উপলক্ষে সীতারামের প্রতিষ্ঠিত দশভুজার পূজা, পীরমহম্মদের দরগায় নমাজ ও সিন্নি, সভাসমিতি, ঘোড়দৌড়, শড়কি, লাঠি ও কুস্তি প্রভৃতি শারীরিক বল প্রবর্ধক ক্রীড়া প্রদর্শন ও ক্রীড়ায় পারদর্শিতা অনুসারে পুরস্কার বিতরণ, নগর-ভ্রমণ, সঙ্কীর্তন, সীতাবামের আখ্যায়িকামূলক কথকতা, থিয়েটার, যাত্রা, জারি প্রভৃতি আমোদ হইবে। নিবেদন ইতি।

নিঃ

শ্রীবসন্তকুমার বসু, উকিল
সভাপতি।
শ্রীসারদাচরণ বসু, বি এ, শিক্ষক
সহকারি সভাপতি।
শ্রীরেবতীকান্ত সরকার, উকিল,
কোষাধ্যক্ষ

শ্রী কামিনীমোহন গুপ্ত বি, এল।
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উকিল।
শ্রীহীরালাল রায়, শিক্ষক।
শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার, ডাক্তার।
সম্পাদকগণ

এই নিমন্ত্রণের ফলে দেশ বিদেশ হইতে অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সীতারাম উৎসবে আনন্দের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। নানাকাবণে উৎসব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সীতারামের অক্ষয়কীর্তিগুলির মেরামতের আশাও বিলীন হইয়াছে।[৪]

সীতারাম যে সময়ে স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস পাইতেছিলেন, সে সময় দেশ এক প্রকার অরাজক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আরাকান দস্যু, বৈদেশিক পর্তুগিজ দস্যু, পাঠান—সকলেই স্ব স্ব লুণ্ঠন ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত। দেশে অনবরত চুবি ডাকাতি সম্পাদিত হইত। সেই অবস্থায় সীতারাম নিজ প্রাধান্য বজায় রাখিয়া এতগুলি কীর্তি স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহার প্রধান কারণ, সীতারাম হিন্দু-মুসলমানে একপ্রাণতা সৃষ্টি করিতে যত্ন করেন এবং অনেকটা কৃতকার্য হইয়াছিলেন। পাঠানদস্যু বক্তার, সীতারামের পরম ভক্তরূপে ক্ষত্রিয় বীর ছকুরায়ের সহিত একপ্রাণে অসি সঞ্চালন করিতেন। আজ চতুর্দিকে যে অপকৃষ্ট জাতির উত্থানের কথা (Depressed classe's mission) হইতেছে, সীতারামকে ইহার অগ্রণী বলিলে বিশেষ কিছু অতিরঞ্জন করা হয় না। উচ্চশ্রেণির মদনমোহন এবং চণ্ডাল জাতীয় রূপচাঁদ ঢালি একই বলে বলীয়ান হইয়া জন্মভূমির জন্য রক্তপাত করিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র বিশারদ ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ ও কোরাণাভিজ্ঞ মৌলবি উভয়েই সীতারামকে উপদেশ দিতেন এবং উভয়েই তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাই সীতারাম সকলকে একমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া অতি অল্পসময়ে অনেক কার্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাই এখনও দেশে দেশে ফকির ভিখারির মুখে শোনা যায়

"শুন সবে ভক্তিভাবে করি নিবেদন,
দেশ গায়েতে যা হইল শুন দিয়া মন।
রাজাদেশে হিন্দু বলে মুসলমানে ভাই,
কাজিয়া লড়াই কাটা কাটির নাহিক বালাই।

বিন্দুর বাড়ির পিঠেকাশন মুসলমানে খায়,
মুসলমানের নস্ পাটালি হিন্দুর বাড়ি যায়।
রাজা বলে আল্লা হরি নহে দুই জন,
ভজন পূজন যেমন ইচ্ছা করুক পেতে মন।
মিলে মিশে থাকা সুখ তাতে বাড়ে বল,
ডরেতে পলায় মগ ফিরিঙ্গিরা খল।
চুলে ধরি নারীলয়ে চড়তে নারে নায়,
সীতা বাজার নাম শুনিয়ে পলাইয়ে যায়।

এই ছড়াতেই বেশ প্রতীয়মান হয় যে সীতারামের রাজত্বে বড়, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই ছিল না। হিন্দু মুসলমান যে একই মায়ের সন্তান, একই শরীরের দক্ষিণ ও বাম বাহু, একের অভাবে যে অপরে কোন কার্যেই সক্ষম হইতে পারেন না, সীতারাম তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং জনসাধারণকেও অনেকাংশে তাহাই বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের কি দুরদৃষ্ট, যে কীর্তিমান মহাপুরুষ নানা মহৎ কীর্তি সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেই সীতারাম ইতিহাসে দস্যু বলিয়া অঙ্কিত হইয়াছেন। উপন্যাসে তাঁহার লোকহিতকর কীর্তির পরিবর্তে তিনি কেবলমাত্র কামুক বলিয়াই পরিকীর্তিত হইয়াছেন।[৬]

.. সীতারামের কয়েকখানি ইষ্টকের প্রতিকৃতি ... যশোহর জেলার সুপরিচিত বন্ধুবর বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় সংগ্রহ করিয়া আমাদের হস্তে এবং অবশেষে যদি সম্ভব হয় বাঙালির আদরের সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে স্থাপনের জন্য আমাকে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। পাঠক দেখিবেন, দুই শত বৎসরেও ইষ্টকগুলির কারুকার্য বিনষ্ট হয় নাই। সীতারামের প্রাসাদ মন্দির প্রভৃতি এই সকল কারুকার্য সম্পন্ন ইষ্টকদ্বারা সুশোভিত থাকিয়া সকলের নয়ন রঞ্জন করিত। দুই শত বৎসরের জল ঝড়ে ও অনাদরে ইহার সে শোভা রহিয়া গিয়াছে। এ বড় কম কথা নহে! চতুর্দিকে শত্রু, দিল্লির বাদশাহ ও বাংলার নবাব শত্রু, পার্শ্ববর্তী ভূম্যধিকারীগণ ঈর্ষায় জর্জরিত হইয়া শত্রুতা সাধনে বদ্ধপরিকর, তথাপি সীতারাম নির্ভিক হৃদয়ে এই সকল কীর্তি-মহীরুহ নির্মাণে তৎপর। এ কীর্তি আবার দুই একটি নহে বা দুই এক দিনে নির্মিত নহে। প্রাণ ভয়ে ভীত দস্যুর পক্ষে কি এই সকল কার্য সম্ভব?

আমরা এই প্রবন্ধে সীতারামের কয়েকটি কীর্তির অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম। পাঠক ইহা হইতে কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে ওয়েস্টল্যান্ড সাহেব কেন বলিয়া গিয়াছেন "The tanks and temples and ruins at Mohammudpur consist far better with the local legends than with the other accounts." এই প্রসঙ্গে আমরা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর সুযোগ্য বংশধর, নাটোর মহারাজের সকরুণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সীতারামের অনেকগুলি কীর্তি এইক্ষণ মহারাজের জমিদারি ভুক্ত। তাই যশোরবাসীর পক্ষ হইয়া আমরা তাঁহার নিকট এই কীর্তিকলাপগুলি রক্ষার জন্য আবেদন করিতেছি। নাটোর রাজ-প্রাসাদে এখনও কয়েকটি মন্দিরে উপযুক্ত পূজারী নিযুক্ত হইয়া পূজাদি কার্য নির্বাহিত করিতেছে। আশা করি আমাদের এই নিবেদন সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে না।

প্রথমেই আমরা সীতারামের প্রধান কীর্তি দুর্গের বিষয় আলোচনার প্রয়াস পাইব। এই দুর্গ পরিবেষ্টিত প্রাঙ্গণের মধ্যেই সীতারামের প্রাসাদ, তোষাখানা, দোল-মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, দশভূজার মন্দির প্রভৃতি অবস্থিত ছিল। এই দুর্গ ও প্রাকার অর্ধ মাইল বেষ্টিত ছিল। দুর্গ-প্রাকার পরিখা বেষ্টিত ছিল। ওয়েস্টল্যান্ড সাহেব যখন মহম্মদপুরে থাকেন তখন পূর্ব ও

উত্তরের পরিখার চিহ্ন বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু অন্য দুইদিকের পরিখা তখনও জলপূর্ণ ছিল। এই দুর্গের একটি সিংহদ্বার ছিল এবং এই সিংহদ্বার দিয়াই দুর্গে প্রবেশ করিতে হইত। বর্তমানে ইহার সামান্য চিহ্ন মাত্র আছে।[৭] দুর্গের বাহিরে 'রামসাগর ও সুখসাগর' নামক দুইটি বৃহৎ পুষ্করিণী বিদ্যমান আছে। শোনা যায় রামসাগরের ন্যায় বৃহৎ পুষ্করিণী বঙ্গদেশে খুব কম।

দুর্গ মধ্যে দোল-মন্দির বর্তমান। কথিত আছে যে বীরবর মেনাহাতি (বঙ্কিমের মৃণ্ময়) এই স্থানে ধৃত হয়। দোলমন্দিরের নিকটে পুণ্যাহগৃহের ভগ্নাবশেষ মাত্র বর্তমান। সীতারামের কোষাগারও এই দুর্গ মধ্যে ছিল। একটি পুষ্করিণীতে সীতারাম তাঁহার ধনরাশি নিক্ষেপ করিতেন। প্রয়োজন মত উহা বাহির করিয়া ব্যয় করিতেন। শোনা যায় যে বর্ধমানাধিপতিরও ধনরত্ন রক্ষার জন্য এই প্রকার পুষ্করিণী আছে। দুর্গ মধ্যেই দশভূজা ও লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের অবস্থা মন্দ নহে, কিন্তু দশভুজার মন্দির আর বেশিদিন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। সীতারামের নিজ প্রাসাদ এইক্ষণ জঙ্গলাকীর্ণ এবং ইহার মধ্যে প্রবেশ দুঃসাধ্য। বর্তমানে লক্ষ্মীনারায়ণশিলা কোথায় আছেন ঠিক জানা যায় না। অনেকেরই মতে সুপ্রসিদ্ধ রামরতন রায় মহাশয়ের বংশধর সুপ্রতিষ্ঠিত নড়াইল জমিদারদিগের গৃহ দেবতাই প্রকৃত লক্ষ্মীনারায়ণের শিলা।

মহম্মদপুরের নিকটবর্তী কানাইনগরে সীতারাম কৃত কৃষ্ণজীর মন্দির। কৃষ্ণজীর মন্দির সকলেরই মতে সীতারামের প্রস্তুত সকল মন্দিরাপেক্ষা অধিক কারুকার্য পূর্ণ। ওয়েস্টল্যান্ড সাহেব বলিয়াছেন যে "it is the finest buildıng of the sort ın the district." মন্দিরটি চতুষ্কোণ। উপরে সুদৃশ্য গম্বুজ। মন্দিরের চতুর্দিকে মন্দির-সংলগ্ন আর চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গম্বুজ সংবলিত চারিটি চূড়া। মন্দিরের সম্মুখভাগের খিলানের নিম্নে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ বর্গক্ষেত্র আছে। এই সকল ক্ষেত্রে কৃষ্ণের জীবনের ঘটনাবলী খোদিত রহিয়াছ। সম্মুখভাগে প্রায় এই প্রকার পঞ্চাশটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে ৫০টি চিত্র হইয়াছে। চিত্রগুলি পরিস্ফুট।...

মন্দিরের সম্মুখে তিনটি দ্বার আছে। প্রত্যেক দ্বারের উর্ধ্বদিকে চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে দুইটি সিংহ একটি পাত্র ধরিয়া আছে এইরূপ প্রতিকৃতি অঙ্কিত। অপর পার্শ্বে পাঁচটি করিয়া দ্বার আছে। মন্দিরের ভিত্তি তিন ফিট উচ্চ। দ্বার ও গবাক্ষগুলি চন্দন কাষ্ঠ নির্মিত। এগুলিও কারুকার্য সমন্বিত। মন্দিরের খিলানের বামদিকে দ্বাদশ কি অষ্টাদশ পরিমিত প্রস্তরে নিম্নলিখিত শ্লোকে খোদিত ছিল।

"বাণদ্বন্দ্বাঙ্গচন্দ্রে পরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষাভিলাষঃ,
শ্রীমদ্বিশ্বাসখাসোদ্ভবকুলকমলে ভাসকো ভানুতুল্যঃ।
ভ্রজ্জৎ স্নেহোপযুক্তং রুচিররুচিহরো কৃষ্ণগেহং বিচিত্রং,
শ্রীসীতারামরায়ো যদুপতিনগরে ভক্তিমন্তঃ সসর্জ।"

১৬২৫ শকে (বাণ=পঞ্চবান; দ্বন্দ্ব—দুই; অঙ্গ—ষড়াঙ্গ; চন্দ্র—এক=৫২৬১ অর্থাৎ ১৬২৫ শকে; ১৬৩৫ শক ১৭০৩ সনের এপ্রিল মাসে আরম্ভ হইয়াছিল) কৃষ্ণ প্রীতার্থে, শ্রীসীতারাম রায় যদুপতি নগরে কৃষ্ণের জন্য গৃহ নির্মাণ করেন। সূর্য যেরূপ পদ্মের জ্যোতি বৃদ্ধি করেন, সেইরূপ বিশ্বাস বংশে সীতারাম ও জ্যোতি বিকীর্ণ করেন, সীতারাম এই স্থলে নিজকে এই প্রকার তুলনা করিয়াছেন। যদুপতি অর্থাৎ কানাই বা কৃষ্ণ এবং যদুপতি নগরে বা কানাইনগরে অপর সৌন্দর্যশালী গৃহের সৌন্দর্যহরণকারী এই মন্দির নির্মিত হইল।

কানাইনগরের এই সুন্দর মন্দিরের পার্শ্বে অপর তিনদিকে আর তিনটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। কানাইনগরের মন্দিরের বর্তমান অবস্থা মন্দ নয় কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে

ইহার ও ইহার সহযাত্রীদিগের সহিত এক পথে যাইবার অধিক বিলম্ব নাই। এই মন্দিরগুলি—আমরা পূর্বেই বলিয়াছি—শ্রীযুক্ত নাটোর মহারাজের জমিদারি ভুক্ত। বলরামের মন্দির নাটোর মহারাজ ক্ষুদ্রাকারে নির্মাণ করিয়াছেন এবং প্রত্যহ ইহার পূজার ব্যবস্থা করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদ লাভ করিতেছেন।

মানসী ১৩১৭ ফাল্গুন

---

১ ভারতী কার্তিক ১৩১৭ অথবা Bengal Past and Present Vol v, April, June 1910 দ্রষ্টব্য। উক্ত দুই প্রবন্ধে আমরা ইহা প্রমাণের প্রয়াস পাইয়াছি যে যাহারা বলিতে চান যে সীতারাম ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের মত সমীচীন নহে। ওয়েস্টল্যাণ্ড সাহেব সীতারামের মৃত্যুর latest date ১৭১২ বলিয়াছেন। আমরা দেখাইয়াছি যে ঐ তারিখই যতদূর সম্ভব সীতারামের মৃত্যুর বৎসর। সেই হিসাবে ১৭১২ হইতে ১৯১২ ঠিক দুই শত বৎসর।

২. আমার ক্ষুদ্র মতে সীতারাম চরিত্রবিষয়ে যে সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন ইহা বোধ হয় না। "সীতারামী সুখ" কথাটির প্রবাদ যতদূর সম্ভব সীতারামকে লইয়াই সৃষ্ট। সীতারামের "সুখসাগর" কাষ্ঠ নির্মিত দ্বিতল প্রাসাদ হইতেই বোধ হয় যে সীতারাম অন্যদিকে যেমন কৃতকর্ম ছিলেন, তেমন বিলাসীও ছিলেন। ইতিহাসের সহিত কিংবদন্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিংবদন্তিকে আমরা একেবারে দূর করিতে পারি না। তবে ইহা নিশ্চয় যে সীতারাম সংক্রান্ত এ সকল বিষয় অতিরঞ্জিত হইয়াছে।

৩. শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় প্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রথম খণ্ড—ভারতবর্ষ ৪৭২ পৃষ্ঠা।

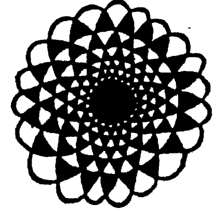
৪. কলিকাতা ঐতিহাসিক সমিতির মুখপত্র (Calcutta Historical Society) Bengal Past and Present নামক পত্রিকার সম্পাদক রেভারেণ্ড ফার্মিঞ্জার ১৯০৯ সনে লিখিয়াছিলেন will it be possible to extend our survey to the Jessore district? How full of interest for instance, would be a visit to Muhammadpur the great quadrangular enclosure in which stood the fortress and palace of Raja Sita Ram Ray By the year 1896 the ruins of the palace had become inaccessible owing to the dense jungle growth how things stand at present day I cannot tell, but if a visit on the part of our Society were to serve to bring about a rescue of these monuments of ancient Bengal from sheer destruction, we should have a very good cause for congratulation" (Bengal past and present vol II. 1908 page 511). দুঃখের বিষয় এই—দুই বৎসরে কলিকাতা ঐতিহাসিক সমিতি যশোহরে যাইয়া উঠিতে পারে নাই। সম্প্রতি এই বিষয় আমাদের সদাশয় গভর্নমেন্টের নজরে আনা হইয়াছে। যদি শীঘ্র শীঘ্র সংস্কার কার্যে নিযুক্ত না হওয়া যায় তবে অচিরে এই প্রাচীন কীর্তির চিহ্নমাত্র থাকিবে না।

৫ পল্লীগ্রামে সাধারণত একশ্রেণির মুসলমান ফকির আছে যাহারা "সুর করিয়া" এই প্রকার ছড়া মুখস্ত বলে। উদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে কয়েকটি গ্রাম্য শব্দ আছে। চতুর্থ লাইনের কাছে—"কাজিয়ার" মারামারির অপভ্রংশ। পঞ্চম লাইনে 'কাশন—' যাহাকে কাশুন্দ বলে। ষষ্ঠ লাইনে 'নস' অর্থাৎ খেজুরের রস। একাদশ লাইনে 'নায়' অর্থাৎ নৌকায়।

৬. ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট সাহেব সীতারামকে দস্যুরূপে চিত্রিত করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বে ভারতীর ও Bengal Past and Present-এর প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছি উহাতে স্টুয়ার্ট সাহেব যে স্বকপোল কল্পিত আখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া সীতারামকে দস্যুরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন উহার বিষয় আলোচনা করিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে কামুকের চিত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন। সীতারাম প্রকৃত কেবল কামুকই ছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা পূর্বে করিয়াছি। তবে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে তাঁহার অমর লেখনী সীতারামকে ওই চিত্রে চিত্রিত না করিলে ভবিষ্যৎ লেখকগণের অনেকটা সুবিধা হইত, বঙ্কিমের পাকা কালীকে সাদা করিবার চেষ্টা করিতে হইত না। বঙ্কিমচন্দ্র বীর তকিখাঁকে ও চন্দ্রশেখরে এই রং-এ চিত্রিত করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র (শিল্প ও সাহিত্যে) আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছি।

৭. স্টুয়ার্ট সাহেবের উত্তরে ওয়েস্টল্যান্ড সাহেব সার সত্যই লিখিয়াছেন। আমরাও অন্যত্র ওয়েস্টল্যান্ডের কথার পুনরুক্তি করিয়া বলিয়াছি "Sitaram may or may not have been a hero in the truest sense of the word, but the legends associated with Muhammadpur and the temples and ruins which exist in such profusion indicate something more than the activities of a mere robber chief" (Bengla Past and Present Vol V P 236)

৮ বারান্তরে "মহম্মদপুরের বর্তমান অবস্থা" প্রবন্ধে আমবা এই বিষয় আলোচনা করিব।



পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি
রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ

পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় গত ১৩৩৫ সনের ১ ফাল্গুন তারিখে বহরমপুর নগরে পবিত্র ভাগীরথীতীরে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। তখন তাহার বয়স ৭৭ বৎসর হইয়াছিল। ফরিদপুর জেলার প্রাণপুর গ্রামে বৈদিক-ব্রাহ্মণবংশে এই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বহুদিন পূর্বে সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তাচার্য পরিব্রাজকশিরোমণি শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী এই বংশ সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

সেকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বালকের যেরূপ শিক্ষা হইত চূড়ামণি মহাশয়েরও বাল্যে সেইরূপ শিক্ষা হইয়াছিল। তিনি বিক্রমপুরের এক টোলে ব্যাকরণ সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করেন, পরে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে—বিশেষত উপনিষদাদি গ্রন্থে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কাশীধামে যাইয়া একজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অসাধারণ মেধা ও প্রতিভাবলে তিনি অতি অল্প সময়ে শাস্ত্রের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ এবং গূঢ় তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারিতেন। সেজন্য জটিল দার্শনিক তত্ত্বসকলের তিনি অনায়াসে সহজ মীমাংসা করিতে পারিতেন।

তাহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া কাশিমবাজারের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় বাহাদুর অন্নদাপ্রসাদ রায় তাহাকে নিজের সভাপণ্ডিতের পদে বরণ করিয়াছিলেন। তিনি বহরমপুরে অবস্থানকালে সুপ্রসিদ্ধ রামদাস সেন মহাশয়ের প্রকাণ্ড পুস্তকাগার হইতে অনেক দার্শনিক গ্রন্থ লইয়া পাঠ করার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাহার এই প্রবল জ্ঞানস্পৃহা জীবনের শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। শারীরতত্ত্বের প্রগাঢ় বুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য তিনি বৃদ্ধ বয়সে Physiology ও Anatomy-র গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং শবব্যবচ্ছেদ দেখিবার জন্য বেলগাছিয়া হাসপাতালে যাতায়াত করিতেন।

কাশীধাম হইতে আগমন করিয়া যখন তিনি উক্ত রায় বাহাদুরের সহিত মুঙ্গেরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ভগবান তাহাকে এক মহত্তর কার্যে নিয়োজিত করিলেন। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (পরে যিনি পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন) হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের জন্য এক আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। চূড়ামণি মহাশয় ভগবৎপ্রেরণায় সেই আন্দোলনে যোগদান করিলেন।

সম্প্রতি স্বর্গগত সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় বাহাদুর দীননাথ সান্যাল মহাশয় এই সম্বন্ধে চূড়ামণি মহাশয়ের তিরোভাবের পরেই "মানসী ও মর্মবাণী" পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা দ্বারা একজন প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত সে সময়কার ধর্মান্দোলনের ইতিহাস কতকটা জানা যাইবে।

"এইরূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাংলা দেশটিকে যখন একটি প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন, এমন সময় কাশীধাম হইতে শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বঙ্গদেশে আসিলেন। কাশী হইতে প্রথমে তিনি বর্ধমানে আসেন। সেখানে তাহার বক্তৃতা শুনিয়া ও তাহার সহিত ধর্মবিষয়ে আলাপ করিয়া তাৎকালিক চিন্তাশীল লেখক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বুঝিলেন যে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের দ্বারাই হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার সম্ভব। সে সময়ে ইন্দ্রনাথই

ছিলেন তাৎকালিক 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের পরম-হিতৈষী বন্ধু, সহায় ও উপদেষ্টা—ইংরাজিতে যাকে বলে, "Friend, Philosopher and Guide." তিনি স্থির করিলেন যে বঙ্গবাসীকে মুখপত্র করিয়া এবং চূড়ামণি মহাশয়কে বক্তা করিয়া কলিকাতায় হিন্দুধর্মের মর্মবাণী ধারাবাহিকরূপে লোককে শুনাইতে পারিলে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত লোকের মন হিন্দুধর্মের দিকে ফিরান যাইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি চূড়ামণি মহাশয়কে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং তাহাকে বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাৎকালিক মনীষিগণের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলেন।

ইহার পরেই বঙ্কিমবাবু তাহার সান্‌কী-ভাঙ্গার বাসায় একদিন একটি বান্ধবসম্মিলনীর উদ্যোগ করেন। সেখানে তিনি চূড়ামণি মহাশয়কে যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত অভিনন্দিত করিয়া তাহাব সহিত ধর্মবিষয়ে কথোপকথন করিলে, চূড়ামণি মহাশয়ের কথায় সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সকলেই সবিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন। পরে বঙ্কিমবাবুর অনুমোদনে ও 'বঙ্গবাসীর' উদ্যোগে কলিকাতায় প্রতি সপ্তাহে চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা হইতে লাগিল এবং সেই সব বক্তৃতার সারাংশ বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত ও দেশময় প্রচারিত হইয়া হিন্দুধর্ম বিষয়ে এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিল।

এই সব বক্তৃতা শুনিবার জন্য তাৎকালিক শিক্ষিত যুবকবৃন্দের কি প্রবল আগ্রহ এবং বক্তৃতা শুনিয়া তাহাদের কি চমৎকার আনন্দ! প্রথম বক্তৃতায় বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতি ছিলেন এবং তৎপরে আরও কয়েকটি বক্তৃতায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ লোকের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া সকলেই তখন বুঝিয়াছিল যে ধর্ম বিষয়ে একটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিক্রিয়ামাত্রই যেমন একস্থান বা ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে না, এই প্রতিক্রিয়াও সেইরূপ অল্পদিনের মধ্যেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তখনকার চিন্তাশীল লেখকগণ হিন্দুধর্ম বিষয়ে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। বঙ্কিমবাবু তাহার নবপ্রকাশিত 'প্রচারে' ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন : অক্ষযচন্দ্রও তাহার নবপ্রকাশিত 'নবজীবনে' ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধাদির প্রাধান্য দিতে থাকিলেন ; বঙ্গবাসী ত এ বিষয়ে চূড়ামণি মহাশয়ের ও হিন্দুধর্মের মুখপত্রস্বরূপই হইল। চূড়ামণি মহাশয়ের সহকারি যুবক ভূধর চট্টোপাধ্যায় 'বেদব্যাস' নামক মাসিকপত্রিকা প্রকাশ করিলেন---তাহাব প্রধান লেখক ছিলেন স্বয়ং চূড়ামণি মহাশয়। এই প্রতিক্রিয়াব ফলেই ক্রমে 'বঙ্গবাসী' হইতে ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণাদি—হিন্দুধর্মের নানাবিধ গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

কিছুদিন বক্তৃতা করিবার পর চূড়ামণি মহাশয় 'ধর্মব্যাখ্যা' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য, হিন্দুধর্মের গূঢ় মর্ম ও দার্শনিক ব্যাখ্যা বিষয়ে এই গ্রন্থখানি সর্বতোভাবে মৌলিক। * * *

তাহার বক্তৃতা শুনিয়া, তাহার সহিত ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এবং তাহার গ্রন্থ পড়িয়া ইহাই এক নূতনত্ব লক্ষিত হইত যে তাহার বক্তব্যের আগাগোড়াই তত্ত্ব কথা. বৈজ্ঞানিক ভাবে গ্রথিত। ভাষার ঝঙ্কার, ভাবেব উচ্ছ্বাস তাহার বক্তৃতা বা গ্রন্থে কোথাও পাওয়া যায় না। ...শাস্ত্র হইতে শ্লোকের বোঝা আওড়াইয়া তিনি শ্রোতা বা পাঠককে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন না। কেবলমাত্র তর্ক ও যুক্তিব দ্বারা হিন্দুধর্মের সাব মর্ম ও তত্ত্ব বুঝানই ছিল তাহার বিশিষ্ট প্রণালী এবং এই বিষয়ে তাহার ক্ষমতাও ছিল অসাধাবণ।

চূড়ামণি মহাশয় কর্তৃক প্রবর্তিত আন্দোলনের ফল হইল এই যে, তখনকার ইংরেজি শিক্ষিত লোকে হিন্দুধর্মকে যেরূপ অবহেলা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের যোগ্য বলিয়া ভাবিত, এই প্রতিক্রিয়ায় লোকে বুঝিল যে হিন্দুধর্মেব ভিতরে গূঢ় ভাব নিহিত আছে এবং হিন্দুধর্মের ভিত্তি পরম সনাতন দার্শনিক তত্ত্বের উপব প্রতিষ্ঠিত ; উহা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ পুষিবার একটা

কৌশল নহে। ইংরেজি-শিক্ষিত লোকের মনোভাবের এই যে পরিবর্তন, ইহাই প্রতিক্রিয়ার মহাফল। সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিলে ইহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহার কারণ এই যে জাতীয় মনোভাব সাহিত্যের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'গীতার ব্যাখ্যা' ইত্যাদি, এমন কি তাহার ঐ সময়ের কয়েকখানি উপন্যাসে পর্যন্ত এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব লক্ষিত হয়।

এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাবেই চন্দ্রনাথ বসু হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্যের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং অক্ষয়চন্দ্র তাহার নবজীবনে নানা লেখকের ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া এই প্রতিক্রিয়ার যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইহার ফল হইল এই যে ইংরেজি শিক্ষিত লোকের চক্ষে হিন্দুধর্ম আর অশ্রদ্ধার বিষয় রহিল না এবং হিন্দু আচার ব্যবহার সকলই যে কুসংস্কার মাত্র এরূপ ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হইল। ইহাই এই প্রতিক্রিয়ার মোট ফল।

সেই সময়ে যখন ঋগ্‌বেদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল এবং উহাকে 'কৃষকের গান' বলিয়া রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রবন্ধাদি লিখিলেন, তখন চূড়ামণি মহাশয়ই তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে ঐ কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইনি বুঝাইয়াছিলেন যে, ঋগ্‌বেদ ভারতীয় আর্যদিগের অসামান্য জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ। ভারতীয় আর্য সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞান যে কতদূর উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল, ঋগ্‌বেদে তাহারই নিদর্শন পাওয়া যায়। এ বিষয়ে এখন যে সকল গবেষণা হইতেছে, তাহা চূড়ামণি মহাশয়ের উক্তিরই সমর্থন করে।"

উক্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, বিগত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বাঙালি হিন্দুর মনে স্বজাতি ও ধর্ম সম্বন্ধে যে একটা শ্রদ্ধা ও অনুরাগের ভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাহার মূলে চূড়ামণি মহাশয়ের এই ধর্মান্দোলন। তিনি কলিকাতা মহানগরীতে জগন্মাতার পাদপীঠে শাস্ত্ররূপ বিল্বমূলে বসিয়া যে জাতীয়তার মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হিন্দুজাতিকে প্রবোধিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে আজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হিন্দুজাতি জাগিয়া উঠিয়া আপন বৈশিষ্ট্য ও আপন অধিকার স্থির রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই আন্দোলনে চূড়ামণি মহাশয়ের সহায় ছিলেন। তাহারা বঙ্গদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত—এমন কি কলিকাতা হইতে কোচবিহার, চট্টগ্রাম হইতে মুঙ্গের পর্যন্ত—প্রত্যেক নগরে, উপনগরে এবং প্রধান প্রধান পল্লীতে আহূত হইয়া হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিতেন। ইহার ফলে বঙ্গের নগরে নগরে হরিসভা, বাল্যাশ্রম প্রভৃতি ধর্ম-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া হিন্দুসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিল।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে গবর্নমেন্ট যখন সহবাসসম্মতি বিষয়ক আইন (Age of Consent Act) প্রবর্তিত করেন, তখন চূড়ামণি মহাশয়ের নেতৃত্বে সেই আইনের প্রতিবাদ করিবার জন্য বঙ্গদেশে এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং কলিকাতার গড়ের মাঠে প্রায় এক লক্ষ লোকের এক বিরাট সভা হইয়াছিল। সেই সভা হইতে সহস্র সহস্র কণ্ঠে "আইন চাই না—আইন চাই না" যে-রব উত্থিত হইয়াছিল, সেই রবে রাজ প্রতিনিধির রাজপ্রাসাদ কম্পিত হইয়াছিল। এই আন্দোলন হইতে চূড়ামণি মহাশয়কে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য তাহাকে অনেক প্রলোভন দেখান হইয়াছিল; কিন্তু সেই কর্তব্যনিষ্ঠ দরিদ্র ব্রাহ্মণ অবিচলিতচিত্তে রাজসম্মান তুচ্ছ করিয়াছিলেন।

কলিকাতা মহানগরীতে যখন চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্মপ্রচারকার্যে প্রবলবেগে চলিতেছিল তখন একদিন স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সাঙ্গোপাঙ্গসহ আসিয়া তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। এই দর্শনের পর চূড়ামণি মহাশয়ও দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া অনেকবার তাহাকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহার উপদেশ-বাক্য শুনিয়াছিলেন; এইরূপে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল।

তিনি নাকি একদিন পরিহাসচ্ছলে চূড়ামণি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"পণ্ডিত! তুমি ত অনেক ধর্মকথা বলিতেছ, তোমার চাপরাস কোথায়? চাপরাস না দেখাইলে যে কেহ তোমাকে মানিবে না।" ইহার উত্তরে চূড়ামণি মহাশয় নাকি বলিয়াছিলেন "আমার কোন চাপরাস নাই ; তবে শাস্ত্রে ঋষিবাক্য যেরূপ বুঝিয়াছি তাহাই প্রচার করিতেছি!" আমার বোধ হয় তিনি আরও বলিতে পারিতেন "আমার চাপরাস তা আপনি নিজে। আমি সে শাস্ত্রকথা বলি, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আপনিই ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ।"

যাহা হউক তিনি প্রচার কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল বহরমপুরে ভাগীরথী তীরে বাস করিয়াছিলেন। উল্লিখিত 'ধর্ম ব্যাখ্যা' ব্যতীত তিনি 'সাধন প্রদীপ', 'ভবৌষধ', 'ভক্তিসুধালহরী' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তক এখন আর ছাপা নাই। তিনি দীর্ঘকাল "বঙ্গবাসী", "বেদব্যাস" প্রভৃতি সাময়িক পত্রে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা পুনর্মুদ্রিত করিলে একখানি বিরাট গ্রন্থ হইবে। এতদ্ভিন্ন তিনি "চূড়ামণি দর্শন" নামক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রাচ্য দর্শনাদি অবলম্বনে বহু গবেষণা মূলক এক প্রকাণ্ড মৌলিক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; দুর্ভাগ্যবশত তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সংস্কৃত ভাষায় রচনার অর্থ, যাহাতে এই গ্রন্থ বঙ্গের বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে এবং ভারতের বাহিরে জার্মানি প্রভৃতি বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থ এখন বারাণসী কুইন্স কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম-এ মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে কাশীতে মুদ্রিত হইতেছে। ছাপা হইলে ইহাও প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠা হইবে।

চূড়ামণি মহাশয়ের যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, তেমন জগন্মাতার প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি নিষ্ঠা ছিল। মায়ের কথা বলিতে বলিতে তিনি অশ্রু বিসর্জন করিতেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ব্রাহ্মণোচিত আচার নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ফলত তাহার জীবনে আমরা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের ত্রিধারাসঙ্গম দেখিয়া ধন্য হইয়াছি।

ভারতবর্ষ ১৩৪৫ বৈশাখ

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট